সুমথনাথ ঘোষ রচনাবলী

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

সুমথনাথ ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

সূচীপত্র

ভূমিকা

কল্লোল কালি-কলম প্রভৃতি সাময়িক পত্রের সঙ্গে এই শতকের তৃতীয় দশক থেকে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, একালে সাধারণভাবে রবীন্দ্রোত্তর পর্বের প্রতিনিধি-রূপে তাঁদের নামই উচ্চারিত হয়ে থাকে। অথচ বিশ শতকের চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের একটা বড় অংশের সাহিত্যসাধনার ওপর তেমন করে আলো পড়ে না। সুকুমার সেন মশায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আধুনিক খণ্ডে বর্জাইসে এমন অসংখ্য লেখকের সারবাঁধা নামের তালিকা আছে, যাঁরা ঐসময়ে পাঠকদের হৃদয়হরণ করেছিলেন কিন্তু অধুনা দুষ্প্রাপ্য তালিকাভুক্ত। বিশ শতকের প্রথম দশ-পনেরো বছরে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সামান্য আগে-পরে কথাসাহিত্যের আসরে, গল্প-উপন্যাসের ডালি সাজিয়ে পাঠক ও ক্রেতার মনোরঞ্জন করেছেন—এমন লেখকের সংখ্যা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে যাবে—যাঁদের আমরা ভুলতে বসেছি। এঁদের অনেকের বিশিষ্ট কিছু গ্রন্থ পাঠের স্মৃতি আজও বয়স্ক প্রবীণ পাঠকের কাছে অমলিন। এখনও পুরনো আমলের লাইব্রেরিতে এঁদের কিছু জনপ্রিয় বইয়ের ছিন্নপত্র চেহারায় বইগুলির একদা-প্রবল জনপ্রিয়তার ছাপ মেলে। সে-সব বইয়ের পুনর্মুদ্রণ ঘটলে খুশি-হওয়ার লোকের অভাব হবে না।

আলোচ্য কথাসাহিত্যিকদের জনপ্রিয়তার অনেক কারণের ভিতর কয়েকটি কারণ অবশ্যই ছিল বাঙালি মধ্যবিত্তের সরল স্নিগ্ধ গার্হস্থ্য-জীবনের রূপায়ণ-দক্ষতা এবং শরৎচন্দ্রীয় গল্প-বলার সহজিয়া রীতি। উপন্যাস মানব-জীবনের কাহিনী, বাস্তবতা তার অন্যতম শর্ত এবং মনোরহস্যের জটিলতাপ্রকাশ অবশ্যই তার বিশিষ্ট ধর্ম—এ সব মেনে নিয়েও বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু বিশিষ্ট লেখক মনোগহনের রহস্য-বিশ্লেষণে অহেতুক মনোবিজ্ঞানীর আতস কাঁচ নিয়ে বসেননি, অথচ অতিপরিচিত নিত্যদৃষ্ট মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত জীবনের ফাঁকে-ফোকরে জটিল মনের কত আলোছায়ার লীলাই না প্রত্যক্ষ করেছেন। তাছাড়া শহর কলকাতা ও মফস্বল বাংলার চাকুরিজীবী অল্পবিত্ত বাঙালি পরিবারের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ হাসিকান্নার জগৎটাকে সাবলীলভাবে গল্পে গল্পে তুলে ধরার যে অনায়াস ভঙ্গি শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে প্রবর্তিত করে-ছিলেন, তাঁর উত্তরসূরীরা তাকে অব্যর্থভাবে অনুসরণ করেছিলেন। এঁরা অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, ফণীন্দ্রনাথ পাল, মাণিক ভট্টাচার্য, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রভৃতি শরৎ-অনুরাগীদের পরবর্তী প্রজন্মের লেখক। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, রামপদ মুখোপাধ্যায়, সুবোধ বসু, জ্যোতির্মালা দেবী, আশালতা সিংহ, আশাপূর্ণা দেবী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, হাসিরাশি দেবী, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় এবং সুমথনাথ

ঘোষ। এ তালিকা অবশ্যই দীর্ঘতর, কিন্তু কয়েকজন প্রতিনিধি-নামেই এ-বক্তব্য নিবেদিত হচ্ছে। গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং আশাপূর্ণা দেবীর কলম এখনও সকর্মক এবং সপ্রতিভ। প্রয়াত সুমথনাথ ঘোষের গ্রন্থাবলী প্রকাশের সূত্রেই এঁদের নাম মনে পড়ল। এঁরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, তবু এঁদের সকলের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের জীবনদৃষ্টি ও রচনারীতিরই বিশেষ অনুবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয়। এঁদের অভিজ্ঞতার পুঁজি পৃথক, তবু বাঙালি মানসের ভাবালুতা ও বাঙালি নারীর বিচিত্র-মূর্তি এঁদের লেখায় ঘুরে-ফিরে শরৎচন্দ্রকেই মনে করিয়ে দেয়। সুমথনাথ ঘোষ মশায়ের লেখার গভীরে প্রবেশ করলে এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়। সুমথনাথ শরৎ-আকাশের চন্দ্রসমীপ নক্ষত্রগোষ্ঠীর উজ্জ্বল সদস্য। বিশেষ করে উপন্যাস-রচনায় সুমথনাথ শরৎচন্দ্রীয় রীতিকে আত্মস্থ করে কীভাবে একটি নিজস্ব পদ্ধতি তৈরি করতে পেরেছেন, তাঁর উত্তরবাহিনী উপন্যাসে আমরা সে পরিচয় পাব। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে অবশ্য শরৎচন্দ্র তাঁর পথপ্রদর্শক নন, সে-ক্ষেত্রে কল্লোল-গোত্রের লেখকদের প্রভাব তাঁর উপর অনেকাংশে বর্তেছে। কিন্তু কল্লোলগোষ্ঠীর প্রতিনিধিস্থানীয় লেখকদের উগ্র বাস্তবতার মোহ তাঁর মধ্যে ছিল না, দেহ সম্পর্কে সুমথনাথের শুচিতাবোধ বরং শরৎচন্দ্রীয় রক্ষণশীলতারই অনুরূপ। বাঙালি সমাজজীবনের ক্ষুদ্রপরিসর গন্ডীর মধ্যে নারীর জননী-জায়া-ভগিনী-ভ্রাতৃজায়া-কন্যা প্রভৃতি সুপরিচিত সম্বন্ধের মধ্যে কত মাধুর্য-রহস্য-মমতা-রোমাঞ্চ আছে, সুমথনাথ অতি-কৌতূহলী চোখে নিবিড়ভাবে তা পর্যবেক্ষণ করেছেন। আগেও একথা আমরা বলেছি যে, নারীই সুমথনাথের গল্পের মুখ্য আকর্ষণ এবং মূলত মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের মধ্য থেকেই তাদের দেখা পেয়েছেন তিনি। তাদের জীবনেরই গভীর থেকে প্রবহমাণ ফল্গু সুমথসাহিত্যভূমিকে শস্যশ্যামল করেছে। বর্তমান রচনা-সংগ্রহের গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে একথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

পরপূর্বা উপন্যাসটি নারীচরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে একটি দুঃসাহসিক পরীক্ষা। ১৯৫৭ সালে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর কাহিনী যেমন নাটকীয় তেমনি চমকপ্রদ, যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি সংগত। এর মূলে কোনো সত্য অভিজ্ঞতা ছিল কি না জানা নেই, কিন্তু এই উপন্যাসে সুমথনাথ যে নারীচরিত্রটি দরদ দিয়ে তৈরি করেছেন, তাকে অবাস্তব বলার স্পর্ধা রাখি না। মধ্যবিত্ত পরিবারের বিবাহিত তরুণী সুমিতা পূর্ববঙ্গের এক গ্রাম্য পরিবেশে একদা ঘটনাচক্রে গুন্ডাদের দ্বারা অপহৃত হল, ঘরে তখন তার শিশুপুত্র সুকুমার। কিন্তু তার স্বামী কিংবা শ্বশুরবাড়ির কেউ সেদিন গুন্ডাদের দাবির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেনি, নিজেদের ধনমানের তুলনায় গৃহবধূ সুমিতাকে গুন্ডাদের হাতে তুলে দিতে তাদের বিবেকে বাধেনি। বিশেষ

করে সুমিতার স্বামী ব্রজেশের কাপুরুষতা ও হীনম্মন্যতাই সুমিতাকে সবচেয়ে বেশি দুঃখ দিয়েছিল। গুণ্ডাদের হাতে সুমিতার ইজ্জতহানির পূর্বেই এক ধনী প্রভাবশালী মুসলমান ব্যবসায়ী সুমিতাকে উদ্ধার করে। কিন্তু ইতিমধ্যেই গুণ্ডাদের দ্বারা অপহরণ ও মুসলমান পরিবারে আশ্রয়লাভ, এই দুই সামাজিক অপরাধে সুমিতা তার শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশাধিকারের ক্ষীণতম সম্ভাবনা বা সুযোগ হারিয়েছে। তার আশ্রয়দাতা গিয়াসুদ্দীন সুমিতাকে আশ্রয় দিয়েছে, তাকে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জনের সুযোগ দিয়েছে কিন্তু সুমিতার প্রতি তার কামনাকেও গোপন রাখেনি। সুমিতা হিন্দুঘরের বিবাহিতা নারী: তার স্বামী আছে, শিশুপুত্র আছে; এই সংস্কারে সুমিতা গিয়াসুদ্দীনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি। কিন্তু সুমিতার তো নিজ সমাজে ও পরিবারে ফেরার পথও বন্ধ—আর ধনী অশেষ ক্ষমতাবান গিয়াসুদ্দীন সুমিতার উপর কখনও বলপ্রয়োগ করেনি। এই সংকটে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে সুমিতা অবশেষে গিয়াসুদ্দীনের তীব্র ইচ্ছা শক্তি, অঢেল টাকা, অটুট ধৈর্য ও অগাধ প্রতিপত্তির কাছে পরাস্ত হয়ে গিয়াসুদ্দীনকে বিবাহ করে, সুমিতা থেকে হয় আমিনা। এর পরবর্তী ঘটনা রীতিমত নাটকীয়—যেন একালের এক আরব্য উপন্যাসের ছেঁড়া পাতা। উচ্চবিত্ত মুসলিম পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা আদবকায়দা কেতাদস্তুরে নিজেকে মানিয়ে নিতে আমিনার বিলম্ব ঘটেনি—দিল্লি লাহোর কলকাতায় অবাধ যাতায়াতে অভ্যস্ত হয়েছে সে, পুত্রকন্যার জননী হয়েছে, গিয়াসুদ্দীনের সম্পদ ও প্রণয়ে-প্রশ্রয়ে বাদশাজাদির মতো জীবনযাপন করেছে সে। কিন্তু তার ছেড়ে-আসা সন্তান সুকুমারকে কোনদিনই ভুলতে পারেনি সুমিতা। এখান থেকেই শুরু হয়েছে তার জীবনের বৃত্তকেন্দ্রে এক গভীর সংকট। প্রথম সন্তানের জন্যে তার ক্ষুব্ধ অনুতাপ ক্ষুধিত স্নেহমমতা এবং ব্রাহ্মণ পরিবারের বিবাহিত নারীর সংস্কার তার অবচেতনা থেকে ধীরে ধীরে বাস্তব অস্তিত্বে উঠে এসে তাকে বিচলিত করেছে, স্বামী-পুত্রকন্যার বিপরীতে অতীতের আকর্ষণ তাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, গোপনে সুকুমারকে অর্থসাহায্য দিয়ে তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছে এক বাল্য সহচরীর মাধ্যমে। এই টানা-পোড়েনে, সুমিতা-আমিনা দুই সত্তার মুখোমুখি সংঘাতে, শেষ পর্যন্ত বিশ্বস্ত পত্নী ও স্নেহশীলা মা আমিনা তার বিবেকবর্জিত অমানুষ প্রথম স্বামী ব্রজেশের মৃত্যুতে বৈধব্যের শূন্যতা অনুভব করেছে এবং দ্বিতীয় সংসারের সমস্ত আকর্ষণ ছিন্ন করে অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়ে সন্ন্যাসিনীর নিঃসঙ্গ প্রায়শ্চিত্তের জীবন বরণ করেছে। স্বামী ব্রজেশের জীবনের বহু কদর্য-অপদার্থ পৌরুষহীন নীচতা-ক্ষুদ্রতায় ঘৃণাবোধ করলেও হিন্দু নারীর স্বামীসংস্কার তার রক্তের অণুতে মিশে কাজ করেছে। এই প্রত্যয়ের দিক থেকেই চরিত্রটি শরৎসাহিত্যের নারীচরিত্রের সমশ্রেণীভুক্ত। আবার মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে গিয়াসুদ্দীনের বিবাহিত পত্নী হওয়ার গৌরবে চরিত্রটি

রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে লেখা মুসলমানী গল্পের কমলা-মেহেরজান চরিত্রটিকে মনে পাড়িয়ে দেয়। উপন্যাসের পটভূমিও খুবই ছড়ানো, কলকাতা-দিল্লি-লাহোর এসেছে কাহিনীর প্রয়োজনে। হিন্দু রক্ষণশীল পরিবারের সংকীর্ণ গৃহ পরিবেশ, কলকাতার নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারজীবন, লাহোরের অভিজাত মুসলিম পরিবারের আধুনিক জীবনযাপন প্রণালী ও বিলাসিতা, দিল্লির ধনকুবের মহল্লার অভিজাত পরিবারগুলির ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার ধরন—একটি ছোট উপন্যাসে লেখক সুকৌশলে এসবই অত্যন্ত বিশ্বাসজনকভাবে তুলে ধরেছেন। গতানুগতিক মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের গল্পকে তিনি এই উপন্যাসে যে নাটকীয় ব্যাপ্তি দিয়েছেন, তা খুবই চমকে-দেওয়ার মতো এবং তেমনি কৌতূহলাস্পদ।

উত্তরবাহিনী সুমথনাথের আর একটি বিশিষ্ট উপন্যাস, বাঁকাস্রোতের পরবর্তী খণ্ড হিসেবে এটির প্রচার প্রতিষ্ঠা। অবশ্য বাঁকাস্রোত না পড়লেও পাঠক উত্তরবাহিনীর গভীরে অবগাহন করবেন পূর্ণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে। দুই উপন্যাসের মিল শুধু নায়কের অভিন্নত্বে—নচেৎ প্রথম উপন্যাসের কোনো ঘটনার অনুক্রম এখানে নেই : এটি স্বয়ংপূর্ণ উপন্যাস। কেবল প্রথম উপন্যাসের কিছু স্মৃতি, কিছু অনুষঙ্গ, কয়েকটি নামোল্লেখ বা দু-একটি চরিত্রের পুনরাবির্ভাব ঘটিয়ে লেখক এটিকে বাঁকাস্রোতের সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে চেয়েছেন। উভয়ত্রই নদীর রূপক ব্যবহার করেছেন তিনি জীবনের তির্যকতার প্রতিমানে। দুই উপন্যাসের একই নায়ক, অর্থাৎ একই স্বভাব-চরিত্রের অধিকারী। বাউণ্ডুলে ভবঘুরে জাতীয় যে একটি চরিত্রের আদল শ্রীকান্ত-পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে অনেকের হাতে তৈরি হয়ে উঠেছিল, তারই একটি মডেল. সুমথনাথ এই দুটি উপন্যাসে এনে বসিয়েছেন। এদের কয়েকটি সাধারণ ধর্ম আছে। কোনো নিরাপদ নির্বিঘ্ন সমাজবন্ধন এদের পাকা বাসা বাঁধতে দেয় না, সৌভাগ্য এদের হাতছানি দিয়ে কেবল বিভ্রান্তিই বাড়ায়, স্নেহপ্রেমের গণ্ডি এদের ভাগ্যে নেই, এরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ অনেক প্রাপ্তি অকস্মাৎ শূন্যগর্ভ হয়ে পড়ে, কেবল বিচিত্ররূপিণী নারীর সঙ্গ ও সান্নিধ্যের অভিজ্ঞতাই এদের জীবনের স্মৃতিসম্পদ হয়ে থাকে। উত্তরবাহিনী উপন্যাসের পশ্চাদ্-প্রচ্ছদে লেখা আছে "উত্তরবাহিনী উপন্যাস সেই চিররোমাণ্টিক রূপপিপাসু তরুণ আলোকের জীবনাভিসারের কাহিনী।"

উত্তরবাহিনী বাঁকাস্রোতের কত পরবর্তী ঘটনা তার কোনো সুস্পষ্ট হিসেব নেই। এই উপন্যাসেও দুটি অধ্যায় দুটি ভিন্ন কাহিনী দিয়ে গড়া, এই দুই কাহিনীর কালগত ব্যবধানও পরিষ্কার বলা হয়নি। তাই দুটি উপন্যাসই যেমন স্বাবলম্ব, তেমনি উত্তরবাহিনীর দুটি অধ্যায়ও। বাঁকা-স্রোতের নায়ক তার হারানো নায়িকা শান্তিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তীর্থে তীর্থে,

সেই সংবাদের সূত্রে উত্তরবাহিনী উপন্যাসে নায়কের হরিদ্বার পর্ব শুরু হয়েছে। তার ভিতর একবার ফ্ল্যাশব্যাকে বারাণসী পর্ব এসে গেছে। হরিদ্বারের দিন যাপনে নায়ক কোনো এক তপঃসিদ্ধ সাধকের যোগশক্তি-বলে জানতে পেরেছে তার প্রাক্তনিকা শান্তির অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে। সুতরাং তার পর থেকে শান্তি-সন্ধান পর্বের সমাপ্তি, শুরু হয়েছে মানসিক শান্তি সন্ধান পর্ব। তারই জন্যে বেকার জীবন, চাকরির সন্ধান, এক চাকরি থেকে অন্য চাকরি, এক বৃত্তি থেকে অন্য পেশা ; এইভাবে ভাগ্যের উঁচু নিচু পথ পেরিয়ে চলেছে নায়ক, লেখকের ভাষায়, দক্ষিণমুখী থেকে হঠাৎ উত্তর-মুখী নদীর মতো গতিলাভ ঘটেছে তার বিচিত্র জীবনের। এই জীবনস্রোত ঘাটে ঘাটে আছড়ে পড়েছে, আর সেই ঘাটগুলির নাম নারী। উত্তরবাহিনী উপন্যাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা অংশ থেকে ভাবুক লেখকের ভাবনার কিছু অংশ তুলে দেওয়া যেতে পারেঃ

"যাহাদের উপলক্ষ্য করিয়া আমার জীবনের স্রোত বারে বারে বাঁকিয়া গিয়াছে, তারা অধিকাংশই নারী। কে কোন পথে কি সূত্রে কেমন করিয়া কখন আমার জীবনে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের কাহিনী না বলিয়া বরং একদিন যারা আমার এই নিস্তরঙ্গ জীবনে ঢেউ তুলিয়াছিল, বান ডাকাইয়াছিল, দুকূল ভাঙিয়া ভিতর বাহির একাকার করিয়া দিয়াছিল, জল সরিয়া গেলেও নদীর বুক হইতে সে চিহ্ন যেমন সহজে মিলায় না, তেমনি করিয়া আমার এ বক্ষপটে একদিন যারা গভীর দাগ রাখিয়া গিয়াছিল, বিস্মরণের এই গোধূলি লগ্নেও যাহাদের ভুলিতে পারি নাই, শুধু তাহাদের কথাই এখানে বলিতে চাই।"

এ শুধু প্রসঙ্গের কৈফিয়ৎ নয়, উপন্যাসের শিল্পরীতিরও দিক-নির্ণায়ক। উত্তরবাহিনী তাই অবিচ্ছিন্ন একটি কাহিনী নয়, যেন অনেক ছোটগল্পের মালা। অনেক চরিত্রের গিঁটে তৈরি, বহু মানুষের খণ্ড খণ্ড জীবনবৃত্তান্তের বুননে গড়ে-তোলা উত্তরবাহিনী যেন উদাস যৌবনের একটি গদ্য খণ্ডকাব্য, যেমন বাঁকাস্রোতকে বলেছিলাম 'উদ্‌ভ্রান্ত বয়ঃসন্ধির উচ্চাঙ্গ গদ্যনাট্য।'

উত্তরবাহিনী উপন্যাসের প্রথমার্ধ তীর্থভ্রমণ কাহিনীও বটে—হরিদ্বার লছমনঝোলার যাবতীয় জ্ঞাতব্য এখানে আছে। অবশ্য তীর্থমাহাত্ম্য প্রচার করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর নায়ক পথে বেরিয়েছে মানুষের খোঁজে—জীবনের বৈচিত্র্য ও অভিজ্ঞতার সম্পদ-সংগ্রহে। এক একটি দিন যায় আর "নব নব রহস্যের দ্বার কে যেন আমার সামনে খুলিয়া ধরে। আমি মুগ্ধ, হতচকিত। একে উপলক্ষ্য করিয়া যে বহুবিচিত্র মনের খোরাক মিলিয়াছে—দেহ মন পূর্ণ তাহাতে। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার স্মৃতির ছোট বড় নানা সম্পদে উঠিয়াছে উথলিয়া (প্রথম অধ্যায়, একত্রিশ পরিচ্ছেদ)।" আগেই জেনেছি, এই সম্পদের সেরা ধন নারী—বিচিত্র নারী চরিত্রের পশরা

সাজিয়েছেন সুমথনাথ এই সাড়ে তিনশো পাতার উপন্যাসে। পাণ্ডাজীর ঘরের রূপসী বিধবা ভগ্নী, পাণ্ডাজীর মাতাজী, হরিদ্বারের পথে সাক্ষাৎ-পাওয়া আর এক মাতাজী যিনি প্রথম যৌবনে ছিলেন বাঙালি ঘরের পলাতকা তরুণী কমলিনী, কাশীর সেই দেবীকল্পা পাপীয়সী রাণীদি, কলকাতার একদা বাঈজী কনখলের সেই অধুনা প্রৌঢ়া সর্ব সংস্কার-মুক্ত মাতাজী, নিবারণবাবু নামক ভ্রমণার্থী বাবুর সেই অবগুণ্ঠিতা স্ত্রী একদা যাকে কেন্দ্র করে একটি অমূলক অপবাদে লেখকের কলকাতা-বাসকালে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছিল (বাঁকাস্রোতের একটি কাহিনী-সূত্র), প্রথম অধ্যায়ে এমন ধারা অনেক নারী চরিত্রের মুখোমুখি হন পাঠক। অনেক নাটকীয় ঘটনা, অনেক রোমাঞ্চ, অপ্রত্যাশিত-অভাবনীয়ের তোরণ পেরিয়ে বেরিয়ে-আসা সেইসব নারীর দিকে চেয়ে লেখক বলেছেন, "মানুষের জীবনে নাটকীয় ঘটনা ঘটে লোকের মুখে শুনিয়াছি কিন্তু আমার মত ঠিক এই রকম নাটক কি কখনো অন্য কাহারো জীবনে ঘটিয়াছে? কেহ শুনিলে কি সত্য বলিয়া ইহা বিশ্বাস করিবে? জানি না।"

এই অভাবনীয় নাটকীয়তা আছে দ্বিতীয় অধ্যায়েও, অবশ্য সেখানে পট-পরিবর্তন ঘটেছে। হরিদ্বার-কনখলের জীবন থেকে ভবঘুরে নায়ক এখন কলকাতার উপকণ্ঠে তাঁর জ্যাঠাইমার সংসারে বেকার জীবন যাপন করছেন। এইবার কাহিনীতে এসেছেন জনৈকা মনোমোহিনী, রূপ-গুণ, রুচি-সংস্কৃতিতে চোখধাঁধানো এক নারী। লেখকের বৌদি, আর তাঁর গীতকণ্ঠী অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যা ভদ্রা। বৌদি কিভাবে তাঁর এই পাতানো দেবরটিকে স্নেহে-মমতায় সম্পূর্ণ বশীভূত করেছেন আর সেই শ্রদ্ধাস্নেহের তলদেশে অবচেতনে এক নিষিদ্ধ সম্পর্কের কম্পন থেকে থেকে ভূমিগর্ভ ছেড়ে উপরিতলে সঞ্চরমাণ হয়েছে, তার সংযত-সতর্ক অথচ দুঃসাহসিক কাহিনী দ্বিতীয়ার্ধের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। এই ধরনের সম্পর্কের ইঙ্গিত অবশ্যই নষ্টনীড়ে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের পক্ষেও এটি ছিল স্পর্ধাতীত। অথচ সুমথনাথ সুকৌশলে শরৎচন্দ্রীয় বিধিসম্মত সতর্কতা অতিক্রম করে নিষিদ্ধ কামনার এই জগতে উঁকি দিয়েছেন, কিন্তু নায়কের দিক থেকে সংরক্ষণ শোভনতা ও সম্ভ্রমের সীমা সামান্যতমও লঙ্ঘন করেননি। সম্পর্কে শ্রদ্ধেয়া নারীর স্নেহসান্নিধ্যের মাটিতে নিষিদ্ধ কামনার বীজবপন এবং তার অঙ্কুরোদ্গমের পূর্বেই তার পূর্ণবিরতি সংঘটন, এটি সুমথনাথের কাহিনীর একটি অভিপ্রায় যা একাধিকবার ঘুরে-ফিরে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বাঁকাস্রোত উপন্যাসের কথাও পাঠকদের মনে পড়বে।

উত্তরবাহিনী উপন্যাসে আর এক চমক রাজেন্দ্রকুমারের স্টেটের ম্যানেজার হওয়ার নাটকীয় কাহিনী। আবার সে কাহিনীর পরিণামও সেই একই—কোনো নারীর সঙ্গে লেখকের মিথ্যা সম্পর্কের অহেতুক অপবাদে 'স্বর্গ'

হইতে বিদায়', পরিবেশ ও পরিস্থিতির অতর্কিত পরিবর্তন তথা জীবন-যাত্রায় পরিবর্তন। কাহিনীর এই অংশে আরণ্যকের বিভূতিভূষণের কথা মনে আসবে। কিন্তু বিভূতিভূষণের সংগে সুমথনাথের যোজন দূরত্ব। তাই শেষ পর্যন্ত সুমথনাথের নায়ক এক অবগুণ্ঠনবতী শুশ্রূষাকারিণীর অভাবিত সেবা এবং তারই সঙ্গে অপ্রত্যাশিত মিথ্যা অপবাদ বহন করে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে আবার নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়েছেন। এই পর্বেই বাল্যবন্ধু চিন্ময়ের সঙ্গে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতায় নতুন এক কাহিনীর সূচনা ঘটেছে এবং সেই কাহিনীর সমাপ্তিতে চিন্ময়ের সঙ্গে একটি অপ্রীতি-কর ও অনিচ্ছাকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত অনুরাধা নামক একটি তরুণীর সঙ্গে লেখকের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ও তার ভবঘুরে ছন্নছাড়া নিরাসক্ত জীবনের পর্ব এখানেই শেষ হয়েছে। বাঁকাস্রোতের সুমথনাথ উত্তরবাহিনীতে আরও পরিণত, আরও পটু গল্পকার ও চরিত্রসৃষ্টিতে নিপুণতর ; নারী চরিত্রের রহস্য নির্ণয়ে আরও প্রবীণতা লাভ করেছেন তিনি।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সুমথনাথের বিশেষত্বের যে পরিচয় পূর্বে পাওয়া গেছে বর্তমান সংকলনের গল্পগুলিতেও তারই পুনরাবৃত্তি দেখি। 'জটিলতা' এই নামকরণ থেকেই পাঠকরা অনুভব করেন মানুষের অতি জটিল দুষ্প্রবেশ্য মানসিকতার উপর কৌতূহলের রশ্মিক্ষেপ করাই গল্পকার সুমথনাথের স্বভাব। আর এই দুরূহ দুর্জ্ঞেয় মন অতি সাধারণ নারী-পুরুষের মধ্যেও লক্ষ করেন তিনি। নিতান্তই একটি সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ তুচ্ছ আখ্যানেও রহস্যময় মনের অন্ধকার খোপগুলিকে বড় অমোঘ নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি 'অভিমান' গল্পে। খুবই মাঝারি অবস্থা ও সাধারণ মাপের মানুষ হরিবিলাসবাবু একটি অনতিকিশোরী বালিকাকে দেখে চমকে উঠে-ছিলেন, কারণ মেয়েটির মুখ ঠিক তাঁর প্রয়াতা পত্নীর মতো। পুত্র অমলের অপরিণত বয়স সত্ত্বেও হরিবিলাসবাবু সকলের নিষেধ ও সতর্ক বাক্য অগ্রাহ্য করে মেয়েটিকে পুত্রবধূ করে আনলেন, স্নেহমমতায় সেই বালিকা পুত্রবধূকে আচ্ছন্ন করে রাখলেন। তাঁর এতদিনের বিপত্নীক নিরাসক্ত কর্মজীবন হঠাৎ নবজীবনোৎসাহে ভরে উঠল, নতুন বাড়ি তৈরি করলেন, গাড়ি কিনলেন, বাগানের শখ মেটালেন। এমনিভাবে আমোদ-আহ্লাদে পুত্রবধূকে যত্নে আদরে স্নেহাধিক্যে তিনি যেমন বিহ্বল করে দিয়ে অভাবিতপূর্ব সুখ পেতে লাগলেন, পুত্রবধূটিও এই স্নেহপূর্ণ যত্নসচেতন প্রৌঢ় শ্বশুরকে পেয়ে তার হারানো পিতামাতাকেই যেন ফিরে পেল—এসব সুখসৌভাগ্য ছিল তার স্বপ্নেরও অগোচর। কেবল হরিবিলাসের পুত্র বেচারা অমলই জানতে পারল না, কখন তার কিশোরী বধূটি যৌবনের শ্যামলিম গৌরবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। তার পত্নীপরায়ণ হৃদয়ের শূন্যতা বেড়েই চলল। ক্রমশ অমলের

মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল, স্ত্রীকে আরও বেশি পেতে চাইল, তার পিতার স্নেহাধিকার থেকে স্ত্রীকে নিজের কাছে পাবার দাবি পুত্রবধূ মেনকাকে বিচলিত করল। এই পর্যন্ত কাহিনীতে কোনো জটিলতা নেই। কিন্তু হরিবিলাসবাবু যেই মুহূর্তে বুঝতে পারলেন যে পুত্রবধূর প্রতি তাঁর স্নেহাধিক্য সামাজিক দৃষ্টিতে অশোভন বা অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে, তৎক্ষণাৎ সতর্ক হলেন তিনি। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর ব্যস্ত কর্মজীবন রূপান্তরিত হল অপরিসীম নির্বিকারত্বে, উৎসাহ স্থলে দেখা দিল প্রভূত বৈরাগ্য, সমস্ত স্নেহমমতা সংকুচিত করে হঠাৎ কর্মত্যাগ করে হরিবিলাসবাবু হরিদ্বারে চলে গেলেন। একটা নীরব ক্ষুব্ধ অভিমান তাঁর এই প্রৌঢ় জীবনের মাধুর্য-উপভোগের স্নিগ্ধতাকে নীরস রিক্ত করে দিল। কিন্তু এ কি শুধু এই জাতীয় হীন-কুৎসিত সমাজনিন্দার প্রতি অভিমান? পুত্র বা পুত্রবধূর প্রতি অভিমান? গল্পের নামকরণের তাৎপর্য-সন্ধান ভাবিত করে পাঠককে। কিশোরী পুত্রবধূকে নিয়ে তাঁর এই স্নেহাধিক্যের পিছনে কি কোনো গূঢ়ৈষণা ছিল? মেয়েটিকে একদিন তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর মৃতা পত্নীর মতো দেখতে। সেদিন পুত্র অমলকে দেখেও হরিবিলাসবাবু নিজের যৌবনের অবিকল রূপটিকে খুঁজে পেয়েছিলেন। হয়তো তারই ফলে কন্যা-তুল্য পুত্রবধূর প্রতি স্নেহ-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উজাড় করে, হরিবিলাসবাবু যেন তাঁর প্রয়াতা পত্নীকে যে সুখ-আহ্লাদ সোহাগস্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারেননি, তাই দিয়ে, সূক্ষ্ম আত্মতৃপ্তি ভোগ করছিলেন। এ কি এক অচরিতার্থ দাম্পত্য-লীলার অভাবিত ক্ষতিপূরণ? যখনই তিনি এই ব্যাপারে সচেতন হলেন, তখনই চমকিত হয়ে আবার আত্মস্বরূপে ফিরে এলেন—যেন ভূতগ্রস্ত জীবনের এই অসম্ভব অপরিণামদর্শিতার মিথ্যাচার থেকে দ্রুত উদ্ধার পাওয়ার জন্যে নিজের কাছ থেকেই পালাতে চাইলেন; এবং তাই সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করে, বাড়িঘর ছেড়ে, চাকরি থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে হরিদ্বার পালাতে চাইলেন। এ কি তাহলে নিজের উপরই অভিমান—নিজের অবচেতন গূঢ়ৈষণার প্রতি সচেতন বিবেকের অভিমান?

লিপিকার সুয়োরানীর সাধ গল্পে রবীন্দ্রনাথের সুয়োরানী বলেছিল, 'ঐ দুয়োরানীর দুঃখ আমি চাই।' রূপসী যুবতীর স্বামীভাগ্য যৌবনের বদলে যদি ধনসম্পদের অহংকারে উথলে ওঠে, তবু সুঠাম যৌবনের জন্য একটি মৃগতৃষ্ণিকা অবচেতনায় তাকে ব্যাকুল করে তোলে—এই হল মৃগতৃষা গল্পের ইঙ্গিত। তারাশঙ্করের বেদেনী গল্পের গভীরেও সেই একই মনস্তত্ত্ব এক নিষ্ঠুর জীবনসত্যের আকারে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সুমথনাথ বিষয়টিকে তাঁর মতন করেই দেখেছেন। মলিনার স্বামী সতীশ মলিনার তুলনায় বয়সে প্রৌঢ় হলেও মলিনাকে গা-ভরা গয়না, সংসার-ভরা স্বাচ্ছন্দ্য, আঁচলভরা অধিকার ও জীবনভরা অহংকারে রাজেন্দ্রাণীর মর্যাদা দিয়েছিল।

এই দৃষ্টিলোভন বৈষয়িক সৌভাগ্যকেই মলিনা নারীসমাজে ঈর্ষণীয় সম্পদ-রূপে জাহির করে সুখ পেত, প্রতিবেশিনীদের মুখ-থেকে শোনা স্বামীর বয়সের প্রতি কটাক্ষের মোকাবিলা করত এইসব স্বামীদত্ত ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ও প্রদর্শনবাদ দিয়ে। কিন্তু এই অগাধ ঐশ্বর্য, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ ও মহিমান্বিত স্বাধীনতা সত্ত্বেও সুখের বক্ষোমাঝে কি কোথাও অতিসূক্ষ্ম অভাববোধ বাসা বেঁধেছিল? যৌবনের জন্যে যৌবনের যে ক্ষুব্ধ কামনা সংগুপ্ত ছিল, তা হঠাৎ ঢেউ খেলিয়ে উঠল একদিন দুপুরে জানলা থেকে দেখতে-পাওয়া পাশের বাড়ির এক বিবাহিত দম্পতির কলহাস্যময় প্রেমলীলায়। এর পরিণামে গোপন ঈর্ষায় ক্ষতবিক্ষত, সুপ্ত আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল, আপন অপরিতৃপ্তির ক্ষোভে অস্থির মলিনার সেই অসুখী সত্তার আর্তনাদ বিচিত্র স্ববিরোধিতায় প্রকাশ পেতে লাগল। ঘটনাচক্রে পাশের বাড়ির সেই তরুণতরুণী দম্পতির সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে গেল। তাদের দারিদ্র্যের সংবাদে মলিনা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীর সাহায্যে তরুণটিকে একটি চাকরি জুটিয়ে দিল। চাকরি উপলক্ষে ছেলেটিকে অনেক দূরে চলে যেত হল আর মেয়েটিকে স্বগৃহে আশ্রয় দিল মলিনা। কিন্তু এসবের পিছনে কি শুধুই তার করুণা-মমতা-অনুকম্পা কাজ করেছিল? নাকি তার ঈর্ষা এই দুটি সুখী দম্পতির জীবনে স্থানগত আপাত বিচ্ছেদ ঘটিয়ে গোপন সুখ অনুভব করেছিল? একে কি স্যাডিজম্ বলা যায়? যে যৌবনবয়সী স্বামী মলিনার নিজের ভাগ্যে জোটেনি, সেই যৌবনধন্য একটি পুরুষকে তার স্বামী-সৌভাগ্যতৃপ্ত পত্নীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেই মেয়েটির গভীর দুঃখে উল্লসিত হওয়াতেই যেন মলিনার নিষ্ঠুর আনন্দ। নারীমনস্তত্ত্বের এই বিচিত্রতা সে জটিলতারই আর এক রূপ।

অপ্রত্যাশিত গল্পে অপ্রত্যাশিতের সমাবেশ একটু বেশিই। কৈশোর-যৌবনে দুজনের গভীর ভালবাসা বিবাহের পরিণাম পায়নি—মেয়েটির অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে, সংসারে এমন ঘটনা নিত্য ঘটে। কমবেশি অনেক বছর পরে কোনো অপরিচিত পরিবেশে অপ্রত্যাশিতভাবে উভয়ের সাক্ষাৎ—এমন ঘটনা অবশ্য ছোটগল্পে অনেকবারই ঘটে থাকে। বলা বাহুল্য এই ধরনের পুনর্দর্শন প্রায়ই সুখকর হয় না। উভয়ের স্বাভাবিক পরিবেশ তছনছ হয়ে যায়, মানসিক শান্তি নষ্ট হয়, ভিতরে ভিতরে ওলটপালট ঘটে। অপ্রত্যাশিত গল্পেও তাই হয়েছে। শঙ্করের কলেজ-জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অশোক রুগ্ন শরীর সারাতে পশ্চিমের একটা পাহাড়ি স্বাস্থ্যপ্রদ অঞ্চলে চেঞ্জে এসে সেখানে কর্মরত শঙ্করের সাক্ষাৎ পেল, আর আবিষ্কার করল শঙ্করের স্ত্রী নীলিমা তারই প্রাকবিবাহ পর্বের প্রেমিকা। সেই অসমাপ্ত প্রেমের বিধুর স্মৃতি আজও বয়ে বেড়াচ্ছে অশোক, সুটকেসে কাপড়চোপড়ের তলায় এখনও

নীলিমার ছবি, —আজও বিয়ে করেনি সে। কিন্তু নীলিমা? সে কি ভুলে গেছে সব কথা? বিয়ের পর মেয়েরা এত বদলে যায়? সত্যিই কি নীলিমা ভুলে আছে? এই ভুলে থাকার জন্যে সে কি অনুতপ্ত? শঙ্করের অতি উৎসাহ ও আগ্রহে অশোক তার বন্ধুর বাড়িতেই স্থায়ী আস্তানা পেতেছে। অথচ নীলিমা ও অশোকের মনের গভীরে চলেছে ভূকম্পন। ঠিক সেই সময়ই শঙ্কর জেনে ফেলেছে তার স্ত্রী ও বন্ধুর পূর্বতন সম্পর্কের কথা। উচ্ছল স্ফূর্তিবাজ শঙ্কর হঠাৎ আত্মমগ্ন বিমর্ষতায় নিশ্চুপ হয়ে গেছে। অশোকের শরীরে তখন প্রবল জ্বরের বিকার।

তিনটি মানুষের স্তব্ধ বিষাদের উপর অতর্কিতে এসে পড়ল একটা হিংস্র বাঘ—বাঘ না নিয়তি?

সুমথনাথের এই গল্পটি ঘটনার বিস্তারে উপন্যাসও হতে পারত, কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত পরিণাম ছোটগল্পের শিল্পরূপেই সার্থক হয়েছে। যে মুহূর্তে শঙ্কর জেনেছে তার স্ত্রী ও বন্ধু পূর্বপরিচিত প্রেমিক-প্রেমিকা এবং আজও দুজনের মধ্যে নিঃশব্দ পারস্পরিক আকর্ষণ রয়ে গেছে, তার কাছে দাম্পত্য সম্পর্ক মুহূর্তে বিস্বাদ হয়ে গেছে, জীবনের মূল্য গেছে কমে। বাঘ মারতে বন্দুক নিয়ে ছুটে যাওয়া কি তার সেই শূন্যতাবোধেরই পরিচায়ক? এমনকি শঙ্করের পিছনে অন্ধকারে অশোকের ছুটে-যাওয়াকেও হয়তো একই অর্থহীন অস্তিত্বের বেদনাজাত বলে ভাবা যায়। অশোককে বাঁচাতে ছুটে গেছে নীলিমা এবং পড়েছে বাঘের মুখে—অবশ্যই এ ঘটনা অপ্রত্যাশিত। এও কি একই শূন্যতাবোধ, না তার বিস্মরণের প্রায়শ্চিত্ত?

এসব অমীমাংসিত প্রশ্ন পাক খায় বিমূঢ় পাঠকের মনে। উত্তর না দেওয়াই তো ছোটগল্পের স্বভাব।

গল্প হিসেবে বনিয়াদী তেমন আঁটসাঁট বাঁধুনির নয়। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মানভঞ্জন ও পুত্রযজ্ঞ গল্প দুটির যেন কোনো ক্ষীণ সংগতিসূত্র আছে। বনেদী বংশের দুশ্চরিত্র পুরুষ ও তার অন্তঃসারশূন্য বাহ্যাড়ম্বরকে তীব্র কশাঘাত করেছেন লেখক। এই ধরনের অপদার্থ অকালকুষ্মাণ্ডের ঘরের শুদ্ধান্তঃচারিণীদের দুরবস্থার চিত্রাংকনই গল্পটির অভীষ্ট। রবীন্দ্রনাথের মানভঞ্জন গল্পে স্বামীর ভ্রষ্টাচারের প্রতিবাদে স্ত্রী হয়েছিল রঙ্গনায়িকা। আর পুত্রযজ্ঞ গল্পে স্বামীর অন্যায় অবিচারে স্ত্রীকে হতে হয়েছিল পথের ভিখারিণী। বনিয়াদী গল্পে একটি বারবনিতা পর্যন্ত গৃহবধূর প্রতি লাঞ্ছনা ও বঞ্চনায় তার অনুকম্পাময়ী নারীত্ব মেলে ধরে মহৎ চরিত্র হয়ে উঠেছে। তবে ঊর্মিলার হঠাৎ বিকৃতমস্তিষ্ক ভিখিরিতে পরিণত হওয়া ঈষৎ দ্রুত আকস্মিকতাসূত্রে গ্রথিত মনে হয়।

রসিকতা মধুর লঘুরসের গল্প। শখের অভিনেতা স্বামী তার পত্নীর গভীর রাত্রের রসিকতার ভাষা বুঝতে না পেরে স্ত্রীকে ব্যভিচারিণী ভেবেছিল। শেষপর্যন্ত রহস্যভেদ হল। ভুল-ভাঙার হতাশ অথচ স্বস্তিদায়ক পরিণাম শুধু তাকে নয়, পাঠকদেরও তৃপ্তি দেয়।

৭ই পৌষ, ১৩৯৯ **অরুণকুমার বসু**

পরপূর্বা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
শ্রীমতী কল্যাণী প্রামাণিকের

করকমলে

এক

দুপুরবেলা এ গলিটা যেন নিঝুম ঘুমিয়ে থাকে। একটা ফেরিওলা, পর্যন্ত ঢোকে না। শুধু দু' একটা হ্যাংলা কুকুর ও কয়েকটা ক্ষুধার্ত কাক ভাঙা ময়লা-ফেলা টবটার ফাঁক দিয়ে গৃহস্থদের পরিত্যক্ত এঁটো-কাঁটাগুলো টানাহেঁচড়া করে রাস্তাময় ছড়ায়। টবটার উল্টোদিকে শাঁখারীদের সেকেলে পুরনো বাড়ি, তার শেওলাধরা দেওয়ালের গা বেয়ে তিনতলার ছাদ থেকে পায়খানার ফুটো ট্যাঙ্কের জল অনবরত টুপটাপ করে ঝরছে। গলিটায় ঢুকলেই আগে সেইজলে পচা আবর্জনা থেকে এক রকম বিশ্রী টকো আঁশটে গন্ধ নাকে আসে, সারা গা যেন বমি বমি করে ওঠে। কিন্তু যারা ওখানকার অধিবাসী, যাদের দিনরাত্রি হয় ওই গলির মধ্যে তারা সেটা টের পায় না। তবু শহরের ওই একফোঁটা গলির মধ্যে তাদের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার যে ইতিহাস প্রতিদিন রচিত হয় বুঝি মহাকালের হিসেবের খাতার এককোণে সকলের অগোচরে তাও টোকা থাকে।

আট বছর পরে সুমিতা সেই গলিটার মধ্যে আবার পা দিলে। এতদিনেও এর কোনো সংস্কার সাধিত হয়নি দেখে সে একটু বিস্মিত হলো। দীর্ঘদিন পরে গলিটায় ঢুকতে গিয়ে তার পা যেন থেমে আসে। থমকে দাঁড়িয়ে ভাবে,—আর এগোবে না ফিরে যাবে! হঠাৎ ভ্যানিটি ব্যাগের মুখটা ফাঁক করে ছোট্ট একটা রেশমী রুমাল বার করে নাকের ওপর চেপে ধরে আবার অগ্রসর হয়। লক্ষ্ণৌর ইস্তাম্বুল আতরের গন্ধ রুমাল ভেদ করে সারা গলিটার হাওয়াকে নিমেষে সুরভিত করে তোলে। জরির নাগরাটা দিয়ে জল বাঁচিয়ে, নোঙরা ডিঙিয়ে, একটা বাড়ির সামনে আসতেই তার পা দু'টো যেন আপনা থেকেই থেমে গেল! সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার আশেপাশে তাকালে সুমিতা, কেউ তাকে দেখছে কিনা। তারপর সন্তর্পণে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। অপরাধীর মত তার বুকটা ঢিপঢিপ করে, হাত কাঁপে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে সে দরজার কড়াটা নাড়ল আস্তে আস্তে। একবার, দু'বার, তিনবার। কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া এলো না। শেষে আর একবার সজোরে নাড়তেই ওপরের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একটি মহিলা প্রশ্ন করলেন, কে?

সুমিতা দরজা থেকে রাস্তায় নেমে এসে ওপরের দিকে চাইতেই তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। বললে, দেখুন, এখানে কি ব্রজেশবাবু বলে কোন ভদ্রলোক থাকেন?

ব্রজেশবাবু! কৈ না, ও নামের কোন লোক তো এ বাড়িতে থাকেন না। বলে একটু থেমে আবার সেই মহিলাটি বললেন, নম্বর ভুল করেননি তো? কত নম্বর বলে দিয়েছে? আমরা মোট তিন ঘর ভাড়াটে এখানে আছি—আমি সকলকেই চিনি।

সুমিতা একটু থেমে মুচকি হাসলে। বললে, নম্বর ভুল হয়নি—এই বাড়িতে আমি নিজেই একদিন এসেছিলুম, তবে সে অনেকদিনের কথা।

তাই বলুন! বলে মহিলাটি গলায় এক প্রকার সুর টেনে আনলেন, নইলে আমারও তো এখানে অনেকদিন হলো বোধহয় ছয় কি সাড়ে ছ'বছর কিন্তু ও নামের কোন ভদ্রলোককে তো এখানে থাকতে শুনিনি? আর এর মধ্যে আরো যে দু'ঘর ভাড়াটে ছিল, উঠে গিয়েছেন, তাঁদেরও নাম আমি জানি। একজন প্রফুল্লবাবু, আর একজন বিমলবাবু। তারপর ভদ্রমহিলা একবার শুধু নিঃশব্দে সুমিতার ওই বে-জাতীয় পোশাকের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আপনি কতদিন আগে এসেছিলেন এখানে বলুন তো?

সুমিতা একটু থেমে কি যেন ভাবলে। তারপর আলতোভাবে কপালটা রুমাল দিয়ে মুছে বললে, সে অবশ্য অনেকদিনের কথা—বছর আষ্টেক হবে। এখন আমি মফস্বলে থাকি, একদিনের জন্য এখানে এসেছি—তাই ভাবলুম একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাই। আচ্ছা থাক—আপনাকে মিছিমিছি কষ্ট দিলুম, দিবা-নিদ্রার ব্যাঘাত করে, কিছু মনে করবেন না। বলে নমস্কার করে সুমিতা দ্রুত পিছন ফিরলো।

গলিটার মুখে আসতেই গ্যাসপোস্টের পাশে যে ছোট্ট চানাওয়ালার দোকান ছিল সেখানে পুরনো চানাওলাটাকে দেখে সে চিনতে পারলে। কতদিন এর কাছ থেকে চিনে-বাদাম, চালভাজা, মুড়ি ও ঝালচানা কিনে খেয়েছিল। কিন্তু ও কি চিনতে পেরেছে তাকে? ধামা মাথায় নিয়ে ফেরি করে বেড়াতো ও লোকের বাড়ি বাড়ি। তার মত কত বৌ তার কাছ থেকে তো কিনতো। ও চিনতে পারেনি দেখে সে বরং কতকটা নিশ্চিন্ত হলো। তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সুমিতা তখন জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা চানাওলা, ওই সতেরো নম্বর বাড়িটায় যে ব্রজেশবাবু থাকতেন, এখন তিনি কোথায় উঠে গিয়েছেন বলতে পারো? তুমি তো কত জায়গায় ঘুরে বেড়াও।

চানাওলাটা হিন্দুস্থানী। অনেক ভেবে বললে, ও, আভি সমঝা। উনকো মাইজী হামসে সওদা লেতা থা?

সুমিতা রুমাল দিয়ে মুখটা ঈষৎ ঢেকে ঢোক গিলে বললে, হ্যাঁ ইস্ লিয়ে তো ম্যয় তুমকো পুছি থি।

চানাওলা তার জবাবে বললে, ও বাবু তো হিন্দু-মুসলমান ঝগড়াকা ওয়াকথ্ হিঁয়াসে চলা গিয়া মাইজী—মুঝে উসকো পাত্তা নেহি মালুম হ্যায়। মাফ্

সুমিতা আর কোন কথা না বলে শুধু একটা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে।

গলির মোড়ে তার ট্যাক্সিটা অপেক্ষা করছিল। দেখা হবে না জেনেই সে অবশ্য এসেছিল। তবু মনের সঙ্গোপনে কোথায় যেন একটা ক্ষীণ আশা জেগে ছিল—হয়তো দেখা হলেও হতে পারে। তাই ট্যাক্সির দরজাটা খুলে সুমিতা

ভাবলে, থাকগে হোটেলেই ফিরে যাই—এত বড় শহরে ঠিকানা না জেনে সারা বছর ধরে মাথা খুঁড়ে মরলেও কেউ বাড়ি দেখিয়ে দিতে পারবে না। তাছাড়া যাকে দেখবার জন্য তার এত আকাঙ্ক্ষা, সেও কি আছে এখানে ? হয়তো দেশে কিংবা তার পিসির বাড়ি মেদিনীপুরে অথবা অন্য কোনখানে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে !

একথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটা যেন মুচড়ে ওঠে। তার জ্যেষ্ঠ সন্তান, তার বড় আদরের ছেলে সুকু—সুকুমার। দীর্ঘ আট বছর সে তার মুখ দেখেনি। চার বছরের ফুটফুটে ছেলেকে শেষ দেখেছিল ! আর ভাবতে পারে না সুমিতা, তার চোখ দুটো সহসা জলে ভরে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কচি-মুখখানি দেখবার জন্যে তার মন যেন আকুল হয়ে ওঠে। আজ-ই যেমন করে হোক একবার চোখে সুকুকে না দেখলে সে মরে যাবে ! রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে অকস্মাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায় সুমিতার। বুকটা ধড়াস করে ওঠে ! ব্রজেশ যে অফিসে চাকরি করতো তার নাম জানে সুমিতা। তাই ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে সে তখনই সেই অফিসটায় নিয়ে যেতে হুকুম দিলে। আজ যেমন করে হোক তার সন্ধান ওকে করতেই হবে—তা নাহলে আবার কবে কলকাতায় আসবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই ! এদিকে কাল ভোরেই তাকে বিমানযোগে চলে যেতে হবে ঢাকা।

ট্যাক্সিটা অফিসের দোরে গিয়ে লাগতেই সুমিতা ফটকের দারোয়ানকে ইশারা করে কাছে ডাকলে। দারোয়ান এসে সেলাম করে দাঁড়াতেই একটা টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে সে বললে, আচ্ছা এখানে ব্রজেশ চক্রবর্তী বলে কোন ভদ্রলোক চাকরি করেন ?

দারোয়ান বললে, জী হাঁ—

তুমি তাকে চেনো ?

দারোয়ান ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, জী হাঁ, আমার কাছ থেকে ওই বাবু প্রায়ই টাকা ধার করেন ? তারপর হেসে বললে, মাইজী এখানকার সব বাবুলোককে তো হামি চিনি। বিশ বছর তক্ নোকরি করছি এই অফিসে। তাছাড়া সুদ দিয়ে অনেক বাবুই টাকা ধার নেয় হামার কাছে। আচ্ছা আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি এখনি তাঁকে ডেকে দিচ্ছি।

সুমিতা বললে, আমি গাড়ির মধ্যে বসে রইলুম।

জী হাঁ। বলে দারোয়ান মাথার পাগড়ীটা ভালো করে মাথায় জড়াতে জড়াতে ভেতরে চলে গেল।

অধীর আগ্রহে সুমিতা অপেক্ষা করতে থাকে ব্রজেশের। যেই কোন লোক ফটক দিয়ে বেরোয় অমনি যেন সে অজ্ঞাতে চমকে ওঠে।

একটু পরে দারোয়ান ফিরে এসে খবর দিলে, বাবু আভি আতা হায়—জেরা ঠারিয়ে মাজী।

সুমিতার বুকের মধ্যে এবার কে যেন হাতুড়ির ঘা মারে। জিব থেকে গলাটা শুকিয়ে ওঠে বারবার। এই ব্রজেশ একদিন তার স্বামী ছিল—সে আট বছর

আগের কথা। অবশ্য ভাগ্যের দোষে আজ সে বিধর্মী—মুসলমান। স্বামী-পরিত্যক্তা।

একটু পরে তার মোটরের সামনে এসে দাঁড়ালো ব্রজেশ - খর্বকায়, শীর্ণদেহ, গায়ে একটা পুরনো ময়লা টুইল শার্ট, কাপড়খানাও তেমনি অপরিষ্কার, পায়ে রঙচটা খাকী কেড্‌স্ জুতো—অতি সাধারণ কেরানীর চেহারা যেমন হয়। চোখে মুখে কোথাও কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষার ছাপ নেই—জীবন সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ ও হতোদ্যম।

কিন্তু সুমিতাকে দেখামাত্র ব্রজেশের চোখ-মুখ কঠিন হয়ে উঠলো। নিশ্চল ও নির্বাক পাথরের মূর্তির মত সে তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো। সত্যি কথা বলতে কি সে কল্পনাও করতে পারেনি যে এইভাবে একেবারে সুমিতার মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হবে। তাছাড়া ভাবতেও পারেনি যে এতখানি সাহস হবে তার যে অফিসে এসে তাকে ডেকে পাঠাবে।

সুমিতাও যেন কি করবে ঠিক ভেবে পায় না—ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুহূর্ত কয়েকের জন্যে এক অদ্ভুত স্তব্ধতা যেন দু'জনের বুকে পাষাণের মত চেপে বসলো। যেন পরস্পরের কাছে কোন এক মহা অপরাধে অপরাধী।

তারপর সে নীরবতা ভঙ্গ করে প্রথম কথা বললে সুমিতা। তার মুখে শুধু একটু করুণ হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। অভিভূতের মত সে বললে, তুমি গাড়ির ভেতর উঠে এসো, আগে তোমায় প্রণাম করি।

ঠিক সেই আগেরই মত সুমিষ্ট ও অনুনয়ভরা কণ্ঠস্বর। যখন সুমিতা তার স্ত্রী ছিল তখন একে প্রত্যাখ্যান করবার ক্ষমতা তার কখনো হয়নি! তাই দীর্ঘ আট বছর পরে আবার তা কানে যেতে ব্রজেশের সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা দিয়ে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনকে দৃঢ় করে ফেলে সে বললে, না তার কোন প্রয়োজন নেই।

সুমিতার কণ্ঠে কিসের আবেগ যেন তখনো কাঁপে। তাই একটু ইতস্তত করে সে বললে, তোমার প্রয়োজন নেই তা জানি কিন্তু ওটাতে আমার যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

মিথ্যে কথা। কঠিনস্বরে ব্রজেশ উত্তর দিলে।

সুমিতা ধীর অথচ দৃঢ়কণ্ঠে তার জবাব ফিরিয়ে দিয়ে বললে, মিথ্যে কথা তোমার না আমার?

দাঁতে দাঁত চেপে ব্রজেশ বলে উঠলো, যার সঙ্গে এখন আমার জ্ঞানত, ধর্মত ও আইনত কোন সম্পর্ক নেই, যে এখন বিধর্মী, যার ছায়া মাড়ালে পাপ—

সহসা সুমিতার কণ্ঠে যেন কে আগুন জেবলে দেয়। সে তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, কিন্তু আমার এ পাপ কার জন্যে জিজ্ঞেস করতে পারি কি? মনে নেই তুমি স্বামী হয়ে আমায় রক্ষা না করে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে

কতকগুলো গুণ্ডার হাতে স্ত্রীকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে এসেছিলে? ভেবেছিলুম তুমি নেই কিন্তু তোমার গ্রামবাসীরা তো আছে, তারা এসে বুঝি উদ্ধার করবে! কিন্তু কোথায় কে? তারাও ভয়ে শিয়ালের মত গ্রাম ছেড়ে যেদিকে পারলে পালালো। তবু রাতের পর রাত বুকে এই আশা নিয়ে কেঁদেছি যে, একদিন এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে ছুটে আসবে আমার দেশের লোক। আমার স্বজাতি, ভারতবাসীরা সভ্য, শিক্ষিত বলে যাঁরা গর্বে ফেটে পড়েন! কিন্তু হায় সে আশাও সবশেষে আকাশকুসুমে পরিণত হলো। দেখলুম, সেখানে একজনও মানুষ নেই, যত সব ভেড়ার দল, শিখণ্ডীর দল!

ব্রজেশ বললে, তুমি কি আমাকে ও আমার দেশের লোককে এইভাবে অপমান করবার জন্য এখানে এসেছো?

এবার সুমিতার সে রোষবহ্নি দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। বক্ষের সমস্ত প্রদাহ যেন কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হতে থাকে। সে বলে, আমার ছায়া মাড়ানো পাপ তুমি বলছিলে তাই তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিলুম যে, সতি সত্যি কারো ছায়া মাড়ালে যদি পাপ হয় তো সে তোমার, আমার নয়! এই পর্যন্ত বলে একটু দম নিয়ে সুমিতা আবার শুরু করলে, কিন্তু সারা জগতের চোখে তোমরা আজ কোথায় নেমে গেছ, ভেবে দেখেছো কি একবার? ভুলে যেয়ো না, একটি নারীকে অপমান করার জন্যে একদিন এই দেশের মাটিতে লঙ্কাকাণ্ড হয়েছিল। কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধ, তারও মূলে ছিল এই দেশের একটি নারীর অপমান! শুধু নারীর ইজ্জৎ রক্ষা আমাদের দেশের আদর্শ নয়, পৃথিবীর কোন সভ্যদেশ কখনো নারীর এত বড় অপমান বুঝি নিঃশব্দে হজম করেনি, যেমন করলে তোমরা! আবার মুখে বড় বড় বুলি, বড় বড় আদর্শের কথা আওড়াতে লজ্জা করে না! আর বলতে পারে না। বুঝি সুকুমারের মুখটা মনে পড়ে সুমিতা থেমে যায়। তারপর হঠাৎ রুমালে চোখ লুকিয়ে একটু কেঁদে বলে, আমায় ক্ষমা করো—তোমায় যদি অপমান করে থাকি কোন রূঢ় কথা বলে, ক্ষমা করো গো। আমার মাথার ঠিক নেই কি বলতে কি বলে ফেলেছি।

ব্রজেশ কিন্তু তেমনি কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। যেন হিন্দুধর্মের মূর্তিমান আদর্শ! সহস্র আঘাতে অচল. অটল।

সুমিতা তখন আস্তে আস্তে বললে, একটা অনুরোধ করবো রাখবে? বলো! তোমার পায়ে ধরছি।

ব্রজেশ শুধু তেমনি নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দিলে, না এখন তোমার কোন অনুরোধ আমার কাছে থাকতে পারে না। আর আমি তা শুনতে বাধ্য নই।

অশ্রুরুদ্ধস্বরে সুমিতা বলে, শুধু একবার সুকুকে দেখাবে—দূর থেকে দেখবো—তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি—একবার তোমার বাসায় আমায় নিয়ে চলো এখনই—কালই ভোরে আমায় চলে যেতে হবে এখান থেকে, আর সময় নেই, আবার কবে কলকাতায় আসতে পারবো জানি না।

আরো কঠিনভাবে এবার ব্রজেশ উত্তর দিলে, না তা কোন মতেই সম্ভব নয়।

কেন সম্ভব নয়? সে তো আমার ছেলে। আমার জাত যেতে পারে বিধর্মী হতে পারি কিন্তু কি করে ভুলবো যে সে আমায় প্রথম মা বলে ডেকেছিল? কি করে ভুলবো যে তারই আহবানে আমার দেহের অণুতে পরমাণুতে প্রথম জেগেছিল মাতৃত্বের বন্যা? কি করে ভুলি যে সে-ই এনে দিয়েছিল আমার জীবনে নারীত্বের চরম সফলতা! তুমি একটু দয়া করলেই হয়! সে যে আমার ছেলে আমার প্রথম সন্তান, তুমি ভুলে যেয়ো না—তোমার পায়ে পড়ি—

ব্রজেশ বললে, তোমার প্রথম সন্তান, আর আমার বুঝি সে কেউ নয়?

কেন, তোমার জিনিস তো তোমারই রইলো, আমি শুধু তাকে একবার চোখের দেখা দেখে চলে যাবো! কত বড় হয়েছে, কত সুন্দর হয়েছে, দেখবো—এর বেশি আর কিছু চাই না। আমাকে ভুল বুঝো না, তোমার দিব্যি।

অসম্ভব। তা কিছুতেই হতে পারে না। কেন না তার জীবনে তুমি মৃত, চিরকালের মত। সে জানে তার মা মরে গিয়েছে বাল্যকালে। তাই আমি চাই না যে তুমি শুধু একবার চোখের দেখা দিয়ে তার জীবনটাকে চিরদিনের জন্যে বিষাক্ত করে দিয়ে চলে যাও। সে বেশ ভুলে আছে। বলতে বলতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে চুপ করে যায় ব্রজেশ।

বেশ ভুলে আছে সে! কিন্তু আমি যে ভুলতে পারি না। প্রতিদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখে চমকে উঠি—দেখি আমার সুকু কাঁদছে, 'মা' 'মা' বলে আমায় ডাকছে। আমার কাছে আসবার জন্যে কত আকুলি-বিকুলি করছে।

তারপর হঠাৎ একটু থেমে রুমাল দিয়ে চোখের কোণটা মুছে বললে, শুধু একবার দূর থেকে তাকে দেখে চলে যাবো—তোমার দিব্যি, একটি কথাও বলবো না তার সঙ্গে। এমন কি তাকে জানতেও দেবো না যে আমি তার মা! আমায় শুধু এইটুকু ভিক্ষা দাও! দোহাই তোমার! মা হওয়ার যে কি জ্বালা সে তুমি জানো না, তাই বলতে পারছো ওকথা। ভুলে যেয়ো না—সে যে আমার জীবন-লতার প্রথম কলি!

ব্রজেশ কঠিন দৃষ্টিতে একবার তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, এই তো? এই কথা বলার জন্যে তাহলে এসেছিলে? আচ্ছা—বলে যেমন সে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালে অমনি সুমিতার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা নামলো। সে বললে, তাহলে দেবে না তাকে একবার চোখে দেখতে? তুমি এত নির্দয়, এত নিষ্ঠুর।

এতক্ষণে ব্রজেশ বুঝি কয়েকপা এগিয়ে গিয়েছিল। সুমিতা চোখের জল মুছতে মুছতে ডাকলে, শোন?

থমকে দাঁড়িয়ে আবার তার কাছে ফিরে আসতেই একটা একশো টাকার নোট ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে বার করে ব্রজেশের হাতে গুঁজে দিতে দিতে সে বললে, যদি দেখা নিতান্তই করতে না দাও তো এই টাকাটা তাকে দিয়ো সন্দেশ খেতে।

ব্রজেশ নোটটা তার হাত থেকে নিয়ে মুঠো করে পাকিয়ে ঘৃণায় ছুঁড়ে দিলে সুমিতার পায়ের ওপর। তারপর বললে, যাকে ছুঁলে জাত যায় তার অর্থ গ্রহণ করবে আমার ছেলে? পয়সার লোভ দেখিয়ে আমায় ভোলাতে এসেছো বুঝি সুমিতা? আমি দীন দুঃখী হতে পারি কিন্তু ব্রাহ্মণের রক্ত এখনো আমার দেহে বইছে ভুলো না। তোমার কাছ থেকে টাকা নেবার আগে আত্মহত্যা করে মরতে পারবো, স্থির জেনো।

ছেলেকে কি তবে আমার কিছু দেবার অধিকারও নেই? আর কোনদিন আমি তাহলে সুকুকে দেখতে পাবো না? ওগো বলো, চুপ করে থেকো না!

বলতে বলতে চোখের জল মুছে আবার শান্তকণ্ঠে বলে, আচ্ছা সে ভালো আছে, লেখাপড়া করছে তো? কত বড় হয়েছে? সেটুকু মুখে বলো—তার কথা শুনে আমার মনটা জুড়োক।

এবার যেন একসঙ্গে নির্মম হয়ে ওঠে ব্রজেশের মনের সমস্ত কোমল-বৃত্তি-গুলো। সে বলে, না তা শোনবারও তোমার কোন দরকার নেই। বলেই ব্রজেশ পিছন ফিরলো যেমন, অমনি সুমিতা মোটরের মধ্যে কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়লো।

ট্যাক্সি ধীরে ধীরে যখন চলতে শুরু করলো গ্র্যাণ্ড হোটেলের দিকে তখন ব্রজেশের সঙ্গে তার বিবাহের সম্পূর্ণ কাহিনীটা যেন বইয়ের এক একটা পরিচ্ছেদের মত সুমিতার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। এই ক'বছরের মধ্যে কি করে ব্রজেশ তাকে ভুলে যেতে পারে, তার প্রতি এমন নিষ্ঠুর হতে পারে, ভেবেই পায় না।

ট্যাক্সিটা হোটেলের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। হঠাৎ অঞ্জলির কথা মনে পড়তেই সুমিতা চেঁচিয়ে উঠল, এই ড্রাইভার, গাড়ি ঘোরাও, একবার চল তো বালীগঞ্জ!

দুই

বালীগঞ্জের স্টেশন পেরিয়ে যে রাস্তাটা বরাবর পূর্বদিকে চলে গেছে তারই ভেতরে কিছুদূর গিয়ে একটা সরু গলি সেখানে ছোট্ট একটা টালী-ছাওয়া বাড়িতে থাকতো অঞ্জলি। সে তার ছেলেবেলার বন্ধু। ঢাকায় থাকতে এক সঙ্গে একই স্কুলে পড়তো, তারপর হঠাৎ অঞ্জলির বিয়ে হয়ে যায়। সুমিতাও বিয়ের পর কলকাতায় চলে এসেছিল বটে কিন্তু কেউ কারুর খবর রাখতো না। একদিন সিনেমায় একটা বিখ্যাত বাংলা ছবি দেখতে গিয়ে দুপুর বেলা অঞ্জলি আবিষ্কার করলে সুমিতাকে। তারপর থেকে আবার শুরু হয় ঘনিষ্ঠতা, মেলামেশা। কিন্তু নিজের অবস্থা খারাপ বলে ব্রজেশ সুমিতাকে বেশি মিশতে

দিত না অঞ্জলির সঙ্গে। বরাবরই তার ছিল যেন একটু বেশি আত্মম্ভরিতা। বিয়ের পর যতবার অঞ্জলি এসেছিল তার সঙ্গে দেখা করতে, ততবার সুমিতাকে যেতে দেয়নি ব্রজেশ তার বাড়ি। অঞ্জলির স্বামীর অবস্থা মোটামুটি ভাল, মার্চেন্ট অফিসের সাধারণ কেরানীর চাকরি করলেও যা মাইনে পায় তাতে নিজের বাড়িতে পাঁচটি ছেলেমেয়ে নিয়ে খেয়ে পরে একরকম চলে যায়।

তখন বোধহয় বেলা তিনটে, সুমিতা গিয়ে হাজির হলো অঞ্জলির বাড়িতে। ঘরের মেঝেয় একটা ছেঁড়া মাদুরে আঁচল বিছিয়ে শুয়েছিল অঞ্জলি। আর রোগা রোগা দুতিনটে ছেলেমেয়ে কাগজের ঠোঙায় করে মুড়িমুড়কী খাচ্ছিল। জলে, ছেঁড়া কাগজে, মুড়িমুড়িকীতে, সারা ঘরটা থৈ থৈ করছিল।

সুমিতাকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলো অঞ্জলি। সে প্রথমটা তাকে চিনতে পারেনি, মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। পাঞ্জাবী মেয়ে কোথা থেকে এল।

তাকে কিন্তু ওইভাবে চেয়ে থাকতে দেখে সুমিতা বলে উঠলো, কেয়া, হ্যামকো নেহি পছন্‌তা ?

ওমা এ কেগো—যাও যাও এ বাড়ি নয়, চলে যাও এখান থেকে বলছি। বলতে বলতে ভয়ে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠলো। তারপর গলায় জোর এনে আবার বললে, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, চলে যাও শীগ্‌গির এবাড়ি থেকে নইলে পুলিশ ডাকবো।

সুমিতা তেমনি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলো কোন প্রকার উত্তর না দিয়ে।

অঞ্জলি যেন বললে, যা তো খোকা পাশের ঘর থেকে রমুর বাবাকে ডেকে আনতো, দেখি ও নড়ে কিনা এখান থেকে। কোথা থেকে এক উটকো আপদ এলো মরতে এখানে।

এইবার হেসে ফেললে সুমিতা। বললে, কি লো চিনতে পারছিস না ?

এতক্ষণে সেই পরিচিত হাসি ও গালের ওপর সেই পরিচিত টোল খাওয়া দেখে অঞ্জলি বলে উঠলো, ওমা তুই—! কি করে চিনি বল, শুনেছিলুম গুণ্ডারা যে তোকে ধরে নিয়ে গিয়েছে—কিন্তু তাই বলে যে এই রকম সালোয়ার-পরা, ওড়না ঢাকা মূর্তি দেখবো তা কে জানতো।

সুমিতা মুচকি হেসে জবাব দিলে, ধরে নিয়ে গেলে বুঝি গুণ্ডারা খেয়ে ফেলে দেয় যে আর কোন কালে তোর সঙ্গে দেখা হবে না ভেবেছিলি ?

তা নয়—তা বলছি না। কিছু মনে করিসনি ভাই, আজকাল কলকাতার শহরে এইরকম দুপুরবেলা কত বদমায়েস লোক এসে বাড়িতে ঢুকে মানুষের সর্বনাশ যে করে যায়। অপরাধ নিসনি ভাই। একগাল হেসে সে আবার বললে, কিন্তু কি চেহারা হয়েছে তোর—পনেরো ষোল বছর বয়সেও যে এত রূপ দেখিনি ?

এবার আর হাসি চাপতে পারে না সুমিতা। বলে, চেহারাটা তো এমনি হয়

না—তার জন্যে অনেক খরচ করতে হয় অর্থাৎ ভাল চেহারা হয় যাতে সেই রকম সব ভালমন্দ খেতে হয়। আগে তো তেমন খাদ্য কিছু পেটে পড়তো না, কাজেই চেহারাটা কি আপনি আপনি হবে ?

তা বলে এমন দুধে-আলতা মেশানো টকটকে রঙ্ কোথায় পেলি ভাই ?

সুমিতা সারা মুখে একটা প্রসন্ন হাসি ছড়িয়ে অঞ্জলির গালটায় একটা ঠোনা মারলে। বললে, আমি কি এখনো তোদের সেই সুমি আছি—না গরীব কেরানীর স্ত্রী আছি—যে অর্ধেক দিন ভাতের সঙ্গে দুটো কুচো চিংড়ি পর্যন্ত জোটে না ? বলে খিল খিল করে হেসে উঠলো, ছেলেমানুষের মত। তারপর হাসির বেগ দমন করতে করতে বললে, জানিস—আমি এখন আমিনা বেগম —মুরগীর কোপ্তা, পেশোয়ারী চালের পোলাও—বিরিয়ানী—দুম্বার কাবাব—এ ছাড়া আঙ্গুরের পায়েস, বেদানার চাটনি, বাদামের হালুয়া, পেস্তার বরফী, জলখাবার খাই—রোজ, নিয়মিত।

সত্যি বলছিস ?

আমার চেহারা দেখেও কি তা মালুম হচ্ছে না তোর ?

অঞ্জলি এতক্ষণ চোখ দুটো বিস্ফারিত করে তার রূপ দেখছিল। এবার বলে উঠলো, কিন্তু—সত্যি বলছি ভাই আমি ভাবতে পারি না যে তুই কি করে এ-অবস্থাটা মেনে নিয়েছিস ?

এবার সুমিতা রীতিমত চটে উঠলো। বললে, দেখ অঞ্জু, তোদের মুখে এইসব ন্যাকামির কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। আমার অবস্থায় পড়লে, তুই কি করতিস শুনি ?

ঠোঁট উল্টে অঞ্জলি জবাব দিলে, আত্মহত্যা তো কেউ ঘোচায়নি !

বারুদে যেন অগ্নিসংযোগ হলো।

নিমেষে সুমিতার চোখ-মুখের চেহারা যায় বদলে। অঞ্জলির মুখ থেকে কথাটা যেন থাবা মেরে কেড়ে নিলে সে। বললে, কি দুঃখে আত্মহত্যা করবো ? আমি তো কোন অপরাধ করিনি।

তারপর একটু থেমে আহতা সর্পিণীর মত আবার গর্জে উঠলো, আর তা করতে যাবো কার জন্যে ! ওই নির্বীর্য, নপুংসগুলোর জন্যে ? যারা নিজেদের প্রাণের ভয়ে কুকুরের মত পালিয়ে আসে মা, বোন ও স্ত্রীকে ফেলে ! উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকে তার গলা, ওঃ কি নৈতিক অধঃপতন ! দলে দলে দেশ ছেড়ে সকলে পালিয়ে এলো—একবার কেউ মুখে এতটুকু প্রতিবাদ পর্যন্ত করলে না, কিংবা গুণ্ডাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে একবার রুখে দাঁড়ালো না। গ্রামকে গ্রাম, দেশকে দেশ, শূন্য, করে যে যেদিকে পারলে পালিয়ে বাঁচল। একবার ভেবে দেখ অঞ্জু তুই, আমার মত হতভাগিনীদের কথা। তারা যখন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আকাশে কান পেতে ভাবছে, ওই বুঝি আসছে দলে দলে—হাজারে হাজারে, লাখে লাখে, তাদের দেশবাসীরা, ওই তাদের মিলিত কণ্ঠের হুঙ্কার

শোনা যাচ্ছে—এখনই বুঝি তাদের অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা বেজে উঠবে চারিদিকে—প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা চাই—তাদের মায়ের অপমানের, তাদের স্ত্রী ও ভগ্নীর অপমানের—

অঞ্জলি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, থাক ভাই ওসব পুরনো কথা। চুপ কর!

চুপ করবো! ইচ্ছে হয় চীৎকার করে শোনাই সকলকে! ওঃ তোরা বুঝতে পারবি না কি করে সেসব দিন কেটেছে আমাদের। অথচ এর জন্যে অপরাধী কে?

অঞ্জলি বলে, সবই বরাত! কাউকে দোষ দেওয়া যায় না ভাই! কে যাবে—সেই জায়গায় যেখানে ধর্ম নেই, রাষ্ট্রনীতি নেই, শাসন নেই! যেখানে সবাই উন্মত্ত একটা জাতকে ধ্বংস করতে!

সুমিতা বলে, চুপ কর, ও কথা বলে নিজেদের মনকে ভোলাতে যাসনি! ইংরেজেরা এদেশে কি কম অত্যাচার করেছিল! তাদের ইতিহাস গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখ দেখি! তখন বন্দুকের মুখে কে গিয়েছিল ছুটে। আজ যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিস বলে মনে মনে অহংকার করিস তা কাদের জন্যে সম্ভব হয়েছিল ভেবে দেখেছিস কি? যারা আজ বড় বড় বুলি আউড়িয়ে খবরের কাগজে ছবি ছাপছে—তাদের জন্য নয়—আমাদের দেশেরই নাম-না-জানা হাজার হাজার হতভাগ্য যুবকদের জন্যে। তখনও তারা অপমানিত হয়েছিল এমনি ভাবেই—এমনি বর্বরের মতই। আজ এখন কেউ একটা প্রতিবাদ করলে না—দেশসুদ্ধ সবাই নীরব রইল!

সুমিতা হাঁপাচ্ছিল। একটু দম নিয়ে আবার বললে, এর চেয়ে যদি দু'পক্ষে লড়াই করতো তাহলে বোধহয় এত প্রাণ যেতো না, এভাবে নারীর ইজ্জত নষ্ট হতো না। তাই ইচ্ছে করে আজ আমার এই পায়ের নাগরা জোড়াটা দিয়ে একটা মালা গেঁথে উপহার দিয়ে যাই এ দেশের পুরুষদের—তাদের অপহৃতা স্ত্রী ও মা ভগ্নীদের দেওয়া জয়মাল্য বলে!

ছি! অঞ্জলি বললে।

ছি আমাকে, না ছি পুরুষ জাতকে? ভেবে দেখ দেখি। ওরা নির্মম কাপুরুষতার কাজ করেছে! স্বামী, দেওর, বাপ, ভাই এরা সবাই শিক্ষিত, সকলে একজোটে গুণ্ডাদের হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে নিজেদের প্রাণ নিয়ে পালালো। গুণ্ডারা এসে শুধু আমায় দেখিয়ে বলেছিল, তোমাদের কারুর গায়ে হাত দেবো না যদি তোমরা তোমাদের বাড়ির সবচেয়ে খুপসুরত ওই জেনানাকে আমাদের দিয়ে দাও। আর যদি তা না দাও তো তোমাদের সকলকে কেটে ফেলবো।

আমি তখন শ্বশুরবাড়িতে, আমার বাপ, ভাইয়েরাও সব সেদিন নেমন্তন্ন খেতে এসেছিল সেখানে—মোট চোদ্দ-পনেরো জন জোয়ান পুরুষ ছিল, আশ্চর্য তারা কেউ এর জন্যে মুখে একটা প্রতিবাদ করলে না। সুড়সুড় করে তাদের হাতে আমাকে বলিদান দিলে—

অঞ্জলি ওই প্রসঙ্গ আর বাড়তে না দিয়ে থামিয়ে দিলে। বললে, থাক ভাই

সে-সব অতীতের কাহিনী, ও শুনলে যেন মাথার মধ্যেটা কেমন করতে থাকে। তার চেয়ে তুই এখন কেমন আছিস বল—কতদিন পরে দেখা! আগের জীবনটাকে ভুলে যা ভাই।

ভুলে যা বললেই কি ভোলা যায় অঞ্জু। দীর্ঘদিন ধরে যে সংস্কার, যে শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে মানুষ হয়েছি, তাকে এক কথায় কি এত সহজে ভোলা যায়!

অঞ্জলি অনুনয় করে, না থাক ওসব আলোচনা ভাই। এখন বল তুই কেমন আছিস?

খুব সুখে আছি ভাই। মাইরি বলছি। বলে খিলখিল করে হেসে চোখের জল সামলে নিলে সুমিতা। তারপর ছোট্ট একটা রুমাল বার করে মুখটা মুছতে মুছতে বললে, এত সুখ যদি জানতুম তাহলে—

মুখ টিপে একটু হেসে অঞ্জলি বললে, সত্যি?

তোকে মিথ্যে বলে আমার লাভ কি বল? তুই তো আমার বরকে কেড়ে নিতে যাচ্ছিস না?

অঞ্জলি কৌতূহলে ফেটে পড়ে। বলে, হ্যাঁরে সুমি, তোকে সে খুব ভালবাসে?

বাসে না আবার! বলে 'মেরে দিল্‌কা রোশনাই,' 'মেরে আখোঁকে পেয়ারী'—

বলিস কিরে, এত প্রেম! বলে একটু থেমে আবার জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁরে একটা বেজাতের সঙ্গে ঘর করতে তোর কোন অসুবিধে হয় না?

কিসের অসুবিধে? বেজাতের সঙ্গে আজকাল তোদের সমাজের যখন অসবর্ণ বিয়ে হয় তখন বুঝি প্রেমের দোহাই দিয়ে সবটাই রঙীন হয়ে ওঠে, না?

অঞ্জলি তাড়াতাড়ি নিজের কথাটা সামলে নিতে নিতে বললে, না না, আমি তা বলিনি, তবে একেবারে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘর থেকে মুসলমানের ঘরে গিয়ে পড়লি—তাই বলছিলুম। তোর কর্তা করে কি ভাই?

সুমিতা বললে, ব্যবসা?

কিসের ব্যবসা রে?

চামড়ার ব্যবসা। লাহোর ন্যাশন্যাল ট্যানারীর মালিক সে। শুধু পাকিস্তানে নয়, তোদের ভারতে এবং বিলেত আমেরিকাতেও তার ব্যবসা চলে।

বলিস কিরে—তাহলে তুই খুব বড়লোক বল?

ঈষৎ হেসে সুমিতা বললে, গত বছরে তের লক্ষ টাকা লাভ হয়েছে আমাদের কোম্পানীর। সেই ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারেই কলকাতায় আসতে হয়েছে, আবার কালই আমরা চলে যাবো ঢাকা, সেখান থেকে পরশু দিন একেবারে সোজা লাহোরে।

তুই বুঝি তার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে এমনি করে ঘুরে বেড়াস?

সুমিতা একটু থেমে বললে, না, তবে অনেকদিন পরে কলকাতা ও ঢাকার নাম শুনে আর স্থির থাকতে পারলুম না। জীবনের কুড়িটা বছর যেখানে কেটেছে, জীবনের বাল্য ও কৈশোরের সেই লীলাভূমিকে একবার চোখে দেখবার জন্যে ছুটে

এলুম ! লাহোরটা বড্ড রুক্ষ জায়গা কিনা। বাংলার গাছপালা, নদী ও বন-জঙ্গল দেখবার জন্যে মনটা তাই মধ্যে মধ্যে কেমন যেন করে ওঠে !

অঞ্জলি চুপ করে কি যেন ভাবলে। তারপর গলার স্বর নামিয়ে এনে ধীরে ধীরে বললে, হ্যাঁরে সুমি, শুধুই কেবল বাংলার গাছপালা, নদী নালা দেখবার জন্যে মনটা কেমন করে, না আর কিছুর জন্যে—সত্যি করে বল দেখি ?

কথাটার ইঙ্গিত যেন বুঝতে পারেনি এমনি একটা ভাব মুখে এনে সুমিতা উত্তর দিলে, আর মধ্যে মধ্যে বড্ড তোকে দেখতে ইচ্ছে করে। হাজার হোক এক সঙ্গে সারা স্কুলটা তোর সঙ্গে পড়েছিলুম তো। বলতে বলতে কথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে সে প্রশ্ন করলে, হ্যাঁরে অঞ্জু, তারপর তোর সংসারের সব খবর কি বল ? কেবল তো আমার কথাই এতক্ষণ তুই জিজ্ঞেস করলি !

অঞ্জলি বললে, মাইরি আমার কেবল জানতে ইচ্ছে করে তোর কথা। ওদের মধ্যে মিলেমিশে তুই কেমন ভাবে সংসার করছিস ! বলে সুমিতার মুখের দিকে সে চেয়ে থাকে বিস্মিত দৃষ্টিতে।

তারপর হঠাৎ কথাটা চেপে নিয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁরে তোর এখন ক'টি ছেলেমেয়ে ?

সুমিতা চট্ করে তার ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে দু'খানা ছোট ছোট ফোটো বের করে তার হাতে দিলে, একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে।

বাঃ কি সুন্দর দেখতে হয়েছে রে এদের। যেন দু'টি পদ্ম ফুল ! আহা, আহা। তারপর আপন মনে বলে ওঠে, তোর রূপটা তো কম নয় তার ওপর এদের বাপকে নিশ্চয় দেখতে ভাল ! হ্যাঁ, কি নাম রেখেছিস ভাই এদের ?

সুমিতা বলে, ছেলের নাম ওর বাপ রেখেছে নবাবজান। আর মেয়ের নাম আমি রেখেছি, আনার বানু।

বাঃ চমৎকার নাম তো ? আচ্ছা ওদের বাপের কথা তো কিছু বললি না ?

তুই কি জিজ্ঞেস করেছিস পোড়ারমুখি সেকথা ? বলে একটা মৃদু চিমটি কাটলে সুমিতা অঞ্জলির গায়ে।

ওঃ বাবা, মুরগী খেয়ে খেয়ে তোর হাতে কি জোর হয়েছে—গা-টা যেন আমার একেবারে ভেঙ্গে গেল বলে মনে হচ্ছে।

হাসতে হাসতে খপ্ করে এবার ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে ফেললে সুমিতা। একটা ফোটো বার করে তার হাতে দিয়ে বললে, দেখ দেখি আমায় চিনতে পারিস কিনা ?

ওমা—এ যে যুগলমূর্তি—দেখি দেখি। মাইরি তোকে ঠিক একটা বেগম-বেগম বলেই মনে হচ্ছে। বাবা তোর বর তো খুব লম্বা। তুই যে এত ঢ্যাঙা তা তুই-ই তো তার বুকের কাছে পড়েছিস। কি সুন্দর দেখতে রে তোর বরকে !

ছেলে মানুষের মত খিল খিল করে হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়লো সুমিতা।

তারপর রুমালটা মুখে চেপে ধরে গদগদ স্বরে বললে, তাহলে আমি যে এবার জিতেছি তা স্বীকার করছিস তো? আচ্ছা নে এই ফোটোটা তোকে আমি প্রেজেন্ট করলুম।

নিশ্চয়ই! তোর আগের বিয়ের ফোটোটা ওই দেখ এখনো দেয়ালে টাঙানো রয়েছে। বলেই হঠাৎ চুপ করে যায় অঞ্জলি সুমিতার মুখের পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে। তারপর চাপা গলায় বলে—তার পাশেই আবার এটাও টাঙিয়ে রাখবো।

না না, ও জীবন আমার শেষ হয়ে গেছে, ওটা এখুনি আমার চোখের সামনে খুলে ফেলে দে ভাই!

তোর কাছে শেষ হতে পারে কিন্তু আমার কাছে তো এখনো তেমনি আছে রে। হ্যাঁ, তোর এ বরের নামটা কি বললি না তো?

গিয়াসুদ্দীন রহমান।

লেখাপড়া কেমন জানে?

কিছুই জানে না। শুধু নামটা সই করতে পারে কোন রকমে! তবে তার লেখাপড়া শেখার চেয়ে শেখানোর দিকে ঝোঁক বেশি! হঠাৎ একটু থেমে সে আবার বলে, ও হ্যাঁ, একটা কথা তোকে বলতে ভুলে গিয়েছি, আমি বি. এ. পাশ করেছি তারই আগ্রহে; তাছাড়া খুব বড় বড় ওস্তাদের কাছে গান শিখেছি, সেতার শিখেছি!

সত্যি, তুই গানবাজনা কি ভালই না বাসতিস ছেলেবেলায়! কিন্তু তোর বাবার অবস্থা ভাল ছিল না বলে স্কুলে দুটো টাকা বেশি দিয়ে তোকে গানের ক্লাশে ভর্তি করতে পারেননি! এই পর্যন্ত বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অঞ্জলি আবার প্রশ্ন করলে, তাহলে তোর সব 'এ্যাম্বিশান্' এ জীবনে পূর্ণ হয়েছে, কি বল? বি. এ. পাশটাও করলি, গানবাজনাও শিখলি, আবার একটা সুন্দর বর ও সুন্দর ছেলেমেয়ে পেলি। ও সুন্দর ছেলেমেয়ে দেখলে তুই এক সময় কি করতিস মনে আছে? সেই ঢাকায় আমাদের বাড়ির নিচের তলায় যাঁরা ভাড়া থাকতেন, তাঁদের ছোট ছেলেটাকে শুধু একবার কোলে নেবার জন্যে তুই রোজ স্কুল থেকে ফেরবার পথে আমাদের বাড়ি না হয়ে যেতিস না?···অথচ ভাগ্যের এমনি বিড়ম্বনা যে তুই সুন্দর এত ভালবাসিস বলে শেষে তোর বিয়ে হলো কিনা ব্রজেশবাবুর সঙ্গে। যেমনি রোগা তেমনি কালো—

সহসা যেন সুমিতার মুখটা অমাবস্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল। যেন ওই নামটাই তার যত কিছু দুর্ভাগ্যের কারণ। একটুখানি চুপ করে থেকে সে তাই অনুরোধ জানালে, থাক ভাই ওর কথা।

আহা বেচারীর এখন বড় কষ্ট রে। বলে অঞ্জলি শুরু করলে, সে আবার একটা বিয়ে করেছে, তার আবার তিনটে ছেলেমেয়ে। ধারে দেনায় একেবারে ডুবে আছে ভদ্দর লোক। আর এ পক্ষের বৌটা হয়েছে তেমনি বজ্জাত। কেবল ধার করে করে সিনেমা দেখে, আর হোটেল থেকে চপ্ কাটলেট আনিয়ে একলা

একলা গেলে। আমার জায়ের এক বোন সেই বাড়িরই ওপর তলায় ভাড়া থাকে কিনা, তার কাছ থেকে ওদের সব খবর পাই! বলে একটু চুপ করে থেকে অঞ্জলি আবার বলতে লাগল—সুকুটার জন্যে বড্ড মন কেমন করে ভাই। সৎমা যেমন হয় চিরকাল, তেমনি দুর্ব্যবহার করে তার সঙ্গে। ভাল করে খেতে দেয় না, ভাল কাপড়-জামা পরতে দেয় না, তার কোলের মেয়েটাকে নিয়ে কেবল রাস্তায় রাস্তায় পার্কে পার্কে হাওয়া খাইয়ে বেড়ানো হয়েছে তার কাজ। এই রোগা কাঠির মত চেহারা হয়ে গেছে, সেদিন তাকে দেখে চিনতে পারি না ভাই। এইসব বলতে বলতে হঠাৎ সুমিতার মুখের দিকে চোখ পড়তেই অঞ্জলি চমকে উঠলো, দেখলে সুমিতা যেন পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কিরে কি হলো তোর, অমন করে রইলি কেন? ওঃ বুঝেছি, সুকুর কথা শুনে, না?

সঙ্গে সঙ্গে সুমিতার চোখ ছাপিয়ে হু হু করে জল গড়িয়ে পড়লো দু' গাল বেয়ে!

ছি ছি কাঁদছিস কেন? আচ্ছা, আমি আর ও প্রসঙ্গ তুলবো না। ভুলে গিয়েছিলুম ভাই।

সুমিতা এবার রুমাল দিয়ে তার চোখের জল মুছতে মুছতে বলে, ভাই অঞ্জু, একটা কথা বলবো, রাখবি?

কি বল?

একবার আমায় দেখাবি সুকুকে—বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। আমি যত চেষ্টা করি কিছুতেই তার সেই মুখটা ভুলতে পারি না। আজো যখন তখন আমি তার সে কান্না শুনতে পাই, "মাগো—মাগো—তুমি চলে যেয়ো না—আমায় নিয়ে যাও"। গুন্ডারা ধরে নিয়ে যাবার আগে আমার গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে মুখটা লুকিয়ে সে ঘুমচ্ছিল।

বলতে বলতে একেবারে ডুকরে কেঁদে ওঠে সুমিতা।

অঞ্জলিরও চোখে জল এসে পড়েছিল। সে উদ্গত অশ্রু দমন করতে করতে বললে, চুপ কর, চুপ কর সুমি—আমি নিশ্চয়ই তোর সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দেবো। সে তো আগে মাঝে মাঝে এখানে আসতো—সেদিনও এসেছিল বিজয়ার প্রণাম করতে—তারপর শুনলুম সেই হারামজাদী সৎমা নাকি তাকে আর এখানে আসতে দেয় না। আমি একটু ভালবাসি বলে সে বলে কিনা লোকের বাড়ী গিয়ে তুই আমার নিন্দে করে আসিস। ফের যদি কোনদিন তুই কারো বাড়ী যাবি তাহলে মেরে পিঠের ছাল চামড়া তুলে ফেলবো। তাই ভাই আমি-ই তাকে আসতে বারণ করে দিয়েছি এখানে।

পারবি তার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে—সত্যি বলছিস? বলে অঞ্জলির দুটো হাত সুমিতা ব্যাকুল হয়ে জড়িয়ে ধরলে। তারপর খপ্ করে ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে একশো টাকার একখানা নোট তার হাতে গুঁজে দিতে দিতে বললে,

তোর ছেলেমেয়েদের সন্দেশ কিনে দিস অঞ্জু।

ওমা, সে কিরে সন্দেশ খেতে এত টাকা মানুষ দেয় ছেলেদের ?

হ্যাঁ, তা না হলে তারা তো জানতে পারবে না যে তাদের একটা বড়লোক মাসি আছে ! বলে ফিক করে একটু হাসবার চেষ্টা করলে বটে সুমিতা কিন্তু তার বদলে চোখের কোণে জল টলটল করে উঠলো। রুমাল দিয়ে চোখটা শুকনো করতে করতে সে বললে, কিন্তু সুকুকে আমায় এক্ষুণি তোকে দেখাতে হবে ভাই। তা না হলে আর দেখা হবার উপায় নেই। কাল ভোরেই আমাকে চলে যেতে হবে ঢাকায়। তাছাড়া ওকে লুকিয়ে আমি এখানে এসেছি। বলেছি কয়েকটা সৌখীন টয়লেট কিনতে যাচ্ছি নিউ মার্কেটে।

অঞ্জলি বলে, কিন্তু এখন—

লক্ষ্মীটি এখন নয় বলিসনি—তুই তো বুঝিস কি যন্ত্রণা মায়ের প্রাণে—আজ আট বছর তাকে দেখিনি ! অথচ সে আমার প্রথম সন্তান ! চল ভাই, আমার ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে—এখুনি আবার তোকে এখানে পৌঁছে দিয়ে যাবো আমি নিজে। আচ্ছা, কোথায় এখন ওরা থাকে রে ?

অঞ্জলি শাড়িটা ছাড়তে ছাড়তে বললে, এই কাছেই মনোহরপুকুর লেনে।

তাহ'লে তো বেশী দেরীও হবে না। এখনি তুই ফিরে আসতে পারবি ভাই !

আচ্ছা চল—বলে চটিটা পায়ে দিয়ে ট্যাক্সিতে এসে বসে সে বললে, এখন হয়ত তাকে পার্কে পেয়ে যাবোখণ—তাদের বাড়ীর পাশেই একটা ছোট্ট পার্ক আছে—সৎমার মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বিকেলে বেশীর ভাগ সময়ই সুকু সেখানে ঘুরে বেড়ায়।

ট্যাক্সিটা পার্কের কাছে এসে দাঁড়াতেই অঞ্জলি নেমে গেল, আর সুমিতা গাড়ীর মধ্যে বসে রইল। কিন্তু অঞ্জলির অনুমানই ঠিক হলো ! সে পার্কের ভেতরে ঢুকেই দেখলে সুকু একটা ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জী গায়ে দিয়ে এবং তালি মারা একটা খাটো হাফ প্যাণ্ট পরে তার সৎমার মেয়েটাকে কোলে নিয়ে চাকরের মত এক-জায়গায় দাঁড়িয়ে কতকগুলো ছেলের গুলি খেলা দেখছে !

অঞ্জলিকে দেখে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, সইমা তুমি এখানে ? ওঃ কতদিন তোমায় দেখিনি।

হ্যাঁ বাবা, তোর সঙ্গে একটু দরকার আছে তাই এসেছি। আয় তো একবার ওই গাড়ীটার কাছে।

সুমিতার বন্ধু হিসাবে ব্রজেশবাবু তখনো অঞ্জলির সঙ্গে একটু সম্পর্ক রেখে-ছিলেন। এমন কি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন যখন তখনো তাকে নেমন্তন্ন করে ছিলেন। তারপর এই বৌয়ের প্রথম সাধেও তাকে নিজে এসে খেতে যাবার কথা বলেছিলেন। এছাড়া মধ্যে মধ্যে অঞ্জলির স্বামী অপূর্বর সঙ্গে পথে বা ট্রামে-বাসে দেখা হলে তিনি যেচে কথা বলতেন, তাদের কুশল সংবাদ নিতেন। অঞ্জলিও মধ্যে মধ্যে সুকুকে তার বাসায় নিয়ে গিয়ে খাওয়াতো এবং আদর যত্ন করতো।

তবে সম্প্রতি কিছুদিন থেকে তার সৎমার দুর্ব্যবহারের জন্যে সব সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছিল অঞ্জলি।

যাহোক মোটরের কাছে ওই বেশে মেয়েটাকে কোলে করে এসে সুকু যেই দাঁড়ালো, অমনি তার কোল থেকে মেয়েটাকে অঞ্জলি তুলে নিয়ে তাকে গাড়ীর ভেতরে উঠতে বললে।

সুকুমার যেই গাড়ীর দরজায় পা দিয়েছে ব্যাকুলভাবে হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সুমিতা ডুকরে কেঁদে উঠলো। তার বুকের মধ্যে তখন যেন সাত সমুদ্রের তরঙ্গ একসঙ্গে উত্তাল হয়ে আছাড় খেতে থাকে। কিছুক্ষণ শুধু চুপ করে ওই অবস্থায় থেকে ফুলে ফুলে সুমিতা কাঁদলে। তার চোখের জলে সুকুমারের মাথা, সারা দেহ ভিজে গেল। তারপর তার গালে, মুখে, কপালে, মাথার চুলে চুমু খেতে খেতে সুমিতা ভারী গলায় বললে, কি চেহারা তোর হয়েছে বাবা ?

সুকুর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন রহস্যময় বলে মনে হয়। এমন সুন্দর চেহারার একজন স্ত্রীলোক খামকা তাকে এভাবে আদর করছেন কেন এবং কি তাঁর পরিচয়, কিছুই বুঝতে না পেরে সে যেন হতভম্ব হয়ে যায়। তার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে তো কোনদিন আর কেউ তাকে এমন করে ভালবাসেনি—এভাবে চুমু খেয়ে আদর করেনি। তাই সে বিস্ময়াবিষ্টের মত সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

অঞ্জলি সে করুণ দৃশ্য দেখে এমনি অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, বারবার আঁচলের প্রান্ত দিয়ে চোখ না মুছে পারছিল না।

সুকু, হারামজাদা, শিগগির নেমে আয় গাড়ী থেকে! একি, এ যে ব্রজেশের কণ্ঠস্বর! সহসা তাদের সকলের সামনে যেন একটা বজ্রপাত হলো। চমকে উঠে মুখ ঘোরাতেই প্রথমে সুমিতার সঙ্গে চোখাচোখি হলো ব্রজেশের। সে তখনি অঞ্জলির দিকে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে ভ্রূকুটি করে বললে, অঞ্জুদি, এর মানে কি ?

অঞ্জলি ধীরে অথচ দৃঢ়স্বরে বললে, এর যা মানে তা তো দেখছেন চোখে! এ ছাড়া আর আপনি কি বলতে চান ?

আমি বলতে চাই এই যে, আপনারা কোন্ অধিকারে আমার ছেলের এভাবে সর্বনাশ করতে এসেছেন!

অঞ্জলির চোখ দুটো এবার দপ্ করে জ্বলে উঠলো। সে বললে, ওর সর্বনাশ যা করার তা তো আপনি পুরো করেছেন, এখন আর কি বাকী রেখেছেন যে আমরা করবো। ছি ছি, ছেলেটার দিকে চাওয়া যায় না—কি চেহারা হয়েছে ? আর কি ভাবে ও চাকরেরও অধম হয়ে লোক-সমাজে ঘুরে বেড়ায় তা কি আপনি চোখে দেখতে পান না ?

মোটরের দরজা খুলে সুকুমার নেমে পড়তেই, ব্রজেশবাবু তার কান মুলে

পিঠে দুমদাম করে ঘা কতক কিল চড় কষিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, বেশ করবো আমার ছেলেকে আমি যা ইচ্ছে তাই করবো—তাতে কার কি? তারপর ছেলেকে উদ্দেশ করে বললেন, চল আজ বাড়ীতে, তোকে খুন করে ফেলবো—আপনার লোকের কাছে সোহাগ কাড়াতে এসেছিস! বলে গজগজ করতে করতে ছেলেকে নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

সুমিতা এ দৃশ্য সহ্য করতে পারল না। শুধু দু'হাতে বুকটা চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে গাড়ীর মধ্যে লুটিয়ে পড়লো।

অঞ্জলি ট্যাক্সিওয়ালাকে গাড়ী ছেড়ে দিতে বললে।

তিন

অঞ্জলিকে তার বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে সুমিতা ট্যাক্সিকে ফিরে যেতে বললে হোটেলে। গাড়ীতে সারাক্ষণ সুমিতা কেঁদেছে। অনেক বুঝিয়েও তার চোখের জল বন্ধ করতে পারেনি অঞ্জলি। তাই গাড়ী থেকে নেমে, বিদায় নেবার আগে সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে শুধু অঞ্জলি বললে, এখুনি ফিরবি! তার চেয়ে আয় না ভাই, আমার এখানে একটু বসে, জলটল খেয়ে সুস্থ হয়ে যা।

সুমিতার চোখের জল তখনো শুকোয়নি। নিমেষে আবার প্লাবন নামলো। বললে, আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে তো পারছিস ভাই, ও অনুরোধ এখন করিসনি, আবার যদি কখনো আসি তো দেখা হবে। তাছাড়া বেশী দেরী হলে আবার ওঁর মনে নানারকম সন্দেহ হতে পারে। উনি মোটেই পছন্দ করেন না যে, আমি এখানে এসে কারুর সঙ্গে পুরনো সম্পর্ক ধরে আবার মেলামেশা করি।

তাই নাকি! আচ্ছা তবে থাক ভাই! তোর যাতে অসুবিধে হয় তা আমি করতে চাই না! মধ্যে মধ্যে চিঠি দিস ভাই, তোর কথা সব সময় মনে হয় জানিস। চুপ কর। চোখের জল ফেলে ছেলেটার অমঙ্গল করিসনি। ব্রজেশবাবুর মধ্যে যে আর মনুষ্যত্ব বলে কোন জিনিস অবশিষ্ট নেই, তা তো নিজে চোখে দেখলি—তবে মিছিমিছি কেন এসব নিয়ে চিন্তা করিস ভাই!

রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে সুমিতা ড্রাইভারকে হুকুম দিল গাড়ী চালাতে। গাড়ী যেই চলতে শুরু করলে অমনি ঘুরে ফিরে আবার ব্রজেশের কথাই তার মনের দ্বারে আঘাত হানতে থাকে!

ব্যর্থতার সেই অপমান যেন সুমিতার সর্বাঙ্গে বিষের জ্বালা ছড়িয়ে দেয়! লজ্জায়, ঘৃণায় তার যেন মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছা করে। এক একবার এমনো ভাবে, কেন মরতে ব্রজেশের কাছে এলো? কেন হৃদয়ের দুর্বলতা প্রকাশ করে এমন কাঙ্গালপনা করতে গেল? এর চেয়ে তার মুখের ওপর লাথি মেরে যদি চলে আসতে পারতো, তাহলে বোধহয় উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হতো! কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গে তার মনটা আবার ভেঙে পড়ে ! ট্যাক্সির নরম গদির ওপর মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলেও ঘুরে ফিরে আবার সেই চিন্তাতেই ফিরে আসে সুমিতা ! তার জন্যে তো সে আসেনি ! শুধু সুকুমারকে একবার চোখে দেখবে বলে এসেছিল। ব্রজেশকে তাই তো এত তোষামোদ ! নইলে ব্রজেশের মত এমন নিষ্ঠুর স্বামীর মুখদর্শন করতো না সে কোনদিন ! তার সব কথা মনে হলে সুমিতার মাথায় আজো যেন খুন চাপে ! ব্রজেশ কি মানুষ ! ছি ! থর থর করে সুমিতার সারাদেহ কাঁপতে থাকে। কি এক অসহ্য যন্ত্রণা যেন তার শিরায়-উপশিরায় অস্থিতে-মজ্জাতে বিষ ছড়িয়ে দেয়। সুমিতা দু'চোখে হাত চাপা দিয়ে প্রাণপণে কি যেন ভুলতে চায়। কিন্তু পারে না। তার পূর্বজীবনকে যেন একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়—তাতে না আছে রঙ্, না কোন মধুর স্মৃতি !

ট্যাক্সিটা বেশ জোরেই চলছিল। গাড়ীর ঝাঁকানীতে ক্লান্ত মনটার সঙ্গে দেহের সংঘর্ষ লেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তার মেজাজ ! যত সে ভুলতে চেষ্টা করে ব্রজেশের অপমান তত যেন আগের দিনের সব পুরনো কাহিনী একটার পর একটা তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মত আঘাত করে তার মনে ! শুধু দুঃখ, শুধু দারিদ্র্য, শুধু দুর্ব্যবহার ছাড়া আর কিছু সে পায়নি স্বামীর কাছে বিবাহিত জীবনে প্রথম ছ'টি বছর। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে পর্দার ওপর যেমন সিনেমার ছবি ভেসে ওঠে তেমনিভাবে তার চোখের সামনে যেন এসে দাঁড়ায় সেইসব দিনগুলো—তার গরীব বাপ-মা কোন রকমে লোকের কাছে চেয়েচিন্তে তাকে স্কুলে পড়াতো। যে বছর সে ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে ঢাকার একটি স্কুলে, কোথা থেকে সে ব্রজেশের নজরে পড়ে গেল। তারপর শুরু হলো ব্রজেশের অযাচিত উপকার ! নিজে সেধে এসে তাকে পড়াতে উদ্যোগী হলো। একগাদা বইপত্তর কিনে দিলে, স্কুলের মাইনেও মাসকয়েক দিলে। তারপর তাকে পড়া বলে দেবার অজুহাতে বিনা বেতনের গৃহশিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে একদিন তাকে বিয়ে করার জন্যে ক্ষেপে উঠলো।

সুমিতা প্রথমটা তার সে প্রস্তাবে রাজী হয়নি। পরে বাপমায়ের অনুরোধে বাধ্য হয়েছিল মত দিতে। মা বললেন, ব্রজেশ বি. এ. পাশ, সদ্ ব্রাহ্মণের ছেলে, কত উঁচু ওদের বংশ—কি নাম ডাক দেশে ! বাপ বলেন, কলকাতায় কি একটা ভাল ব্যবসা করে ব্রজেশ, একটা পয়সা খরচা লাগবে না, উপরন্তু ব্রজেশের মরা মায়ের অনেকগুলো গহনাও সে পাবে—এমন সুপাত্র যখন ঈশ্বর জুটিয়ে দিয়েছেন তখন তাকে, হাতের লক্ষ্মী পায়ে করে ঠেলে দিলে পরে কাঁদতে হবে।

অতএব বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু কিছুদিন পরেই যখন সুমিতাকে নিয়ে ব্রজেশ কলকাতায় এলো তখন তার সমস্ত স্বপ্ন ভঙ্গ হলো !

হাজরা রোডের মোড়ে পুলিশের হাত তোলা দেখে হঠাৎ ট্যাক্সিটা যেই থামল, সঙ্গে সঙ্গে তার কল্পনায় ছেদ পড়ল। কিন্তু আবার গাড়ী চলা শুরু হতেই তার

মনও সক্রিয় হয়ে উঠলো। ব্রজেশ এবার তাকে নিয়ে এসে উঠলো অন্ধকার গলির মধ্যে, পুরনো একটা বাড়ীর একতলার একখানা ঘরে। সুমিতার সমস্ত মন বিদ্রোহ করে উঠলো। তার আগে পর্যন্ত সে জানতো যে, ব্রজেশ ধনীর সন্তান। কিন্তু ব্রজেশ কৈফিয়ৎ স্বরূপ বললে, ব্যবসায় দারুণ লোকসান হওয়ায় এই অবস্থায় এসে তাকে দাঁড়াতে হয়েছে। এরপর শুরু হলো গহনা বিক্রি! একে একে সুমিতার সব ক'খানা গহনা যখন খতম হয়ে গেল তখন জন্মালো সুকু—তার প্রথম সন্তান। দারুণ অভাব তখন চলেছে সংসারে, দু'বেলা পেট ভরে ভাতও জোটে না! ছেলের মুখের দিকে চেয়ে সুমিতা ভুলে গেল সব দুঃখ!

অনেক কষ্টে শেষে ব্রজেশ একটা চাকরি পেলে মার্চেন্ট অফিসে। মাইনে, মাত্র পঞ্চাশ টাকা। তারপর একটা ছেলেপড়ানো জোগাড় করে কোনরকমে দিনাতিপাত করতে লাগল। তিনবছর বাদে একটা মরা মেয়ে প্রসব করবার পর যখন সুমিতাকে ধরলো কঠিন রোগে, ব্রজেশ তাকে পাঠিয়ে দিলে দেশে—শরীর সারবার জন্যে। নোয়াখালি জেলার সোনাপোতা গ্রামে নারিকেল গাছে ঘেরা বাগান ও পুষ্করিণীর মধ্যে টিনের প্রকাণ্ড আটচালায় গিয়ে সুমিতা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো! ধীরে ধীরে তার দেহে যেন নতুন জীবনের সঞ্চার হলো। সে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠলো।

পরের বছর পুজোর সময় তার শ্বশুরবাড়ী ভরে উঠলো আত্মীয়-স্বজনে—শ্বশুর, দেওর, ভাশুর, পিসতুতো মামাতো দেওর ও ননদ কত। বারো বছর পরে এবার পুজোর পালা পড়েছে তাদের। কাজেই বাড়ী একেবারে লোকে লোকারণ্য।

পুজো শেষ হয়ে গেল। লোকজনও সবে দু'একজন করে বিদায় নিতে শুরু করেছে এমন সময় একদিন গভীর রাত্রে হারে-রে-রে-রে করে গুণ্ডারদল এসে তাদের বাড়ী ঘিরে ফেললে। তাদের সকলের হাতে—লাঠি, সড়কি, রামদা।

ভয়ে সবাই চীৎকার করে উঠলো। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে সে কান্না শুধু ব্যর্থ হলো না, আরো কলুষিত হয়ে গেল।

মশাল হাতে করে নরপিশাচরা বাড়ীর চৌহদ্দীর মধ্যে এসে দাবী করলো তাকে।

এর পরের কথা মনে পড়লে সুমিতার দেহের মধ্যে রক্ত টগবগ করে ফুটতে থাকে। তার শ্বশুর এসে তার হাত ধরে তুলে তাকে গুণ্ডাদের কাছে সমর্পণ করলেন। বাড়ীতে আরো যেসব মদ্দপুরুষরা ছিল তারা ভয়ে ভেড়ার মত কাঁপছে। কেউ মুখে টুঁশব্দটি পর্যন্ত করলে না। ব্রজেশের মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না। বুঝি ঘাড় হেঁট করে সে তখন নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিল। চীৎকার করে শুধু প্রতিবাদ জানিয়েছিল একমাত্র এই সুকু—তার দেহের রক্ত মাংসে গড়া প্রথম সন্তান। মাগো—মাগো—তুমি যেও না—

ঝরঝর করে সুমিতার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। রুমাল দিয়ে চোখটা

মুহুতে মুহুতে সে ভাবলে, যাক ওসব কথা আর চিন্তা করবে না কিছুতেই।

ট্যাক্সি থেকে বাঁদিকে মুখ ফেরালে সুমিতা। সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টিটা আকৃষ্ট হলো 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল'-এর ধবধবে সাদা গম্বুজটার দিকে। দূর থেকে নীল আকাশের গায়ে আঁকা ঠিক যেন একটা ছবির মত তার মনে হতে লাগল। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে রইল সেইদিকে।

ট্যাক্সিটা চলছিল দ্রুতগতিতে। একটু পরেই তার চোখের সামনে থেকে সেই দৃশ্যটা কোথায় মিলিয়ে গিয়ে তার স্থলে যখন আবার কতগুলো গাছপালা ও অট্টালিকার জটলা এসে পড়লো তখন গাড়ীর মধ্যে চোখটা ফিরিয়ে এনে সুমিতা আবার গদির ওপর এলিয়ে দিলে দেহটাকে।

কিন্তু আশ্চর্য, আবার সেই পুরনো দৃশ্য! সঙ্গে সঙ্গে তার মন ফিরে গেল আবার সেই অসমাপ্ত গল্পে! তারপর?

না-না, থাক—আর ওসব কথা ভাববে না সে কিছুতেই। বলে মনের সঙ্গে যতবার সে সংগ্রাম করে ততবারই পরাজিত হয়ে যেন ফিরে আসে আবার সেইখানে। সুমিতার চোখের সামনে আবার পুরনো ঘটনাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে! গুন্ডারা তাকে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকে। শেষে একদিন পালাবার সময় নদীর ধারের গভীর এক জঙ্গলের মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্যে লাগল বিবাদ। কার অধিকার তার ওপর সবচেয়ে বেশী! এই নিয়ে তর্ক থেকে একেবারে মারামারি কাটাকাটি। সে বীভৎসতা কল্পনা করা যায় না। ভয়ে চীৎকার করে উঠেছিল সুমিতা।

নারীকণ্ঠের সেই আর্তনাদ শুনে ছুটে এলো সেখানে এই গিয়াসুদ্দীন। সে তখন একটা মহাজনী নৌকোতে চামড়া বোঝাই করে ফিরছিল সেই নদী পথ দিয়ে। সে গুন্ডাদের হাত থেকে জোর-জবরদস্তি তাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায় নোয়াখালিতে এবং তাকে সেখানে আটকে রাখে তার নিজস্ব এক বাগান বাড়ীতে।

তারপরের দৃশ্য আরো ভয়ানক। গিয়াসুদ্দীন তার রূপে মুগ্ধ হয়ে যখন তাকে বিয়ে করতে চাইলে তখন তীব্র প্রতিবাদ জানালে, সুমিতা। বললে, তার আগে সে আত্মহত্যা করে মরবে।

গিয়াসুদ্দীন কড়া নজর রাখলে তার ওপর, তার লোকজন সর্বদা তাকে ঘিরে থাকতো, সে সুযোগ সে তাকে দেবে না কিছুতেই। সেও দৃঢ়পণ করে বসল। সেও তখনি মোল্লা ডাকতে পাঠাল তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলবে বলে।

সুমিতা তখন তার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে অনেক অনুনয় বিনয় করে কাঁদল। বললে আজ নয়—আমায় একটু ভেবে দেখবার জন্যে কয়েকটা দিন অন্ততঃ সময় দাও, তোমার পায়ে পড়ি—

গিয়াসুদ্দীন একটু ভেবে বলেছিল, বেশ কিন্তু কোন রকমে যদি জানতে পারি যে, তুমি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করছো বা অন্য কিছু মতলব আঁটছো তা হলে সেই মুহূর্তে মোল্লা ডেকে পাঠাবো মনে থাকে যেন!

এরপর আবার খাওয়া নিয়ে সুমিতা যখন বললে সে মুসলমানের হাতের ছোঁয়া খাবে না তখনো গিয়াসুদ্দীন জোর করলে না। বললে, বেশ আমার হিন্দু চাকর আছে—সে সব এনে নিয়ে দেবে তুমি পাক করে খেয়ো।

এইভাবে যখন দিন কাটছে তখন গোপনে সেই হিন্দু চাকরটাকে হাত করে একটা চিঠি পাঠালে সুমিতা ব্রজেশের কাছে। তাতে লিখলে শিগগির যেন সে লোকজন নিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বাড়ীতে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সে চিঠির জবাব ব্রজেশ যা দিলে তা পড়ে সুমিতার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। সে লিখলে, আমি সুযোগ পেলেই পুলিশে খবর পাঠাতে পারবো—তবে আমাদের সঙ্গে আর তোমার কোন সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। তোমার জাত গিয়েছে, তুমি মুসলমানের ঘর করছো। কাজেই আমাদের বাড়ীতে ঠাঁই পাবার আশা তোমার মন থেকে চিরকালের মত মুছে ফেলো।

চিঠিখানা পড়ে কিছুক্ষণ বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল সুমিতা। তারপর ঘরে খিল দিয়ে অনেক কান্নাকাটি করলে। সারারাত ধরে ভেবে আবার পরেরদিন আর একটা চিঠি তেমনিভাবে পাঠালে সে ব্রজেশের কাছে। এবার লিখলে ঘরে স্থান যদি না দাও অন্ততঃ বাড়ীতে একটা ঝি-চাকরের মতও আশ্রয় দিয়ো। তাহলেই আমি তোমার ও সুকুর সেবা-যত্ন করে বাকী জীবন সুখে কাটাতে পারবো। এর চেয়ে আর বেশী কিছু আমি তোমার কাছে চাইবো না, দিব্যি করে বলছি। আশা করি এটুকু ভিক্ষা দিতে তুমি কার্পণ্য করবে না।

সে চিঠির আরো নিষ্ঠুর জবাব দিয়েছিল ব্রজেশ—তোমার সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই, আশ্রয়ের কথা ছেড়ে দাও এমন কি আমাদের ভিটেতে ওঠবার পর্যন্ত তোমার আর কোন অধিকার নেই। কাজেই এ-বিষয়ে মনে কোন রকমের দুর্বলতা আর রেখো না। তাই রূঢ় হলেও স্পষ্ট ভাষায় তোমাকে এই কথাটা শোনাতে বাধ্য হলুম। জানি, এতে তুমি মনে খুব আঘাত পাবে—কিন্তু আমরা যে কুলীন ব্রাহ্মণ একথাটা ভুলে যেয়ো না।

চিঠিটা পড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে সুমিতা ঘরময় পাগলের মত পায়চারি করতে লাগল। তবে কিসের আশায় বেঁচে থাকা—কিসের জন্য জীবনধারণ—এই আমার ভবিষ্যৎ!

তারপর আবার মাথাটা ঠাণ্ডা করে ভাবতে লাগল তাহলে পুলিস এসে তাকে উদ্ধার করে কোথায় নিয়ে যাবে? কার কাছে নিয়ে গিয়ে রাখবে?

কথাটা নিয়ে মনে মনে অনেক তোলাপাড়া করলে সে। তাহলে পরিণাম কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে একটা নারী কল্যাণ আশ্রম তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো! চরকা কেটে, সুতো তৈরী করে, তাঁত বুনতে হবে—তার ওপর বাসন মাজা, রান্না করা এবং নানারকম শিল্প-কর্মের দ্বারা আশ্রমের আয় বৃদ্ধি করে তবে পেটের ভাতের সংস্থান করতে হবে। তাও একদিন বা দু'দিনের জন্য নয়—বছরের পর বছর—হয়ত বা সারাজীবন! নয়ত আশ্রমের মাধ্যমে এমন কোন সহৃদয় পুরুষ

হয়ত এসে জুটবে যে অনুগ্রহ করে তাকে বিবাহ করতে রাজী হবে—রামচরণ ধাড়া কিংবা গোবিন্দ মাইতি গোছের নাম তাঁর। তারপর খবরের কাগজে সেই ভদ্রলোকের মহানুভবতার জন্যে স্তুতিগান করে হয়ত একটা প্যারাও ছাপা হবে!

তারপর?

আর ভাবতে পারে না সুমিতা। তার মাথার মধ্যে যেন সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

সে তখন সেই ঘরের মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহীর মত গর্জন করতে করতে ভাবতে থাকে, কিন্তু কেন? কেন সে এ হীনতা মেনে নেবে? কার জন্যে? তার এ অবস্থার জন্য সে তো দায়ী নয়। এ তো তার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ নয়—যে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাকে এইভাবে সারাজীবন ধরে! এর জন্য যে সমাজ দায়ী, যে দেশ দায়ী, যে লোকেরা দায়ী, তাদের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। যারা অন্যায় করলে, তারা চোখ রাঙাবে, এর কোন প্রতিবিধান না করে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিব্যি থাকবে অথচ তাকে এইভাবে অপমানে ও হতশ্রদ্ধায় দিন কাটাতে হবে! না-না-না! অসম্ভব! এ অন্যায়কে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারবে না!

সুমিতা তার মনের সঙ্গে যখন এইভাবে লড়াই করছে, তখন একটা চাবুক হাতে করে ছুটে এলো ঘরে গিয়াসুদ্দীন। তারপর খুব জোরে ঘা কতক সুমিতার পিঠের ওপর সশব্দে বসিয়ে দিয়ে বললে, হারামজাদী শয়তানী, গোপনে পুলিশে খবর দিয়েছিস—দাঁড়া তোকে এর উপযুক্ত শাস্তি দিচ্ছি।

সুমিতা এবার কাঁদলো না বা তার পায়ে ধরে ক্ষমাও চাইলো না—শুধু হিংস্র ব্যাঘ্রিণীর মত ঘুরে দাঁড়ালো তার মুখোমুখি।

গিয়াসুদ্দিনের চোখ দুটো দিয়ে তখন আগুন ছিটকে পড়লো। সে বলে, কেন পুলিশকে জানিয়েছিস?

সুমিতা বলে, তোর মত দুশমনের হাত থেকে নিস্তার পাবো বলে।

পৈশাচিক অট্টহাস্যে সমস্ত ঘরখানাকে ভরিয়ে দিয়ে গিয়াসুদ্দীন বলে, নিস্তার পাবি বলে, আমার কাছ থেকে? কিন্তু পুলিশ আমার কি করবে—সেখানেও আমার চর আছে জানিস না বোধহয়, দাঁড়া শয়তানী এখনি তোকে পাঠিয়ে দেবো এমন জায়গায় যে পুলিশের বাবাও তা টের পাবে না!

সুমিতাও সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো কালনাগিনীর মত ফণা তুলে, তারপর অগ্নিবাণের মত চোখ দুটো তার মুখের ওপর বিঁধিয়ে দিয়ে বললে, তোর যা ইচ্ছা হয় করতে পারিস শয়তান, তবু আমি ধর্মত তোর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে যে সকল রকম চেষ্টা করেছি—এইটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা।

ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম—দাঁড়া শয়তানী তোর ধর্মের বড়াই আমি এখুনি ঘুচিয়ে দিচ্ছি। বলে দাঁতের ওপর দাঁত ঘষতে ঘষতে গিয়াসুদ্দীন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর তার সেই কোমল ও ভঙ্গুর দেহটাকে চিলের মত ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে আছড়ে ফেললে বিছানাটার ওপর। কিন্তু ইতিমধ্যে কখন যে সুমিতা অজ্ঞান

হয়ে পড়েছিল কামোন্মত্ত পশুটা তা জানতেও পারেনি। তাই পৈশাচিক উল্লাসে সুমিতাকে ধর্ষণ করতে যেই সে উদ্যত হলো অমনি তার মুদ্রিত চোখ, স্খলিত বেশ ও ঠাণ্ডা মূর্ছিত দেহটাকে দেখে সে আঁতকে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে মনে যেন তার কেমন একটা প্রতিক্রিয়া হলো। তাই থমকে দাঁড়িয়ে প্রথমে সে সুমিতার নগ্ন দেহটার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর ছুটে গিয়ে এক বদনা জল এনে তার মুখে-চোখে ঝাপ্টা দিতে দিতে বাতাস করতে লাগল।

একটু পরে চোখ চেয়েই সুমিতা যখন দেখলে যে, গিয়াসুদ্দীন তার পায়ের কাছে বসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছে তখন লাথি মেরে গিয়াসুদ্দীনের হাতটা সরিয়ে দিয়ে সুমিতা বললে, কাপুরুষ—বেইমান কাঁহাকা—দূর হয়ে যা।

গিয়াসুদ্দীনের পৌরুষে এ কথায় নিদারুণ আঘাত লাগে। সঙ্গে সঙ্গে তাই তার চোখ দুটো রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো। সে বললে, কেয়া, ম্যায় কাপুরুষ হুঁ! বেইমান হুঁ!

সুমিতা এবার আঘাতের ওপর আঘাত করলে। বললে, তারও অধম তুই! নরাধম, পাষণ্ড। তুই একটা জানোয়ার। তাই একটা মেয়েমানুষকে জবরদস্তি ধরে এনে, ঘরে বন্ধ ক'রে, তাকে চাবুক মেরে জখম ক'রে যে তার ধর্মনষ্ট করে সে আর যাই হোক মরদ নয়।

হাম মরদ্‌ভি নেহি! বলে গিয়াসুদ্দীন তার দীর্ঘ মোগলাই চেহারাটার দিকে একবার তাকালো।

সুমিতা এবার চরম কশাঘাত করলে। বললে, তুই জেনানারও অধম। তুম্‌ আওরৎ-কা-জুত্তিসেভি নীচে, বে-শরম, বেয়াকুব্‌, বেইমান!

একটু চুপ করে থেকে কি ভেবে শুধু নীচুসুরে গিয়াসুদ্দীন বললে, মুঝে মাফ করনা। তারপর একটু ইতস্তত করে তার কাছে সরে এসে অনুনয় করলে, খোদাকসম, আমি তোমার ধর্মনষ্ট করিনি বিশ্বাস করো। যেদিন মরদের মত, জোয়ান পুরুষ বান্দার মত তোমার মন জয় করতে পারবো সেদিনের অপেক্ষায় রইলুম। বলে ঘর থেকে যেন অপরাধীর মত ছুটে বেরিয়ে গেল। যেন কি একটা অন্যায় করতে গিয়ে বিবেকের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে।

কি কুক্ষণে কার মুখ দিয়ে কখন কোন্‌ কথা বার হয় এবং কার মনে তার প্রতিক্রিয়া কিভাবে হয় তা কে জানে!

পার্ক স্ট্রীট ছেড়ে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা মোটরের সঙ্গে ধাক্কা বাঁচাতে গিয়ে সুমিতার ট্যাক্সিটা থেমে যেতেই আবার তার চিন্তায় ছেদ পড়লো। সে মন থেকে সব মুছে ফেলবার জন্য রাস্তার দিকে চোখ ফেরাতেই দেখে, মোটরের যেন অরণ্য চারিপাশে। অফিসের ছুটির পর চৌরঙ্গির রাস্তায় যে এইরকম মোটরের ভীড় হয় সে ধারণা তার ছিল না। কারণ ইতিপূর্বে কোনদিন সে-দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য তো তার হয়নি! তাই তার মনে হতে লাগল যেন কলকাতার যেখানে যত মোটরগাড়ী আছে সব সেইসময় এক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে। মোটরগাড়ীর

যেন শোভাযাত্রা !

কিছুক্ষণ পরে আবার যেই সুমিতার ট্যাক্সিটা হর্ন বাজিয়ে চলতে শুরু করলে, আবার তার মন ঘুরেফিরে পূর্ব স্মৃতিতে ফিরে গেল। আজ তার মনে যেন কি হয়েছে। সবচেয়ে দুঃখের, সবচেয়ে অপমানের দিনগুলো যেন চোখের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে বলে, ভুলিনি আমরা কিছুই, তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।

এর পরের দৃশ্যটাকে সুমিতা পঞ্চম বা নাটকের শেষ দৃশ্য বলে মনে করে। এর স্থান লাহোর। গিয়াসুদ্দীনের নিজস্ব দেশ।

বনের পাখীর মত তাকে নিয়ে গিয়ে গিয়াসুদ্দীন খাঁচায় বন্ধ করে রেখে যেন পোষ মানাতে চায়! কবে পাখীর মুখে বোল ফুটবে আর তাই শুনে তার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করবে—তারই আশায় যেন দিনের পর দিন অপেক্ষা করে বসে থাকে গিয়াসুদ্দীন।

এদিকে সুমিতাও সদম্ভে তার নারীত্বের মর্যাদা রক্ষা করে চলে। এ যেন বাঘের সঙ্গে বাঘিনীর লড়াই!

সুমিতা লাহোরে গিয়ে যখন গিয়াসুদ্দীনের অন্ন গ্রহণ করতে নারাজ হলো তখন সে পড়লো মুস্কিলে। অনেক মাথা ঘামিয়ে গিয়াসুদ্দীন বললে, বেশ, আমি তোমায় একটা চাকরি দিচ্ছি, আমার কারখানার কর্মচারীদের বেতনের তালিকা তুমি মাসে মাসে তৈরী করে দিয়ো আর সেই কাজের জন্য যে বেতন পাবে তোমার সেই স্বোপার্জিত অর্থ দিয়ে তুমি তোমার গ্রাসাচ্ছাদন করো।

প্রস্তাবটা মন্দের ভালো। সুমিতাও তাতে রাজী হলো। কর্মচারীদের উপস্থিতির খাতা দেখে সে যোগবিয়োগ দিয়ে কার ক'টাকা মাইনে পাওনা প্রতিমাসে হিসাব করে দিতে লাগল। এর জন্যে প্রথমেই গিয়াসুদ্দীন তাকে পাঁচশ টাকা মাইনে দিতে চাইলে। কিন্তু সুমিতা বললে, অনুগ্রহ সে চায় না। তার অফিসে অন্য কর্মচারীকে এই কাজের জন্য যা মাইনে দিতো সেইটুকুই কেবলমাত্র তার প্রাপ্য বলে সে মনে করে।

তাই হলো। পঁচাত্তর টাকা মাহিনার চাকরি পেলে সুমিতা। তবে তাকে অফিসে যেতে হতো না। গিয়াসুদ্দীনের অট্টালিকার মধ্যে তার জন্যে যে কক্ষ নির্দিষ্ট ছিল তারই মধ্যে সুমিতা বসে কাজ করতো।

তার সেই কাজ পরিদর্শন করবার ছলে গিয়াসুদ্দীন মধ্যে মধ্যে শুধু সুমিতার কাছে এসে বসতো এবং নানারকম গল্প-গুজব করে যতটা পারতো সময় কাটিয়ে চলে যেতো। সুমিতাকে যত দেখে তত যেন তার প্রতি আকর্ষণ বাড়ে গিয়াসুদ্দীনের। তার কাজকর্ম, তার বুদ্ধি বিবেচনা, তার সূক্ষ্ম রুচিজ্ঞানের যত পরিচয় পেতে থাকে তত যেন মুগ্ধ হয়। সত্যি রূপে গুণে উজ্জ্বল এমন ঝকঝকে মেয়ে গিয়াসুদ্দীন আর কখনো দেখেনি। সে ধনী হতে পারে। কিন্তু চামড়ার ব্যবসায়ী। তার সমাজও তাই সেই রকম। বিকৃত রুচির কতকগুলো অশিক্ষিত মেয়ের বীভৎস মুখ যেন তাকে চারিপাশ থেকে ঘিরে ধরে। তাই তার

মনের দুর্বলতা এক-একদিন চেপে রাখতে সে পারতো না। হঠাৎ বলে বসতো, আমিনা, তুমি কি সত্যি আমায় কোনদিন গ্রহণ করতে পারবে না ?

না। বলে স্পষ্টভাষায় সে তার উত্তর দিয়ে দিতো।

গিয়াসুদ্দীনের মনে এতে বড় আঘাত লাগে। সময় সময় সে আঘাতে তার সমস্ত পশুবৃত্তিগুলো একসঙ্গে জেগে উঠত। সে ভাবতো জোর করে তখনি সুমিতার সেই অহঙ্কার চূর্ণ করে দেয়, সে তাকে গ্রহণ করে কি না দেখে! কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে মনকে শাসন করে প্রতিনিবৃত্ত করতো। তার ওই কঠিন প্রকৃতির মধ্যে কোথায় যেন একটা ভদ্র মন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাই সুমিতা যেন তার চোখে কেমন একটা মোহের সৃষ্টি করেছিল। তার মনটাকে সম্পূর্ণভাবে না পেলে যে সুমিতার কিছুই পাওয়া হবে না, তা গিয়াসুদ্দীন বোধ করি কেমন করে যেন বুঝতে পেরেছিল। সেইজন্য সে অপেক্ষা করছিল সেই বিশেষ দিনটির, যেদিন তার মনের পাপড়ি ফুলের মত আপনা-আপনি রূপে, রসে, গন্ধে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে।

অবশ্য গিয়াসুদ্দীনের মনের এই ক্রমপরিবর্তন লক্ষ্য করে সুমিতা। যেমন আত্মপ্রসাদ লাভ করতো তেমনি সে বেচারীর জন্যে একটু অনুকম্পাও তার মনের মধ্যে দেখা দিত।

এইভাবে পুরো একবছর কেটে যাবার পর একদিন গিয়াসুদ্দীন এসে তাকে বললে, তোমার জন্যে আমার কোম্পানীর এবার তিন ডবল লাভ হয়েছে! তুমি আমার 'লাকি স্টার'!

সুমিতা বললে, মিথ্যে কথা। ওটা আমার মনকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করার একটা ছলমাত্র!

গিয়াসুদ্দিন তার কাছে দিব্যি গেলে বললে, খোদাকশম আমি খাতাপত্তর সব তোমাকে দেখাতে পারি! যেদিন থেকে তুমি আমার এখানে এসেছো সেইদিন থেকেই মোটা মোটা অর্ডার আসতে আরম্ভ হয়েছে।

একটু থেমে সুমিতা তখন বললে, তাই নাকি! তাহলে আমার এর জন্যে কমিশন পাওয়া উচিত ?

নিশ্চয়ই পাবে! আমি তেমন বেইমান নই! বলতে বলতে গিয়াসুদ্দীন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এর কয়েকদিন পরে গিয়াসুদ্দীনের ব্যবসা দশম বর্ষে পদার্পণ করলে একটা বিরাট উৎসবের আয়োজন করলো। সারাদিন ধরে নৃত্য-গীত, জলসা ও খানাপিনা চললো। ভারতের বহু বিখ্যাত গায়ক-গায়িকার ও নৃত্যশিল্পীর সমাবেশে সে উৎসব এক মহা-সমারোহে পরিণত হলো। সারা লাহোরবাসীর মুখে সেদিন কেবল ওই এক কথা!

সহরের প্রান্তে ইতিমধ্যে কখন যে গিয়াসুদ্দীন লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটা বিরাট বাগানবাড়ী তৈরী করেছিল সে কথা সুমিতা জানতো না। উৎসবটা হচ্ছিল

সেইখানে। তাই নবনির্মিত উদ্যানবাটিকার মধ্যে পা দিয়ে সুমিতা মুগ্ধ হয়ে গেল। জয়পুরী মার্বেলের প্রাসাদ, তার চারিদিকে কত ফুলের বাগিচা, কত ফোয়ারা, পাথরের মূর্তি, কত লালরঙের পাথর-বাঁধানো পথ, ঘুরে ফিরে যেন তাকে প্রদক্ষিণ করছে।

প্রাসাদের মধ্যে ঢুকেই সামনে যে বিরাট হলটা ফুলে লতায় পাতায় সুসজ্জিত রেইখানে বসেছে জলসা। আয়োজন সব প্রস্তুত। শ্রোতা ও গায়ক, বাদক সব যেন উৎকণ্ঠিত আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল শুধু কার মুখের হুকুমের।

তিনতলার সর্বাপেক্ষা যেটা সুন্দর ঘর—মূল্যবান আসবাবপত্রে ঝলমল করছিল তার মধ্যে সুমিতাকে নিয়ে গিয়ে গিয়াসুদ্দীন প্রথমে বসালে। সে ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে সুমিতার মাথা যেন ঝিমঝিম করতে লাগল। ধনীর এ-রকম সুসজ্জিত কক্ষ তার জীবনে সে আর কখনো চোখে দেখেনি—তবে উপন্যাসে, গল্পে এ-রকম বর্ণনা পড়েছিল অনেক !

গিয়াসুদ্দীন একটু পরে আবার তাকে সেই ঘরের ভিতরের দিকে অথচ হলের ওপরে ঝোলানো শ্বেতপাথরের তৈরী জাফরিকাটা বারান্দাটায় নিয়ে গেল। সেখানে সিংহাসনের মত মখমলের একটা চেয়ার পাতা ছিল, তার চারিদিকে কারুকার্য করা নানারঙের পর্দা ঝুলছিল—সেখান থেকে জলসা সুন্দরভাবে দেখা যায়। সুমিতাকে সেখানে বসিয়ে দিয়ে গিয়াসুদ্দীন নীচে চলে গেল।

কিন্তু যেমন সুমিতা সেই সিংহাসনের ওপর বসলো অমনি সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো জলসা। সবাই যেন সুমিতার এই মূল্যবান উপস্থিতির জন্যে অপেক্ষা করেছিল ! এ-কথাটা যখন সে নিজে বুঝতে পারলে তখন যেন নিজের কাছেই কেমন লজ্জিত হয়ে পড়লো। অবশ্য এই সঙ্গে আবার সে ঈষৎ গর্বও অনুভব না করে পারলে না।

এদিকে সুমিতা বসবার পরই কয়েকজন পরিচারিকা এসে তার সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতে লাগল।

জলসা শেষ হতেই শুরু হলো খানাপিনা ! নিমন্ত্রিত, অতিথি-অভ্যাগতরা সব যখন একে একে বিদায় হলো তখন রাত অনেক হয়েছে। সেই বিরাট অট্টালিকার শূন্য ঘরগুলোতে তখনো যেন নৃত্যগীতের শেষ অনুরণন লেগে রয়েছে। সুমিতা বসেছিল সেই সর্বাপেক্ষা সুসজ্জিত কক্ষটায়। হঠাৎ দরজার ভারী মখমলের পর্দাটা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল গিয়াসুদ্দীন।

তাকে দেখেই সুমিতা উঠে দাঁড়ালো। তারপর বললে, অনেক রাত হয়েছে এবার আমার যাবার ব্যবস্থা করো। গাড়ী কি এসেছে ?

গিয়াসুদ্দীন একটু চুপ করে থেকে বললে, কোথায় যাবে ?

কেন, আমার ঘরে ?

গিয়াসুদ্দীন তার আরো একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, যদি বলি এইটাই তোমার ঘর !

চমকে উঠলো যেন সুমিতা। এটা তার কাছে একটা অবিশ্বাস্য এবং কল্পনার চেয়েও যেন অলীক বলে মনে হতে লাগল। তাই একথার কি জবাব দেবে যখন সে চিন্তা করছে, তখন দেওয়ালের পাশে সরে গিয়ে চট করে একটা আলমারী থেকে গোল করে পাকানো কতকগুলো লম্বা কাগজ তার চোখের সামনে মেলে ধরলে গিয়াসুদ্দীন। তারপর আঙ্গুল দিয়ে সুমিতার নামের জায়গাটা দেখিয়ে বললে, এই দেখো দলিল, এই দেখো তোমার নাম। তারপর আরো একটা নীল-রঙের গোটানো কাগজ দেখিয়ে বললে, এটা তোমার বাড়ী ও বাগানের প্ল্যান, এই নাও।

সুমিতা যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। হঠাৎ জেগে উঠে বললে, না-না—এ আমি নেবো না—এ হয় না—এ হতে পারে না! তার বুকের মধ্যেটা কাঁপতে থাকে থরথর করে।

কেন হয় না আমিনা? এটা যে তোমার প্রাপ্য কমিশন! তোমার সেই এক লক্ষ টাকা দিয়েই আমি এটা তৈরী করে দিয়েছি। তাই তোমার জিনিষ তোমার হাতে সমর্পণ করে দিলুম। আজ থেকে তুমি এখানেই থাকবে—এটা তোমার নিজের মহল। এ নিজস্ব সম্পত্তি, তোমার দাসদাসী সব রইলো এখানে।

এর পর একটু চুপ করে থেকে গলার স্বর নামিয়ে এনে সে বললে, আচ্ছা আদাব্—আমি তাহলে চল্লুম।

বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর বারান্দা পেরিয়ে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নীচে নামতে লাগল।

সুমিতার চোখের সামনে যেন কোন নাটকের অভিনয় হচ্ছিল, আর সে মুগ্ধ হয়ে তাই দেখছিল। গিয়াসুদ্দীন চলে যাবার পরও কয়েক মুহূর্ত সে তেমনি আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হঠাৎ যখন তার সম্বিত ফিরে এলো তখন সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সিঁড়ির ওপর থেকে গিয়াসুদ্দীনকে ডাকলে, শোনো?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো গিয়াসুদ্দীন। তারপর আস্তে আস্তে যখন সে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো, তখন সুমিতা তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

গিয়াসুদ্দীন বললে, কেন, আমার মহল্লায়।

আর আমি বুঝি এখানে একলা থাকবো!

এ যে তোমার নিজের অন্তঃপুর পিয়ারী!

সেইজন্যে—আমি তোমায় যেতে দেবো না—এখান থেকে। এই বলে তার হাতটা চেপে ধরে সুমিতা বললে, আজ থেকে তোমার স্থানও আমার এই মহলে!

সাচ্! সত্যি! বলে কিছুক্ষণ অপলকদৃষ্টিতে সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে গিয়াসুদ্দীন

ব্রজেশের কাছ থেকে অপমানিত হবার পর থেকে যত ঘুরে ফিরে সেই পুরনো কথাগুলো মনে পড়ে তত যেন সুমিতার বিবেক বলে ব্রজেশের তুলনায় অনেক ভাল, অনেক ভদ্র গিয়াসুদ্দীন।

ট্যাক্সিটা এসে হোটেলের দরজায় থামতেই, চট করে সুমিতার মন থেকে সব যেন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়!

চার

ওদিকে মুস্কিল হলো সুকুমারের।

খেয়ে, ঘুমিয়ে, খেলা করে, স্কুলে গিয়ে কোন কিছুতেই যেন আর সে শান্তি পায় না। কেবলি তার মনে পড়ে, অত্যাশ্চর্য সুন্দর অথচ ক্রন্দনরতা একখানা মুখকে! এমন সুন্দরী সে তো জীবনে আর কখনো দেখেনি। তবে কে সে? অমন লক্ষ্মী-প্রতিমার মত মূর্তি যার সে কেন তাকে এত আদর করতে এলো? কেন তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তার সর্বাঙ্গ অমন করে চুমুতে ভরিয়ে দিলে! তবে সে কি তাকে চেনে? তার কেউ হয়? নইলে তাকে আদর করতে গিয়েই বা অমনভাবে কাঁদতে লাগল কেন?

এই রকম নানা প্রশ্ন দিবারাত্র সেই বারো বছরের কিশোর বালকের মনকে যেন কেমন বিভ্রান্ত করে তোলে! জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যতদূর তার মনে পড়ে তার জীবনে আর কেউ তো তাকে এভাবে কখনো ভালবাসেনি! তবে সে কে? কোন স্বর্গের দেবী! যদি এসে তাকে ভালবাসলে—তবে আবার ফেলে দিয়ে তখনি চলে গেল কেন? আর তার জন্যে তার বাবাই বা রেগে গিয়ে তাকে এত প্রহার করলেন কেন?

সকল কাজের মধ্যে ঘুরে ফিরে কেবল সেই চিন্তাটাই যেন তাকে পেয়ে বসে! যেখানে যায় তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে সেই মমতাময়ী একটি মুখ! কে—কে—সে?

তার পরিচয় না জানা পর্যন্ত কিছুতেই যেন সুস্থির হতে পারে না সুকুমার। সে যদি তার আপনজন হয় তবে অমন করে তাকে ফেলে পালিয়ে গেল কেন? আর যদি আপন জন না হয়—তা হলেই বা এত লোক থাকতে তাকে এত ভালবাসতে যাবে কেন?

সংশয়ক্ষুব্ধচিত্তে একদিন দুপুরবেলা সে স্কুল পালিয়ে অঞ্জলির বাড়িতে এসে হাজির হলো। অঞ্জলি তখন সবে কোলের ছেলেটাকে ঘুম পাড়িয়ে নিজে চোখ বুজতে যাচ্ছে, এমন সময় তার কানে গেল সেই অতিপরিচিত ভীরুকণ্ঠের ডাক —'সইমা'।

ধড়মড় করে উঠে বসে অঞ্জলি বলে, কে রে, সুকু ? আয় বাবা ভেতরে। এই দুপুর রোদ্দুরে এতটা পথ হেঁটে এসেছিস তো ? বলে তাড়াতাড়ি হাত পাখাটা নিয়ে তাকে বাতাস দিতে দিতে বললে, কেন আবার আমার এখানে এলি বাবা, তোর বাপ-মা জানতে পারলে মেরে শেষ করে দেবে যে ! চলে যা শিগ্গির !

তা দিকগে সইমা, আমি কোন মারকে ভয় করি না ! বলে একটু ইতস্ততঃ করে সে অঞ্জলির কোলের কাছে আরো একটু ঘেঁষে বসতে বসতে বললে, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, সত্যি বলবে সইমা ? তার গলাটা যেন ভারী হয়ে এলো।

ও মা, ছেলের কথা শোনো। আমি যে তোর মায়ের মতন, আমি কি কখনো মিথ্যে কথা বলতে পারি বাবা তোকে ! বল না, কি বলতে চাস ? লজ্জা কি !

সুকুমার এইবার আস্তে আস্তে বলল, সেদিন যে আমায় এত আদর করেছিল, সে কে সইমা ? শেষের কথাটা বলতে গিয়ে তার চোখে জল এসে পড়ে, তাড়াতাড়ি বুঝি তাকে সামলে নেয় সুকুমার।

একটুখানি চুপ করে থেকে তার মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে অঞ্জলি বলে, ও কথা আজ থাক, সে পরে একসময় বলবোখন বাবা !

না-না—পরে নয়, পরে নয় সইমা, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি—আমায় এখুনি বলো—আমায় জানতে দাও, সে আমার কে—তা না হলে আমি মারা যাবো ! আজ পনেরো দিন ধরে আমি খেতে পারি না, ঘুমুতে পারি না—যখন যেখানে যাই সেই মুখখানা যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে ! কে সে—কেন আমি তাকে ভুলতে পাচ্ছি না কিছুতেই—বলো সইমা, শিগ্গির।

অঞ্জলি একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলে। তারপর বললে, না বাবা আমি তা বলতে পারবো না, আমায় জিজ্ঞেস করিসনি !

অভিমানে কণ্ঠ বুজে আসে সুকুমারের। বলে, সইমা তুমি যতক্ষণ না বলবে আমি কিছুতেই এখান থেকে উঠবো না।

ওকথা বলতে নেই, শিগ্গির বাড়ী যা—দেরী হলে তোর মা কত বকবে লক্ষ্মী বাবা আমার, সোনা আমার—আচ্ছা, আজ থাক, আর একদিন আসিস বলবোখন।

আর একদিন নয়, আর এক মুহূর্তও তর সইছে না আমার—আজ আমাকে বলতেই হবে—তা না হলে তোমার পায়ে আমি মাথা খুঁড়ে মরবো সইমা !

অঞ্জলি স্থির ও অপলক দৃষ্টিতে সুকুমারের মুখের ওপর তাকিয়ে ছিল। সুকুমারের সেই কথাগুলো শুনে তার চোখের কোলে জল এসে পড়েছিল কিন্তু সে-জল লুকোবার চেষ্টা করতেই যেমন তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো অমনি মুখে একটুখানি হাসি টেনে এনে বললে, আচ্ছা সুকু, মনে কর ওই যদি তোর মা হয় !

কি ! কি বললে ? সইমা ? সুকুমারের সামনে যেন বজ্রপাত হলো। জড়ের মত কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে সে শুধু মাথা নেড়ে বললে, না,

না, মিথ্যে কথা তা হতে পারে না, আমার মা তো কবে মরে গিয়েছে।

যদি বলি সে মরে যায়নি বাবা— হারিয়ে গিয়েছিল। আমরা তাকে খুঁজে পাইনি বলে ভেবেছিলাম মরে গিয়েছে !

এবার আর কান্না চেপে রাখতে পারলে না সুকুমার ! অঞ্জলির কোলের মধ্যে মুখটা গুঁজে ডুকরে ডুকরে—ফুলে ফুলে সে কাঁদতে লাগল। সেও যত কাঁদে অঞ্জলিও তত কাঁদে। তারপর এক সময় চোখের জল মুছে মুখটা তুলে সুকুমার অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, আমার মা কোথায়, আমি তার কাছে যাবো সইমা—আমি এখানে আর থাকবো না। নতুন মা আমায় পেট ভরে খেতে দেয় না, ভাল জামা পরতে দেয় না, কেবল বাড়ীর কাজ করায়, আর না করলে, কি রকম মারে। এই দ্যাখো না কাল স্কুল থেকে এসে খেতে চেয়েছিলুম বলে, কি রকম মেরেছে। বলে গায়ের ময়লা শার্টটা তুলে দেখালে।

সেই কচি কোমল নধর পিঠের ওপর বেতের দাগ তখনো লাল হয়ে আছে দেখে শিউরে উঠলো অঞ্জলি। তারপর আপন মনে অভিসম্পাত দিয়ে উঠলো তার সৎমায়ের উদ্দেশে, উঃ কি পাষাণী রে—এতটুকু দয়া-মায়া নেই সেই চামারনীর প্রাণে।

আমি আর বাড়ী যাবো না সইমা—আমাকে আমার মার কাছে পাঠিয়ে দাও তুমি—নয়ত বলো কোথায় মা থাকে—আমি এখুনি চলে যাবো সেখানে !

সে যে অনেক দূরে বাবা—তিন দিন লাগে গাড়ী করে যেতে সেখানে।

সে কোথায় ? যদি দশ দিনও লাগে, তবু আমি সেখানে চলে যেতে পারবো ! আমার মা যেখানে আছে আমি যাবো সেখানে—তুমি আমায় শুধু গাড়ীতে তুলে দিয়ে এসো—আমি আর বাড়ীতে ফিরবো না। বাবা, নতুন মা সবাই কেবল আমায় মারে। বলে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

অঞ্জলি একটা দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করে বললে, সুকু তুই এখন বড় হয়েছিস, সব কথা বুঝতে পারবি। এই পর্যন্ত বলে একটু থেমে আবার তাকে এইভাবে বলতে শুরু করলে, তুই যে তার কাছে যাবি বলছিস, সে তো এখানে থাকে না—লাহোরে থাকে।

সুকু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, আমিও লাহোর যাবো, সইমা।

অঞ্জলি বললে, সেখানে গেলেই তো হবে না বাবা—তোর মা সেখানে এক মুসলমানের বাড়ীতে থাকে, তার এখন জাত গিয়েছে, আমাদের সমাজে তাই তার স্থান নেই। সেইজন্য তোর মা সেই মুসলমানের দেশে চলে গিয়েছে আমাদের সকলকে ছেড়ে। তার কাছে কি যেতে আছে বাবা ? তুই যে ব্রাহ্মণের ছেলে—দুদিন পরে তোর পৈতে হবে !

সুকুমার একটুও চিন্তা না করে বলে উঠলো, আমি ব্রাহ্মণ হতে চাই না—আমি পৈতেও চাই না—আমার মায়ের যদি জাত গিয়ে থাকে তো আমি তার ছেলে—আমারও জাত গিয়েছে সইমা। আমাকে তুমি সেখানে পাঠিয়ে দাও। আমি মার

কাছে যাবো। এত সুন্দর মা, এত ভাল মাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই এখানে থাকতে পারবো না। বলে সে আবার কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে অঞ্জলি বললে, তার ঠিকানা তো আমি জানি নারে—শুধু ওইটুকুই জানি যে, সে থাকে লাহোরে। তারপর তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে চুপি চুপি বললে, এসব কথা কেউ যেন না জানতে পারে বাবা, কাউকে তুই বলিসনি যেন। তোর নূতন মাকে তো নয়ই, এমন কি তোর বাবাকেও নয় - বুঝেছিস ?

কাউকে যে সে বলবে না—এ কথাটা জানিয়ে অগত্যা সেদিন সুকুমারকে বাসায় ফিরতে হলো।

পাঁচ

ওদিকে হলো কি, এখান থেকে ফিরে গিয়েও সুমিতার মনে শান্তি নেই। কেবলি ঘুরে ফিরে সুকুর কথাটা তার মনে পড়ে যায়। আহা! বাছার আমার কি কষ্ট! মনে করতে গেলেই অজ্ঞাতে তার চোখে জল এসে পড়ে। একটা কথা কিন্তু সুমিতা কিছুতেই ভেবে পায় না যে, সৎমা না হয় পরের ছেলেকে পীড়ন করতে পারে কিন্তু বাপ হয়ে ব্রজেশবাবু কোন্ প্রাণে তা সহ্য করে! ওই দুধের বাচ্চা অতটুকু ছেলেকে, নিজের হাতে কি প্রহারটাই না করলে সেদিন তার সামনে? তার কাছে সুকুমার যেমন নিজের ছেলে—প্রথম সন্তান, ব্রজেশবাবুর কাছেও তো তাই। তবে সে যদি আজো তাকে ভুলতে না পেরে থাকে, ব্রজেশবাবু বাপ হয়ে কি করে এই রকম দুর্ব্যবহার করে সুকুর সঙ্গে! সুমিতা ভাবে, আমার ওপর রাগ হতে পারে, অভিমানও হতে পারে কিন্তু ছেলেটার কি অপরাধ! এই সব যত চিন্তা করে তত ব্রজেশবাবুর ওপর তার সমস্ত রাগ যেন একসঙ্গে গিয়ে জমা হয়। সত্যি, এত চামার, এত নিষ্ঠুর মানুষ যে হতে পারে তা সে চোখে না দেখলে হয়ত কোনদিন বিশ্বাস করতে পারত না।

সুমিতা প্রায়ই এমনি সব কত কি চিন্তা করে।

একদিন বিকেলে তার ঘরের সামনে জাফরিকাটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে চেয়ে ছিল পশ্চিম আকাশের দিকে। মৃত সূর্যের শেষ চিতা তখনো নেভেনি। তখনো নির্বাপিতপ্রায় বহ্নির রক্তিম আভাটুকু বুঝি মিলোয়নি। তার অন্তিম আলোতে যেন সারা আকাশটা কেমন ম্লান ও থমথম করছিল।

নিঃশব্দে কখন যে গিয়াসুদ্দীন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল সুমিতা জানতেই পারেনি। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একসময় বলে উঠলো, কি এত ভাবছো আমিনা এখানে দাঁড়িয়ে?

চমকে উঠলো সুমিতা তার এই ডাকে। তারপর পিছন ফিরবার আগেই যখন

খিল খিল করে হেসে উঠলো তখন তার বাঁ হাতটা টেনে নিয়ে গিয়াসুদ্দীন তার তর্জনীতে পরা বহুমূল্য হীরার আংটিটা আঙ্গুলে করে ঘোরাতে লাগল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, আজকে সেতার বাজাচ্ছো না তো? আমি যে তাড়াতাড়ি কারখানা থেকে পালিয়ে এলুম শুনবো বলে।

আজ আমার মনটা ভাল ছিল না। আমিনা বললে।

আচ্ছা তবে থাক, তোমার মন যখন ভাল নেই!

আমিনা বলে, না তা কি হয়—আজ তুমি সকাল সকাল এলে আমার সেতার শুনবে বলে?

আমিনা ঘর থেকে তাড়াতাড়ি সেতারটা নিয়ে এসে সেইখানে মখমলের কার্পেটটার ওপর বসে পড়লো। তারপর তারে তারে এক অত্যাশ্চর্য রাগিণীর ঝঙ্কার তুললে।

কিন্তু সে সুর এত মধুর ও এত করুণ যে গিয়াসুদ্দীন তা যেন সহ্য করতে পারলে না। সে ধীরে ধীরে বললে, মেরী জান, দুস্‌রী কোঈ রাগ্‌নী ছোড়িয়ে জিস্‌কী তানসে দিল্‌ খুশ্‌ হো যায়।

আমিনা তখন একটা আসোয়ারী সুর ধরলে।

ইতিমধ্যে সুমিতা অঞ্জলিকে একটা চিঠি দিয়েছিল সুকুর সম্বন্ধে সমস্ত কৌতূহল প্রকাশ করে।

কিছুদিন পরে অঞ্জলির কাছ থেকে তার জবাব এলো, তাতে সে সুকুর কথাই সব বিস্তারিত করে লিখেছে। পড়তে পড়তে কেবল সুমিতার চোখের কোলে জল উপচে পড়ছিল। লেখা ঝাপসা হয়ে আসছিল।

তবু চিঠিখানা একসঙ্গে বার তিনেক পড়ে শেষ করে সুমিতা সেটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলে। তারপর বালিশে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বিছানায় পড়ে রইল।

একটু পরে নবাবজান, তার বোন আনারকলির সঙ্গে লুকোচুরি খেলা করতে করতে ছুটে এসে সেই ঘরের খাটের নীচে লুকলো। কিন্তু মাকে অত বেলা পর্যন্ত ওই ভাবে চুপচাপ শুয়ে পড়ে থাকতে দেখে নবাবজানের মনে কেমন যেন ভয় হয়। তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে সুমিতার পায়ে হাত দিয়ে সে ডাকলে, আম্মা, তোমার কি হয়েছে—তবিয়ৎ কি আচ্ছা নেই?

ছেলের ডাক কানে যেতেই তার গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো। সে গায়ের পিরানটার বোতামগুলো আঁটতে আঁটতে উঠে বসলো বিছানায়। তারপর নবাবজানের মাথায় হাত দিয়ে চুলগুলো পিছনে সরিয়ে দিতে দিতে বললে, নেহি মেরী লাল, তবিয়ৎ মেরী অচ্ছি হ্যায়।

ছেলেটা তখনি আবার এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবার আরো বেশী করে সুকুকে মনে পড়তে থাকে সুমিতার। আহা, বেচারা এখন কি করছে

কে জানে! হয়ত সৎমা তাকে কত প্রহার করছে! নয়ত তার কথা ভেবে কত চোখের জল ফেলছে। কঠিন ভঙ্গীতে অনেকক্ষণ বসে থাকে সুমিতা। যেন ছেলের এই নির্যাতনের সব ব্যথাটুকু তার বুকে শেলাঘাত করে। অনেক ভেবে সেইদিনই সন্ধ্যার পর কাগজ কলম টেনে নিয়ে অঞ্জলিকে চিঠি লিখতে বসলো সুমিতা। দীর্ঘ চিঠি—শুধু সুকুর জন্য উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় ভরা। তার প্রতিটি অক্ষর যেন জমাট অশ্রু দিয়ে লেখা। প্রথমে ব্রজেশবাবুর নিষ্ঠুর ও নির্দয় ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিস্তর বিষ উদ্গার করে তারপর আসল কথাটা লিখেছে। বেশ স্পষ্ট ভাষায় এটা জানিয়েছে যে, সুকু তার কাছে আসার চিন্তা যেন একেবারে মনে ঠাঁই না দেয়। কারণ ইঙ্গিতেও গিয়াসুদ্দীন যদি জানতে পারে যে, এখনো সে ভুলতে পারেনি তাকে বা তার আগেকার জীবনের সঙ্গে এখনো রয়েছে সম্পর্ক তা হলে তার পক্ষে বেঁচে থাকাই একরকম অসম্ভব হয়ে উঠবে। তার এ স্বামী এমনি খুব ভাল মানুষ। কিন্তু ভারী বদরাগী। বিশেষ করে যেখানে তাঁর অগাধ বিশ্বাস তার ওপর। তাতে যদি এতটুকু সন্দেহের ছোঁয়াচ লাগে কোথাও তাহলে তার পরিণাম যে কী ভীষণ হবে তার পক্ষে তা লিখে জানানো শক্ত! সে তাই বার বার করে তাকে নিষেধ করেছে, ভাই অঞ্জু, আমার ঠিকানা যেন কোনমতেই আর কেউ জানতে না পারে, একমাত্র তোর কাছেই এটা গোপন রাখিস। হ্যাঁ, আর একটা কথা। সুকু আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তার জন্যে যেমন আমার দুর্ভাবনার অন্ত নেই, তেমনি তার ওপর আমার অগাধ আশা! সে যেন লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হয়। সেদিকে তোকে একটু নজর রাখতে হবে ভাই। আমার আর কে আছে তুই ছাড়া। আমি আজই তোমার নামে পাঁচশ টাকা পাঠাচ্ছি, এটা দিয়ে ওর একটা ভাল মাষ্টার রাখিস, আর ওর জন্যে ভাল খাবারের বন্দোবস্ত করে দিস। আর হ্যাঁ, বেশী চিঠি আমায় লিখিসনি। খুব বেশী জরুরী কথা না থাকলে লিখবি না ভাই, মনে রাখিস! বেঁচে থাকি তো দেখা আবার হবেই।

সেইদিন গভীর রাত্রে সুকুকে স্বপ্ন দেখে এমনভাবে কেঁদে উঠলো সুমিতা যে, গিয়াসুদ্দীনের ঘুম ভেঙে গেল। সে তাড়াতাড়ি তার গায়ে হাত দিয়ে তাকে জাগিয়ে দিলে, আমিনা, তুমি কি স্বপ্ন দেখছো?

আলুথালু বেশে বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসে আমিনা বলে, হ্যাঁ, কতসব আজে বাজে স্বপ্ন যে দেখছিলুম—ওঃ বড্ড ভয় করছে। কি রকম যেন মাথার মধ্যে করছে!

গিয়াসুদ্দীন বললে, "সুকু-সুকু বলে" ভয়ানক কাঁদছিলে? সুকু কে?

তাই নাকি? যেন কিছুই জানে না। এমনিভাবে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, কি জানি—স্বপ্নের মধ্যে কাকে কি বলে যে ডেকেছি।

প্রথম প্রথম এই রকম স্বপ্ন যখন তখন দেখতো সুমিতা। অধিকাংশ দিন

ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠতো। তারপর নবাবজান ও আনারকলি হবার পর সেটা কমতে কমতে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। তাই 'ও কিছু নয়' বলে একটা গভীর নিশ্বাস ফেলে আমিনা আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো এবং ঘুমন্ত পুত্র নবাবজানকে টেনে নিলে বুকের মধ্যে।

এই দেখে গিয়াসুদ্দীনও চুপ করে গেল। আর কথা না বাড়িয়ে আমিনার গায়ে মাথায় সোহাগভরা হাত বুলিয়ে দিতে দিতে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

ছয়

এদিকে চিঠি ও টাকা পেয়ে সুমিতার কথামত ব্যবস্থা করতে অঞ্জলি উঠে পড়ে লাগে!

কিন্তু মায়ের কাছে যাওয়া সম্ভব নয় শুনে সুকু বেঁকে বসে। খুব কান্না-কাটি করে। অজলি তাকে অনেক বোঝায়। সুমিতা তাকে বার বার নিষেধ করে দিয়েছে তার ঠিকানা কাউকে না বলতে তাই অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে অবশেষে অঞ্জলি সুকুমারকে শান্ত করে। বলে, আবার তোর মা যখন আসবে তখন তোর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করবে কিন্তু তার আগে তোকে ভাল করে লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হতে হবে, যাতে তোর মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়! তাহলে সে এসে কত ভালবাসবে তোকে?

মা আসবে শুনে দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। ডুকরে কেঁদে সুকুমার বলে, কবে, কবে সইমা, আসবে আমার মা! বলে যেন একেবারে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

আবার সে যেদিন আসবে, তোর কাছে আমি তাকে নিয়ে যাব বাবা। এখন তুই মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া শেখ, তোর মার ইচ্ছে তুই খুব বিদ্বান হবি, খুব লেখাপড়া শিখবি—সবাই কত মান্য করবে তোকে।

সুকু বলে, আমাকে যে কেউ পড়া বলে দেয় না, আমি আপনি-আপনি পড়ি তাই তো ভাল রেজাল্ট করতে পারি না।

অঞ্জলি বলে, আচ্ছা আমি এখন থেকে সব ব্যবস্থা করবো। তোদের ইস্কুলের হেডমাণ্টারের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করেছি সামনের মাস থেকে তিনি তোকে ছুটির পর একঘণ্টা করে পড়াবেন। বেশ মনোযোগ দিয়ে কিন্তু তাঁর কাছে পড়বি, বাবা! এবার যদি ভাল রেজাল্ট করতে পারিস, তাহলে তোকে একটা খুব ভাল ফাউন্‌টেনপেন কিনে দেবো।

ঠিক বলছো? ফাউন্‌টেন্‌পেনের নাম শুনে সুকুমারের চোখ দুটো যেন জ্বলে ওঠে। তার বহুদিনের বাসনা এই রকম একটা কলমের! বাপের কাছে একদিন নাকি মুখ ফুটে সে চেয়েছিল কিন্তু তিনি তার উত্তরে সুকুমারের কান মুলে দিয়ে বলেছিলেন, গরীবের ছেলের অত শখ ভাল নয়। বড় লোকদের

ছেলেদের দেখে দেখে বুঝি এইসব শেখা হচ্ছে। এইজন্যে কি তোকে আমি স্কুলে পাঠাই! গরীবের ছেলে গরীবের মত থাকবি। খবরদার! ফের যদি কোনদিন এই রকম কিছু মুখে শুনি তো মেরে পিঠের ছালচামড়া তুলে দেবো।

একদিন এটা সুকুমার অঞ্জলির কাছে নিজেই গল্প করেছিল। তাই অঞ্জলি জানতো তার সবচেয়ে লোভ একটা ফাউন্‌টেন্‌পেনের ওপর।

এছাড়া স্কুলের কাছে যে ভাল খাবারের দোকানটা ছিল তার সঙ্গে অঞ্জলি সুকুর টিফিনের একটা বন্দোবস্তও করে দিলে। প্রত্যেক দিন সবথেকে ভাল সন্দেশ, রসগোল্লা, দৈ প্রভৃতি আট আনা থেকে দশ আনার তাকে খেতে দেবে।

খাবার খাওয়ার নাম শুনে সবচেয়ে খুশি হয়ে উঠলো সুকু। তাই আনন্দে গদগদ হয়ে সে বললে, সইমা, এত টাকা তুমি কোথায় পাবে?

অঞ্জলি সুমিতার কথাটা চেপে গিয়ে বলে, আমিও তো তোর মা, তোর জন্যে তাই আমিই এই ব্যবস্থা করছি বাবা। কিন্তু তোকে ভাল করে লেখাপড়া শিখতে হবে—তা না হলে কিন্তু আমি সব বন্ধ করে দেবো, মনে থাকে যেন। তবে এসব কথা আর কেউ যেন না জানতে পারে—শুধু তুই আর আমি ছাড়া। সাবধান!

সত্যি, ভাল খাওয়া পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই সুকুমারের চেহারাটায় পরিবর্তন দেখা দেয়। আস্তে আস্তে মুখের সে অসুস্থ ও রুগ্ন ভাবটা কেটে গিয়ে একটা চমৎকার শ্রী যেন ফুটে উঠতে থাকে। ওদিকে তার পড়াশুনায়ও ধীরে ধীরে বেশ মন বসতে লাগল। সুকুমারের পড়ার খবর মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখে হেডমাষ্টার মশায়ের কাছ থেকে অঞ্জলি জানতো।

বাস্তবিক অল্পদিনের মধ্যেই সুকুমারের লেখাপড়ায় বেশ উন্নতি দেখা গেল। সেই বছর সে ক্লাসের মধ্যে একজন ভাল ছেলে বলে পরিচিত হলো। বাৎসরিক পরীক্ষায়ও অষ্টম স্থান অধিকার করলে।

অঞ্জলি এই শুভ সংবাদ দিয়ে সুমিতাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখলে!

সুমিতা খুব আনন্দ প্রকাশ করে কেবল তার জবাব দিলে না, সেইসঙ্গে আরও কিছু টাকা পাঠিয়ে লিখলে সুকুর লেখাপড়ার জন্যে যত টাকা লাগুক আমি দিতে প্রস্তুত। তবে সে যেন মানুষের মত মানুষ হয়, আমার মুখ রাখে, তার ওপর আমার অনেক আশা। শুধু এইটুকু তুই লক্ষ্য রাখিস।

কিছুদিন পরে এই নিয়ে এক কাণ্ড ঘটলো। ছেলের স্কুল থেকে ফিরতে কেন দেরী হয় খোঁজ করতে গিয়ে ব্রজেশবাবু হেডমাষ্টারের কাছে যখন শুনলেন যে, অঞ্জলি তাঁকে মাইনে পাঠিয়ে দেয় তার ছেলেকে পড়াবার জন্যে তখন তিনি ভীষণ চটে উঠলেন। আর এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে ব্রজেশবাবু ছেলেকে কেবল যে হেডমাষ্টারের কাছে কোচিং পড়তে দিলেন না তাই নয়, একেবারে স্কুল থেকে তাকে টানতে টানতে অঞ্জলির বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তার সামনে যা মুখে এলো তাই বলে অঞ্জলিকে গালাগালি করে এলেন। তারপর দ্বিতীয় পক্ষের

স্ত্রীর কাছে ফিরে রাগে গর গর করতে করতে বললেন, দেখি এবারে কার কত সোহাগ উথলে ওঠে।

সুকুমারের সৎমা তখন মুখটা বেঁকিয়ে বলে উঠলো, বলি ব্যাপারটা কি, আমার ওপর অত রাগ করছো কেন—আমি তোমার কোন্ ঝাড়ের বাঁশ কেটেছি ?

ব্রজেশ বললে, তোমাকে কি আমি বলছি।

তবে এঘরে আর দশটা তোমার কোন্ আপনার জন আছে শুনি—আমাকে কি নেকী পেয়েছো যে, এটুকু বুঝতে পারবো না !

তখন ব্রজেশবাবু যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, তোমার বড় ছেলের সব হিতাকাঙ্ক্ষীদের কথা বলছি গো—

একগাল হেসে তখন সোহাগে গড়িয়ে পড়ে সুকুমারের সৎমা বললে. বলি কোন্ সর্বনাশী চোখখাগীরা এই কাজ করছে শুনি—খেঙরে তাদের বিষ ঝেড়ে দেবো না—এখনো চেনেনি আমায় ?

বলি, অত চেঁচাচ্ছো কেন ? শোন আগে কথাটা ? বলে ব্রজেশ সব কথা বলতেই যেন তেলেবেগুনে সে জ্বলে উঠলো।

চেঁচাবো না—এখনি হয়েছে কি ? সেই সর্বনাশীরা আঁটকুড়ো হোক্—তিনদিনের মধ্যে যেন তাদের হাতের নোয়া সিঁথের সিঁদুর ঘুচে যায়। আমার ছেলের মাথাটা খাবার জন্যে সকলে উঠে পড়ে লেগেছে। সে যে গরীবের ছেলে তার বাপের খেতে দেবার সঙ্গতি নেই, এইটে তার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে তার মনকে আমাদের ওপর বিষিয়ে দেবার চেষ্টা ! এ কি আমি বুঝি না ? আমার ছেলেকে পর করে দেবার এ একটা চক্রান্ত আমি সব জানি !

এর দিন কয়েক পরে আবার সেই পাড়ার কয়েকটা ছেলে এসে সুকুমারের সৎমাকে বলে দিলে যে, সুকু রোজ টিফিনে একটা খাবারের দোকান থেকে রসগোল্লা, সন্দেশ কত কি খায়।

কথাটা প্রথমে তিনি বিশ্বাস করেননি ! কেননা এত পয়সা সে পাবে কোথায় ? তিনি তো তাকে একটা করে পয়সা টিফিনে মুড়ি খাবার জন্যে দেন। তবু সুকুমার বাড়ী ফিরতে একেবারে তার চুলের মুঠি ধরে, উত্তম মধ্যম ঘা কতক দিয়ে প্রশ্ন করলেন, আবার চুরি বিদ্যে শেখা হয়েছে ! তাইত বলি আমার বিছানার তলায় রোজ পয়সা এত কম মনে হয় কেন ? ওখান থেকে চুরি করে খাবার খাওয়া হয়, বল্ শিগ্গির সত্যি করে ?

সুকুমার কাঁদতে কাঁদতে সব অস্বীকার করে। বলে, আমি কোনদিন পয়সা চুরি করিনি—

আবার মিথ্যে কথা। বলে আরো ঘা কতক কিল চড় বসিয়ে দেন তার পিঠে ! তবে পয়সা তোর কোন্ বাবা দেয় যে, রোজ স্কুলে রসগোল্লা সন্দেশ গিলিস্ ?

সুকুমার এর কোন জবাব না দিয়ে শুধু চুপ করে থাকে, আর নিঃশব্দে কাঁদে।

গোপনে আরো দু'একটি তার ক্লাসের ছেলেকে জিজ্ঞেস করে যখন ব্রজেশবাবু জানলেন যে, কথাটা সত্যি—সুকুমার রোজ ওই রকম খাবার খায় তখন একদিন চুপিচুপি অফিস কামাই করে তিনি সেই হিন্দুস্থানী খাবারওলার দোকানের কাছে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। তারপর যেই সুকু সেখানে ঢুকে রসগোল্লা, সন্দেশ নিয়ে খেতে আরম্ভ করেছে অমনি তাকে হাতে হাতে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন—হারামজাদা, কোথায় পেয়েছিস তুই এত পয়সা, সত্যি করে বল বলছি ?

সুকু কেঁদে ফেলে বলে, পয়সা তো আমার কাছে নেই।

তাহলে কি দোকানদার তোকে এমনি খেতে দিলে ! বলে যেমন তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন অমনি মোটা ভুঁড়িওয়া হিন্দুস্থানী খাবারওলাটা চৌকী ছেড়ে নেমে এসে এসে বললে, হাঁ বাবুজী, খোঁকা যা বলছে সব ঠিক—ওর টিফিনের জন্যে মাস-কাবারী হিসাব আছে আমার দোকানে। খোঁকার মা আমাদের এসে মাসে মাসে দিয়ে যান।

সমস্ত ব্যাপারটা এবার যেন কেমন ঘুলিয়ে ওঠে ব্রজেশবাবুর কাছে। খোকার মা ! সে আবার কে ? তিনি বাড়ীতে গিয়ে ছেলেকে উত্তম-মধ্যম প্রহার করে আসল কথাটা তখন বার করে নিলেন।

আবার অঞ্জলি ! ছেলেকে সঙ্গে করে নিয়ে তিনি অঞ্জলির বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন এবং বেশ করে তাকে দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে বললেন, খবরদার আমার ছেলের জন্যে যদি এইভাবে আর দরদ দেখাতে যাও তাহলে এখান থেকে ওকে মেদিনীপুরে পিসীর বাড়ী চালান করে দেবো বলে রাখলুম। আমার ছেলে গরীব। তাকে গরীবের মত থাকতে দাও। টাকা তোমার বেশী হয়ে থাকলে দেশে তো ভিখিরীর অভাব নেই, তাদের দিতে পারো। বলে রাগে অগ্নিমূর্তি হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এর ফলে আবার সুকুর লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটে ! আবার ক্ষিদে চেপে থাকতে থাকতে শরীরও তার ভেঙে পড়ে !

মাস পাঁচ-ছয় পরে হঠাৎ একদিন তেড়ে এলেন ব্রজেশবাবু অঞ্জলির বাড়ী। বললেন, নিশ্চয়ই সেই হারামজাদা এখানে লুকিয়ে আছে ? কোথায় সে শিগ্‌গিরই বার করে দাও নইলে এখনি পুলিশ ডাকবো !

ব্যাপার কি ? বলে অঞ্জলি যেমন প্রশ্ন করলে অমনি তার মুখের ওপর ব্রজেশবাবু খিঁচিয়ে উঠলেন, আর ন্যাকা সাজতে হবে না—এসবই তোমাদের ষড়যন্ত্র আমার বুঝতে বাকী নেই কিছু।

অঞ্জলি বললে, আগে শুনি সত্যি কি হয়েছে তারপর বলছি।

তখন ব্রজেশবাবু মুখখানা বিকৃত করে বললেন, ব্যাপার আর কি, আজ তিনদিন হলো তার কোন পাত্তা নেই। বাড়ী থেকে পালিয়েছে। আমার আত্মীয়স্বজন যে যেখানে ছিল সকলকেই তো খবর দিয়েছি কিন্তু কেউ তার কোন খবর বলতে

পারছে না।

এবার রাগে অঞ্জলির চোখ দুটো জ্বালা করে উঠলো। সে বললে, ছি, ছেলেটা বড় হয়েছে—তার ওপর কি নির্দয় অত্যাচার আপনাদের। আমি আগেই জানতুম যে, একদিন এইরকম একটা কাণ্ড হবে।

ব্রজেশবাবু এর কোন উত্তর না দিয়ে শুধু গলার স্বর আরো এক পর্দা তুলে বললেন, আর ন্যাকা সাজতে হবে না। আমি সব জানি। এ তোমাদের কারসাজি! আমার ছেলেকে পর করে দেবার মতলব! আচ্ছা দেখা যাক্, কোন্ মাসীমার কুটুম তাকে কতদিন খেতে দেয়! মোদ্দা আমার বাড়ীর দরজা আজ থেকে বন্ধ, এই বলে গেলুম।

অঞ্জলি আর চুপ করে থাকতে পারল না। শেষের কথাটা শুনে মেজাজ হারিয়ে ফেললে—বলি, আপনার বাড়ীর দরজা খোলা কি বন্ধ, সেকথা বলে আমায় শাসাতে এসেছেন কেন, লজ্জা করে না? ঐ এক ফোঁটা দুধের বাচ্চাকে দুটো পেট ভরে খেতে দেন না। জানেন, ওপরে ভগবান আছেন! তিনি সব দেখছেন!

আমার ছেলেকে আমি যদি খেতে দিতে না পারি তো কার কি আছে! বড়লোকী ফলাবার বুঝি আর জায়গা নেই। আচ্ছা দেখে নেবো কত পয়সা হয়েছে তোমার। বলে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

সাত

লাহোর—লাহোর—লাহোর! নামটাকে জপমালার মতো মুখস্থ করতে করতে সুকুমার প্রথম দিন সইমার বাড়ী থেকে ফিরেছিল। তারপর কোন্‌দিকে সেই দেশটা ভূগোল বইটা বার করে তার মধ্যে থেকে খুঁজে বার করতে পারলে না। অথচ একদিন তাদের ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল—লাহোর নামটা যেন ইতিপূর্বে শুনেছিল বলে তার মনে হতে লাগল।

তাই বইটা বার করে পাতার পর পাতা সে উল্টে যেতে থাকে।

একবার, দুবার, তিনবার—বইটার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত খুঁজেও সে কিন্তু ওই নামটা বার করতে পারলে না। শেষে একখানি একখানি করে পাতা পড়তে পড়তে এক সময় নামটা দেখে সে লাফিয়ে উঠলো। হ্যাঁ, এই তো—লাহোর! পশ্চিম পাঞ্জাব প্রদেশে বড় একটা শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। তারপর পড়লে তার কোথায় কি কি দ্রষ্টব্য স্থান আছে এবং কিসের জন্য বিখ্যাত ইত্যাদি—

কিন্তু কোন্‌খান দিয়ে সেখানে যাওয়া যায় সে কথা তো লেখা নেই! সুকুমার এবার মহা চিন্তায় পড়লো।

দুদিন পরে ক্লাসে যখন আবার ভুগোল পড়ানো হচ্ছিল তখন সুকুমার দেওয়াল-জোড়া ভারতবর্ষের বড় মানচিত্রটার কাছে খুঁজতে লাগল লাহোর নামটা।

তারপর সেটা খুঁজে বার করে শিক্ষক মহাশয়কে জিজ্ঞেস করলে, স্যার, লাহোরে যেতে গেলে কোন্ কোন্ রেলপথ দিয়ে কেমন করে যেতে হয় ?

মাষ্টারমশায় বললেন, এখন যেখানটায় পড়া হচ্ছে তাই মন দিয়ে শোন—ক্লাস শেষ হলে আমার ঘরে যেয়ো বলে দেবোখন।

ক্লাস যেন আর শেষ হয় না—সুকুমার মনে মনে অধৈর্য হয়ে ওঠে। মাষ্টার-মশায় তখন পড়িয়ে চলেছেন দাক্ষিণাত্যের নদনদী ও জলবায়ুর কথা। কোথা থেকে উঠে কখন কোন্ দিক দিয়ে মৌসুমী বায়ু বয় এবং কোন্ নদী কোথায় গিয়ে পড়েছে ইত্যাদি।

সুকুমারের কানে কিন্তু সে সব কথা একেবারেই ঢোকে না। লা-হো-র--সেই তিনটে কথার মধ্যে যেন তার জীবনের সকল পড়া, সকল প্রশ্নের জবাব মিলিত হয়েছে। তার গর্ভধারিণী জননী, তার একমাত্র জীবনের আশ্রয়স্থল, তার ইহকাল পরকাল, তার স্নেহ ভালবাসা, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তার সুখ-দুঃখ—তার সকল কামনা-বাসনা যেন অপেক্ষা করছে সেই লাহোরে।

ঘণ্টা বাজতেই সে মাষ্টারমশায়কে গিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলে কোন্ পথে লাহোর যেতে হয়। তিনি বলে দিলেন—হাওড়ার স্টেশন থেকে পাঞ্জাব মেলে অমৃতসর স্টেশনে নেমে সেখান থেকে আবার ট্রেন বদলে যেতে হয় !

কথাটা যেন সঙ্গে সঙ্গে গিলে নিলে সুকুমার ! তারপর একদিন হঠাৎ সুযোগ বুঝে সে বাড়ী থেকে পালালো—হাফপ্যাণ্টের ওপর একটা পুরনো তালিমারা ছিটের কোট, তার সঙ্গে একটা পুরনো স্যাণ্ডেল পায়, আর মাত্র চারটি পয়সা পকেটে নিয়ে।

লাহোরে পেঁছিতে তার প্রায় সাত আট দিন লেগে গেল। বিনা টিকিটে ট্রেনে যেতে যেতে যেখানেই ধরা পড়ে সেখানেই ঘাড় ধরে চেকার তাকে নামিয়ে দেয়। আবার পরের একটা ট্রেনে চেপে আরো কয়েকটা স্টেশন এগোয়। এমনি করে একদিন সত্যি সত্যি সে লাহোরে পেঁছিল।

এবার সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে যেমন করে হোক খুঁজে বার করবে তার মাকে। তাঁর সেই স্নেহময়ী মূর্তি তখনো যেন সুকুমারের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে।

প্রথমে সে কয়েকটা দিন শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল। কোন মেয়েছেলে দেখলেই হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিপদ হলো সেখানকার অনেক মেয়ে আবার মুখে বোরখা ঢাকা দিয়ে পথ চলে বলে। তবু যেখানে মেয়েদের কোন ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষ্যে ভীড় জমে—সেখানেই সে কোন একটা ছল করে গিয়ে দাঁড়ায়। কোন বড়লোকের বাড়ী বিয়ে, কোন পার্টি, সিনেমা, থিয়েটার ও সভাসমিতি—যখন যেখানে যা হয়, সে আগে থেকে গিয়ে তার ফটকের

কাছে ঘোরাঘুরি করে। কত লোক তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়, দূরে সরিয়ে দেয়। কত সুন্দরী, রূপসী নারীর জনতা চলে যায় তার চোখের সামনে দিয়ে কিন্তু সেই অনির্বচনীয় সুন্দর একখানি মুখের দেখা সে কোথাও পায় না।

মেজাংটাই খানদান ও রহিস মুসলমানদের সবচেয়ে প্রিয় মহল্লা। সেখানে কত বড় বড় অট্টালিকা, কত বাগ ও বাগিচা! তন্ন তন্ন করে সুকুমার খোঁজে তার মাকে সেখানের সর্বত্র। তারপর গোলবাগ, সালেমারবাগ, সাহাদারা, লোহারিগেট, শাল্‌মিগেট, কুড়িবাগ, নিজবাথ্ রোড, মডেলটাউন, পুরনো আনারকলি প্রভৃতির পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কোথাও সে তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান মার সেই মুখখানাকে দেখতে পায় না। এবার মরিয়া হয়ে ওঠে সুকুমার। খুঁজে বার করবেই সে তার মাকে। সে প্রতি রাস্তার প্রতি গলিতে ঘুরতে থাকে। শেষে একদিন ক্লান্ত হয়ে একটা টাঙ্গাওয়ালার কাছে সহিসের কাজ নিলে।

টাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে সারা শহরটা প্রতিদিন যেন সে চষে ফেলে। আর যখন যেখান দিয়ে গাড়ী ছোটে তার দৃষ্টি থাকে দু'পাশের বড় বড় বাড়ীর ওপরের ঘরের জানালার দিকে। যদি শারসির মধ্যে দিয়ে হঠাৎ দেখতে পায় সেই মুখখানা! কিংবা খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে যদি তার মা কোনদিন অন্য-মনস্কভাবে চেয়ে থাকে দূর দিগন্তের পানে!

কল্পনায় এই রকম কত কি চিন্তা করতে করতে সুকুমার টাঙ্গাওলার পায়ের তলায় বসে মধ্যে মধ্যে মুখে হাঁক দিতে থাকে, এ বাচ্চা বাঁচকে—বাঁচকে—হঠ্ যাও —হঠ্ যাও···

টাঙ্গা চলে—ম্যালরোড, জি. টি. রোড. লরেন্স গার্ডেনের পথে।

জোর কদমে শহরের সবচেয়ে সুন্দর পিচঢালা চক্‌চকে সড়কগুলোর ওপর দিয়ে ছুটে চলে টাঙ্গা—খপ্ খপ্—খপ্ খপ্···

লাল রঙের তেজীয়ান ঘোড়াটার চারটি নাল বাঁধানো খুরের শব্দ যখন একটানা সঙ্গীতের মত বেজে চলে তখন চুপ করে শুনতে শুনতে কখন যেন সে তার মধ্যে ডুবে যায়। কখনো বা সুকুমার বড় বড় অট্টালিকার জাফরিকাটা অলিন্দগুলোর দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। এই বিরাট বৈচিত্র্যে ভরা পৃথিবীটাতে তখন কেবলমাত্র তার স্নেহময়ী জননীর মুখ ছাড়া আর কিছুই সে যেন দেখতে পায় না। তাঁর ধ্যানে তাই বুঝি সে মগ্ন হয়ে যায়।

হঠাৎ হাতের চাবুকটা দিয়ে টাঙ্গাওলা 'সপাং' করে এক ঘা তার পিঠে কষিয়ে দিয়ে বলে, এ বে, কেয়া দেখরহা।—আঁখ সড়ক্ পর রাখো।

চমকে উঠে পিছনের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে তখনি সে মুখে আওয়াজ করতে থাকে—বাঁচকে, বাঁচকে—হঠ্ যাও—আরে এ বুড্ঢা।

এমনি করে দীর্ঘদিন ধরে মাকে খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ হবার পর সুকুমারের মনে হলো হয়ত সইমা তাকে মিথ্যা কথা বলে ভুলিয়ে ছিল, তার মা লাহোরে থাকে

না !

মাস কয়েক কেটে গেলে সে তাই একদিন রাত্রে হঠাৎ চুপি চুপি এসে রেল স্টেশনে শুয়ে রইল, ভোরের গাড়ী ধরে আবার কলকাতায় ফিরে আসবে বলে।

শেষ রাতের শীতে কুঁকড়ি মেরে একটা ছেঁড়া কম্বলে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে সুকুমার পড়েছিল স্টেশনের ওয়েটিং রুমটার ধারে। সেখানে কোন আলো ছিল না, আলোটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল বোধহয়। কিন্তু টিকিট ঘরের ফোকর দিয়ে খানিকটা আলো এসে পড়ে—সেই অন্ধকার স্থানটাকে যেন আরো বেশী বীভৎস করে তুলেছিল।

গিয়াসুদ্দীনরা তখন দিল্লীতে বাস করছিল। সেখানে তারা যে একটা নতুন বাড়ী তৈরী করেছিল, সে খবরটা অঞ্জলি বা সুকুমার কেউই জানতো না। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য সুকুমারের যে নাটকীয়ভাবে সেইদিনই মাঝরাতের গাড়ীতে গিয়াসুদ্দীন ও সুমিতা দিল্লী থেকে লাহোরে ফিরে এলো কি একটা জরুরী কাজের জন্যে।

টিকিট কলেকটারকে টিকিট দিয়ে ফটকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ যাতায়াতের পথ জোড়া করে একজনকে শুয়ে থাকতে দেখে গিয়াসুদ্দীনের ভারি রাগ হলো। সে তার পায়ের জুতো দিয়ে এক ঠোক্কর মারলে সুকুমারকে, তারপর মুখে 'হঠ্ যা উল্লু' বলে একেবারে গট্‌মট্ করতে করতে রাস্তায় নেমে গেল।

সুকুমার ঘুমন্ত কণ্ঠে শুধু একবার চেঁচিয়ে উঠলো, 'ও মাগো' বলে। তারপর শুয়ে শুয়েই পায়ের সেই ব্যথাটায় হাত বুলোতে লাগল।

সুমিতা আগেই নেমে গিয়েছিল রাস্তায়, তবু সেই করুণ কণ্ঠস্বর তার কানে যেতে মুহূর্তের জন্যে যেন সে থমকে দাঁড়ালো, তার মনে হলো সে ডাক যেন পরিচিত। তার বুকের মধ্যে কি একটা অশ্রুত ধ্বনি যেন আকুলি-বিকুলি করতে থাকে! কিন্তু তখনি পিছন থেকে গিয়াসুদ্দীন এসে তার হাতটা ধরে টান দিলে। চলো জল্‌দি। কুত্তাকো রোহ্‌নে দেও···

সামনেই তাদের বিরাট মোটরখানা অপেক্ষা করছিল। তাতে গিয়ে দু'জনে উঠে বসতেই ভোঁ-ভোঁ শব্দ করে হর্ন বাজিয়ে দিকবিদিক প্রকম্পিত করতে করতে মোটরটা যখন অদৃশ্য হয়ে গেল তখনো কিন্তু পায়ের সেই ব্যথাটায় হাত বুলোতে বুলোতে কাঁদতে থাকে সুকুমার।

আট

ভিখিরীর মত একটা ছেঁড়া ও ময়লা জামা গায়ে এবং হাফ্ প্যান্ট পরে সুকুমার একদিন সোজা স্টেশন থেকে অঞ্জলির বাড়ীতে এসে হাজির হলো।

অঞ্জলি তাকে দেখামাত্র একেবারে ঝেঁজে উঠলো। বললে, মুখপোড়া বেরো আমার বাড়ী থেকে, এখানে তোর স্থান নেই!

অপরাধীর মত ঘাড় হেঁট করে শুধু সুকুমার দাঁড়িয়ে রইল অঞ্জলির সামনে। তার কথার কোন জবাব দিলে না।

অঞ্জলির কণ্ঠ যেন এবার আরো তীব্র হয়ে উঠল। বললে, এখনো ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি যে, শিগ্গির যা তোদের বাড়ীতে। আমি তোর কে যে আমার এখানে এসেছিস। এখনি তো তোর বাবা তেড়ে আসবে আমায় অপমান করতে। তারপর আপন মনে গজগজ করতে করতে কান্নাচাপা স্বরে বললে, জানি পর কখনো আপন হয় না!

সইমা! বলে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু সুকুমার একবার ভয়ে ভয়ে তাকে ডাকলে।

কে তোর সইমা? খবরদার, তুই আর আমায় সইমা বলে ডাকবি না, বলে দিচ্ছি।

এবার টপ্ টপ্ করে কয়েক ফোঁটা জল নিঃশব্দে তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো মাটিতে!

উঃ—আবার কান্না হচ্ছে বুড়ো ছেলের। যেখানে গিয়েছিলি যা না, চলে এলি কেন সেখান থেকে? থাকতে পারলি না সেখানে—চিরকাল! এইটুকু ছেলের আবার বাড়ী থেকে কাউকে না বলে পালানো, যা চলে যা, অমন বদমায়েস্ ছেলের আমি সইমা হতে চাই না।

চোখের জল মুছতে মুছতে সুকুমার জবাব দেয়, তোমার কথা শুনেই তো পালিয়েছিলুম।

আমার কথা শুনে! ওমা কোথায় যাবো। কি মিথ্যে কথা বলতে শিখেছিস তুই! তোর বাবাকে বুঝি তুই বলেছিলি এই কথা—তাই সেদিন আমার বাড়ী বয়ে এসে যা নয় তাই শুনিয়ে গিয়েছিল। কবে আমি তোকে পালাতে বলেছিলুম—বল দেখি।

সুকুমার এবার ধীরে ধীরে বললে, পালাতে বলবে কেন? তুমি তো বলেছিলে যে, আমার মা লাহোরে থাকে—তাই আমি তাকে সেখানে খুঁজতে গিয়েছিলুম।

ওমা কোথায় যাবো? তুই সেই কথার ওপর বিশ্বাস করে লাহোরে গিয়েছিলি! তারপর আশা-আশঙ্কায় উদ্ভাসিত দু'টি চোখ মেলে অঞ্জলি বললে, তা দেখা

পেলি সেখানে মায়ের ?

তুমি মিথ্যে কথা বলেছ। মা তো সেখানে থাকে না।

অঞ্জলি বললে, কেমন করে জানলি সেখানে থাকে না ?

সুকুমার বললে, আমি লাহোরে এমন বাড়ী নেই যেখানে তাঁর খোঁজ করিনি ? এই ছ'মাস ধরে প্রতিদিন তাঁকে খুঁজে বেড়িয়েছি পাড়ায় পাড়ায়, রাস্তায় রাস্তায় !

ওমা কি ছেলে তুই রে ! বলতে বলতে তার গলার স্বর নিমেষে যেন খাদে নেমে আসে। তারপর একটু থেমে অঞ্জলি ভারীগলায় বলে তা আমাকে একটু বলে গেলে কি হতো বাবা !

তুমি যদি না যেতে দাও সইমা। তাই আমি তোমাকে না বলে চলে গিয়েছিলুম।

তোর বাবা যে এর জন্য কত গালাগালি দিয়ে গেল আমায় তা কি বলবো ? তার ধারণা আমিই তোর মাথায় এইসব মতলব দিয়েছি !

সুকুমার বলে, বারে তুমি দিতে যাবে কেন ? আমার মার কাছে বুঝি আমার যেতে ইচ্ছে করে না ?

অঞ্জলি একটু থেমে বলে, সে কথা তোর বাপ বোঝে কৈ বাবা ! তারপর হঠাৎ কণ্ঠস্বর নামিয়ে এনে যেন আপন মনেই বলে উঠলো, আর বুঝুক না বুঝুক তাতে আমার কি এসে যায়। পরের জন্যে রোজ রোজ এ অপমান আর ভাল লাগে না ! তুই স্নান করে দু'টি খেয়ে নে আগে বাবা। তারপর আমি যাদের ছেলে তাদের কাছে তোকে পৌঁছে দিয়ে এসে, সাতটা তুলসীপাতা মাথায় দিয়ে স্নান করে আসবো।

সুকুমার বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললে, না সইমা, আমি আর ও বাড়ীতে যাবো না, আমি তোমার কাছে থাকবো।

তার কণ্ঠস্বরকে ব্যঙ্গ করে অঞ্জলি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—উঃ, তোমার কাছে থাকবো ? তারপর কৃত্রিম অভিমানে যেন ফেটে পড়লো তার গলা। বললে, আমি তোর কে ? নিজের ঘরদোর মা বাপ আছে—তাদের কাছে চলে যা ! তোর জন্যে এভাবে গাল পেতে চড় খেতে যাবো কেন আমি !

এবার সুকুমারের দুচোখ ফেটে যেন বন্যা নামে। সে বলে, সইমা, আমায় ও বাড়ীতে আর যেতে বলো না। আমি এখানে থাকবো।

হ্যাঁ—তারপর তোমার বাবা কাল পুলিশ ডেকে এনে বলবে যে, আমার ছেলেকে চুরি করে রেখেছে। মিছিমিছি ওসব ঝামেলা আর ভাল লাগে না আমার।

সুকুমার সইমাকে এইভাবে রাগতে কখনো দেখেনি। তাই তাকে কোনরকমে রাজী করাতে না পেরে সে শুধু ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। এতদিন পরে আবার বাপের সম্মুখীন হওয়ার অর্থ যে কি তা সে হাড়ে হাড়ে বুঝতো। তাছাড়া তার নতুন মার মূর্তিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই যেন তার বুকের মধ্যেটা

ঠাণ্ডা হয়ে আসে !

সুকুমারের মুখ দেখেই তার মনের কথা বুঝি বুঝতে পারে অঞ্জলি, তাই নানা ভাবে তাকে সান্তনা দিতে থাকে। বলে, বাপ মা ছেলের মঙ্গলের জন্যই বকে, মারে, তাই বলে কি বাড়ী ছেড়ে পালাতে আছে ? কিংবা অপরের বাড়ীতে থাকবো বলতে আছে বাবা ? ছিঃ, এখন তুই বড় হয়েছিস্, কত জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে।

এমনি ভাবে আরো অনেক মিষ্টি কথা বানিয়ে বানিয়ে বলে সুকুমারকে বোঝালে অঞ্জলি। শেষে খাইয়ে-দাইয়ে একখানা রিক্সা করে তাকে পৌঁছে দিতে গেল নিজে।

কিন্তু বাড়ীর দরজায় গিয়ে যখন দাঁড়ালো তখন সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে অঞ্জলির মনে মায়া হলো। ফাঁসীর আসামীর মত কে যেন তাকে বধ্য-ভূমির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বলাবাহুল্য অঞ্জলিরও মনের অবস্থা অনেকটা তার-ই মত ছিল তবু মুখে হাসি টেনে এনে সে সুকুমারের দাড়ি ধরে মুখটা তুলে একটা চুমু খেয়ে বললে, ভয় কি বাবা। আমি তো সঙ্গে রয়েছি !

সে কথার জবাবে সুকুমার কি যে বলবে ভেবে পেলে না। শুধু তার চোখের দু'কোল ছাপিয়ে হু হু করে যেন জলোচ্ছ্বাস বয়ে যায়।

অঞ্জলি তাকে হাত ধরে রিক্সা থেকে নামাতে গিয়ে চমকে উঠলো। দেখলে তার সর্বাঙ্গ ঘামছে এবং হাতটা ঠাণ্ডা কনকন করছে, বরফের মত।

সুকুমারদের বাড়ীর দরজাটা ছিল বন্ধ। অঞ্জলি নেমেই কড়া নাড়লে। কিন্তু সব চুপচাপ—কেউ কোন সাড়া দিলে না।

অঞ্জলি আবার কড়া নাড়লে।

আবার তেমনি সব নিস্তব্ধ।

এই নীরবতা যে কিসের লক্ষণ তা বুঝতে সুকুমার বা অঞ্জলি কারুরই বাকী রইল না। তাই আস্তে আস্তে সুকুমার বলল, সইমা, চলো আমরা ফিরে যাই—বাড়ীতে বোধহয় কেউ নেই।

কথাটা সে বলে শেষ করতেই অঞ্জলি আর একবার খুব জোরে কড়া নাড়লে। এবার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল ভেতর থেকে। আর অঞ্জলি দেখলে তাদের সামনে রুদ্রমূর্তিতে দাঁড়িয়ে সুকুমারের নতুন মা। তাদের দু'জনের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত দেখে এমন এক তীক্ষ্ম দৃষ্টি হানলে সে যে, তাদের মনে হলো—এখনি বুঝি ভস্ম করে ফেলবে।

মুহূর্তকয়েক সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে তেমনি স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে অঞ্জলি জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বললে, এই নাও ভাই, তোমার গুণধর ছেলে।

কোন উত্তর না দিয়ে এবার সুকুর নতুন মা শুধু মুখটা তার দিক থেকে সহসা

অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলে।

তখন অঞ্জলি বললে, সুকু পেন্নাম কর—

থাক, আর অত সোহাগে দরকার নেই, যে চুলোয় এতদিন রেখেছিলে সেখানে নিয়ে যাও'গে। এ বাড়ীতে আর ওর স্থান নেই! বলে রাগে গরগর করতে করতে নতুন মা একেবারে ভেতরে চলে গেল।

এবার আর এক পর্দা গলা চড়িয়ে অঞ্জলি বললে, বলি কার ওপর অত রাগ দেখাচ্ছো শুনি? কি দায় পড়েছে আমার ওকে নিয়ে যাবার। ও আমার কে?

কেন, আর বুঝি খেতে দিতে পারলে না? তাই এতদিন পরে ফিরিয়ে দিতে এসেছো বাড়ী বয়ে।

এবার ধীর অথচ গম্ভীরস্বরে অঞ্জলি বললে, দেখ নতুন বৌ, তোমাদের অনেক অপমান এতদিন ধরে সহ্য করেছি—কিন্তু আর নয়, এবার মুখ সামলে কথা বলো বলে দিচ্ছি!

কি, আমার বাড়ী বয়ে এসে আবার আমায় চোখ রাঙানো—কেন আমি কি তোমার ভিটের প্রজা, না তোমার খাই পরি শুনি—

অঞ্জলি বললে, আমিও তোমার প্রজা নই—তোমার খাই না পরি না—এটা স্মরণ রেখে কথা বলো বলছি। তারপর আপন মনেই বলতে লাগল, ছেলেটা এতদিন পরে হঠাৎ কোথা থেকে এসে হাজির হলো, তাই ভাবলুম যাই নিজে সঙ্গে করে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসি—আবার হয়ত কোথাও পালিয়ে-টালিয়ে যাবে! তা কলিকালে কারো ভাল করতে নেই—উল্টে আমায় কিনা -

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুকুমারের নতুন মা বললে, যা ভালো করেছো তার ওপর আর ভালো করতে এসো না দোহাই তোমার—দয়া করে মানে মানে এখন সরে পড়ো। তাহলে বাঁচি আমি। হাড়ে বাতাস লাগে!

হ্যাঁ যাচ্ছি, তোমার বাড়ীতে আমি থাকতে আসিনি। বলতে বলতে রাগে অঞ্জলির চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়লো। তারপর নিজেকে সামলাতে না পেরে সে বললে, তোমার মত নীচ ছোটলোকের বাড়ীতে যে আমি পা দিয়েছি তাই তোমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি জেনো। আবার তাড়িয়ে দিচ্ছ আমায়—লজ্জা করে না মুখে একথা উচ্চারণ করতে? ছিঃ। বলতে বলতে অঞ্জলি একেবারে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

সইমা, তুমি চলে যেয়ো না! বলে সুকুমার যেমন তার দিকে দু'পা এগিয়ে গেল, অমনি ছুটে গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে দুমদাম করে পিটতে পিটতে তার নতুন মা বলে উঠলো, সইমা—তোর চোদ্দ পুরুষের নাড়ীকাটা মা! তোর এই মা বলা আজ আমি ঘুচিয়ে দেবো—দেখি মাগী জব্দ হয় কিনা? যেচে কিনা পরের ঘরে আগুন লাগাতে আসে—এত বড় আস্পদ্দা!

ওঃ মরে গেলুম—সইমা গো—তুমি চলে যেয়ো না গো। বলে বুকফাটা কান্না কেঁদে উঠলো সুকুমার!

কান্নার স্বর কানে আসতেই দুটো কান জোর করে হাত দিয়ে চেপে ধরলে অঞ্জলি। তারপর গলিটা থেকে ধীরে ধীরে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই সামনে যে রিক্সা দেখতে পেলে তাতে চেপে বসে বললে, এই রিক্সা জল্দি—শিগ্গির ছুটে চল্—

ঠুন্-ঠুন্-ঠুন্-ঠুন্ করে ঘণ্টায় ঘা দিতে দিতে নিমিষে রিক্সাটা গলিটা ছেড়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লো। কিন্তু তখনো সেই জনকোলাহল ভেদ করে যেন সুকুমারের সেই ডাক অঞ্জলির কানে তেমনি ভাবেই এসে আছাড় খেতে লাগল।

বাড়ী ফিরে এসে সেই দিন অঞ্জলি সুমিতাকে একখানা চিঠি দিলে। তাতে সুকুমারের সব কাহিনীই সে বিবৃত করলে। বিশেষ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে লাহোরে যাওয়া এবং সেখানে ছ'মাস ধরে পথে পথে সহিস হয়ে মাকে খুঁজে বেড়ানো, তারপর তার সঙ্গে সৎমার আচরণের কথা—কোন কিছুই বাদ রাখলে না লিখতে। মনের আবেগে সব কথাই উল্লেখ করলে।

চিঠিটা পড়ে সুমিতার মন ভয়ানক খারাপ হয়ে যায়। সারাদিন সে কোন কাজে মন দিতে পারে না। কেবলি ঘুরেফিরে সুকুমারের সেই বিষণ্ণ মুখটি যেন তার চোখের সামনে উদয় হয়। তার সঙ্গে সৎমার নিষ্ঠুরতার নানারকম কাহিনী কল্পনা করতে গিয়ে সহসা সুমিতার প্রতিহিংসার স্পৃহা ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করে। সুকু তার প্রথম সন্তান! একদিন তার সম্বন্ধে মনে মনে যেসব ছবি এঁকেছিল সেগুলো যেন মনের দোরে একসঙ্গে ভীড় করে এসে জমে। না-না—অসম্ভব, কিছুতেই সে তা হতে দেবে না। সুকুমার তার প্রথম সন্তান। তাকে মানুষের মত মানুষ করে তুলবেই সে। মনে মনে এমনি কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বসে সুমিতা। তার জাত যেতে পারে, সে ধর্মচ্যুত হতে পারে কিন্তু সুকুমার যে তার জ্যেষ্ঠ সন্তান, তাকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করেছিল একথা কেমন করে সে বিস্মৃত হবে!

রাগে সুমিতার দেহের সমস্ত রক্ত যেন টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকে। কয়েকদিন ধরে দিনরাত ভেবে ভেবে অবশেষে সে একটা মতলব ঠিক করলে এবং অঞ্জলিকে চিঠি লিখে তা জানালে।

তার এই পরিকল্পনার কথা পড়তে পড়তে অঞ্জলির চোখ জলে ভাসতে থাকে। অতি করুণ চিঠি। সুকুমারের সম্বন্ধে যেসব কথা লিখেছে সুমিতা, তা একমাত্র মা ছাড়া অন্য কারো পক্ষে চিন্তা করা সম্ভব নয়। সুমিতা লিখছে, তুই যদি কোনরকমে তাকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দিতে পারিস তাহলে আমি এখানকার একটা বোর্ডিংয়ে রেখে তার ভালভাবে লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করতে পারি। অবশ্য তাকে একথা জানতে দিবি না। বলবি তুই যেন তাকে দিল্লীর কোন স্কুলে লেখাপড়া শেখাবার জন্য পাঠাচ্ছিস। খরচ যা লাগে আমি এখান থেকে যোগাবো গোপনে, তোরই নামে। শুধু তুই যদি তাকে কোনরকমে রাজী করিয়ে একবার এখানে

পাঠিয়ে দিতে পারিস তাহলে সারাজীবন আমি তোর কাছে ঋণী হয়ে থাকবো! এতে কোন রকমের অন্যায় হবে বলে আমি মনে করি না। কেননা আমি তার মা। কাজেই তাকে মানুষ করবার অধিকার আছে আমার ষোল আনা, আমি মনে করি।

সবশেষে লিখেছে সুমিতা, সুকুমার তার মাকে খুঁজতে লাহোর এসেছিল এবং ছ'মাস ধরে খুঁজেও সন্ধান করতে পারেনি, একথা শুনে আমার মনের মধ্যে যে কি হচ্ছে তা এই সামান্য চিঠিতে লিখে তোকে বোঝাতে পারবো না। তুইও সন্তানের মা, তোর অন্তর দিয়ে হয়ত বুঝতে পারবি আমাকে। ভাই, এক এক সময় কি মনে হয় জানিস! কেন মরতে তখন লাহোর ছেড়ে দিল্লীতে গিয়েছিলুম। আবার ভাবি, এর মধ্যে হয়ত ঈশ্বরের কোন মঙ্গল নিহিত আছে! দিল্লীতে আমরা একটা নূতন বাড়ী করেছি। ছ'মাস হলো সকলে সেখানেই বাস করছি। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সুবিধের জন্যে দিল্লীতেই আমাকে থাকতে হবে বরাবর। লাহোরের বাড়ীতে কর্তা নিজেই থাকবেন এবং সেখান থেকে যাতায়াত করবেন।

সব শেষে সুমিতা লিখেছে, সুকুকে যদি কোন রকমে তুই এখানে পাঠাতে পারিস তো একটা টিকিট কেটে গাড়ীতে তুলে দিয়েই আমায় 'তার' করে দিস ভাই। আমি যথাযথ ব্যবস্থা করবো। সুকুর খবর জানবার জন্যে তোর কাছে মন পড়ে রইলো, চিঠির উত্তর দিতে দেরী করিসনি যেন।

চিঠিটা পড়ে অঞ্জলির খুব ভাল লাগল। সুকুর সম্পর্কে এর চেয়ে আর কল্যাণকর পরিকল্পনা কি হতে পারে? তাছাড়া এতে ওর বাপ ও সৎমার ওপর একটা উপযুক্ত প্রতিশোধও নেওয়া হবে!

কিন্তু মুস্কিল হলো এই যে সুকুমারের আর কোন খবরই পায় না অঞ্জলি। প্রায় দেড় মাস কেটে গেছে একবারও সে আসেনি তার কাছে। রীতিমত চিন্তিত হয়ে ওঠে অঞ্জলি। স্কুলে খোঁজ নিয়ে জানলে তার বাবা নাম কাটিয়েছে। আরো খবর পেলে যে তার সৎমা নাকি বাড়ী থেকে তাকে আর বেরুতে দেয় না, দিনরাত সদর দরজায় চাবি দিয়ে রাখে।

অঞ্জলি একদিন একটা রিক্সায় করে তাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে চলে গেল, যদি সুকুমারের দেখা পায় এই আশায়! কিন্তু কোথায় সুকুমার?

তবু আশা ছাড়ে না অঞ্জলি।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন এইভাবে সে বৃথাই রিক্সাভাড়া নষ্ট করলে। অবশেষে চতুর্থ দিন তার মনস্কামনা পূর্ণ হলো। সেদিন বাড়ীর কাছাকাছি রিক্সাটা অঞ্জলি দেখলে, সুকুমার জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে হাঁ করে।

ইশারা করতে হলো না, অঞ্জলিকে দেখেই সুকুমার পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে একেবারে তার কাছে এসে হাজির হলো।

অঞ্জলি সঙ্গে সঙ্গে তাকে রিক্সায় তুলে নিলে।

নিস্তব্ধ দুপুর। সুকুমারের সৎমা তখন বোধ করি দিবানিদ্রায় মগ্ন। তাই

সে যে রিক্সায় চেপে একেবারে অঞ্জলির বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছে সেকথা জানতেই পারলে না।

এইবার অঞ্জলি তাকে দিল্লীতে পাঠাবার কথা সব বললে।

সুকুমার সে প্রস্তাব শুনে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো, আমায় আজই তুমি সেখানে পাঠিয়ে দাও সইমা। নইলে শনিবার দিন বাবা আমায় মেদিনীপুরে নিয়ে গিয়ে পিসিমার বাড়ীতে রেখে আবে বলেছে।

সত্যি নাকি?

হ্যাঁ সইমা। বলতে বলতে একেবারে ডুকরে কেঁদে ওঠে সুকুমার।

সেইদিন বিকেলের তুফান মেলে একটা টিকিট কেটে অঞ্জলি সুকুমারকে বসিয়ে দিয়ে এলো। সেই কামরায় দিল্লীযাত্রী একজন মুসলমান ভদ্রলোক আগে থেকে বিছানা বিছিয়ে অনেকটা স্থান দখল করে বসেছিলেন। তাঁর ঠিক পাশেই অঞ্জলি সুকুমারের জন্যে একটু জায়গা করে দিয়ে সেই ভদ্রলোককে অনুরোধ করলে ছেলেটাকে দিল্লী স্টেশনে নামিয়ে দেবার জন্যে।

ভদ্রলোকটি মিষ্টি হেসে সম্মতি জানাতে অঞ্জলি নিশ্চিন্তমনে প্লাটফর্মে বেরিয়ে এলো এবং সুমিতা যে ঠিকানায় চিঠি দিতে বলেছিল সেখানে তখনি একটা টেলিগ্রাম করে দিলে।

পরদিন সন্ধ্যার সময় সুকুমার দিল্লীর ষ্টেশনে গিয়ে নামতেই একজন দরোয়ান এসে তাকে সেলাম জানিয়ে বললে, আপনার নাম সুকুমার তো, আমি আপনাকে স্কুলের বোর্ডিংয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি।

লোকটির মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সুকুমার জিজ্ঞেস করলে, এত ভীড়ের মধ্যে থেকে তুমি আমায় চিনলে কেমন করে দারোয়ানজী—তুমি আমায় আগে কখনো দেখোনি?

দারোয়ানজীর দুর্বোধ্য হিন্দীভাষায় বললে, হামারা তো এহি কাম হ্যায় বাবুজী। বলে একটু হেসে আসল কথাটা চেপে গেল। অর্থাৎ সুমিতা যে, যে বোরখা ঢাকা দিয়ে দূর থেকে তাকে চিনিয়ে দিয়ে চলে গেছে সেটা আর তাকে জানতে দিলে না।

সুকুমার জানতো যে তার সইমা তাকে সেখানে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছে। সুমিতাও অঞ্জলির জবানীতে হেডমাষ্টারের সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। কাজেই দারোয়ান শুধু সুকুমারকে বোর্ডিংয়ে পৌঁছে দিতেই বাকীটা যেন সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের মত হয়ে গেল। শুধু একটা বিষয়ে সুমিতার হিসেবের কিছু ভুল হয়েছিল। সে ভেবেছিল হয়ত ক্লাস সিক্স-এ ভর্তি হতে পারবে সুকুমার। কিন্তু হেডমাষ্টার পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন সে কিছুই জানে না! সিক্স তো দূরের কথা, এমন কি ফাইভ-এর যোগ্যও নয়। কাজেই ক্লাস ফোর-এ তিনি তাকে ভর্তি করলেন।

এই ক্লাসেই সুমিতার মুসলমান পুত্র নবাবজান পড়তো।

মাস তিনেক পরে। একদিন স্কুলের ছুটি হলে যখন হুড়মুড় করে সব ছেলেরা ফটক দিয়ে বেরিয়ে আসছিল তখন হঠাৎ সুকুমারের জুতোর সঙ্গে ঠোক্কর লেগে নবাবজান হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঠাস করে এক চড় মারলে সুকুমারের গালে।

হো হো করে কতকগুলো ছেলে এমনভাবে হেসে উঠলো যে, সুকুমারের মুখচোখ লজ্জায় রক্তবর্ণ ধারণ করলে। ক্লাসের এই সব ছেলেরা তার কাছে শুধু মুখে অচেনা নয়, এখনো অপরিচিতও বটে।

অথচ নবাবজান শুধু পুরনো ছাত্র নয়, বড়লোকের ছেলে বলে সকলেই তাকে খাতির করে। কাজেই তাদের সেই হাসিটা নবাবজানের পক্ষেই জয় ঘোষণা করলে। এতগুলো সহপাঠীর সামনে সে অপমান সুকুমারের কাছে বড় মর্মান্তিক বোধ হলো। সে কিছুতেই তা যেন বরদাস্ত করতে পারছিল না। অথচ উপায়ও নেই। এতগুলো ছেলে রয়েছে তার বিপক্ষে। প্রতিশোধ নিতে যাওয়া উচিত হবে কিনা সে যখন ভাবছে তখন নবাবজান আবার তাকে গালাগালি দিয়ে উঠলো স্টুপিড, রাস্কেল বলে। এর পর আবার যেই সে সোয়াইন্ কথাটা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছে অমনি নেকড়ের মতন ঝাঁপিয়ে পড়লো সুকুমার তার ঘাড়ের ওপর। তারপর কিল, চড়, লাথি, থেকে আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি! অবশেষে বই খাতা মাটিতে ফেলে দিয়ে তারা রীতিমত মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হলো।

দু'টি ছেলে খপ করে তাদের বইগুলো ধুলো থেকে কুড়িয়ে নিয়ে নিজেদের জিম্মায় রাখলে।

কিন্তু এতক্ষণ যে সব সহপাঠীরা উভয়ের এই দ্বন্দ্বযুদ্ধকে হাততালি দিয়ে ও মুখে নানাপ্রকার শব্দ করতে করতে উৎসাহ দিচ্ছিল তারা সহসা থেমে গেল নবাবজানের বুকের ওপর সুকুমারকে চেপে বসতে দেখে। কয়েকজন তখনি ছুটে গিয়ে তাদের ধরে ফেললে এবং দুজনকে টানাটানি করে ছাড়িয়ে দিলে।

নবাবের গালের ওপর সুকুমার এমন ভাবে চিমটি কেটে নিয়েছিল যে, তা থেকে রক্ত পড়ছিল ঝুঁজিয়ে। কতকগুলো ছেলে সেদিকে নবাবের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সে পকেট থেকে একটা রেশমী রুমাল বার করে গালের রক্তটা মুছতে মুছতে বললে, ও তো কুত্তা, তাই কুত্তার মত আঁচড়ে দিয়েছে। তারপর একজনের হাতে রুমালটা গুঁজে দিয়ে বললে, দে তো ভাই, আমার গায়ের ধুলোগুলো ভাল করে ঝেড়ে।

সুকুমার নিজেই নিজের পায়জামা ও পাঞ্জাবির ধুলো হাত দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে বলে উঠলো, তুই তো একটা নেড়ী কুত্তা।

আবার রুখে এলো নবাবজান, খবরদার মুখ সামলে!

তুইও খবরদার, মুখ সামলে! বলতে বলতে সুকুমারও ফের তার দিকে তেড়ে গেল। যে সব ছেলেরা সেখানে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল তারা আবার কেউ

হাততালি দিয়ে উঠলো, কেউ বা মুখে শিষ টেনে বললে, লেগে যা ভেল্কী খেলা —দো দো আনা বাবু। কেলো হারে কি ভুলো হারে, দেখে যাও বাবু।

নবাবজানের চোখে যেন আগুনের শিখা জ্বলছিল। যেসব ছেলেরা তাকে ধনীর সন্তান বলে তোষামোদ করতো তাদের মধ্যে দু'একজন চুপিচুপি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে, দূর, তুই কোন কাজের নস্, দে না বেশ করে পালিশ দিয়ে, তারপর আমরা তো আছি—

নবাবজান তার বইগুলো আবার সহপাঠীদের হাতে দিয়ে জামার আস্তিন গুটোতে গুটোতে যেমন দু'পা এগিয়ে গেছে অমনি তাদের নজর পড়লো ক্লাস টীচার যোগেনবাবুর দিকে। তখন যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। যোগেনবাবুর বড় কড়া শাসন। তাঁকে ছেলেরা যমের মত ভয় করে।

ঝগড়াটা তখনকার মত থামলো বটে কিন্তু বাড়ীতে পা দিতেই নবাবজানের মুখের দিকে তাকিয়ে সুমিতা একেবারে শিউরে উঠলো। বললে, মেরি লাল, এ কেয়া হুয়া।

নবাবজানকে কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকতে দেখে তার মা অধীর হয়ে উঠলো, কি হয়েছে শিগ্গির বল? কে মেরেছে তোকে এমন করে?

ঘাড় নীচু করে সে জবাব দিলে, আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে।

তোদের ক্লাসের ছেলে? কার এতবড় আস্পদ্দা যে আমার ছেলের গায়ে হাত তোলে দেখি। দাঁড়াও তাকে মজা দেখাচ্ছি। বলেই তিনি হাঁক দিলেন, আব্দুল? আরে এ আব্দুল?

হুজুর! বলে সেলাম করে এসে দাঁড়ালো একজন ভৃত্য।

রাগে সুমিতার চোখ মুখ তখন রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে। রুক্ষস্বরে তাকে সে হুকুম দিলে, এখনি হেডমাষ্টারের কাছে নবাবকে নিয়ে যা, আর তাঁকে বলবি যে, মেমসাহেব বলে দিয়েছে নবাবের গায়ে হাত তুলেছে যে তাকে যেন কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। নইলে তিনি সেক্রেটারীর কাছে নালিশ করবেন।

নবাবজান আস্তে আস্তে বললে, এখন ছুটি হয়ে গেছে, হেডমাষ্টার সাহেব তো চলে গিয়েছেন।

সুমিতা বললে, তোকে যে মেরেছে তাকে চিনিস তো? সে কোথায় থাকে?

নবাবজান বললে, সে বোর্ডিংয়ে থাকে।

বোর্ডিংয়ে? বেশ তো তাহলে আব্দুলের সঙ্গে এখনি চলে যা, সুপারিনটেন্ডেণ্ট-এর কাছে। তাঁকে গিয়ে আগে দেখাবি তোর গালটা। কি সর্বনেশে ছেলে। এমন করে কি কেউ কখনো মারে?

আব্দুলের সঙ্গে নবাবজান তখনি বোর্ডিংয়ে চলে গেল। তারপর সুমিতা যা বলতে বলেছিল তার ওপর আরো দুপোঁচ রং চড়িয়ে সে বললে, যে ছেলেটি খোকাবাবুকে এমনি করে মেরেছে, তাকে আমাদের সামনে শাস্তি দিতে বলেছেন মেমসাহেব।

যোগেনবাবু ছিলেন বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। নবাবজানের ওই ধবধবে গালের ওপর কালশিরে পড়ে রয়েছে এবং তা থেকে তখনো রক্ত বেরোচ্ছে দেখে একেবারে অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডেকে পাঠালেন সুকুমারকে অপিস ঘরে।

সুকুমার শুষ্কমুখে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই যোগেনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, কেন তুই ওকে এইভাবে মেরেছিস ?

ও আমায় আগে মেরেছিল যে স্যার। মাটিতে ফেলে দিয়ে কি রকম মেরেছে দেখুন না, আমার কনুই, হাত পা সব কেটে গিয়েছে! বলে যেমন সুকুমার তাঁকে জামা সরিয়ে দেহের ক্ষত অংশগুলো দেখাতে গেল অমনি বেত নিয়ে সপাসপ ঘা কতক তার পিঠের ওপর বসিয়ে দিয়ে যোগেনবাবু বললেন, তোকে আগে মেরেছিল তা আমায় বলে না দিয়ে তুই ওর গায়ে হাত তুলেছিলি কেন? বুড়োছেলে! আর ওইভাবে মানুষ মারে কাউকে ? আর একটু হলে যে ওর চোখটা নষ্ট হয়ে যেতো! ফের যদি কোনদিন এরকম শুনি তো বোর্ডিং থেকে তোকে তাড়িয়ে দেবো। মনে থাকে যেন। যাও চলে যাও।

সুকুমার চলে যেতে নগেনবাবু নবাবজানকেও শাসিয়ে দিলেন। বললেন, অপরাধ তোরও কম নয়। তুই কেন ওকে আগে মেরেছিলি ? তুই যদি না আগে ওর গায়ে হাত তুলতিস তাহলে তো ও তোকে মারতে যেতো না।

নবাবজান বললে, আমি কিছু বলিনি স্যার। ও আগে আমায় পিছন থেকে লেঙ্গি মেরেছিল।

ধমক দিয়ে উঠলেন যোগেনবাবু, ফের যদি কোনদিন শুনেছি যে, মারামারি করেছো তো কঠিন শাস্তি দেবো। যা, বাড়ী চলে যা।

বাড়ীতে তাদের ঢুকতে দেখে প্রথমে সুমিতা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলে, কি হলো রে আব্দুল! সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-এর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

আব্দুল একগাল হেসে বললে, জী হ্যাঁ। দেখা না করে কি আমি আসি ?

কি বললেন তিনি ?

বলবেন আবার কি ? যা মারটা মারলেন ছেলেটাকে আমাদের সামনে।

তাই নাকি ? হাঁরে খুব মেরেছে ? খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সুমিতার মুখ!

আব্দুল এবার একগাল হেসে মেমসাহেবকে বললে, হ্যাঁ, চাবুক মেরে তার পিঠটা ফুলিয়ে দিয়েছে।

বেশ হয়েছে। বলে একটা ক্রুর উল্লাস মনের মধ্যে চাপতে চাপতে সুমিতা বলে ফেললে, এতবড় বদমায়েস যে ওর গালটা একেবারে ছিঁড়ে দিয়েছে নখ দিয়ে।

খুব কাঁদছিল তো ছেলেটা ?

আব্দুল বললে, কাঁদবে ওসব ছেলে ? একেবারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে খাড়া হজম

করলে, চোখ দিয়ে একফোঁটা জল পর্যন্ত বেরুল না—কি বিচ্ছুরে বাপ—

সুমিতা এবার কণ্ঠস্বরটা নামিয়ে নবাবকে জিজ্ঞেস করলে, কে রে সেই শয়তান ছেলেটা ? কোথায় তার বাড়ী ?

নবাবজান বললে, কি জানি আম্মা ! কিছুদিন হলো ও ছেলেটা ভর্তি হয়েছে আমাদের ক্লাসে, সুকুমার ওর নাম, বাড়ি নাকি কোলকাতায়।

কি বললি ! সু-কু-মা-র ? কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সুমিতার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন কিসের এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় চীৎকার করে ওঠে। সুকুমারের দেহের সেই বেত্রাঘাত তার জ্বালা নিয়ে যেন সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হয়ে তার সর্বাঙ্গে জ্বলতে থাকে ! কি করলুম ! বলতে বলতে ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগল সুমিতা। অনুশোচনায় তার সমস্ত অন্তর বুঝি জ্বলে পুড়ে যায়। কেন নিজে থেকে তাকে মার খাওয়াতে গেলুম। আহা বাছার আমার কত কষ্ট হচ্ছে—তাকে কে সান্ত্বনা দেবে। পৃথিবীতে তার আপন বলতে কে আছে। তাই বুঝি অভিমানে বাছার চোখে জল আসেনি। মনের ব্যথা মনে চেপে নিয়ে শুধু নিঃশব্দে কেঁদেছে। নিজের মনকে আর কি বলে বোঝাবে যেন ভেবে পায় না সুমিতা ! শুধু তার দেওয়ালে মাথা কুটে মরতে যেন ইচ্ছে করে।

দশ

এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পরের দিন সুকুমারদের ক্লাসে দুটো দলের সৃষ্টি হলো। সুকুমার প্রহৃত হয়েছে বলে, একদল খুব উল্লাস করলে। এদের সংখ্যাই বেশী। এরা নবাবজানের মোসাহেবী করে, বড়লোকের ছেলে বলে তার ঘাড় ভেঙ্গে যখন তখন ভালমন্দ খায়।

অবশ্য অপর দল সংখ্যায় অল্প হলেও নবাবজানের এই আচরণ বরদাস্ত করতে পারলে না। তারা বললে, এটা নবাবের ভারী অন্যায়। বাড়ী থেকে লোক ডেকে এনে সুকুমারকে এইভাবে মার খাওয়ানোর তারা তীব্র নিন্দা করলে।

ক্লাসে নতুন ছেলে বলে তখনো সুকুমারের সঙ্গে বিশেষ কারো ভাব জমেনি। তাছাড়া দিল্লী শহরের বড় লোকের ছেলেদের সব আদব-কায়দা চালচলন, ভাব-ভঙ্গীই আলাদা। তাদের সঙ্গে মিশতে সুকুমারের কেমন যেন ভয় ভয় করতো।

ক্লাসে গিয়ে চুপচাপ পিছনের দিকের একটা বেঞ্চিতে বসে থাকতো সে। যদিও তার সইমা সবদিক দিয়ে তাকে বড়লোকের মতই ব্যবস্থা করে দিয়েছিল—থাকা, খাওয়া, বেশভূষা, কোন কিছুরই কার্পণ্য করেনি তবু যেন পদে পদে কেমন একটা সংকোচ, কেমন একটা জড়তা বোধ করতো সুকুমার। দীর্ঘ দিনের দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা ভোগের অভ্যাসের ফলে তার মনে যে হীনমন্যতা আশ্রয় করেছিল তাকে যেন কিছুতেই দূর করতে পারছিল না। সিল্কের পায়জামার সঙ্গে মূল্যবান

বুসসার্ট ও কাবলী জুতো পরে চলতে গেলে তার পা যেন কে আটকে ধরতো। আবার বোর্ডিংয়ের 'ডাইনিং রুমে' চেয়ার টেবিলে বসে ঝকঝকে কাঁচের পাত্র থেকে খেতে গেলে তার গলা দিয়ে যেন খাবার নামতে চাইত না। সুপ, মাছের ফ্রাই, কাটলেট, পুডিং প্রভৃতি কাঁটা চামচে করে গালে ফেলবার সময় প্রতিদিন তার মনে পড়ে যেতো বাড়ীর কথা। ভাতের ওপর কুচো চিংড়ীর ঝোল, তার সঙ্গে পুঁই ডাঁটার চচ্চড়ি কিংবা একটুখানি জলের মত ডাল—তাও হয়ত সবদিন জুটতো না। সৎমার দেওয়া সেই হতশ্রদ্ধার খাদ্যের কথা মনে পড়ে তার চোখের কোণ ভিজে উঠতো।

ভেল্কীবাজীর মত কোথা দিয়ে এবং কেমন করে যে তার অবস্থার এতবড় পরিবর্তন সম্ভব হলো তা ভাবতে গেলে সুকুমারের যেন মাথা ঝিম ঝিম করে। অথচ তার সইমা নিজের ছেলেদের জন্যে এরকম ভাল ব্যবস্থা না করে, তার জন্যেই বা করতে গেল কেন, সেও আর এক রহস্য তার কাছে। ভেবে কোন কিছুরই কূল কিনারা পায় না যেন সুকুমার! সত্যি এ যেন তার নবজন্ম। সম্পূর্ণ নতুন জীবন, নতুন পরিবেশ!

নবাবজানের সঙ্গে মারামারির ফলে যে শাস্তি পেলে সুকুমার তা যেন তার কাছে শাপে বর হলো। একদল সহপাঠী বিশেষত যারা নবাবকে দু'চক্ষে দেখতে পারতো না তারা স্বভাবতই সুকুমারের দিকে ঢললো এবং দেখতে দেখতে তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা জমে উঠলো তার।

এতে কিন্তু নবাবজানের আক্রোশটা আরো বেড়ে গেল সুকুমারের ওপর। ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলার সময় দুটো দল হলে স্বভাবতই নবাবজান সুকুমারের বিরুদ্ধে যেতো। ভলিবল, টেবিল-টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, ফুটবল, হকি যখনই যে খেলা হতো, সুযোগ ও সুবিধা পেলেই নবাব সুকুমারকে হারাতে চেষ্টা করতো বটে, তবে অধিকাংশ সময়ই সে ব্যর্থ হতো। এক একদিন বল খেলতে গিয়ে ঈর্ষার জ্বালা চাপতে না পেরে হঠাৎ নবাব 'ফাউল' করে বসতো। সুকুমারকে খেলা ছেড়ে এমন নির্দয় আঘাত করতো যে, উঃ বলে সে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠতো! একদিন হকি খেলার সময় তার পায়ে স্টিক দিয়ে এমন মারলে নবাব যে সুকুমার মাঠে শুয়ে পড়লো এবং তার পা-টা দেখতে দেখতে ফুলে উঠলো ঢোল হয়ে।

পড়াশুনার ক্ষেত্রে গায়ের জোর চলে না তাই সুকুমারকে ক্লাসে লেখাপড়ায় ভাল করতে দেখলে যেন ভেতরে ভেতরে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরতো নবাব। লেখাপড়ায় নবাব কোনদিনই ভাল ছিল না। সুকুমার হেডমাষ্টারের কাছে ইংরাজী পড়তো, অঙ্ক ও ইতিহাস পড়তো সেকেণ্ড মাষ্টারের কাছে। সপ্তাহে তিনদিন ইংরাজী, তিনদিন অঙ্ক ও ইতিহাস। বলাবাহুল্য এসব ব্যবস্থাই সুমিতা আগে থাকতে করে রেখেছিল এবং প্রতি মাসে সেই দু'জন শিক্ষককে তার জন্যে এক শত টাকা করে সে বেতন দিতো। অবশ্য সবটাই অঞ্জলির নাম করে পাঠাতো।

টাকা পয়সার জন্যে সুকুমারকে চিন্তা করতে সইমা বারবার নিষেধ করে

দিয়েছিল। প্রতি মাসেই একখানা দু'খানা করে চিঠি দিয়ে ওই কথাটাই অঞ্জলি বারবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিত যে, লেখাপড়া ভাল করে না শিখলে এবং মানুষের মত মানুষ হতে না পারলে তাকে সে মায়ের কাছে পাঠাতে পারবে না। সব সময় যেন তা মনে রাখে সুকুমার!

সইমার এক একখানা চিঠি আসে আর মায়ের কথা বেশী করে মনে পড়ে সুকুমারের। মায়ের কাছে যে সত্যি সে একদিন যাবে, এ কথাটা কল্পনা করতেও যেন তার সারা দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। শুধু লেখাপড়ার কথা কেন, পৃথিবীর সবকিছু তখন সে ভুলে যায়। বইয়ের পাতা খোলা পড়ে থাকে, তার মন উড়ে চলে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে। কখনো বা নিঃশব্দে সইমার সেই চিঠিখানা হাতে করে বসে বসে শুধু সে ভাবে আর ভাবে। আর তার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

একটার পর একটা বছর যেমন কাটে তেমনি ক্রমশঃ স্কুলে লেখাপড়ায় ভালছেলে বলে একটু একটু করে খ্যাতি বাড়তে থাকে সুকুমারের।

হেডমাষ্টার ইংরাজী পড়াতে পড়াতে প্রায়ই আক্ষেপ করে বলেন, সুকু তুই শুধু পাঠ্যপুস্তকগুলোতে একটু মন দে, তাহলে তোর ফার্ষ্ট সেকেন্ড হওয়া ক্লাসে কেউ রুখতে পারবে না।

সুকুমার লজ্জিতস্বরে উত্তর দেয়, স্যার এইবারে ঠিক পড়বো।

কিন্তু ওই পর্যন্ত। পাঠ্যপুস্তকগুলোকে দেখলেই তার মন কেমন যেন বিরূপ হয়ে ওঠে। তার মধ্যে সে যেন কোন রস পায় না। সেই সময়টা বরং সে স্কুল লাইব্রেরী থেকে আনা ইংরাজী ও বাংলা যত রাজ্যের সব অপাঠ্য উপন্যাস ও রোমাঞ্চকর পুস্তকের মধ্যে ডুবে থাকে।

ইতিহাসের শিক্ষক যিনি, তাঁরও সেই এক অভিযোগ তার সম্বন্ধে! কতদিন তিনি হেডমাষ্টার মশাইকে ডেকে বলেছেন, ছেলেটা অসাধারণ মেধাবী কিন্তু পাঠ্যপুস্তক একেবারে ছোঁয় না, তা নাহলে বাংলায় ওর যা জ্ঞান স্কুলের আর কোন ছেলের তা নেই। তারপর একটু থেমে আবার বলেন, কিন্তু ওই এক রোগেতেই মরেছে। নভেল পেলে আর কিছু চায় না।

একদিন তো পড়াতে পড়াতে রাগ করে তিনি বলেই ফেললেন, ওই নভেল-গুলোই তোর মাথা খাচ্ছে। ফের যদি কোনদিন তোর টেবিলে কোন নভেল দেখেছি তো ছিঁড়ে ফেলে দেবো জানলা গলিয়ে, বলে দিলুম। হুঁ, আমার রাগ জানিস না। একটু পরে আবার মিষ্টি গলায় বলেন, বাবা একটু পাঠ্য বইটায় মন দে তাহলে তোর ফার্ষ্ট হওয়া কে আটকায় একবার দেখি।

ফার্ষ্ট হওয়ার কথা শুনে নিমেষে তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় মায়ের সেই স্নেহমাখা মুখখানা। সইমা কয়েকদিন আগে তাকে যে চিঠি দিয়েছে, তাতে লিখেছে, ফার্ষ্ট হলেই তাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবে। সুকুমার সেই শিক্ষক মশাইয়ের কাছে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে বলে, এবার

ঠিক পড়বো মাষ্টার মশাই দেখে নেবেন।

কয়েকদিন হয়ত পড়েও কিন্তু আবার শৈথিল্য দেখা দেয় পাঠ্যপুস্তকে।

সুমিতা ছেলেকে ধরা দেয় না কিন্তু দূর থেকে সব লক্ষ্য করে। সুকুমারের কৃতিত্ব ও গুণপনা যত বাড়ে তার মনে পুত্রের জন্যে স্নেহও তত উথলে পড়ে। সন্তানগর্বে এক এক সময় তার বুক ভরে ওঠে কিন্তু মুখে সেকথা কাউকে প্রকাশ করে না। বরং একটা কঠোর ঔদাসীন্যের আবরণে মনের সে উল্লাসকে ঢেকে রাখে। সবচেয়ে বেশী ভয় তার গিয়াসুদ্দীনকে, যদি কোনদিন কোনরকমে প্রকাশ পায় যে, সুকুমার তার ছেলে আর তারই কৃতিত্ব চোখে দেখার জন্যে যখন তখন সে স্কুলের সব ব্যাপারে ছুটে ছুটে আসে, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।

তাই গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে সবসময় তাকে অভিনয় করতে হতো। স্কুলের বাৎসরিক খেলাধূলা দেখতে গিয়ে সুকুমার যখন সকলের প্রশংসা অর্জন করে তখন সুমিতা চুপ করে থাকতো, মুখে কোন উৎসাহ দেখাতো না। বরং সুকুমারের খেলার যদি প্রশংসা করতো গিয়াসুদ্দীন তাহলে সে মুখটা বেঁকিয়ে বলতো, ও তো ভারী খেলোয়াড়, আমার মনে হয় ওর চেয়ে অনেক ভাল খেলছে সেই যে লাল জামা গায়ে দেওয়া ছেলেটি। বলে সুমিতা অপর একজনকে দেখিয়ে দিতো মাঠে!

গিয়াসুদ্দীন যখন হেসে তার জবাব দিতো, তুমি কিছু বোঝো না খেলার তখন মনের মধ্যে যে খুশির তুফান উঠতো সুমিতার, তা বোধ হয় একমাত্র অন্তর্যামী ছাড়া আর কারো সাধ্য ছিল না ধরবার।

এইভাবে মুখে তার কাছে যত হার মানে সুমিতা তত কিন্তু খুশি হয় মনে মনে।

স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ সভায় উপস্থিত হয়ে যখন দূর থেকে সুমিতা দেখতো যে, সুকুমার তিন-চারটি পুরস্কার একসঙ্গে গ্রহণ করছে, তখন তার বুকের স্পন্দন যেন থামতে চাইতো না। অপলক নেত্রে শুধু ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকতো। তার ইচ্ছা করতো তখনি ছুটে গিয়ে সকলের সামনে একবার সুকুমারকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। পুরস্কার কি একটা পায় সুকুমার? ভাল রচনা লেখার জন্যে স্বতন্ত্র পুরস্কার! ইংরাজীতে প্রথম স্থান অধিকার করার জন্যে পৃথক পুরস্কার! আবার ভাল ছেলে বলে সৎস্বভাবের জন্যে পুরস্কার! এছাড়া লেখাপড়ায় তৃতীয় স্থান অধিকার করার জন্যে তো আছেই। সেদিন বাড়ীতে ফিরে ঘরে দোর দিয়ে সুমিতা খুব খানিকটা কেঁদে তবে মনটাকে হাল্কা করতো।

একদিন সুমিতাকে একা নবাবজানের ঘরে ঢুকে তাদের স্কুলের মাসিক পত্রিকাটা হাতে করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গিয়াসুদ্দীন পা টিপে টিপে সুমিতার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো। এমন নিঃশব্দে সে এসেছিল যে, সুমিতা কিছুই টের পায়নি। সুকুমারের কবিতা পড়ে সুমিতা তখন যেন কেমন বিমনা হয়ে পড়েছিল। স্কুলের পত্রিকার সেই সংখ্যায় যে কবিতাটি লিখেছিল সুকুমার

তার নাম ছিল 'মায়ের প্রতি !' তার ভাবার্থ হচ্ছে এই রকম—মা তুমি যদি দূরে থাক ক্ষতি নেই, তোমার মূর্তিখানি আমি দিবারাত্র পূজো করবো আমার মনের মন্দিরে। তাহলে যেদিন আমার এ পূজা সার্থক হবে সেদিন তোমার সাক্ষাৎ আমি পাবোই পাবো। আর যদি দেখা না পাই তাতেও ক্ষোভ নেই, যেন তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে আমার মৃত্যু হয় মা।

এর প্রতিটি অক্ষরে যে ব্যথা, যে বেদনা লুকনো ছিল একই সঙ্গে তার সবটুকু যেন তখন সুমিতার বক্ষে উদ্বেল হয়ে উঠে। তাই গিয়াসুদ্দীনের উপস্থিতির কথা সে বিস্মৃত হয়েছিল।

গিয়াসুদ্দীন কিছুক্ষণ চুপ করে তার পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে জিজ্ঞেস করলে, আজকাল দিনরাত তুমি কি এত ভাবো বল তো আমিনা ?

চমকে উঠে মনের ভাব গোপন করে নিলে সুমিতা। তারপর সে কথার জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখে হাসি টেনে এনে বললে, এই দেখো নবাবদের স্কুলের পত্রিকায় কেমন সব সুন্দর সুন্দর লেখা ছেলেরা লিখেছে।

কিন্তু তার জন্যে তোমার এত চিন্তা, চোখে জল কেন আমি তো বুঝতে পারছি না আমিনা ?

সুমিতা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে ছেলের কথা ভেবে !

গিয়াসুদ্দীন বাংলা জানতো না, তাই সুকুমারের বাংলা হরফে ছাপা কবিতার কিছুই বুঝতে পারলে না, শুধু পত্রিকাটায় যে সব ইংরাজী ও হিন্দী লেখা ছিল সেগুলো উল্টে-পাল্টে একটু আধটু পড়ে বললে, বাস্তবিক, তুমি ঠিকই বলেছো ! নবাবের লেখা যদি এমনি ভাবে ছাপা হতো এতে !

সুমিতাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে আবার বললে, আচ্ছা আমিনা নবাবকে তুমি এসব একটু-আধটু তো শেখাতে পারো ? তুমি ওর লেখাপড়া আজকাল একেবারে দেখো না কিছুই। গিয়াসুদ্দীনের কণ্ঠে যেন অভিযোগের সুর ধ্বনিত হয়।

সুমিতা জবাব দিলে, এসব জিনিস কি শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করার ? একটা সম্পূর্ণ পৃথক অনুভূতি থেকে এর জন্ম। এ নিয়ে মানুষ জন্মায় ! তাই লোকের অনুপাতে শিল্পীর সংখ্যা পৃথিবীতে এত কম।

গিয়াসুদ্দীনের মনে এতে আরো রাগ হয়। সে বলে, এই যে এতগলো ছেলে লিখেছে, সকলেরই কি তাহলে এই গুণ আছে, শুধু নবাবের নেই ?

এবার ফিক্ করে হেসে উত্তর দেয় সুমিতা, সে তো তোমারই ছেলে, তার কাছে এর চেয়ে বেশী আর কি আশা করা যায়। বাপ, আর্ট যে পথ দিয়ে চলে তার ধার দিয়েও হাঁটে না, তার ওপর একে ব্যবসাদার, তায় আবার চামড়ার ব্যবসায়ী। বলে নিজের রসিকতায় নিজেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

এতে বুঝি গিয়াসুদ্দীনের আত্মসম্মানে ঘা লাগে ! একটু থেমে সে তাই জবাব দিলে, আমি না হয় চামড়ার ব্যবসা করি কিন্তু তার মা তো বিদুষী, তবে

তোমার ছেলের হবে না কেন ? আমার মনে হয় তুমি চেষ্টা করলেই হতে পারে।

এমনি করে সুকৌশলে অনেক সময় তার কাছে সুকুমারের চিন্তাটা গোপন করে ফেলতো সুমিতা। এটা হয়ত অন্যায় সুমিতার পক্ষে কিন্তু তবু সে পারে না নিজেকে নিবৃত্ত করতে সুকুমারের চিন্তা থেকে। কেন, তা বুঝি একমাত্র ঈশ্বর জানেন !

এগারো

সেদিন সেজেগুজে সুমিতা গিয়াসুদ্দীনকে ডাকতে গিয়ে দেখলে তখনো সে কতকগুলো চামড়ার টুকরো নিয়ে পরীক্ষা করছে।

ওমা, তুমি এখনো বসে রয়েছো, চারটেয় যে প্রাইজ আরম্ভ, আর মাত্র পনেরো মিনিট সময় আছে, ওঠো শিগ্‌গির।

মুখ তুলে কি বলতে যাচ্ছিল গিয়াসুদ্দীন কিন্তু সুমিতার সাজসজ্জার দিকে চেয়ে সহসা থেমে গেল। সত্যি, সাজটা সেদিন খুবই বেশী করে ফেলেছিল সুমিতা। জ্ঞাতসারেই করেছিল কিংবা সুকুমার তার জ্যেষ্ঠপুত্র এতগুলো পুরস্কার পাবে, সেই আনন্দে মনের উচ্ছ্বাস চাপা দিতে গিয়ে স্বভাবধর্মে ওটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তা কে জানে।

যাহোক, মোট কথা গিয়াসুদ্দীনের চোখে সেটা ভাল লাগল না একেবারেই। মুহূর্ত-কয়েক চুপ করে কি ভেবে সে শুধু জবাব দিলে, আমি যাবো না। তুমি চলে যাও।

কেন যাবে না ? বলে সুমিতা তার হাত থেকে সেই চামড়ার টুকরোগুলো কেড়ে নিতে গিয়ে বললে, আজ তো রবিবার, ছুটির দিন ঘরে বসে কি করবে, চলো না একটু বেড়িয়ে আসি !

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে এবার গিয়াসুদ্দীন উত্তর দিলে, সকলের ছেলে প্রাইজ নিয়ে আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে যাবে অথচ আমার ছেলে পাবে না। সে দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারবো না। বলে সুমিতার মুখের ওপর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীর আর মর্মভেদী স্বরে বললে, তুম্‌কো শরম নেহি আতি ?

কেঁও! সঙ্গে সঙ্গে যেন আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত করলে আমিনা।

গিয়াসুদ্দীন বলে, সত্যি আমি আশ্চর্য হয়ে যাই আমিনা তোমার শরম লাগে না এই রকম বেশভূষা করে সেখানে যেতে ?

সুমিতার চোখ দুটো এবার অপমানে যেন জ্বালা করে ওঠে। সে বললে, শরম ? কিসের শরম ? যে স্কুলে হাজার ছেলে পড়ে, সেখানে সকলে কি প্রাইজ পায় ? যারা পায় না তাদের উৎসাহ আসে যারা পায় তাদের দেখে, তাই

সেখানে নবাবকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া আমাদের বেশী কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

বেশ তুমি তোমার কর্তব্য করোগে কিন্তু আমি পারবো না, মুঝে মাফ কিজীয়ে! আমায় মাফ করো। বলে সে-ঘর থেকে তখনি বেরিয়ে চলে গেল গিয়াসুদ্দীন।

সুমিতা সেই অপমানটা গায়ে না মেখে তখনি ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে মোটরে গিয়ে উঠলো। তার চোখের সামনে সুকুমারের প্রাইজ পাওয়ার দৃশ্যটা যেন ভাসতে থাকে! দেরী হয়ে গেলে পাছে সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় তাই মোটর ড্রাইভারকে আরো জোরে চালাতে হুকুম দিলে।

সুকুমার অন্য বছরের মত এবারও একসঙ্গে অনেকগুলো প্রাইজ পেলে! তার সে পুরস্কার পাওয়ার সব আনন্দটুকু দু'চোখ ও বুকে ভরে নিয়ে যখন সুমিতা বাড়ী ফিরে এলো তখন ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই গিয়াসুদ্দীন বলে উঠলো, দেখো আমিনা আমি ঠিক করেছি নবাবকে বাড়ীতে পড়াবার জন্য এবার ওদের স্কুলের হেডমাষ্টার আর অঙ্কের মাষ্টারকে রাখবো। আমি খবর নিয়ে জানলুম ওঁরা দু'জনে নাকি অদ্ভুত ভাল পড়ান। আর যেসব ছেলেরা ওঁদের কাছে প্রাইভেট পড়ে তারাই স্কুলে পাইজ পায়।

বেশ তো, রাখো না তাঁদের।

নবাব ঠিক সেই সময়ে ঘরে এসে ঢুকেছিল কি কাজে। বললে, কিন্তু আব্বাজান তাঁদের তো পাওয়া যাবে না।

ভ্রূ-কুঁচকে লিয়াসুদ্দীন জিজ্ঞেস করলে, কেন?

নবাব বললে, আমাদের ক্লাসের আরো দু'তিনজন পড়াবার জন্য তাঁদের অনুরোধ করেছিল কিন্তু তাঁরা রাজী হননি, সকালে বিকালে ছাত্র আছে বলে।

আচ্ছা তার জন্যে তোমায় কোন চিন্তা করতে হবে না। রাজী করাবার ওষুধ কি তা আমি জানি। বলে দম্ভে স্ফীত হয়ে ওঠে গিয়াসুদ্দিন।

আমিনা বললে, ভালই তো, চেষ্টা করে দেখ না। নবাব যদি প্রাইজ পায় তাহলে আনন্দ কি আমার কম!

পরের দিনই গিয়াসুদ্দীন এসে সগর্বে আমিনাকে খবর দিলে যে নবাবকে বাড়ীতে পড়াবার জন্যে সে ঠিক করে এসেছে ওদের হেডমাষ্টার আর অঙ্কের শিক্ষককে। তারপর একটু থেমে বললে, প্রথমে অবশ্য রাজী হতে চাননি, তখন মোক্ষম ওষুধ দিলুম। বললুম, এর জন্যে একশো টাকা করে মাইনে দেবো। ব্যস কাম্ ফতে। সকালে সেক্রেটারীর ছেলে না মেয়েকে পড়াতে হয়, সেটা কিছুতেই ছাড়তে পারবেন না কেউই। তবে রাত্রের টুইশানটা ছেড়ে দেবেন।

নবাব বললে, রাত্রে? রাত্রে তো সুকুমারকে পড়ান।

গিয়াসুদ্দীন এবার কণ্ঠে জোর দিয়ে বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই ছেড়ে দেবেন বলেছেন তাঁরা দু'জনে। আমিনার মুখের দিকে গিয়াসুদ্দীন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, এ জগতে পয়সা খরচ করলে কিনা পাওয়া যায়? কি বলো ভাল

করিনি ?

সুকুমারের নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমিনার মুখটা শুকিয়ে উঠেছিল ! তবু জোর করে মুখে হাসি টেনে সে গিয়াসুদ্দীনের কথার জবাব দিলে, খুব ভাল করেছো। তারপর নবাবের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলে উঠলো, এবার কিন্তু ভাল করে পড়াশুনা করতে হবে, আসছে বছর তোমার প্রাইজ পাওয়া চাই। মনে রেখো !

নবাবজান মুখে সম্মতি জানিয়ে তখনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সুকুমারের লেখাপড়ার কি হবে ? এই চিন্তাটাই তখন সুমিতার মনকে দগ্ধ করতে থাকে ভেতরে ভেতরে। সুকুমার এই বছর পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। সামনে বছর হয়ত ফার্স্ট কি সেকেন্ড হবে। কিন্তু এই উন্নতির মুখে যদি এভাবে তার লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটে ! যদি আবার বিগড়ে যায় সে ?

ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে চোখে ঘুম আসে না সুমিতার। রাতের পর রাত বিনিদ্র কেটে যায়। এক-একদিন এমনও মনে হয় যে, আরো বেশী টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে মাষ্টারদের গিয়াসুদ্দীনের কাছ থেকে। আবার গিয়াসুদ্দীনের কথা ভেবে থেমে যায়। ভীষণ একরোখা বদ-মেজাজী লোক সে। নিজের জিদ বজায় রাখবার জন্যে হয়ত হাজার হাজার টাকা খরচ করতেও সে পিছবে না। তাছাড়া কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে যদি সাপ বেরিয়ে পড়ে, দরকার কি ? থেমে যায় সুমিতা। কিন্তু তবু তার বুকে কেমন যেন একটা প্রতিহিংসার স্পৃহা জাগে মাঝে মাঝে।

এদিকে সুকুমার কিন্তু চিঠি লিখে আগেই সেই খবরটা জানিয়ে দিয়েছিল সইমাকে। সে লিখেছিল, ভালই হয়েছে সইমা। মাষ্টারদের পিছনে মিছিমিছি তোমায় আর এক কাঁড়ি করে টাকা খরচ করতে হবে না। আমি এখন একাই লেখাপড়া করতে পারবো। ইংরেজী ও অঙ্কে আর এখন আমি কাঁচা নেই। আশা করি গৃহশিক্ষক ছাড়াও সামনের পরীক্ষা ভালই দেবো। তুমি একদম ভেবো না।

অঞ্জলির চিঠিতে সুকুমারের এই মনোভাবের কথা পড়ে সুমিতার মনে কিন্তু আশার চেয়ে আশঙ্কাই হয় বেশী।

মায়ের কথা ইদানীং বড্ড বেশী মনে পড়ে সুকুমারের !

হোষ্টেলের ছাত্রদের সকলেরই মা আছে। তাদের কাছে মায়ের লেখা চিঠি আসে। তারাও নিয়মিত মাকে জবাব দেয়। আবার ছুটি হলেই মায়ের কাছে চলে যায়। এই সময়টা সুকুমারের মন ভয়ানক খারাপ লাগে। এক-একবার সে ভাবে সইমার কাছে চলে যাবে কিনা কিন্তু পাছে তার বাবা টের পেলে আবার আটকে ফেলে সেই ভয়ে একথা চিন্তাতেও সে আনতো না। বাপ ও সৎমা তার জীবনে যেন একটা বিভীষিকা। তার চেয়ে বেশ আছে এই দিল্লী শহরে !

এক-একদিন কিছুতেই যেন তার চোখে ঘুম আসে না। মধ্য রাত্রে উঠে

করুণ ভাষায় চিঠি লিখতে বসে অঞ্জলিকে। বলে, সইমা আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার কাছে ভাল করে লেখাপড়া শিখবো, কিন্তু তার আগে শুধু মাকে একবার দেখবো। বড্ড তাকে দেখতে ইচ্ছা করে। তার সেই মুখ, সেই চোখের জল সর্বদা আমার সামনে যেন ভাসে। তুমি যদি ঠিকানাটা দাও তো আমি পরিচয় না দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে শুধু একবার তাকে দূর থেকে দেখে চলে আসবো। আমায় বিশ্বাস করো। তোমার পায়ে ধরে শুধু এইটুকু ভিক্ষা চাই। আমায় দয়া করো, আমায় বাঁচাও সইমা! আমার মা বেঁচে আছেন অথচ তাঁকে চোখে দেখবার অধিকারও আমার নেই। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কি পৃথিবীতে থাকতে পারে, তা আমার জানা নেই। আমার মনের ভেতরটা যদি তোমাকে দেখাতে পারতুম তাহলে বোধহয় তোমার মনে করুণা হতো।

অঞ্জলি এ চিঠি আর যেন পড়তে পারে না। চোখের জলে ভেসে যায় চিঠিখানা। এক-একদিন সেও অস্থির হয়ে ওঠে। ভাবে, না ছেলেটাকে আর এইভাবে কষ্ট দেবো না। কাগজ কলম টেনে নিয়ে চিঠিও লিখতে বসে সুকুমারকে। কিন্তু সুমিতার ঠিকানাটা লিখে ফেলে, একটু পরে চিঠিটা পড়ে আবার ভাবে, ছেলেমানুষ যদি মাকে দেখে মনের আবেগে এমন কিছু করে বসে যার জন্যে হয়ত সুমিতার সঙ্গে গিয়াসুদ্দীনের কোন মনোমালিন্য ঘটে! আর ভাবতে পারে না অঞ্জলি, কিন্তু তখন কে তাকে লেখাপড়া শেখাবে? কে তাকে মানুষের মত মানুষই বা করবে? তার চেয়ে এই ভালো। ছেলেটা তো মানুষ হোক। চিঠিটা লিখে আবার কুটিকুটি করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয় অঞ্জলি।

বারো

এদিকে নবাবজানের জন্য ভাল গৃহশিক্ষক রেখেও কোন সুবিধা হলো না। পরের বছর প্রাইজ পাওয়া দূরের কথা, পরীক্ষার ফল বরং আগের চেয়ে সে আরো খারাপ করলে। অথচ সেবার ফার্ষ্ট হয়ে দশম শ্রেণীতে উঠলো সুকুমার!

গিয়াসুদ্দীন বেশ চিন্তিত হয়ে ওঠে ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে! তাই দেখে সুমিতা কিন্তু মনের মধ্যে যেন একটু উল্লাস বোধ করে। গিয়াসুদ্দীনের এ পরাজয় যেন তার কাছে নয়, সুকুমারের কাছে। নবাব ও সুকু দু'জনেই তার সন্তান, তবু সুকুমারের উন্নতিতে সুমিতা যেন বেশী সুখ বোধ করে। এক-একবার এই পক্ষপাতিত্বের কথা ভেবে নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পায় সুমিতা। তবু তার সমস্ত মন সুকুমারের উন্নতির দিকে পড়ে থাকে কেন তা বুঝতে পারে না।

আনারকলি বড় হয়েছে। দাদার সঙ্গে তার খুব ভাব। সে একদিন নবাবের লেখাপড়ায় এই শৈথিল্যের আসল কারণটা মায়ের কাছে চুপি চুপি বলে দিলে।

সে নাকি লক্ষ্য করেছে তার দাদার খাতার মধ্যে সিনেমার নায়িকাদের ছবি। তাছাড়া তার ইয়ার বন্ধুও আজকাল জুটেছে অনেক। তাদের সঙ্গে নাকি সে সিগারেট খায়, স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখে, মেলায় গিয়ে জুয়া খেলে।

এসব খবর আনার ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণী জানতো না। আনারও হয়ত সব খবর পুরোপুরি জানে না। তবে কিছুটা সে রাখতো কারণ কোনদিন একটা কাশ্মীরী পাউডার কেস, কোনদিন বা ভ্যানিটি ব্যাগ কিনে এনে নবাব বোনকে উপহার দিতো। কারণ বোনের কাছ থেকে ভুলিয়ে প্রায়ই সে টাকাকড়ি নিয়ে যেতো।

আনার ছিল বাপের খুব পেয়ারের মেয়ে। গিয়াসুদ্দীনের কাছে আবদার করে সে কোন কিছু চাইলে কখনো সে না বলতে পারতো না। ভ্যানিটি ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে আনার স্কুলে পড়তে যেতো। বান্ধবীর সংখ্যাও ছিল তার অনেক। তাদের নিয়ে রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া করতে ভালবাসতো আনার। সে যে একটা বিরাট ধনীর কন্যা একথাটা কখনো ভুলতে পারতো না। তাই বান্ধবীরা রেস্তোরাঁর বিল দিতে গেলে সে তাদের হাত থেকে টাকা কেড়ে নিয়ে নিজেই সবটা দিয়ে দিতো। এছাড়া স্কুলের খেলাধুলা, থিয়েটার কোন চ্যারিটি শো, সব তাতেই সে সবচেয়ে বেশী চাঁদা দিয়ে বড়লোকিয়ানা বজায় রাখতো।

অবশ্য এ-শিক্ষাটা বাপের কাছ থেকেই লাভ করেছিল আনার। গিয়াসুদ্দীন সর্বদা ছেলেমেয়েকে বলতেন যে, তোমরা এমনভাবে চলবে যাতে কেউ তোমাদের গরীব ভেবে ঘৃণা না করে। মনে রেখো এ দুনিয়াটা হলো পয়সার দুনিয়া, যে যত পয়সা ছড়াবে তার তত সম্মান, তত খাতির।

ছেলেমেয়েদের হাত খরচের জন্য যথেষ্ট টাকা ব্যয় করতে তাই বাপ কোনদিন দ্বিধা বোধ করতো না। তাদের বেশভূষায়, চালচলনে কোথাও না গরিবানা প্রকাশ পায় সেদিকে কড়া নজর দিত। স্কুলের অন্যান্য ধনীর সন্তানদের ওপর টেক্কা দেবার জন্যে তাই তারা ভাইবোন সবচেয়ে বেশী খরচ করতো।

সত্যি, স্কুলের দাসী চাকরানী থেকে বেয়ারা দারোয়ানরা সবচেয়ে বেশী সেলাম করতো আনারকে ও নবাবজানকে। তাদের দু'জনেরই কাছ থেকে তারা প্রায়ই মোটা মোটা বকশিশ পেতো, পালপার্বণ ছাড়াও।

মেয়েদেরও একটা দল সর্বদা আনারের মোসায়েবী করে চলতো। কোনদিন 'লেক ওখলায়' তারা আনারের নতুন বিরাট মোটরে চড়ে বেড়াতে যেতো, কোনদিন বা কুতুবমিনারে, কখনো বা খেলার মাঠে। আজ এম্ সি সির ক্রিকেট দল, কাল অলিম্পিকের ফুটবল খেলা, তার পরের দিন হয়তো জাপানের টেনিস খেলোয়াড় — সবটাতেই আনার বন্ধুবান্ধব সঙ্গে করে দেখতে যেতো।

একদিন এমনি একটা প্রদর্শনী ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে সুকুমারের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে আনারের আলাপ হয়ে গেল। পরিচয়টা অবশ্য করিয়ে দিলে নবাব। সুকুমার ভাল ছেলে বলে ক্লাসে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, এখন আর নবাব

তার প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করে না। বরং তার তোষামোদ করে। ঠিক তার পিছনের সিট্-এ বসেছিল সুকুমার। এত দামী টিকিটে সুকুমার কখনো যায় না, তবে সেদিন আর কোন সিট্ খালি না থাকায় সুকুমার ওই স্পেশাল টিকিট কাটতে বাধ্য হয়েছিল! ফুটবল খেলা দেখতে সে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে।

নবাবরা ভাইবোন বসেছিল পাশাপাশি। প্রথমে তারা কেউই সুকুমারকে দেখতে পায়নি। হঠাৎ নবাবের কানে গেল সুকুমারের গলা। কাকে সে যেন ফুটবল খেলার ইতিবৃত্ত বোঝাচ্ছিল। পিছন দিকে ফিরেই নবাব বলে উঠলো, আরে সুকুমার যে! কখন এলি?

সুকুমার বললে, এই তো তোদের আসার মিনিট দশেক আগে।

তখন আনারকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে নবাব বললে, যার কবিতা স্কুলের ম্যাগাজিন-এ পড়ে তোর খুব ভাল লেগেছিল, এ সেই কবি সুকুমার চক্রবর্তী।

মধুর হেসে অভিবাদন করলে আনার। তারপর বললে, সত্যি, আপনার কবিতা পড়ার পর থেকে আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্যে মনে ভারী ইচ্ছা হয়েছিল। বড্ড ভাল লাগে আপনার কবিতা।

তাই নাকি?

নাকি মানে? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? জানেন এখুনি মুখস্থ বলে দিতে পারি আপনার সব ক'টা কবিতা। বলে সুরমা টানা বিস্ফারিত চোখ দুটো তার মুখের ওপর তুলে ধরে, খিল খিল করে হেসে ফেললে আনার। হাসি নয় সে যেন সাহানা রাগিণীর একটা তান!

নিজের কবিতার প্রশংসা শুনে কিনা কে জানে, সুকুমারের মুখে চোখে কেমন একটা সলজ্জ হাসি ফুটে উঠলো। সে বললে, আমার কোন প্রবন্ধ বুঝি পড়েননি?

ঠোঁট উল্টে আনার জবাব দেয়, ঈশ্বর রক্ষা করেছেন। ভাগ্যিস পড়িনি!

কেন? প্রবন্ধ পড়তে ভাল লাগে না বুঝি?

প্রবন্ধ মানে তো কেবল কতকগুলো 'কোটেশন' আর শক্ত শক্ত কথার বুকনি। বাবা, মানে বুঝতে কাল-ঘাম ছুটে যায়!

সুকুমার এবার আপত্তি তুললে, কিন্তু আমার কীট্স্-এর ওপর লেখা প্রবন্ধটা পড়েছেন?

বললুম তো, ও আমি বুঝি না।

সুকুমার এবার উত্তর দিলে, না পড়েই রায় দেবেন না। আমার রিকোয়েস্ট অন্ততঃ একবার পড়ে দেখবেন।

কোথায় পাবো সেটা?

কেন, জানুয়ারীর ইসুতে বেরিয়েছিল, নবাবের কাছে তো পত্রিকাটা আছে।

নবাব মুখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে জবাব দিলে, হুঃ, তোর ওই রাবিশ লেখার জন্যে আমি যেন তাকে সিন্দুকে তুলে রেখেছি।

সুকুমার বললে, আচ্ছা আমার কাছে যে কপিটা আছে, আমি পাঠিয়ে দেবো নবাবকে দিয়ে, পড়ে ফেরত দেবেন।

নবাব এবার বিরক্ত হয়ে ওঠে। বলে, খেলা দেখতে এসে যদি কানের কাছে এই সব ফ্যাচ ফ্যাচ করবি, তাহলে উঠে যা তোরা এখান থেকে বলছি। আনারটা দিন দিন দেখছি উচ্ছন্ন যাচ্ছে! বাড়ীতে দিনরাত ওই করবে আবার মাঠে এসেও একটু শান্তি নেই। বলে আনারকে একটা কৃত্রিম ধমক দেয় নবাব। আনার নিঃশব্দে সুকুমারের চোখের দিকে চেয়ে কি যেন ইশারা করে দাদাকে জিব ভেঙ্গালে। তার এই ভঙ্গী দেখে সুকুমারও হেসে ফেললে।

হাসছিস কেন রে? বলে নবাব যেমন সুকুমারের দিকে ফিরলে, অমনি আনার তার ঠোঁটের ওপর একটা আঙ্গুল চেপে ধরে বললে, প্লিজ্ সুকুমারবাবু, বলবেন না ওকে।

এমন অনুরাগভরা কণ্ঠে সুকুমারকে এর আগে কেউ কোনদিন কোন কিছু করতে হুকুম করা দূরে থাক, নিষেধও করেনি। তার সঙ্গে আবার আনারের সুরমাটানা চোখের গভীর দৃষ্টি যেন নীরবে আরো কত কি বলতে চাইলে। সুকুমার তাই নবাবের সে প্রশ্নের উত্তরে শুধু বললে, জানি না।

গুড্, তুইও তাহলে ওর দলে! বলে নবাব মুখটা ফিরিয়ে নিলে!

আনার এবার খিল খিল করে এক অদ্ভুত ধরনের হাসির তরঙ্গ তুললে। সে হাসিতে শুধু তার দাদার পরাজয় প্রকাশ পেলে না, সুকুমারের মত একজন কবিকে জয় করার উল্লাস ও গর্ব যেন ঘোষণা করলে। সে হাসির অনুরণন অনেকক্ষণ পর্যন্ত গোপনে সুকুমারের মনের মধ্যে যেন সুরধ্বনির বিস্তার করে।

খেলা দেখতে দেখতে আড়চোখে সুকুমার অনেকবার তাকালে আনারের মুখের দিকে। এই ক'বছরে সুন্দরী মেয়ে দিল্লীর পথে-ঘাটে, চাঁদনীর চকে সে বিস্তর দেখেছে। কিশোরী, তরুণী, যুবতী, নানাবয়সের, নানা জাতের! ইরানী, ইহুদী, পাঞ্জাবী, মুসলমানী, কাশ্মীরী, আরো কত কি। তারা সবাই রূপসী! তাদের রূপ এক-একজনের এক-এক রকমের। তার বর্ণনার ভাষা সুকুমারের জানা নেই। শুধু তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে সুকুমারের নিষ্পলক দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠেছে বহুদিন আগে দেখা নিউমার্কেটের একটা ফুলের দোকানের ছবি! অদ্ভুত, আশ্চর্য সে দোকান! তাজা ফুল সব মনে হয় যেন ফুটে রয়েছে ডালে ডালে সবুজ পাতার মধ্যে। তাদের কোনটা ডালিয়া, কোনটা ক্রিসেন্‌থিমাম্, কোনটা ম্যাগ্‌নোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা, আবার কোনটা বা বস্‌রাই-গুল্। কিন্তু আনারের রূপের তুলনা যেন তাদের কারো সঙ্গে হয় না। সে রূপ যেন সব দল ও গোত্র ছাড়া। সে যেন শুধু বাছা বাছা বসরাই গোলাপের কুঁড়ি দিয়ে গাঁথা একগাছি গোড়ের মালা—রূপে, গন্ধে, বর্ণে, সুললিত ও সুসংবদ্ধ।

সেদিন হোস্টেলে ফিরে কেবলি যেন সুকুমার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে! আনারকলি নাম এ মেয়েকে যে দিয়েছে, তার রুচির তারিফ করলে না কেবল, মনে

মনে একটা কবিতা রচনা করে ফেললে আনারকে নিয়ে ! অবশ্য এ কবিতাটা সে লুকিয়ে রাখলে নিজের খাতায়। কেমন যেন লজ্জা লাগে কাউকে দেখাতে। এই বুঝি তার প্রথম প্রেমের কবিতা। আনার তার মনে যেন প্রথম প্রেমের চেতনা জাগালো।

তেরো

আনারের সহোদর ভাই যে নবাব, একথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার যেন নবাবের প্রতি অন্তরে অন্তরে কেমন একটা প্রীতিপূর্ণ আকর্ষণ অনুভব করে। কেন এমন হয় তা সে বুঝতে পারে না। তবু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করার জন্যে নিজে যেচে যেচে আলাপ করতে যায়। কিন্তু নবাবের প্রকৃতি যেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া ! সে বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না বিশেষ করে সুকুমারের মত ভাল ছেলের সঙ্গ। ক্লাসের যতসব বকা, ইয়ারবাজ, ওঁছা ছেলেদের সঙ্গেই সব সময় নবাব মেলামেশা করে, আড্ডা দেয়। তাই সুকুমারের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। মনের বাসনা মনেই চেপে রাখে !

আনারকে সে স্কুলের যে পত্রিকাখানা পাঠিয়েছিল নবাবের হাত দিয়ে সেটা একদিন আবার তাকে এনে ক্লাসে ফিরিয়ে দিয়েছিল সে ওই পর্যন্ত।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। আনারের সঙ্গে সুকুমারের আর দেখা হয়নি। এক-একদিন তাকে দেখবার জন্যে সুকুমারের মন যে অধীর হয়ে ওঠেনি তা নয়, তবে সেটা সম্ভব নয় বুঝে মনের গোপন বাসনাকে সে কষ্টে দমন করেছে। কতদিন খেলার মাঠে, পার্কে, গার্ল স্কুলের পথে যেতে যেতে সে ভেবেছে কিন্তু যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায় আনারের সঙ্গে রাস্তায় তো ভারী মজা হয় ! দিল্লীর মত বিরাট শহরের যে কোন্ অঞ্চলে সে থাকে তা কে জানে। তাছাড়া তারা বড় লোক। কখনো মোটরগাড়ী ছাড়া এক পা হাঁটে না। তবু তার সঙ্গে দেখা হওয়া অসম্ভব জেনেও কিন্তু মনে মনে এমনি সব দুরাশা বহন করে সুকুমার ঘুরে বেড়ায় রাস্তায় রাস্তায়।

আনারের পিসতুত বোন লায়লা ঢাকা থেকে মামার বাড়ীতে এসেছিল বেড়াতে। আনারের চেয়ে দু' এক বছরের বড় সে। তাকে নিয়ে গাড়ী করে দিল্লী শহর দেখাতে বেরুল আনার। ফোর্ট, জামেমসজিদ, নিজামুদ্দীন আউলিয়া, সাবদারজঙ্, পার্লামেন্ট বিল্ডিং প্রভৃতি দেখাতে দেখাতে অবশেষে কুতুবমিনারে গিয়ে তারা হাজির হলো। সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে একেবারের ওপরের তলায় উঠে লায়লা ছোট্ট একটা রেশমী রুমালে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বললে, আমার মাথাটা যেন ঘুরছে ভাই আনার।

ধ্যেৎ, ওটা তোর মনের ভুল। নীচের দিকে তাকাসনি তাহলে ওরকম হবে না।—ওই দূরে চেয়ে দেখ ওই যে পাণ্ডব কিল্লা দেখা যাচ্ছে। বলে আঙুলটা

তুলে দেখালে দূরের একটা জায়গায়। তারপর বললে, কুতুবউদ্দীন আইবেক্ যিনি দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, এটা তাঁর তৈরী, ইতিহাসে তো পড়েছিস, নিশ্চয়ই মনে আছে।

সহসা পিছন দিক থেকে সুকুমার বলে উঠলো, মুঝে মাফ্-কী জীয়ে। আপ্ তো ভুল বোল্ রঁহে।

চমকে উঠে পিছন ফিরতেই আনার দেখে, সুকুমার অপলক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে অপরূপ হাসিতে চোখ মুখ ভরিয়ে তুলে সে বলে উঠলো, ভুল ? কাঁহেজী।

আব্‌কো উয়ো আইডিয়া তো বিলকুল পুরানি হ্যায়! ইয়ে তো বানায়া পীর কুতুবউদ্দীন বক্‌তিয়ার কাফি, সম্রাট্ ইল্‌তুৎমিসের গুরু। বলে একটু থেমে তার কাছে আরো দু'পা এগিয়ে গিয়ে দূরে আঙ্গুল দেখিয়ে সুকুমার বললে, ওই তো ওঁর দরগাহ্ রয়েছে, ওখানে শেষ মুঘল বাদশাহদের অনেকেই দেহ রেখেছেন। প্রতিবছর তাই ফুলের মেলা বসে ওইখানে।

আনার বললে, আপনি এতসব খবর পেলেন কোথা থেকে ?

হেসে জবাব দেয় সুকুমার, এত বছর দিল্লীতে থেকেও যদি এখানকার সঠিক ঐতিহাসিক তথ্যগুলো না জানি তাহলে যে অপরাধ করা হবে মিস্ রহমান। তাছাড়া হিস্ট্রি আমার ফেবারিট্ সাব্‌জেক্ট—ইতিহাস পড়তে আমার ভারি ভাল লাগে যে।

হো হো করে একটা হাসির তুফান তুলে আনার চোখে মুখে খুশি উছলে বলে, সেইজন্যে বুঝি আর স্থান না পেয়ে একেবারে এই বাস্তব ইতিহাসের মাথায় চেপে বসে আছেন।

সুকুমার বলে, ঠিক ধরেছেন, এইখানে উঠলে আমার চোখের সামনে যেন ইতিহাস প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। আমি দেখতে পাই সব মৃত অতীতকে। দিল্লীর সমস্ত পুরনো কাহিনী যেন বায়োস্কোপের ছবির মত একটার পর একটা আমার চোখের পর্দার ওপর দিয়ে দ্রুত সরে যেতে থাকে। মনে পড়ে ইন্দ্রপ্রস্থকে, মনে পড়ে শক, হূণ, পাঠান ও মুঘল বীরদের। মনে পড়ে এইখানে—এই মাটিতে কত রাজ্যের উত্থান-পতন, কত ভাঙ্গাগড়া হলো, কত নরনারীর হাহাকার, কত দীর্ঘশ্বাস জমাট হয়ে আছে এর প্রতিটি ধূলিকণায় তা ভুলতে পারি না!

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল আনার। তার কথা শুনতে শুনতে কেবলি তার মনে হচ্ছিল, কত লেখাপড়া শিখেছে, কত গভীর জ্ঞান সে অর্জন করেছে, এই বয়সেই। অথচ তার ভাইজানও তো ওরই সঙ্গে ক্লাস টেন্-এ পড়ে। সে তো এসবের কিছুই খবর রাখে না।

সুকুমারের মনে হলো, একবার আনারকে বলে, কতদিন ধরে সে তাকে খুঁজছে মনে মনে কিন্তু কিসের এক লজ্জা তাকে যেন পেয়ে বসলো সে-কথা মুখ ফুটে

তাই অনেক চেষ্টা করেও প্রকাশ করতে পারলে না তার কাছে। ভাবলে সঙ্গিনী লায়লা যদি কিছু মনে করে। আবার ভয়ও হয়, একে সুন্দরী, তার ওপর ধনীর কন্যা, যদি তার কথার অন্য অর্থ ধরে তাকে মুখের ওপর অপমান করে বসে। কিংবা সে কিছু মুখে না বললেও লায়লা যদি বাড়ীতে গিয়ে বলে দেয়, তাহলে শুনে তার বাপ মা কি মনে করবেন। ছিঃ বলে মনকে সংযত করে।

ওদিকে আনারের সঙ্গে পিসতুতো বোন থাকার দরুন কিনা কে জানে, সেও আর তার সঙ্গে আলাপ না বাড়িয়ে বা কোন রকম আতিশয্য না দেখিয়ে একটু পরেই নেমে এলো ওপর থেকে।

সুকুমার কিন্তু এর অর্থ করলে অন্য রকম। তার মনে হলো একবার শোভনতার খাতিরেও তো বলতে পারতো আনার, চলুন আমার সঙ্গে গাড়ীতে করে আপনাকে দিল্লী পেঁছে দিই। বড়লোকের মেয়েদের কথা সে বইয়েতে অনেক পড়েছে। সেই রকম একটা ধারণাই আজ তার মনে জন্মালো আনারের সম্বন্ধে। তাই জোর করে আনারের চিন্তা মন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে দেতে সে পাণ্ডব কিল্লার ভগ্নস্তূপের দিকে তাকিয়ে রইল।

চোদ্দ

আবার বহুদিন তাদের দেখাসাক্ষাৎ নেই। তারপর একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে সুকুমারের সঙ্গে আনারের অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেল 'ওখলায়'। স্কুলের কয়েকজন বান্ধবীকে নিয়ে নতুন কেনা মার্সিদিস্ গাড়ীটায় চড়ে আনার সেখানে গিয়েছিল পিক্‌নিক্ করতে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যখন সবাই ব্যস্ত, তখন চুপি চুপি গাছপালার মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে সুকুমারের পিছনে এসে দাঁড়ালো আনার। এদিকটা শুধু নির্জন নয়, কতকগুলো গাছপালা ঝোপঝাড় এমনভাবে উঠেছে যে, দেখলে মনে হয় কে যেন ঘিরে রেখেছে এই জায়গাটা ইচ্ছা করে। অত দূর থেকে আনারের সুকুমারকে দেখতে পাবার কথা নয়। গোপনে এক বান্ধবীর খাবার থেকে একমুঠো তুলে নিয়ে কৌতুক করার জন্যে সে গিয়ে লুকিয়েছিল একটা গাছের আড়ালে। কিন্তু কতকগুলো পিঁপড়ে এমন অসভ্যের মত তার পায়ে কামড়াতে শুরু করলে যে, পা চুলকতে চুলকতে কোন্‌দিক দিয়ে বেরুবে পথ খুঁজে না পেয়ে বনের মধ্যে আরো খানিকটা ঢুকে গেলে হঠাৎ আনার দেখতে পায় সুকুমারকে। একটা বই নিয়ে একাগ্রমনে সে তখন পড়ছিল। কিন্তু এরকম জায়গায় ছুটির দিনে কি মানুষ পড়তে আসে! তাই ভারি কৌতূহল জাগল আনারের মনে। পা টিপে টিপে সে তাই সুকুমারের পিছনে এসে দাঁড়ালো। সুকুমার তার পাঠে তখন এমনি মগ্ন যে, আনারের উপস্থিতির কথা একেবারেই জানতে পারিনি। আনার মিনিট কয়েক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে শেষে একটা গাছের পাতা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে টুপ করে তার মাথার ওপর ছুঁড়ে

দিলে।

পাতাটা মাথায় ঠেকতেই যেন শিউরে উঠল সুকুমার। তারপর দ্রুত পিছন ফিরেই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল আনারকে দেখে। বললে, একি, তুমি এখানে!

ঝকঝকে দাঁতের পাটিতে যেন হাসির রোশনাই ঠিকরে পড়ে। আনার বলে, সেকথা আমিও তো আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি।

সুকুমার বলে, আমি এখানে পড়তে এসেছি।

কেন, অতবড় দিল্লীর শহরে বুঝি আপনার পড়বার মত জায়গা আর খুঁজে পেলেন না! শুনেছি খুব সুন্দর আপনার হোস্টেল।

তা ঠিক। কিন্তু বড় গোলমাল, সেখানে সবাই একসঙ্গে ম্যাট্রিকের পড়া তৈরী করতে ব্যস্ত, তাই আমি এখানে চলে এসেছি একটু নিরিবিলিতে পড়াশুনা করবো বলে।

বাঃ, বেশ যুক্তি তো আপনার। দিল্লী থেকে সাত আট মাইল দূরে এসেছেন নিরিবিলি জায়গা খুঁজে লেখাপড়া করতে? ভাল ছেলেদের বুঝি সবই অদ্ভুত! বলে মধুর হাসি হেসে উঠলো আনার।

সুকুমার প্রশ্ন করলে, কিন্তু তুমি এখানে একা যে?

মোটেই একা নয়। দলবল নিয়ে পিক্‌নিক্‌ করতে এসেছি। হঠাৎ দূর থেকে আপনাকে দেখতে পেয়ে কিছু খাবার দিতে এলুম। বলে মুঠোভর্তি হাতটা তার সামনে মেলে ধরে হাসতে হাসতে বললে, নিন্‌, খান্‌।

না না, আমার পেট ভরা আছে। খাবারের কোন প্রয়োজন হবে না। তোমরা পিক্‌নিক্‌ করতে এসেছ। তোমাদের ওপর আর ভাগ বসাব না।

ভয় নেই, কেউ আপনাকে ভাগ দিতে ব্যস্ত নয়। বরং এটা উদ্বৃত্তই হয়েছে।

সুকুমার বললে, মাপ করো, আমায় ও অনুরোধ করো না।

আনার তাকে আর সাধলে না কিন্তু হঠাৎ কি মনে করে গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর তার সামনে ছুঁড়ে সেই খাবারগুলো ধুলোয় ফেলে দিয়ে বললে, বুঝেছি আমার ছোঁয়া খেতে আপনার আপত্তি! আমি মুসলমান আর আপনি হিন্দু—তায় ব্রাহ্মণ, তাই আমায় ঘৃণা করেন।

সুকুমার কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই রাগে অপমানে ফুলতে ফুলতে সেখান থেকে ছুটে চলে গেল আনার।

আনার যে টপ্‌ করে এইভাবে রেগে চলে যাবে তা সুকুমার ভাবতেও পারেনি। সে মনে করেছিল আনার তাকে আরো কিছুক্ষণ সাধ্যি-সাধনা করলে তারপর খাবে। তার ওই সুন্দর মুখের কথা, হাসি, অনুরোধ আরো কিছুক্ষণ অন্ততঃ উপভোগ করে তারপর তার ইচ্ছা পূর্ণ করবে! কাজেই ব্যাপারটা যে এত দ্রুত এমন বেখাপ্পা হয়ে যাবে তার জন্যে সুকুমার একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, তাই সে মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগল নিজেকে। সত্যি, বড়লোকের মেয়েদের মেজাজ বোঝা ভার।

এর কিছুদিন পরে আবার তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবে যমুনার ধারে সুকুমারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ! সে বেড়াচ্ছিল হঠাৎ পিছন থেকে আনারের বিদ্রূপভরা কণ্ঠ তার কানে এসে বিঁধলো, গুড্ ইভ্‌নিং, মিঃ চক্রবর্তী।

পিছন ফিরে আনারকে দেখে সুকুমার প্রথমটা খুব ঘাবড়ে গেল। তারপর একটু ইতস্তত করে বলে উঠলো, মিস্ রহমান্? গুড্ ইভ্‌নিং।

আনারের হাতে একটা ছোট্ট ক্যামেরা প্রস্তুত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক্ করে তার বোতামটা টিপে দিলে সে।

একি, আমার ফটো তুলবে নাকি?

তুলবো মানে—তোলা হয়ে গেছে। বলে হাসতে হাসতে সহসা মুখটা গম্ভীর করে ফেললে, ভয় নেই এতে আপনার জাত যাবে না—অনেক দূর থেকে তুলেছি।

সুকুমার অপ্রস্তুত হয়ে বললে, না—না তা নয়—বলছিলুম কি আমার মত একজন নগণ্যের ফটো তুলে মিছিমিছি ফিল্ম নষ্ট করে কি লাভ!

আনারের ঠোঁটের কোণে ছোট একটু বাঁকা হাসির বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠলো। একটু থেমে বললে, যাকে মনের মধ্যে ধরতে পারি না তাকে যদি ক্যামেরার মধ্যে ধরার চেষ্টা করি তাতে কি আপত্তি আছে আপনার? গুড বাই। বলেই একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করে নিমেষে তার সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল আনার। সুকুমারকে আর কোন কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত দিলে না।

সুকুমার এর পরে যে কি করা উচিত ভেবে না পেয়ে শুধু হতভম্বের মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। আনারের এই আচরণের মধ্যে অনুরাগ না বিরাগ—কোন্‌টা প্রকাশ পাচ্ছে ঠিক বুঝতে না পেরে তার মাথার মধ্যে সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

আর কদিন পরেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা। লেখাপড়ার মধ্যে ডুবে থাকে সুকুমার। তবু পড়তে পড়তে ওরই মধ্যে একটু ফাঁক পেলেই কোথা দিয়ে যেন আনারের কথাগুলো এসে জট পাকায় তার মাথার মধ্যে। যত সে-চিন্তা মন থেকে সে দূর করতে যায় তত যেন তার জটিল জালে নিজেকে আরো বেশী জড়িয়ে ফেলে। তবে কি সেই দুর্লভ রূপের অধিকারিণী আনার, আমিরকন্যা আনার, তাকে ভালবাসে! কিন্তু ভা—ল—বা—সা এই বর্ণ কটা গোপনে উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে কি এক শিহরণ যেন কেঁপে ওঠে তার ওষ্ঠ প্রান্তে! শূন্য ঘরের চারিদিকে একবার চকিতে চেয়ে নিয়ে দেখলে কেউ শুনতে পায়নি তো! তবু নির্জন ঘরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে সেই কথাটা ঘুরতে ঘুরতে যখন আবার তার কানে এসে ঢোকে তখন কেমন যেন মধুর মনে হয়। কেন এমন হয়, ভাবতে চেষ্টা করে সুকুমার কিন্তু তার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ খুঁজে পায় না।

তার জীবনের স্রোত যে কখন কৈশোর ও যৌবনের মহাসঙ্গমে এসে মিলেছে সেকথা সে বুঝতে পারেনি। তাই বুঝি অসহ্য বেদনার সঙ্গে এক অনাস্বাদিতপূর্ব পুলকও সুকুমার অনুভব করে অন্তরের অন্তঃস্থলে। আনারের চিন্তা মুখে

আনতে যত ভয়, মনের অবচেতনায় তা নিয়ে লোফালুফি খেলায় যেন তত রস তত সুখ! এরই নাম বুঝি বয়ঃসন্ধি। জীবনের রুক্ষ মরুতে প্রথম মরুদ্যানের উদয়! কল্পনা প্রজাপতি হয়ে ওড়ে, ফুলের বাসরঘরে তাকে ধরতে সাধ যায়, কিন্তু পারে না! শুধু পিছু পিছু ছুটে মরে। এ যেন ফাল্গুনের উতলা রাতের দীর্ঘশ্বাস। যেন ললিত ও বেহাগের সুর নয়, সঙ্গীত সাঙ্গ হওয়ায় স্তব্ধ অনুভূতি।

পড়া ছেড়ে উঠে পড়ে সুকুমার এক একদিন। ভাল লাগে না। কিছুই তার যেন ভাল লাগে না। শুধু সে ঘুরে বেড়ায় পথে-পথে উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন! কখনো কুদ্‌শিয়া গার্ডেনে, কখনো বা রোশেনারা পার্কের এক নির্জন বেঞ্চিতে গিয়ে বসে থাকে। কিন্তু বেশীক্ষণ বসতেও ভাল লাগে না, আবার হয়ত উঠে পড়ে। এবার কি করবে কোন্‌দিকে যাবে ভেবে পায় না। এক একবার তার মনে হয় এ জীবন ব্যর্থ! এ জীবনের কোন অর্থ হয় না। আবার একটু পরে ভাবে বেশ হয় যদি হঠাৎ আনার এসে পড়ে এখানে। কোনদিন বা এমনি কত কি ভাবতে ভাবতে রীজ্‌-এর ওপর চলে যায় সে। সেখানে বাবলা গাছের ছায়াঘেরা বড় বড় পাথরের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে যাওয়া পথে বেড়িয়ে বেড়ায়। কখনো বা চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সেন্ট জেম্‌স কলেজের চূড়োটার দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে থাকে। কি ভাবে কে জানে! আবার বিকেল বেলাটা খেলাধূলা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ, আজকাল আর কিছুই যেন তার ভাল লাগে না। অথচ কি যে ভাল লাগে নিজেই বুঝতে পারে না। এক একদিন আবার নির্জনে কবিতা লিখতে বসে। কিন্তু লেখার পরে নিজের কাছে নিজেই যেন লজ্জিত হয়ে পড়ে। সে কবিতার সবটাই তো আনারকে চাওয়া, তাকে পাবার গোপন-বাসনায় ভরে উঠেছে। ছিঁড়ে ফেলে দেয় তখনি সেটা চুপিচুপি। পাছে কেউ দেখতে পায়। কিছু মনে করে।

সেদিন কনট্‌ সার্কাসের দিকে বেড়াতে গিয়েছিল সুকুমার। সন্ধ্যা হয় হয় দেখে দ্রুত ফিরছে—এমন সময় হঠাৎ আকাশটা কালো মেঘে ছেয়ে গেল। সুকুমার তাড়াতাড়ি সামনের রেস্তোঁরাটায় ঢুকে পড়লো। ওইটা ওখানকার সবচেয়ে অভিজাত রেস্তোঁরা, তাই আজকাল ভীড় সবসময়েই সেখানে লেগে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে এত ভীড় জমে গিয়েছিল যে, সুকুমার বসবার কোথাও একটুখানি জায়গা খুঁজে পেলে না। প্রকাণ্ড হল্‌টার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত শেষ বারের মত চোখ বুলিয়ে সে ভাবছে ফিরে যাবে, না বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে, এমন সময় 'লেডিজ' পর্দা ফেলা কেবিনের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল আনারের। নিমেষে যেন আনারের চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে ইশারা করে ডাকলে সুকুমারকে। শোভনতা অশোভনতার কথা ভুলে গিয়ে তখনি সুকুমার পর্দা সরিয়ে কেবিনটার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো। কিন্তু সেই সংকীর্ণ স্থানে, পর্দার আড়ালে একেবারে একা আনারের মুখোমুখি বসতে কেমন

যেন সঙ্কোচ বোধ করতে লাগল সে।

হাস্যোজ্জ্বল চোখে সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে আনার বলল, ভাগ্যিস্ আমি দেখতে পেলুম, তা না হলে তো ফিরে যাচ্ছিলেন !

সুকুমার ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠেছিল। এবার যেন একটা কথা বলার প্রসঙ্গ পেয়ে বাঁচল। বললে, সত্যি একটা জায়গাও যে পাবো না, তা ভাবতে পারিনি।

তেমনিভাবে হাসতে হাসতে আবার আনার জবাব দিলে, আর আমাকেও যে এখানে এভাবে দেখতে পাবেন, তাও বোধহয় ভাবতে পারেননি, না ? বলতে বলতে ফাউল কাটলেটের ছোট্ট একটা টুকরো কাঁটায় গেঁথে ডিস্ থেকে তুলে আনার নিজের মুখের মধ্যে পুরে দিলে। তারপর বাঁকা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললে, কি আর করা যাবে, ভাবতে পারা যায় না এমন ঘটনাও তো পৃথিবীতে অনেক ঘটে—কি বলুন ? ওকি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—বসুন। বলে তাকে সামনের শূন্য আসনটা দেখিয়ে দিল।

সুকুমার বসবার উদ্যোগ করতে যাচ্ছে এমন সময় আবার খোঁচা দিয়ে আনার বলে উঠল—এক্স্‌কিউস্ মি, আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খেলে আপনার জাত যাবে।

এবার সুকুমার আনারের পাশে গিয়ে বসে পড়লো। তারপর সোজা তার বিস্ফারিত চোখের ওপর দৃষ্টি রেখে বললে, আমায় অমন জাত তুলে যখন তখন খোঁটা দাও কেন বলো তো ?

আপনি যে ওটা মানেন, তাই।

কে বলেছে ওকথা তোমাকে ?

কাউকে বলতে হবে কেন, আমি যে ভুক্তভোগী !

ঠিক সেই সময় বেয়ারাটা সুকুমারের জন্য এক ডিশ কাটলেট্ নিয়ে পর্দা সরিয়ে সেখানে ঢুকলো। আনার তাকে দেখেই অর্ডার দিয়ে দিয়েছিল। তাড়াতাড়ি নিজের ডিশ্‌টা কোলের কাছে অনেকখানি টেনে নিতে নিতে আনার বললে, অনেকটা ফাঁক আছে, এতে আপনার জাত যাবে না আশা করি কি বলেন ? শেষ কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক ধরনের হাসি আনারের ওষ্ঠ থেকে ছিটকে গিয়ে পড়লো সুকুমারের মুখের ওপর।

সুকুমার সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে তখনি খপ্ করে আনারের পাত থেকে তার অর্ধভুক্ত কাট্‌লেট্‌টা তুলে নিয়ে নিজের গালের মধ্যে ভরে দিলে।

একি করলেন, আমি যে মুসলমান, আমার এঁটো খেলে জাত যাবে যে আপনার !

সুকুমার বললে, যদি জাত যায় তো তোমার এঁটো খেয়েই যেন যায় আনার। বলতে বলতে সহসা তার মুখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে উঠলো।

আনার সে কথার কোন জবাব না দিয়ে শুধু তার ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে

সুকুমারের একটা ফটো বার করে তার সামনে ধরলে, এর ওপর আপনি একটা অটোগ্রাফ্ করে দিন তো ?

একি, এ যে আমার ফটো ?

তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের মত আনারের কণ্ঠস্বর ঝকমক করে উঠলো, তবে কি আপনি ভেবেছিলেন যে, অন্যের ফটো আপনাকে দিয়ে অটোগ্রাফ করিয়ে নেবো ?

না, তা নয়। কি হবে আমার অটোগ্রাফ ?

আনার বললে, আমার এক বান্ধবী চেয়েছে, আপনার কবিতার সে বড় ভক্ত !

সুকুমার পকেট থেকে কলম বার করে, 'আনারকে দিলুম' লিখে তার নীচে নিজের নামটা সই করে দিলে।

একি ! আমার নাম লিখলেন যে ? বলে মুখের হাসিটা চেপে কৃত্রিম গাম্ভীর্য ভরা কণ্ঠে আনার প্রশ্ন করলে—আমার কি গরজ পড়েছে, আপনার ফটো রাখবার ?

যাকে জানি না, চিনি না, তাকে আমি দেবো না আমার ফটো।

আনার বলে, কিন্তু আমি তো চাই না আপনার ফটো।

তুমি না চাইলেও, আমি যে তা চাই আনার।

মিথ্যে কথা, বলে আনার সঙ্গে সঙ্গে ফটোটা দু'হাত দিয়ে যেমন টেনে ছিঁড়ে ফেলতে গেল তার মুখের ওপর অমনি সুকুমার তার হাত দুটো চেপে ধরে মিনতি করলে, আনার, প্লিজ্ তুমি লেখাপড়া শিখেছ, এটুকু শোভনতা অন্ততঃ তোমার কাছ থেকে আশা করতে পারি যে, যার ফটো তার সামনে সেটাকে ছিঁড়ে ফেলে তাকে সোজাসুজি অপমান করবে না। আমার আড়ালে গিয়ে তুমি যা ইচ্ছে করো আমি এতটুকু দুঃখিত হবো না ! বলতে বলতে তার গলার স্বর ভারী হয়ে এলো।

আনারের কণ্ঠেও এবার এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দেয়। সে বলে, একজন কেউ হাতে করে খাবার নিয়ে খেতে অনুরোধ করলে তাকে গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দেওয়াটাও যে কত বড় অপমান, আশা করি সেটুকু বোঝবার মত শিক্ষাদীক্ষা আপনার আছে।

ওঃ বুঝেছি। সেদিনের ওখলার সেই ঘটনার প্রতিশোধ নিচ্ছো এইভাবে ! বলতে বলতে নিমেষে সুকুমারের কণ্ঠের আবেগ যেন স্তিমিত হয়ে আসে। তবু নিজেকে সংযত করতে করতে সে বললে, আনার তুমি আমায় ভুল বুঝছো !

ভুল আমি বুঝিনি, আমি জানি, জাতে আমি মুসলমান। শেষ কথাটা বলতে গিয়ে আনারের গলার আওয়াজ গাঢ় হয়ে এলো।

সুকুমার এবার আনারের মুখের দিকে চোখ তুলে কি যেন বলতে চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না। বুঝি সংশয়, বুঝি সঙ্কোচ, বুঝি তাছাড়া আরো কি যেন এসে তার রসনাকে আড়ষ্ট করে দিলে। অনেক ইতস্তত করে শেষে অস্ফুটস্বরে সে একবার মাত্র বলে ফেললে, আনার, ভালবাসার মধ্যে কি জাতিভেদ থাকে ?

মেঘাবৃত আকাশের বক্ষ বিদীর্ণ করে যেন অশনিপাত হলো !

ভালবাসা ! আনারের কণ্ঠে কোন কথা ফুটলো না, শুধু তার সেই কৃষ্ণ-পক্ষ্মাচ্ছাদিত চোখ দুটির মধ্যে যেন সহসা কি এক আলোর দীপ্তি দেখা দিয়েই নিভে গেল। তারপর সুকুমারের মুখের ওপর থেকে সে আস্তে আস্তে তার দৃষ্টিটা নামিয়ে নিয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। তাকে ভালবাসে সুকুমার—এই কথাটা যে তার মুখ থেকে শুনবে, বোধ করি এটা কল্পনাও করতে পারেনি।

সুকুমার তাই তার এই নৈঃশব্দ্যকে উপেক্ষার সঙ্গে তুলনা করে ভুল বুঝলে।

পর্দা সরিয়ে তখনি বিলটা নিয়ে এসে ঢুকলো বেয়ারা ! আনার তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে টাকাটা দিয়ে নীরবে বেরিয়ে গেল।

সুরে বাঁধা সেতারের কোন একটা তারে হঠাৎ ঘা লাগলে যেমন অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার সুরের একটা অস্ফুট ধ্বনি কাঁপতে থাকে সহজে মেলায় না, সুকুমারের বুকের ভেতরটা তখন ঠিক তেমনি করছিল। আনার কুমারী মেয়ে, ধনীর আদরিণী কন্যা, তার মুখের ওপর সহসা এই অসভ্য অশোভন উক্তি করে সে তার আত্মসম্মানের আঘাত করেছে। আনার নিশ্চিত চটেছে, হয়ত এখুনি বাড়ী গিয়ে তার ভাইজানকে বলবে। নবাবজান স্কুলের ছেলেদের কাছে তার নামে সেই নিয়ে হয়ত কত কুৎসা রটাবে। ওরা খানদানী মুসলমান, ওদের আভিজাত্য, নীতিজ্ঞান ভিন্ন ধরনের। হিন্দুর ছেলে হয়ে, মুসলমানের মেয়েকে মুখে ভালবাসি কথাটা উচ্চারণ করেই হয়ত মহা অপরাধ করে ফেলেছে ! কে জানে ! ছি ছি, মনের আবেগ সামলাতে না পেরে কি অন্যায়টা সে করে ফেললে। এমনি আরো কত কি ভাবনা হতে থাকে তার মনে। রাস্তায় বেরিয়ে নির্জনে গিয়ে সে এর জন্য ক্ষমা চাইবে আনারের কাছে মনে মনে স্থির করলে। কিন্তু বাইরে এসে দেখে কোথায় আনার ? সে একেবারে সোজা মোটরে গিয়ে উঠলো এবং তার দিকে একবারের জন্যে ফিরে না তাকিয়েই তখনি স্টার্ট দিয়ে তীরবেগে গাড়ীটা ছুটিয়ে দিলে।

হতভম্বের মত গাড়ীর শুধু লাল আলোটার দিকে তাকিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো সুকুমার। শরবিদ্ধ পাখীর মত একটা যন্ত্রণা যেন অনুশোচনার সঙ্গে তার অন্তরে সব সময় অনুভব করতে থাকে। কি করলুম, কেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ওই ভালবাসার কথাটা, নিশ্চয় আনার এর জন্যে অপমান বোধ করেছে।

আনারের মনে যে ইদানীং কিসের চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, তা বুঝতে সুমিতার বিলম্ব হয় না। সব কাজেই তার অন্যমনস্কতা প্রকাশ পায়। একটা কিছু করতে বললে আর একটা করে বসে। একটা জিনিস আনতে বললে আর একটা এনে দেয়। ফাউন্টেন পেনটা ব্লাউজের বুকে গুঁজে রেখে হারিয়ে গেছে ভেবে সারা বাড়ীটা তোলপাড় করে বেড়ায়। কখনো বা পড়তে পড়তে হঠাৎ বই বন্ধ করে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে জানলার ভেতর দিয়ে দূরে আকাশের পানে।

কাজে অকাজে ঘরে ঢুকে সুমিতা মেয়ের মনের এই পরিবর্তন যাচাই করে। এক একদিন আনার জানতেই পারে না, কখন থেকে তার আম্মা পিছনে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কেয়া শোচ্‌তা মেরী বেটিয়া ?

মায়ের কণ্ঠ কানে যেতেই চমকে ওঠে আনার। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে চোখে কে যেন সিঁদুর ঢেলে দেয়। শরমজড়িতস্বরে সে হয়ত বলে, কুছ্‌ নেই, আম্মি। তার সেই কথায় সত্যের দৃঢ়তা যেমন ফোটে না, মিথ্যার ছলনাও তেমনি প্রকাশ পায় না। সুমিতারও একদিন এ বয়স ছিল, সেও একদিন এমনি কত কল্পনার জাল বুনেছিল! আনারের কণ্ঠস্বর শুনে, তার চোখের চাহনি দেখে তাই সেই দিনের কথাই বার বার তার মনে পড়তে থাকে। কিন্তু কিভাবে সতর্ক করবে মেয়েকে, আর তাতে ফল ভাল হবে কি মন্দ হবে—তাই নিয়ে মনে জল্পনা-কল্পনা করে সুমিতা। অথচ সে জানে গিয়াসুদ্দীনকে বললে কোন ফল হবে না। কেননা বাপের কাছ থেকেই সকল বিষয়ে সে এত প্রশ্রয় পায় যে, পুরুষ ছেলেদের সঙ্গে মিশবে না, কিংবা বাইরে বেরুবে না বলতে যাওয়াটা তার পক্ষে শুধু ধৃষ্টতা নয়, অপমানকরও বটে। সে কথা মেয়ে তো শুনবেই না, এমন কি গিয়াসুদ্দীনও বিশ্বাস করবে না। ছেলে-মেয়েকে শিক্ষা-দীক্ষায় অতি আধুনিক করে তৈরী করতে চায় গিয়াসুদ্দীন। ঘরে আটকে রেখে তোতাপাখীর মত নীতি-শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী সে নয়। সে বলে বাইরে থেকে ছেলেমেয়েরা সব কিছু দেখে এবং ঠেকে শিক্ষা লাভ করুক। এ নিয়ে অনেকদিন অনেক আলোচনা তাদের মধ্যে হয়ে গিয়েছে।

নবাব যে ইয়ার বন্ধুর দল নিয়ে আজকাল ঘোরাফেরা করে, সুমিতা একেবারেই তা পছন্দ করে না। অথচ কতদিন সেকথা গিয়াসুদ্দীনের কানেও সে তুলেছে কিন্তু কোন ফল হয়নি। বরং ছেলে যে ইতিমধ্যে লায়েক হয়েছে, আজ এখানে যায়, কাল ওখানে যায় –খেলাধুলা, পার্টি, সিনেমা নিয়ে সর্দারী করে এতেই গিয়াসুদ্দীন মনে মনে খুশিই হয়। ছেলেকে এর জন্যে টাকাকড়ি দিতেও সে কসুর করে না। তার একমাত্র ছেলে নবাব। অনেক আশা ভরসা সে রাখে তার ওপর! ছেলে স্মার্ট না হলে ব্যবসা করবে কি করে, যে রকম দিনকাল পড়ছে! তবু একদিন সুমিতা চুপিচুপি গিয়াসুদ্দীনকে বললে, আনারের ভাবভঙ্গী আমার ভাল বলে মনে হচ্ছে না, তুমি ওর বিয়ের ব্যবস্থা করো বাপু।

গিয়াসুদ্দীন একেবারে ক্ষেপে উঠলো। বললে, ওইটুকু মেয়ের সাদি ?

সুমিতা বললে, ওইটুকু তো তুমি বলছো কিন্তু মেয়েয় বয়েস যে পনেরো পূর্ণ হয়েছে তা কি খবর রাখো ? তাছাড়া ওদের ক্লাসের দুটো মেয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে প্রেম করে, শুনেছো তো ?

তা করুক কিন্তু আমার মেয়ে সেরকম নয়। ও ভাল করেই জানে, ও লক্ষপতির মেয়ে, ওকে আমি বিলেতে রেখে লেখাপড়া শেখাবো। এখান থেকে

শুধু ম্যাট্রিকটা পাশ করার অপেক্ষায় আছি। তখন কত শাহানশাহ্ ওর পায়ের তলায় এসে লুটোবে, দেখে নিও। বলে গিয়াসুদ্দীন আবার সাবধান করে দেয় সুমিতাকে। বলে, আমিনা, খবরদার বিয়ের কোন প্রসঙ্গ তুমি ওর কাছে কখনো আভাসে ইঙ্গিতেও তুলবে না, ওর মন আমি ভালভাবেই জানি।

মেয়েমানুষের মনের খবর তুমি কি জানো? কাজেই ও নিয়ে এতটা অহংকার করা তোমার সাজে না।

গিয়াসুদ্দীন ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে বলে, সে আমার মেয়ে। বাংলাদেশের কাদা মাটিতে তৈরী তার মন নয়, যে একটুতেই দাগ পড়বে সেখানে। আনার তার বাপের মেয়ে—আফগানের কঠিন রক্তে গড়া তার দেহ ও মন। পাথরের বুকে দাগ দিতে গেলে লোহার আঘাতের দরকার, ভুলে যেয়ো না। আনারের মন জয় করা অত সহজ ব্যাপার নয়, আমি জানি। কাজেই ও নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তুমি অন্য কাজে মন দাও।

পনেরো

সেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সুকুমার কেবল প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলো না, তাদের স্কুলের ছাত্রদের মধ্যেও সে প্রথম স্থান অধিকার করলে। সুকুমারের মন যেন আর কোন ধৈর্য কোন বাধা মানে না। সইমাকে তখনি লিখলে তাঁর আদেশ সে পূর্ণ করেছে, স্কুল থেকে সে ফার্স্ট হয়েছে। কাজেই মায়ের কাছে যাবার অধিকার এবার সে নিজেই অর্জন করেছে। আর কোনক্রমেই যেন তাকে বঞ্চিত করা না হয়। দীর্ঘ পত্রে শুধু এই কথাটাই লিখলে, মাকে দেখবার জন্যে আমার মনের মধ্যে যে কি হচ্ছে তা কি করে বোঝাবো তোমায় সইমা। ফার্স্ট হওয়ার সংবাদ পাওয়ার পর থেকে দিনে রাতে কোন সময় আমার চোখে ঘুম আসে না। কেবল মায়ের সেই মুখখানি মনে পড়ে। আর ভাবি কখন ছুটে গিয়ে নিজে তাকে প্রণাম করে এই খবরটা দেবো। তাই তোমায় পায়ে ধরে অনুরোধ জানাচ্ছি আর এক মুহূর্ত দেরী করো না। চিঠি পেয়েই আমার মায়ের ঠিকানা আমায় জানিয়ে দিও। তোমার পায়ে পড়ি সইমা! আমি প্রস্তুত হয়ে আছি। চিঠি পাওয়ামাত্র মাকে দেখতে চলে যাবো। মা যেখানেই থাকুন!

চিঠি পেয়ে অঞ্জলির মনে আর আনন্দ ধরে না। সুকুমার তাহলে সত্যিই ফার্স্ট হয়েছে। তার কথা রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে সুমিতার মুখটাও তার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ওঠে। যেদিন এ সংবাদ তার কাছে পেঁছিবে সেদিন কি পরিমাণ উল্লসিত যে সে হবে তা অনুমান করতেও যেন তার আনন্দ ধরে না। কিন্তু ঠিকানাটা সুমিতার অনুমতি না নিয়ে কি দেওয়া ঠিক হবে? এই মনে করে তখনই সুকুমারের সেই চিঠিটা সে সুমিতার কাছে পাঠিয়ে দিলে। এবং তাতে একথাও লিখে দিলে যে, সুকুমারের কাছে আর লুকোচুরি করা ঠিক নয়। কেননা সে এখন বড় হয়েছে, ম্যাট্রিক পাশ করলেও তার বয়সটা উনিশের কম নয়, এটা স্মরণ

করে কাজ করে যেন সে। চিঠি শেষ করে সে এই কথাটার নীচে দাগ টেনে দিলে যে—"তা ছাড়া আমাকে আর তার কাছে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিসনি যেন ভাই! আমি বারবার তাকে এই আশ্বাসই দিয়ে এসেছি যে ফার্স্ট হলেই তাকে মায়ের ঠিকানা দেবো।"

সুকুমারের সেই চিঠিটা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে সুমিতার সমস্ত দেহ মন যেন একসঙ্গে এক অচিন্তিতপূর্ব আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। চিঠিখানা গালে মুখে গায়ে সর্বাঙ্গে কিছুক্ষণ ধরে সে বোলাতে থাকে, ঠিক যেন আদর করছে ছেলেকে। ছেলের হাতের লেখা প্রতিটি অক্ষরের ভেতর যেন অনুভব করে। নিঃশব্দে চিঠিটা হাতে করে কাঁদলে সে অনেকক্ষণ। তারপর মনকে দৃঢ় করলে। হ্যাঁ, এবার সে নিজেই চিঠি লিখবে সুকুমারকে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। তবে তাকে সাবধান করে দেবে, তাদের আসল পরিচয়টা সে যেন গোপন রাখে অন্যের কাছে। এই ভেবে তখনই সে কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো সুকুমারকে। সবে লিখেছে "আমার প্রাণাধিক পুত্র সুকু"। এমন সময় যেন কালবৈশাখীর প্রলয় তাণ্ডব শুরু হলো। গিয়াসুদ্দীন পাগলের মত চেঁচাতে চেঁচাতে একটা চাবুক হাতে করে ছুটে এলো সেখানে। বললে, নবাব কোথায়, কোথায় সেই বদ্‌-তামিজ বদ্‌মাশ? বলে, এঘর, ওঘর, সেঘর—ওপর নীচে তাকে খুঁজতে থাকে। উয়ো উল্লু, উয়ো বদ্‌-তামিজ কাঁহা? কান পাকড়কে, লে আও জল্‌দী উসকো! ধরে আন, ধরে আন শিগগির তাকে।—চীৎকার করে বাড়ী ফাটাতে থাকে।

চাকর-বাকরেরা ছুটোছুটি করে খুঁজতে থাকে নবাবকে।

একশো, পানশো, হাজার রুপেয়া ইনাম! যো উসকো পাকড়কে লে আয়েগা আভি হামারে পাশ। যেন ক্ষেপে গিয়েছে গিয়াসুদ্দীন। হ্যাঁ, যত টাকা লাগে দেবে বকশিশ—একশো, পাঁচশো, হাজার! যে তাকে ধরে এনে দেবে!

ভয়ে থর থর করে কাঁপে দাসদাসীরা। তারা চেনে গিয়াসুদ্দীনকে, জানে একবার রাগলে আর তার জ্ঞান থাকে না। বন্য শার্দুলের চেয়ে হিংস্র হয়ে ওঠে সে। তাই নবাব যে বাড়ীতে নেই বা আসেনি এ কথাটাও কেউ মুখ ফুটে তার সামনে উচ্চারণ করতে সাহস পর্যন্ত করলে না। ছুটলো তখনি যে যেদিকে পারলে নবাবের খোঁজে!

আর একদল হুড়মুড়, দুড়দাড় শব্দে মনিবের অনুসরণ করলো। কখনো এঘর, কখনো ওঘর, কখনো ওপর, কখনো নীচে পিছু পিছু ছুটতে লাগল। কত কাঁচের ফুলদানী ঝনঝন করে ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল। কত চেয়ার টেবিল সৌখীন জিনিসপত্তর সব হুড়মুড় শব্দে উল্টে পাল্টে ঘরময় ছড়াছড়ি হয়ে যায় সেদিকে কারুর খেয়াল নেই।

লেখা বন্ধ রেখে উঠে এলো সুমিতা। ব্যাপার কি, কিসের এত গোলমাল?

চাকর বাকরদের সামনে পেয়ে বেশ ক্রুদ্ধস্বরে আগে সে জিজ্ঞেস করলে কিন্তু তারা যখন বললে, কসুর মাফ্ কীজিয়ে আম্মাজান, হামলোগ কুছু ন-হী জানতে তখন দ্রুত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে সুমিতা এগিয়ে এসে একেবারে গিয়াসুদ্দীনের পথ রোধ করে দাঁড়াল। তারপর চাকরদের হুকুম করলে, যাও তুমলোক্ আভি আপ্নে আপ্নে কাম্মে।

গিয়াসুদ্দীনের এরকম উগ্রচণ্ডমূর্তি আর একবারমাত্র সুমিতা দেখেছিল। কিন্তু সে বহুকাল আগে, প্রথম যেদিন তাকে ধরে এনে সে ঘরে বন্ধ করে রেখে-ছিল। তারপর সে পুলিশে খবর পাঠিয়েছে ভেবে চাবুক হাতে নিয়ে তাকে প্রহার করেছিল—

আর যেন চিন্তা করতে পারে না। আতঙ্কে সুমিতার বুকের ভেতরটা তখন গুরগুর করছিল। তবু মুখে চোখে কাঠিন্য এনে সুমিতা বলে, বাতাইয়ে, কেয়া মামলা হ্যায়—কেঁও, এতনে নারাজ হ্যাঁয় ?

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার সুমিতার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে গিয়াসুদ্দীন হুংকার দিয়ে উঠলো, নবাব কাঁহা ?

ম্যায় কেয়া জানু উয়ো কাঁহা হ্যায় ? সে কোথায়, তা আমি কি জানি ?

সঙ্গে সঙ্গে গিয়াসুদ্দীনের গলার স্বর আরো একপর্দা চড়ে উঠলো, আনার কাঁহা ?

সুমিতা একটু ইতস্ততঃ করে বললে, হোগী কাঁহি তো, জরুর। লেকিন কেয়া মতলব্ আপ্কা বাতাইয়ে তো ?

তোবা ! আপনে বাচ্চোঁকী কুছ্ খবর ভি নেহি রাখ্তি, ফির্ মুঝসে পুছতি মতলব কেয়া—তুমকো শরম নেহি আতি ? ছিঃ, নিজের ছেলেমেয়ে কোথায়, খবর রাখো না, আবার জিজ্ঞেস করতে তোমার লজ্জা হচ্ছে না ?

অভিমানস্ফুরিত কণ্ঠে সুমিতা বললে, শরম আমার নেই জানি কিন্তু—

চুপ করে থাকো। আমাকে কোন কথা প্রশ্ন করার আগে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। নিজের ছেলেমেয়েরা কোথায় যায়, কোথায় থাকে কিছুই সংবাদ রাখো না। যেন তারা তোমার প্রতিবেশী পরের ছেলেমেয়ে। নসিব। সবই আমার বরাত। তা না হলে এত করেও তোমার মন পাই না কেন ? আমি কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করছি আমার ছেলেমেয়েগুলোকে তুমি ঠিক পরের মত দেখো।

কি বলছো ? ছেলেমেয়েগুলো তোমার, তুমি তাদের পেটে ধরেছো না আমি ?

পেটে ধরলেই নিজের হয় না, এতদিনে তোমার কাছ থেকে আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি। তুমি আমার ভুল ভেঙে দিয়েছো।

মিথ্যা বলারও একটা সীমা আছে জেনো ! কঠিন দৃষ্টিতে গিয়াসুদ্দীনের মুখের দিকে এবার তাকিয়ে রইলো সুমিতা।

দাঁতের ওপর দাঁত রেখে তখন গিয়াসুদ্দীন কৈফিয়ত চাইলে, মিথ্যা তো আমি

বলছি জানি কিন্তু নবাব কোথায়? আগে সে খবর আমি চাই তোমার কাছে। তুমি না তার মা? বল, জলদি!

একটু চুপ করে থেকে সুমিতা উত্তর দিলে, কোথাও পড়তে-টড়তে গেছে বোধহয় বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী—

সুমিতার কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে গিয়াসুদ্দীন এবার যেন জ্বলন্ত শলাকা বিঁধিয়ে দিলে তার কর্ণপটাহে। বললে, হ্যাঁ, পড়তে গিয়েছে, তবে বন্ধুর বাড়ী নয়—বাইজীর বাড়ি।

বাইজীর বাড়ী! শিউরে উঠলো সুমিতা। কি বাজে কথা বলছো—আমি বিশ্বাস করি না।

হ্যাঁ, আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি। কারুর কোন কথা শুনবো না। বলে কতকটা যেন আপন মনেই গর্জন করে উঠলো। ভেবেছিলুম টেস্ট পরীক্ষায় ফেল্ হওয়াতে বুঝি লজ্জা হয়েছে তাই লেখাপড়া নিয়ে দিনরাত মেতে থাকে। বাড়ীতে মাস্টারদের কাছে পড়েও আবার বন্ধুবান্ধবদের কাছে যায় লেখাপড়া করতে। কিন্তু এখন দেখছি বিলকুল সব ঝুট। লেখাপড়ার নাম নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কেবল বদমায়েসী করে বেড়ায়। তাই এত বড় বড় মাস্টার রাখা সত্ত্বেও পাশ করতে পারে না পরীক্ষায়।

সুমিতার কণ্ঠস্বর এবার অগ্নিশিখার মত কাঁপতে থাকে, এ যে কল্পনারও অতীত।

গিয়াসুদ্দীন কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবে। তারপর বলে, কে জানতো এত সব! চকের মধ্যে দিয়ে আসছি, এমন সময় দেখি আমার সাদা মার্সিদিস্ গাড়ীটা একটা গলির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। একি, আমার গাড়ী এখানে কে আনলে? কৌতূহল হলো। আশেপাশে খোঁজ নিয়ে জানলুম কোন বড়লোকের ছেলে নাকি ওই গাড়ীটায় করে এসেছে এক বিখ্যাত সিনেমা একট্রেসের ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে রাগে একেবারে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে উঠলো। সিঁড়ি দিয়ে একেবারে ওপরে উঠে গেলুম। তারপর জানালার পাশ থেকে উঁকি মেরে দেখি নবাবের সামনে একজন নাচওয়ালী ছুক্রী নাচছে আর গান গাইছে। আব স্থির থাকতে পারলুম না, নবাবের টুঁটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবো মনে করে যেমন 'নবাব' বলে ডেকেছি অমনি সে পিছনের দরজাটা দিয়ে ছুটে কোথায় পালালো। বলতে বলতে আবার গিয়াসুদ্দীনের চোখে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। সে বললে, আজ তাকে খুন করে তবে আমি জলগ্রহণ করবো—আসুক একবার। বলে তখনই উল্কার বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুমিতা তেমনি স্থির ভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। চোখের সামনে বজ্রপাত হতে দেখলেও বোধ করি সে এতটা স্তম্ভিত হতো না।

নিমেষে সমস্ত বাড়িটায় যেন একটা বিষাদের ছায়া নামে।

আনার এ সবের বিন্দুবিসর্গও জানতো না। সে সিনেমায় গিয়েছিল বন্ধুদের

সঙ্গে। বাড়িতে পা দিয়েই তার বুকটা কেঁপে উঠলো। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে গেছে অনেকক্ষণ কিন্তু ঝাড় লণ্ঠন কোন ঘরেই তো জ্বলেনি। অন্যদিন রেডিয়ো বাজতে থাকে, এতক্ষণে সমস্ত ঘরগুলোয় যেন একটা সঙ্গীতের প্রবাহ বয়ে যায়। তবে আজ একি হলো।

কিছুই বুঝতে না পেরে আনার প্রথমে মায়ের ঘরে গেল। আস্তে আস্তে তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ডাকলে, আম্মা, কি হয়েছে তোমার ?

সুমিতা কোন উত্তর না দিয়ে তেমনি নীরব হয়ে রইল।

এবার আনার গিয়ে ঢুকলো তার বাপের ঘরে। গিয়াসুদ্দীন তখন চুপ করে একটা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। তার পিছনে গিয়ে ধীরে ধীরে সোহাগিনী আনার জিজ্ঞেস করলে, আব্বাজান, কি হয়েছে—এমন গম্ভীর মুখ করে রয়েছো ? ওদিকে মা, এদিকে তুমি—কারুর মুখেই হাসি নেই, সবাই চিন্তিত !

গিয়াসুদ্দীনকেও কোন উত্তর না দিয়ে তেমনি নীরব থাকতে দেখে আনার শঙ্কিত হলো। তবু আরো একটু নীরব থেকে সে বললে, তোমাদের কি হয়েছে ?

গিয়াসুদ্দীন একটা গভীর নিঃশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে বললে, আজ থেকে আমার হুকুম না নিয়ে তুমি বাড়ির বাইরে আর একপা কোথাও বেরুতে পারবে না—মনে থাকে যেন।

কেন, আব্বাজান ?

এ আমার হুকুম ! বলে কড়াস্বরে উত্তর দিয়ে আবার গিয়াসুদ্দীন গম্ভীর হয়ে গেল।

চিন্তিত মুখে আনার বাপের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। আর বেরুতে পারবে না তার অনুমতি ছাড়া, এর চেয়ে বড় শাস্তি কি আর হতে পারে ? স্বাধীনভাবে এতদিন চলাফেরা করে তারপর এই নিষেধাজ্ঞা। সুকুমারের বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখ দু'টি, তার বলিষ্ঠ অথচ নবযৌবনের আবেগ শিহরিত মূর্তি, সব প্রথম তার মনে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ আগে যে একসঙ্গে বসে তারা সিনেমা দেখেছে। তার আনন্দময় স্মৃতি যে তার দেহের অণুতে পরমাণুতে এখনো মধুর হয়ে রয়েছে।

তবে কি সুকুমারের সঙ্গে তার সিনেমা দেখার কথাটা গিয়াসুদ্দীন জানতে পেরেছে ? হয়ত তার বাপজানের কোন বন্ধু কিংবা কারখানার কোন কর্মচারী তাদের এই মেলামেশাটা লক্ষ্য করে বাপজানের কাছে নালিশ করেছে। সর্বনাশ, তাহলে আর রক্ষা নেই। তার হাত পা যেন ভয়ে হিম হয়ে আসে ! বাপজান তাকে কত ভালবাসে, কি রকম বিশ্বাস করে তা সে জানে। অথচ সুকুমার একজন হিন্দু—তার সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠতা করেছে জানলে তাকে আর আস্ত রাখবে না তার বাবা। মনে মনে তার বাবা যে ভীষণ হিন্দুদ্বেষী সেটা আনার ভাল করেই জানে। তাছাড়া তার হুকুম—বড়লোক, বিশেষ করে নিজ সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ে ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে যেন সে মেলামেশা না করে। কতদিন এ নিয়ে তাকে কত

উপদেশ দিয়েছে গিয়াসুদ্দীন !

এমনি সব চিন্তা করতে করতে হঠাৎ আনারের মনে হয়, সত্যি দোষটা তার। কেন সে আজ সিনেমা দেখতে গিয়ে নিজে গায়ে পড়ে সুকুমারকে ডাকতে গেল কাছে। অবশ্য তারও একটা কারণ ছিল। সেদিনের সেই রেস্তোঁরার ঘটনার পরে আর তাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখাশুনো হয়নি। সে প্রায় তিন মাস আগের কথা। তারপর যত সুকুমারের কথা ভেবেছে আনার তত তাকে দেখবার জন্যে তার মন অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার দেখা পায়নি। তখন একে টেস্ট পরীক্ষা নিয়ে সুকুমার ব্যস্ত ছিল ; উপরন্তু তার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, আনার সেদিন তার কথায় অপমান বোধ করেছে। তাই সুকুমার আনারের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল প্রাণপণ চেষ্টায়। আনারও চিঠি লিখে কিংবা ভাইকে দিয়ে কোন খবর পাঠাতে পারেনি সুকুমারকে। লজ্জার চেয়ে ভয়টাই বেশী ছিল তার মনে। যদি কোন রকমে সে-কথা ফাঁস হয়ে পড়ে তাহলে! পরের কথাটা চিন্তা করতেও আতঙ্ক হয় আনারের। তার বাবা যে কতদূর নিষ্ঠুর হতে পারে তা ভাবতে গেলে আঁতকে ওঠে তার অন্তরাত্মা। হয়ত কসাই লাগিয়ে সুকুমারকে এখনই হত্যাই করে বসবে। রাগলে তার বাপজান হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। চামড়ার কারখানার অনেক কসাই-গুণ্ডা তার হাত-ধরা, তাও সে জানে। এমনিভাবে কত শত্রুকে তার বাবা চিরদিনের মত পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে। টাকা-পয়সার অভাব নেই তার। নিজের জেদ বজায় রাখতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে এক মুহূর্তও চিন্তা করে না।

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আনার তার চিন্তাকে আবার ফিরিয়ে আনে বর্তমানের মধ্যে। কিন্তু বাড়ীর আবহাওয়া থেকে তার মনটা আবার যায় সরে।

কিছুক্ষণ আগে সে রিভোলি সিনেমাতে "আন্ডার টু ফ্ল্যাগস্" ছবিটা দেখতে গিয়েছিল, তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ফতিমার সঙ্গে। সুকুমারও যে ওই ছবিটা দেখতে গিয়েছিল তা সে জানতো না। প্রথম শ্রেণীর টিকেটঘরের ছোট্ট জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে সুকুমার পকেট থেকে টাকা বার করতে যাচ্ছে, এমন সময় পিছন থেকে ডাকলে আনার, হ্যাল্লো, সুকুমারবাবু যে।

বহুদিন পরে তার মধুর কণ্ঠে নিজের নাম শুনে সুকুমারের দেহমন যেন একসঙ্গে সেতারের মত বেজে উঠলো। তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে সে বললে, হ্যাঁ, মিস্ রহমান, তারপর আপনি যে !

আনার তার সুরমা টানা ডাগর চোখ দুটো সুকুমারের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে তুলে ধরে বললে, ভাল জিনিস বুঝি কেবল আপনি একলা 'এন্জয়' করবেন ! আর কারুর বুঝি তাতে অধিকার নেই !

সুকুমার ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠেছিল। ঈষৎ হেসে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে জবাব দিলে, গায়ে পড়ে ঝগড়া করছেন কেন, আমি কি তা বলেছি ?

আবার কি করে বলবেন? একলা এসেছেন চুপিচুপি দেখতে। বলতে বলতে ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে আনার বললে, তিনখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট দিন তো?

টিকিট তিনখানা নিয়ে জানালার কাছ থেকে সরে দাঁড়াতেই সুকুমার এগিয়ে গিয়ে যেমন চাইলে একখানা সেকেন্ড ক্লাস টিকিট, অমনি জোরে হেসে উঠলো আনার। বললে, কবিরা কি সব সময়ই ধ্যানে থাকে নাকি! তিনখানা টিকিট কাটলুম তবে আমি কার জন্যে? আমরা দু'জন, আর আপনি—চোখে দেখেও কি বুঝতে পারেন না? বলতে বলতে ফতিমার হাতে একটা ছোট্ট চিমটি কাটলে।

কিন্তু আপনি কেন আমার টিকিটটা—

হাসতে হাসতে আনার তার অর্ধ-সমাপ্ত কথাটাকে শেষ করে দিলে, যদি আপত্তি থাকে তাহলে আর একদিন না হয় আমায় দেখিয়ে এ ঋণটা শোধ করে দেবেন। সিনেমা শুরু হতে তখনো বিলম্ব ছিল। আনার ফতিমা ও সুকুমারকে ডেকে নিয়ে সামনের রেস্তোরাঁতে গিয়ে ঢুকলো। এখানেও প্রায় দশ টাকার চায়ের বিল চুকিয়ে দিলে আনার।

ফার্স্ট বেল বাজতে তারা গিয়ে ঢুকলো অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে। সুকুমারের ঠিক পাশের সিটটাতে গিয়ে বসলো আনার। আর আনারের পাশে ফতিমা। ছবি শুরু হলে সুকুমার আনারের কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে অস্ফুটস্বরে আনারকে ঘটনাগুলো পরপর বুঝিয়ে দিতে লাগল। ইংরিজী ছবির সব কথা একে আনার বুঝতে পারে না, তার ওপর যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ওই কাহিনী তার কিছুই সে জানতো না। কাজেই সুকুমারের সাহায্যে আনার ছবিটার পূর্ণ রসগ্রহণ করতে পেরেছে বলে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালে। তারপর বিদায় নেবার সময় আবার পরের শনিবার দিন সেইখানে এইভাবে মিলিত হবে তার সঙ্গে কথা দিয়ে এসেছে। তাই বাপের ওই হুকুম শোনার পর কেবলি তার মনে হতে লাগল, কি হবে?

অনেকক্ষণ একলা ঘরে এই নিয়ে চিন্তা করে শেষে ধীরে ধীরে সে আবার মায়ের কাছে এলো! এবং বাবার হঠাৎ ওই রকম রাগের কারণটা কি জিজ্ঞেস করলে।

সুমিতা যখন বললে, নবাব বাঈজীর বাড়ীতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে তার বাপজানের কাছে, তখন দুশ্চিন্তার একটা বোঝা যেন নেমে গেল তার বুক থেকে। যাক, অন্ততঃ তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে দাদারও পরিণামের কথাটা চিন্তা করে ভয়ে তার বুকটা দুর দুর করতে লাগল।

গিয়াসুদ্দীনের রাগের কথা নবাবেরও অজ্ঞাত ছিল না। ক্রোধের যে নিষ্ঠুর ও বর্বর মূর্তি সে দেখেছিল—বোধ করি তা স্মরণ করেই সে আর বাড়ীতে ফিরলে না। দিল্লী শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল একেবারে মীরাটে। সেখানে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

গিয়াসুদ্দীন কল্পনাও করতে পারেনি যে এতটা সাহস হবে নবাবের। তাই তাকে কি শাস্তি দেবে সেই কথা চিন্তা করতে করতে ঘরের মধ্যে ক্ষিপ্ত কুকুরের মত পায়চারী করতে থাকে।

এদিকে যত দেরী হয় নবাবের ফিরতে, রাগও যেন তত মাথায় চড়ে যায় গিয়াসুদ্দীনের। চাকর বাকর থেকে ফটকের দারোয়ান পর্যন্ত সকলকে ডেকে ডেকে সে বলে দেয় নবাবকে দেখামাত্র যেন ধরে নিয়ে আসে তার কাছে।

কিন্তু রাত্রি গভীর হবার পরও যখন নবাব বাড়ীতে ফিরলো না তখন সমস্ত রাগটা তার গিয়ে পড়ে সুমিতার ওপর। উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে গিয়ে এক সময় তার ঘরে ঢোকে গিয়াসুদ্দীন, তারপর কণ্ঠের জ্বালা চাপতে না পেরে বলে, এর মধ্যে নিশ্চয় তোমার কোন কারসাজি আছে।

এতে রীতিমত অপমানিত বোধ করে সুমিতা! সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে তাই উত্তর দেয়, তার মানে? তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করতে এলে?

আমার মন বলছে এ তোমার কাজ। তুমি নিশ্চয় তাকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছো আমার প্রহারের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে। বলে আরো বেশী সন্দেহ কণ্ঠে নিয়ে গিয়াসুদ্দীন এগিয়ে এলো সুমিতার মুখের কাছে। বললে, তা না হলে তার এতদূর স্পর্ধা হবে যে, এত রাত পর্যন্ত বাড়ীতে না এসে বাইরে থাকবে?

সুমিতা বললে, যে বাইজীর বাড়ী যায় বাপ-মাকে লুকিয়ে তার পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই মনে রেখো।

কথাটা কিন্তু গিয়াসুদ্দীনের মনঃপুত হলো না। সে তেমনি রুক্ষস্বরে তাই উত্তর দিলে, আচ্ছা দেখি কার এতবড় বুকের পাটা যে, আমার কাছ থেকে তাকে লুকিয়ে রাখে। বলতে বলতে তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে একেবারে বাইরে এসে দাঁড়ালো।

এবার চাকর দাস-দাসীদের বেশী টাকা বকশিশের লোভ দেখিয়ে বললে, এই রাত্রে এখুনি যদি তোরা কেউ তার সন্ধান আমায় এনে দিতে পারিস তো পাঁচ হাজার টাকা বকশিশ দেবো হাতে হাতে।

টাকার লোভে কতকগুলো আহাম্মক সেই রাত্রেই এদিক-ওদিক ছুটলো বটে কিন্তু আসল কাজের কাজ কিছুই করতে পারলে না। মুখ কালি করে একে একে ফিরে আসতে লাগল।

এমনি করে সে রাতটা পুইয়ে গেল। পরদিনও সকাল উত্তীর্ণ হয়ে দুপুর পেরিয়ে যখন বিকেলও শেষ হয়-হয় প্রায় তখন গিয়াসুদ্দীন কারখানার কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে নিজের অফিস ঘরে ডেকে পাঠালে। তারা এসে সেলাম করে দাঁড়ালে তাদের কাছে নবাবের আসল কাহিনীটা চেপে গিয়ে সে শুধু বললে, নবাব বাড়ী থেকে পালিয়েছে কাল, এখনো ফেরেনি। কোথায় যে রাগ করে চলে গেছে-বুঝতে পারছি না, তোমরা যদি তার একটু সন্ধান করো তো বড় উপকৃত

হবো।

তাদের মধ্যে তখন একজন একটু ইতস্তত করে বললে, একটা কথা বলবো জনাব কিছু মনে করবেন না। খোকাবাবু আমার কাছ থেকে একশো টাকা পরশুদিন ধার করে নিয়ে গেছে।

তুমি আমাকে না জানিয়ে তাকে এত টাকা দিয়েছিলে কেন? বলে চড়ে উঠলো গিয়াসুদ্দীন তার ওপর।

ভয়ে ভয়ে কর্মচারীটি জবাব দিলে, হুজুর শুধু, আমি একা নয় আরো তিন-চারজনের কাছ থেকে এমনিভাবে সে টাকা নিয়ে গেছে।

কৈ, তাদের ডাকো দেখি এখানে?

কারখানার আরো কয়েকজন কর্মচারী তখন এসে দাঁড়ালো গিয়াসুদ্দীনের সামনে। ভয়ে তাদের অন্তরাত্মা তখন কম্পমান। গিয়াসুদ্দীন রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কেন তোমরা তাকে টাকা দিয়েছো আমায় না জানিয়ে? বলো শিগ্গির।

তারা চুপ করে রইলো, কোন উত্তর না দিয়ে।

ও ছেলেমানুষ কোথা থেকে এত টাকা শোধ দেবে, একবারও সেকথা মনে হলো না তোমাদের? সঙ্গে সঙ্গে গিয়াসুদ্দীন বললে, আজ এই মুহূর্তে তোমাদের চাকরি থেকে আমি বরখাস্ত করলুম।

তখন হাত জোড় করে একজন বললে, আমি বলেছিলুম যে, সাহেব জানতে পারলে আর রক্ষা থাকবে না, তার উত্তরে খোকাবাবু বললে বাপজান জানতেই পারবে না। আম্মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি তোমাদের শোধ দিয়ে দেবো।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, আমার কাছ থেকে এর আগেও আরো তিন-চারবার এরকম ভাবে টাকা ধার নিয়েছিল হুজুর, আবার যথাসময়ে মায়ের কাছ থেকে টাকা এনে শোধও দিয়েছিল।

মায়ের কাছ থেকে! নিমেষে গিয়াসুদ্দীনের মুখচোখ দিয়ে যেন আগুন ছিটকে পড়ে। একটা হুঙ্কার দিয়ে সে বলে উঠলো, দূর হয়ে যাও বেইমানের দল আমার সামনে থেকে। বলতে বলতে সজোরে অফিস ঘরের দরজাটা লাথি মেরে খুলে দিয়ে, তরতর করে নীচে নেমে এলো, তারপর গ্যারেজ থেকে মোটরটা বার করে বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়ে দিলে।

কর্মচারীরা মনিবের এইরকম হঠাৎ বিস্ফোরণের কারণ অনুমান করতে না পেরে ভারাক্রান্ত মনে আবার কারখানায় ফিরে গেল।

বাড়ীতে পা দিয়েই সোজা সুমিতার ঘরে গিয়ে ঢুকলো গিয়াসুদ্দীন। সুমিতা তখন দেওয়াল-জোড়া বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে নবাবের অধঃপতনের কথাটা চিন্তা করছিল।

সহসা তার চোখের সামনে আয়নায় গিয়াসুদ্দীনের মুখের বীভৎস প্রতিচ্ছবি দেখে সে চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি চিরুনিটা মাথা থেকে নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই, বাঘের মত একেবারে লাফিয়ে পড়লো গিয়াসুদ্দীন সুমিতার ওপর।

থাবা মেরে সে টিপে ধরলে সুমিতার গলার নীচেটা, যেন এখনই নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকে মেরে ফেলবে ! তারপর কট্‌মট্‌ করে তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, শয়তানী, আজ আমায় বলতে হবে তুমি কি চাও। কেন তুমি এতবড় সর্বনাশটা আমার করলে ! আমার একমাত্র ছেলেকে কেন এমন করে নষ্ট করে দিলে !

সুমিতা এর জন্য একেবারে প্রস্তুত ছিল না। সে ভাবে, পাগল হয়ে গেল নাকি গিয়াসুদ্দীন ! তাই ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শুধু বললে, তোমার এসব কথার অর্থ কি, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

তা পারবে কেন ? বলে সে মুখে একটা কুৎসিত গালাগালি দিয়ে বললে, আমি ভুল করেছি তোমায় বিশ্বাস করে। তোমার মত একটা বেইমানীর প্রেমে নিজেকে কেন এভাবে উৎসর্গ করতে গেলুম। আমি নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে ডেকে এনেছি, তোমার দোষ নেই ! বলে অনুশোচনায় উন্মত্তপ্রায় হয়ে আবার তার গলা ছেড়ে দিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

সমস্ত ঘরটা যেন থমথম করতে লাগল। আর তার মাঝে কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুমিতা। তখনো যেন তার কানে গিয়াসুদ্দীনের সেই কথাগুলো তেমনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

সুমিতার মনে হয় যেন এই পৃথিবীতে সে একা ! তার আর কেউ কোথাও নেই। তবে কি সত্যি সত্যি নবাব, আনার তার কেউ নয় ! এইমাত্র যে নিদারুণ কথাটা গিয়াসুদ্দীন তাকে শুনিয়ে দিয়ে গেল তা কি তবে সত্যি ? অন্তরের অন্তস্তলে সে যেন কান পেতে থাকে তার জবাব শোনবার জন্যে। অনেক— অনেকক্ষণ ধরে। একবার হয়ত ক্ষীণ একটা স্বর শুনতে পায় সে তার মনের মধ্যে, হ্যাঁ ঠিকই বলেছে গিয়াসুদ্দীন। না না—তা কি সম্ভব ! তারা তো আমারই সন্তান।

আবার ছুটে আসে গিয়াসুদ্দীন সেখানে। সুমিতার হাত দুটো চেপে ধরে উন্মত্ত আবেগের সঙ্গে বলে, আমিনা দোহাই তোমার, আমার ওপর এভাবে প্রতি-শোধ নিও না। তোমাকে ভালবেসে, তোমাকে বিশ্বাস করে, তোমার হাতে যথাসর্বস্ব তুলে দিয়ে আমি কি অন্যায় করেছি ? বলো বলো আমিনা, তুমি চুপ করে থেকো না, আল্লার কিরে ! বলো, তুমি কি আমায় সত্যি সত্যি কোনদিন ভালবাসনি ?···আর আমায় ভালবাসতে পারনি বলে আমার ছেলেমেয়েকে ভালবাস না। বলো, চুপ করে থেকো না। আমার মনের মধ্যে যে কি হচ্ছে তা তোমায় বলে বোঝাতে পারব না। আমার মাথার ঠিক ছিল না, তাই না জেনে মুখে যা এসেছে বলে তোমার মনে ব্যথা দিয়েছি। আমায় ক্ষমা করো আমিনা। বলো, এমনভাবে চুপ করে থেকো না !

সুমিতার মনে বুঝি এবার অনুকম্পা জাগে ! তাই গিয়াসুদ্দীনের হাত দুটো

ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে শুধু বলে, আমায় একটু একলা থাকতে দাও—দোহাই তোমার !

সুমিতার কণ্ঠের অত্যধিক কোমলতায় কিনা কে জানে গিয়াসুদ্দীনের সে রাগ যেন নিমেষে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সে ঘাড় হেঁট করে তখনই বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

সুমিতা বরাবরই একটু বেশী অভিমানী তাই কোন ব্যাপারেই সে গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে কখনো বাদানুবাদ বা তর্ক করতো না, শুধু সমস্ত মনটাকে নিঃশব্দে গুটিয়ে নিয়ে সরে যেতো দূরে।

এমনি করে বাড়ীর আবহাওয়া এদন বিষাক্ত করে তুললে গিয়াসুদ্দীন, যে তার মধ্যে সুমিতার নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে থাকে। যাদের সে মনে করতো সবচেয়ে আপন জন নিমেষে তারাই যেন হয়ে উঠলো তার কাছে সকলের চেয়ে বেশী পর। একথা ভাবতেও ঘৃণা হয়। লজ্জায় অপমানে সুমিতার মরে যেতে ইচ্ছা করে।

অথচ রাগ পড়ে গেলে, যতবার সুমিতার মান ভাঙ্গাবার চেষ্টা করে গিয়াসুদ্দীন, ততবার কিন্তু ব্যর্থ হয়। যখনই আসে দেখে গম্ভীর মুখ সুমিতার। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত বার বার তার তটে মাথা ঠুকে আবার যেন সে দ্বিগুণতর জ্বালা বুকে নিয়ে ফিরে যায়।

এমনি ভাবে একটা সম্পূর্ণ মাস যখন গড়িয়ে গেল তখন একদিন সকালে হঠাৎ গিয়াসুদ্দীনের চোখে পড়লো, তার বড় মোটরখানা ফটকে দাঁড়িয়ে আছে, আর সুমিতার দাসীবাঁদীরা তাতে জিনিসপত্র বোঝাই করছে ! ব্যাপার কি ! সে যখন ভাবতে চেষ্টা করছে তখন সেজেগুজে ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে নিয়ে সুমিতা একেবারে এসে দাঁড়াল তার সামনে। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললে, আমার এখানে ভাল লাগছে না। দিনকতকের জন্যে আমি লাহোরে চলে যাচ্ছি। আশা করি তোমার এতে কোন অমত নেই।

গিয়াসুদ্দীন সোজা উত্তর দিলে, না। কোনদিন তোমার কোন কাজে অমত প্রকাশ করিনি, আজো করবো না ! তোমার যা খুশি করতে পারো। এমন কি আমাকে জিজ্ঞেস করার কোন প্রয়োজন নেই।

তার কণ্ঠে দুঃখের চেয়ে অভিমানই যেন বেশী প্রকাশ পায়।

সুমিতা যেমন নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুকেছিল, তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়ে মোটরে উঠলো।

সত্যি কথা বলতে কি গিয়াসুদ্দীনও যেন মনেপ্রাণে এই রকম একটা কিছু চাইছিল। অন্ততঃ আমিনা তার সামনে থেকে কিছুদিন দূরে সরে যাক, তাতে যদি বাড়ীর আবহাওয়াটা কিছু বদলায়।

বদলানো দূরে থাক, বাড়ীর আবহাওয়া যেন ক্রমশই দুর্বিষহ হয়ে ওঠে গিয়াসুদ্দীনের কাছে। এক মাসের বেশী হতে চললো নবাবের কোন সংবাদ নেই। সুমিতাও চুপচাপ। লাহোর থেকে সে কোন খবর পাঠায় না। ঘরে আছে আনার,

তার মুখও অন্ধকার। একমাত্র আদরিণী সদাহাস্যময়ী কন্যার অন্তরে কোথায় যে কিসের ব্যথা বুঝতে পারে না গিয়াসুদ্দীন। একবার ভাবে দাদার জন্যে সে মনে আঘাত পেয়েছে। আবার চিন্তা করে হয়ত বা মা চলে যাওয়ার দরুন মেয়ের মন খারাপ। কিংবা উভয়ের মিলিত কারণেই সে সর্বদা এত গম্ভীর হয়ে থাকে। আনারের ঘরে ঢুকে একদিন সোজাসুজি তাকে গিয়াসুদ্দীন জিজ্ঞেস করলে, মেরি বেটিয়া, কেয়া শোচতি রহতি হো—হর্‌বখ্‌ত। তুমি সব সময় কি এত চিন্তা করো মা?

আনার একথার কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে থাকে।

গিয়াসুদ্দীন আবার বলে, আজকাল সবসময় তোমার মুখ এমন অন্ধকার দেখি কেন? মায়ের জন্যে বুঝি মন কেমন করছে? তাহলে না হয় লাহোরে গিয়ে গিয়ে থাকগে।

আনার ঘাড় নেড়ে জবাব দেয়, তাতে আমার স্কুলের পড়ার ক্ষতি হবে।

তবে কিসের এত দুশ্চিন্তা তোমার মনে, আমি তো ভেবে পাই না। কিসের অভাব তোমার? ও বুঝেছি, দাদার জন্য বোধ হয় মন কেমন করছে না, বল তো সত্যি করে?

আনারের দু'চোখে এবার জল ভরে আসে।

গিয়াসুদ্দীন তা লক্ষ্য করে বলে, দেখছো তো তার খোঁজের জন্যে পুলিশে পর্যন্ত খবর দিয়েছি। এছাড়া কত লোকজন পাঠিয়েছি চারদিকে। তারপর একটু থেমে আপন মনেই বলতে থাকে, যাবে কোথায়, আসতেই হবে তাকে একদিন ঘরে! আনার এর কোন উত্তর না দিয়ে সজল চক্ষু দু'টি বাপের মুখের ওপর তুলে তেমনি নীরব থাকে। এদিকে যত দিন যায় পুত্রের কাছে পরাজয়ের এই গ্লানি দুঃসহ মনে হয়। এতটুকু ছেলের এতখানি বুকের পাটা কোথা থেকে এলো! নিশ্চয়ই এর পিছনে কারুর কোন বদ্‌মতলব আছে। মনে মনে গিয়াসুদ্দীন এ নিয়ে যত চিন্তা করে তত যেন এই সন্দেহটা তার মনে বদ্ধমূল হয় যে, নবাবের অধঃপতনের জন্যে একমাত্র দায়ী সুমিতাই! তা না হলে তাকে না জানিয়ে যখন তখন টাকা-কড়ি নবাবের হাতে তুলে দেবে কেন? এর পিছনে ওইরকম একটা উদ্দেশ্য না থাকলে কখনো এমন কাজ মা হয়ে কেউ করতে পারে? তাই ছেলে ফিরে এলে এবার নিজের চোখে চোখে রাখবে—এইরকম একটা দৃঢ় সঙ্কল্প সঙ্গে সঙ্গে করে বসে গিয়াসুদ্দীন!

ছেলের এই মতিগতি দেখে যেন মেয়ের সম্পর্কে বেশী সতর্ক হয়ে ওঠে গিয়াসুদ্দীন। মেয়ের ওপর তাই সবসময় কড়া নজর রাখতো। ফলে কিছুদিন যেতে না যেতেই আনারের মনে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে সে। তার সন্দেহ হলো আনার যেন মনে মনে কিসের একটা বেদনা বয়ে বেড়াচ্ছে। গিয়াসুদ্দীন মেয়ের এই ব্যবহারে মনে মনে অপমানিত বোধ করে! ভাবে, মেয়েকে এত আদর দিয়েও তার অন্তরের হদিস পাই না কেন? প্রথমে সে মনে করেছিল বুঝি নবাবের

জন্যে, ভাইয়ের বিরহে তার এই মানসিক অশান্তি ! কিন্তু ক্রমশঃ বুঝতে পারলে, তার সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ! তবে কিসের দুর্ভাবনা সবসময় আনারের মত মেয়ের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আড়াল থেকে অনেকদিন লক্ষ্য করেছে গিয়াসুদ্দীন, তার পড়ার বই সামনে খোলা পড়ে থাকে আর সে চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে কি যেন চিন্তা করে। কখনো বা তার উপস্থিতির কথা বুঝতে পেরে গোপন করে যেন দীর্ঘশ্বাস !

অনেকদিন দেখে শেষে গিয়াসুদ্দীন সোজা মেয়ের ওপর এক হুকুমনামা জারী করলে। বললে, আমি স্থির করেছি তুমি বড়ো হয়েছো, তোমার এবার একটা বিয়ে দেবো।

বিয়ে ? চমকে উঠে আনার বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বোবা দৃষ্টিতে। না, না, তা সম্ভব নয় !

সম্ভব নয় ? কেন ? তোমার যা বয়েস, তার অনেক আগেই আমাদের ঘরের মেয়েদের বিয়ে হয়।

শরমজড়িত কণ্ঠে আনার উত্তর দেয়, আমি পড়বো—এবং যতদিন না লেখাপড়া শেষ হচ্ছে ততদিন আর ওকথা তুমি আমার সামনে বলো না, বাপজান !

এর উত্তরে গিয়াসুদ্দীন বললে, তাই যদি জানো তবে দিনরাত কিসের এত চিন্তা তোমার মনে। নিশ্চয় লেখাপড়ার নয় ? কেন না লেখাপড়ার কথা যারা চিন্তা-ভাবনা করে তারা অমন উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে না। আমি গোপনে কিছুদিন থেকে তোমার মনের এই পবিবর্তন লক্ষ্য করছি। একটু থেমে আবার কঠিনস্বরে বললে, আমাকে ছেলেমানুষ ভেবো না আনার—আমি সব বুঝি—আমি তোমার বাবা—ভুলে যেয়ো না !

না, না, বাপজান তুমি আমায় ভুল বুঝেছো ! আমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারবো না, আমায় ও আদেশ করো না। কান্নায় গলা বুজে এলো তার।

ভয় নেই তুমি আমার একমাত্র মেয়ে, উপযুক্ত পাত্রেই তোমাকে দেবো। জাস্টিস্ আসান্ আলির ছেলে, এই বছর বিলেত থেকে বড় ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এসেছে, তার সঙ্গে আমি বিয়ের সম্বন্ধ করছি তোমার। বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় গিয়াসুদ্দীন।

আনার ভাল করেই চেনে তার বাপজানকে। জানে একবার যা গোঁ ধরবে কিছুতেই তা থেকে একচুল তাকে নড়ানো যাবে না। তাই সারারাত ধরে কেঁদে কেঁদে শুধু সে চোখ ফুলিয়ে ফেললে। সে যাকে জানে না—চেনে না—তাকে কিছুতেই বিয়ে করতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারের জ্ঞানদৃপ্ত মার্জিত মূর্তিটা যেন তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কি কালো টানা টানা চোখ ! কি সুগভীর চাহনি। যেন অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নেয় নিমেষে ! বার বার ঘুরে ফিরে সুকুমারের সেই কথাটা তার মনে পড়তে থাকে, ভালবাসায় কি জাতিভেদ আছে ? মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনারের সর্বাঙ্গ—মাথার চুল থেকে

নখের ডগা পর্যন্ত যেন কি এক পুলকানুভূতিতে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

পরদিন আয়াকে দিয়ে আনার বলে পাঠালে তার বাবাকে যে, এখন সে কিছুতেই বিয়ে করতে পারবে না—অন্ততঃ ম্যাট্রিকটা পাশ না করা পর্যন্ত তো বটেই।

রক্তবর্ণ চক্ষু নিয়ে একসময়ে নিঃশব্দে গিয়াসুদ্দীন এসে দাঁড়ালো আনারের পিছনে। পড়ার বই সামনে খুলে রেখে চুপ করে সে তখন বসেছিল! সহসা নিজের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলার শব্দে নিজেই চমকে উঠে যেমন পিছন ফিরতে যাবে, দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার বাপজান।

সে কিছু বলবার আগেই গিয়াসুদ্দীন যেন জেহাদ ঘোষণা করলে। সুদৃঢ়-স্বরে বললে, তোমার বিয়ের সম্বন্ধ আমি স্থির করে ফেলেছি। তারা দেখতে আসবে সামনের শনিবার। তুমি প্রস্তুত থাকবে—এই আমার হুকুম! বলে চলে যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়াতে দেখে আনারের দু'চোখে জল টলটল করছে।

মেয়ের জলভরা সেই চোখের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, ও কান্না, না মহব্বত-কী-আঁসু!

নেহি—নেহি—বাপজান। মেরি কসুর মাফ্ কিজীয়ে! বলেই চোখের জল মুছে ফেললে।

গিয়াসুদ্দীন গম্ভীর স্বরে বললে, তোমার রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছে বুঝি কারুর প্রেমে পড়েছো, কাউকে তুমি ভালবেসেছো। নইলে কথায় কথায় এমন জল এসে পড়ে না চোখে! ও জল আমি চিনি! কিন্তু তাতে কোন সুবিধে হবে বলে আমি মনে করি না। তুমি তো জানো আমার মত! আমি বড়লোক, সেই জন্যে ধনী ও শিক্ষিত এবং বিশেষ করে মুসলমান ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে পারবো না। তাছাড়া সমাজে আমার মাথা হেঁট হয়, আমার সম্মান ও মর্যাদার হানি হয় যাতে এমন কাজও আমার মেয়ে হয়ে তোমার করা উচিত নয়, সেটুকু বোঝবার মত বয়স ও শিক্ষাদীক্ষা তোমার হয়েছে আশা করি।

আনার এবার অশ্রুরুদ্ধস্বরে বললে, তা হয়েছে বলেই ওসব কথা কোনদিন আমি মনে আনিনি। তুমিই তো তুলছো! বলতে বলতে সে চোখের জল সামলাতে গিয়েও পারলে না, বাপের সামনে একেবারে কেঁদে ফেললে।

আমি কেন তুলেছি তা বোঝবার মত বয়স তোমার হয়েছে। বলতে বলতে হঠাৎ কন্যার সামনে এগিয়ে এসে তার চোখের ওপর নিজের জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে উঠলো, আমি আর কাউকে বিশ্বাস করি না। তোমাদের স্বাধীনতা দিয়ে, তোমাদের ওপর বিশ্বাস করতে গিয়ে আমি ঠকেছি! আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। আর না। নিজেকে এইভাবে বার বার প্রতারিত হতে দেবো না আমি কিছুতেই।

এবার সব সঙ্কোচ ও লজ্জা কাটিয়ে গলায় জোর এনে আনার প্রতিবাদ করে, বাপজান, তুমি ভুলে যেয়ো না আমার মনে যদি সেরকম কোন দুরভিসন্ধি থাকতো

তাহলে তুমি হয়ত আজ আমাকে এখানে দেখতে পেতে না! কিন্তু পাছে তুমি মনে ব্যথা পাও, পাছে তোমার সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় সেইজন্যে সে-সব কথা কোনদিন চিন্তায়ও আনিনি। বলে চোখের জল বার বার হাত দিয়ে মুছতে থাকে।

এর উত্তর দিলে গিয়াসুদ্দীন মনের জ্বালা চাপতে চাপতে, তোমাকে এত লেখাপড়া শেখাচ্ছি তো সেইজন্যে মা! জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা হবে বলে, ভুলে যেয়ো না।

মুহূর্তকয়েক নীরব থেকে সহসা ডুকরে কেঁদে ওঠে আনার, লেখাপড়া বোধহয় না শেখালেই ভাল করতে বাবা—তাহলে হয়ত তুমি যা বলছো তা অনায়াসে মেনে নিতে পারতুম!

তার মানে?

তার মানে লেখাপড়া শিখে যতটুকু জ্ঞানলাভ করেছি—তাতে বিবেক বলে যে, ভালবাসা ছাড়া বিয়ে করার কোন অর্থ হয় না। আর তার চেয়েও বড় শিক্ষা এই পেয়েছি যে, ভালবাসার মধ্যে কোন ধর্মভেদ বা কোন জাতিভেদ থাকতে পারে না। ভালবাসা নির্মল পবিত্র ঈশ্বরের আশীর্বাদ!

মেয়ের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে গিয়াসুদ্দীন মনে মনে কি যেন চিন্তা করতে থাকে। তার মনে সহসা উদয় হয়—তবে কি একথার অর্থ এই যে, আনার এমন কাউকে ভালবেসেছে যে তাদের জাতছাড়া, ধর্মছাড়া? অন্য সময় হলে মেয়েকে হয়ত একটা চড় মেরে মুখ লাল করে দিতো। কিন্তু তখন গিয়াসুদ্দীনের গৃহের শান্তি বলতে ওই একমাত্র মেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না। তাই অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে তারপর একটু ভেবে গিয়াসুদ্দীন জবাব দিলে, মুসলমান হয়ে কোন কাফেরকে বিয়ে করাটা কি তুমি সত্যিকারের শিক্ষিতের কাজ বলে মনে করো? আমি মুখ্যু মানুষ, আমার তো মনে হয় শিক্ষাই মানুষকে সত্যাসত্য, ধর্মাধর্ম ও ভালমন্দের বিচার করার ক্ষমতা এনে দেয়, আর সেই জন্যই তোমাদের সব দিক থেকে ভাল শিক্ষা দেবার জন্যে আমি জলের মত অর্থ ব্যয় করছি। জানি না, তোমাদের শিক্ষাদীক্ষা কি বলে। মোট-কথা আমি জান্ থাকতে তা সমর্থন করতে পারবো না!

কাফের! কাফের তুমি কাকে বলছো বাবা জানি না! বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, জ্ঞানে, গুণে, শিষ্টতায়—সর্ববিষয়ে যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তাকে যদি কাফের বলে ঘৃণা করো তো আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলুম না বাবা।

সহসা যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হলো। তবু গিয়াসুদ্দীন অতিকষ্টে নিজের রাগ সংবরণ করে নিলে। মেয়ের সঙ্গে আর কোন বিতর্কে অবতীর্ণ না হয়ে পরাজিতের মত গম্ভীরমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ষোলো

সেদিন আনার নিজে সুকুমারকে সিনেমা দেখার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সুকুমারের মনে এর জন্যে আনন্দের সীমা ছিল না। গোপনে সে দিন গুনতে থাকে। এ শুধু সুন্দরী তরুণীর পাশে বসে সিনেমা দেখার সৌভাগ্য নয়—তার মত এক ভাগ্যবিড়ম্বিত, আত্মীয়-পরিজনহীন তরুণের কাছে এনেছিল এক পরম স্বীকৃতি। আনার যে তাকে আপন মনে করে এটাই তার চরম পাওয়া। সেজে-গুজে সেখানে গিয়ে যথাসময়ে হাজির হতে সুকুমারের তাই বিলম্ব হয় না। কিন্তু কোথায় আনার? সিনেমা শুরু হয়ে যাবার পরও এক ঘণ্টা সে বাহিরে তার জন্যে অপেক্ষা করে করে শেষে হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

এরপর থেকে একেবারে চুপচাপ! সুকুমার আনারের আর কোন পাত্তাই পায়নি। অথচ মনের মধ্যে সে যেন কিসের এক দুর্দমনীয় আকর্ষণ অনুভব করে আনারের জন্যে—কি তীব্র তার বেদনা, তা সে মুখে বোঝাতে পারে না! তার অভাবে যেন অদ্ভুত এক শূন্যতায় ভরে ওঠে জীবন তার।

আবার সেই সঙ্গে মায়ের অভাব মিলিত হয়ে সমস্ত পৃথিবীতে সে যেন একা এক অভিশপ্ত জীবন যাপন করছে বলে মনে করে। সুকুমারকে যেন এই নিঃসঙ্গতা পাগল করে তোলে। তখন সবচেয়ে বেশী রাগ হয় তার সইমার ওপর। কতগুলো চিঠি তাকে সে দিয়েছে মায়ের ঠিকানা চেয়ে কিন্তু একখানারও জবাব দেয়নি সইমা।

এক একদিন যেন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সুকুমারের জীবন। সে মাকে স্বপ্ন দেখে, মায়ের কথা চিন্তা করে দিনরাত। কখনো ভাবে, মায়ের কাছে গিয়ে একবার কাঁদতে পারলে যেন তার মনটা হালকা হয়।

এমন সময় অকস্মাৎ যেন ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলেন! কলকাতায় যাবার একটা সুযোগ মিলে গেল সুকুমারের। কলেজের যে হকি টিম খেলতে যাচ্ছে কলকাতায় ইন্‌টার-ইউনিভারসিটি কম্‌পিটিশন্‌-এ, তার একজন খেলোয়াড় নির্বাচিত হলো সুকুমার। অবশ্য তাকে রিজার্ভ-এ থাকতে হবে। হঠাৎ একজন খেলোয়াড় অসুস্থ হয়ে পড়ায় এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে পড়লো।

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে তাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল। সকালে কলকাতায় পৌঁছে জলযোগ সেরে, বিশ্রাম না নিয়েই সুকুমার একেবারে সইমার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো!

সুকুমারকে দেখে প্রথমটা চিনতে পারেনি অঞ্জলি। হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বাস্তবিক তার চেহারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে এখন। সেই হাড়-বারকরা, রোগা লিকলিকে একফোঁটা ছেলে আর তো সে নেই। এখন সে রীতিমত যুবক। দিল্লীর জলহাওয়ায় থেকে পাঞ্জাবী ধরনের লম্বা চওড়া

চেহারা হয়েছে। তার ওপর যেমন ফর্সা ধবধবে রঙ্, তেমনি কালো টানাটানা চোখ, টিকলো নাক, সরু গোঁফের রেখার সঙ্গে অল্প অল্প দাড়ি দু'দিকের জুলপির নীচে থেকে নেমে সারা চিবুকটাকে ভরিয়ে তুলছে। যেন বর্ষার প্রথম ধারায় নব তৃণোদ্গম হয়েছে ফুলগাছ ঘেরা বড়লোকের বাড়ীর লন্-এ। মানে, সব মিলিয়ে এমন সুন্দর সুশ্রী পুরুষোচিত চেহারা হয়েছে যে, বাংলাদেশের তরুণদের পক্ষে দুর্লভ বলা যেতে পারে। তাই দীর্ঘদিন পরে তাকে চিনতে না পারাটা অঞ্জলির পক্ষে অপরাধ নয়। তবু তার ওষ্ঠের নীচের কালো ছোট্ট আঁচিলটা দেখে অঞ্জলির অনুমান করতে ভুল হয়নি। কিন্তু অকস্মাৎ একটা বলিষ্ঠ তরুণকান্তি যুবককে পাজামার ওপর সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে দেখে প্রথমটা একটু সমীহ হয় বৈকি? বাঁ হাতে মাথার কাপড়টা তুলে দিয়ে অঞ্জলি যখন প্রশ্ন করলে, কাকে চাই, তখন একেবারে তার পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে সুকুমার বললে, তোমাকেই চাই সইমা—আমায় চিনতে পারছো না?

ওমা সুকু, তুই? আয় আয় বাবা—বলে তার কপালে সস্নেহে একটা চুমু খেয়ে বললে, বাবা, কতবড় হয়েছিস। সইমার মাথা যে ছাড়িয়ে গিয়েছিস রে। তারপর তার হাতটা ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে তক্তাপোষের ওপর বসিয়ে বললে, তা ছেলে যত বড়ই হোক মায়ের কাছে সে সব সময়ই ছোট থাকে, কি বলিস? বলে হেসে উঠতেই অঞ্জলির ছেলেমেয়েরাও এসে সুকুমারকে একেবারে ঘিরে দাঁড়ালো। অঞ্জলি তাদের বললে, নমস্কার কর ওকে, ও তোদের সুকুদা হয়।

ছেলেমেয়েরা একে একে তায় পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবার পর সুকুমার তাদের সঙ্গে ছোটখাটো আলাপ আলোচনার যোগ দিলে। জিজ্ঞেস করলে, কার কি নাম, কে কোন্ ক্লাসে পড়ে, কি কি বই পড়ে ইত্যাদি ইত্যাদি।

অঞ্জলি বললে, যা তোরা এখন ভীড় কমা দেখি। স্কুলের সময় হলো, চলে যা সব। আমাকে একটু ওর সঙ্গে কথা বলতে দে! কতদিন পরে ওকে দেখলুম!

অঞ্জলির মনে যেন কত কথা একসঙ্গে ভীড় করে আসে। চা ও জলখাবার খাওয়াতে খাওয়াতে সুকুমারের সঙ্গে সে গল্প জুড়ে দেয়। সব শেষে যখন অঞ্জলি জিজ্ঞেস করলে, কদিন তুই থাকবি বাবা কলকাতায়, তখন সুকুমার বললে, খেলতে এসেছি, যদি জিততে পারি তাহলে মোট দশ দিন। আর তা না হলে যদি আজকের খেলায় হেরে যাই তো কালই রাত্রের গাড়ীতে দিল্লী রওনা!

অঞ্জলি বললে, বেশ, তাহলে কাল সকালে আমার এখানে খাবার নেমন্তন্ন রইলো, মনে থাকে যেন!

সুকুমার এবার অভিমান-ভরা কণ্ঠে বললে, মায়ের ঠিকানা না দিলে আমি আর এখানে জলস্পর্শ করবো না। তুমি মায়ের ঠিকানা দেবে বলেছিলে, কিন্তু

দিলে না কেন? আমি তোমায় কতগুলো চিঠি দিয়েছি তার একটারও উত্তর পাইনি।

অঞ্জলি তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, আচ্ছা কাল সকাল সকাল আসিস, তোকে তখন সব ব্যাপারটা খুলে বলবোখন, তাহলে আর সইমার ওপর তোর রাগ থাকবে না—আমি ঠিক জানি।

সুকুমারের চোখের কোণে জল ছল ছল করছিল। সে বললে, মা বেঁচে থাকতেও আমি মাতৃহীন সইমা, এ যে কত বড় অভিশাপ তা যদি বুঝতে তাহলে বোধহয় একদিনও আমার কাছে ঠিকানাটা গোপন রাখতে পারতে না। শেষের দিকে আর মনের আবেগ সামলাতে পারলে না সুকুমার। দু' ফোঁটা জল উপচে পড়লো চোখ বেয়ে।

আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে গিয়ে অঞ্জলিরও চোখের পাতা ভিজে উঠলো। বললে, ছি বাবা, চোখের জল ফেলতে নেই, তাতে অকল্যাণ হবে যে তোর মার। চুপ কর!

এর জবাব কিছু না দিয়ে শুধু নিঃশব্দে পকেট থেকে একখানা রুমাল বার করে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল সুকুমার।

পিছন থেকে গলা হেঁকে অঞ্জলি বললে, তাহলে কাল একটু সকাল সকাল আসিস বাবা।

সতেরো

পরের দিনই সুকুমারদের দিল্লী যেতে হবে। খেলায় তাদের হার হয়েছে। তাই সকাল সকাল সে সইমার বাড়ীতে এসে হাজির হলো। নানারকমের রান্নার আয়োজন করেছিল অঞ্জলি, বাংলার রান্না কতকাল সুকুমার খায়নি বলে। ছেলেমেয়েরা সব তখন স্কুলে বেরিয়ে গেছে। অঞ্জলি সুকুমারকে রান্নাঘরে ডেকে একটা আসন দিলে বসতে! রান্নাঘরের দরজার কাছে বসে চা খেতে খেতে সুকুমার গল্প করে সইমার সঙ্গে—আর দেখে সেই সব রান্নার আয়োজন। বলে, সইমা, তুমি করেছ কি, এত রকমের তরকারী কি খাওয়া সম্ভব!

আহা, এত আবার কিরে, গরীব সইমার ভারি তো ক্ষমতা। কতকাল পরে এলি, দু'চার দিন থেকে যা তা নয় আজই যেতে হবে। কেন, ওরা ফিরে যাক না—তুই আমার এখানে ক'টা দিন থেকে যা বাবা।

তুমি গরীব! তাই বুঝি এই বিরাট আয়োজন। তাই বুঝি এত টাকা খরচ করে আমায় লেখাপড়া শেখাচ্ছো! বলে, একটু ভেবে সে আবার বললে, তা হয় না সইমা। সকলের কন্‌সেসন্‌ টিকিট যে একসঙ্গে, আবার সুযোগ পেলে চলে আসবোখন, দেখি গরমের ছুটিতে যদি পারি।

অঞ্জলি বললে, তা হ্যাঁরে, এতদিন পরে এলি, একবার তোর বাবা আর

নতুনমার সঙ্গে দেখা করে এসেছিস তো!

সহসা মুখখানা কালো হয়ে উঠলো সুকুমারের। বললে, না, তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক কোনদিন ছিল এটা স্বীকার করতেও আমি ঘৃণা বোধ করি! তুমি আমাকে ও অনুরোধ করো না।

এমন সময় হঠাৎ ডাকপিওন এসে সদর দরজার কড়া নেড়ে বললে, চিঠি আছে।

যা তো বাবা, আমার হাত জোড়া—চিঠিগুলো নিয়ে আয় তো। ছেলেমেয়েরা সব খেয়ে স্কুলে বেরিয়ে গিয়েছিল, শুধু কোলের পাঁচ বছরের মেয়েটা রান্নাঘরে তার পাশে বসে এক টুক্‌রো নারকোল চিবোচ্ছিল।

সুকুমার খপ্‌ করে উঠে সদর দরজায় যেতেই তার হাতে তিনখানা চিঠি দিলে পিওন। নামগুলো একে একে পড়তে পড়তে হঠাৎ একটা খামের ওপর 'লাহোর'-এর ছাপ দেখে ধড়াস করে উঠলো সুকুমারের বুকটা। চিঠিটার ওপরে আবার অঞ্জলির নাম লেখা! মনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সেই খামটা লুকিয়ে বাকীগুলো অঞ্জলিকে নিয়ে গিয়ে দিলে সুকুমার!

তার মধ্যে অঞ্জলির বোনের লেখা একটা চিঠি ছিল। সে যেই সেটা খুলে পড়তে শুরু করলে অমনি সেই ফাঁকে সুকুমার একবার রাস্তায় বেরিয়ে এলো। তারপর পকেট থেকে চিঠিখানা নিয়ে খুলতেই তার সারা দেহ একসঙ্গে শিউরে উঠলো। সত্যি, এ যে তার মায়ের চিঠি! এই তো ওপরে লাহোরের ঠিকানা লেখা। আর চিঠির শেষে তার মায়ের নাম লেখা সুমিতা। থরথর করে তার হাত কাঁপতে থাকে উত্তেজনায়—চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। লেখাগুলো ভাল করে পড়তে পারে না সে। শুধু বার বার এই কটা লাইন তার চোখের সামনে যেন বড় হয়ে ওঠে—ভাই অঞ্জলি, তোর চিঠি পেয়েছি। কিন্তু উত্তর দিতে না পারার অনেক কারণ আছে, যা তোকে লেখা যায় না। সেইজন্য এত দেরী হলো! তোরই জন্যে আমার সুকু আজ মানুষ হয়েছে, তুই আমার মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিস এর, জন্যে ঈশ্বর তোর মঙ্গল করবেন। মায়ের কাজ তুই করেছিস, আমি শুধু তাকে গর্ভেই ধরেছিলুম। তোকেই যেন সে মা বলে মনে করে—আমার কথা তাকে ভুলে যেতে বলিস। জীবনে আর হয়ত কোনদিন তার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হবে হবে না। আমার মত হতভাগিনী বোধহয় পৃথিবীতে আর দুটি নেই। তাই এমন ছেলের মুখ থেকে একবার মা ডাক শুনে জীবন ধন্য করতে পারলুম না। আমি যে তার পড়াশুনার যাবতীয় ব্যয় বহন করেছি, একথাও তাকে কোনদিন তুই জানতে দিসনি। এই আমার শেষ অনুরোধ। চিঠির উত্তর দিতে হবে না। আমার মনে বড় অশান্তি—যদি কোনদিন সুযোগ পাই তো সে-সব কথা লিখে জানাবো। আজ এই পর্যন্ত!

চিঠিখানাকে জামার পকেটে সযত্নে লুকিয়ে রেখে সুকুমার আবার সইমার কাছে গিয়ে বসলো। তারপর কোনরকমে আহার-পর্ব সমাধা করে ছুটলো

হোটেলে। তবু অঞ্জলি তাকে ঠুকলে, হ্যাঁরে, সইমার কাছে বুঝি দুদণ্ড বসতে ভাল লাগে না। সে-সব কথা যেন তখন সুকুমার কানে শুনতে পায় না। শুধু মায়ের সেই কথাগুলো তার দু'কানে বাজতে থাকে বার বার। কতক্ষণে মায়ের মুখ দেখবে! ঠিকানা যখন একবার পেয়েছে আর তাকে পায় কে! পাখীর মত ডানা থাকলে সে বোধহয় এখনি উড়ে চলে যেতো সেখানে!

হোটেলে ফিরে নিজের সুটকেস ও বিছানাটা গুছিয়ে নিয়ে একাই বিকেলের গাড়ীতে পাড়ি দিলে সে একেবারে লাহোরে। তার যেন আর একটুও দেরী সইছিল না। দলের কাছে আসল কথাটা গোপন রেখে সে বললে, এক আত্মীয়ের সঙ্গে পথে নেমে দেখা করে পরে ফিরবে দিল্লী। হয়ত দুচার দিন দেরীও হতে পারে তার।

আঠারো

লাহোর স্টেশনে এসে গাড়ী থেকে নামতেই সুকুমারের বুকটা আনন্দে ধড়াস করে উঠলো! যেখানে তার মা থাকে সেই দেশে তাহলে এসে পেঁছিলো!

আর একদিন এইখান থেকে যেভাবে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরেছিল সে কথাটাও সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল! কিন্তু আজ আর সে ভয় নেই। মায়ের বাড়ীর ঠিকানা তার কাছে। দেখা হবেই! কতক্ষণে হবে? যেন তারই জন্যে তার মন ছটফট করতে থাকে।

ঠিকানা খুঁজে খুঁজে সন্ধ্যা নাগাত যখন সুকুমার সেই বাড়ীটার সামনে গিয়ে হাজির হলো তখন দেখলে যত সহজে মায়ের দর্শন পাবে ভেবেছিল, ব্যাপারটা তত সহজ নয়। ফটকে সশস্ত্র প্রহরী। কোন পুরুষের ভেতরে যাবার হুকুম নেই। মনের দুঃখ চেপে সুকুমার তখন ফিরে এসে একটা হোটেলে উঠলো। তারপর নাইট-শোয়ে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে বলে বেরিয়ে পড়লো হোটেল থেকে। রাত তখন প্রায় বারোটা—ওই অঞ্চলটা একেবারে এত নির্জন যে বুকের ভেতরটা ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। সুকুমার চোরের মত সেই বাড়ীটার আনাচে-কানাচে ঘুরতে থাকে!

দূরে লাহোরের বড় পোস্ট অফিসের ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। আমিনা বিছানায় শুয়ে একে একে তা গুনতে গুনতে ঘুমবার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই যেন চোখে ঘুম আসতে চায় না। অঞ্জলি চিঠিটা পেয়ে যখন সুকুমারকে সব কথা লিখবে তখন তা পড়ে ছেলের মনে কি রকম প্রতিক্রিয়া হবে সেই চিন্তাই বুঝি তার মাথায় তখন ঘুরপাক খাচ্ছিল।

নিঝুম রাত! পথে ঘাটে টাঙ্গা, এক্কা চলা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাস্তার আলো লেগে বাগানের বড় বড় গাছগুলোর ছায়া যেন সুমিতার ঘরের দেওয়ালে কাঁপে। সহসা ঝুপ করে কিসের যেন শব্দ হলো। জানালার ভেতর দিয়ে তার

ঘরে লাফিয়ে পড়লো কে।

কে? সঙ্গে সঙ্গে আমিনা বেড সুইচটা টিপে দিয়ে চমকে উঠলো। এ্যা কে ও—ওই জানলার কাছে দাঁড়িয়ে! নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না সুমিতা। সে কি স্বপ্ন দেখছে, না সত্যি সত্যি তার সামনে তার সে-ই ছেলে সুকুমার!

সুকুমারেরও মুখে কোন কথা ছিল না। শুধু বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে সে তাকিয়ে ছিল মায়ের মুখের দিকে। হ্যাঁ—সেই মুখ—অবিকল সে-ই। মায়ের যে মূর্তিকে এতদিন ধরে অন্তরের মণিকোঠায় রেখে পুজো করে এসেছে—হুবহু সেই স্নেহবিগলিত মাতৃমূর্তি!

সুকুমারের মুখে যেন কথা ফোটে না। শুধু বজ্রাহতের মত তাকিয়ে থাকে।

সুমিতারও বুঝি সাময়িক বাকরোধ হয়ে গিয়েছিল, তাই সে এমন পাষাণ মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মুহূর্তকয়েক এমনি ভাবে কেটে যাবার পর সহসা মা, মাগো বলে ঝাঁপিয়ে পড়লো সুকুমার সুমিতার বুকের ওপর!

সুকু, বাবা সুকু, বলে তার মাথাটা বুকের ওপর চেপে ধরে, তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে অঝোর ধারে অশ্রু বর্ষণ করে সুমিতা! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! সুমিতা যত কাঁদে, তার তিন গুণ কাঁদে সুকুমার!

এমনি করে মনের প্রথম আবেগটা চোখের জলের সঙ্গে নিঃশেষিত হয়ে যাবার পর সুমিতা ছেলের চোখ আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে অস্ফুটস্বরে বললে, কি করে ঠিকানা পেলি বাবা এখানের? তাছাড়া চারিদিকে লোকলস্কর, কড়া পাহারা, ঘরেই বা ঢুকলি কি করে?

সুকুমার বলে, চোরের মত এসেছি মা। সন্ধ্যা থেকে কত চেষ্টা করেছি তোমার কাছে আসবার কিন্তু শান্ত্রি পাহারা ঢুকতে দেয়নি। বলে পরিচিত বা অপরিচিত কোন পুরুষকে অন্দরে ঢুকতে দেওয়ার হুকুম নেই। তাই এই গভীর রাতের অন্ধকারে পাঁচিল ডিঙিয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে, বড় আমগাছটার ডাল বেয়ে তোমার ঘরে এসে ঢুকেছি মা।

চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভয়ার্তকণ্ঠে সুমিতা বলে উঠলো, বড় অন্যায় করেছিস বাবা। শিগ্গির পালা, কেউ যদি দেখতে পায় তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।

মাগো, আমাকে আর চলে যেতে বলো না—আমি একবার যখন তোমাকে পেয়েছি তখন আর কিছুতেই তোমায় হারাতে পারবো না।

স্নেহার্দ্রকণ্ঠে তখন অনেক তাকে বোঝালে সুমিতা। বললে, বাবা সুকু লক্ষ্মীটি আমার কথা শোন, ছেলেমানুষি করিস না—শিগ্গির চলে যা বাবা…

মা তুমি যদি আমার ব্যথা বুঝতে পারতে, তাহলে কিছুতেই অমন নিষ্ঠুর

কথা মুখে আনতে পারতে না। তারপর সুমিতার পা দুটো বুকে চেপে ধরে বললে, তোমার পায়ে পড়ি মা আমায় চলে যেতে বলো না—আমি কিছুতেই তোমায় ছেড়ে যেতে পারবো না। এর জন্যে যদি মরতে হয় তাও শতগুণে ভাল আমার কাছে!

এবার কঠিন হয়ে উঠলো সুমিতা। তাকে তিরস্কার করে বললে, তুমি না লেখাপড়া শিখেছো? তুমি কি বোঝো না আমার অবস্থা? তোমার সঙ্গে আমার এখন আর কোন সম্পর্ক নেই—আমি এখন অন্যের স্ত্রী, অন্যের মা। চলে যাও শিগ্‌গির আমার সামনে থেকে!

এরকম নিষ্ঠুর কথা যে মায়ের মুখ থেকে শুনতে হবে তা আশা করতে পারেনি সুকুমার। তাই শুধু অভিমান নয়, রাগও হলো তার মায়ের ওপর। চোখের জল চাপতে চাপতে বললে, তুমি এত নির্দয় হয়ো না মা, আমাকে এইভাবে তাড়িয়ে দিয়ো না।

সুমিতা জানতো এমনিভাবে একটা কঠিন আঘাত সুকুমারের মনে দিতে না পারলে কাজ হবে না। তাই অন্তরের সমস্ত আবেগ, সমস্ত স্নেহ-মমতা গোপন করে মুখে আরো কঠোরভাব এনেছিল। তবু শেষের দিকের কথাগুলো উচ্চারণ করার সময় থরথর করে তার ঠোঁট কেঁপে উঠেছিল, চোখের কোণে জলও এসে পড়েছিল। সুকুমার বুঝতে পারেনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে নীচে একটা পরিচিত মোটরের শব্দ শোনা গেল। সুমিতা চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি জানলা থেকে মুখটা বাড়িয়ে দেখে, সর্বনাশ, সাদা রঙের সেই নতুন মার্সিডিস্ গাড়ীটা ঢুকছে ফটকের ভেতরে। গাড়ী চালাচ্ছে গিয়াসুদ্দীন!

সুমিতার বুক ভয়ে ঢিপ ঢিপ করে ওঠে। সে এবার জোর করে সুকুমারকে জানলার কাছে ঠেলে নিয়ে গিয়ে বললে, শিগ্‌গির পালাও, ধরা পড়লে, শুধু তোমার নয়—সেই সঙ্গে আমারও প্রাণ যাবে, মনে থাকে যেন?

সুকুমার মায়ের মুখের দিকে করুণ নেত্রে আর একবার শুধু তাকালে, তারপর জানলা গলে আমগাছ বেয়ে একেবারে পাঁচিলের বাইরে রাস্তায় লাফিয়ে পড়লো।

যাক বাঁচা গেছে! বলে যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুমিতা বিছানায় এসে শুয়েছে, অমনি ঘরের দরজায় এসে কড়া নাড়লে গিয়াসুদ্দীন। দরজা খুলে ঘুমের ভান করতে চট করে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল গিয়াসুদ্দীন। তারপর সব কথার আগে সে সুমিতাকে প্রশ্ন করলে, আমিনা, ম্যায় সমঝতা হুঁ কি তুম্ কিসিসে সাথ্ বাত্ কর রহি থি।

সুমিতা মুখের ভাব এমন করলে যেন এমন অসম্ভব কথা কখনো শোনেনি। তাই একটু ভেবে বললে, কৈ না তো। এই গভীর রাত্রে আমার ঘরে আবার কে আসবে যে, তার সঙ্গে কথাবার্তা কইবো?

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বারকয়েক ঘরের ভেতরটা ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে

গিয়াসুদ্দীন বললে, কিন্তু রাস্তা থেকে যেন আমার মনে হচ্ছিল আর একজন কে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

ফস্ করে সুমিতার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তুমি কি আমায় সন্দেহ করো!

তোবা! তোবা। বলে জিব কেটে গিয়াসুদ্দীন বললে, কিছু মনে করো না বিবিজান, যদি একথা জিজ্ঞেস করে তোমার আত্মসম্মানে ঘা দিয়ে থাকি, কসুর মাফ্ কিজীয়ে।

কৃত্রিম হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে আমিনা বললে, এই বদনামটা দেবার জন্যে বুঝি এতদিন পরে দিল্লী থেকে ছুটে এলে এখানে?

কথা বলতে বলতেও সব সময় গিয়াসুদ্দীনের চোখ ঘরের চতুর্দিকে যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছিল। সহসা বড় জানলাটার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে গিয়াসুদ্দীন বললে, ওটা কি পড়ে রয়েছে ওখানে?

ও কিছু নয়। বলে মুখটা অন্য দিকে যেমন ঘুরিয়ে নিতে গেল সুমিতা, অমনি গিয়াসুদ্দীন সেখান থেকে একটা ফাউন্টেন পেন কুড়িয়ে এনে বললে, এ কার কলম? এখানে কে ফেললে?

দেখি ওটা কি? বলে হাত বাড়ালে যেমন আমিনা, সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূকুঞ্চিত করে তার চোখের ওপর ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গিয়াসুদ্দীন বলে উঠলো, আমার সঙ্গে বেইমানী! কে এসেছিল সত্যি কথা বলো বলছি? নিশ্চয় এখান দিয়ে চলে যাবার সময় তার পকেট থেকে এটা পড়ে গিয়েছে, সে জানতে পারেনি।

কলমটার ওপরে ইংরিজিতে শুধু লেখা ছিল এস, সি। আলোর সামনে এগিয়ে গিয়ে কলমটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই নামটা বার বার পড়তে লাগল গিয়াসুদ্দীন। যদি আরো কিছুর সন্ধান মেলে তা থেকে!

ভয়ে আমিনার বুকের ভেতরটা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল। তবু তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তেজস্বিনীর মত সে জবাব দিলে, জানি না। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তো যা মনে করার করতে পারো।

গিয়াসুদ্দীনের মাথায় তখন ঘুরতে থাকে সেই কথাটা—এস, সি, এর পুরো নামটা কি? তবে কি অন্য কোন লোকের সঙ্গে তার এখানে কিছু আছে! আর যেন ভাবতে পারে না। দেহের সমস্ত রক্ত একসঙ্গে ক্ষেপে ওঠে! তার মনে হয় এই জন্যেই কি তবে সে দিল্লী থেকে চলে এসেছে লাহোরে? আমিনার চরিত্রে এবার সত্যি তার সন্দেহ জাগে। তখন আর বেশী কিছু না বলে চুপ করে গেলেও গিয়াসুদ্দীন কিন্তু পরদিন ভোরে উঠে বাড়ীর চাকর দারোয়ানগুলোকে চুপি চুপি ডেকে জিজ্ঞেস করে, কোন মরদ এ বাড়ীতে এসেছিল কিনা বিবিসাহেবার সঙ্গে দেখা করতে? তারা যদিও সকলে বললে, না সেরকম কাউকে তারা কোনদিন আসতে দেখেনি, তবুও সন্দেহ যায় না তার মন থেকে। সে ভাবে, হয়ত ঘুষ দিয়ে এদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে আমিনা। কে জানে? বেইমান জেনানার পক্ষে সবই সম্ভব! কর্মচারী নয় তো, যত সব নিমক্‌হারামের

দল! বলে মনের রাগ মনের মধ্যে চেপে নেয় গিয়াসুদ্দীন।

নবাবের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির কারণ হয়ত আমিনা। সে-ই হয়ত নবাবকে লাহোরে তার কাছে লুকিয়ে রেখেছে, এই মনে করে গিয়াসুদ্দীন এতদিন পরে হঠাৎ সেদিন গভীর রাত্রে সেখানে ছুটে এসেছিল। কিন্তু এসে যা নমুনা পেলে তাতে আমিনার প্রতি তার বিতৃষ্ণা শুধু বেড়ে গেল না, তার চরিত্রে পর্যন্ত রীতিমত সন্দেহ উপস্থিত হলো।

আমিনার চরিত্রের এদিকটা কোনদিন গিয়াসুদ্দীন ভেবে দেখেনি। সেকথা ভাবতে তাই ঘৃণায় তার সমস্ত মন সংকুচিত হয়ে ওঠে! তবে কি আগাগোড়াই আমিনা তার সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে। এবার তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন একসঙ্গে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করে। বাইরে থেকে ছুটে সে সুমিতার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। গিয়াসুদ্দীনের চোখ দুটো জবাফুলের মত রক্তবর্ণ, মাথার চুলগুলো রুক্ষ, শুষ্ক! যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পরাজিত হয়ে অস্ত্রাঘাতের জ্বালা সর্বাঙ্গে নিয়ে পালাতে পালাতে হঠাৎ সামনে কোন শত্রুকে পেলে যেভাবে মানুষ আক্রমণ করে, তেমনিভাবে চরম আঘাত হানলে গিয়াসুদ্দীন সুমিতাকে। ছুটে গিয়ে তার চুলের মুঠিটা চেপে ধরে বললে, ইয়ে দুশমন্ তুম্‌রা কোন্ বাতাও জলদি নেহি তো আভি দেখাতা হুঁ!

কাঁপছিল তার সারা দেহ। চোখ দিয়ে যেন আগ্নেয়গিরির ফুটন্ত ধাতু নির্গত হচ্ছিল। কম্পিত হস্তে সেই ফাউনটেন পেনটা তার মুখের কাছে তুলে ধরে সে চীৎকার করে উঠলো, 'এস্, সি' কোউন্ হ্যায় তুমহারা? বাতাও আব্‌ভি! মেরী ছাতি ফাট্‌রহি হ্যায় ইস্‌কে ইয়হ্ জান্‌নেকে লিয়ে। শয়তান, বেশরম! একেবারে উন্মাদ পাগল হয়ে গেছে যেন গিয়াসুদ্দীন।

সুমিতার মাথার কেবল চুলগুলো নয়, তার সমস্ত শরীরটা সেই ক্ষিপ্ত দানবের বজ্রমুষ্টির মধ্যে যেন দুঃসহ জ্বালায় জ্বলছিল। তবু মুখ দিয়ে অতি কষ্টে সে বললে, নেহি জান্‌তি!

দৈত্যের হাতে ক্রীড়নকের মত সুমিতার দেহটাকে প্রথমে দেওয়ালের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, আবার পৈশাচিক আক্রোশে তেড়ে গিয়ে তাকে ফুটবলের মত মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে দরজার দিকে নিক্ষেপ করতে করতে সে আর্তনাদ করে উঠলো, নিক্‌লো হারামজাদী, আভি ঘরসে।

শেষ আঘাত সহ্য করতে না পেরে তখনই সুমিতা অচৈতন্য হয়ে পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল গিয়াসুদ্দীন। তারপর দারোয়ান ও ঝি-চাকর সকলকে ডেকে বললে, দশ হাজার টাকা বকশিশ দেবো যদি তোমরা এখনি বলো কোন্ আদ্‌মি আসে আমার ঘরে আমার অনুপস্থিতিতে!

প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে টাকার লোভ দেখিয়েও যখন গিয়াসুদ্দীন জানতে পারলে না কিছু তখন সোজা থানায় চলে গেল এবং গোয়েন্দা বিভাগে সেই কলমটা জমা দিয়ে বললে, এর মালিক কে জানালে দশ হাজার টাকা পুরস্কার।

পরদিন আবার এক সময় গিয়াসুদ্দীন চুপি চুপি সুমিতার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। অসুস্থ রুগীর মত নিঃসাড়ে পড়েছিল সুমিতা বিছানার এক কোণে। আগুন নিভে গেলে যেমন শুধু ভস্ম পড়ে থাকে গিয়াসুদ্দীনের মনের অবস্থা ঠিক সেই রকম। তার সব রাগ যেন প্রশমিত হয়েছে। বিছানার একপাশে বসে ধীর ও শান্ত কণ্ঠে সে তার প্রতি আগের দিন যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে তার জন্যে মাপ চাইলে। তারপর জিজ্ঞেস করলে, আমিনা, একটা কথা তুমি সত্যি করে বলবে? আমি তোমার কি করেছি যে, তুমি এইভাবে আমার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছো। তোমার হাতে আমি আমার যথাসর্বস্ব তুলে দিয়েছিলুম, ধনদৌলত, আমার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ, আমার বংশের ইজ্জত, মানসম্ভ্রম—সব। তুমি যা ইচ্ছে করেছো তাই হয়েছে—কোনদিন আমি একটা কথাও বলিনি তোমার মতের বিরুদ্ধে! বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর আবেগে যেন বুজে আসে। গলাটা পরিষ্কার করতে করতে সে আবার বলে, তবে তুমি কেন আমার সঙ্গে এইরকম শয়তানী করলে!

সুমিতা এর কোন জবাব দিতে পারে না। শুধু নিঃশব্দে আরো বার কয়েক তার ওপরের ঠোঁটটা কেঁপে উঠে থেমে যায়। দু'চোখের কোল বেয়ে হু-হু করে জল গড়িয়ে পড়ে।

বলো, আমার কি দোষ! ছেলেটাকে চোখের ওপর দেখলুম তুমি বকিয়ে দিলে, তারপর এখানে যে অন্য কোন মানুষ আসে, হাতে হাতে সব প্রমাণ পেয়েও কি করে চুপ করে থাকি, কি করে মনকে বোঝাই যে তুমি নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক—তুমি সকল সন্দেহের অতীত! বলো—আমার অপরাধ কোন্‌খানে!

চুপ করে থেকো না আমিনা! আমি মনের সঙ্গে আর যুদ্ধ করতে পারছি না। আমার সমস্ত দিল্ তুমি আজ ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছো—যদি দেখাবার হতো তো বুক চিরে দেখাতুম। বলতে বলতে নিমেষে যেন অত্যন্ত কোমল ও ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে গিয়াসুদ্দীন।

আবার কিছুক্ষণ স্থিরভাবে সুমিতার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, তোমার কি দুশমনি করেছি যে, প্রতিহিংসা নেবার জন্যে তুমি আমার এই সর্বনাশ করছো, বলো আমিনা? আমার বুক ফেটে যাচ্ছে তোমার মুখ থেকে শুধু সেই কথাটা শোনবার জন্যে। তোমাকে আমি জোর করে ঘরে বেঁধে রাখিনি, তুমি স্বেচ্ছায় আমার ঘরে এসেছ ভুলে যেয়ো না। তোমাকে আদর যত্নে বিবির মর্যাদা দান করে কি তখন অন্যায় করেছি বলো? চুপ করে থেকো না।

আর্তস্বরে সুমিতা বললে, দোহাই তোমার! আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।

গিয়াসুদ্দীন আর্তনাদ করে ওঠে, না না—আজ আমাকে এর একটা ফয়শালা করতেই হবে। নইলে আমার মনের আগুন কিছুতেই নিভতে চাইছে না।

সময় যেদিন হবে সেদিন সব বলবো। আজ আমায় আর পীড়ন করো না,

আমি আর পারছি না সহ্য করতে। তুমি চলে যাও আমার সামনে থেকে। শুধু এইটুকু মাত্র অনুরোধ তোমার কাছে। আমায় একটু একলা শান্তিতে থাকতে দাও।

স্থির হয়ে গিয়াসুদ্দীন কি যেন ভাবলো। তারপর বললে, চলে যাবো কিন্তু তোমাকে আর এখানে একা রেখে যাবো না—তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো! তার জন্যে যদি আরো কিছুদিন এখানে আমাকে অপেক্ষা করতে হয়, তাতেও রাজী!

বেশ তাই হবে। এখন শুধু দয়া করে আমায় একটু একলা থাকতে দাও। তোমাকে আর আমি সহ্য করতে পারছি না চোখের সামনে!

গিয়াসুদ্দীন কোন কথা না বলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঊনিশ

দিল্লীতে ফিরলো সুকুমার যেন সর্বহারা হয়ে। শুধু সংসারে নয়, এ পৃথিবীতে যেন তার আর কেউ কোথাও নেই। সে একা! একেবারে নিঃস্ব একা! মায়ের মুখ চেয়ে বুঝি সে এতদিন বেঁচে ছিল। যে মায়ের মূর্তিকে সে মনের মণি-কোঠায় বসিয়ে দীর্ঘদিন ধরে শুধু পুজো করেছে, তপস্যা করেছে, তার কাছ থেকে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার যে সে কোনদিন পেতে পারে তা বুঝি কখনো কল্পনাও করতে পারেনি। সুকুমার জানতো, এবং তার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাসও ছিল যে, একদিন সে তার মাকে পাবেই পাবে; আর যেদিন সেই পরম সৌভাগ্য লাভ করবে সেদিন তার জীবনের সকল অভাব, সকল শূন্যতা বুঝি দ্বিগুণ গৌরবে পূর্ণতর হয়ে উঠবে। তাই সেই বহু প্রতীক্ষিত, বুভুক্ষালব্ধ ধনকে হাতে পেয়েও যে হারাতে হবে এমন নিদারুণ আঘাতের সঙ্গে, এ যেন ছিল তার ধারণারও অতীত। যদি শুধু তাকে প্রত্যাখ্যান করতো, তাহলে হয়ত এতটা ব্যথা লাগত না তার মনে। তার সঙ্গে যে কোন সম্বন্ধ নেই—এই নিষ্ঠুর উক্তির সঙ্গে জোর করে বিদেয় করে দেওয়াটা যেন সুকুমার কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিল না। মায়ের মুখের সেই মর্মান্তিক বাণী শুধু তার জীবনকে বিষাক্ত করে দেয়নি, সেইসঙ্গে এই কথাটাও যেন বুঝিয়ে দিয়েছে যে, পৃথিবীতে তার মত অভিশপ্ত জীব আর দ্বিতীয় নেই! এই এক চিন্তা যেন সব সময়ে সুকুমারের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আহার নিদ্রা ভুলে গিয়ে সে তাই কিসের এক দুঃসহ বেদনা যেন দিবারাত্র বহন করে বেড়ায়। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ ভালো লাগে না। লেখাপড়া করতেও মন যায় না। খেলাধুলা ছেড়ে একাকী চুপচাপ শুধু নির্জন জায়গায় বসে বসে কি যেন ভাবে!

গিয়াসুদ্দীন লাহোরে চলে গিয়েছে জানতো আনার।

তাই সেদিন বাপ বাড়ীতে ছিল না বলে আনার গাড়ীটা একাই নিয়ে বেড়াতে

বেরিয়েছিল। রীজ্-এর ওপর দিয়ে মোটর চালিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ সুকুমারকে এক জায়গায় দেখতে পেয়ে আনার মোটরটা থামিয়ে নেমে এলো। বাবলা গাছের ঝোপের আড়ালে একটা বড় পাথরের ওপর বসে সে নিঃশব্দে তাকিয়ে ছিল দূরে আকাশের দিকে। সুকুমারের সামনে এলে আনার চমকে উঠলো, এ কি তার চেহারার পরিবর্তন! সে সোহাগভরা কণ্ঠে বললে, এখানে একা একা বসে কি করছেন!

সুকুমার তার কথার জবাব না দিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, আনারের চেহারাও যেন কেমন শুকিয়ে গিয়েছে!

আনার ঠোঁটের কোণে হাসি চাপতে চাপতে বললে, কথা বলবেন না বুঝি আমার সঙ্গে? ও বুঝেছি, রাগ হয়েছে সেদিন সিনেমায় নেমন্তন্ন করে আসিনি বলে!

সুকুমার হঠাৎ একটা যেন কিসের বেদনা বুকের মধ্যে গোপন করতে করতে বলে উঠলো, যারা বড়লোক তারা খেয়াল-খুশি মত যা ইচ্ছে তাই করতে পারে! তা নিয়ে রাগ করতে যাবো আমি কোন্ অধিকারে!

আনার তার কাজলটানা চোখ বেঁকিয়ে আরো কাছে এসে বললে, এ তো আপনার মুখের কথা! আপনার মনের কথাও কি তাই?

কি মনে হয়। বলে সুকুমার বাবলা গাছ থেকে ছোট্ট একটা ডাল ভেঙ্গে নিলে হাতে।

আনার হেসে বললে, সত্যি কথা যদি বলতে হয় তাহলে বলবো যে, এটা স্রেফ আপনার অভিমান।

নিমেষে সুকুমারের মুখের সব রেখাগুলো যেন একসঙ্গে কঠিন হয়ে উঠলো। বললে, অভিমান! অভিমান করা চলে যেখানে মানুষের ওপর মানুষের সত্যিকারের জোর আছে, অধিকার আছে—ভুলে যেয়ো না আনার।

আনার বললে, আপনার মামলাটা সব যেন এক তরফা হয়ে যাচ্ছে। আমারও যে এ সম্বন্ধে কিছু বলার থাকতে পারে আগে তা শুনুন, তারপর বিচার করবেন।

না-না, কারো কিছু শোনবার আমার প্রয়োজন নেই আনার! আমায় মাফ করো। বলতে বলতে কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ যেন আরো ভারী হয়ে আসে সুকুমারের।

দরদীকণ্ঠে এবার আনার বললে, আমায় ভুল বুঝবেন না সুকুমারবাবু। আমি একটা কুমারী মেয়ে আপনার সঙ্গে মেলামেশা করি এটা যদি আমার বাপ মা পছন্দ না করেন, তা কি আমার অপরাধ? আপনি শিক্ষিত হয়ে এটা কি বুঝতে পারেন না?

পারি! আনার সব আমি বুঝতে পারি! কিন্তু তবু আমার মনকে যে কিছুতেই বোঝাতে পারি না! বলে স্থির দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সুকুমার। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, আচ্ছা আনার,

বলতে পারো এ পৃথিবীতে যার আপন বলতে কেউ নেই সে কি নিয়ে বেঁচে থাকবে !

শিউরে উঠলো আনার। মুহূর্তে তার চোখের দৃষ্টি কোমল থেকে কোমলতর হয়ে এলো। একটু চুপ করে থেকে সে যেন কৈফিয়ৎ দেবার সুরে বললে, অন্য কারুর সঙ্গে আমি মেলামেশা করি, আমার বাবা এটা একেবারেই পছন্দ করেন না !

হঠাৎ সুকুমারের মুখচোখ যেন উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। কণ্ঠের সমস্ত আবেগ দমন করতে করতে সে বলে, আনার, সত্যি বলছি, জগতে আমার আপন বলতে আর কেউ নেই ! তুমিও যদি আমায় পরিত্যাগ করো—আর বলতে পারে না, সুকুমারের গলার স্বর যেন বুজে আসে।

আনার তার মুখের ওপর থেকে চোখ নামিয়ে নিতে নিতে জবার দেয়, কিন্তু আমি যে মুসলমান, তাছাড়া আমার বাবা বড় হিন্দুদ্বেষী।

এবার তার মনের সকল রুদ্ধ উচ্ছ্বাস যেন কণ্ঠের সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত বাধা ভেঙ্গে একসঙ্গে বেরিয়ে এলো। সুকুমার বললে, আনার, আমি যদি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করি, তাহলেও কি তোমার বাবার অমত হবে ?

আনারের মুখচোখ নিমেষে গোলাপী হয়ে উঠলো। সে এর উত্তরে কি বলবে ভেবে না পেয়ে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে।

সুকুমার বলে, আমি আর কিছু চাই না, শুধু তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলার অধিকার থেকে আমায় বঞ্চিত করো না তুমি আনার ! অন্ততঃ আমি যেন ভাবতে পারি এমন একজনও আমার এ পৃথিবীতে আছে, যার কথা চিন্তা করার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে ! শুধু এইটুকু—এর চেয়ে বেশী আর কিছু চাই না আমি তোমার কাছে। বলো, এটুকুও কি তুমি আমায় দিতে পারবে না ?

আনার যেন আর তাকাতে পারছিল না সুকুমারের মুখের দিকে। তার দু' চোখে কেবলি জল ভরে আসছিল। তাই তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ঠোঁট দুটি চেপে উত্তর দিলে, বাবাকে জিজ্ঞেস করে আপনাকে এর উত্তর দেবো। বলতে বলতে আর পিছন দিকে না তাকিয়ে সোজা রাস্তায় নেমে এলো এবং মোটরে স্টার্ট দিলে।

কুড়ি

এক সপ্তাহ পরে গিয়াসুদ্দীন ফিরে এলো লাহোর থেকে দিল্লীতে। যে প্রাসাদ সর্বদা হাসিতে খুশিতে সঙ্গীতে ঝলমল করতো, যাকে সে মর্তের স্বর্গ বলে মনে মনে ভাবতো, আজ তা যেন শ্মশানে পরিণত হয়েছে। তার কক্ষে কক্ষে শুধু অন্ধকার, শুধু ব্যর্থতার হাহাকার ! একমাত্র ছেলে বংশের গৌরব, জীবনের আশা-ভরসা, সে আজ চরিত্রহীন ও পলাতক। বেঁচে আছে কি না খোদা জানেন ! যাকে সবচেয়ে বেশী ভালবেসে জীবনসঙ্গিনী করেছিল, সে আজ তার সবচেয়ে বড়

শত্রু। একমাত্র মেয়ে যার মুখের দিকে তাকালে মনে হতো যেন ঈশ্বরের আশীর্বাদ, স্বর্গ থেকে ছিটকে পড়েছে এক ঝলক আলো তার ঘরে, আজ তারও মুখ বিষণ্ণ, তারও মনে জমে উঠেছে অসন্তোষের বিষ—তারই বিরুদ্ধে! সবাই আজ বিমুখ তার ওপর। নিজেকে অভিশপ্ত মনে হয়।

এই সব ভাবতে ভাবতে গিয়াসুদ্দীনের চোখে ঘুম আসে না। সারা রাত বাড়ীটায় যেন প্রেতের মত সে ঘুরে বেড়ায়! নিঃশব্দে পা টিপে টিপে চলে। কখনো বারান্দায়, কখনো সিঁড়িতে, কখনো ছাদে। কখনো বা চুপি চুপি এসে দাঁড়ায় সুমিতার ঘরের কাছে।

এক একদিন গভীর রাতে বাইরের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয়, এমনি করে কি তাকে বেঁচে থাকতে হবে বাকী জীবনটা! অসম্ভব। তা সে পারবে না কিছুতেই। আবার কখনো চিন্তা করে এত টাকা, এত বিষয় সম্পত্তি থেকে তবে লাভ কি, যদি সুখ না রইলো মনে, শান্তি না পেলে জীবনে?

এমনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন স্তূপীকৃত হয়ে ওঠে প্রতি রাত্রে তার মস্তিষ্কে! গিয়াসুদ্দীন ভাবে, সে কি এবার পাগল হয়ে যাবে নাকি! কিন্তু এ জীবনে তার আর শান্তি কোথায় আনন্দ কোথায়? হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে আনারের মুখখানা! কন্যার সেই স্নেহার্দ্র মুখটি সহসা যেন তাকে চঞ্চল করে তোলে। সে ছুটে যায় আনার ঘরের দিকে। মরুযাত্রী যেমন করে তৃষ্ণার জ্বালা বুকে নিয়ে দুরন্ত বেগে যায় ওয়েসিস্-এর পানে।

…রাত বোধ হয় তখন দেড়টা কি দুটো। আনারের ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো গিয়াসুদ্দীন। একি, আলো জ্বলছে কেন আনারের ঘরে! জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখে, আনার কি যেন লিখছে একমনে। দরজা তখনো খোলাই ছিল। কত রাত হয়েছে বুঝি তা ভাববার অবকাশ মেলেনি আনারের। তাই ভেজানো কপাটটা খুলে গিয়াসুদ্দীন যখন একেবারে কন্যার চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়ালো তখন যেন চমক ভাঙ্গে তার। মুখটা ফিরিয়ে সামনে বাবাকে দেখেই আনার এমনভাবে চমকে উঠলো যেন চুরি করতে গিয়ে হঠাৎ পুলিসের কাছে ধরা পড়ে গেছে হাতে হাতে!

গিয়াসুদ্দীন সস্নেহে তাকে প্রশ্ন করলে, এই রাত পর্যন্ত কি এত লেখাপড়া করছিস মা?

আনার মুখে কোন জবাব না দিয়ে শুধু তার অর্ধ-সমাপ্ত সেই চিঠিটা বাপের হাতে তুলে দিলে।

চিঠিখানা উর্দুতে লেখা। সুকুমারের সেই কথাটা রোজই সে মনে করতো বাবাকে জিজ্ঞেস করবে কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটে তার কাছে প্রকাশ করতে সাহস পেতো না। লজ্জা, সংকোচ, ভয় তাকে বাধা দেয়। বাপের ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছে ক'দিন। তাই চিঠি লিখে বাপের মতামত জানবে বলে সেদিন রাত্রে সে লিখতে বসেছিল। চিঠিটা যতবার লেখে কিছুতেই আর মনঃপূত হয়

না আনারের। তাই বারবার ছিঁড়ে ফেলে শেষবারের মত যখন একাগ্রমনে শেষ করতে উদ্যত তখন গিয়াসুদ্দীন নিজেই এসে হাজির।

মেয়ের সব কিছু ক্ষমা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েই যেন সেদিন গিয়াসুদ্দীন এসেছিল। তাই চিঠিটা পড়ে বেশ কিছুক্ষণ মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একটা কি যেন ব্যথা বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে বললে, বেশ তো! আমাদের জাতের ও ধর্মের কোন ছেলের সঙ্গে যদি তুমি মিশতে চাও, কি আলাপ-আলোচনা করতে চাও, আমার কোন আপত্তি নেই। এর জন্যে মুখে না বলে, চিঠি লেখার কি প্রয়োজন ছিল মা?

আনার এবার মুখটা বাপের দিকে তুলে একটু ইতস্তত করে বললে, সে এখনো আমাদের ধর্ম গ্রহণ করেনি বাবা—তবে তোমার মতটা জানতে পারলে করবে বলেছে।

হঠাৎ গিয়াসুদ্দীনের রগের দু'পাশে সবুজ রঙের মোটা মোটা দুটো শিরা যেন স্ফীত হয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জ্বালা ধরলো। এত প্রেম যে, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে রাজী! আল্লা, তাহলে সেই চীজটিকে একবার চোখে দেখতে হচ্ছে! তাই মেয়ের কাছে মনের ইচ্ছা গোপন করে উদারতা দেখিয়ে গিয়াসুদ্দীন সস্নেহে বললে, বেশ তো, এ খুব আনন্দের কথা। তাকে তাহলে একদিন চায়ের নেমন্তন্ন করো, আমি তার সঙ্গে একটু আলাপ করে দেখি। কেমন?

বহুদিন পরে বাপের মুখ থেকে এমন নরম ও স্নেহার্দ্র বাক্য শুনে আনার একটু বিস্মিত হলো! তবু সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা বাপ্‌জান, তবে এই শনিবার দিন বিকেলে তাকে নেমন্তন্ন করি, কেমন?

হ্যাঁ মা। বলে মেয়ের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারময় সেই কথাটা বুঝি চিন্তা করতে করতে বেরিয়ে যায়।

গিয়াসুদ্দীন এতদিনে নিঃসন্দেহ হলো যে, মেয়ে সেই ছেলেটিরই প্রেমে পড়েছে। যদিও চিঠিতে কোথাও সে কথার ইঙ্গিত নেই। আনার প্রকাশও করেনি। বরং এত সতর্ক হয়ে লিখেছিল যে, সেই অতি-সাবধানতা লক্ষ্য করেই তার মনে ওই কথাটাই বার বার উঁকি মারতে থাকে। যাহোক, মেয়ের মনে যদি সেই ছেলেটি রেখাপাত করে থাকে তো তাকে একটু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা তো বাপের তরফ থেকে নিশ্চয়ই কর্তব্য! এইভাবে নিজেই সান্ত্বনা দেয় মনকে!

কিন্তু বিছানায় শুয়ে বার বার একটা কথাই গিয়াসুদ্দীনের মনে পাক খেতে থাকে, কি এমন অসাধারণত্ব আছে সেই ছেলেটির মধ্যে যে, নিজের জাত ধর্ম ভুলেও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তার মেয়ে? আনারের মত মেয়ের মন জয় করতে পারে যে ছেলে, তাকে দেখার কৌতূহল গিয়াসুদ্দীনের মনে ক্রমশঃই বাড়তে থাকে।

একুশ

দিল্লীতে আসার পর থেকে সুমিতাও যেন নিজের ঘরে বন্দিনীর মত জীবন-যাপন করে। ভাল করে কারুর সঙ্গে কথা বলে না। খাওয়া-দাওয়াও একরকম ত্যাগ করেছে। ফাঁসীর আসামীর মত শুধু ঘরের এক কোণে বসে দিনরাত কি সব যেন চিন্তা করে! গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে কথা কইতে তার ঘৃণা বোধ হয়।

ওদিকে ঘৃণায় গিয়াসুদ্দীনও আর ঢোকে না তার ঘরে। আনারও মায়ের সঙ্গে যাতে বেশী মেলামেশা না করে, তার জন্যে দাসীদের ওপর কড়া হুকুম দিয়েছে। ছেলেটার মাথা খেয়েছে, আবার মেয়েটাকে না জাহান্নমে দেয়!

সুমিতা বলেছিল একদিন সব কথা তাকে বলবে! কি সে-ই সব কথা! জানবার কৌতূহল দিন-দিন বেড়ে চলে গিয়াসুদ্দীনের মনে। শুধু আমিনার মুখ থেকে তার প্রশ্নের জবাব শোনার জন্যে বুকে এক অসহ্য জ্বালা চেপে সেই দিনটার প্রতীক্ষা করতে থাকে সে। মধ্যে মধ্যে শুধু আমিনাকে তার দাসী মারফত সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয় গিয়াসুদ্দীন! বলে, জিজ্ঞেস করে এসো কবে আমার প্রশ্নের জবাব পাবো, আর দেরী সহ্য করতে পারছি না!

সুমিতা ঠিক দিনটা বলে না, তবে শিগ্‌গিরই জানাবে—ঝিকে দিয়ে বলে পাঠায়।

এই রকম দুর্যোগের মধ্যে যখন সুমিতার মন বিপর্যস্ত তখন অঞ্জলির কাছ থেকে হঠাৎ সে একটা চিঠি পেলে। এ চিঠিতে সুকুমারের কথা কম কিন্তু যার কথা বেশি, সে হলো ব্রজেশবাবু! তিনি নাকি ক্যান্‌সার রোগে মরণাপন্ন। বাঁচেন কিনা সন্দেহ। বিকারের ঘোরে কেবলই সুমিতার নাম করছেন আর বলছেন, আমায় ক্ষমা করো। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

চিঠিটা পড়েই প্রথমে সুমিতার চোখ দুটো যেন স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো কিন্তু পরক্ষণেই ঘৃণার সঙ্গে সেটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলে সুমিতা। ব্রজেশবাবুর নাম শুনলে তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন একসঙ্গে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে ওঠে! কিসের সম্পর্ক তার সঙ্গে! তার জীবনে সবচেয়ে বড় শত্রু তিনি! ক্ষমার অতীত তাঁর অপরাধ! বলে মন থেকে মুছে ফেলে দিলে সব স্মৃতি!

কিন্তু এরপর দুটো দিনও গেল না, কি হলো কে জানে। পাথরের বুকে কোথা দিয়ে যেন ফাটল ধরল। যাঁর বিরুদ্ধে এত ঘৃণা, এত বিদ্বেষ সুমিতার মনে, তাঁরই প্রতি আবার ভেতরে ভেতরে যেন এক অদ্ভুত সহানুভূতি জাগে। সামান্য একটা চিঠি কিন্তু কি অসামান্য তার ক্ষমতা! তার প্রতিটি কথা যেন উঠতে বসতে সব সময় তার বক্ষের অস্থিতে পঞ্জরে আঘাত হানতে হানতে তাকে দুর্বল করে তোলে। সুমিতার মনে হয়, সত্যি, কি অপরাধ ব্রজেশবাবুর।

তিনি ব্রাহ্মণ, দু'বেলা, সন্ধ্যা আহ্নিক না করে মুখে জল দেন না। সুমিতাকে অশুচি জেনেও কেমন করে আবার তাকে গ্রহণ করবেন, আশ্রয় দেবেন ঘরে!

এমনি করে যত ভাবে তত ব্রজেশবাবুর ব্যাপারটার মধ্যে যেন কোথাও আর তাঁর কোন অপরাধ দেখতে পায় না সে। কেবল অসুস্থ শয্যায় পড়ে ব্রজেশবাবু তার কাছে ক্ষমা চাইছেন আর তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে—সেই দৃশ্যটা বার বার তার চোখের ওপর যেন ভেসে উঠতে থাকে। সুমিতা যত চোখ বুজিয়ে ভুলতে চেষ্টা করে, অন্য কথা চিন্তা করতে যায় কিছুতেই যেন পারে না। ঘুরে ফিরে কেবলি মনে হয়, আহা, বেচারীর বড় কষ্ট, পয়সার অভাবে হয়ত ভাল করে চিকিৎসাই হচ্ছে না! ভাবতে ভাবতে কখন যে সুমিতার দু'চোখ জলে ভাসতে থাকে তা নিজেই বুঝতে পারে না। এক একবার এমনও মনে হয় একবার ছুটে গিয়ে তাঁকে চোখে দেখে আসে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে আবার কঠিন হয়ে ওঠে সুমিতা! ভাবে আজ গিয়াসুদ্দীনের কাছে শুধু সে পর নয়, তার একটা পয়সাতেও যেন তার কোন অধিকার নেই। আবার সে কাঁদতে থাকে।

শনিবার দিন যে আনার সুকুমারকে বাড়ীতে চায়ের নেমন্তন্ন করেছিল সে খবর জানতো না সুমিতা। আনারও মায়ের কানে তা তোলেনি। তার বাপের সম্মতি ছাড়া কোন কিছু আর মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করার হুকুম তার ছিল না। ইদানীং বাপের সঙ্গে যে মায়ের একটা নিদারুণ মনোমালিন্য চলেছে এবং নবাবকে নিয়েই যে এ বিরোধের সূত্রপাত তা ঝি-চাকরদের মুখ থেকে সবই জেনেছিল আনার। মায়ের সঙ্গে বাপের বিবাদ মিটে গেলেই সব আবার ঠিক হয়ে যাবে সে জানতো!

যাহোক শনিবার যখন সুকুমার নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এলো তখন চায়ের টেবিলে গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে প্রথমেই আনার তার পরিচয় করিয়ে দিলে। তারপর খাবারের প্লেট সাজিয়ে দিয়ে যখন চায়ের কেৎলী থেকে পেয়ালায় আনার চা ঢেলে দিতে লাগল, তখন গিয়াসুদ্দীন কাটলেটের ডিশটা সুকুমারের দিকে আগে ঠেলে দিয়ে বললে, তুমি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে চাও শুনে বড় খুশি হয়েছি কিন্তু তার আগে আমি একটা কথা তোমায় ভাল করে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। তুমি ভাল ছেলে, লেখাপড়া শিখেছো, কাজেই যে ধর্ম তুমি আজ গ্রহণ করতে চলেছো আশা করি তার সম্পূর্ণ অর্থ তুমি মনে প্রাণে উপলব্ধি করেছো। বলে একটু থেমে হঠাৎ আনারের মুখের দিকে বাঁকা চোখে একবার চট করে তাকিয়ে নিয়ে বললে, তোমার মাকে একবার ডেকে আনো তো, তার সঙ্গেও এর আলাপটা হয়ে যাক। বলোগে বিশেষ প্রয়োজনে আমি ডাকছি।

আনার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। গিয়াসুদ্দীন চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আবার শুরু করলে, এরকম ঘটনা পৃথিবীতে অনেক ঘটতে দেখা যায় যে, একটা মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে শুধু তাকে পাবার লোভে মানুষ সেই ধর্ম গ্রহণ করে,

তারপর দু'দিন পরেই যখন সে মোহ ছুটে যায়—তখন তাকে ছেঁড়া জুতোর মত পরিত্যাগ করে চলে যায়! মেয়ে আমার বড় আদরের, তার জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করার আগে আমি তাই তোমাকে সাবধান করে দিতে চাই। ভাল করে ভেবে দেখো, নিজের মনকে আগে পরীক্ষা করে দেখো। তারপর—

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুকুমার বলে উঠলো, আমায় তেমন বেইমান মনে করবেন না। তাছাড়া আমার জীবন বড় বিচিত্র। শুনলে বুঝতে পারবেন সব।

গিয়াসুদ্দীন বললে, কথাটা আমি খোলাখুলি বললুম বলে মনে কিছু করো না যেন।

সুকুমার উত্তর দিলে, না আমি কিছুই মনে করিনি, বরং খুশি হয়েছি। কেননা আসলে আমি তো মুসলমানেরই ছেলে।

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো গিয়াসুদ্দীন।

সুকুমার চায়ের পেয়ালাটা হাত থেকে নামিয়ে বললে, হ্যাঁ বিশ্বাস করুন, ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আজ আমার মা মুসলমান অথচ মজা এই যে, তাঁরই অর্থে, তাঁরই সাহায্যে আমি যে মানুষ হয়েছি, লেখাপড়া শিখেছি এই দিল্লী শহরে, তা আমি একেবারেই জানতুম না।

সে আবার কি! সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করলে গিয়াসুদ্দীন।

ঈষৎ হেসে সুকুমার জবাব দিলে, সে ভারি মজা, ঠিক যেন উপন্যাসের মত। বলছি। বলে সবে আরম্ভ করতে যাচ্ছে—

এমন সময় আনারের পিছনে পিছনে সুমিতা এসে ঢুকলো ঘরে!

দরজার কাছে এসে যেমন সুমিতার পা থমকে দাঁড়িয়ে গেল. অমনি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলো সুকুমার! এ কি, মা তুমি এখানে! বলে কণ্ঠের আবেগ সামলাতে না পেরে একেবারে চেঁচিয়ে উঠলো সুকুমার। তারপর ছুটে গিয়ে তার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, মা, মাগো তুমি এখানে থাকো?

এর কোন জবাব সুকুমারকে দেবার আগেই সিংহ-গর্জন করে উঠলো গিয়াসুদ্দীন। কি বললে, ও, তাহলে ইনি তোমার মা! বুঝেছি এবার তোমার সব কৌশল। তার মানে আমার ছেলেকে উচ্ছন্ন দিয়ে, আমার পয়সায় এতদিন নিজের ছেলেকে প্রতিপালন করেছো এখানে। আমার বুকে বসে আমারই দাড়ি উপড়েছো! বলে সে অসুরের মত সুমিতার ওপর লাফিয়ে পড়ে তার টুঁটি টিপে ধরলে। নিমেষে শোভনতা ভদ্রতা সব ভুলে গিয়ে গিয়াসুদ্দীন একটা অসভ্য জানোয়ারে পরিণত হলো।

আনার বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাপের এই কুৎসিত আচরণের জন্যে সুকুমারের দিকে যেন লজ্জায় মুখ তুলতে পারছিল না। তবু এইমাত্র বাপের মুখ থেকে যা শুনলে তা কি সত্যি! তাহলে সুকুমার তার ভাই, একই মায়ের পেটে তারা জন্মেছে!

সুকুমার ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে না পারলেও মায়ের এ অপমান চোখের সামনে সহ্য করতে পারে না। তাই গিয়াসুদ্দীনের হাতটা টেনে মায়ের কণ্ঠ থেকে ছাড়িয়ে দিতে গেল। কুৎসিত গালাগাল দিয়ে সুকুমারকে ঠেলে ফেলে দিলে গিয়াসুদ্দীন। নিকাল্ যাও আভি হিঁয়াসে—বেইমান, হারামজাদা কাঁহাকা।

সুকুমারকে এর পরও অগ্নিমূর্তিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গিয়াসুদ্দীন আবার উন্মত্তক্রোধে চীৎকার করে উঠলো, আভি নিকালো, নেহি তো শির টুটা দেঙ্গে!

আনার জোর করে সুকুমারকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে একেবারে বাড়ীর ফটক পার করে দিলে। বললে, শিগ্‌গির পালাও, আর এক মিনিট এখানে দাঁড়িয়ো না। রাগলে বাপজানের জ্ঞান থাকে না। যেন পশু হয়ে যায়।

সুকুমারের মনে তখন সব যেন কেমন ঘুলিয়ে উঠেছে! তার মা কি তবে আনারের মা! নবাব তাহলে তার ভাই, আর আনার তার বোন। এতদিন এত কাছে থেকেও কেন একথা জানতে পারেনি! তাহলে হয়ত জীবনের গতি আজ অন্য রকম হতো! তবু গিয়াসুদ্দীনকে সে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না! মায়ের যে অপমান চোখের সামনে এইমাত্র দেখেছে, তার প্রতিশোধ কি করে নেবে তাই ভাবতে ভাবতে বাসার পথে হাঁটতে থাকে।

গিয়াসুদ্দীনের মাথায় এবার সত্যি যেন খুন চাপে। সুমিতাকে বলে, ব্যাপার কি আমায় সব খুলে বলতে হবে এখনি, নইলে তোমায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো।

দুর্বল শরীরে বুঝি এত উত্তেজনা সহ্য করতে পারে না সুমিতা। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরের মেঝেয় আছড়ে পড়ে মূর্ছা গেল।

কিন্তু তাতেও রাগ কমে না গিয়াসুদ্দীনের এতটুকু। সে অপেক্ষা করে সেখানে। গোলাপ জল চোখে মুখে ছিটিয়ে বাতাস করে করে যখন আবার দাসীরা তার চৈতন্য ফিরিয়ে আনলে তখন তাদের সকলকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে গিয়াসুদ্দীন গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, জবাব দাও আমার কথার আগে তা না হলে আমি এখান থেকে নড়বো না।

শুধু আজকের দিনটা আমায় মাপ করো, কাল সব কথা তোমায় বলবো, কিছু গোপন রাখবো না।

আমি যে আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। তুমি বুঝবে না, আমার মনের অবস্থা! বলে তার সামনে যেন অন্তর্দাহে ছটপট করতে থাকে গিয়াসুদ্দীন। ঘরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত আহত সিংহের মত নিঃশব্দে পায়চারী করতে করতে শেষে বজ্রগম্ভীর স্বরে বললে, মনে থাকে যেন কাল সকালে আমি তোমার কাছ থেকে সব উত্তর চাই। তখন কোন জবাবদিহি শুনবো না।

কৌতূহলে রাত আর কোন রকমে যেন কাটতে চায় না গিয়াসুদ্দীনের। কখন ভোর হবে! তারই প্রতীক্ষায়, দুপুর থেকে যেন প্রহর গুনে চলে! আমিনার

মুখ থেকে কি জবাব শুনবে, সেই তার একমাত্র চিন্তা! কি বলবে সে? তার সম্ভব অসম্ভব যত রকমের উত্তর হতে পারে একসঙ্গে সব যেন মাথার মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠে তাকে স্থির থাকতে দেয় না।

বাইশ

সেদিন ঝি ঘরে সন্ধ্যার বাতি জ্বালাতে এসে অঞ্জলির একটা চিঠি গোপনে দিয়ে গেল সুমিতাকে। চিঠির প্রথম কয়েকটা লাইন পড়েই তার মাথা গেল ঘুরে। চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ভূমিকম্পের মত কাঁপতে লাগল। শুধু এই কটা কথাই সে পড়লে—'কাল রাত্তির দেড়টার সময় ব্রজেশবাবু মারা গিয়েছেন।' এ ছাড়া চোখের জলে আর কিছু সে দেখতে পেলে না, পড়তে পারলে না। বার বার কেবল ব্রজেশের সেই ময়লা জামা-পরা শীর্ণ দেহটা ও দারিদ্র্যের অভিশাপদুষ্ট সেই মুখখানা তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। যত তাঁকে ভুলতে চেষ্টা করে, তত যেন তার চোখ ফেটে কানা বেরিয়ে আসে। সে কান্না যেন থামতে চায় না। রাত্রি যত গভীর হয়, শোকের প্রাবল্যও তত বাড়ে। নিঃশব্দে সে কাঁদে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদে। কেন কাঁদে বুঝতে পারে না। এক এক সময় তার হুঁশ ফিরে আসে। ভাবে, কেন মিছিমিছি সে কেঁদে মরছে। ব্রজেশবাবু তার কে? কি সম্বন্ধ এখন তাঁর সঙ্গে? এক কালে স্বামী ছিল, তাতে এখন কি! সে তার জন্যে কাঁদবে কেন! কিন্তু তবু মন মানে না। একটু পরে আবার চোখ ভরে আসে জলে। এবার সে কাঁদে—স্বামীহারা সদ্য বিধবার মর্মভেদী কান্না! ব্রজেশের সঙ্গে যে তার সমস্ত সম্পর্ক অনেকদিন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে এবং তার সঙ্গে এখন সুমিতার ধর্মত ও আইনত যে কোন সম্পর্ক নেই সেটা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না। বিবাহের দিন থেকে শুরু করে শেষ সাক্ষাতের ক্ষণটি পর্যন্ত প্রতিটি কথা তখন তার মনের পর্দায় ঘা দিতে থাকে। সহসা মনে পড়ে গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে সেই প্রথম শুভদৃষ্টির কথা। মনে পড়ে ব্রজেশের পিছু পিছু লাজাঞ্জলি বর্ষণ করতে করতে উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রজ্বলিত হোমাগ্নিকে প্রদক্ষিণ করা। সঙ্গে সঙ্গে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান—সব যেন কোন্ মসীলিপ্ত অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুধু তার মধ্যে থেকে ভেসে আসে যেন বহুদূর থেকে এক অমৃতময় বাণী—সম্প্রদানের সেই মন্ত্রটা—

ওঁ মম ব্রতে তে মম হৃদয়ং দধামি
মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু……

সুমিতা আর পারলে না নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। বিছানা থেকে নেমে এসে একে একে হাতের, গলার, কানের সমস্ত অলঙ্কার খুলে উন্মাদের মত ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে ঘরময়। তারপর আছড়ে পড়ে মাটিতে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল।

এদিকে সকাল হতে তর সয় না। গিয়াসুদ্দীন নিজেই গিয়ে দোর ঠেলে আমিনার ঘরের। বলে, খুলো জল্‌দি দরওয়াজা—ফজির হোগেয়ি।

তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়াল সুমিতা। তারপর রেশমী কাপড় ও জামাটা গা থেকে টেনে খুলে ফেলে দিয়ে সাদা বিছানার চাদরে দেহটা ঢেকে আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে দিলে।

ভূত দেখলে যেমন চমকে ওঠে লোক তেমনি ভাবে গিয়াসুদ্দীন সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে হতবাক হয়ে রইল।

সুমিতাও তার সেই নিরাভরণা দেহটাকে নিয়ে পাথরের মূর্তির মত নির্বাক নিস্তব্ধ হয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে থাকে।

তাদের দু'জনের মাঝে যেন দুস্তর ব্যবধান।

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে এক সময় গিয়াসুদ্দীন বলে উঠলো, আমিনা, ছি ছি, কি হয়েছে তোমার! এমন বেশভূষা করেছো কেন? আমায় এত অপমান করেও তোমার আশ মিটছে না! এ দেখলে বাড়ীর ঝি-চাকররা কি মনে করবে। এতে আমার কত বড় অসম্মান, তা কি তুমি জানো না?

তোমার এতে অসম্মান কি আছে জানি না। তবে আমার কাছে এর চেয়ে বড় সম্মান বুঝি আর কিছু নেই! তাই আজ যা দেখছো এই আমার সত্যিকারের পরিচয়। এরপর আর কিছু তুমি আমার কাছে জানতে চেয়ো না। আমায় তুমি ক্ষমা করো!

আজ এই হিন্দু বিধবার বেশ তোমার কাছে সত্য! তার মানে অবস্থার চাপে পড়ে রক্ষিতার মত শুধু তুমি এতদিন আমার সঙ্গে বাস করেছো অথচ অন্যকে স্বামী বলে মনে মনে পুজো করেছো, এই তো বলতে চাও?

এবার চোখের জল গোপন করতে গিয়েও পারলে না সুমিতা। শুধু বললে, হয়ত তাই। তুমি ঠিকই বলছো, মানুষ অবস্থার দাস। কিন্তু তার মন তো মুক্ত তাই কেউ তাকে বাঁধতে পারে না। যা সত্য, শাশ্বত—সেই পথেই তার গতি! তা না হলে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর থেকে আমার এমন দশা হবে কেন?

নিমেষে গিয়াসুদ্দীনের চোখ দুটো হিংস্র হয়ে ওঠে। সে দাঁতের ওপর দাঁত ঘষতে ঘষতে বললে, আমি তোমায় ভুল বুঝেছিলুম। ভেবেছিলুম আগের জীবন তোমার কাছে মরে ভূত হয়ে গেছে তাই আমার যথাসর্বস্ব তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলুম! জানতুম না যে, সত্যিকারের স্বামী ও সত্যিকারের ছেলে নিয়ে তুমি লুকিয়ে আমার সঙ্গে ও আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এতকাল অভিনয় করেছো, শুধু প্রতারণা করেছো।

না—না আমি কারো সঙ্গে কোন প্রতারণা করিনি। আমায় বিশ্বাস করো।

জেনো নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে আমিনা। লজ্জা করে না তোমার ওকথা মুখে আনতে? এখনো মিথ্যা বলে আমার চোখে ধুলো দিতে চাও?

সামনে দেখছি তুমি হিন্দু বিধবার বেশ ধরেছো—কাল দেখলুম তোমার ছেলে তোমায় মা বলে ডাকলে। এবং সেই ছেলেই বলেছে আমায় যে, তুমিই তাকে টাকা-পয়সা দিয়ে গোপনে লেখাপড়া শিখিয়েছ এই দিল্লী শহরে। পাছে আমার কাছে ধরা পড়ে যাও তাই তাকেও সেকথা জানতে দাওনি? তবু বিশ্বাস করতে হবে আমায় তোমার সব কথা? আমাকে পাগল, না উন্মাদ—কি মনে কর তুমি? জবাব দাও কেন এ ভণ্ডামি, কেন এ শঠতা করলে আমার সঙ্গে? বলো আমার প্রেমে কোথায় কমতি ছিল। কি পাওনি তুমি আমার কাছ থেকে। তোমাকে যে ভোগ ঐশ্বর্য ও বিলাসের মাঝে আমি ডুবিয়ে রেখেছিলুম, তাই বুঝি তার প্রতিশোধ এই ভাবে নিলে। মানুষের ইহজন্মের যা কিছু কামনা-বাসনা তার কোনটাই তো তোমার অপূর্ণ রাখিনি! অট্টালিকা, ধনদৌলত, দাসদাসী, ছেলে-মেয়ে, লেখাপড়া, গান-বাজনা তুমি যখন যা চেয়েছো তোমায় সব দিয়েছি, কিছুরই তো অভাব রাখিনি! তবে কেন আমার সঙ্গে প্রতারণা করে আমার এভাবে সর্বনাশ করলে? এতটুকু মায়া, এতটুকু দয়াও কি তোমার প্রাণে নেই। এত নিষ্ঠুর, এত নির্দয় তুমি। উঃ! এক কাফেরকে বিশ্বাস করে তার রূপে-গুণে মজে কি অন্যায় করেছি। ছি ছি ছি! বলতে বলতে অনুশোচনায় গিয়াসুদ্দীন বারংবার নিজের বুকে নিজেই আঘাত করতে থাকে।

এবার গিয়াসুদ্দীনের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে সুমিতা বললে, আমি তোমার সঙ্গে কোন শঠতা, কোন প্রতারণা করিনি, ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি।

থাক্, তোমার ও মুখ দিয়ে আর ভগবানের নাম উচ্চারণ করো না।—নরকেও তাহলে তোমার স্থান হবে না। প্রথম দিনই আমি ভুল করেছিলুম, যদি সেদিন তোমায় ভালবাসার চেষ্টা না করতুম, তাহলে আজ আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করতে তুমি সাহস পেতে না কিছুতেই। বলে নিজের মাথার চুলগুলো দু'হাতে মুঠি করে ধরে পাগলের মত সমস্ত ঘরটায় ছুটে বেড়ায়। তারপর সহসা তার সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বলে, জানো, তোমাকে আমি এখনি ছারপোকার মত টিপে মেরে ফেলে দিতে পারি। কিন্তু না, তাও করবো না, তোমাকে ছুঁতে আমার ঘেন্না করে। তুমি নর্দমার চেয়েও জঘন্য, আবর্জনার চেয়েও কদর্য।

সুমিতার কণ্ঠে এবার ধীরে ধীরে যেন বল ফিরে আসে। সে মাথা উঁচু করে বলে, আমাকে তুমি যত ইচ্ছে গালাগালি দাও, যত পার ঘৃণা করো, কিছু বলবো না। শুধু একটা কথা তোমাকে না জানিয়ে পারছি না যে, আমি তোমার সঙ্গে কোন প্রতারণা করিনি। তোমার ওপর কোন প্রতিহিংসা নেবার জন্যেও এ কাজ করিনি। বিশ্বাস করো আমি তোমাকে ও তোমার ছেলেমেয়েদের অন্তরের সমস্ত স্নেহ ভালবাসা দিয়েছি, কিন্তু তবু কেন জানি না এমন হয়! প্রথম সন্তান ও স্বামী যাঁর গলায় মন্ত্র পড়ে, অগ্নিদেবতাকে সাক্ষী করে একদিন মালা দিয়েছিলুম, তাদের বেশী আপন মনে হয়। ভুলতে পারা যায় না।

চুপ, আমি আর একটা কথাও শুনতে চাই না তোমার মুখ থেকে। বলে দু'হাতে কান চেপে ধরে যেন বুকের মধ্যে কিসের একটা আর্তনাদ লুকিয়ে নিলে গিয়াসুদ্দীন। তারপর কণ্ঠস্বর সংযত করতে করতে উন্মাদের প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, এরপর তুমি আমার আরো কি সর্বনাশ করতে চাও বলো—

তার ধারণা সে মুসলমান বলে, তাকে এতদিন সে মনে মনে ঘৃণা করে এসেছে। আজ সুযোগ পেয়ে তার প্রতিহিংসার পূর্ণাহুতি দিলে।

ধরিত্রীর মত শান্ত ও সুস্থিরকণ্ঠে এবার সুমিতা উত্তর দিলে, আমি আর কিছু করতে চাই না, শুধু তোমার কাছ থেকে বিদায় চাই—

বিদায়! কথাটা কানে যেতেই প্রথমটা রাগে জ্বলে উঠলো গিয়াসুদ্দীন। তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় নিজের মনেই বলে উঠলো, হ্যাঁ সেই ভালো। তোমার ও-মুখ আর যেন আমায় দেখতে না হয়—

আভূমিনত হয়ে তাকে শেষ অভিবাদন জানিয়ে সুমিতা যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখন একটা কথাও গিয়াসুদ্দীনের মুখ দিয়ে বেরুল না। সে যেন কিসের চিন্তায় মগ্ন!

তার চোখের সামনে দিয়ে ঘর ছেড়ে, বারান্দা অতিক্রম করে, সুমিতা যখন একটার পর একটা সিঁড়ি নামতে নামতে একেবারে নীচে এসে দাঁড়ালো তখন যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল গিয়াসুদ্দীনের। যেন এতক্ষণ সে ঘুমচ্ছিল। আর ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখতে দেখতে চলে গিয়েছিল সুমিতার অনুরাগভরা সেই দিনগুলিতে। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতে তাই ছেলেমানুষের মত ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি বেয়ে সুমিতার সামনে এসে দাঁড়ালো। এবং আবেগভরাকণ্ঠে প্রশ্ন করলে, আমিনা, তুমি কি সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছো? আর কখনও আসবে না?

বহুদিন পরে আবার সেই পুরনো সোহাগভরা ডাক কানে আসতে একটু বিস্মিত হলো সুমিতা! এতদিন পরে হঠাৎ তার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে চমকে উঠে সে!

থমকে দাঁড়িয়ে সুমিতা একবার শুধু তার মুখের দিকে চোখ তুলে করুণ দৃষ্টিতে তাকালে। তারপর একটু থেমে কণ্ঠের সমস্ত জড়তা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিষ্করুণস্বরে বললে, এর পরেও কি তুমি আমায় এখানে থাকতে বলো?

আল্লার কিরে, জানি তুমি হয়ত কথাটা বিশ্বাস করবে না। তবু আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না। তুমি যেও না, আমি তোমায় আর কিছু বলবো না কোনদিন। বিশ্বাস করো। বলতে বলতে দু'হাত দিয়ে সিঁড়ির পথ আগলে দাঁড়ালো।

সুমিতা কণ্ঠে অসম্ভব গাম্ভীর্য এনে বললে, নিজের মনকে যখন জানতে পেরেছি তখন আর কিছুতেই তা হতে পারে না। পথ ছাড়ো।

গিয়াসুদ্দীন তেমনিভাবে আরো কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে বললে, যদি একান্তই চলে যাবে—তাহলে অন্ততঃ একটা কথা বলে যাও

যে, আমায় ক্ষমা করেছো।

সুমিতার নীচের ঠোঁটটা বারকতক কেঁপে উঠে থেমে গেল। অতিকষ্টে সে শুধু বললে, তোমার কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার। আমায় তুমি ক্ষমা করো!

গিয়াসুদ্দীনের চোখে এবার জল এসে পড়লো। বললে, কোথায় যাচ্ছো বলে যাও আমায়।

দৃঢ় কণ্ঠে বললে আমিনা, প্রায়শ্চিত্ত করতে।

কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের কথাটা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত মনটা যেন আবার বিষাক্ত হয়ে ওঠে। তাহলে কি কোনদিনই সে তাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেনি! হতবুদ্ধির মত নিস্তব্ধ হয়ে দাড়িয়ে সেই কথাটাই তখন বার বার বার ভাবতে থাকে গিয়াসুদ্দীন!

ততক্ষণ সুমিতা অন্দর মহল ছেড়ে, উঠোন পেরিয়ে, ফটকের মধ্যে দিয়ে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়লো। তারপর অর্গলমুক্ত বিহঙ্গের মত নিমেষে সহরের জনতার মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল।

কিন্তু তখনো তেমনি বজ্রাহতের মত সেই একই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে গিয়াসুদ্দীন। ঘুরে ফিরে একটা কথাই তার মাথার মধ্যে তখনো প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, আমিনা তার সঙ্গে এই দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণাই করেছে—না সত্যি সত্যি তাকে ভালবেসেছিল! কে তার মনের এ সংশয় দূর করবে!

তেইশ

পরের দিন সকালে থানায় ডাক পড়লো গিয়াসুদ্দীনের। সেই ফাউন্টেন পেন-এর মালিক নাকি ধরা পড়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে মোটর নিয়ে ছুটলো গিয়াসুদ্দীন। তার মন থেকে তখনো সে সন্দেহের জ্বালা বুঝি ঘোচেনি!

কিন্তু থানায় হাজির হয়ে যা দেখলে তাতে নিজের কাছে নিজেই যেন আরো ছোট হয়ে গেল। সেই কলমের মালিক আর কেউ নয়, সুকুমার চক্রবর্তী—সুমিতার সেই ছেলে!

তার ওপর আবার যখন সুকুমারের মুখ থেকে সবিস্তারে শুনলে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে লাহোরে গিয়াসুদ্দীনের ঘরে সেই কলম ফেলে আসার কাহিনীটা তখন যেন নিজের গালে নিজের চড়াতে ইচ্ছা করলো! গিয়াসুদ্দীন আর একটি কথাও না বলে অবিলম্বে সুকুমারকে পুলিসের কবল থেকে মুক্ত করে দিলে। তারপর গম্ভীর মুখে রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

বাড়ীতে এসে কিছুতেই যেন সুস্থির হতে পারে না গিয়াসুদ্দীন। আমিনার কথাই সর্বক্ষণ মনে ভাবে। নিজেকে অপরাধী মনে হয় আমিনার কাছে। তার

চরিত্রে অকারণ সন্দেহ করে তার প্রতি যে কেবল অন্যায় করেছে তাই নয়, তার ভালবাসার উপযুক্ত প্রতিদানও দেয়নি। সে কথা যত ভাবে তত তার মন ছি ছি করে ওঠে! তার জন্যে যেন বিবেকের কাছে সে ছোট হয়ে যায়। কাপুরুষ ভেবে একদিন তাকে ঘৃণা করেছিল বলে আমিনাকে সে জয় করেছিল অন্তরের প্রেম দিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সে মর্যাদা রক্ষা করতে পারলে কৈ? সেই কাপুরুষতাই তো প্রকাশ পেল তার আচরণে। সেই জন্যেই বোধহয় তাকে এমনি করে ঘৃণাভরে ত্যাগ করে চলে গেছে আমিনা! শুধু সে একা কেন? একমাত্র ছেলে নবাব সেও গেছে! সে আজ দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ, বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ! একমাত্র কন্যা তার মনও আজ অন্যদিকে! তবে সে কি পেলে এই জীবনে। ভালবাসা না দিলে ভালবাসা পাওয়া যায় না। দেওয়ার মধ্যে দিয়েই যায় পাওয়া—এই কথাটা যেন আজ প্রথম উপলব্ধি করলে গিয়াসুদ্দীন।

পরাস্ত সৈনিকের মত নিজের ঘরে বসে মনে মনে এমনি যখন অনুতাপ করছিল গিয়াসুদ্দীন তখন দারোয়ান এসে এক টুকরো কাগজ তার হাতে দিলে। ইংরিজীতে লেখা সুকুমারের নামটা পড়ে গিয়াসুদ্দীন তখনি তাকে ভেতরে আসবার হুকুম দিলে!

সুকুমার ঘরে ঢুকতেই গিয়াসুদ্দীন তাকে সস্নেহে কাছে বসিয়ে বললে, ঠিক সময়েই এসে গেছো তুমি—আমি ভাবছিলুম এখনি লোক পাঠাবো তোমার কাছে।

কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না সুকুমার। তাই গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করলে, আমার কাছে লোক পাঠাচ্ছিলেন কেন? কি দরকার আমার সঙ্গে আপনার!

গিয়াসুদ্দীন একটু থেমে এবং কিছু ইতস্তত করে জবাব দিলে, দরকার? হ্যাঁ, দেখো আমার ইচ্ছা যে, তুমি আজ থেকে আমার এখানে এসে থাকো এবং এখান থেকেই কলেজের পড়াশুনা করো, তার জন্যে যা কিছু খরচা লাগে আমি সবই করবো। এই বলে একটু থেমে আবার বললে, তুমি বোধহয় জানো এবং আনারের কাছে সবই শুনেছো যে আমার ছেলে নবাব আজ দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ, অনেক চেষ্টা করেও তার কোন খবর পাইনি—বেঁচে আছে কি না খোদা জানেন!

সুকুমারের মুখ চোখ নিমেষে রক্তবর্ণ ধারণ করলো। সে তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, না—তা কিছুতেই সম্ভব নয়। যেখানে আমার মায়ের অপমান হতে আমি নিজে চোখে দেখেছি; সেখানের ইঁট, কাঠ ও পাথরের দেওয়ালে তাঁর চোখের জল ও দীর্ঘনিঃশ্বাস আজো জমাট বেঁধে আছে, সন্তান হয়ে সেখানে থাকা আমি পাপ বলে মনে করি! বলে অন্তরের কঠোর জ্বালা দমন করে নিয়ে আবার বললে, কিন্তু তার আগে আমার মায়ের মুখ থেকে এ অনুরোধটা আমি শুনতে চাই। তাঁর এতে সম্পূর্ণ মত আছে কি না, জানতে চাই।

ম্লান হেসে গিয়াসুদ্দীন জবাব দিলে, তোমার মা যদি এখানে থাকতেন, তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর মুখ থেকে শুনতে পেতে!

যদি থাকতেন! তার মানে? তিনি কি এখানে থাকেন না? বলে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে গিয়াসুদ্দীনের চোখের দিকে তাকিয়ে যেন সে জবাব চাইলে তার প্রশ্নের। তাকে নিরুত্তর দেখে সুকুমার ফের বললে, অর্থাৎ আপনি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন?

গিয়াসুদ্দীনের যতটুকু পরিচয় পেয়েছিল সুকুমার তাতে তাকে একটা বর্বর ও রূঢ় প্রকৃতির অশিক্ষিত, দাম্ভিক, ধর্মান্ধ ব্যক্তি—সকল রকমের স্নেহ, মায়ামমতা প্রভৃতি কোমলবৃত্তি বর্জিত বলেই জানতো। কিন্তু সহসা ওর কণ্ঠে দীনতা, চোখে মুখে মমতার ছবি দেখে একটু বিস্মিত হলো।

গিয়াসুদ্দীন তার কথার জবাব না দিয়ে কি যেন ভাবছিল। একটু পরে শুধু বললে, না, এখানে সে থাকে না।

গিয়াসুদ্দীনের কণ্ঠস্বর এবার যেন আবেগে কেঁপে ওঠে। সে বললে, না। বরং সে-ই আমাদের ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। তাকে ধরে রাখবার অনেক চেষ্টা করেছিলুম আমি, বিশ্বাস করো!

চলে গিয়েছে? কোথায়? দোহাই আমার মায়ের কথা নিয়ে আমার সঙ্গে আর ছলনা করবেন না, সত্যি করে বলুন, আমার মা কোথায়? আমি যে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ছুটে এসেছি এখানে। বলুন—তিনি কোথায়? আমার আর একমুহূর্ত দেরী সইছে না!

গিয়াসুদ্দীন এবার গম্ভীর মুখে উত্তর দিলে, আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, ওই আনার আসছে তাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। আশা করি সে তোমার সঙ্গে মিথ্যা বলবে না। এই বলে পাশের ঘরে উঠে চলে গেল!

আনার সুকুমারকে দেখে কেবল আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো না, কণ্ঠে হৃদয়ের সমস্ত সুধা ঢেলে একবার 'ভাইয়া' বলে তাকে সম্বোধন করতে পেয়ে যেন ধন্য হলো।

কিন্তু তার বদলে সুকুমার বিষণ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, আনার, আমার মা কোথায় আগে বলো। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম, কিন্তু শুনছি তিনি নাকি এখান থেকে চলে গিয়েছেন! আমি তোমার মুখ থেকে সত্যি কথা শুনতে চাই।

আনার বললে, সত্যি তিনি চলে গিয়েছেন এখান থেকে—চিরদিনের জন্যে। বলে লজ্জায় অপমানে অধোবদন হয়ে রইল।

কিন্তু কোথায় গিয়েছেন তিনি? বলো শিগ্‌গির, আমার কাছে লুকিয়ো না লক্ষ্মীটি—কাল রাত্রে বড় দুঃস্বপ্ন দেখেছি তাঁকে। তাই ছুটে এসেছি সকাল হতেই। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় সুকুমারের কণ্ঠ বুজে আসে।

আনার বললে, আল্লার কিরে, কোথায় গিয়েছেন জানি না। তবে প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছি বলে চলে গেছেন!

প্রায়শ্চিত্ত! নিমেষে সুকুমারের চোখে মুখে যেন এক অমঙ্গলের ছায়া ঘনিয়ে আসে। সে আর কোন কথা না বলে তখনি সেখান থেকে একেবারে বাইরে

বেরিয়ে এলো।

তার পিছনে পিছনে আনার ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাচ্ছো ভাইয়া তুমি?

সুকুমার বললে, মাকে খুঁজতে।

আনার একটু থেমে বললে, আমিও যাবো তোমার সঙ্গে মাকে খুঁজতে—একটু অপেক্ষা করো আমি বাপজানকে জিজ্ঞেস করে আসি।

সুকুমার দৃঢ়কণ্ঠে বললে, না তা হয় না। আমি একাই যাবো! বলে ছুটে ফটক খুলে রাস্তায় বেরিয়ে গেল।

চৌদ্দশ

সেইদিন থেকে সুকুমার হলো পর্যটক। তীর্থে তীর্থে মায়ের সন্ধানে ফিরতে লাগল। প্রথমে সে গেল কাশী। তারপর গয়া, মথুরা ও বৃন্দাবন। সেখানে বহুদিন ধরে খোঁজ করে মাকে না পেয়ে শেষে খুঁজতে খুঁজতে হাজির হলো এসে হরিদ্বার। কয়েকদিন ধরে সেখানে খুঁজে খুঁজে মাকে না পেয়ে গেল কনখলে। সেদিন ভোরের দিকে যখন কনখলের দক্ষ-প্রজাপতির ঘাটে গিয়ে সুকুমার হাজির হলো, তখন ঈশ্বর যেন তার দিকে মুখ তুলে চাইলেন! সে তার মায়ের দেখা পেলো। কিন্তু দেখেই সে শিউরে উঠলো। এ মা তো সে মা নয়, যাকে সে চিনতো, জানতো, এ যেন এক সম্পূর্ণ আলাদা মূর্তি। সোনাকে আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাদ বাদ দিয়ে যেমন পাকা সোনা তৈরী করে, বিধাতা তাঁকে যেন তেমনি করে গড়েছেন! শীর্ণতপস্বিনীর মূর্তি। বিলাসিনীর সে রূপের এক কণাও তার দেহের কোথাও আর অবশিষ্ট নেই! মাথার চুলগুলো পুরুষের মত ছোট ছোট করে ছাঁটা, অনশনে মুখের হাড়গুলো ঠেলে উঁচু হয়ে উঠেছে, রোগা রোগা হাত পা, রঙটা গিয়েছে তামাটে হয়ে। সবে গঙ্গায় স্নান সেরে জপের মালা এক হাতে ও অন্য হাতে জলভরা কমণ্ডলু নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে বটগাছের তলায় দাঁড়িয়েছে অমনি সুকুমার পেছন থেকে 'মা' বলে একেবারে তার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়লো। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে বললে, মা একি তোমার বেশ! আমি যে চাইতে পারছি না তোমার মুখের দিকে! কেন তুমি এমন কাজ করলে? তোমার জন্যে আজ তিনমাস ধরে পথে পথে আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। ভগবান যখন অনুগ্রহ করেছেন তখন আর তোমায় ছাড়বো না। ফিরে চলো মা আমার সঙ্গে। আমি তোমায় নিতে এসেছি। তোমার সেবা করে আমার বাকী জীবনটা কাটাবো এই আমার সাধ।

সুকুমারের হাত দুটো পায়ের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে সুমিতা ধীর ও প্রশান্ত কণ্ঠে বললে, আমায় ক্ষমা করো বাবা! আমায় তুমি আর এখান থেকে ফিরে

যেতে বলো না। ভগবানের কৃপায় আমার উপযুক্ত স্থান আমি খুঁজে পেয়েছি। এখান থেকে আর এক পা কেউ আমায় সরাতে পারবে না। তুমি এখনি চলে যাও এখান থেকে। আর কোনদিন যেন তোমাকে আমি এখানে না দেখি। তাছাড়া একটা কথা তোমায় শপথ করতে হবে—আর কেউ যেন জানতেও না পারে আমি এখানে আছি। বলতে বলতে সহসা তার কণ্ঠ দৃঢ় হয়ে এলো।

সুকুমারের বুকের মধ্যে থেকে কি একটা বেদনা যেন ঠেলে উঠে তার কণ্ঠকে রোধ করে ধরে। অতিকষ্টে সে বলে, মাগো, তুমি মা হয়ে এ-কথাটা কি করে আমায় বলতে পারলে, আমি যে কল্পনাও করতে পারছি না।

সুমিতা বোধকরি ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েছিল তাই প্রাণপণে সব আবেগ দূরে সরিয়ে দিয়ে কঠিন স্বরে বলবার চেষ্টা করলে, তোমার যে মা সে তো অনেকদিন আগে মরে গেছে। আজ আমার মধ্যে তোমার সে মা বেঁচে নেই। তুমি আমায় তাই ভুল বুঝছো বাবা—তুমি লেখাপড়া শিখেছো, বড় হয়েছো, আশা করি এর চেয়ে আর বেশী কিছু তোমায় বলতে হবে না। তাই আমি চাই আমাকে আর কোন প্রশ্ন করে লজ্জায় না ফেলে তুমি এখনি চলে যাও এখান থেকে। শুধু আমায় একা বাকী জীবনটা একটু শান্তিতে এখানে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও।

কোন্ অধিকারে মা! এবং কিসের জন্যে জিজ্ঞেস করতে পারি কি? বল মা চুপ করে থেকো না। আমার মনের কথা কি তুমি মা হয়ে বুঝতে পারছো না? বলো কোন্ অপরাধে তুমি আমায় এতবড় শাস্তি দিতে চাইছো! শুধু বলো—তোমার ওই মুখের কথাগুলো যেন আমার বাকী জীবনের পাথেয় হয়ে থাকে। নইলে কি নিয়ে আমি বাঁচব!

সুমিতা চুপ করে কি যেন ভাবছিল। হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত সুকুমার আবার কৈফিয়ৎ চেয়ে বসে, তুমি আমার মা—একদিন আমি জন্মেছি তোমার ওই দেহ থেকে, জানি না এটা তুমি অস্বীকার করতে পারো কি করে? কিন্তু আমার দেহে যতদিন একবিন্দু রক্ত থাকবে, কিছুতেই তা পারবো না মা!

ফল রেখে গাছ মরে যায়, তা বলে ফলের পরিচয় কি কখনো নষ্ট হয় বাবা। বলতে বলতে আবার সুমিতার দু'চোখ সজল হয়ে আসে। নিমেষে উদ্গত অশ্রু সংবরণ করে নিয়ে আবার বুকে বল সঞ্চয় করে সে বলে, যেদিন দু'বছরের শিশুকে ত্যাগ করে আমি ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলুম সেই দিনই যে তোর মায়ের মৃত্যু হয়েছে বাবা, ভুলে যাসনি।

কি বলছো মা! বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সুকুমার।

এবার স্নেহের সঙ্গে ছেলের চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে সুমিতা উত্তর দিলে, ঠিকই বলছি বাবা! তুমি লেখাপড়া শিখেছ, ভাল করে ঠাণ্ডা মাথায় সব ভেবে দেখো। তারপর চোখের জল সামলাতে সামলাতে ছেলেকে হঠাৎ বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার কপালে স্নেহের একটা ছোট্ট চুমু খেয়ে বললে,

তোমার প্রতি আমার যেটুকু কর্তব্য ছিল তা আমি শেষ করে দিয়েছি বাবা—এখন আমায় শান্তিতে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। এবার তার গলার স্বর কেঁপে উঠলো, প্রাণপণে নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে একটু থেমে অস্ফুটস্বরে বললে, আর কোনদিন যেন তোকে এখানে না দেখি! এই আমার শেষ আদেশ।

চোখের জল মুছতে মুছতে সুকুমার তাঁর কাঁধের ওপর মুখটা চেপে ধরে শুধু অতিকষ্টে বললে, মা এ ছাড়া আর কিছু কি তোমার আমায় বলার নেই? আমি তবে কি নিয়ে বেঁচে থাকবো—

এবার তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে সুমিতা বললে, তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, এ কথাটা যেন কোনদিন ভুলে যেয়ো না। তোমার জাত ধর্ম যেন বজায় থাকে বাবা। এই আমার শেষ আশীর্বাদ তোমার ওপর রইলো।

বলেই আর পিছনে না তাকিয়ে সামনের আঁকাবাঁকা নির্জন গলির পথ দিয়ে দূরের এক মন্দিরের দিকে চলে গেল।

শুধু বজ্রাহতের মত সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুকুমার। একটি কথাও আর মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলো না।

উত্তরবাহিনী

উৎসর্গ

শ্রীমতী মৃদুলা ঘোষ
জীবনসঙ্গিনীকে

॥ এক ॥

সত্যি কথা বলিতে কি, তখন আমার যা বয়স, তাতে ওই হরিদ্বারের মত সাধু-সন্ন্যাসীদের জায়গায় বাকী জীবনটা কাটাইতে চাই শুনিলে, যে কোন ব্যক্তির ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আমার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইবার কথা।

কিন্তু আমার সদ্যলব্ধ পাণ্ডাঠাকুর, মিনিট পনেরো-কুড়ি পূর্বেও যাঁর অস্তিত্ব আমার কাছে ছিল নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ, তাঁর মুখের কোথাও একটি রেখার পরিবর্তন লক্ষ্য করিলাম না, বরঞ্চ সেই অতিরিক্ত-দুগ্ধ-ঘৃতপুষ্ট চিক্কণ মুখের উপর যে ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফরাজি শোভা পাইতেছিল, তাহার প্রান্তদ্বয় চট্ করিয়া একবার চুমরাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "কৈ ফিকির নেহি, ঠেরিয়ে আব্‌কো যেত্‌না রোজ মর্জি! ইয়ে ত সব আপ্‌হি কে হ্যায়।"

বলিয়া গঙ্গাতীরস্থ ফুলফলের বাগানসমেত যে সুরম্য অট্টালিকার মধ্যে আমাকে লইয়া ঢুকিয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়া দিলেন।

এ্যাঁ! বলে কি! চমকিয়া উঠিলাম। ইহা বিনয় না অতিভক্তি?

প্রথমটা খুব ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। আমার বাবা কোনদিন এখানে আসেন নাই। আমার ঠাকুর্দাও না। জানিতাম না যে তাঁর বাবা অর্থাৎ আমার প্রপিতামহ কবে কোন্‌কালে তীর্থ করিতে আসিয়া বর্তমান পাণ্ডাজীর প্রপিতামহের যজমান হইয়াছিলেন, তাহার নজির বৃহদাকার এক পুরানো খেরোবাঁধানো খাতার পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধার করিয়া আমার বাপ-ঠাকুর্দার নাম-ধাম বিবরণ, মায় দেশের ঠিকানা, বাংলা-দেশের কোথায় আদি নিবাস, ও তাঁহারা কয় ভাই, কার কয় ছেলে ছিল, তাঁদের নাম কি কি ইত্যাদি, গড়গড় করিয়া বলিয়া দিয়া যেমন আমাকে বিস্মিত করিয়া দিলেন, তেমনি স্টেশনে নামিবার সংগে সংগে যে বিরাট পাণ্ডার দল আমার পিছনে ফেউয়ের মত লাগিয়া গিয়াছিল, এতক্ষণ মোটা মোটা খাতা বগলে লইয়া একই প্রশ্ন জনে জনে করিয়া আমাকে তিতিবিরক্ত করিয়া তুলিতেছিল, "বাবুজী আপনার ঘর কোন্ জিলায়? আপনার নামটি কি? আপনার পিতাজীর নাম কি? আপনি গোঁসা হচ্ছেন কেন? একবারটি মুখে বললে কি ক্ষতি হয় আপনার" ইত্যাদি, তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইলাম।

কারণ তাহাদের প্রশ্নের জবাব না দিয়া কাহারো পার পাইবার উপায় ছিল না। বহুজনকে বলিতে বলিতে মুখ ব্যথা হইয়া গেলেও তবু রেহাই নাই। বলিত, "আর একটিবার বললে কি আপনার মুখটি ক্ষয়ে যাবে"!

মজা এই, যেই একজনকে বলিলাম অমনি আশেপাশের সকলে যে যার খাতার পাতা খুলিয়া খুঁজিতে থাকে। আর খুঁজিয়া না পাইলে, "বাবুজী আপনার পিতামহের কি নাম ছিল, কোন্ জিলায় ঘর?" তখন আবার প্রশ্ন

করিতে শুরু করে। আমার চোদ্দ পুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরাধি-কারসূত্রে আমি কার ভাগে পড়ি, কোন্ পাণ্ডার যজমানভুক্ত, ইহা সেই সব বিরাট বিরাট খাতার সমুদ্র মন্থন করিয়া যতক্ষণ না তাহারা আবিষ্কার করিতে পারিতেছে ততক্ষণ যেন তাহাদের চোখে ঘুম নাই। কিন্তু এইভাবে জেরার পর জেরা করিয়া একবার আমার বংশের কোন একটি সূত্র যদি কোনপ্রকারে কোথা হইতে কেহ আবিষ্কার করিতে পারে, তাহা হইলে অন্য কারো কোন আপীল চলিবে না আমার উপর। অর্থাৎ মামলার ফয়শালা হইয়া গেল এক কথায়। উত্তরাধিকারসূত্রে কোন্ পাণ্ডার বংশধরের ভাগে আমি পড়ি, তৎ-ক্ষণাৎ স্থির হইয়া গেল। আমার পরিচয় ধরিয়া টানা-হেঁচড়া করিবার কোন এক্তিয়ার রহিল না আর কোন পাণ্ডার। অন্য কাহারো এমন সাধ্য নাই যে আমার পরিচয় গোপন করিয়া আমাকে তাহার যজমানভুক্ত করিয়া লয়।

পাণ্ডাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত রকমের অলিখিত আইন বা সততা প্রচলিত আছে। একজন আর একজনের অধিকারে কখনই হস্তক্ষেপ করে না। বরং কেহ যদি প্রথমটা পাত্তা করিতে না পারে, ঠিক তাহার পিছনে লাগিয়া থাকে এবং চার-পাঁচদিন পরেও গোয়েন্দার মত ঠিক যাহার যজমান সেই উপযুক্ত পাণ্ডার কানে সংবাদটি পৌঁছিয়া দিয়া, কর্তব্য সম্পাদন করে। অদ্ভুত ঐক্য পাণ্ডাদের মধ্যে।

যাহা হউক, এইভাবে একজনের দলভুক্ত হইতে পারিয়া, যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

ওখানকার পাণ্ডাদের নিয়মকানুন কি, কিছুই জানিতাম না।

বাস্তবিকপক্ষে ষণ্ডাকৃতি এতগুলি মানুষ মোটা মোটা খাতা বগলে লইয়া যখন আমায় ঘিরিয়া ওইরূপ প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিতেছিল তখন বুঝি নাই, তীর্থ-পাণ্ডা বলিতে কি বুঝায়। আর কেনই বা আমার মত নিরীহ প্রাণীকে লইয়া তাহাদের এত টানাটানি হেঁচড়াহিঁচড়ি!

তাই সেদিন আমার উপর পাণ্ডাজী যজমানত্বের শীলমোহর যখন লাগাইয়া দেন তখন ভাবি নাই যে এই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অপরিচিত ব্যক্তিটি মুহূর্তে আমার এইরূপ পরমাত্মীয় হইয়া উঠিবে।

তীর্থস্থানের পাণ্ডাদের সম্বন্ধে ভাল-মন্দ অনেক রকম জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। কে জানে কোন্ মানুষের মধ্যে কি লুকাইয়া আছে। অথচ আমার বেশভূষা আচার-আচরণে কোথাও ধনসম্পদের চিহ্নমাত্র ছিল না, বরং ছিল তার বিপরীতটা।

তাই পাণ্ডাজীর মুখ হইতে ওই কথাটি শুনিয়া আশ্বাসের চেয়ে আশঙ্কায় যেন বুকের ভিতরটা দুরদুর করিয়া উঠিল। শেষে কি কলিকাতা হইতে হাজার মাইল দূরে আসিয়া জুয়াচোর বদমাইশের খপ্পরে পড়িলাম!

মনের মধ্যে এই চিন্তাটা সবে চাড়া দিয়াছে এমন সময় পাণ্ডাজী স্বভাব-মধুর ভঙ্গীতে দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা বাবুজী, আভি

আরাম কীজিয়ে, কৈ ডর নেহি! ইয়ে তো স্বর্গদোওয়ার হ্যায় জী!" বলিয়া আমাকে তাঁর ছড়িদারের হাতে সমর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ছড়িদারের নাম ঈশ্বরলাল। সে এতক্ষণ মোটা খেরোবাঁধানো খানতিনেক খাতার বোঝা কাঁধে লইয়া স্টেশন হইতে বরাবর পান্ডাজীর সঙ্গে অনুচরের মত ফিরিতেছিল। মানুষটি যেমন নিরীহ তেমনি বশংবদ। তাহাকে যে ছড়িদার বলে, জানিতাম না।

প্রকৃতপক্ষে এই ছড়িদার পান্ডার বেতনভুক কর্মচারী হইলেও চাকর নহে। যদিও যজমানের যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা তাহার একমাত্র কাজ। প্রয়োজন হইলে বাজার হইতে নুন, লকড়ী, খাবার ও জিনিসপত্র সবই যেমন সে কিনিয়া আনে তেমনি সঙ্গে লইয়া তীর্থস্থানের যেখানে যা কিছু দ্রষ্টব্য সব ঘুরিয়া দেখানোও তার কর্তব্যকর্ম। পান্ডাজী শুধু তীর্থকৃত্যটুকু করাইয়া ক্ষান্ত। যজমানের নিকট হইতে দক্ষিণাদি গ্রহণ ও তৎসহ আশীর্বাদ বিতরণ এবং সুফলদান। অর্থাৎ হাতে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিবেন এইমাত্র। তাও শেষ দিন, বিদায়ের প্রাক্‌কালে।

এক কথায়, সবই তোমার, শুধু চাবিকাঠিটা আমার।

পান্ডাঠাকুরের সঙ্গে যজমানের দেখাসাক্ষাৎ তাই ঘটে সেই পরম মুহূর্তে, পঞ্জিকা দেখিয়া যার দিনক্ষণ শুভলগ্ন স্থির করিতে হয়।

কিন্তু আমার বেলা ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল।

প্রতিদিন 'হর-কী-প্যারী' যাইবার পথে একবার আমার ঘরের সামনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন কোন অসুবিধা হইতেছে কিনা। বলিতেন, "কৈ ফিকির নেহি! যো কুছ্ আব্‌কা দরকার, ছড়িদারকো পাশ সব চিজ মিলেগী জরুর। ইয়ে ত স্বর্গদোওয়ার হ্যায় জী!"

বলা বাহুল্য আমার প্রতি তাঁর এই অযাচিত করুণা আমার মনের অস্বস্তিকে দিনে দিনে বাড়াইয়া তুলিল। আমি কেবল গরীব নয়, বেকারও। হয়ত তিনি আমাকে বড়লোক মক্কেল ঠাওরাইয়াছেন কিংবা কোন ধনীর সন্তান। তাই আমার প্রতি এই অহেতুক স্নেহ যেন আমার আতঙ্ক হইয়া দাঁড়াইল।

তীর্থদর্শনের আশায় কিংবা কোন পরমার্থের লোভে আসি নাই। জীবন-সংগ্রামে পরাজিত, লাঞ্ছিত সৈনিকের মত তখন আমার মানসিক অবস্থা। যেখানে হিংসা দ্বেষ হানাহানি লোভের বিচিত্র প্রকাশ নাই, একজনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবার জন্য দশজন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় না, মানুষ যেখানে মনুষ্যত্বের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত, স্নেহ, ভালবাসা, প্রেম প্রভৃতি হৃদয়দৌর্বল্যের স্থান নাই যেখানে, বিশেষ করিয়া নারীর প্রবেশাধিকার যে স্থানে নিষিদ্ধ, সেই সাধুসন্ন্যাসীদের পুণ্যভূমিতে থাকিয়া শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন করিবার ইচ্ছা লইয়া এইখানে পালাইয়া আসিয়াছিলাম। হরিদ্বার সাধুসন্ন্যাসীদের স্থান বইয়ে পড়িয়াছিলাম। তাছাড়া সেখানে কোন

বাঙ্গালী নারী নাই, ইহাই ছিল আমার কাছে সব চেয়ে বড় আকর্ষণ। তার কারণ ব্যাঙ্গালীর মেয়েদের যেমন ভালবাসিতাম, তেমনি ভয়ও করিতাম।

থাক্ সে কথা এখন।

একদিন তাই পান্ডাঠাকুরকে বলিয়া ফেলিলাম, "আপনি কেন কষ্ট করে রোজ আসেন? তাছাড়া আপনার ছড়িদার ঈশ্বরলাল বড় ভাল লোক। সব সময় দেখাশুনা করে। আপনি মিছিমিছি ব্যস্ত হবেন না।"

পান্ডাজী বিনয়আপ্লুত কণ্ঠে বলিলেন, "আপনি পরদেশী, আপনার কোন তকলিফ্ না হয়।"

তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া জবাব দিলাম, "তকলিফ্! কষ্ট! কি বলছেন? এমন প্রাসাদোপম অট্টালিকায় থাকতে পাওয়া পরম সৌভাগ্য!"

"ইয়ে সব ত আপ্‌হিকে বদৌলত্। আপনাদের দৌলতেই ত এই সব। আপনার পিতাজী, দাদাজীর মত মহাত্মাদের দানেই এ সম্ভব হয়েছে। এ আপনাদেরই সেবার জন্য।"

আমার বাবা বা ঠাকুরদাদা যে এখানে কখনো আসেন নাই, বোধহয় পান্ডাজী তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। আমিও তাহা আর স্মরণ করাইয়া না দিয়া শুধু বলিলাম, "তাঁরা ছিলেন দরিদ্র, কতটুকু তাঁদের সামর্থ্য। একথা বলে তাই লজ্জা দেবেন না।"

জিভ কাটিয়া পান্ডাজী বলিলেন, "আরে রামজী কহো! ইয়ে ত কৈ সরমকা বাত্ নেহি বাবুজী! এক পয়সা ভি দান, আউর দশ রুপিয়া ভি দান হ্যায়। লেকিন কম্‌তি আউর বেশী! হাম্ লোক পান্ডা আদমী, হামারা পাশ দোনো একই-ই, বরাবর। খেয়াল রাখ্‌না, ইয়ে ত স্বর্গদোওয়ার হ্যায় জী!"

বাস্তবিক এযুগে এরকম বিনয় কদাচিৎ দেখা যায়। শুনিয়াছি বৈষ্ণবরা নাকি বিনয়ের অবতার। কিন্তু ইহাদের তুলনায় তারা যেন শিশু। তবু মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা সন্দেহের ছায়া লুকাইয়া থাকে। আমি শহুরে মানুষ। বাল্যকাল হইতে পথেঘাটে, ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, এমন কি মন্দিরে মন্দিরে "পকেটমার হইতে সাবধান, চোর-জুয়াচোর, বদমাইশ প্রভৃতি তোমার নিকটেই আছে" এই সতর্কবাণী দেখিয়া অভ্যস্ত। কাজেই মানুষকে বিশ্বাস করিবার কথাটা যেন ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

ঈশ্বরলালের কাছে শুনিয়াছিলাম যেখানে আমি আছি, ওই সুন্দর বাগান বাড়িটি একটি ধর্মশালা। পান্ডাজীর এক ধনী যজমান উহা দান করিয়াছেন মানুষের সেবাব্রতে। তবে পান্ডাজী-ই সর্বময়কর্তা। তিনি যেমন খুশি যাত্রীদের জন্য উহা ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু দান বা বিক্রয় করিবার অধিকার তাঁহার নাই। পান্ডাজীদের বংশানুক্রমে উহার কর্তৃত্বভার হস্তান্তরিত হইবে শুধু।

প্রশ্ন করিলাম, "কিন্তু সব ধর্মশালার যেমন নিয়ম আছে, কয়দিন করিয়া

যাত্রীরা থাকিতে পারিবে, এখানেও নিশ্চয় সেরকম কিছু আছে?”

“হ্যাঁ জী! সাত রোজকা ত কানুন হ্যায়। লেকিন্ আদমী কাঁহা! বৈশাখ জেঠ্ মাহিনামে ত কেদারনাথ, বদরীনাথ যাত্রীকো ভিড় হোতা হায়, আউর সবসে জাদা ভিড় লাগতা হ্যায় কুম্ভমে।”

বলিলাম, “কুম্ভমেলা! সে ত শুনেছি বারো বছরে একবার।”

“হাঁ জী।” অর্থাৎ অন্য সব সময়ে ঘর খালি পড়িয়া থাকে। এবং এখন যতদিন খুশি থাকিলেও পান্ডাজীর কোনো আপত্তি নাই।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, “আচ্ছা এখানে এরকম ধর্মশালা আরো কত-গুলি আছে?”

ঈশ্বরলাল তাহার ছোট ছোট চোখ দুইটি কুঁচকাইয়া বলিল, “হোগা থোড়া বহুত্ দেড়শো-দুশো!”

“এ্যাঁ! এই রকম ধর্মশালা দেড়শো-দুশো আছে এবং সব জায়গায় বিনা পয়সায় থাকতে দেয়—বলো কি?”

“আউর বেশী ভি হো সেকতা। আব্ পণ্ডিতজীকো পুছনা ত পুরা পাত্তা মিল জায়েগা।”

পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করিবার আমার কোন গরজ ছিল না। সংখ্যায় উহারা দেড়শো বা সাড়ে তিনশো হইলেও আমার কিছু আসে যায় না। শুধু ওইরূপ আরো যে অনেক স্থান বিনা পয়সায় থাকিবার আছে, ইহা শুনিয়াই মনে যেন আবার নতুন বলসঞ্চার হইল।

এক সপ্তাহ যেদিন পূর্ণ হইল সেইদিন সকালে পণ্ডিতজী হঠাৎ আসিয়া আমায় প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, “আপনি কি কাম করেন?”

মাথা চুলকাইয়া উত্তর দিলাম, “উপস্থিত কিছুই করি না। বেকার।” সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা আশংকা জাগিয়া উঠিল, হয়ত তিনি এখনি বলিয়া বসিবেন ঘরখানি ছাড়িয়া দিতে।

কিন্তু মুহূর্ত কয়েক তিনি শুধু নীরব রহিলেন। বোধ হয় আমি যে কিছু তাঁহাকে 'দিতে-থুতে' পারিব না, সেই কথাটাই চিন্তা করিতেছিলেন। ঈশ্বর জানেন। কিংবা উহা আমার অনুমান মাত্র। আমার যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা, তাহাতে ওইরূপ চিন্তাই ত স্বাভাবিক। তাই মনের মধ্যে কেমন একটা উৎকণ্ঠা সঙ্কোচ ও লজ্জা লইয়া তাঁহার জবাবের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কে জানে এখনি হয়ত আবার নতুন একটা আস্তানার খোঁজে বাহির হইতে হইবে ভাবিতেছি, এমন সময় পান্ডাজী তাঁহার সেই ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফরাজির দুই প্রান্ত চুমরাইয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, “কৈ ফিকির নেহি, আব্ ঠারিয়ে যেত্না কৈ রোজ মর্জি। ই য় ত স্বর্গদোওয়ার হায় জী।”

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য বলিলাম, “আমি বড় গরীব।”

"ত কেয়া হ্যায়!" সহসা যেন তিনি মারমুখী হইয়া উঠিলেন। তারপর আমার মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, "ইয়ে সংসারমে সব্ আদমী হ্যায় গরীব! কৈ পয়সা লেকে আতা নেহি, ফিন্ যাতাভি নেহি!" তারপর নিজের ভাষায় আরো যা বলিলেন, তাহার অর্থ হইল, মানুষও দুদিনের জন্য সংসারে আসিয়া অপরের টাকাকড়ি লইয়া শিশুর মত খেলা করিতে করিতে ভাবে বুঝি উহা তাহার নিজস্ব, কিন্তু একদিন সে ভুল ভাঙে যখন সব ফেলিয়া রাখিয়া তাহাকে চিরদিনের মত ইহলোক হইতে বিদায় লইতে হয়।

এবার ম্লান হাসিয়া কহিলাম, "অপরের টাকাকড়ি নিয়ে খেলা করিতে পারি তেমন কিছুও যে আমার নাই!"

"বাবুজী ইয়ে ত স্বর্গদোওয়ার হ্যায়। গঙ্গামাইকা রাজত্বকে রোটিকা কোই ভাব্না নেহি। সব্কৈকা রোটি জরুর মিলনা হ্যায়।"

বলিলাম, "পেটের জন্যেই ত সংসারে যত কিছু গণ্ডগোল, হানাহানি, কাটাকাটি পণ্ডিতজী—যদি রুটির ভাবনা সত্যি ভাবতে না হয়, তাহলে স্বর্গ ত হাতের মুঠোয়।"

"হাঁ জী। যো কুছ হ্যায় সব হিঁয়াই হ্যায়। ইস্কো বল্তা হ্যায় স্বর্গদোওয়ার। বেদ, পুরাণমে ভি ত হ্যায়—আব্ পড়্হা নেহি!"

বলিলাম, "পড়েছি।"

"লেকিন আব্লোক বিশ্ওয়াস্ নেহি করতা হ্যায়! দক্ষপ্রজাপতি ঘাটমে গিয়া থা? কন্খলকা উধারসে, একদম লক্ষ্মণঝুলা তক্ স্বর্গদোয়ার হ্যায়। সংসারমে এইসা পুণ্যভূমি কৈ নেহি। পুরা শান্তি মিলনেকা জায়গা ত ইয়ে হ্যায় বাবুজী—!"

মুহূর্তে মনে হইল, হউক উহারা অশিক্ষিত, কিন্তু কেমন সুখী। বেদপুরাণে বিশ্বাস করে বলিয়া কি ক্ষতি হইয়াছে। আমাদের মত বৃথা শিক্ষার অহংকার লইয়া অহরহ সন্দেহের জ্বালায় ত জ্বলিতে থাকে না। বেশ আছে।

সব চেয়ে বিস্ময়ের কথা, পাণ্ডাঠাকুরের বয়েস আদৌ বেশী নয়, আমার চেয়ে মাত্র চার-পাঁচ বছরের বড় ছিলেন। অতিরিক্ত দুগ্ধঘৃতপুষ্ট দেহ বলিয়া পালোয়ানের মত দেখিতে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের কোন যুবকের দেহে যেন সত্তর-পঁচাত্তর বয়সের মাথা কে বসাইয়া দিয়াছে। সব সময় বিজ্ঞ দার্শনিকের মত বড় বড় তত্ত্বকথা তাঁহার মুখে।

প্রথমটা মুদ্রাদোষ ভাবিয়া মনে মনে হাসিয়াছিলাম কিন্তু কিছুদিন পরেই বুঝিতে পারিলাম উহা কেবল তাঁর মুখের বুলি নহে। তাঁর অন্তরের একান্ত বিশ্বাসও বটে।

যে কোন প্রসঙ্গের উল্লেখ হউক, কথার ফাঁকে ফাঁকে, একবার নয় একাধিকবার তিনি আপনাকে শোনাইয়া দিবেন ওই কথাটি—"ইয়ে ত স্বর্গদোওয়ার

হ্যায় জী!”

তা কে জানে ধর্মকথা বা কোন জটিল শাস্ত্রীয় আলোচনা, আর কে জানে সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা।

মনে আছে, একদিন পাণ্ডাজীর তবিয়ৎ খারাপ থাকায় বাড়িতে তিনি আহার করিতে যান নাই। হর-কী-প্যারীতে তাঁহার অফিস ঘরে বসিয়া ছিলেন। প্রশ্ন করিলাম, “আজ কি তাহলে খাওয়াদাওয়া কিছুই করবেন না? উপবাস?”

বিষণ্ণকণ্ঠে জবাব দিলেন, “হাঁ, থোড়াসে দুধ পিয়েগা জী।”

যেন খাবার কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমি স্মরণ করাইয়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার ছড়িদারকে হাঁক দিলেন, “আরে এ ঈশ্বরলাল, দুধকা লোটা লে আনা!”

অবিলম্বে তাঁহার সেই সেবক কর্মচারীটি একটা বড় ঘটিভর্তি দুধ ও একটা মোরাদাবাদী লম্বা চোঙা গ্লাস দিয়া গেল। তিনি আমার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে সেই ঘটির সম্পূর্ণ দুধটা উদরসাৎ করিলেন দেখিয়া বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তবু দুধের পরিমাণটা কত যাচাই করিবার জন্য শুধাইলাম, “আপনার ওই লোটাতে কতটা দুধ ধরে, পাণ্ডাজী?”

“হাঁ, হোগা, কমসে কম—ঢাই-তিন সের!” অর্থাৎ আড়াই কি তিন সের।

কণ্ঠে বিস্ময় চাপিয়া আবার প্রশ্ন করিলাম, “এটা কি গরুর দুধ খেলেন?”

“নেহি জী, ইয়ে ত ভঁইসাকা হ্যায়। বাচ্চা লোক গরুকা দুধ পিতা, হামলোক সব ভঁইসাকা পিতে হ্যায়!”

“এ্যাঁ! বলেন কি! এই এতখানি মহিষের দুধ খেয়ে আপনি হজম করেন?”

পাণ্ডাজীর মুখেচোখে সেই দিব্য হাসি ফুটিয়া উঠিল, “ইয়ে ত স্বর্গ-দোওয়ার হ্যায় জী। ফিন্ সাম্‌কো এত্‌নাহি পিয়েগা!”

অর্থাৎ আড়াই দুকুনে পাঁচ সের মহিষের দুধ খাইয়া একটা লোক যে হজম করিতে পারে, নিজে চোখে না দেখিলে কিছুতেই বিশ্বাস করিতাম না।

তখন পাণ্ডাজীর বাড়িতে কয়টি মহিষ, কতগুলি গরু আছে এবং ছেলে-পুলে ও সংসারের লোকসংখ্যাই বা কিরূপ প্রশ্ন করিলাম।

পাণ্ডাজী বলিলেন, “দো ভৈঁইসা, দো গাইয়া মেরা হ্যায়। চার লেড়কা-লেড়কী মাতাজী, আউর হাম দোনো। ইয়ে ত সাত আদমী হামরা হ্যায় জী।”

বলিলাম, “এক-একটা মহিষ আর গরুর কত করে দুধ হয়?”

পাণ্ডাজী হিসাব না করিয়া মুখস্থের মত বলিয়া দিলেন, “দো ভঁইসাকে আধা মণ, আর এক গাইয়া দেতা হ্যায় দশ সের। ব্যস! দোসরি গাইয়াকে দুধ আভি বন্ধ্ হ্যায়।”

“তার মানে প্রতিদিন তিরিশ সের দুধ! এত দুধ করেন কি?”

“কেয়া করেগা! বালবাচ্চা হ্যায়, সব খা লেতা। কুছ্‌ভি দহি মালাই

রাবড়ি বন্‌তা হ্যায় জী!"

বলিলাম, "আপনাদের এখানের গরু-মহিষ ত খুব দুধ দেয় দেখছি!"

পাণ্ডাজী একবার শুধু তাঁহার গোঁফের দুই প্রান্ত চুমরাইয়া কহিলেন, "ইয়ে ত স্বর্গদোওয়ার হ্যায় জী!"

বুঝিলাম। অর্থাৎ যেহেতু ইহা স্বর্গের দ্বার সেই হেতু এখানে অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই। সবই সম্ভব।

॥ দুই ॥

মনে পড়ে, প্রথম দিন গঙ্গাস্নান করিয়া ধর্মশালায় ফিরিয়া ভিজা কাপড় বাহিরে রোদে শুকাইতে দিবার সময় পাণ্ডাজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "এখানে কাপড় মেলে দিতে পারি ত, চোরের উৎপাত কেমন?"

সঙ্গে সঙ্গে এমন মুখভঙ্গী করিয়া তিনি জিভ কাটিলেন, যেন ওই কথাটা উচ্চারণ করিয়া আমি কি এক পাপকর্ম করিয়া ফেলিয়াছি। বলিলেন, "ইয়ে তো স্বর্গদোওয়ার হ্যায় জী! সাধু-সন্ত্‌কা তপস্যাকে স্থান!"

হাসিয়া নিজের অপরাধটা গোপন করিবার জন্য বলিলাম, "কিন্তু আমার মত অসাধু লোকের তো অভাব নেই দেশে!"

"নেহী জী, উয়ো বাত্‌ মাত কহিয়ে! পুনকো বাস্তে, ধরমকে লিয়ে তো আদমী লোক হিঁয়া আতা হ্যয়!"

মনে মনে বলিলাম, আপনি ভাগ্যবান পুরুষ। আমার মত ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্য নগরীতে যদি জন্মাইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, সেখানে কালীঘাটের মন্দিরে দেওয়ালের গায়েও লেখা আছে, 'পকেটমার হইতে সাবধান'! 'জুতাচোর হইতে সাবধান!'

পাণ্ডাজী এবার আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন, তাঁদের সেই গঙ্গামাঈর রাজত্বে সত্য, ধর্ম ছাড়া আর কিছু নাই। লোকে আর অন্য কিছু বুঝে না, চিন্তা করিতে জানে না।

কথাটির অর্থ তখন সম্যক উপলব্ধি করিতে পারি নাই। সবাই নিজের দেশকে ভাল বলে, বিশেষ করিয়া বিদেশীর কাছে, ভাবিয়া মুচকি হাসিয়াছিলাম। কিন্তু ক্রমশই যত দিন যাইতে লাগিল যেন কে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল তাঁহার কথাটা কতখানি সত্য। মনে আছে, একদিন ভাতের দোকানে ভাত খাইয়া যখন একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিলাম, দোকানী নিজের ক্যাশবাক্স খুলিয়া পয়সাকড়ি গুনিয়া দেখিয়া বলিল, "নেহি হোগা বাবুজী, আব্‌ পিছু দে যাইয়ে!"

নোটটা হাতে লইয়া আর একবার দোকানীর মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইলাম। অদ্ভুত মানুষ তো! আমি একজন বিদেশী যাত্রী, আমাকে সে

চেনে না, জানে না, ইতিপূর্বে কোনদিন চোখে দেখে নাই, কোথায় কোন্ ধর্ম-শালায় উঠিয়াছি তাহাও একবার মুখে প্রশ্ন করিল না, শুধু বলিল পরে দিয়া যাইবেন! কি অদ্ভুত বিশ্বাস! আমি ইচ্ছা করিলেই তো উহাকে একটি পয়সা না দিয়া আজই অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারি। কলিকাতা শহরের কালীঘাটে কি কোন বাঙ্গালী দোকানদার এইরূপ কোন অ-বাঙ্গালী যাত্রীকে এতখানি বিশ্বাস করিতে পারে?

নোটটা ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিতে গিয়া, যখন এমনি কত সব ভাবনা মনের গভীরে তোলাপাড় করিতেছিল, দোকানীটি আর একজনকে ভাত দিতে দিতে হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিল, "যাইয়ে! যব্ খুশি দে যাইয়েগা। আব্ তো বাঙ্গালী হ্যায়!"

বলিলাম, "হাঁ।"

কিন্তু বাসায় ফিরিবার সময় সারা পথ একটি কথাই আমার মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল, বাঙ্গালী বলিয়া আমাকে সে বিশেষ খাতির করিল না, স্বর্গদ্বারের ইহাই নিয়ম, মানুষকে বিশ্বাস করাই ইহাদের ধর্ম। তবে কি পান্ডাজী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্যি!

একদিন বাজারের ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম। হঠাৎ একটা বড় খাবারের দোকান দেখিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। সকাল হইতে খালি পেটে আছি, ক্ষুধাও খুব পাইয়াছিল। সামনে একটা বড় উনানের ওপর প্রকান্ড কড়াইয়ে যে ব্যক্তিটি কচুরি ভাজিতেছিল, কাঁচা শালপাতার দোনায় করিয়া কচুরি, পেঁড়া, হালুয়া প্রভৃতি আনিয়া দিল। খাইবার পর পাতাটা একটি উচ্ছিষ্ট টিনের মধ্যে ফেলিয়া আবার তাহার কাছে ফিরিয়া আসিলাম। অন্য কোন লোকজন দেখিতে না পাইয়া বলিলাম, "ভেইয়া জেরা পানি পিলা দেও।" আমার মুখ হইতে বোধ হয় কথাটি তখনো সম্পূর্ণ বাহির হয় নাই, সেই বিরাটকায় যমদূত-সদৃশ হালোয়াইটি একেবারে মারমুখী হইয়া উঠিল।

জ্বলন্ত কড়াই হইতে তাহার হাতের সেই গরম সাণ্ডাটা উদ্যত করিয়া হুঙ্কার দিয়া বলিল, "কেয়া বোলা?"

ভয়ে আমার বুকটা দুরদুর করিতে লাগিল, কি জানি, বিশুদ্ধ রাষ্ট্রভাষায় কথা বলিতে গিয়া কিছু অপরাধ করিলাম নাকি?

সামনে ফুটন্ত ঘিয়ের বিরাট কড়াইয়ের চারিপাশ দিয়া কাঠের আগুনের শিখা লকলক করিয়া বাহির হইতেছিল। কিন্তু সেই হালোয়াইয়ের চোখ হইতে তখন যে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল তাহার উত্তাপ বোধ করি তার চেয়েও বেশী ছিল। নিমেষে বুঝিবা আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবে, মনে হইতে লাগিল।

আমার কণ্ঠস্বরকে বিকৃত করিয়া সেই লোকটি এবার বলিয়া উঠিল, "পানি পিলা দেও! আব্ হিন্দু হ্যায়, না মুসলমান?"

এতক্ষণে যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল! বুঝিতে পারিলাম আমার অপরাধ

কোনখানে!

লোকটা এবার একটা গ্লাসভর্তি জল আনিয়া আমার সামনে ঠক্ করিয়া বসাইয়া দিয়া মুখ ভেঙাইয়া বলিল, "পা-নি নেহি—বলো গঙ্গাজল!—ইয়ে গঙ্গা মাইকা তীর্থ হ্যায়।"

বাস্তবিক গঙ্গাকে এখানকার লোকেরা যে কতখানি ভক্তিশ্রদ্ধা করে, তার জল কিরূপ পবিত্রভাবে ব্যবহার করে, চোখে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

গঙ্গার দেশে আমরাও বাস করি। গঙ্গার জল ঘড়ায় করিয়া ঠাকুরঘরে তুলিয়া রাখি সারা বছর পূজা-অর্চনা করিবার জন্য। গঙ্গায় ডুব দিয়া, অভাবে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শুদ্ধ হই। কালীঘাটের আদিগঙ্গার থকথকে কর্দমাক্ত ময়লাভাসা জলে কিংবা কলিকাতার ভাগীরথীর পুণ্যসলিলে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীকে ডুব দিয়া 'গঙ্গে চ গোদাবরী' মন্ত্র চোখ বুজিয়া উচ্চারণ করিতে দেখিয়াছি। কাশীর ঘাটেও পুণ্যার্জন করিবার জন্য বিশেষ পর্ব উপলক্ষে ভিড় লক্ষ্য করিয়াছি, কিন্তু ভক্তির দিক হইতে বিচার করিলে, হরিদ্বারের সঙ্গে কাহারো তুলনা হয় না।

গঙ্গাই এ তীর্থের দেবতা। তাই গঙ্গার ধারাকে এখানকার লোকেরা দেবী-জ্ঞানে পূজা করে। শাঁখঘণ্টা বাজাইয়া ব্রহ্মকুণ্ড, যেখানে কথিত আছে, ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে গঙ্গাদেবী প্রথম মাটিতে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই বাঁধানো কুণ্ডের জলকে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়া আরতি করে, ফুল-বিল্বপত্র ধূপধুনা দিয়া পূজা করে।

যাত্রীসাধারণ কাঁচা শালপাতার দোনাভর্তি গোলাপ ফুলের সঙ্গে ছোট্ট একটি ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া, গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়া হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি অর্পণ করে। পাছে মানুষের দেহের কোন ময়লা গঙ্গার সেই পবিত্র দেহকে স্পর্শ করে তার জন্য স্নানার্থীরা সব সময় সতর্ক থাকে।

গঙ্গার জলে সাবান কাচা বা বাসন মাজা শুধু নয়। থুতু-গয়ার ফেলা বা কুলকুচি করিয়া মুখ ধোওয়া বা কোনপ্রকার অশুচি বস্তু নিক্ষেপ করাকে ইহারা পাপকার্য বলিয়া মনে করে।

এই গঙ্গার তীরে তীরে যত সাধু-সন্ন্যাসীদের মঠ, দেবদেবীর মন্দির, মহন্তদের আখড়া। তাহাদের জপতপ ধ্যানধারণা সব কিছু এই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে। ইহার পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া, বেদ-উপনিষদ হইতে মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ যোগী-ঋষিরা প্রতিদিন ইহার জলে ডুব দেয় মাথা নোয়াইয়া। তাই এই গঙ্গার ধারাকে, ইহার জলকে, লোকেরা দেবমূর্তি জ্ঞানে পূজা-আরতি করে।

কেবল পাণ্ডারা নহে, এখানকার স্থানীয় লোকেরাও কেউ এই পুণ্যস্থানে বসবাস করে না। করিতে সাহস পায় না। পাছে সংসার পাতিতে গেলে সংসারের নানারূপ ময়লা আবর্জনা আসিয়া পড়ে গঙ্গার পবিত্র জলে। পাণ্ডারা

এস্থানে বাস করাকে তাই পাপ বলিয়া মনে করে। হরিদ্বারের চৌহদ্দির বাহিরে অনেক দূরে তাহারা স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া সংসারধর্ম পালন করে।

হরিদ্বার বিশেষ করিয়া ব্রহ্মকুণ্ড ও তাহার কাছে কেহ বাস করে না। তাহাদের কাছে ইহা 'স্বর্গদোওয়ার', দেবভূমি!

এখানে তাই মৎস্য, মাংস, মদ প্রভৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ। সবাই এখানে নিরামিষভোজী। এমন কি এই দেবভূমিতে স্বামী-স্ত্রীর সহবাস ইহারা পাপ কার্য বলিয়া মনে করে।

তাই পাণ্ডারা হরিদ্বারের এলাকা ছাড়াইয়া প্রায় মাইল দুই দূরে কন্‌খলের দিকে বাড়িঘর বাঁধিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া সবাই বাস করে। তাহাদের অধিকাংশের গৃহস্থালি ওইখানে। সেইখানেই তাহাদের সংসার-ধর্ম, সেখানেই প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের হিসাবনিকাশ।

এখানে গঙ্গার তাই দুই রূপ। হরিদ্বারে যে গঙ্গার ধারার তপশ্চারিণী পূজারিণীর শুচিশুদ্ধ মূর্তি, কন্‌খলে তাহার অন্যরূপ, যেন গৃহবধূ কল্যাণী ও লক্ষ্মীরূপিণী!

হরিদ্বারে সেইজন্য শত শত ধর্মশালা, বড় বড় অট্টালিকা সব জনশূন্য পড়িয়া থাকে। লোকজন সেখানে বসবাস করে না। বিশেষ পালপার্বণ উপলক্ষে যখন তীর্থযাত্রী হাজার হাজার পুণ্যকামী নরনারীর ভিড় হয় তখন তাহারা সেখানে আশ্রয় পায়। পূজা-অর্চনা ধর্মানুষ্ঠান করিয়া কেহ যেমন 'ত্রিরাত্রি' বাস করে, তেমনি আবার কেহবা একটি রাত কাটাইয়া তীর্থ-দর্শনের পুণ্যটুকু সঞ্চয় করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়।

পাণ্ডাজী বলেন, প্রতি বছর কেদারবদরী দর্শনের সময় খুব ভিড় হয়, তখন একটি ঘরও খালি পড়িয়া থাকে না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে দলে দলে যাত্রীরা আসে এখানে। ধর্মশালাগুলো তখন পূর্ণ হইয়া যায়।

শুনিলাম এইসব ধর্মশালায় থাকিতে নাকি একটি পয়সাও লাগে না, উপরন্তু কম্বল, থালাবাসন, বালতি সব কিছু যাত্রীদের ব্যবহার করিবার জন্য বিনা ভাড়ায় দিবার ব্যবস্থা আছে সর্বত্র। যাহারা সেখান হইতে দুর্গম তীর্থ কেদারনাথ ও বদরীনাথ দর্শনে যায়, তাহাদের এই সুখ-সুবিধাটুকুর জন্য, যাঁহারা এই সব বড় বড় ইমারত বানাইয়াছেন, তাঁহাদের ধারণা ইহাও একপ্রকার পুণ্যকর্ম। ইহাতে তাঁহাদেরও কিছু পুণ্যসঞ্চয় হয়।

মনে মনে বলিলাম, পরমেশ্বর ইহাদের মঙ্গল করুন। এইরূপ বিশ্বাস যেন উহাদের মনে চিরস্থায়ী হয়।

সত্যি সত্যি এই স্থানকে স্বর্গদ্বার বলিয়া উল্লেখ করিয়া পাণ্ডারা যে এতটুকু বাড়াবাড়ি করে নাই, সেই কথাটি এখনো ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে পড়ে। জানি

না, আজ সে স্বর্গদ্বারের কি রূপ, কি চেহারা হইয়াছে, অথচ বেশী দিনের কথা নয়। মনে হইতেছে এই তো সেদিন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দু'তিন বছর আগেকার কথা। শুনিলে হয়ত আজ অনেকে হাসিবেন, বিশ্বাস করিবেন না যে ওখানকার লোকেরা তখনো চা খাইতে শিখে নাই। চা কি বস্তু তাহারা জানিত না। উহার নাম পর্যন্ত শোনে নাই। তাই ওই পানীয় দ্রব্যটি কেবল দুষ্প্রাপ্য নয় ওখানে প্রবেশাধিকারও পায় নাই।

বেশ মনে আছে, এক পেয়ালা চায়ের জন্য সারা হরিদ্বার ঢুঁড়িয়া ফেলিয়াছিলাম, কিন্তু কোথাও একফোঁটা চা চোখে দেখি নাই। ওখানে বড় বড় বিলিতী চা কোম্পানীর দৃষ্টি কেন সেদিন পড়ে নাই তখন বুঝি নাই। কিন্তু এখন বুঝি, ওই সব সাধুসন্ন্যাসী যাঁরা গাঁজা, গুলি, সিদ্ধিতে চরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, গরম জলে সিদ্ধ চায়ের পাতার রস তাহাদের জিহ্বায় এতটুকু সুড়সুড়িও দিতে পারিবে না ভাবিয়া বোধ হয় ওখানের রাস্তায়, ঘাটে সর্বত্র চায়ের বদলে দুধের দোকান ছিল। লম্বা ধরনের মোরাদাবাদী গ্লাসে দোকানী সামনের প্রকাণ্ড কড়াই হইতে ফুটন্ত দুধ তুলিয়া লইয়া প্রশ্ন করিত, "মিঠা, আউর ফিকা—", অর্থাৎ চিনি দিতে হইবে কি হইবে না! ওখানকার অধিকাংশ লোকেই ফিকা দুধ পছন্দ করিত। তবে মিষ্টি দুধ চাহিলে চামচ করিয়া 'শক্‌কর' সেই দুধের পাত্রে ফেলিয়া দুইটি মগে অনেকক্ষণ ধরিয়া ফেটাইয়া তারপর ফেনাসমেত দুধের গ্লাসটা গ্রাহকের হাতে তুলিয়া দিত। রাস্তায় দাঁড়াইয়া সেই ঈষদুষ্ণ দুধের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে সেদিন ওখানকার লোকেরা চায়ের চেয়েও বোধ করি বেশী তৃপ্তিলাভ করিত।

আমি কলকাতা শহরে মানুষ। ভোরবেলা উঠিয়া আগে চায়ের সংগে একখানা লেড়োবিস্কুট খাওয়া অভ্যাস। তাই চায়ের অভাবে খুবই কষ্ট পাইতাম সন্দেহ নাই।

শেষে একদিন পাণ্ডাজীকে প্রশ্ন করিলাম, "এখানে কি কোথাও চায়ের দোকান নাই? চা পাওয়া যায় না?"

তিনি জিভ কাটিয়া উত্তর দিলেন, "ইয়ে তো স্বর্গদোওয়ার হ্যায় জী! চা এখানে কেউ খায় না। ও বহুত বুরা চীজ হ্যায়—অর্থাৎ খুব খারাপ জিনিস চা,—শুনেছি ও খেলে নাকি শরীরের সব তাগত নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের অকাল-মৃত্যু ডেকে আনে।"

ঈষৎ হাসিয়া জবাব দিলাম, "ঠিকই শুনেছেন। তবে এখানে যা হাড়-কাঁপানো শীত ওই গরম দুধে যে শানায় না। তাছাড়া ও তো খাদ্য, আমাদের কলকাতার লোকের নাড়ীতে এখানকার ওই খাঁটি দুধ যে সহ্য হয় না।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে মুহূর্ত কয়েক তাকাইয়া পাণ্ডাজী কহিলেন। "ইয়ে তো স্বর্গদোওয়ার হ্যায় জী। এখানে কোন অসুখ বা রোগ নেই। স্রেফ্ গরম দুধ পিকে ইধার উধার ঘুমিয়ে, তবিয়ৎ আচ্ছা বন যায়েগা।"

পাণ্ডাজীর কথামত দুধ খাইতে গিয়া আর এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। একপোয়া গরম দুধ চাহিলে দোকানী খপ্ করিয়া সামনের যে বিরাট কড়াইয়ে দুধ ফুটিতেছিল, তাহাতে একটা লোহার রডের মুখে বাঁধা পিতলের পোয়া ঘটি ডুবাইয়া যখন আর একটা মগের মধ্যে ঢালিতে যাইতে-ছিল, হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, "ইয়ে তো গাইকা দুধ হ্যায় ?"

"নেহি জী! ইয়ে তো ভৈঁইসা কা হ্যায়!"

"তাই নাকি! তাহলে থাক।" বলিবার সঙ্গে সঙ্গে দোকানী হাত নামাইয়া অদূরে আর একটি দোকান দেখাইয়া বলিল, "গোরুর দুধ ওই দোকানে মিলিবে। ওখানে যান।"

দোকানীর এই ভদ্র আচরণে আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। আমি তাহার জিনিস লইলাম না বলিয়া একবারও মুখ বেজার করিল না, এমন কি আমাকে মিথ্যা বলিয়া ওই মহিষের দুধকে গোরুর দুধ বলিয়া একবারও চালাইবার চেষ্টা করিল না, উপরন্তু তাহারই প্রতিদ্বন্দ্বী সমব্যবসায়ীর নিকট আমাকে পাঠাইয়া দিল।

এ সততাও কি তাহা হইলে স্বর্গদোওয়ারের ব্যবসায়ী বলিয়া! পাণ্ডাজীর কথাটাই আবার আমার কাছে ধ্বনিত হইয়া উঠিল, 'ইয়ে তো স্বর্গদোওয়ার হ্যায় জী!'

ঠিক অনুরূপ ঘটনা আর একদিন ঘটিয়াছিল। বড় বড় কচুরি ও পুরী ভাজা হইতেছে দেখিয়া সেই দোকানটিতে গিয়া দুখানি পুরী ও দুখানি কচুরির অর্ডার দিয়া তারপর হাত বাড়াইয়া লইবার সময় যেমন প্রশ্ন করিলাম, "ইয়ে তো ঘিউ কা ভাজা হুয়া জী?"

"নেহি জী। ইসমে ঘিউ, বাদামতেল মিশাল হ্যায়।"

হাতটা নামাইয়া ইতস্তত করিতেছি, কি বলিব। এমন সময়, সে নিজেই বলিয়া উঠিল, "আব্ কেয়া শুদ্ধ্ ঘিউকা মাঙ্তে, যাইয়ে উয়ো দোকানমে!" বলিয়া আর একটি দোকান নিকটেই দেখাইয়া দিল।

জানি না, এইরূপ সততা অন্য কোন তীর্থস্থানে দুধ ও মিঠাইওলার মধ্যে আর কেহ কখনো দেখিয়াছেন কিনা। আমি তো দেখি নাই। উহাই প্রথম এবং শেষ। তাই এখনো মন কাঁদে সেখানে যাইবার জন্য। মধ্যে মধ্যে পাণ্ডাজীর সেই কথাটি মনে পড়িয়া যায়, 'ইয়ে তো স্বর্গদোওয়ার হ্যায় জী!'

ওই স্থানটি স্বর্গদ্বার বলিয়া বোধ হয় মানুষ তাহার কামক্রোধ, লোভ, লালসা, কামনা, বাসনা সব কিছু পরিত্যাগ করিয়াছে, নহিলে বুঝি স্বর্গে ঢুকিবার প্রবেশপত্র মিলিবে না। কে জানে!

ভাবিতে লাগিলাম। তাই কি ইহার চতুর্দিকে শুধু ত্যাগ, শুধু কৃচ্ছ্র-সাধন! বিলাস-ব্যসনের কোন চিহ্ন পথেঘাটে কোথাও নাই। চতুর্দিকে এত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, সত্যি কথা বলিতে কি একদিনও নজরে পড়ে নাই সেরকম

কিছু।

ব্রহ্মকুণ্ডে যাইবার পথে, দুধারে সারি সারি যত সব দোকান। তাহার কোনটাতেই কোনো বিলাস-ব্যসনের বস্তু দেখি নাই। শুধু কম্বল, লাঠি, খড়ম, কমণ্ডলু, রুদ্রাক্ষ, পাথরের জিনিসপত্র, বৈরাগীর গেরুয়া বস্ত্রর দোকান। একটির পর একটি। দুধ মিঠাই প্রভৃতি খাবারের দোকানের সংখ্যাই অধিক। গাড়োয়ালী ও কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের ভাতের হোটেল আছে কয়েকটি। গঙ্গার জলে রান্না করা ফুরফুরে সুগন্ধ দেরাদুন আতপ তণ্ডুলের ভাতের সঙ্গে ডাল, আর একটা কিছু 'ভাজি'। ব্যস্। খাদ্যের বাহুল্য কোথাও নাই। যতটুকু প্রয়োজন জীবনধারণের জন্য, তাহার অতিরিক্ত কিছু নাই। আবার তেমনি রুটির দোকানও আছে। ওই রকম অনাড়ম্বর বাহুল্যবর্জিত।

সেদিন সমস্ত জায়গাটা জুড়িয়া একটা বৈরাগ্যের আবহাওয়া যেন। ভোর হইতে না হইতে ঘুম ভাঙিয়া যায়, ব্রহ্মচারী কিশোর বালক-বৃন্দের কণ্ঠনিঃসৃত স্তোত্রগানে—

'মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গার হারাবলি
স্বর্গারোহণ বৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।'

গুরুকুল হইতে এই বালকের দল ওই হাড়ভাঙা শীতে, উত্তরীয় গায়ে, নেংটি পরিয়া, একটুকরা কম্বলের আসন বগলে লইয়া, খালিপায়ে এই দীর্ঘপথ পদব্রজে মুখে গঙ্গার স্তব করিতে করিতে আসিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের বরফশীতল সলিলে অবগাহন স্নান করিত এবং পুনরায় যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে, তেমনি গান গাহিয়া আশ্রমে ফিরিয়া যাইত। ব্রহ্মকুণ্ড হইতে ইহার দূরত্ব কম ছিল না। বোধ হয় দুই মাইলেরও কিঞ্চিৎ অধিক। শৈশব হইতেই বৈরাগ্য ত্যাগের শিক্ষালাভ করে তাহারা এইভাবে।

এই সময় মন্দিরে মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি হইতে থাকে। দেবতাদের বুঝি ঘুমভাঙানি আরতি শুরু হয়।

নির্জন গঙ্গার তীর। ঘাটে ঘাটে তখনো অন্ধকার! ওপারে শিবালিক পর্বতশ্রেণীর তরঙ্গশীর্ষে ক্ষীণ-অস্ফুট আলোর রেখা যেন মনে হয় ধ্যানমগ্ন গিরিরাজের ওষ্ঠপ্রান্তে রহস্যময় হাসির মত। অনেকক্ষণ অন্ধকারের ভিতর চাহিয়া থাকিলে তবে তাহা চোখে পড়ে। ঠিক সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে সাধুসন্ন্যাসীবৃন্দ এঘাটে ওঘাটে স্নান সারিয়া জপতপে বসেন। সম্মুখে উপলখণ্ডমুখর গঙ্গার বুকে ওঠে অনন্ত ওংকারধ্বনি। দূরে গঙ্গার ওপারের চণ্ডীপাহাড়ের মাথায় চণ্ডীদেবীর শ্বেতবর্ণ মন্দিরগাত্রে প্রভাতের প্রথম রক্তিম আভা ধীরে ধীরে যখন উজ্জ্বল হইতে থাকে এবং একটি দুইটি করিয়া তারা সারারাত্রি জাগিয়া, যাহারা তখনো আকাশের বুকে ঘুমন্ত চোখেও পাহারা দিতেছিল মিটিমিটি করিয়া, তাহারা একে একে বিদায় লইতেই, প্রভাতের জয়যাত্রা শুরু হয়। প্রচণ্ড শীতের কনকনে হিমেল হাওয়ায় দেহের মধ্যে অস্থিগুলোকে পর্যন্ত যেন নাড়া দিয়া কাঁপাইতে থাকে।

তাই সকাল হইলেও দোকানপাট তখনো থাকে বন্ধ। পথেঘাটে লোকজন হাঁটে না। শুধু সেই নির্জন নিস্তব্ধ প্রকৃতির মধ্যে পুণ্যলোভাতুর স্বল্প-সংখ্যক নরনারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, "নীলধারা কী জয়! গঙ্গামাইকী জয়!"

॥ তিন ॥

বাস্তবিকপক্ষে তীর্থস্থান বলিতে কি বুঝায়, হরিদ্বারে না আসিলে যেন কিছুতেই এমনভাবে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না।

তেমনি ভারতবর্ষের অধ্যাত্মরূপ বলিতে কি বুঝায় নিজের চোখে তাহা যেমন প্রত্যক্ষ করা যায় এইখানে, তেমনটি আর কোথাও দেখি নাই। কেন জানি না, অন্য তীর্থে গেলে মনে হয় সেখানে যেন দেবতা বন্দী হইয়া আছেন, ওই সব বৃহদাকৃতি প্রস্তর-নির্মিত অন্ধকার মন্দির-গহ্বরে।

কেবল এখানেই একমাত্র তাহার ব্যতিক্রম।

এখানের যিনি দেবতা তাঁর মন্দির ওই চির উন্মুক্ত, অনন্ত উদার আকাশ। সে মন্দিরের চূড়া এক নয় একাধিক, শূন্যদিগন্তে তরঙ্গায়িত। সূর্য-চন্দ্রের উদয়-অস্তের কনকমুকুট তাহাদের শিরে চিরভাস্বর। তিনি শুধু হিমালয়ের শিলাসনে ধ্যানমগ্ন নিশ্চল, নির্বাক প্রস্তরখণ্ডে নির্মিত পাষাণমূর্তি নন, তাঁহার অপার করুণা ওই গঙ্গার স্বচ্ছ সলিলে নীলধারার কুলুকুলু ধ্বনিতে চিরপ্রবহমাণ। তাঁর সে পবিত্র চরণামৃত পানে যেন সকলের দেহ-মন পূত শুদ্ধ। একই দেবতার দেউলে যেন সবাই সমবেত হইয়াছে। সকলে একই তীর্থের যাত্রী, যে তীর্থের ধর্ম—প্রেম, ভালবাসা, সত্যবাদিতা।

এর কিছুদিন পরে হঠাৎ এমন একটি ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটিতে দেখিলাম, যাহা হইতে পাণ্ডাজীর ওই কথাটির সত্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলাম। গঙ্গামায়ীর রাজত্বে রুটির অভাব কারো হয় না, তিনি বলিয়া-ছিলেন কেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। হয়ত অন্য কাহারো মুখে শুনিলে কিছুতেই বিশবাস করিতে পারিতাম না। ইহা কি কখনো সম্ভব? এমন স্থান কি আজকের দিনেও থাকা সম্ভব?

সাধু-সন্ন্যাসীদের গোপন আস্তানার সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম। তাই ঘুরিতে ঘুরিতে কতখানি যে বেলা হইয়াছে ঠাওর করিতে পারি নাই। সকাল হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় ধর্মশালায় ফিরিবার কোন তাগিদও ছিল না। বেড়াইতে বেশ ভাল লাগিতেছিল। নিরঞ্জনী আখড়ার অভ্যন্তরে ঢুকিয়া বাগান বাগিচা মন্দির সাধু-সন্ন্যাসীদের আস্তানা সব ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিলাম, এমন সময় ঢং ঢং করিয়া বেল বাজিয়া উঠিল। ঘণ্টার আওয়াজ ঠিক স্কুলের পেটাঘড়ির মত। বারোটা যে বাজিয়াছে, একটা ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে দেখিলাম। কিন্তু এই ঘণ্টার সঙ্গে যে ভোজনের সম্পর্ক জড়িত তাহা আগে

বুঝি নাই। দেখিলাম সামনে যে বড় ইঁদারা এবং তাহার পাশে যে লম্বা টানা বারান্দা, ঝুপঝুপ করিয়া এক-একজন লোক আসিয়া সেখানে পিতলের থালা ও গেলাস বসাইয়া যাইতেছে। ওই থালা ও গেলাসগুলি আখড়ার সম্পত্তি—ইঁদারা ও বারান্দার সংলগ্ন একটি চাতালের মত উঁচু জায়গায় স্তূপীকৃত করা ছিল। সব চেয়ে অবাক লাগিল কিন্তু যাহারা একে একে আসিয়া একটি থালা ও একটি গেলাস তুলিয়া লইয়া বসিতেছিল, তাহারা কেহই আশ্রমবাসী নহে। আশেপাশে, বাগানের এদিকে-ওদিকে এতক্ষণ যাহাদের দেখিতেছিলাম এবং আমার মত আরো দুই-চারিজন, যাহারা এই আখড়ায় বহিরাগত দর্শক, তাহারাও কালবিলম্ব না করিয়া পংক্তিভোজনে বসিয়া গেল। খোলা ফটকের ভিতর দিয়াও আসিল বেশ কিছু বাহিরের লোক।

একজন আমার দিকে তাকাইয়া বলিল, "আপ ভোজন নেহি করেংগে?"

বলা বাহুল্য বিনা বাক্যব্যয়ে আমিও পূর্ববর্তীদের পন্থা অনুসরণ করিলাম। সেই বিরাট দীর্ঘ বারান্দাটার অর্ধেকও তখন ভরে নাই। আখড়ার সাধু মহন্তরা এবার একে একে আসিয়া শুধু সেই বারান্দাটা ভর্তি করিলেন না, পাশের আরো একটি ছোট রক ওইভাবে থালা-গেলাস লইয়া ভরাইয়া তুলিলেন।

এইভাবে শুরু হইল ভোজনপর্ব।

প্রথমে বিরাটকায় এক পুরুষ, বিরাট একটি জলপাত্র লইয়া আসিয়া প্রত্যেকটি গ্লাস যেমন ভরিয়া দিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রহস্তে আর এক ব্যক্তি একটি প্রকাণ্ড ঝুড়ি হইতে দুইখানি করিয়া ঘি-মাখানো বড় সাইজের রুটি প্রত্যেকের থালায় ফেলিয়া দিতে দিতে যেন ছুটিয়া চলিল। অমনি তাহার পিছনে পিছনে আর একজন বড় বালতি করিয়া ডাল দিতে আসিল। বড় গর্তযুক্ত হাতা ডুবাইয়া এক এক হাতা অড়হর ডাল দিতে লাগিল। ডাল রুটি খাওয়া শেষ হইবার পূর্বেই দেখা দিল ভাতের বড় গামলা লইয়া এক ব্যক্তি আগে আগে চলিয়াছে, আর একজন বড় সাণ্ডা করিয়া এক সাণ্ডা ভর্তি ভাত তুলিয়া প্রত্যেকের পাতে দিতেছে। ভাত দেওয়া শেষ হইলে, আলুকা-শাক অর্থাৎ শুধু আলুর একটা ঝোলানি মত তরকারি, এক এক হাতা প্রত্যেককে বণ্টন করিতে করিতে আবার একজন চলিয়া গেল।

অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। আমি উহার অর্ধেকও খাইয়া শেষ করিতে পারিলাম না। অথচ আমার আশেপাশেব বহু ব্যক্তি কেবল সব চাটিয়া-পুটিয়া খাইল না, কেহ কেহ আরো একখানি দুখানি রুটি, কেহ বা আর একবার ভাত চাহিয়া লইল।

এইভাবে ভোজনপর্ব শেষ হইলে, প্রত্যেককে তাহার এঁটো থালা এবং গ্লাসটি মাজিয়া ধুইয়া ঠিক যেখানে যেমন গোছ করা ছিল, আবার তেমনিভাবে সেখানে রাখিয়া যাইতে হইবে—ইহাই ছিল আখড়ার নিয়ম। তাহা ছাড়া ওখানে কেহ কাহারো 'ঝুটা' ছোঁয় না। এঁটো সম্বন্ধে ওদেশের লোকেরা বড্ড

বেশী আচারপরায়ণ।

বিরাট সেই ইন্দারার পাশে কয়েকটি বড় বড় চৌবাচ্চার সঙ্গে সারি সারি কল লাগানো। যার যখনই খাওয়া শেষ হইতেছে, সে তখনি সেখানে গিয়া থালা গেলাস মাজিয়া যথাস্থানে রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে। সমস্ত ব্যাপারটা যেন যন্ত্রচালিতের মত ঘটিতেছে। কোথাও হৈ-চৈ, গণ্ডগোল নাই, টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নাই।

বাহিরে আসিয়া একজনকে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম যে কেবল ওই একটি আখড়ায় নয়, ওখানে আরো যেসব বড় বড় মঠ-মন্দির ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আখড়া রহিয়াছে সর্বত্রই নাকি একই নিয়ম। যে কোন ব্যক্তি, খাওয়ার ঘণ্টা বাজিলে, আসিলেই বিনা খরচে খাইতে পাইবে। কেহ একটি প্রশ্ন পর্যন্ত করিবে না। জানিতে চাহিবে না তুমি কে, কেন আসিয়াছ, কোথায় থাক ইত্যাদি। তুমি মানুষ, ভগবানের সৃষ্ট জীব এই পরিচয়ই যথেষ্ট।

ঠাকুর ভোগ খাইবেন, আর তুমি না খাইয়া থাকিবে, তাহা হইলে ঈশ্বর কি তুষ্ট হইবেন! এই মনোভাব এক জায়গায় নয়, আরো বহু মঠ ও আখড়ায় ভোগের সময় গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ভারতবর্ষের সর্ব সম্প্রদায়ের মঠ ও আখড়া বোধ হয় ওখানে আছে। উদাসী, নির্বাণী, নিরঞ্জনী, আচারী, প্রভৃতি আরো যাহাদের নাম আমি জানি না। রাস্তায় বাহির হইলে চোখে পড়ে সাধুদের এক এক সম্প্রদায়ের এক এক রকম বেশভূষা। তবে খাদ্যের তালিকা ওই। শুধু ভাত ডাল আর তাহার সঙ্গে একটা শাক অর্থাৎ ভেজিটেবলের তরকারি। মাছ মাংস ওখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ, কেবল হরিদ্বার নয়, কন্‌খল, জোয়ালাপুর, লছমনঝোলা, স্বর্গদ্বার পর্যন্ত কোথাও আমিষের নামগন্ধ নাই, সর্বত্রই নিরামিষভোজী।

সেদিন আমিষ-নিরামিষের মধ্যে যে কোন প্রভেদ আছে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। বিনা খরচে যদি প্রতিদিন পেট পুরিয়া খাইতে পাওয়া যায়, তাহার চেয়ে বেশী আর কি চাই। বিশেষ করিয়া আমার মত নিঃসম্বল ও বেকার ব্যক্তির কাছে আত্মীয়-স্বজনশূন্য সেই অজ্ঞাত অপরিচিত স্থানে ইহাকে ঈশ্বরের মহাশীর্বাদ বলিয়া মনে হইল।

গঙ্গামাঈর রাজত্বে কেহ যে অভুক্ত থাকে না, রুটি তাহার মিলিবেই মিলিবে, পাণ্ডাজীর সেই উক্তিটি প্রতিদিন মধ্যাহ্নে একবার করিয়া স্মরণ করিতাম।

পাণ্ডাজী বা তাঁহার ছড়িদার ঈশ্বরলাল কেহই জানিত না যে আমি আহারপর্ব এইভাবে বিনা পয়সায় সারি। তাঁহাদের ধারণা ছিল, আমি বাজারে যেসব কাশ্মীরী হোটেল ছিল সেখান হইতেই প্রতিদিন খাইয়া ধর্মশালায় ফিরি।

কিন্তু সেদিন একেবারে পাণ্ডাজীর সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল। ভীমগোড়ার কাছে এক আখড়ায় সবে খাইতে শুরু করিয়াছি, দেখি সহসা

পাণ্ডাজী মহন্তর সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে সামনের একটি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

বোধ হয় আমাকে ওইভাবে দশজন রবাহূতের সঙ্গে আহার করিতে দেখিবেন তিনি আশা করেন নাই। তাই প্রথমটা আমার মুখের দিকে তাকাইয়া তাঁহার চোখের পলক যেন নিমেষে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। কিন্তু সে মাত্র কয়েকটা মুহূর্তের জন্য। তারপর মুখে তেমনি সরল হাসি টানিয়া বলিলেন, "আরামসে ভোজন করিয়ে, ইয়ে গঙ্গামাঈকী স্থান হ্যায়, ইয়ে হ্যায় স্বর্গদোওয়ার!"

ভাবিয়াছিলাম পাণ্ডাজীর মনে আমার সম্বন্ধে যেটুকু উচ্চ ধারণা ছিল, আজ হইতে তাহা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ তিনি। পরের দিনও আবার যথারীতি 'হর-কী-প্যারী' যাইবার পথে আমার ঘরে ঢুকিয়া আমার আর কোন অসুবিধা হইতেছে কিনা আগের মতই দরদের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

॥ চার ॥

এইভাবে যখন পুরা দুইটি মাস কাটিয়া গেল, তখন হঠাৎ একদিন আমি অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। প্রবল জ্বরের সঙ্গে সর্দিকাশি ও বুক-পিঠে দারুণ যন্ত্রণা। পাণ্ডাজী ডাক্তারকে খবর পাঠাইলেন।

ডাক্তার আসিয়া বুক-পিঠ পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "নিউমোনিয়া। খুব সাবধানে না রাখলে জীবনসংশয় হতে পারে।"

পাণ্ডাজী আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া তখনি একটা টাঙা আনাইয়া তুলিয়া লইয়া তাঁহার কনখলের বাড়িতে চলিয়া আসিলেন।

সুন্দর একটি বৈঠকখানা ঘর রাস্তার একেবারে উপরে, অথচ অন্দরমহলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। সেখানে একটি নেয়ারের খাটিয়ায় আমাকে শোয়াইয়া তিনি ভিতর হইতে একটি মহিলাকে ডাকিয়া আনিলেন।

ধবধবে সুন্দর চেহারার এক বিধবা, বয়স বোধ হয় চল্লিশের বেশী হইবে না, মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বিধবার রূপ এরকম শুচিশুভ্র পবিত্র ইতিপূর্বে আমি কখনো দেখি নাই। যেমন টানা টানা ফালা-করা চোখ, তেমনি নাক-মুখ, মুক্তার পাতার মত সাজানো দাঁত। গলায় একটা কালোরঙের কার, তার সঙ্গে ছোট একটা চৌকা পিতলের চাকতি বাঁধা। কোমরটা যেন ঈষৎ ভাঙা, তাই সহজভাবে সোজা হাঁটিতে পারেন না। চলিবার সময় সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়া হাঁটেন। ওই ধবধবে মার্বেল পাথরের মত মুখে, ভ্রমরকৃষ্ণ কুচকুচে কালো টানা ভ্রূর নীচে যাহাকে বলে পদ্মপলাশলোচন দুটি চোখ। অপূর্ব মহিমময়ী সে রূপ। কথা বলিবার আগে, তাঁহার চোখের উপর যেন মুখটা জড়াইয়া যায়।

পান্ডাজী বলিলেন, "বাবুজী, ইয়ে হামারা মাতাজী।"

তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে নামিয়া যেমন তাঁহার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিতে গেলাম, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মাত উঠিয়ে বেটা, শো রহ্।"

তারপর হিন্দীর সঙ্গে বাংলা মিশাইয়া বলিলেন, "অসুখ করলে নমস্কার করতে নেই কাকেও। থাক্।" বলিয়া পা সরাইয়া লইতে গিয়া পুনরায় কহিলেন, "কোন ভয় নেই বেটা। আমরা রয়েছি। তোমার অসুখ শিগ্‌গিরই ভালো হয়ে যাবে।"

সত্যি আমি একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম। ইহার পর তিন চার সপ্তাহ ধরিয়া ডাক্তার, ওষুধ, ইনজেকশন, ইত্যাদি চলিবার পর যখন প্রায় দুইশত টাকা পান্ডাজীর খরচ হইয়া গেল তখন একদিন তাঁহাকে বলিলাম, "আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিন, এত টাকা কেন আমার জন্যে মিছে ব্যয় করছেন!"

পান্ডাজী এবার চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "হাসপাতালটা গরীব-দুঃখী, যাদের কেউ নেই, তাদের জন্য। সেখানে আপনি গিয়ে একজন গরীবকে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করবেন কেন?"

বলিলাম, "আমিও তো গরীব!"

পান্ডাজী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "তা হতে পারে। কিন্তু আপ্ হামারা যজমান হ্যায়। আপনার জন্যে তো আমি রয়েছি। যাদের কেউ নেই, তাদের কথা ভাবুন তো!"

এরপর আর কোন কথা আমার মুখ দিয়া সরিল না। চুপ করিয়া গেলাম।

প্রত্যেক দিন পান্ডাজী চলিয়া গেলে দুপুরে তাঁর মাতাজী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "আজ কেমন আছো বেটা!"

একদিন "খুব ভাল আছি মাজী" বলিলে, তিনি কহিলেন, "যাক, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। সবই গঙ্গামায়ীর কৃপা, নইলে তুমি যে এত তাড়াতাড়ি এমনধারা সুস্থ হয়ে উঠবে, কল্পনা করতে পারিনি।"

কৃতজ্ঞতায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। বলিলাম, "আপনাদের এ ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না।"

"ছিঃ বেটা, ওকথা বলতে নেই। ঋণ আবার কি! তুমি আমার যজমান, আমার ছেলের মত! তোমার বিপদ তো আমারই বিপদ!"

বলিয়া বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী ভাষায় আবার কহিলেন, "সেবার এক যজমান তাঁর থাইসিস রুগী মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন। ঠান্ডা লেগে এমন বেড়ে গেল যে, মুখ দিয়ে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগল। আমার ছেলে, তোমার পান্ডাজী, নিজের দু'হাত দিয়ে সেই রক্ত সাফ করে, তার সেবা-শুশ্রূষা করেছিল পুরো এক বছর ধরে। কিন্তু বাঁচলো না, মা গঙ্গা তাকে নিজের কাছে টেনে নিলেন।"

"তাই নাকি?"

"হাঁ বেটা, এই ঘরে সেই মেয়েটি ছিল। আমার বেটা কাউকে এ ঘরে ঢুকতে দেয়নি। একাই তার সেবা করেছিল। কত লোক নিষেধ করলে, ও কালব্যাধি ছুঁলেই তোমার হবে, তুমি ওকে ঘর থেকে দূর করে দাও। কিন্তু আমার ছেলের মুখে সেই এক কথা, যজমান আমার পর নয়। নিজের মেয়ের মত। মানুষের সেবা মানেই তো ঈশ্বরের সেবা করা।"

দপ করিয়া আমার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল পাণ্ডাজীর সেই চওড়া বুকের ছাতিটা। মনে পড়িল একসঙ্গে আড়াই-তিন-সের দুধ খাওয়ার কথা। পরে একদিন দেখিয়াছিলাম, দুই হাতে দুইটা মহিষ লইয়া সেই খরস্রোতা গঙ্গার জলে একাকী নাওয়াইতেছেন। কেবল দৈহিক শক্তি নয়। মানসিক দৃঢ়তাও তাঁহার ছিল অসাধারণ। তাই কোন কিছু পরোয়া করিতেন না।

সত্যি সত্যি ওই যক্ষ্মারুগীর সেবা যে দীর্ঘদিন করিয়াছিল, তাহার ধারে কাছে কোনদিন কোন রোগ-ব্যাধি ঘেঁষিতে পারে নাই। অটুট স্বাস্থ্যে ঝলমল করিত পাণ্ডাজীর দেহ। তাঁহার সেই অটুট স্বাস্থ্য ও পালোয়ানের মত জোরালো চেহারা দেখিয়া ভয়ে বুঝি রোগও তাঁর ধারেকাছে আসিতে পারিত না।

এ কোথায় আসিলাম!

এ যেন এক ভিন্ন রাজ্য। এ মর্তভূমি নয়, অপ্সরার দেশ। পথেঘাটে যেখানে যে মেয়ে চোখে পড়ে সবাই সুন্দরী, রূপসী। পাণ্ডারা অধিকাংশ গাড়োয়ালী ও কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ।

অদ্ভুত রূপ এখানকার মেয়েদের, বিশেষ করিয়া পাণ্ডাজীর ঘরের ভিতরে চাঁদের হাট যেন। এঁদের অধিকাংশই কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ।

যেমন মা, তেমনি মেয়ে, তেমনি পাণ্ডাজীর স্ত্রী ওঁরা খুবই পর্দানসীন। বোধ হয় আমি একটা পরদেশী, তায় যুবক বলিয়া আমার সামনে পাণ্ডাজীর স্ত্রী বা বহিন্ বাহির হইতেন না। যদিও জানালার ফাঁক দিয়া তাঁহাদের রোজই দেখিতে পাইতাম। কি আশ্চর্য কল্পনাতীত রূপ সামান্য পাণ্ডার ঘরে, ভাবিতে যেন দেহ রোমাঞ্চিত হইত। আমি বাংলা দেশের শহরে ও গ্রামে অনেক মেয়ে দেখিয়াছি, কিন্তু এঁদের রূপের সঙ্গে কাহারও তুলনা হয় না। পাণ্ডাজীর পরিবারের অন্য সব মেয়েদের দেখিয়া মনে হইত, উহারা সত্যি সত্যি এ মর্তভূমির মানুষ নহে। অপ্সরার দেশে যেন তাহারা জন্মিয়াছে। দেহের বর্ণনা কি দিব! দুধে-আলতায়-গোলা যেমন গাত্রবর্ণ, তেমনিই দুই গালে যেন বসরাই গুল্ ফুটিয়া আছে সর্বদা, মেয়েদের এত রূপ কল্পনা করা যায় না।

পাণ্ডাজীর স্ত্রী ভগ্নী ও কন্যারা কেহই আমার সম্মুখে আসিতেন না। কিন্তু ভিতর হইতে তাঁহাদের অদৃশ্য হস্তের সেবা-যত্নের কোনদিন ত্রুটি হয় নাই। বৈঠকখানার সংলগ্ন ভিতরের বারান্দায় ঠিক ঠিক সময়ে ঘড়ির কাঁটা

মিলাইয়া আমার পথ্য—কখনো গৃহজাত টাটকা ঘোল, কখনো গরম দুধ, কখনো ছানা প্রভৃতি চোখ খুলিয়া দেখিতাম হাজির। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা কখনো ইহার ব্যতিক্রম দেখি নাই।

পাণ্ডাজীর মাতাজী মধ্যে মধ্যে আমার ঘরে আসিয়া আমার সঙ্গে দু-চার দণ্ড গল্প করিয়া চলিয়া যাইতেন।

অন্নপথ্য করিবার পর একদিন পাণ্ডাজীকে বলিলাম, "পাণ্ডাজী, তীর্থস্থানে কোন ঋণ রাখতে নেই। কত কি খরচপত্র হলো যদি বলেন, তাহলে চেষ্টা করবো কোন না কোন দিন শোধ দিতে।"

পাণ্ডাজী বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "ঋণ! আপনি তো আমার কাছ থেকে কোন টাকাকড়ি ধার নেননি! আপনি আমার যজমান—বিদেশে আপনাকে আমার সর্বতোভাবে রক্ষা করা কর্তব্য। কাজেই যদি কিছু করে থাকি, তা সে পাণ্ডার ধর্মপালন করেছি।"

এই বলিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তারপর তাঁহার সেই ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফরাজির প্রান্তদেশ একবার চট করিয়া চুমরাইয়া লইয়া বলিলেন, "কৈ ফিকির নেহি! গঙ্গামাঈ কী কৃপামে আপ্ আরাম হো গিয়া, যো খুশি একরোজ গঙ্গাজীকে পূজা দে দেনা! আচ্ছা?"

কৃতকৃতার্থ হইয়া বলিলাম, "তাই হবে!"

পথ্য করিয়া যখন বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছি, তখন বলিলাম, "এবার ধর্মশালায় যাবো পাণ্ডাজী, আর এখানে আপনাদের কষ্ট দেবো না।"

কিন্তু তিনি ঘাড় নাড়িলেন। বলিলেন, "আরো কিছুদিন থাকিয়া ভাল করিয়া সুস্থ হইলে, তারপর যাইবেন।"

অগত্যা থাকিতে হইল। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ লক্ষ্য করিতেছিলাম, দুপুরবেলা যেন কিসের একটা তর্ক গোলমাল ঝগড়া হয় ভিতরে। মহিলাদের তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বরে হঠাৎ দিবানিদ্রা ভাঙিয়া যায়।

একদিন চুপি চুপি ভিতরের দরজার কাছে গিয়া কান পাতিয়া রহিলাম। ব্যাপার কি!

ব্যাপার যতটুকু তাহাদের ভাষা হইতে উদ্ধার করিতে পারিলাম তাহাতে আমার হৃদস্পন্দন শুরু হইয়া গেল। অর্থাৎ ঝগড়াটার কেন্দ্রস্থল আমি। পাণ্ডাজীর যে রূপসী বিধবা ভগ্নীটি অলক্ষ্য হইতে আমার সেবা করিত, আমার সঙ্গে নাকি তাহার একটা গোপন প্রণয়সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন স্বয়ং পাণ্ডাজীর স্ত্রী। কয়েকদিন গভীর রাত্রে তিনি নাকি ললিতাকে দেখিয়াছেন, অন্ধকারে আমায় জানলার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে।

সব চেয়ে আশ্চর্য ললিতা উহা অস্বীকার করিতেছে না। বরং বলিতেছে, একজন লোক রোগের জ্বালায় ছটফট করিতেছে শুনিয়া সে স্থির থাকিতে পারে নাই। যদি কোন কিছু দরকার হয়, তাই ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া গিয়াছিল।

কিন্তু তাহার ঘরের মধ্যে তো যায় নাই।

পাণ্ডাজীর স্ত্রীর কণ্ঠ এইবার উচ্চতর হইয়া ওঠে, "ভিতরে গিয়াছিল কিনা কে জানে!"

এই লইয়া তুমুল ঝগড়াটা কেবল নারীমহলে সীমাবদ্ধ থাকিলে এতটা আমার খারাপ লাগিত না। কিন্তু সেদিন পাণ্ডাজীর কাছে নালিশ করিতে যখন গেলেন তাঁহার স্ত্রী, তখন পাণ্ডাজী সব শুনিয়া, তাঁহার ভগ্নীকে কিছু না বলিয়া বরং স্ত্রীর উপর চড়িয়া উঠিলেন, "তু কেয়া আদমী, না জানওয়ার! একটা লোক রোগের যন্ত্রণায় রাত্রে ঘুম ভেঙে ছটফট করছে শুনে আর কারুর ঘুম যদি না ভেঙে থাকে এবং ললিতা যদি উঠে তার খবরদারি করতে গিয়ে থাকে তো ললিতাকা কেয়া কসুর হুয়া? ইয়ে তো মেরা সমঝ্মে নেহি আতি! সে মানুষ তাই মানুষের মত কাজ করেছে। আর তোমরা জানোয়ার তাই তার গায়ে কলঙ্ক দিচ্ছ।"

পাণ্ডাজী ছিলেন ভয়ংকর রাশভারী ও গম্ভীর প্রকৃতির। পাণ্ডাজীর স্ত্রী মনে মনে তাঁকে যমের মত ভয় করিতেন। তাই ওই কথার পর আবার যেমন কি বলিতে তিনি উদ্যত হইলেন, একটি প্রবল দাবড়ানি দিলেন, "বাস্ করো! তুম্কো ইয়ে বুরা বাত্ ম্যায় শুন্নে তৈয়ার নেহি! বে-সরম কাঁহিকা!"

"কেয়া ম্যয় বেসরম্?" বলিয়া আহত সর্পিণীর মত আর একবার যেমন মাথা তুলিতে গেলেন পাণ্ডানী সংগে সংগে তেমনি বজ্রহুঙ্কার ছাড়িলেন পাণ্ডাজী, "চুপ রহো! দুসরি বাত্ মাত্ কহো!"

পাণ্ডাজী যে এত রাগী সে ধারণা আমার আগে ছিল না। সেদিন প্রথম জানিতে পারিলাম। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছিলাম, পাণ্ডাজীর জুতোর শব্দ বাইরে শোনা গেলেই বাড়ির ভিতরটা যেন একেবারে ভয়ে নিশ্চুপ হইয়া যাইত। হয়ত তখন শাশুড়ী ননদ বৌ সবাই মিলিয়া কোন কিছু লইয়া উচ্চকণ্ঠে আলোচনা করিতেছিল। আমি বাহিরের ঘরে অতিথি হইলেও, মাঝখানের সেই একখানি কাঠের দরজার বন্ধ কপাটের এপার হইতে যে অনেক কিছু শুনিতে পাই, তাহা বোধ হয় তাঁহাদের ধারণা ছিল না।

যাহা হউক, সে ঝগড়া নিমেষে ঠাণ্ডা হইয়া গেল বটে কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত পাণ্ডাজীর স্ত্রীর গজরানি শোনা গেল। তিনি বলিতেছিলেন, "নিজের বোন কিনা, তাই তার কোন দোষ চোখে পড়ে না, আর কেউ যদি এ কাজ করতো তাহলে তার কাঁধে মাথা থাকতো না এতক্ষণ!"

"চুপ রহো!" বলিয়া এবার একটা ধমক দিয়া পাণ্ডাজী তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন।

নিস্তব্ধ দুপুর। বাহিরে ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল রোদ। আমি দরজার কাছে কতক্ষণ তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়াছিলাম জানি না। হঠাৎ পিছনের দিকে ফিরিতে দেখি পাণ্ডাজীর মা। নিঃশব্দে কখন তিনি ঘরে ঢুকিয়াছেন, আমি ঘুণাক্ষরে

জানিতে পারি নাই।

চমকাইয়া উঠিলাম। তিনি চাপাকণ্ঠে বলিলেন, "ভালই হলো! তা হলে সবই শুনেছো বাবা!"

"হাঁ মা। কিন্তু—"

"এর মধ্যে কোনো কিন্তু নেই বাবা। বালবিধবা মেয়ে, তার ওপর ওই রূপের ডালি। আমি বলছিলুম আজকাল তো আবার লোকে বিয়ে-থা দিচ্ছে বিধবাদের—ওরও একটা হিল্লে করে দাও। তা ছেলে একেবারে বেঁকে বসলো। —না মা, তা কখনো সম্ভব নয়। আমরা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, তায় যজমানী করে খাই, ভুলে যেয়ো না!"

বলিলাম, "কিন্তু এসবের কোনো কিছু তো আমি জানি না মা।"

"তুম্ কেইসে জানেগা বেটা?—ভেতরের ব্যাপার তুমি জানবে কি করে বাবা? মেয়েদের কেচ্ছা যে এসব—"

"কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না মা।"

এবার তিনি আমার আরো একটু নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তুমি যখন রোগের ঘোরে মা, বাবা, গেলুম বলে রাত্রে ছটফট করতে তখন তোমার পক্ষে কিছু কি জানা সম্ভব বাবা?" বলিয়া মুহূর্ত কয়েক থামিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আমি অনেকদিন দেখেছি। কিন্তু বলিনি কিছু মেয়েটার মুখ চেয়ে। ওই খাণ্ডারনী বৌ তাহলে ওকে ছিঁড়ে কুটে খাবে! এমনি তো দুচোখে দেখতে পারে না! সব সময় ওর বিরুদ্ধে বিষ ওগরাচ্ছে!"

একটু থামিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কিন্তু মা, আপনার ওপরও তো দেখলুম তিনি খুব প্রসন্ন নন। পাণ্ডাজীর কি গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা আপনার ওপর, অথচ—"

আমার মুখের কথা থামাইয়া তিনি বলিলেন, "আমি তো ওর নিজের শাশুড়ী নই বাবা, তাই এত রাগ!" বলিয়া নিমেষে নীরব হইয়া গেলেন।

আমিও কিছুক্ষণ তাঁর মুখের ওপর তেমনি স্থিরদৃষ্টি ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। তারপর প্রশ্ন করিলাম, "সৎ-শাশুড়ী বুঝি?"

"না।"

"তাহলে?"

"কেউ নই। না-না, মিথ্যা বলব না তোমার কাছে—তুমি আমায় যখন মাতাজী বলে ডেকেছো!"

বলিয়াই সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। যেন মনের মধ্যে সহসা একটা কিসের ঝড় উঠিয়াছে, তাহাকে দমন করিবার জন্য তাঁর ভিতরে একটা সংগ্রাম চলিয়াছে। আমি তেমনি ভাবে তখনো তাঁহার মুখের উপর আমার জিজ্ঞাসু চোখ দুটি মেলিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছিলাম। সহসা একটি গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি চাপা গলায় কহিলেন, "তোমাকে বলতে আমার বাধা নেই, তুমি আমার সন্তানের মত। আমি এঁদের কেউ নই!"

"তার মানে?"

তিনি একবার নীচের ঠোঁটটা উপরের দাঁতের পাটি দিয়া কামড়াইয়া ধরিলেন। তারপর আরো মুহূর্ত কয়েক নীরব নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন, "আমি বাঙ্গালীর মেয়ে।"

"এ্যাঁ!" যেন আমার সামনে একটা উল্কাপাত হইল। বেশ কিছুক্ষণ যেন আমার বাকরোধ হইয়া রহিল।

ভাবিতে লাগিলাম, এ কি স্বপ্ন না সত্যি! যে মহিলার চালচলন কথাবার্তা সব কিছু ওদেশের মেয়েদের মত—কোথাও এতটুকু তফাৎ নাই, বাঙালীর মেয়ের পক্ষে এ পরিবর্তন কি করিয়া সম্ভব হইল?

তাই বিস্ময়ের ঘোর কাটিতে প্রথমেই শুধাইলাম, "কিন্তু—"

আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "বাঙালী মেয়ের পক্ষে এ কেমন করে সম্ভব, এই তো? ভুলে যেয়ো না, আমার এখন চল্লিশ বছর বয়েস, আমি এখানে যখন এসেছিলুম তখন ছিল সতেরো!"

এই কথা বলিয়া হঠাৎ সন্দিগ্ধ ভাবে একবার চারিপাশে চোখটা ঘুরাইয়া লইলেন। তারপর আরো চাপা গলায় কহিলেন, "বলবো একদিন সব আমার কাহিনী। এখন যাই বাবা।"

বলিয়া দ্রুতপদে অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন। আমি আর কোন কাজে মন দিতে পারিলাম না। সব যেন কেমন গোলমাল হইয়া গেল। এখানেও সেই বাঙালীর মেয়ে!

॥ পাঁচ ॥

কৌতূহল বাড়িয়া চলে।

দিনের পর দিন যায়, কিন্তু মাতাজীকে ঠিক সেদিনকার মত নিরিবিলিতে আর পাই না। অবশেষে একদিন দুপুরে সবাই যখন নিদ্রামগ্ন, চুপি চুপি আমার ঘরে তিনি আসিয়া ঢুকিলেন। আমার শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া ফিস-ফিস করিয়া কহিলেন, "সবে সতেরোয় পা দিয়েছি, তখন আমি বিধবা হই। বুঝতেই পারছো তখন আমার কি রূপ ছিল! আমার বাবা থাকতেন আগ্রায়, চারিদিকে মুসলমানপাড়া, তার মধ্যে ছিল আমাদের বাগানবাড়ি। আমি বিধবা হবার পরে, ছ'টা মাস গেল না, বাবা মাথার শিরা ছিঁড়ে মারা গেলেন। আমার ভাইয়েরা সব ছোট ছোট, মা তাই ভরসা পেলেন না আমাকে নিয়ে ওই জায়গায় থাকতে। তাই তিনি তাঁর গুরুর হাতে আমায় সমর্পণ করেছিলেন আমি যখন এ বাড়িতে আসি, তখন তোমার পান্ডাজী মাত্র দেড় বছরের মা-মরা ছেলে। তখন থেকে ওকে বুকে করে মানুষ করেছি, ও তাই নিজের মায়ের মতই ভক্তি করে। ওর বিয়ের পর, ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এ নিয়ে অনেক ঘোঁট করেছিলেন। ভাঙচি দিয়েছে কত বড় বড় যজমানদের। তারা

সব ওকে ছেড়ে চলে গেছে, তবু আমাকে ও ত্যাগ করেনি। বলে, "জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত যাকে মা বলে ডেকেছি, সেই আমার মা। ধর্ম, সংস্কার, সব বৃথা মায়ের কাছে।"

আমি অবাক হইয়া তাকাইয়া ছিলাম তাঁহার মুখের দিকে। যেন একটা নাটক-নভেল শুনিতেছি।

তিনি একটু থামিয়া দম লইয়া আবার শুরু করিলেন, "বৌয়ের তো চিরদিন তাই আমি চক্ষুশূল! আমাকে তাড়াবার জন্যে কত ছল-ছুতো করেছে। বলে, তোমার বাবার ও সেবাদাসী ছিল। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, সতী-সাবিত্রী, ওকে শাশুড়ী বলে মানতে পারবো না!"

"তারপর?"

"এই নিয়ে কত ঝগড়াঝাঁটি কত ঘোঁট এই পাণ্ডাদের সমাজে, কিন্তু ছেলের সেই এক কথা। যে আমাকে মানুষ করেছে, যাঁকে আমি মা বলে ডাকি, সে আমার কাছে দেবীর তুল্য। বাবার চরিত্র নিয়ে আলোচনা করা মহাপাপ। বাবা যাকে মা বলে ডাকতে শিখিয়েছিলেন তিনিই আমার মা জননী, আমার ইহকালের পরকালের দেবী।"

সতেরো-আঠারো বছর বয়সে পাণ্ডাজীর সেই মাতাজীর চেহারা কিরূপ ছিল কল্পনা করিতে গেলে সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। মাথার মধ্যেটা ঝিম ঝিম করে। সে রূপ নয়, যেন বহ্নিশিখা। পাণ্ডাজীর পিতার সহিত তাঁর সম্পর্ক কিরূপ ছিল, পবিত্র কি কলুষিত, তার চিন্তা না করিয়া আমি পাণ্ডাজীর পায়ে নিঃশব্দে আমার প্রণতি নিবেদন করিলাম। স্বর্গদ্বারে বাস করা সার্থক হইয়াছে তাঁর।

তিনি বলিলেন, "একদিন তো রাগ করে, আমি বেরিয়ে গিয়েছিলুম বাড়ি ছেড়ে। কলকাতার টিকিট কেটে স্টেশনে অপেক্ষা করছি, এমন সময় ছুটতে ছুটতে ও গিয়ে হাজির। আমার পা-দুটো জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না, বলে, মা, তুমি ফিরে চলো। আমি বউকে কালই বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবো। তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছু জানি নে পৃথিবীতে।"

এই বলিয়া চোখের পাতা কাপড়ের প্রান্ত দিয়া বারকয়েক মুছিয়া লইয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। তারপর কহিলেন, "শুধু ওরই জন্যে জড়িয়ে আছি, এত হেনস্থা সহ্য করেও—নইলে কবে চলে যেতাম ছোট ভাইয়ের কাছে কলকাতায়। সে কতবার চিঠি লিখেছে, দিদি তুমি এসো, আমরা তোমায় মাথায় করে রাখবো।"

এবার তিনি চোখটা কাপড় দিয়া মুছিয়া লইয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন। একটু পরে আমাকে বলিলেন, "একটা কাজ কিন্তু তোমায় আমার জন্য করতে হবে বাবা—একটা চিঠি আমার ভাইকে দেবো, তুমি নিজে সেটা তাঁর হাতে পৌঁছে দেবে, অন্য কারো হাতে সে চিঠি যেন না পড়ে। কেমন?"

বলিলাম, "আচ্ছা। কিন্তু কবে আমি কলকাতা যাবো, তার তো কোন

ঠিক নেই মা।"

তিনি বলিলেন, "যখন যাবে, মনে করে চিঠিটা চেয়ে নিয়ে যেয়ো বাবা। যেন ভুল না হয়।" বলিতে বলিতে অন্দরমহলে প্রবেশ করিতে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি তো ভাল হয়ে গেছো বাবা, আর এখানে থেকো না। তোমার জন্যে মেয়েটার খোয়ার আর চোখে দেখা যায় না। দিনরাত ওই বৌয়ের গালাগাল আর সন্দেহ। তোমার সঙ্গে নাকি ও গোপনে রাত্রে মিলিত হয়!"

সেদিন অপরাহ্নে পাণ্ডাজী যখন ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন, আমি ঈষৎ কুণ্ঠার সঙ্গে তাঁকে নিবেদন করিলাম, "পাণ্ডাজী কাল সকালে আমি এখান থেকে চলে যাব, ধর্মশালায় গিয়ে থাকবো কেমন?"

তিনি মুহূর্তকাল আমার মুখের উপর অপলক নেত্রে তাকাইয়া রহিলেন। যেন কি একটা গভীর সমস্যায় আমি তাঁহাকে ফেলিয়াছি। কিন্তু নিমেষে মুখের সে ভাব পালটাইয়া গেল। এবার যথারীতি তাঁর সেই ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফের দুই প্রান্ত চুমরাইয়া বলিলেন, "কৈ ফিকির নেহি। ইয়েভি আপ্‌কা ঘর: উয়োভি আপহিকে হ্যায়!"

॥ ছয় ॥

এবারে যে ধর্মশালায় আসিয়া উঠিলাম, সেটা তিন রাস্তার মোড়ে এক বিরাট অট্টালিকা। কত ঘর, দালান, কত উঠান। তবে অধিকাংশ ঘরই তখন খালি। দুই-চারজন স্ত্রী পুরুষ দুই-তিনদিন হইল আসিয়াছে। তাহারা আমারই পাণ্ডাজীর যজমান। তাই ওই ধর্মশালায় আশ্রয় লইয়াছে। আমার পাণ্ডাজীই উপস্থিত এ ধর্মসালারও তত্ত্বাবধায়ক। ইহার সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁহার হাতে।

ইচ্ছা করিলে অবশ্য যজমানরা তাঁহাদের পছন্দমত অন্য যে-কোনো ধর্মশালায় থাকিতে পারেন। তবে এ ধর্মশালাটির ঘরগুলি অতি সুন্দর এবং একেবারে বাজারহাট, রেলস্টেশন, গঙ্গার ঘাট সব কিছুই নিকটে বলিয়া বহিরাগতরা এই বাড়িটিকেই বেশী পছন্দ করিত।

আমার কাছে অবশ্য এ বাড়িটার অন্য আকর্ষণ ছিল। ঘরের জানলা খুলিলেই সামনে চোখে পড়ে গঙ্গার নীলধারা কুলুকুলু স্বরে যেন নৃত্য করিতে করিতে উপলখণ্ডের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আবার ইহাকে অতিক্রম করিয়া আরো দূরে ওপারে পাহাড়ের সানুদেশ বরাবর যে শ্যামল বনজঙ্গলের রেখা তাহার একেবারে শীর্ষদেশে চণ্ডীদেবীর যে মন্দির, তাহাকে স্পষ্ট দেখা যায় এ ঘর হইতে।

ওদিকে পিছনের জানলা দিয়াও চোখে পড়ে সাবিত্রী পাহাড়, ছোট-বড় অসংখ্য বৃক্ষলতা লইয়া মাথা উঁচু করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

সন্ধ্যার যে প্রদীপ চণ্ডীদেবীর মন্দিরে টিপটিপ করিয়া জ্বলে, আমার

ঘর হইতে তাহাকে দূর আকাশের একটা তারার মত মনে হয়। অন্ধকারের সমুদ্রে লক্ষ লক্ষ তারার সঙ্গে মিশিয়া যাইলেও আমার কিন্তু তাহাকে চিনিতে ভুল হয় না একদিনও। সেই সময় পিছন হইতে সাবিত্রী-মন্দিরের আরতির শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি আমার ঘরে আসিয়া আমার মনটাকে সহসা সেখানে টানিয়া লইয়া যাইত।

যে ঘরটায় আমি থাকিতাম সেটা রাস্তার দিকে। হঠাৎ একদিন প্রত্যুষে ঘুম ভাঙিয়া যাইতেই কানে আসিল, 'মাতাজী নমস্তে' 'মাতাজী নমস্তে'!

কিছুক্ষণ পূর্বে ব্রহ্মচারী বালকবৃন্দের গঙ্গাস্তোত্র কানে আসিয়া ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ভোরের হাড়কাঁপানো শনশনে হাওয়ায় কম্বল ছাড়িয়া শয্যাত্যাগ করিবার সাহস ছিল না বলিয়া আপাদমস্তক আরো ভালো করিয়া কম্বলে জড়াইয়া বিছানায় পড়িয়া ছিলাম।

'মাতাজী নমস্তে!' দ্বিতীয়বার কানে আসিতে, কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলাম না। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া জানলার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। চার মাসেরও অধিককাল এখানে আসিয়াছি, কেবল নাগাসন্ন্যাসী, সাধু মহান্ত, বাবাজী, হরেক রকমের যে সব যোগী মহাপুরুষ দেখিয়াছি তাঁহারা সবাই পুরুষ। কোন সন্ন্যাসিনীর সন্ধান, কি সাক্ষাৎ পাই নাই। সেইজন্য 'মাতাজী নমস্তে' শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম।

কিন্তু মাতাজীকে দেখিয়া চোখের পাতা বিস্ময়ে স্থির হইয়া রহিল। কে এই রূপসী নারী! সুন্দরী, তরুণী, ভৈরবীমূর্তি মাথায় জটাজাল, রক্তাম্বর পরিহিতা, কণ্ঠে ও বাহুতে রুদ্রাক্ষের মালা, ললাটে রক্তচন্দন, টকটকে লাল জবাফুলের মালায় বক্ষের অর্ধাংশ আবৃত। যেন অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী প্রতিমা। হাতে যে বিরাট ত্রিশূল তাহাতেও জবার মালা ঝুলিতেছে। ভৈরবী সন্ন্যাসিনী নন যেন এক লাবণ্যময়ী জগদ্ধাত্রী প্রতিমাকে কে জোর করিয়া সেই ভয়ঙ্করী ভৈরবীর সাজে সজ্জিত করিয়া দিয়াছে। ঈশানীকে রুদ্রাণীর বেশ পরাইয়াছে।

জানালায় দাঁড়াইয়া বুঝিতে পারিলাম না কোন্ পথে সেই দেবীমূর্তি অন্তর্হিত হইলেন। ওখানে ঘাটের ধারে, পাহাড়ের অন্দরে-কন্দরে যে সব সাধুসান্ন্যাসী থাকেন, এই কয়দিনে খুঁজিয়া খুঁজিয়া সকলকেই দর্শন করিয়াছিলাম। কিন্তু শান্তি কোথায় গিয়াছে, বাঁচিয়া আছে কিনা, সাক্ষাৎ পাইব কিনা, ইহা জানিবার জন্য অনেক সাধু সন্ন্যাসীর কাছে গোপন অনুসন্ধান করিয়াও কিছু জানিতে পারি নাই। ভাগো, নেহি জানতা, বলিয়া কেহ বা দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। লোকচক্ষুর বাহিরে বনজঙ্গলাবৃত, অন্ধকার পর্বত-গুহাভ্যন্তরে ধ্যানমগ্ন অনেক যোগী মহারাজের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু এই জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তির সন্ধান কোথাও পাই নাই।

তাই সেইদিন হইতে চুপি চুপি তাঁহার খোঁজে ঘুরিতে লাগিলাম।

বিল্বকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে যাইবার যে পথটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া বন-জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে, জানিতাম না সেইদিকে মন্দিরের পিছনে যে দুর্গম পর্বতসঙ্কুল অরণ্য, তাহার ভিতরে বিরাট পাহাড়ের গহ্বরে কোন মানুষ বাস করিতে পারে।

কেমন করিয়া, কোন্ পথ দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেদিন সেই ভয়-ভীষণ স্থানটি আবিষ্কার করিয়াছিলাম বলিতে পারিব না। প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া এক-একদিন যেমন এক-একটি নতুন পথে চলিয়া যাইতাম, সেদিনও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। মনে আছে, বিল্বকেশ্বর শিবকে দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় পথ হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। কখন যে গভীর হইতে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলাম বুঝিতে পারি নাই। বেশ কিছুক্ষণ ঘুরপাক খাইবার পর হঠাৎ বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। এ কোথায় আসিলাম! চারিদিকে ভাঙ-চোরা পাহাড়ের প্রাচীর আর জঙ্গল। কোন্ দিকে পথ কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? আতঙ্কে বার বার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এইরূপ স্থানে যে-কোন হিংস্র জন্তু লুকাইয়া থাকিতে পারে। কোন বাঘ, ভাল্লুক বা অজগর এখনি আমার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আমায় মারিয়া ফেলিলেও সে-কথা কেহ জানিতে পারবে না। ভয়ে আমার সমস্ত দেহ যেন ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন হঠাৎ পাশের এক অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে যেন মানুষের ক্ষীণকণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সাবধানে বড় বড় পাথরের কয়েকটা চাঁই পার হইয়া অবশেষে সেই গহ্বর-টার কাছে গিয়া কান পাতিলাম। হ্যাঁ শুধু মানুষের গলা নয়, এ যে একেবারে নারীর কণ্ঠস্বর। গুঁড়ি মারিয়া, জন্তু-জানোয়ারের মত হাতের দুই কনুই ও হাঁটুর উপর ভর দিয়া, সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে বেশ কিছুটা হামাগুড়ি দিয়া যাইবার পর থমকাইয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। সামনে সেই অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী মূর্তি! কিন্তু সেই ভৈরবীর বেশ এখন নাই, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা নাই, কপালে রক্তচন্দন নাই, পরনে রক্তবাসও নাই। বিরল-বসনা এক অরণ্য-দেবী যেন সহসা সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন।

আমার মুখচোখের রেখায় কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল জানি না, তবে আমার সেই হতভম্ব মূর্তির সামনে ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, "আপ্ হিঁয়া পর কেয়া মাঙতা হ্যায়?"

কি জবাব দিব! ঘাবড়াইয়া গেলাম।

এবার যেন বজ্রকঠিন স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "কাহে হিঁয়া আয়া?"

সঙ্কোচজড়িত কণ্ঠে বলিলাম, "দর্শন কে লিয়ে।"

"দর্শন! ইয়ে তো মন্দির নেহি হ্যায়! দর্শনকা কৈ দেওতা ভি হিঁয়া নেহি হ্যায়!"

বলিলাম, "আপ্‌কো দর্শন করনে।"

জিব কাটিয়া সঙ্গে সঙ্গে তিনি দু'পা পিছাইয়া গিয়া, দু'হাত জোড়

করিয়া কপালে ঠেকাইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বলিলেন, "ম্যায় তো দেবী নেহী হুঁ! ভগবানকো সেবাদাসী হুঁ। মেরা গুরুজীকো দর্শন করোগে? আও, ভিতরমে।"

এতক্ষণে যেন মনে বল ফিরিয়া পাইলাম। তাঁহার পিছু পিছু কিছুদূর এক সুড়ঙ্গপথে যাইতেই দেখি জটাজুটধারী শীর্ণকায় এক সন্ন্যাসী কোলের উপর দুই হাত রাখিয়া ধ্যানমগ্ন। তাঁহার সামনে ধুনি জ্বলিতেছে।

দূর হইতে যেই নমস্কার করিলাম সেই ধ্যানী মহাপুরুষকে, অমনি ইশারা করিয়া ভৈরবী আমাকে বাহিরে চলিয়া যাইতে বলিলেন। গুহার মুখের কাছে আসিয়া তাঁহাকে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞসা করিলাম, "আমি পরদেশী আদমী, এখানে নতুন এসেছি, পথঘাট চিনি না। কৃপা করে মুঝে বাতা দিজিয়ে, কোন্ দিক দিয়ে গেলে ব্রহ্মকুণ্ডের কাছে যেতে পারি।"

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লইয়া তিনি চোরাপথে কেমন করিয়া যে বিল্বকেশ্বর মন্দিরের সন্নিকটে লইয়া হাজির করিলেন বুঝিতে পারিলাম না। তারপর সেখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যাও, আভি সিধা দক্ষিণমে, কুছ ডর নেই, চলা যাও।"

আমি তাঁহাকে নমস্কার করিতে গেলে তিনি চোখ রাঙাইয়া নিষেধ করিলেন, "খবরদার!"

সঙ্গে সঙ্গে হাত দুইটি গুটাইয়া লইয়া চলিয়া আসিলাম তাঁহার নির্দেশ-মত পথে।

॥ সাত ॥

এরপর আরও দু সপ্তাহ কাটিয়া গেল।

কিন্তু কোথাও আর সেই অপূর্ব লাবণ্যময়ী ভৈরবীকে দেখিতে পাই নাই।

পান্ডাজীর বাড়ী অনেকদিন যাই নাই। সেদিন কন্‌খলে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মাতাজীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিতে-ছিলাম, পথে এক নাটকীয় দৃশ্য দেখিয়া হতবাক হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

দেখিলাম সেই অপূর্ব লাবণ্যময়ী নারী, কতকগুলি ছাপানো হ্যান্ডবিল রাস্তার লোকদের বিলি করিতে করিতে বাজারের দিকে চলিয়া গেলেন।

পরনে তাঁর অতি সাধারণ লালপাড় শাড়ি, গায়ে একটা অত্যন্ত সস্তার রং-চটা ব্লাউজ।

সত্যি কথা বলিতে কি নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। ভুল দেখিলাম না তো! এ কি সত্যিসত্যি সেই ভৈরবী! সেই দেবী-প্রতিমা! না অন্য কাহারও সহিত গোলমাল করিয়া ফেলিলাম!

থমকিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম।

হঠাৎ একটি ছোট ছেলের হাতে দেখি সেইরূপ একখানি হ্যান্ডবিল। পড়িতে পড়িতে আমার নিকট দিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল। "খোকা শোনো" বলিয়া তাহার নিকট হইতে সেই হ্যান্ডবিলটা চাহিয়া লইলাম, "দেখি এটা কিসের বিজ্ঞাপন?"

"লিজীয়ে।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেটা আমার হাতে সে দিয়া দিল।

হ্যান্ডবিলটা হিন্দী ও ইংরাজীতে লেখা ছিল। পড়িতে গিয়া বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় বাড়িয়া গেল। দেখি উহা এক দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপন। দেশী গাছগাছড়া হইতে প্রস্তুত, অত্যাশ্চর্য সেই কবিরাজী মাজন ব্যবহার করিলে নাকি দাঁতের গোড়া ফোলে না, ব্যথা হইলে সারিয়া যায়, পুঁজ বা পাইওরিয়াজনিত দুর্গন্ধ নাশ করিয়া দাঁতের পাটিকে পুনরায় সজীব ও সুন্দর করিয়া তোলে। এক কৌটার মূল্য চার আনা। দুই কৌটা একসঙ্গে লইলে সাড়ে ছয় আনা মাত্র। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কৌতূহল বাড়িতে বাড়িতে যখন শেষ সীমায় পেঁছাইল তখন আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। প্রাপ্তিস্থান বলিয়া নীচে যে কন্‌খলের ঠিকানা দেওয়া ছিল, খুঁজিতে খুঁজিতে সেখানে গিয়া হাজির হইলাম।

কন্‌খলের বাজার হইতে বাঁ দিকে যে সরু রাস্তাটা ভিতর দিকে ঢুকিয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে বেশ খানিকটা আগাইয়া যাইতেই দেখি, প্রকাণ্ড ফটক-ওলা পুরানো ধরনের এক বাড়ি। আর তার সেই বিরাট ফটকটা তালাবন্ধ, বোধ হয় কখনই খুলিবার প্রয়োজন হয় না। এককালে হাতী বা উটের পিঠে মাল লইয়া ভিতরে ঢুকিবার সময় খোলা হইত। এখন পাছে গরু-মহিষ ঢুকিয়া পড়িয়া গাছপালা নষ্ট করে, সেইজন্য ওইরূপ ব্যবস্থা, সব সময় বন্ধ থাকে।

ষাঁড়, গরু, মহিষ প্রভৃতিকে ওখানকার লোকেরা দেবতাজ্ঞানে পূজা করে। তাই গাছপালা নষ্ট করিতে চোখে দেখিলেও, কেহ তাহাদের গায়ে হাত তোলে না। ইহাকে পাপকার্য বলিয়া মনে করে।

হয়ত সেইজন্য ওই ব্যবস্থা, কে জানে! ওদেশে এই শ্রেণীর বড় বড় ফটকওলা বাড়ি, মন্দির, মঠ, বিদ্যাভবন অনেক দেখিয়াছিলাম। ওই সব বড় বড় কাঠের দরজার মধ্যেই ছোট কাটা আর একটা ছোট দরজা লাগানো থাকে, লোকজন তাহার ভিতর দিয়া যাতায়াত করে। যাহা হউক সেই ছোট কাটা দরজাটা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে দেখি, ভিতরে অনেকগুলি ছোট-বড় ঘর। তবে খুবই পুরানো। সামনে বড় একটি উঠান। তার একদিকে একটা চালা-ঘরের মধ্যে দু'তিনটি গরু-বাছুর বাঁধা। ওর পাশেই একটি বড় ইঁদারা, তাহার পাড় এককালে ইঁট দিয়া বেশ উঁচু করিয়া বাঁধানো ছিল, এখন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। একদিকের ইঁট একেবারে নাই বলিলেই হয়। ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে একেবারে মাটির কাছে আসিয়া পেঁছিয়াছে। সেখানে ছোট ছোট কয়েকটা কাঠের খুঁটি পুঁতিয়া কেরোসিনের তোবড়ানো টিন কাটিয়া পেরেক

দিয়া আঁটা। ইঁদারা হইতে জল তুলিবার জন্য, দুপাশে দুইটি লোহার দণ্ডের সঙ্গে মাথার উপর বাঁধা আর একটি দণ্ড হইতে একটি কপিকল ঝুলিতেছে। কপিকলটার চাকার সঙ্গে মোটা দড়িতে জল তুলিবার বালতি নয়, লোহার তৈরি একরকম গামলার মত পাত্র আংটায় বাঁধা রহিয়াছে। এখনি কে জল তুলিয়াছিল। সেই লোহার পাত্রটি যে ভাঙ্গা ইঁটের উপর বসানো রহিয়াছে, তাহার গা দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

উঠানের অপরদিকে ছোট্ট একটু ফুলের বাগানে তখনও সাদা-লাল রঙের দু-চারটি ফুল ফুটিয়া আছে। এক কোণে খড়ের ছোট্ট একটি গাদা। সেখানে বিচালির টুকরা ঝুড়িতে ভর্তি দেখিলাম।

বেশ নিকানো-গুছানো, পরিপাটী গৃহস্থের সংসার। দরিদ্র হইলেও ছন্নছাড়া নয়, একটা লক্ষ্মীশ্রী সর্বত্র বর্তমান। আমাকে ঢুকিতে দেখিয়া চার-পাঁচটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একটি ঘরের ভিতর হইতে একসঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই ছোট, বয়েস বারো-তের হইতে পাঁচ বছরের মধ্যে হইবে। বোধ হয় ওই ঘরে সকলে একসঙ্গে খেলা করিতেছিল।

"আব্ কেয়া মাঙ্‌তা?" তিন-চারিজন একসঙ্গে আমায় একই প্রশ্ন করিয়া বসিল।

বলিলাম, "দাঁতের মাজন হিঁয়া বিক্‌তা হ্যায়?"

বড় ছেলেটি বলিল, "হাঁ জী।"

বলিলাম, "আমি মাজন কিনতে এসেছি।"

"আপ্ বইঠিয়ে। মাজীকো বোলাতা হ্যায়।" বলিয়া সেই ছেলেটি সামনের একটা ছোট ঘরে আমাকে লইয়া গেল। সেখানে একটা পুরনো তক্তপোশের উপর আরো পুরনো একটা চট পাতা ছিল। চটের ওপর এখানে ওখানে কালির দাগ। কতগুলো হিন্দী বই, খাতা, স্লেট-পেন্সিল ছড়ানো। বোধ হয় ওটাই ছেলেদের লেখাপড়ার ঘর। খানকয়েক বই একপাশে সরাইয়া দিয়া ছেলেটি আমাকে বসাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। তার আগেই কিন্তু অপর ছেলেমেয়েগুলি সবাই একসঙ্গে বাড়ির ভিতর ছুটিয়া গিয়াছিল। যেন যে আগে ভিতরে সেই সংবাদটা পৌঁছাইতে পারিবে, সে প্রাইজ পাইবে।

বসিয়া আছি। বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়া যায়। তখনও কাহারও পাত্তা নাই। ছেলেগুলিরও আর কোন সাড়াশব্দ পাই না। কোথায় গেল রে বাবা! জানালার ফাঁক দিয়া এদিক-ওদিক তাকাইতে লাগিলাম।

এই সময় হঠাৎ আমার দৃষ্টি গিয়া পড়িল সেই বড় ফটকের ছোট্ট কাটা দরজাটার দিকে। দেখি রোগা শুকনো কাঠির মত লম্বা একটি বৃদ্ধ লোক, বয়স সত্তর-বাহাত্তরের কম নয়, সেই দরজাটা গলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, অমনি সেই ছেলেগুলি সবাই একসঙ্গে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল। তারপর যেন ডাকাত পড়িয়াছে, এইভাবে তাঁহার পাঞ্জাবির

এ-পকেট, ও-পকেট, সে-পকেটে হাত ঢুকাইয়া তাহারা কি যেন খুঁজিতে লাগিল। সকলের মুখে এক রব, পিতাজী কোন্ চিজ লায়া, মেরে লিয়ে!

জনে জনে যখন সেই একই প্রশ্ন করিতে লাগিল, তখন স্মিতহাস্যে বৃদ্ধ সর্বকনিষ্ঠকে কোলে তুলিয়া লইয়া, মুখে একটি সস্নেহ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "পহেলে অন্দর চলো, দেতা হুঁ।"

নেহি, আগাড়ি দিজিয়ে, তব্ অন্দর যায়েগা। বলিয়া ছোট ছেলেটি বৃদ্ধের পাঞ্জাবির একটা অংশ টানিয়া ধরিল। ছেলেটি যখন নাছোড়বান্দা, তখন তাহার কান মলিয়া দিয়া গালে একটি সজোরে চড় কষাইয়া দিলেন তিনি।—ছোড়ো কুত্তা আগাড়ি, বদ্মাস কাঁহাকা, কুছ নেহি দেগা তুমকো। যাও ভাগো।

ছেলেটি চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ির ভিতর ছুটিয়া গেল। বৃদ্ধটি তখন বাকি ছেলেমেয়েগুলিকে সঙ্গে করিয়া অন্দরমহলে গিয়া ঢুকিলেন। আমি যে একটা বিদেশী লোক এতক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি কেন, একবার সে-কথা জিজ্ঞাসা করা দূরে থাক, আমার দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। আরও মিনিট কয়েক একলা তেমনি ভাবে ঘরে বসিয়া থাকিবার পর, ছেলেদের হিন্দী পাঠ্যপুস্তক একখানা হাতে লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাই হঠাৎ কখন যে সেই অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী মূর্তি একেবারে আমার সামনে আসিয়া আবির্ভূতা হইয়াছেন টের পাই নাই। অদ্ভুত একটা সুগন্ধ নাকে আসিতেই চোখ তুলিয়া মুহূর্তে যেন বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলাম।

আমার মুখের রেখায় সে ভাব যে কতখানি ফুটিয়াছিল জানি না, তবে আমি প্রথমে কথা বলিতে পারি নাই। তিনিই প্রশ্ন করিলেন, "আপ্ মাজন লেনে আয়া?"

"হাঁ জী!" সবিনয়ে উত্তর দিলাম। সাধারণত ব্যবসার ক্ষেত্রে ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতা যেভাবে আলাপ করে, বলা বাহুল্য আমি তাহা পারি নাই। কণ্ঠ যেন কিসের আবেগে বুজিয়া আসিতেছিল। ইনিই যে সেই মহিমময়ী নারী, একবারও আমি তা বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

অথচ তিনি এমন ভঙ্গী করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন, যেন আমায় চেনেন না। ইতিপূর্বে কখনও দেখেন নাই।

তিনি তাই দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিলেন, "আপ্ কেতনা কৌটা মাঙতে?"

বলিলাম, "দু কৌটা।"

"আচ্ছা, ঠেরিয়ে।" বলিয়া যেমন পিছনে ফিরিতে যাইবেন, বলিলাম, "কেতনা দাম?"

"একঠো চার আনা। দো'ঠোকে সাড়ে ছে আনা।"

পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিতেই তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। শুধু যাইবার আগে মিষ্টকণ্ঠে একবার বলিলেন,—

"আভি আতা হুঁ। থোড়া বৈঠিয়ে জী।"

বেশ কিছু দেরি করিয়াই তিনি ফিরিলেন। বোধ হয় টাকার 'চেঞ্জ' ঘরে ছিল না। বড় ছেলেটা একটু পরে সেই নোটটা হাতে করিয়া ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়া, আবার একটু পরে ফিরিয়া আসিলে, তিনি দুইটা মাজনের কৌটা হাতে লইয়া আবার আমার ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। সে দুইটা আমার হাতে দিয়া রেজগী গনিয়া সাড়ে নয় আনা যখন ফেরত দিলেন, আমি মাজনের কৌটা পকেটে ভরিতে ভরিতে শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, "যদি পরে দরকার হয় আরও তাহলে—"

আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া তিনি বলিলেন, "কৌটার গায়ে যো ঠিকানা লিখা হ্যায়, চিঠিমে অর্ডার ভেজ্‌নেসে, হাম ভি. পি-সে ভেজেঙ্গা! আচ্ছা?"

এবার আমাকে একটু ইতস্তত করিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আউর কুছ প্রশ্ন হ্যায় ইস্‌কে লিয়ে?"

বলিলাম, "না। তবে হ্যাঁ, দেখুন, একটা কথা যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, তাহলে অপরাধ নেবেন না।" বলিয়া বাঙ্গালীর পক্ষে হিন্দী না শিখিয়া যতদূর বিশুদ্ধ ভাবে বলা সম্ভব তেমনি ভাষায় ওই কথাটা তাঁকে নিবেদন করিলাম।

"ফরমাইয়ে—"

"আচ্ছা, আপনাকেই তো সেদিন গুহার মধ্যে গুরুজীর আশ্রমে দেখে-ছিলুম!"

"হাঁ, তো কেয়া—"

"আর একদিন ত্রিশূল হাতে, রক্তবাস পরে, রুদ্রাক্ষের মালার সঙ্গে জবা-ফুলের মালা গলায় ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাট থেকে আপনাকে আমি আমার ধর্মশালার সামনে দিয়ে কি যেতে দেখেছিলুম!"

"তব্ ফির কেয়া বাত্? হ্যাঁ, তার জন্যে তুমি কি বলতে চাও?"

এবার একটু থামিয়া, তারপর প্রশ্ন করিলাম, "আচ্ছা, আপনি কি এখানে থাকেন?"

"হাঁ জী। ইয়ে তো মেরা মোকান হ্যায়। মেরা গরীবখানা হ্যায়। হামনে তো হিঁয়াই ঠের্‌তি।"

আবার একটু থামিয়া, কণ্ঠের সঙ্কোচ ও জড়তা দূর করিবার জন্য বার দুই কাশিয়া মৃদুস্বরে কহিলাম, "ইয়ে সব লেড়কা-লেড়কী কি আপ্‌কো—"

"তব্ ফিন্ দুসরা কিসিকো হোগা বাতাইয়ে—"

মনে হইল, তাঁহার কণ্ঠে যেন কেমন একটা বেসুরো আওয়াজ। শুনিয়া লজ্জা পাইলাম। আর ও বিষয়ে প্রশ্ন করা উচিত হইবে না ভাবিয়া, চুপ করিয়া যাইতেই দেখিলাম, তিনি একবার আমার মুখের উপর চট্ করিয়া দৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন। তারপর একটু থামিয়া কহিলেন, "দেখা নেহি? আভ্‌ভি

যো পণ্ডিতজী অন্দরমে গিয়া থা, ওহি তো মেরা সোওয়ামী, মেরা পতি।”

সবিনয়ে জানাইলাম, “দেখা হ্যয়। হ্যাঁ দেখেছি।”

তিনি এবার বলিলেন, “ওরা সব পণ্ডিতজীর ছেলেমেয়ে। আমার নয়। গুরুর আদেশে আমরা দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। মাত্র দু'বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। এই দু'বছরে আমরা দু'দিন মাত্র সংযুক্ত হয়েছি।”

সবটাই অবশ্য বিশুদ্ধ হিন্দীতেই বলিলেন। আমি চমকিয়া উঠিলাম, তাঁহার মুখের ওই স্পষ্ট উক্তি শুনিয়া। কোন নারী যে এইভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন পুরুষের সামনে এ-কথা এমন সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে ইহা যেন কল্পনার অতীত। লজ্জাশরমের বালাই নাই, এ কেমনধারা মেয়ে!

তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া বোধ করি সেই কথাটাই চিন্তা করিতে-ছিলাম, এমন সময় তিনি হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, “কেয়া শোচ্ রহা বাবুজী?'

“নেহি, কুছ নেহি।”

বলিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া শুধু বলিলাম, “আপনাদের এ স্বর্গ-দ্বারে অসম্ভব বলে কিছু নেই!”

“কাহে?”

বলিলাম, “না, মানে, আপনার মত এমনধারা গুরুভক্তি কখনও দেখিনি। শুধু গুরুর আদেশে আপনি এ বিয়েতে রাজী হয়ে গেলেন! আশ্চর্য, অদ্ভূত নারী আপনি। স্বর্গদ্বার নাম সার্থক আপনার জন্যে। আপনাকে না দেখলে, এ দেশের নারীর মহিমা কিছুই বুঝতে পারতুম না।”

“কেয়া, গুরুজীকো আপ্লোক নেহি মান্তে হ্যায়? দেওতাকে বাত্ আউর গুরুকে বাত্ সব তো একই হ্যায়, বরাবর হ্যায়। নেহি জান্তে?” বলিয়াই দু'চোখ বুজাইয়া গুরুর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন স্তবপাঠ করিয়া,... “তস্মৈ শ্রীগুরবে নমো নমঃ।”

“গুরুবাক্যকে দেববাক্য বলে সবাই মনে করে। কিন্তু ঠিক আপনার মত এতখানি ত্যাগ শুধু গুরুদেবের কথায়, আমাদের বাংলাদেশের কোন মেয়ে পারত কিনা সন্দেহ!”

সহসা যেন আগুনে ঘৃতাহুতি হইল। তাঁর চোখমুখ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। হিন্দুস্থানী ভাষার সঙ্গে শুদ্ধ বাংলাভাষা মিশাইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, “মিথ্যে কথা! সব মেয়ের পক্ষেই সম্ভব! কেন মিছিমিছি বাঙ্গালীর মেয়ের অপবাদ দিচ্ছেন!”

আমি তো একেবারে হতবাক।

কিছুক্ষণ পরে সুমিষ্ট কণ্ঠে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তিনি আরও কহিলেন, “হরিদ্বারে আমাকে দেখেছেন ভৈরবীর বেশে, তখন আমি আমার গুরুজীর শিষ্যা। সেও যেমন সত্য আবার এখানে যা দেখছেন, পণ্ডিতজীর স্ত্রী, তাঁর

সন্তানের জননী, এ পরিচয়টাও তেমনি সত্য!"

বোধ হয় আমার মুখের রেখায় কেমন একটা অবিশ্বাসের, সন্দেহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাই তাঁহার কৈফিয়ত দিবার জন্য আবার নিজেই বলিয়া ফেলিলেন, "গুরুজী বলেন, জানিস বেটি, মন বড় বেইমান, যতক্ষণ না সে জানতে পারে সংসারের সব কিছু, ততক্ষণ বেড়ালের মত রান্নাঘরের চারিপাশে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। তাড়ালে পালায়, কিন্তু একটু পরেই আবার এসে হাজির হয় ঠিক সেইখানে।"

এবার আমি বলিয়া উঠিলাম, "আপনার এ কথার অর্থ কি, আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না, মাপ করবেন।"

তিনি বলিলেন, "অর্থাৎ আমার বিয়ের প্রস্তাবটা করার আগে তিনি এই-ভাবে আমাকে নর ও নারীর সম্পর্কের সম্বন্ধে জ্ঞান দিতেন। একদিন তিনি বললেন, মা তুমি অক্ষতযোনী, অখণ্ড কৌমার্যবতী, আমি জানি। তাই তোমার সম্পূর্ণ মনটাকে তুমি ঈশ্বরে সমর্পণ করতে পারছ না। কিছুদিন থেকেই আমি লক্ষ্য করছি। তুমি যে নারী, জীবধাত্রী, জীবসৃষ্টির মূলে যে তুমি, সে রহস্য যতক্ষণ না ভেদ করতে পারছ, ততক্ষণ তোমার জ্ঞান অর্ধসমাপ্ত থেকে যাবে, সম্পূর্ণ হবে না। আমি অনেক চিন্তা করেছি তোমার জন্যে। তারপর একদিন যখন লক্ষ্য করলুম তোমার অর্ধেক মন তোমার অজ্ঞাতেই পুরুষকে চাইছ, চমকে উঠে দুকানে হাত চাপা দিলুম—ইয়ে কেয়া বাত!"

গুরুজী বললেন, "হাঁ বেটি, মায় সাচ্ বাতায়া। যা সত্য, আমি তাই বলছি। আমার চোখে জল এসে পড়লো।"

কাতরকণ্ঠে বললুম, "গুরুজী, আমি চিরকুমারী ব্রহ্মচারিণী, এ কথা কানে শোনা পাপ নয় কি?"

"নেহি বেটি। মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলাটাই বরং পাপ।"

"কি বলছেন, আমি মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছি!" দুচোখের ধারায় আমার বুক ভিজে গেল।

গুরুজী তখন ধীরে ধীরে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, "বেটি, ঈশ্বরের সেবায় একমন একপ্রাণ হওয়া চাই। তুমি জান না, আমি লক্ষ্য করেছি, কাল রাত্রে যখন হোমাগ্নিতে আমি পূর্ণাহুতি দিচ্ছিলাম, তুমি পণ্ডিতের কাছে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে মন্ত্রপাঠ করছিলে, তখন তোমার বক্ষাঞ্চল হঠাৎ খসে পড়ল, তুমি আগে তাকে ঢাকতে বিব্রত হয়েছিল। পাশে যে পণ্ডিত রয়েছে সে যত বৃদ্ধ হোক তবু তো পুরুষ, এ কথাটা ভুলতে পারেনি তোমার মন। পবিত্র হোমাগ্নির দীপ্তির বদলে তোমার মুখে যে নারীর লজ্জা ও সঙ্কোচের রক্তিমাভা ফুটে উঠেছিল তুমি তা টের পাওনি। আমি চোখে দেখেছি।"

এই বলিয়া একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, "আপনি শুনলে অবাক হবেন, আমি এ দেশের মেয়ে নই, আমি বাঙ্গালীর মেয়ে। আমার নাম কমলিনী।"

সম্মুখে বজ্রপাত হইলেও বোধ করি এতখানি অভিভূত হইতাম না। তাই মুহূর্ত কয়েক বোকার মত তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া, শেষে শুধাইলাম, "কিন্তু এ বিবাহ কেমন করে সম্ভব হল বুঝতে পারছি না। আপনার বয়স তো খুব বেশী হলে কুড়ি কি বাইশ!"

"না। ঊনত্রিশ।"

কমলিনী দেবী এবার বলিলেন, "বুঝতে পারবে না ভাই। বোঝবার চেষ্টা করো না। পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস ঘটেছে, যা বিশ্বাস করানো লোককে কঠিন, জানি। তবুও যা সত্যি, তা অস্বীকার করব কেমন করে? তবে শোন, বলি? তুমি যখন জিজ্ঞেস করেছ, তখন আমি মিথ্যে বলতে পারব না, এই তীর্থস্থানে দাঁড়িয়ে।" বলিয়া তিনি যাহা বলিলেন তাহার মূল বক্তব্য হইল এই যে—একদিন তাঁহার কোন এক আত্মীয় তাঁহাকে লইয়া পলাইয়া আসিতেছিল এইখানে। কিন্তু ট্রেনের কামরায়, তাঁহার মুখ দেখিয়া গুরুজীর কেমন সন্দেহ জাগে। তিনি কাশী হইতে ওই একই কামরায় উঠিয়াছিলেন। তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, কাঁহা যা রহা বেটি?

তখন তিনি বলেন, হরিদ্বার। তাঁহার চোখের উপর সম্মোহিতের মত দৃষ্টি রাখিয়া তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, কিস্‌কো পাশ যা রহা, সাচ্‌ বাতাও! ম্যায় সাধু হুঁ। গোড় পাকড়কে বলো।

ব্যস, যা সত্য সব তিনি তখন বলিয়া দেন।

ফলে গাড়িতেই ওই মহাপুরুষ গুরুজীর সাক্ষাৎ কৃপালাভ করেন। তিনি মন্ত্র দিয়া তাঁহাকে শিষ্যা রূপে গ্রহণ করিয়া সেদিন তাঁহার সতীত্বরক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই পণ্ডিতজীও ছিলেন তাঁহার শিষ্য। হঠাৎ তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হওয়ায় ছয়টি বাচ্চা ছেলেমেয়ে লইয়া তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলে একদিন সেই গুরুজী তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন। গুরুর আদেশ তিনি অমান্য করিতে পারেন নাই, মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন।

সব শুনিয়া আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার সামনে কোন কথা উচ্চারণ করিতে পারি নাই। তিনিও আমার মুখের উপর নীরব দৃষ্টি ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন।

সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আমি বলিলাম, "বাস্তবিক আপনাকে দেখলে কিছুতেই কল্পনা করা যায় না যে এরা আপনার নিজের সন্তান নয়, আপনি অন্যের সন্তানদের নিয়ে এত খুশি ও আনন্দে আছেন!"

একটু থামিয়া তিনি এর জবাব দিলেন, "ভাই, যদি অন্য কারুর সঙ্গে আমার বিয়ে হত, যেমন সচরাচর মেয়েদের হয়, তাহলে এতদিনে এতগুলি ছেলেমেয়ের মা হতে আমার কোন বাধা থাকত না। তাদের সুখদুঃখকে যদি নিজের বলে নিতে বাধ্য হতুম, তাহলে পণ্ডিতজীর ছেলেমেয়েরা কি অপরাধ করলে! এদের আমি আমার ছেলেমেয়ে বলেই মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছি, তাই আমি অসুখী নই। আমি খুব আনন্দে আছি।"

বলিয়া একটু থামিয়া আবার শুরু করিলেন, "এও তো আমি সেই গুরুরই সেবা করছি, তাঁর নির্দেশমত কর্মে নিজেকে নিযুক্ত করেছি। গীতায় ভগবান বলেছেন, 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'—তাছাড়া মানুষের মাঝেই তো ভগবান রয়েছেন। মানুষের সেবাই তো ঈশ্বরের সেবা। এর চেয়ে বড় ধর্ম আর কি আছে জগতে! বেশ আছি। বড় আনন্দে আছি ভাই। তুমি ঠিকই বলেছ। স্বামী-স্ত্রীতে মাজন তৈরী করে বিক্রী করি। এমনি করেই দিন কেটে যাচ্ছে গুরুর কৃপায়।"

ছোট ছেলেটা ঠিক এই সময় মা বলিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, "মায়ি ভুখ্ লাগা বহুত!"

"চলো বেটা। অভি যা রহু," বলিয়া তাঁহাকে বুকের মধ্যে সস্নেহে তুলিয়া লইয়া ভিতরে যাইতে উদ্যত হইলেন।

সহসা আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিলাম, "আচ্ছা যদি কিছু মনে না করেন জিজ্ঞেস করতে পারি কি, সেই যে আত্মীয়, যাঁর সঙ্গে আপনি গৃহত্যাগ করে-ছিলেন তাঁর কি হল?"

ঈষৎ হাসিয়া তিনি জবাব দিলেন, "তিনিও এখানে আছেন।"

বলিলাম, "কোথায়? আপনার বাড়িতে?"

"না।" বলিয়া তিনি কহিলেন, "রাজঘাটের কাছে একটা বিরাট অশ্বত্থ গাছের তলায় যে শিবমন্দির আছে, তিনি এখন সেখানের মহান্ত মহারাজ।"

"ওঃ, তাহলে তো আমি তাঁকে দেখেছি। একমুখ কালো দাড়ি, মাথায় ইয়া জটা। বড় বড় টানা চোখ—রংটা কালো।"

"হাঁ, ঠিকই দেখেছেন।"

আশ্চর্য! তাঁর কথাবার্তা, ঢং-ঢাং—কোথাও তো বাঙ্গালীত্বের এতটুকু নামগন্ধ নেই!

কমলিনী দেবী দুই হাত জোড় করিয়া কপালে তুলিয়া বলিলেন, "উনি ঠাকুরের কৃপা লাভ করেছেন। যথার্থ যোগীপুরুষ।"

আমি আর কিছু না বলিয়া শুধু দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া তাঁহাকে নমস্কার জানাইতে গিয়া মনে মনে বলিলাম, ধন্য বাঙ্গালী, তোমার অসাধ্য কিছু নাই।

আসিবার সময় সারা পথ, শুধু পান্ডাজীর সেই কথাটি যেন কানের কাছে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ইয়ে তো স্বর্গদোওয়ার হ্যায় জী'!

॥ আট ॥

পান্ডাজীর বাড়ি হইতে চলিয়া আসিবার সময়, তাঁহার মাতাজী বলিয়া ছিলেন, এদিকে যখন আসবে, দেখা করে যেয়ো, কেমন?

মুখে হাঁ বলিলেও পান্ডাজীর সেই খান্ডারনী স্ত্রীর জন্যে, ও-বাড়িতে

ইচ্ছা করিয়াই ঢুকিতাম না। হয়ত তিনি মনে করিতেন, তাঁর সেই বিধবা ননদকে দেখিবার লোভে আসিয়াছি।

পরে একদিন পাণ্ডাজীর মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া কথায় কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা আপনি কমলিনী দেবীকে চেনেন?"

"কমলিনী দেবী! কোথায় তার ঘর বাবা?"

"ওই যে মাজন বিক্রী করেন! আবার কখনও ভৈরবীর বেশে ত্রিশূল হাতে নিয়ে যান! আপনাদের এই কন্‌খলের বাজারের ভিতর দিকে একটা গলির ভেতরে থাকেন।"

"ও বুঝেছি। আর বলতে হবে না। কমলার কথা বলছো!" বলিয়া আমায় থামাইয়া দিলেন।

"সত্যি উনি যে বাঙ্গালীর মেয়ে, তা জানতুম না।"

"কী ভাবে তার পরিচয় পেলে বাবা?"

"সেদিন মাজন কিনতে গিয়েছিলুম ওঁর বাড়িতে। তিনি নিজেই সব পরিচয় দিলেন। বাস্তবিক, অদ্ভুত চরিত্র মহিলার! একটি বৃদ্ধ ঘাটের মড়াকে বিয়ে করে কেমন সুখে সংসার করছেন!"

আমার কণ্ঠে তাঁর সম্বন্ধে এত বেশী উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিয়া কিনা জানি না, মাতাজী বলিয়া উঠিলেন, "তুমি তো ছেলেমানুষ, কদিন বা এখানে এসেছ! একটু চোখ খুলে রাখলে অমন কত কিছু উদ্ভট দেখতে পাবে এখানে। এটা স্বর্গদোওয়ার, ভুলে যেয়ো না। এখানে বাইরে থেকে দেখে মানুষ চেনা যায় না। এখানে সবই সম্ভব, আবার সবই অসম্ভব।" বলিয়া একটু হাসিয়া চুপ করিলেন।

তাঁহার হেঁয়ালি ঠিক ধরিতে না পারিয়া বলিলাম, "অবশ্য আপনি এখানে এতকাল রয়েছেন, আপনি অনেক কিছু জানেন।"

মুখটা বিকৃত করিয়া তিনি বলিলেন, "ওসব পরের কেচ্ছা ঘাঁটা আমি পছন্দ করি না। আমার ছেলেও করে না। তাই ঘরের মধ্যেই থাকি। কোন বিশেষ বিশেষ পালপার্বণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করতে যাই, কি মন্দিরে যাই। তাছাড়া আমার সময় কৈ বাবা! দেখছ তো ভোর থেকে উঠে রাত পর্যন্ত ফুরসৎ নেই। কাজের চাকায় ঘুরছি দিনরাত।"

এই বলিয়া একপ্রকার সুর গলায় টানিয়া তিনি বলিলেন, "তবে ঘরের ভেতরে বসে থাকলেও কানে আসে সব কিছু বাবা। অনেকেই জানে না, ওই যে স্নানের ঘাটে নামতে ডানদিকে ছোট একটা মন্দির ও তার সঙ্গে একটা ধর্মশালা, ওটা কার জান?"

বলিলাম, "না।"

"ওই যে সামনে ছোট্ট একটা খাটিয়ার ওপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকে সব সময়, একমাথা পাকাচুল নিয়ে শুঁটকি মত একটা বুড়ী—মুখের চামড়াগুলো যার কুঁচকে গেছে—ওপর-নীচ দাঁতের পাটিতে বোধ হয় একটা কি দুটো

অবশিষ্ট আছে—উনিই ওই মন্দির আব ধর্মশালা তৈরী করে দিয়েছেন।”

বলিলাম, “হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি বটে। স্নান করতে যাবার সময় অনেকেই তাঁর কাছে গিয়ে বলে, মাতাজী, নমস্তে, আর তিনি হাতটা তুলে যেন তাদের আশীর্বাদ করেন।”

“মাতাজী না ছাই! সব পৈতে পুড়িয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছেন! তিনি ছিলেন এককালে তোমাদের কলকাতার ডাকসাইটে বাঈজী। বাঙালীর মেয়ে মতিবাঈ। কত বড় বড় লোকের ভিটেমাটি চাটি হয়েছে ওর জন্যে, ধনীকে পথের ভিখিরী করে ছেড়েছেন একদিন, সে কথা কেউ জানে না। এ স্বর্গদ্বার, এখানে আসে সবাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। সারাজীবনের পাপের সঞ্চিত ধন দিয়ে দান-খয়রাত করে এখানে মন্দির ধর্মশালা বানিয়ে লোকের চোখকে ওরা ধাঁধিয়ে দেয়। তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আদায় করার জন্যে।”

কণ্ঠে বিস্ময় চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বলিলাম, “বলেন কি! মতিবাঈ ওই শুকনো বুড়ীটা! ওর নাম কলকাতায় অনেক বুড়োদের কাছে শুনেছি। যেমন সুন্দরী, তেমনি নাকি ভাল নাচগান করতে পারত।”

পান্ডাজীর মা বলিলেন, “ওর এখন বয়েস অনেক হয়েছে, লোকে বলে নাকি আশির কাছাকাছি। ওই যে ঘাটের বাঁদিকে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের আগে একটা মহাদেবের মন্দির একটু ভেতর দিকে রয়েছে, সেখানে কোন দিন গিয়ে দেখেছ?”

বলিলাম, “হ্যাঁ, ওখানে তো গিয়েছি। মন্দিরের মহান্ত একজন মোটামত, বিরাটকায় জটাজুটধারী সন্ন্যাসী, চোখ দুটো সব সময় ভাঙ খেয়ে রক্তবর্ণ হয়ে আছে, তাকে দেখে হঠাৎ আমার বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলার সেই কাপালিকের কথা মনে পড়েছিল।”

পান্ডাজীর মা বলিলেন, “না। ও লোকটার ভেতর যথার্থ কিছু আছে। সত্যিকারের যোগীপুরুষ। ঠাকুরের কৃপালাভ করেছে ও।”

“তাই নাকি?”

“জানো কি উনিও বাঙালী, ব্রাহ্মণের ছেলে?”

বাস্তবিক, এখানে কি সবই বিচিত্র! সব চেয়ে অবাক লাগিত বাঙালীদের কথা ভাবিয়া। কি অদ্ভুত ভাবে তাহারা উহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একাত্ম হইয়া গিয়াছে। ধরিবার উপায় নাই।

মনে পড়ে প্রথম যেদিন সন্ধ্যারতির সময় সেই শিবমন্দিরে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে চলিয়া আসিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, “মাত্ যাইয়ে মহারাজ, আভি পেরসাদ মিল্ যায়েঙ্গে!”

“ভগবানকে সেবা হো গিয়া জী?”

“আভি থোড়া দের হ্যায়। আপ্ ঠ্যার যাইয়ে।”

ভগবানের সেবার যথার্থ অর্থ যে কি, তাহার আস্বাদ পূর্বেই পাইয়াছিলাম। তাই পাশের ঘরের দিকে নজর দিতেই বিলম্বের কারণটাও বুঝিতে

পারিলাম। তখনো সেই ঘরে বিরাট পাথরের শিল ও নোড়ায় সিদ্ধিবাটা চলিতেছে। একটু পরে শিলের শব্দ থামিয়া গেল। এবং বিরাট লোটার মধ্যে সিদ্ধিবাটার সঙ্গে কাঁচা দুধ, বাদামবাটা ও অন্যান্য কিসব সুগন্ধ মশলা মিশাইয়া মন্দিরের মধ্যে এক ব্যক্তি লইয়া গিয়া, শিবলিঙ্গের মাথায় মন্ত্র পড়িয়া একটু ঢালিয়া দিল, তারপর বাহিরে আনিয়া ছোট ভাঁড়ে একটু ঢালিয়া আমার হাতে দিল।

সিদ্ধি আমি কখনো খাই নাই। কিন্তু ওখানে যেদিন হিমালয়ের ওই ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুকের ভিতরের হাড়গুলো শিরশির করিত, তখন ওই অমৃত-টুকু যেন নতুন জীবন আনিয়া দিত।

ওদিকে ঠিক সন্ধ্যার সময় যেদিন যাইতাম, তখন ওই কথা বলিয়া প্রশ্ন করিতাম, "নমস্তে মহারাজজী। ভগবানকো সেবা হো গিয়া!"

এ কথার মধ্যে কি ইঙ্গিত লুকানো আছে, তা মহান্তজী ভালো ভাবেই জানিতেন, এবং আমার মত আরও বহু অমৃতপিয়াসীকে করজোড়ে ঠিক সময়ে সেখানে উপস্থিত থাকিতে দেখিতাম।

তবে ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, মহান্তজী যেন আমার প্রতি একটু বেশী স্নেহ দেখাইতেন। জানি না বাঙ্গালী বলিয়া কিনা।

এ জায়গাটা যেন আমাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছিল: বৈকালে আমি এক-একদিন, এক-একদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কোনদিন ক্যানালের ধার দিয়া, গুরুকুলের দিকে চলিতে চলিতে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইতাম। তাহার কাকচক্ষুর মত স্থিরজলের উপর কমলালেবু বনের স্তব্ধ ছায়ার সঙ্গে অস্তগামী সূর্যের শেষ রক্তিম আভাটুকু পশ্চিমের আকাশ হইতে চুপি চুপি আসিয়া নিঃশব্দে রঙের খেলা খেলিতে খেলিতে কেমন ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া যাইত, আমি দুই চোখ ভরিয়া সে রূপসুধা পান করিয়া যখন ধর্মশালায় ফিরিতাম, তখন মনে হইত সত্যি, স্বর্গদ্বারই বটে। সার্থক নাম। আবার কোনদিন বা রাজ-ঘাটের ওপর যে রাধাকৃষ্ণের মন্দির, তাহার অলিন্দে বসিয়া সন্ধ্যার আরতির সময় ভক্তিমতী সুন্দরী রূপসীদের মধ্যে কত প্রেমময়ী রাধিকার বাস্তব মূর্তি প্রত্যক্ষ করিতাম।

মনে পড়ে, একদিন ওইখানে হঠাৎ এক তরুণ কিশোর আমার সামনে আসিয়া, দু'হাত জোড় করিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজজী, আপ্‌কো মোকান্‌?"

বলিলাম, "কলকাত্তা।"

"আপ্‌ কেয়া বাঙ্গালী?"

"হাঁ জী। কাঁহে?"

সে তখন ভক্তিগদগদ কণ্ঠে গাড়োয়ালী ভাষায় যা বলিল, তার অর্থ

হইতেছে, সে পাণ্ডার ছেলে, থাকে দেবপ্রয়াগে, সেখান হইতে টোলে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ওখানে আসিয়াছে। তাহার একান্ত ইচ্ছা ইংরাজী শিখিবার, তাই আমি যদি তার সেই সাধ পূর্ণ করি, তাহা হইলে চিরজীবন সে আমার কাছে ঋণী থাকিবে। কি জানি তাহার সারল্যভরা দুই চোখের দিকে তাকাইয়া সহসা আমার তপোবনের আশ্রমমৃগের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাহার সে অনুরোধ তাই এড়াইতে পারিলাম না। আমার ঠিকানাটা তাহাকে দিয়া দিলাম।

পরদিন সকালে আটটা বাজিতে না বাজিতেই দেখি সদ্যস্নাত, শুভ্রবস্ত্র পরিহিত, এক আশ্রমবালক যেন, আমার দোরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার কপালে চন্দনের ফোঁটা। ওই শীতে গায়ে একখানি সাদা উত্তরীয়।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র 'নমস্তে' বলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া উত্তরীয়ের, প্রান্তের গিঁট খুলিয়া, সদ্য তোলা গোলাপ, বেল, জুঁই ফুলের রাশি দুই হাতের অঞ্জলি ভরিয়া আমায় অর্পণ করিল। মুহূর্তে আমার ঘরটা যেন আশ্রমে রূপান্তরিত হইল।

বলিলাম, "এ কি?"

লজ্জা ও সংকোচ-জড়িত কণ্ঠে সে উত্তর দিল, "এই আমার গুরুদক্ষিণা। এর চেয়ে বেশী আর কিছু দেবার সাধ্য আমার নেই। আমি যে টোলে বিনা খরচে থাকি খাই লেখাপড়া শিখি, তার বাগানের ফুল। অসংখ্য ফুল ফোটে রোজ সেখানে।"

এইভাবে রোজ সে একরাশ টাটকা ফুল গাছ হইতে তুলিয়া আনিয়া আমার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিত, আর তার বিনিময়ে আমি তাকে শিখাইতাম, ডগ্ মানে কুত্তা, ক্যাট মানে বিল্লি, মাঙ্কি মানে বাঁদর ইত্যাদি।

জানি না, আজও আমাকে তাহার মনে আছে কিনা। আমার সেই শিক্ষা তাহার জীবনের পথে কতখানি আলো দান করিয়াছে। তবে আমি আজও তাহাকে ভুলি নাই। তাহার নামধাম বাড়ির ঠিকানা সব সে আমায় দিয়াছিল। বলিয়াছিল, দেবপ্রয়াগে তাহার ঘর। সেখানে তাহার বাবা, ঠাকুরদাদা সবাই আছেন। তাহাদের জাতব্যবসা পাণ্ডাগিরি। যদি কোনদিন ওদিকে যাই, যেন নিশ্চয়ই তাহাদের বাড়িতে উঠি।

বলা বাহুল্য, তারপর আর ও অঞ্চলে কোনদিন যাই নাই। তবে আমার প্রবাসজীবনের সেই ক্ষণিক স্মৃতি যে আদৌ ভুলি নাই, তাহার প্রমাণ যখন কেউ দেবপ্রয়াগের কথা বলে বা কোন বইয়ে সেই স্থানটির উল্লেখ পাই, সহসা যেন আমার চোখের সামনে সেই সদ্যস্নাত, শুভ্রবস্ত্র ও উত্তরীয় পরিহিত তাপস বালক কপালে শ্বেতচন্দনের টিপ ও দুই হাতে সদ্য ফোটা ফুলের ডালি লইয়া আসিয়া দাঁড়ায়। স্বর্গদ্বারের বহু স্মৃতির স্রোতে সে ভাসিয়া যায় নাই। যেমন মনে পড়ে সাবিত্রী পাহাড়ের মাথার উপরের ঝিকিমিকি সেই প্রথম সন্ধ্যাতারাটিকে, আর কনখলের রাধাকৃষ্ণের মন্দির হইতে গঙ্গার ওপারে দূরে

টিহিরি গাড়োয়ালের পর্বতশৃঙ্গের মধ্যে ছোট্ট একটি পায়রার মত শ্বেতবর্ণ গাড়োয়ালের সেই রাজবাড়িকে।

॥ নয় ॥

পাণ্ডাজীর মা একদিন বলিয়াছিলেন। এখানে আসে যত পাপীতাপী, সারা-জীবন ধরিয়া কুকার্য করে তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে। জীবনের পৃষ্ঠায় যার যেটুকু কালির দাগ লাগিয়াছে, কলঙ্কের সেই চিহ্ন যেন মাজিয়া ঘষিয়া গঙ্গার জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে চায়। নহিলে বুঝি স্বর্গে ঢোকার প্রবেশপত্র মিলিবে না। সার্থক নাম স্বর্গদ্বারের। কথাটার তাৎপর্য সেদিন ঠিকমত বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু আরো কিছুদিন সেখানে বসবাস করিবার পর, সে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল কেমন করিয়া সেই কথাই বলিতেছি। কন্‌খলে ঢুকিবার মুখে, বাঁহাতি উঁচু পাঁচিল-ঘেরা এক বিরাট বাগানের প্রকাণ্ড ফটকের উপর লেখা ছিল 'সদানন্দ মিশন'।

ওই রকম মঠ মিশন আখড়ার ছড়াছড়ি ও অঞ্চলে। ভারতবর্ষে যে কত বিভিন্ন সাধক সম্প্রদায় আছে, তা এখানে এলে যেমন প্রত্যক্ষ করা যায় অন্য কোন তীর্থে বোধ হয় তেমন হয় না। তার কারণও বোধ করি ওই 'স্বর্গদ্বার' নামটির মধ্যেই বিধৃত। স্বর্গে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্য সবাই তাহার দরজায় আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাই হরিদ্বার, কন্‌খল, ঋষিকেশ প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া এত সাধু সন্ন্যাসী মহান্তদের ভিড়। ভোগবিলাসের বদলে শুধু বৈরাগ্য, শুধু ত্যাগের চিত্র এখানে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জী থা' উপনিষদের এই বাণীর সার্থক রূপ, একমাত্র এখানেই যেন চোখে দেখা যায়।

পাণ্ডাজীর ভাষায় 'ইয়ে তো স্বর্গদোওয়ার হ্যায়জী'!

এই 'সদানন্দ মিশনে'র সামনে দিয়া অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি। আর সেই বড় ফটকটা সব সময় বন্ধ থাকে বলিয়া কিনা জানি না। উহার ভিতরে কি আছে, দেখিতে যাইবার কৌতূহল কোনদিন বোধ করি হয় নাই।

সেদিন হঠাৎ ওই ফটকটার কাটা দরজাটা খোলা দেখিয়া, ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। সত্যি কথা বলিতে কি, ভিতরটা যে ওইরকম ছবির মত সাজানো, কখনো ভাবি নাই। এককালে যে উহা কোন 'রহিস আদমী'র শৌখীন বাগান-বাড়ি ছিল, তাহার চিহ্ন তখনো সুসজ্জিত ফুলফলের গাছে, কেয়ারী করা আঁকাবাঁকা পথের দু'পাশে সারি সারি শ্বেতপাথরের টুকরো পোঁতা দেখিলেই বুঝা যায়। এখানে ওখানে ছোটখাটো অনেকগুলি কুটীর ছড়ানো। কোনটা গাছপালায় ঘেরা, কোনটার বা কিছু অংশ দেখা যায়, কিছু যায় না, ফুল-গাছের আড়ালে ঢাকা। ফটকের মধ্য দিয়া ঢুকিলে হঠাৎ ভুল হয় বুঝি কোন তপোবনে আসিয়া পড়িলাম। অবশ্য ইহার জন্য সম্মুখের গঙ্গার ওই

উদারবিস্তৃতি ও ওপারের ধ্যানমগ্ন গিরিশ্রেণীর পটভূমিকার সৌন্দর্যই দায়ী। ওই প্রাচীরবেষ্টিত বাগানটার ভিতরের অনেকটা অংশ কেবল গঙ্গার তীরেই অবস্থিত ছিল না। কুলকুলনাদিনী নীলধারা ঠিক ওই জায়গাটায় আসিয়া সহসা এমন ভাবে বাঁকিয়া গিয়াছে যে মনে হয় যেন ওপার হইতে গঙ্গাদেবী দুই ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়া সেই স্থানটিকে তাঁহার বুকের ভিতর টানিয়া লইয়াছেন।

তাই ভিতরে ঢুকিয়া সম্মুখে তাকাইবা মাত্র আমার মুখ দিয়া অস্ফুট স্বরে শুধু বাহির হইল, বাঃ!

অস্তগামী সূর্যের শেষ রক্তিমাভা তখন ধ্যানমগ্ন গিরিরাজের ললাটে, বৃক্ষচূড়ায়, আশ্রমের অভ্যন্তরে, গঙ্গাবক্ষের উপলখণ্ডে প্রতিহত ঝিরঝির ধারার অস্ফুট ওঙ্কারধ্বনিতে।

সামনের পথটা ধরিয়া একটু ঘুরিয়া গিয়া, একেবারে গঙ্গাতীরের শান-বাঁধানো বিরাট ঘাটটার চত্বরে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিলাম সেই-দিকে। হরিদ্বারের গঙ্গার অনেক ঘাট হইতে দাঁড়াইয়া এইরকম আসন্ন সন্ধ্যায় ওপারের দিকে তাকাইয়া যে ছবি এতদিন দেখিয়াছি, এর সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না। এর সৌন্দর্য ছিল সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। মনে হইল যেন বিশ্ব-শিল্পীর আঁকা একখানি বিরাট চিত্রপট সহসা কে আমার চোখের সামনে মেলিয়া ধরিয়াছে।

আশ্রমের কোন একটি কুটীরে তখন কীর্তন গান হইতেছিল। একটু পরে সেই গান লক্ষ্য করিয়া সেদিকে অগ্রসর হইলাম। নিশ্চিত উহাই মূল মন্দির, সন্ধ্যা-আরতির পর কীর্তন হইতেছে, সেখানে গেলেই আশ্রমবাসীদের সাক্ষাৎ মিলিবে।

বলাবাহুল্য, তখনো পর্যন্ত একটি মানুষেরও সাক্ষাৎ পাই নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই মন্দিরের কাছে পৌঁছিবার আগেই কীর্তন থামিয়া গেল। দেখিলাম সামনের একটি ঘর হইতে আট-দশজন পুরুষ, অধিকাংশই অধিক বয়স্ক, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ, নিঃশব্দে যে যার কুটীরের দিকে চলিয়া গেলেন। সবশেষে তিন-চারজন গেরুয়াধারী পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁর মাথায় একবোঝা জটা, অনেকটা বেদেনীদের সাপের ঝাঁপির মত দেখিতে, এবং কুচকুচে কালো রংয়ের দাড়ি বুক ছাপাইয়া নাভিমূল পর্যন্ত বিলম্বিত, তিনি আমার দিকে আগাইয়া আসিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন, "আসুন এদিকে। ঠাকুরের দর্শন করতে এসেছেন তো?"

"আজ্ঞে হাঁ।" বলিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতে গেলে তিনি পা-দুটা পিছনে টানিয়া লইয়া নিজের কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিলেন, "জয় গুরু, পায়ে হাত দেবেন না। ঠাকুর সকলের ভেতরই আছেন।"

তাহার কি জবাব দিব ভাবিয়া না পাইয়া বলিলাম, "কীর্তন বুঝি শেষ হয়ে গেল?"

"হ্যাঁ। আমাদের এখানে কীর্তন সন্ধ্যার আগেই শেষ হয়। সন্ধ্যার পর যে যাঁর নিজের কুটিরে ধ্যানধারণা পূজাপাঠ আপন অভিরুচিমত করেন।" বলিতে বলিতে সেই কুটীরের সামনে যেই আসিয়া দাঁড়াইলাম, মহারাজ বলিলেন, "যান ভিতরে গিয়ে দর্শন করে আসুন।"

মন্দির বলিতে সাধারণত আমরা যা বুঝি ইহা তেমন কিছু নয়। আরো পাঁচ-দশটা কুটীরের মত ইহাও একটা। তফাৎ শুধু তার ভিতরে ছোট্ট একটু উঁচুমত বেদী, আর তার উপরে একখানা বাঁধানো বড় ছবিতে ফুলের মালা দেওয়া। সে ছবি একজন অতি সাধারণ জটাজুটহীন মহারাজের। তিনি বাঘছালের উপর উপবিষ্ট। তখনো ধূপ-ধুনার ধোঁয়া ঘরের ভিতরে রহিয়াছে, আরতি-প্রদীপের মুখে কয়েকটা শিখা নিভিয়া গেলেও দুই-একটি তখনও মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে।

দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিতে তিনি বলিলেন, "ইনিই আমাদের গুরুমহারাজ।"

নেহাৎ সাদাসিধা ধরনের মানুষ। মাথায় জটার ভার নাই। আবক্ষলম্বিত দাড়ির বোঝাও নাই। মুখচোখে কোথাও দিব্যজ্যোতিও দেখিলাম না। যেমন মন্দির। তেমনি তাঁর গুরু।

বোধ হয় আমার মুখের রেখায় মনের ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি একটা কাঁচা শালপাতার দোনায় করিয়া একখানি প্যাঁড়া ও কয়েক টুকরা ফল আনিয়া আমার হাতে দিবার সময় বলিলেন, "আমাদের আরো তিন-চারিটি আশ্রম আছে। কাশী, গয়া, বৃন্দাবন ও পুরীতে। গুরুমহারাজ এখন এখানে নেই। তিনি পুরীর আশ্রমে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি বুঝি ঘুরে ঘুরে বেড়ান সারা বছর ধরে এক এক জায়গায়?"

"তার কিছু স্থিরতা নেই। যখন যেখানে যে রকম প্রয়োজন, থাকেন।"

"এখানে এই আশ্রমের ভার বুঝি আপনার ওপর?"

"সকলে আমায় মহান্ত মহারাজ বলে ডাকেন বটে কিন্তু আশ্রমের কাজ-কর্ম আমরা চারজন গুরুভাই মিলেমিশে করি। এছাড়া আমাদের শিষ্য-শিষ্যাদের সব সময়ই আসা যাওয়া আছে। অনেকে আবার এখানেই বারো মাস থাকেন।"

বললাম, "সত্যি চমৎকার আপনাদের এই আশ্রমের পরিবেশ, একবার এসে আর চলে যেতে ইচ্ছা করে না। এত মঠ এত আশ্রম এখানে দেখলুম। কিন্তু এ স্থানের আর তুলনা হয় না।"

মহান্ত মহারাজ বিনয়াবনত কণ্ঠে কহিলেন, "যাঁরাই এখানে প্রথম আসেন, ওই কথা বলেন। বেশ তো আসবেন, যখন ইচ্ছা। আমাদের এখানে গেস্ট হাউসও আছে।" কথাটা বলিয়া ফেলিয়া হয়ত তাঁহার মনে হইল, এতটা আগ্রহ না দেখাইলেই হইত। তাই পুনরায় বলিলেন, "আপনি এখানে

কোথায় উঠেছেন?"

"গঙ্গা-ভাগীরথী ধর্মশালায়। হরিদ্বারের সেই লাল পুলটার কাছাকাছি।"

মহারাজের পাছে অহমিকা প্রকাশ পায়, তাই বলিলেন, "ও জায়গাটিও ভাল, ভেতরে অনেকখানি বাগান আছে, অনেক গাছপালা তাতে।"

বলিলাম, "ওকথা বললে আমি শুনবো না। এ আপনাদের সাধুজনোচিত ঔদার্য।"

"চলুন আপনাকে আমাদের আশ্রমের ভেতরটা একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই। সন্ধ্যার অন্ধকার এখনো নামেনি। আরো একটু আগে এলে ভাল করে সব দেখতে পেতেন।" বলিয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখাইয়া আমাকে লইয়া অবশেষে সেই শানবাঁধানো ঘাটটার চত্বরে আসিয়া বসিলেন। চুপ করিয়া গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া। সেই ঘাটের চওড়া চওড়া সিঁড়ির নীচে, আরো নীচে গঙ্গার কাছাকাছি। যে কয়জন বসিয়াছিলেন তাঁহারা সবাই বোধ হয় ওই আশ্রমেরই শিষ্য। কাহারো মুখে কোন কথা নাই। কেহ কাহারও সঙ্গে কোন বিষয় লইয়াই আলোচনা করিতেছিল না। সবাই নিশ্চুপ। যেন ধ্যানমগ্ন।

স্বর্গ কোথায় জানি না। জানি না কোন্ দিকে তার প্রবেশ দ্বার। তবে সেদিন সেই পরমক্ষণে, বিশেষ মুহূর্তে অন্য সকলের মত নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গোপনের একপ্রান্তে বসিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হইল, যেন আমার সম্মুখে ওই যে ধ্যানমগ্ন গিরিরাজ দেবতাত্মা হিমালয় ও তাঁর পদপ্রান্তে স্তব-গান মুখরিত ওই অনন্ত কল্লোলিনী গঙ্গার ধারা, তার সঙ্গে আকাশ মাটি গাছপালা বিশ্বপ্রকৃতি সব যেন মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। ধরার সঙ্গে অধরার, রূপের সঙ্গে অরূপের, মর্তের সঙ্গে স্বর্গের কোন ভেদাভেদ নেই। আমি যেন একাত্ম হইয়া গিয়াছি তাহাদের সঙ্গে। বস্তুর মধ্যে যিনি বস্তুস্বরূপ, সৌন্দর্যের মধ্যে যিনি অনন্তসুন্দর, সেই ঈশ্বরকে যেন প্রত্যক্ষ করিলাম চোখের সামনে। সহসা আমার কাছে যেন ধ্বনিত হইল উপনিষদের সেই বাণীঃ—

'যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো বিশ্বভুবনম্ আবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।'

অর্থাৎ যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি সমুদয় জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বারংবার নমস্কার করি।

সেই দিন মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলাম, যেমন করিয়া হউক আশ্রয় লইতে হইবে। ঠিক এইরকম একটা স্থান যেন আমার মন খুঁজিয়া ফিরিতে-ছিল। এতদিন পরে কে যেন উহা চোখে আঙ্গুল দিয়া আমায় দেখাইয়া দিল।

॥ দশ ॥

এরপর হইতে প্রায়ই যাইতাম ওখানে। কখনো সকালের দিকে, কখনো অপরাহ্ণে, কখনো সন্ধ্যায়। কিন্তু যেদিনই গিয়াছি। দেখি সেই মহান্ত মহারাজ কোন না কোন সাংসারিক কাজকর্মে ব্যস্ত। একদিন দেখিলাম, কোদাল লইয়া মাটি কোপাইতেছেন। রীতিমত চাষীমজুরদের ন্যায় ক্ষেতের কাজ করিতে-ছিলেন। আবার একদিন দেখি কুড়ুল দিয়া মোটা মোটা কাঠ চেলা করিতে-ছেন। একদিন দেখিলাম, রান্নার মহলে বড় বড় বালতি জলে ভর্তি করিয়া ইঁদারা হইতে জল লইয়া যাইতেছেন। আর একজন গেরুয়াধারী মহারাজ উঁচু শিকলবাঁধা বালতি দিয়া কপিকলের সাহায্যে গভীর ইঁদারা হইতে টানিয়া হিঁচড়াইয়া সেই জল উঠাইতেছিলেন।

আমার কাছে সেই ঘাটের চাতালটি ছিল প্রধান আকর্ষণ। যখনই যাইতাম মহান্ত মহারাজের সঙ্গে দেখা হইয়া যাইত। তিনি কিন্তু ওই সব কাজ করার জন্য এতটুকু লজ্জাবোধ করিতেন না। বরং যেদিন এ অবস্থায় দেখিতাম, কি দিয়া কথা শুরু করিব ভাবিয়া না পাইয়া, হয়ত কাঠ চেলা করিতেছেন, নমস্কার করিয়া শুধাইলাম, "কি, কাঠ চেলা করছেন?" তেমনি জল টানিয়া লইতে দেখিলে প্রশ্ন করিতাম, "জল তুলছেন?"

লম্বা গোঁফদাড়ির মধ্য দিয়া তাঁহার মুখের কোন ভাবান্তর চোখে পড়িত না। শুধু মুখটা ফাঁক হইয়া গিয়া কয়েকটি দাঁত চকচক করিয়া উঠিত। তিনি জবাব দিতেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, নরনারায়ণের সেবার আয়োজন করতে হবে তো?"

তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কোন দিন এই সব কাজের জন্য এতটুকু বিরক্তি, মুখভার বা গম্ভীর তাঁহাকে দেখি নাই। পরম উৎসাহে, আনন্দের সঙ্গে যেন তিনি ওই সব করিতেন।

আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ, যোগাভ্যাস বা ধ্যানধারণা করিতে কেবল তাঁহাকে নয়, আর কোন সাধুমহারাজ বা আশ্রমবাসীদেরও দেখি নাই। শুনিয়া-ছিলাম সাধু-সন্ন্যাসীদের জপতপের সময় দিবাদ্বিপ্রহর নয়। প্রকাশ্যও নয়। সেটা একান্ত গোপনীয়। কেহবা মধ্যরাত্রে, কেহবা সারারাত জাগিয়া জপতপ করেন এইরূপ জনশ্রুতি আছে বলিয়া, সে সম্বন্ধে মনেও কোনরূপ কৌতূহল জাগে নাই। শুধু এক-একদিন মনে হইত যদি সারাদিন ধরিয়া ওইরকম হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিবেন, তাহা হইলে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া এখানে আসিবার প্রয়োজন কি ছিল! ইহার জন্য দৈহিক ক্লেশ রীতিমত হইত, সন্দেহ নাই। যদিও মুখ দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। তবে সব সময়

তাঁহার দুই চোখে যেন এক রহস্যময় হাসি লাগিয়া থাকিত। আশ্রমের অধিবাসীদের মধ্যে কাহাকেও কোন দিন ধ্যানধারণা করিতে বা গুরু মহারাজের ঘরে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে দেখি নাই। শুধু ওই কীর্তনের সময়টুকু, তাও এক ঘণ্টার বেশী নয়—অনেকেই গিয়া বসিতেন। অধিকাংশ সময়ই তাঁহারা বাগানের মধ্যে নিজ নিজ কুটীরে কিংবা ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া চুপচাপ গঙ্গার দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। এক ঘণ্টা নয়, দু ঘণ্টা নয়, চাঁদনীরাত হইলে চার-পাঁচ ঘণ্টা বা কেহ কেহ অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেখানে মৌন হইয়া বসিয়া থাকিতেন।

যেদিন মহান্ত মহারাজের মুখে শুনিলাম তাঁহাদের আশ্রমবাসীরা অনেকেই শিক্ষিত ব্যক্তি, পণ্ডিত, তখন আমার শ্রদ্ধা ওই আশ্রমের প্রতি আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে মৌখিক আলাপ বা দু'চারটি কথাও কোন কোন আশ্রমবাসীর সহিত যে হয় নাই তাহা নয়। তবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম সবাই স্ব-স্ব গন্ডীর মধ্যে যেন একাকী নিশ্চুপ থাকিতে ভালবাসেন। বেশী কথা বলিয়া কেহ কাহারও সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতেন না বা বৃথা সময় নষ্ট করিতেন না। ইঁহাদের মধ্যে একজনের চেহারা আমাকে আকৃষ্ট করে সব চেয়ে বেশী। দীর্ঘকায় পুরুষ, বড় বড় চোখে গভীর দৃষ্টি, তীক্ষ্ম নাসিকা। প্রশস্ত ললাট, রংটা খুব ফর্সা নয়, তামাটে ধরনের, ভারী গম্ভীর গলার আওয়াজ, অতি পুরুষোচিত।

মহান্ত মহারাজকে আশ্রমবাসীরা শ্যামা মহারাজ বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার আসল নাম ছিল নাকি শ্যামাকান্ত। কেউ কেউ আবার নামের শেষ আকারটি লোপ করিয়া দিয়া শ্যাম মহারাজ বলিতেন। শ্যাম মহারাজটাই এখন তাঁর ডাকনামে পরিণত হইয়াছিল।

একদিন শ্যাম মহারাজকে চুকি চুপি সেই ভদ্রলোকটির নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উনি একজন ব্যারিস্টার। এককালে কলকাতার হাইকোর্টে নাকি খুব ভাল প্র্যাকটিস ছিল তাঁর। নাম হরিশ চৌধুরী। এই বলিয়া সগর্বে বলিলেন, "সারা পৃথিবী উনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, খুব পণ্ডিত লোক।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। উনি কি বলেন জানেন? আমাদের এ আশ্রমের নাকি তুলনা হয় না। এত দেশ ঘুরেছেন কিন্তু এত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য তিনি পৃথিবীতে খুব কম দেখেছেন। 'গড্ ইজ্ বিউটি, এন্ড বিউটি ইজ্ গড্।' বাস্তবিক উনি ভারী ভালবাসেন এই আশ্রমকে। এখানেই বছরের বেশী সময়টা তাই থাকেন। পুরীর আশ্রমেও কখনো-সখনো যান। এর পরেই ওঁর পছন্দ ওই আশ্রমটি।"

বলিলাম, "আমার কতটুকু অভিজ্ঞতা, আমারও কিন্তু মনে হয়, এরকম দৃশ্য যে আরো কোথাও আছে, তা কল্পনা করা যায় না।"

ভদ্রলোকের কথা শুনিয়া ওই আশ্রম সম্বন্ধে যেন আরো বাড়িয়া যায়

আমার শ্রদ্ধা। ওঁর মত পণ্ডিত গুণী ব্যক্তির সঙ্গে আলাপটা ভালভাবে জমাইবার জন্য মনের মধ্যে এক প্রবল বাসনা চাপিয়া রাখিতাম, কারণ আমার মত স্বল্পশিক্ষিত অল্পবয়স্ক যুবকের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র আকর্ষণ দেখি নাই। বরং আমাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া তিনি চলিয়া যাইতেন।

সর্বপ্রথম ওখানে এক মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনিই আমাকে একদিন ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছো বাবা?"

বলিলাম, "কলকাতা।"

"তাই তো বলি, তোমাকে দেখে আমার আগেই এ সন্দেহ হয়েছিল। কলকাতার মানুষের চোখমুখের ভাবই আলাদা। তা তুমি বুঝি চেঞ্জে এসেছো এখানে? কদিন ধরেই দেখছি, তুমি এখানে এসে বসে থাকো। রোজই মনে করি জিজ্ঞেস করবো। তা আর হয়ে ওঠে না। আমারও বাড়ি কলকাতায়, তবে অনেক কাল ঘরছাড়া। তা প্রায় আট বছর হলো কিনা, তাই তোমায় দেখেই চিনেছি।"

"আট বছর আপনি এখানে আছেন?"

"হ্যাঁ। শুধু আট বছর কেন, বাকি জীবনটাও এখানে কাটাতে চাই। তবে সবই তাঁর কৃপা। এমন স্বর্গ ছেড়ে আর কি কোথাও যেতে ইচ্ছা করে বাবা!"

উনি যে মহিলা, কথা না কহিলে বুঝিতে পারিতাম না। দেখিয়াছি গঙ্গার ঘাটের চাতালে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে অন্যান্য পুরুষদের সঙ্গে। তাঁহাকে আমি আগে পুরুষই ঠাওরাইয়া ছিলাম। মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, চোখে একটা রুপালি ফ্রেমের চশমা, পায়ে সাদা কেড্‌স জুতা, গায়ে একটা ফুলহাতা জ্যাকেট ও গরমের আলোয়ান জড়াইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার যে হাতটা আলোয়ানের বাহিরে কোলের উপরে ছিল, তাহা দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম বুঝি একটা শার্ট পরিয়া আছেন। জ্যাকেটের হাতা আর শার্টের জামার হাতের মধ্যে কোন তফাত ছিল না।

ওই ভদ্রমহিলাই সব আগে ঘাটে আসিয়া বসিতেন। সেদিন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা তুমি কি এখানে বেড়াতে এসেছো?"

"হ্যাঁ।"

"তা কতদিন থাকবে?"

"দেখি কতদিন থাকতে পারি। এমন স্থান ছেড়ে কার যেতে ইচ্ছা করে মা বলুন?"

"ঠিক বলেছো বাবা। তা তুমি কি একা এসেছো না 'ফ্যামিলি' নিয়ে?"

"একাই। 'ফ্যামিলি-ট্যামিলি' আমার নেই।"

"তুমি বুঝি বিয়ে-থা এখনো করোনি?"

"এখনো নয়—কোনদিনও করার ইচ্ছে নেই।"

"খুব ভালো করেছো। যদি জীবনটাকে উপভোগ করতে চাও তো ও-কাজে যেয়ো না। এখন বিয়ে মানেই আত্মহত্যা। আজকালকার মেয়েদের ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার।" বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তারপর বলিলেন, "তা কি কাজকর্ম করো তুমি?"

আমি জবাব দিবার আগেই বলিলেন, "এই যে ছোট ছেলে কেবল লেখে, 'মা, খুব ঠান্ডা পড়ার আগে তুমি চলে এসো, কলকাতায় শীতটা কাটিয়ে আবার যেয়ো চলে।' শীত তো এখানে বারো মাস। সংসারের সাধ চিরদিনের জন্যে মিটে গেছে। ভগবান আমার কপালে লেখেননি সংসার-ধর্ম, তাই তাঁর কোলে টেনে নিয়েছেন। বেশ আছি। তাছাড়া যাবো কোন্ চুলোয়, তাদের ওই সংসারের আর ছায়া মাড়াবো না লিখে দিয়েছি। এখানে যখন আটটা বছর কাটিয়েছি, আর কিছু ভয় করি না।" বলিয়া গলার স্বরটা একটু নামাইয়া আবার নিজের কথাতেই ফিরিয়া আসিলেন। "দুই ছেলে, নাতি-নাতনী সবই আছে আমার। একদিন অনেক স্বপ্ন ছিল মনে, তাদের নিয়ে ঘর বাঁধবো। এতটুকু এতটুকু যে দুই ছেলেকে নিয়ে বিধবা হয়েছিলুম, তাঁদের লেখাপড়া শিখিয়ে একজনকে ইঞ্জিনীয়ার, আর একজনকে প্রফেসর তৈরী করে অনেক সাধ করে বিয়ে-থা দিয়েছিলুম বাবা। বড় বৌয়ের মুখ খুব, কিন্তু ছোট বৌ আর এককাঠি সরেশ! যেদিন থেকে দুই বৌ ঘরে এলো, অমনি আগুন জ্বলতে শুরু করলো। শাশুড়ী মাগী তো একটা দাসীবাঁদীর সামিল। তাকে সংসার থেকে বিদায় করার জন্যে নিত্য ঝগড়াঝাঁটি, অশান্তি। শুধু শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করার সময় দুজনে গলায় গলায় ভাব। নইলে মনে মনে কেউ কাউকে ভাল বাসে না, সহ্য করতে পারে না। বৌ নয় তো সব ধাড়ী ধাড়ী, ধিঙ্গি মেয়ে। বয়সের গাছপাথর নেই। আগে শুধু বৌদের সঙ্গে হতো, ক্রমশ ছেলেরাও বৌদের দলে ভিড়ে গেল, তখন মায়া-মমতা সব ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে পড়লুম। বৌ নয়, রাক্ষসী ডাইনী। শুধু কি আমি? ছেলে দুটোর মনেও কি এতটুকু শান্তি আছে? আমি মা, আমার কাছে লুকোলে কি হবে, ওদের মুখ দেখে আমি বুঝতে পারি। ভাগ্যিস বাচ্ছাগুলো হয়েছিল, তাদের নিয়ে তারা ভুলে থাকে। নইলে ওই হারামজাদীরা যে পাজির পাঝাড়া তা তারাও হাড়ে হাড়ে বোঝে। আমার সোনার সংসার পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে। ওঃ, মেয়েমানুষের ছায়া যেখানে আছে, তার ধারে কাছে যেও না বাবা, যদি সত্যিকারের সুখ-শান্তি চাও। বৌ নয়, এক-একটা কালনাগিনী। মেয়েমানুষ জাতটাই বেইমান শয়তানী। প্রেম ভালবাসা না ছাই! ওসব তাদের মুখের কথা। স্বামী শুধু একটা টাকা রোজগারের যন্ত্র। শুধু নিজের কাপড় গয়না, সাজগোজ, সিনেমা রেস্টুরেন্ট ছাড়া আর কিছু তারা চায় না, বোঝে না।"

বুঝিলাম ভদ্রমহিলার দুঃখের কারণ। ছেলেদের উপর বৌয়েদের প্রভাব সহ্য করতে না পারার দরুন এই বিষোদ্গার। আজকালকার লেখাপড়া জানা

মেয়েদের সঙ্গে সেকালের অশিক্ষিতা শাশুড়ীদের এইরকম সব সংসারেই অশান্তি। সব মা-ই শাশুড়ী হইলে বৌকে তাই বিষচোখে দেখে।

॥ এগারো ॥

সেদিন একলা ঘাটে বসিয়া ছিলাম। আশ্রমবাসী কাহাকেও নিকটে দেখি নাই। একটু পরে পিছনে জুতার শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখি ব্যারিস্টার চৌধুরী সিগারেট মুখে দিয়া ঘাটের উপরের দিকে চাতালে না বসিয়া, সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছেন।

দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইতে তিনি আমার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। তারপর ভারী গলায় বলিলেন, "তোমাকে প্রায় দেখি, এখানে তোমার কেউ আছেন নাকি?"

"আজ্ঞে না। এখানটা আমার খুব ভাল লাগে। হরিদ্বারে যত সুন্দর জায়গা আছে, আমার মনে হয়, এর তুলনা হয় না।"

"রাইট! ঠিক বলেছো। তোমার দৃষ্টি আছে, তোমার সঙ্গে আমি একমত।" বলিয়া সিগারেটে একটা টান দিয়া আমায় প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি কোন কলেজে-টলেজে পড়ো?"

"না।"

"তবে? চাকরি বাকরি করো?"

"উপস্থিত কিছু করি না, বেকার!"

আবার একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন। "তাহলে কি বাপের হোটেলে, বিনা পয়সার গেস্ট?"

এই কথাটা বলিতে পারিলাম না যে একদিন কারখানায় চাকরী করিতাম। ম্যানেজারের মেয়েকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়া রক্ষা করিতে পারি নাই, আর এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যার জন্য সে ছিল আমার বাল্য-সঙ্গিনী, আমার প্রথম প্রেমের দীপশিখা। তার সন্ধানে আমি আসিয়াছি। নানা তীর্থ ঘুরিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়াছি তাই এখানে একটু আশ্রয় পাইলে বাঁচিয়া যাই।

তাঁর এই কথা বলার ধরনটা আমার কেমন খারাপ লাগিল। বলিলাম, "বাপ মা কবে মরে গেছেন তা ভুলে গেছি। আর সাবালক হয়ে শুনেছি জ্যাঠামশায়ের মুখে, তিনি নাকি বিপুল ঋণের বোঝা রেখে গিয়েছিলেন।"

"অর্থাৎ বেকার, না 'ভ্যাগাবন্ড'! 'বাট্ ইউ ডু নট লুক্ সো'। মনে রেখো লাইফ ইজ গ্রেট্! তুমি ইয়ং-ম্যান, সামনে তোমার বিপুল ভবিষ্যৎ, তুমি যেন খুব মুষড়ে পড়েছো।"

বলিলাম, "আজ্ঞে তার জন্য নয়।"

"তবে কি ডিসাপয়েন্টেড লাভ্? হতাশ প্রেমিক? সাধারণত তোমার

মত বয়সের বাঙালী যুবকদের মধ্যে এই রোগটা খুব উৎকট। শতকরা নিরানব্বই পার্সেন্ট ভোগে এই রোগে।"

পিতার বয়সী ভদ্রলোকের মুখ থেকে ওই কথা শুনিয়া লজ্জায় আমার মাথাটা আপনাআপনি হেঁট হইয়া পড়িল।

উৎসাহ দিয়া তিনি বলিলেন, "এর জন্যে লজ্জার কিছু নেই। একদিন তোমার মত আমারও অবস্থা হয়েছিল। 'জাস্ট লাইক ইউ'। যাকে ভালবেসে-ছিলুম, অন্যের সঙ্গে যখন তার মা-বাবা বিয়ে দিয়ে দিলেন, তখন কিন্তু তোমার মত এমনধারা ভেঙে পড়িনি। বৈরাগ্য যে আসেনি মনে একটু তা বললে মিথ্যা কথা বলা হবে, তবে নিজেই তা জয় করেছিলুম এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞাও করেছিলুম, ওর চেয়ে দশগুণ সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে তাকে দেখিয়ে দেবো! যাক্, সেসব বাজে কথা। 'দ্যাট্ ইজ্ নাউ লঙ্ হিসট্রি এন্ড দা গ্রেটেস্ট ট্র্যাজিডি টু'!"

বলিয়া সিগারেটের শেষ টুকরোটা থেকে শেষবারের মত ধোঁয়া টানিয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন জঙ্গলের দিকে। তার পর আমার চোখের ওপর গভীর দৃষ্টি রাখিয়া কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে গভীর নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "না, তোমার চোখে রঙ্ আছে। 'ইউ হ্যাভ্ এ পেয়ার অফ্ রোমান্টিক আইজ্'। তোমার ভাবনা কি? একটা মেয়ে কেন, কতশত জুটবে। আগেই বলেছি। মনে রেখো, 'লাইফ ইজ্ গ্রেট্'।"

লজ্জায় যেন আমার মুখে আর কথা আসিতেছিল না। আড়ষ্ট স্বরে শুধু ক্ষীণ একটু প্রতিবাদ করিলাম, "না—না—ওসব বলবেন না স্যার।"

"যা সত্যি তাই বলেছি। মনে করো না, এ বাজে কথা। 'দিস্ ইজ্ দি এসেন্স অফ্ মাই লঙ্ এক্সপিরিয়েন্স্'! ওসব প্রেম-ট্রেম কিছু নয়। ও একটা সাময়িক রোগ,—ন্যাবার মত। এখন বয়েসটা কাঁচা তাই বুঝতে পারছো না। পরে যখন বুঝবে, তখন 'ইট উইল বি টু লেট্ মাই বয়'। ও হলো ক্যালেন্ডারের ছবির মত। দেওয়াল থেকে পুরনোটা খুলে ফেলে সেই পেরেকের গায়ে যেমন আবার নতুন ক্যালেন্ডার এনে টাঙিয়ে দাও তেমনি।"

উত্তেজনায় তাঁর চোখমুখ এবার যেন কেমন জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল। তিনি বসিয়া ছিলেন, হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর ঘাটের রানাটার উপর অস্থির ভাবে দু'চারবার পায়চারি করিয়া কহিলেন, "আর যদি সত্যিকারের সুখ চাও, শান্তি চাও, তাহলে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সেই কথাটা স্মরণ করো। মনে পড়ে সেই কবিতাটা? 'ধন নয়। মান নয়, কিছু ভালবাসা, করেছিনু আশা'। এই বয়সে আমি অনেক দেখলুম, কিন্তু এর চেয়ে খাঁটি কথা বোধ হয় আর কেউ এমন সুন্দর করে পৃথিবীতে বলেছে কিনা সন্দেহ। কুড়ি বছর ধরে আমি সারা পৃথিবীটা চষে বেড়িয়েছি। ভেবো না যে আজে-বাজে কথা বলছি, এসব পাগলের প্রলাপ! তোমারই মত যৌবনের উত্তপ্ত নেশায় রক্ত টগবগ করে ফুটেছে, ঠাকুরদেবতা ধর্মকর্ম নিয়মনিষ্ঠা কিছু মানি

না। ওসব কুসংস্কার, কুশিক্ষা, নন্‌সেন্স বলে আমাদের অশিক্ষিত পিতা-পিতামহদের গালাগাল দিয়েছি। জানো আজ তার ফলে কি হয়েছে?" বলিয়া হঠাৎ আহত বাঘের মত পায়চারি করিতে করিতে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।—"দম্ভের চোটে সব কিছু 'বোগাস্' 'অর্থহীন' বলেছি। ঠাকুর মিথ্যে, ধর্মকর্ম মিথ্যে, আচার অনুষ্ঠান মিথ্যে—একমাত্র সত্য আমি ছাড়া আর কিছু নেই। অর্থাৎ আমার যা ইচ্ছা, যা ভাল লাগে। তাই করার স্বাধীনতা আমার আছে। এক কথায় যার নাম স্বেচ্ছাচারিতা। ঘরে ও সমাজে যেখানে যা কিছু বিধি-নিষেধের ডোরে জীবন বাঁধা সব মিথ্যে। ফলে সমস্তটা মন একটা জায়গায় গিয়ে কেন্দ্রীভূত হলো, একমুখী হয়ে উঠলো। দেহসর্বস্ব হয়ে উঠলো। জীবনটার অর্থ তখন দাঁড়ালো শুধু উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল! জৈবিক ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা মেটাতে, তোমায় বলতে লজ্জা নেই, নাইট্ ক্লাব, ক্যাবারে, হোটেল, নামকরা ফরাসী সুন্দরী, রাশিয়ান ব্যালে গার্ল, অনেক সম্ভ্রান্ত প্রিন্সেসদের সঙ্গেও রাতের পর রাত কাটিয়েছি। সুরার উত্তেজনায় দেহকে শ্রান্ত হতে দিইনি। একদিকে বোতলের পর বোতল শূন্য করেছি, অন্যদিকে কামনার লেলিহান শিখায় দেহের আহুতি দান করেছি। এক-আধদিন নয়, 'টুয়েন্টি লঙ্ ইয়ার্স'—ভাবতে পারো? কিন্তু তারপর কি? এর শেষ কোথায়, তৃপ্তি কোথায়, কোন্ দিকে পথ? জীবনটা কি শুধু উত্তেজনা? কামনার বহ্নিশিখা কি চির অনির্বাণ? একটা বোতল ফুরালে, আর একটা বোতল দিয়ে দেহের আগুন কতদিন জ্বালিয়ে রাখবে? এক নারী ছেড়ে অন্য নারীতে গমন করে জৈবিক ক্ষুধা মেটাবে কত দিনে? এই দেহ-সর্বস্ব প্রবৃত্তির উৎসবে ইন্ধন কত দিন যোগাবে? আগুন, তা মনের হোক, কি বাইরের হোক, একসময় তা নিভবেই। যখন নিভবে তখন কি অবশিষ্ট থাকবে? কি নিয়ে বাঁচবে? ওদেশের অনেককে এই প্রশ্ন করে বিফল হয়েছি। তবে এই শেষ কথা জেনে এসেছি ওদের থেকে যে, গৃহ মানে গৃহিণী—তার মানে চেস্টিটি, মরালিটি! সতীত্বের অপর নাম পবিত্রতা, বা শান্তি, বা সুখ। তাদের গৃহ থেকে সেই শান্তি সুখ পবিত্রতা চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছে। কোন জাতির গ্রেট ম্যান কখনো এমন আবহাওয়ায় জন্মাতে পারে না। তাই আজ সারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখো, কোথাও গ্রেট ম্যান খুঁজে পাবে না! 'ভারজিন্ ল্যান্ড' না হলে উৎকৃষ্ট ফসল কি কখনো ফলতে পারে? অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর কথা ভেবে দেখো, সারা পৃথিবীতে কত মহৎ ব্যক্তি জন্মেছে!"

হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া তিনি থামিয়া গেলেন। তারপর আবার নিজের কথায় ফিরিয়া আসিলেন, "এ অবশ্য আমার 'থিওরি', জানি তুমি হয়ত এ শুনে মনে মনে হাসছো। হাসো, তাতে আমার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। আমার শুধু দুঃখ, আমার দেশের কথা ভেবে। তারা সব জেনে-শুনেও আবার সেই বিদেশের পন্থাকে অনুসরণ করছে। তাকে আদর্শ করে

এগিয়ে চলেছে। কাঞ্চন ফেলে তারা কাঁচে গেরো দিচ্ছে। ওদেশের সামাজিক জীবনের সঙ্গে আমাদের সমাজের যে আকাশপাতাল তফাৎ, সেটি কেমন করে মানুষ ভুলে যায়, বুঝতে পারি না। ওদের পোশাক-পরিচ্ছদ, ওদের খাওয়া-দাওয়া, শোওয়া-বসা, সামাজিক বিধিব্যবস্থা—কোনটাই যখন আমাদের সঙ্গে মেলে না, তখন এটাই বা মিলবে কেন? একজন যদি ভুল করে, কি আরও দশজনে করে, তা দেখেও কি চৈতন্য হয় না? গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে কোথায় চলেছি আমরা ভেবে দেখো। এ আমার পাগলামি নয়, মনে রেখো এ আমার জীবনদর্শন।"

তিনি একজন পাক্কা ব্যারিস্টার। তাঁর কথা বলিবার ঢঙ-ঢাঙ কেবল সুন্দর নয়, কানের ভিতর দিয়া একেবারে মনের গভীরে কেমন করিয়া তাহাকে সঞ্চারিত করা যায় তাহা তিনি জানিতেন।

আমি বিস্ময়াভিভূতের মত শুধু তাঁর কথাগুলিকে গিলিতেছিলাম। জবাব দিবার, প্রশ্ন করিবার, তর্ক করিবার, ভাল কি মন্দ বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিবার কথা পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

অনেককাল পরে ভাল শ্রোতা পাইলে ওস্তাদ গায়করা যেমন তাদের কেরামতি দেখাইতে ছাড়ে না, তানের পর তান লাগাইয়া একেবারে বিহ্বল করিয়া দেয়, ব্যারিস্টার চৌধুরীকে দেখিয়া সেদিন ওই কথাটাই বার বার আমার মনে পড়িতে লাগিল। আমি যে একজন তাঁর তুলনায় শিক্ষাদীক্ষায় শিশু, অর্বাচীন সকল বিষয়ে সে-কথা তাঁর খেয়াল ছিল না।

তাই আবার একটা সিগারেট খপ্ করিয়া ধরাইয়া, একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া শুরু করিলেন, "জানো, উইল ইউ বিলিভ ইট্? আজো যদি বিয়ের সানাই আমার কানে আসে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছোট্ট একটা ঘোমটা দেওয়া মেয়ে, আর তার চন্দন-পরা সলজ্জ মুখ। কবি যাকে বলেছেন, 'ওগো বর ওগো বঁধু, এই যে নবীনা বুদ্ধিহীনা এ আজি তোমার মধু'!

"ভাবতে পারো, ওদের দেশের লোক যখন জীবন সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ, হতাশ, সর্বহারার মত তাদের মানসিক অবস্থা, সুখের জন্যে, শান্তির জন্যে, নারীর সতীত্বের জন্যে, মা-বাপের সঙ্গে ছেলেমেয়ের স্নেহের বন্ধনের জন্যে আমাদের দেশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে, তখন আমরা সেই উৎকেন্দ্রিক দেহসর্বস্ব, ছন্নছাড়া জড়বাদে বিশ্বাসী জাতটাকে অন্ধের মত অনুকরণ করতে চলেছি।"

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার আমি শুধু ছোট একটি প্রশ্ন করিলাম।—"অর্থাৎ আপনার বক্তব্য এই যে, মেয়েদের আবার সেই পর্দার মধ্যে ফিরে যেতে হবে? তা না গেলে দেশ থেকে শান্তিসুখ সব চলে যাবে? স্ত্রী-শিক্ষার আলোতে অন্তঃপুরের অন্ধকার দূর হবে না?"

ব্যারিস্টার সাহেব বলিলেন, "তা জানি না। তবে যে প্রদীপ আমরা ঘরে ঘরে জ্বেলেছি, তার শিখায় যত আলো, তার চেয়ে অনেক বেশী ধোঁয়া আর

কালি। এই কথাটাই আমি বলতে চাই।”

চৌধুরী সাহেব আমার মুখের উপর চট্ করিয়া একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বলিলেন, “আজ আবার কবির ভাষায় সেই কথাটাই কেবল বলতে ইচ্ছা করছে—‘দাও ফিরে মোরে সে অরণ্য’।

“মনে পড়ে যখন মানুষ চালাঘরে বাস করতো। কালকাসুন্দে, গাবভেরেণ্ডা, রাংচিতে, আর কাঁটামেদী গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা থাকতো তার আঙ্গিনা। মাথায় ঘোমটা দিয়ে মাটির কলসী ভরে নদী থেকে কাঁখে করে জল এনে ঘরদোর, রান্নাঘর, তুলসীতলা, উঠান, গোবরমাটি দিয়ে নিজে হাতে লেপে, ঝকঝকে তকতকে করে রাখতো স্ত্রীরা। সেই উঠানের একপাশে কাঠ জেলে কালো হাঁড়িতে ধানসিদ্ধ করে, সেই ধান উঠানে রোদে শুকিয়ে, কোমরে শাড়ির আঁচলটা কষে বেড় দিয়ে, ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে ভারী কোমর নাচিয়ে ধান থেকে চাল তৈরী করতো। আর সেই চালের ভাত স্বামী-পুত্রকে খাইয়ে, যেটুকু সময় অবসর পেতো, রোদে পিঠ দিয়ে বসে কাঁথা সেলাই করতো। ছেঁড়া কাপড় মেরামত করে নিজের, স্বামীর ও ছেলেমেয়েদের ইজ্জৎ রক্ষা করতো। একটি মেয়ের সমস্ত চিন্তা যেমন সেই কুঁড়েঘরের মধ্যে থাকতো সীমাবদ্ধ, তেমনি একটি পুরুষও ভোর হতে না হতেই ছুটতো মাঠে হালবলদ নিয়ে, সারাদিন ক্ষেত চষে, চাষ করে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর সামনে বসে সানকিতে করে তার হাতের রান্না খেতে খেতে, সব সময় মনটা পড়ে থাকতো তার সেই ক্ষেতটা জুড়ে। যদি ভাল ফসল না ফলে, তাহলে ছেলেমেয়েদের ও স্ত্রীকে কি খাওয়াবে। বৃষ্টি না হলে, গ্রীষ্মের কাটফাটা রোদে আকাশের দিকে তাকিয়ে, মেঘের চিন্তায় দিন কাটতো ; আবার বেশী জল পড়তে শুরু করলে, চোখে তার ঘুম আসতো না, রাত জেগে বসে থাকতো। কখনো বা কোদাল হাতে নিয়ে ছুটতো মাঠে, সেই দুর্যোগের রাতে ক্ষেতের আল সামলাতে। নইলে ছেলেমেয়ে-স্ত্রীর মুখের অন্ন যে ভেসে যাবে সেই বৃষ্টিতে। কখনও বা সারাদিন ধরে জল ছেঁচে ছেঁচে রুক্ষ মাটির বুক সরস করে তুলতো, তাতে সোনালী ফসল ফলাবার চিন্তায় দিবারাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলতো।

“মোট কথা যেমন স্বামী তেমনি স্ত্রী। যে যার নিজের সংসারের চিন্তায় বিভোর থাকতো। বাজে কথা, বৃথা কাজের চিন্তা করার সময় বা ফুরসৎ কারুর হতো না!”

এই বলিয়া তিনি সহসা থামিলেন। বুঝি তাঁর হাতের আধপোড়া সিগারেটটার কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া যায়। দুই-তিনটা টান সিগারেটে দিয়া, আবার নিজের অসম্পূর্ণ বক্তব্যের জের টানেন, “আমার মনে হয় আজকের মানুষের হাতে অনেক ফালতু সময়, অনেক এনার্জি। আর এই ‘সারপ্লাস এনার্জি’ হচ্ছে তার অধোগতির সোপান। এখন শিক্ষিত স্ত্রী ও পুরুষের প্রচুর অবসর। সময় কাটাবে কি করে তারা ভেবে পায় না। তাই মদ খেয়ে

অস্বাভাবিক উত্তেজনা দেহে-মনে এনে, এক পুরুষ যেমন একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তেমনি ভাবে এক স্ত্রীলোক অপর পুরুষকে নিয়ে গোপনে নতুন আনন্দে উন্মত্ত হতে হতে, অবশেষে সমস্ত জাতটা একদিন 'ব্যাস্টার্ড' হয়ে যাবে, তুমি দেখো নিয়ো। আমি হয়ত তখন তা দেখবার জন্যে বেঁচে থাকবো না, কিন্তু তুমি থাকবে, তখন আমার কথাটা তোমার মনে পড়বে নিশ্চয়।"

'ব্যাস্টার্ড'!' সমস্ত জাতটা জারজ বর্ণসংকটে পরিণত হবে? তাঁর এই উদ্ভট কল্পনার কথা শুনিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম!

তিনি বলিলেন, "চমকে উঠলে যে! কথাটা শুনতে খুব খারাপ লাগছে, না? যদি বলি আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি! ভেবে দেখো, যদি তোমার রক্ত তোমার ছেলমেয়েদের শিরায় প্রবাহিত না হয়, তবে তোমার জন্যে তাদের চিন্তা হবে কেন, আর তাদের প্রতি তোমার অন্তরের টান থাকবে কেন? এটা তো অতি সহজ কথা, একটা শিশুও যা বুঝতে পারে, তুমি পারছো না?"

ঠিক এই সময় শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মন্দিরে সন্ধ্যারতি শুরু হইল।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যারিস্টার চৌধুরীর মুখও বন্ধ হইয়া গেল। দুটি চোখ স্তিমিত হইয়া আসিল। জ্বলন্ত সিগারেটটা তাঁহার আঙুলের মধ্যে নীরবে পুড়িতে লাগিল।

সত্যি কথা বলিতে কি, তাঁর মত লোকের সহসা এই ভাবান্তর দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

হঠাৎ একটা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বলিলেন, "জানো, শুধু এই শোনার জন্যে আমি এখানে পড়ে থাকি। বড় ভালো লাগে এই শাঁখঘণ্টার মিলিত আওয়াজ, কানে যাওয়ামাত্র আমার দেহের মধ্যে যেন প্রাণটা কেমন করতে থাকে। তোমায় সে অনুভূতিটা ঠিক মুখে বলে বোঝাতে পারবো না। বিশ্বাস করো।"

"কেন, আপনার বাড়ি কোন্ দেশে? সেখানে কি এসব নেই?" আমি সংশয়াচ্ছন্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম।

তিনি বলিলেন, "আমার বাড়ি সভ্যতার পীঠস্থান কলকাতার এলগিন রোডে। সেখানে সন্ধ্যায় শাঁখঘণ্টা যাঁরা বাজাবেন তাঁরা তখন হয় সিনেমায় নয়ত কোন ফিরিঙ্গী রেস্তোরাঁয় থাকেন।" তারপর কতকটা যেন আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "ভালই হয়েছে, ঈশ্বর আজ সে-ঘর ভুলিয়ে নিজ গৃহে টেনে এনেছেন! 'হোম অফ ইটার্নল্ বিউটি অ্যান্ড জয়্।' তাই বাকি জীবনটা এইখানেই কাটাবো স্থির করেছি।"

বলিলাম, "সত্যি ভারী শান্তির জায়গা আপনাদের এই আশ্রমটি। আর নামটিও তেমনি সুন্দর, 'সদানন্দ মিশন'!" বলিয়া একটু থামিয়া ইতস্তত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা আপনাদের এ আশ্রমের শিষ্য যদি কেউ হতে চায়, তাহলে কি নিয়ম?"

"তা আমি কিছু জানি না, বলতে পারবো না। এ আশ্রমের যিনি 'ইনচার্জ', ওই যে শ্যাম মহারাজ, যাঁর ইয়া লম্বা দাড়ি আর মাথায় জটার বোঝা, তিনি বলতে পারবেন।" এবার সিগারেটের শেষ টুকরোটা মুখ হইতে খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন। "কেন? তোমার কোন আত্মীয়স্বজন বুঝি আসতে চান?"

তাঁহার মুখের উপর হইতে চোখ নামাইয়া লইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তারপর আস্তে আস্তে বলিলাম, "না, আমার নিজের জন্যে।"

"হোয়াট্! হোয়াট ডু ইউ সে মাই বয়্? তুমি এতটুকু ছেলে, এই বয়সে তোমার এত বৈরাগ্য কিসের?" বলিয়া তাঁহার দুইটি হাত আমার দুই কাঁধে রাখিয়া আমার চোখের উপর তাঁহার চোখ দুইটি যেন বিঁধাইয়া দিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বলিলেন, "গো অ্যান্ড গেট ম্যারেড্! যাও বাড়ি ফিরে গিয়ে বিয়ে করোগে, ছোট দেখে একটা মেয়েকে—যদি জীবনে সত্যিকারের শান্তিসুখ চাও।" তারপর আপন মনে বলিয়া উঠিলেনঃ

"'ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা, করেছিনু আশা।'

ওয়ান্ডারফুল! লোকটা শুধু বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে গেল। কেউ তাকে চিনলে না, বুঝলে না।"

বলিলাম, "বিয়ে করে খাওয়াবো কি? আমি যে বেকার!"

"তুমি যা খাচ্ছো, সেও তাই খাবে। তুমি উপোস করলে, সেও করবে! আর তাও যদি না পারো তো ভিক্ষে করবে। দুজনে একসঙ্গে। তবু পলাতক মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেবে না। জৈব প্রবাহকে স্বচ্ছ, সরল ধারায় বইতে দেবে, যদি শান্তি চাও। মনে রেখো, ধনসম্পদ ঐশ্বর্যই মানুষকে উন্মার্গগামী করে, পথভ্রষ্ট করে।"

আমি তাঁর এ কথার কি জবাব দিব ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি কিন্তু থামিলেন না। তেমনি ভাবেই বলিয়া চলিলেন, "রাস্তায় অন্ধ স্বামীর হাত ধরে যারা ভিক্ষে করে, তাদের মুখের দিকে কোনদিন তাকিয়ে দেখেছো? ওই যারা মোটর হাঁকিয়ে ছুটে যায়, যাদের স্ত্রীরা গায়ে হীরামুক্তা-জড়োয়ার গহনা ঝলমল করতে করতে স্বামীর পাশে বসে থাকে, তাদের মুখের সঙ্গে যদি ওদের মুখের চেহারা কোনদিন মিলিয়ে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে শান্তি কোথায়। সুখ কোথায়।"

ব্যারিস্টার সাহেবের কথাগুলো মনের মধ্যে একটা ধাক্কা দিলেও, তাঁহার সহিত কিছুতেই একমত হইতে পারিলাম না। তিনি যত বড় বিদ্বান, বুদ্ধিমান হউন, আর পৃথিবীর যত দেশই পরিভ্রমণ করুন না কেন, তাঁহার যে যথার্থ জীবনদর্শন হয় নাই, কেন জানি না সেদিন তার সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

তিনি দেহবাদী। ভোগ বলিতে দেহ ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। দেহকে

বাদ দিয়া, নিষ্কাম প্রেমের সাধনাও যে একপ্রকার ভোগ এবং পাওয়ার চেয়ে না পাওয়ার আনন্দ, মিলনের চেয়ে বিরহের সুখ যে কত বেশী, তাহা ধারণা করিবারও ক্ষমতা বুঝি তাঁহার ছিল না। বয়স আমার অল্প হইলেও, নিজের জীবন দিয়া তখনই এই তত্ত্বটুকু বুঝিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহার সহিত আর উহা লইয়া কোনো তর্ক করি নাই।

॥ বারো ॥

হরিদ্বারের চেয়ে কন্‌খলের দিকটা আমায় যেন বেশী আকর্ষণ করিত। কেন জানি না, সেখানেরও ওই সব ভাঙাচোরা মন্দির, নির্জন পুরনো গঙ্গার ঘাট, উপলখণ্ডে ভরা গঙ্গার ক্ষীণধারা, ঝুরিনামা প্রাচীন বট, হঠাৎ কোন উঁচু ফটকওলা শাহী ইমারতের ভগ্নাবশেষ, বনজঙ্গল-বাগান-বাগিচার মধ্যে কত নাম-না-জানা সাধুমহন্তদের আস্তানা, বিদ্যার্থীদের টোল, গীতাভবন, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় আশ্রম, আখড়া, মঠ ইত্যাদি নিমেষে যেন আমার মনকে কোন সুদূর অতীতে লইয়া যাইত! আর ওখানের যারা অধিবাসী তাহাদেরও যেন এক ভিন্ন জগতের মানুষ বলিয়া মনে হইত। যে সত্য যুগ কবে কোন্ কালে পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে বিদায় লইয়াছে, তাহাদেরই শেষ বংশধর কিছু কিছু যেন এখনো ওখানে রহিয়া গিয়াছে!

মনে আছে এরপর কয়েকদিন আর সদানন্দ মিশনের দিকে যাই নাই। যদিও প্রতিদিন অপরাহ্নে মনটা যেন আমার দেহ ছাড়িয়া সেখানে গিয়া বসিয়া থাকিত।

আসল কথা, সেই ব্যারিস্টার লোকটিকে আর আমার ভাল লাগিত না। ওই বিরাট-লেখাপড়া-জানা পৃথিবী-ঘোরা অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকটির কাছে নিজেকে এত ক্ষুদ্র ও মূর্খ বোধ হইতে যে পাছে আরো কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া বসেন তাই দূরে সরিয়া থাকিতাম। তাঁহার সহিত পাছে আবার দেখা হইয়া যায়, এই ভয়েই যাওয়া বন্ধ করিয়াছিলাম।

একদিন বৈকালে হঠাৎ আবার সেই কাটা ফটকের ভিতর দিয়া সেখানে ঢুকিয়া পড়িলাম কেন জানি না।

ভালই হইল। ভাগ্যক্রমে প্রথমেই শ্যাম মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তিনি একটা ঝুড়ি লইয়া বাজারে যাইতেছিলেন।

আমাকে দেখিয়া নিজেই কাছে ডাকিলেন। তারপরে কহিলেন, "অনেক দিন দেখিনি, ভেবেছিলুম আপনি বুঝি চলে গেছেন এখান থেকে।"

বলিলাম, "না। এমন জায়গা ছেড়ে যেতে কি মন চায় মহারাজ?"

"তা ঠিক। কিন্তু সকলের মন তো আপনার মত নয়। প্রথমটায় উচ্ছ্বাস করেন অনেকেই। এসে বলেন, এত সুন্দর জায়গা আর দেখিনি। অথচ তিন-চারদিন পরেই বলেন, আজ বিকেলের গাড়িতে কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি মহারাজ,

আপনাকে প্রণাম করতে এলুম।”

“তাই নাকি!”

সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্য কথা পাড়িলেন।—“হ্যাঁ দেখুন, কাল আমাদের এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস। আপনি দুপুরে এখানে প্রসাদ পাবেন। কেমন, আসছেন তো?”

বুঝি এই রকম একটা সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলাম। বেশ মনে পড়ে সেদিন দুপুরে ভোগ খাওয়ার পর নিজের এঁটো শালপাতাটা হাতে লইয়া যখন ফেলিতে যাইতেছিলাম মহারাজ বলিলেন, “এই দুপুরে আবার হরিদ্বারে ফিরে যাবেন কেন, আমার ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করুন। তারপরে সন্ধ্যা-বেলায় একেবারে কীর্তন শুনে আরতি দেখে ফিরবেন।”

আমাকে লইয়া তিনি নিজের ঘরে আসিয়া কম্বল-বিছানো একটা তক্তপোশের উপর বসাইয়া বলিলেন, “এখুনি আসছি, ততক্ষণ বিশ্রাম করুন।”

সত্যি, একটু পরেই শ্যাম মহারাজ ফিরিয়া আসিলেন।

তারপর কিছুক্ষণ খুচরো আলাপের পর হঠাৎ আমি তাঁকে প্রশ্ন করিলাম, “একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে কেবলই ইচ্ছে করে, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে সাহস হয় না।”

গোঁফদাড়ির ভিতর হইতে তাঁহার চোখ দুটি নিমেষে যেন স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল।

বলিলেন, “কি এমন কথা বলুন, আমরা সাধু-সন্ন্যাসী, আমাদের কাছে নিঃসন্দেহে সকল প্রশ্ন করতে পারেন। লজ্জা কি, বলুন?”

“জানেন আপনাকে দিনরাত এখানে যা কঠোর পরিশ্রম করতে দেখি, তাতে মনে হয়, যদি তাই করবেন তাহলে নিজে সংসারী না হয়ে এ জীবন বেছে নিলেন কেন?”

এবার দুই ঠোঁটের মধ্য দিয়া তাঁর কয়েকটি দাঁতও ঝিলিক দিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, “একথা আমাকে এর আগে আরো দু-চারজন জিজ্ঞেস করেছেন!”

“তাই নাকি?”

“হ্যাঁ। কি জানেন, সংসারে আপনি যে-কাজকর্ম করেন, সে তো নিজেরই স্বার্থে—নিজের ভোগের জন্যে, কিন্তু এখানে তো সবটাই পরহিতায়—যাকে বলে নিঃস্বার্থ ভাবে জীবের সেবা।”

জবাবটা ভালই লাগিল। তিনিও যে আমাকে খুশি করিতে পারিয়াছেন, তার জন্য একটু যেন আত্মপ্রসাদও লাভ করিলেন বলিয়া মনে হইল। এবার আমি আর একটি প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, “আচ্ছা মহারাজ, আমার তো মনে হয়, জীবনটা নদীর মত, উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে সব সময়, স্বাভাবিক নিয়মে। তাই হঠাৎ সে নদীর ধারা যদি দক্ষিণমুখে না গিয়ে উত্তর-

বাহিনী হয়, বা অন্য পথে ধায় তাহলে বুঝতে হবে পথে কোথাও একটা কোন বিপুল বাধা পেয়েছে নিশ্চয়!"

"ঠিকই ধরেছেন।" বলিতে বলিতে মাথা হইতে বিপুল জটার বোঝাটা তিনি নামাইয়া পাশে রাখিলেন।

তখন আমি বলিলাম, "কোন মানুষের জীবন যদি স্বাভাবিক পথে না গিয়ে উল্টোপথে যায়, তখন বুঝতে হবে এমন কিছু একটা আঘাত সে পেয়েছে যাতে সংসারধর্মে মন না দিয়ে এই সন্ন্যাসের পথে, ত্যাগের পথে ছুটে এসেছে। এ বিষয়ে আপনার কি মত?"

"এ বিষয়ে আমি আপনার সঙ্গে একমত।"

"আচ্ছা মহারাজ, আপনারও জীবনে কি তেমন কিছু ঘটেছিল, না আপনি আবাল্য অখণ্ড ব্রহ্মচারী?"

খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "পূর্বাশ্রমের কথা সাধুদের বলতে নেই। তবে অখণ্ড ব্রহ্মচারী আমি নই।"

এবার আমি অন্য প্রশ্ন করিলাম, "আপনাদের এই মিশনে কি যে-কেউ ইচ্ছে করলেই থাকতে পারে? না কোন বিশেষ নিয়মকানুন আছে, গুরু মহারাজের কাছে মন্ত্র নেওয়া ছাড়া?"

"গুরু মহারাজের কেবল একটা নির্দেশ আছে, বয়েস সম্বন্ধে। বয়েস অন্ততপক্ষে পঞ্চাশের ওপরে হওয়া দরকার।"

"কেন বয়েস সম্বন্ধে তাঁর এত কড়াক্কড়ি?"

"এ বিষয়ে তিনি মনুর মতের সমর্থক। অর্থাৎ 'পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ'। তাঁর বিশ্বাস, সংসারের ভোগলালসা সব চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত মানুষ সম্পূর্ণ মনটাকে ঈশ্বরে দিতে পারে না। সেকালের মুনিঋষিরা বহুদ্রষ্টা ছিলেন। তাঁদের মত অভ্রান্ত।"

বলিলাম, "আগের দিনে তো সাধু-সন্ন্যাসীরা অখণ্ড ব্রহ্মচারী ছিলেন!"

"ঠিকই। তেমনি তাঁরা বনে, গিরিগুহায় থাকতেন। লোকালয়ে এসে গৃহীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন না বা তাঁদের আতিথ্যগ্রহণ করতেন না। গুরু মহারাজ বলেন, যিনি প্রকৃত সন্ন্যাসী তিনি তাঁর আসন ছেড়ে কখনো কোথাও নড়েন না। তাই যাঁরা শিষ্য-শিষ্যা পরিবৃত হয়ে সংকীর্তন করেন, পূজাঅর্চনা উৎসবাদিতে মত্ত হন, তাঁদের অবচেতন মন থেকে তখনো ভোগ-লালসার নিবৃত্তি হয়নি বুঝতে হবে। গেরুয়া ধারণা করেছেন বলেই যে কেউ খাঁটি সন্ন্যাসী, এ বিশ্বাস করার কোন হেতু নেই। শিষ্যার সেবা যে গুরু গ্রহণ করেন, তিনি বাইরেটা গেরুয়া রঙে যতই রঞ্জিত করুন, ভেতরটা এখনো সম্পূর্ণ রাঙাতে পারেননি, ঠিক জানবেন। সাধুদের কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ একমাত্র ধর্ম।"

বলিলাম, "আপনাদের আশ্রমে দেখছি মহিলাদেরও ব্যবস্থা আছে।"

মহারাজ বলিলেন, "যাঁকে আপনি দেখেছেন তিনি একজন মহীয়সী

মহিলা। বৃদ্ধা এককালে বাংলাদেশের খ্যাতনামা অভিনেত্রী ছিলেন। অমর দত্ত, গিরিশ ঘোষ, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী প্রভৃতির সমসাময়িক। তাঁদের সঙ্গে একত্রে সব অভিনয় করতেন। ওঁর ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীরা সবাই খুব কৃতী। স্বেচ্ছায় কিছু ত্যাগ করে ওঁর যা কিছু সম্পত্তি ছিল সব গুরুজীর চরণস্যাৎ করেছেন। এই আশ্রমটি ওঁর খুব প্রিয়। এর পরেই ওঁর প্রিয় আমাদের বৃন্দাবন আশ্রম। অবশ্য উনি ছাড়া এমন আরো কিছু মহিলা শিষ্যাও আমাদের আছেন।"

এখানে সেই মহিলা-শিষ্যাটির সঙ্গে আমার ইতিপূর্বে যে আলাপ হইয়াছিল তাহা তিনি জানিতেন না। কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোন অসাধারণত্ব লক্ষ্য করি নাই। বরং অতি সাধারণ মহিলা বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল।

একটু থামিয়া আবার হঠাৎ পূর্বের প্রশ্নে ফিরিয়া আসিলাম, "তার মানে, আপনিও একদিন সাংসারিক জীবনযাপন করেছেন?"

মহারাজ বলিলেন, "নইলে কি আমায় এখানে দেখতে পেতেন! আমার জীবন এত ঘাত-প্রতিঘাত যে শুনলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। আমি অবশ্য আপনার কৌতূহলচরিতার্থে শুধু এইটুকু বলতে চাই, বাংলাদেশের বিখ্যাত কোন এক সাধকের বংশে আমার জন্ম হয়েছিল! আজ আমারই সেবাইতরূপে সেই গৃহদেবতার কাজে ব্রতী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা পারিনি শুধু অপরিমিত ভোগলালসার জন্যে।"

"আপনি সংসারধর্ম করেছিলেন? মানে বিয়ে-থা—"

"হ্যাঁ। মিথ্যা কথা বলবো না, একদিন যৌবনে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলকে ত্যাগ করে ব্রহ্মদেশে পালিয়ে গিয়েছিলুম। এবং সেখানে বহু বর্মী নারীর সঙ্গ করেছি দীর্ঘদিন। আপনাকে বলতে লজ্জা নেই। পিতাজী মহারাজ বলেন, ওরে, আগুনে পুড়লে আর খাদ থাকে না, তখন সোনা খাঁটি হয়। তুই সেই পাকা সোনা। তোর জন্যে আর আমার কোন ভয় নেই। তুই পারবি, তোর মত পাপী-তাপী আমি খুঁজছি।"

একটু থামিয়া প্রশ্ন করিলাম, "আপনি যা করেছেন, তাকে যদি পাপ বলে স্বীকার করেন, তবে আবার সেই পাপ যে না করেছে, তাকে এখানে আশ্রয় দিতে নারাজ কেন? আগুনে হাত দিয়ে হাত পুড়িয়ে যে যন্ত্রণায় জ্বলে মরছে, তাকে দেখে যদি কেউ আগে থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে সেই সাবধানী হুঁশিয়ার ব্যক্তির কদর নেই আপনাদের কাছে? আপনাদের এ কোন্ ধরনের আইন বুঝতে পারলুম না!"

তিনি বলিলেন, "পিতাজী মহারাজ বলেন, কাঠের আগুনে আমার কাজ নেই। আমি চাই কাঠ-কয়লা। সেই কাঠ জ্বলে পুড়ে ধোঁয়া গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে যে কয়লা তৈরী হয়, তাই।"

"চমৎকার আপনাদের যুক্তি! সত্যি কথা বলতে কি, আমি কিছু বুঝতে পারলুম না।"

শ্যাম মহারাজ বলিলেন, "আহা, এ তো অতি সাধারণ জিনিস। অপরের জ্বালা দেখে কি বোঝা যায় তার তীব্রতা কতখানি, যতক্ষণ না নিজে সে জ্বালায় জ্বলছি। অর্থাৎ কিনা অভিজ্ঞতা—সুখ-দুঃখের, ব্যথা-বেদনার, প্রেমবিরহের।"

"তার মানে, অভিজ্ঞতার মূল্যটাই আপনাদের কাছে বড়। অর্থাৎ লোহা পুড়িয়ে নিজের গায়ে ছেঁকা দিয়ে বুঝতে হবে কেমন জ্বালা, এই তো? কিন্তু সে জ্বালাকে যদি কেউ মনে না রাখে? পাপ কাজ আপনি যাকে বলছেন, তাকে যদি পাপ বলে গ্রহণ না করে, তাহলে?"

তিনি বলিলেন, "তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি ভুল বুঝবেন না। সে জ্বালা কেমন তা তো বুঝিয়ে দিতে হবে না।"

শ্যাম মহারাজ তাঁর বক্তব্য শেষ করিলে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তারপর প্রশ্ন করিলাম, "অর্থাৎ আপনি বলতে চান, মানুষের জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা দৈহিক সম্পর্ক ছাড়া সম্ভব নয়, সে ভালই হোক, আর মন্দই হোক, এই তো?"

লম্বা দাড়ির মধ্যে একবার হস্তসঞ্চালন করিয়া তিনি বলিলেন, "আগেই বলেছি নিজের হাত যতক্ষণ না পোড়ে, অন্যের হাতপোড়া দেখে যেমন কিছুতেই বোঝা যায় না তার কি ভীষণ জ্বলুনি, জীবনটাও ঠিক তেমনি। পুরোপুরি মানুষকে জানতে হলে, দুই মিলে এক হওয়া চাই। নইলে জীবনের অর্ধেকটা অ-জানা থেকে যায়। আর জাহাজের কম্পাসের মত মনটা সব সময় সেই উত্তর-মুখী হয়ে থাকে।"

বিস্মিত কণ্ঠে এবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার মানে এখানে এই যে এত সব গেরুয়া, লেংটিধারী, ন্যাড়ামাথা সাধু-সন্ন্যাসীর ভিড়, তাঁদের মধ্যে কি তবে অখণ্ড ব্রহ্মচারী বলতে কেউ নেই?"

মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে জিব কাটিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইলেন। তারপর কতকটা যেন অপরাধীর মত বলিলেন, "আছেন কিনা পিতাজী একমাত্র জানেন, মিথ্যা বলবো না। তবে জগতে এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। পূর্বজন্মের সুকৃতি আর ঈশ্বরের অনেক করুণা থাকলে তবে তেমন মানুষ জন্মগ্রহণ করেন।"

আমার মনের মধ্যে সব যেন কেমন গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। একটু ভাবিয়া তাই তাঁহাকে শুধাইলাম, "নিষ্কাম প্রেম, ভালবাসা বলতে কি তাহলে কিছু নেই?"

মহারাজ যেন আমার মুখ হইতে হঠাৎ ওইরূপ প্রশ্ন আশা করেন নাই। তাই লম্বা দাড়িটার মধ্যে নিঃশব্দে বারকয়েক হাত বুলাইয়া কহিলেন, "এ কথা আমায় জিজ্ঞেস না করে, নিজের মনটাকে বিশ্লেষণ করলেই সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারবেন। উপনিষদ্ বলেছেন, আপনাকে জানো—আত্মানং বিদ্ধি!"

একটু থামিয়া, আমার মুখের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া আবার বলিলেন, "আপনি ছেলেমানুষ, সংসারের কোন অভিজ্ঞতা এখনো হয়নি, তাই

ভাবপ্রবণ আপনার মনে এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। তবে কি জানেন, সে বড় কঠিন জিনিস। কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করলে সেই নিষ্কাম প্রেম ও ভালবাসার স্তরে পৌঁছানো যায় না। মিথ্যা বলবো না আপনি আমি যাকে নিষ্কাম প্রেম ভালবাসা বলে মনে করি, আসলে কিন্তু তা স-কাম। তার পিছনে গোপন রয়েছে আপনার মনের কামনাবাসনা। নইলে আন্য সকলের প্রতি আপনার মন সমভাবাপন্ন হয় না কেন! বিশেষ একটি দেহ, বিশেষ একটি সুন্দর মুখকে দেখতে যখন আপনি ভালবাসেন, তখন একমাত্র তাকেই আপনার মন চায়, আর একান্তভাবে চাওয়ার অন্য অর্থ কামনা।”

মিনিটখানেক চুপ করিয়া আবার তিনি সেই কথার জের টানিয়া আনিলেন, “হয়ত তার সঙ্গে আপনি মিলিত হতে পারছেন না, কোন সামাজিক বিধিনিষেধ বা সংস্কারের ভয়ে। কিংবা আপনার শিক্ষাদীক্ষা, ভদ্রতা, শোভনতা বোধ, আপনাদের দুজনের মাঝে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করেছে বলে। তবু মনকে কি ঠেকাতে পারেন? সেই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে গোপনে সে কি ছোটে না সেখানে তখন? লেহন করে না কি তার রূপ-যৌবন অগোচরে? মনের গহ্বরে অবচেতনায় বা স্বপ্নে আলো-আঁধারে তার সঙ্গে চলে না কি শৃঙ্গার? বলুন তো নিজের বুকে হাত দিয়ে?”

বলিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া, যেন আমার কাছে তাহার জবাব চাহিলেন। আমি কি উত্তর দিব যখন ভাবিতেছি, তিনি আবার বলিয়া উঠিলেন, “শাস্ত্রে বলে, ‘মনের অগোচর পাপ নেই।’ আমার মতে অন্ধকারও ঢের ভাল। জানি তার অবসান হলে আলো দেখা দেবে, কিন্তু সেই আলোকে সব সময় আড়াল করে রাখে যে কুয়াশা সেটাই ভয়ঙ্কর সর্বনেশে। মনটা বড় পাজি, যতক্ষণ না তার পাওনাগণ্ডা কড়ায়-ক্রান্তিতে বুঝে পায়, ততক্ষণ মেটে না তার ক্ষিধে, নেভে না তার দেহের আগুন।” এই বলিয়া মহারাজ খপ্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যেন ইহার উপর আর কোন বক্তব্য থাকিতে পারে না। শেষ কথা, চরম কথা, যা, তিনি বলিয়া দিয়াছেন।

আমিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলাম।

“যাই, বৈকালীর সময় হলো।” বলিয়া এবার মহারাজ মন্দিরের দিকে পা বাড়াইলেন, আমি নিঃশব্দে দু হাত কপালে ঠেকাইয়া তাঁহাকে নমস্কার জানাইয়া ভারাক্রান্ত মনে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম।

রাস্তায় আসিয়া সামনে একটি একা দেখিয়া উঠিয়া বসিলাম। পথ বেশি নয়। অন্য দিন হাঁটিয়াই ধর্মশালায় ফিরি, কিন্তু সেই সময় মনের সঙ্গে পা দুটাও যেন একসঙ্গে মিলে আর দেহটাকে টানিতে পারিতেছিল না।

চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম একায়। বুঝি মহারাজের শেষ কথাটার অনুরণন তখনো আমার কানের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছিল।

সন্ধ্যার যদিও বিশেষ দেরি ছিল না, কিন্তু তখনি কনখলের ওদিকটায় কেমন যেন ছমছমে ভাব। নির্জন। নিস্তব্ধ পথ। বিশেষ করিয়া রামকৃষ্ণ

মিশনের ফটকটা পার হইবার পর হইতে। শুধু ঘুটঘুট শব্দ, টাঙ্গা ও এক্কা-গাড়ির ঘোড়ার পদধ্বনি, রাস্তার দুপাশে বড় বড় আম, জাম, জারুল গাছ আর পুরনো পাঁচিল ঘেরা সব বাগানের দীর্ঘকায় বনস্পতিদের শাখাপ্রশাখায় ঘনায়মান অন্ধকারের বুকে যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

কি জানি কেন, এক্কায় যাইতে যাইতে সেই বিশেষ মুহূর্তে প্রথম যাহার কথা মনে পড়িয়া গেল, সে কাশীর সেই রাণীদি। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আলাপের দিন হইতে দৃশ্যের পর দৃশ্য সব কিছু যেন একের পর এক একসঙ্গে চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

॥ তেরো ॥

মনে পড়িল প্রথম সাক্ষাতের কথা!

নৌকার দড়ি খুলিয়া, ঘাটের কিনারায় লগি লাগাইয়া মাঝি যেমন ঠেলা দিয়াছে, অমনি অহল্যাবাঈ ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া উপর হইতে দ্রুতপদে নামিতে নামিতে একটি নারী হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিল, "এই মাঝি, বাঁধকে!"

মাঝি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, লগিটা উঠাইয়া লইয়া সিঁড়ির কোণাতে নৌকার যে মুখটা আটকাইয়া গিয়াছিল তাহাকে ঠেলিতে লাগিল।

এবার সেই নারীর গলা দিয়া বেশ একটু রূঢ় স্বর বাহির হইল, "এই বাঁধো!"

তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে মাঝি জবাব দিল, "ইয়ে নাও আপকো লিয়ে নেহি। ইয়ে ত বাবু পুরা কেরায়া লিয়া।"

"জান্তি হ্যায়। হাম্ বলতি তুম্ রোক্কো!" ধমক দিয়া উঠিলে মাঝির লগির ঠেলায় নৌকার মুখটা হঠাৎ ধাক্কা খাইয়া টলমল করিয়া উঠিল।

মাঝি গম্ভীর স্বরে বলিল, "বাবুকো বিনা হুকুমসে হাম আপকো লেনে নেহি সেকেগা।"

"হ্যাঁ, আমি তা জানি। তোমার বাবুকে আমি বলছি, একটু ডাকো তো।"

"বাবুজি?"

ছইয়ের ভিতর বসিয়া আমি সবই শুনিতেছিলাম। তাই মাঝি ডাকিতে বাহিরে না আসিয়া জবাব দিলাম, "আরে লে লেও, জেনানা আদমী হ্যায়।"

মুখের কথাটা শেষ হইবামাত্র মহিলাটি লাফ মারিয়া নৌকার উপর উঠিয়া পড়িলেন। এবং কতকটা যেন আমায় কৈফিয়ত দিবার ভংগীতে কহিলেন, "এত রাত যে হয়েছে বুঝতে পারিনি। কীর্তনটা আজ খুব জমিয়েছিল শ্রীধর ঠাকুর। যাঁদের সঙ্গে রোজ ফিরি, তাঁরা দুজনেই আজ আসেননি কেন জানি না, তাই একা এত রাত্রে হেঁটে কেদার পর্যন্ত যেতে সাহস হলো না।"

বলিতে বলিতে ভদ্রমহিলা পাটাতনের উপর দিয়া সোজা ছইয়ের দিকে

চলিয়া আসিলেন। ছইয়ের ভিতরে একটি লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। সেই আলো-টার সামনেই আমি বসিয়াছিলাম। তাই এবার আমার মুখখানি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ও তুমি!"

পূর্ণিমা না হইলেও চাঁদের আলো ভালই ছিল। বোধ করি পূর্ণিমার বেশী দেরিও ছিল না, আর দুই তিন দিন বাকী। জ্যোৎস্নার আলো যদিও নৌকার উপরে পড়িয়াছিল, তবু কাছাকাছি না আসিলে মুখ চেনা শক্ত।

বলা বাহুল্য, ভদ্রমহিলা যেমন আমাকে চিনিতে পারিলেন, আমিও তাঁহাকে সেইরূপ চিনিতে পারিয়াছিলাম। তবু তিনি যেমন 'ও তুমি' বলিয়া যেন কত পরিচিত, এমনি ভাব দেখাইলেও আমি কিন্তু মুখে সেইরূপ কিছু বলিতে পারিলাম না, বরং আরো বেশী গম্ভীর হইয়া গেলাম।

এই গম্ভীরতার আসল কারণ কোথায়, বোধ হয় ভদ্রমহিলা তাহাও অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। তাই আমার লজ্জা ভাঙাইবার জন্য গায়ে পড়িয়া তিনি-ই আবার কথা কহিলেন, "তোমাকে আপনি বলতে পারলুম না বলে কিছু মনে করো না ভাই। তুমি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট।"

বয়সের কথাটা তুলিয়া তিনি যেন কাটা ঘায়ের উপর নুনের ছিটা দিলেন।

এবার আমি বলিয়া ফেলিলাম, "না না, কিছু মনে করিনি।"

"তুমি তো আমার পাড়ায় থাকো। চেনাজানা। তোমাকে ত আমি প্রায় দেখি। তাছাড়া কেদারের পথে ঘাটে স্নান করতে একটু বেশী বেলায় গেলে প্রায়ই তোমায় দেখতে পাই।

একেবারে যেন আমায় দুর্বল স্থানটিতে তিনি আঘাত দিয়া বসিলেন।

কথাটা সত্যি, ওঁর স্নান করিবার সময় আমিও ঘাটে যাইতাম। দুজনে হয়ত একই সঙ্গে স্নানও করিতাম। যদি কোনদিন আমি আগে গিয়া পড়িতাম তাহা হইলে স্নানের ঘাটে অপেক্ষা করিলে, পাছে অশোভন দেখায় তাই আগে ভাগে আমি গংগায় গা ডুবাইয়া থাকিতাম। কখন তিনি আসিবেন, স্নান সারিয়া সিক্তবসনে কমণ্ডলুতে জল ভরিয়া, আমার চোখের উপর দিয়া একটি একটি করিয়া সিঁড়ি ভাঙিগয়া কেদারের মন্দিরে উঠিয়া যাইবেন,—সেই দৃশ্য দেখিবার জন্য আমার মন যেন গোপনে লালায়িত হইয়া থাকিত।

সব চেয়ে বড় কথা। তিনি রূপসী, তরুণী কিংবা যুবতী সেকথা ভাবিয়া দেখি নাই। আমার চেয়ে বয়সে বড় হইলেও এমন সুন্দর নবনীত কোমল দেহ, সর্বাঙ্গে এমন পেলবতা, এমন শ্রীময়ী নারী আমি আগে কখনো দেখি নাই। শুধু তাই নয়, তেমনি মাধুর্য চলনের ভঙ্গিমায়, সিক্ত দেহ হইতে মনে হয় জল-বিন্দুর সঙ্গে লাবণ্য ঝরিয়া পড়িতেছে। রাজহংসীর মত গুরুনিতম্বিনী, পায়ের পাতার সঙ্গে আংগুলগুলি এমন সুসংবদ্ধ যে প্রত্যেক পদক্ষেপে তাঁর ভিজে পায়ের সম্পূর্ণ ছাপ পাথরের সিঁড়ির বুকে আপনা আপনি যেন আঁকা হইয়া যাইত।

গেরুয়া রংয়ের খাটো শাড়ী পরা, হাঁটুর উপর হইতে পায়ের দিকটা একেবারে নিভাঁজ নিটোল। ধবধবে সুন্দর রং নয়, মাজামাজা উজ্জ্বলবর্ণ, স্থির গঙ্গাজলের উপর পূর্ণিমার চাঁদের আলো পাড়িলে যেমন দেখায়, অনেকটা সেই রকম। রম্ভোরু। ক্ষীণকটি, কোমরের ঊর্ধ্বাংশ বাহুমূল পর্যন্ত ধীরে ধীরে প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইয়া উঠিয়া গিয়াছে, মনে হয় যেন কোন শিল্পী এমন হিসাবসম্মতভাবে সে দেহটি গড়িয়াছেন যে কোথাও এতটুকু মেদবাহুল্য বা হিসাবের ভুল-ত্রুটি নাই। দুটি বাহু নয় যেন বাহুলতা, দীর্ঘাকৃতি আঙ্গুলগুলি তেমনি কনকচাঁপার কলির মত। মাথার চুল দীর্ঘ ও ঈষৎ কুঞ্চিত। স্নানের শেষে সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া গামছা দিয়া নিঙড়াইয়া সিক্তচুল হইতে জল ঝরাইয়া, গামছা খুলিয়া লইলে সারা পিঠে ছড়াইয়া পড়ে সে কেশভার। যেন কালো কুচকুচে চুলের চালচিত্রের মত। মুখের মধ্যে খুব ডাগর চোখ বা টিকালো নাক ছিল না, থাকিলে কত সুন্দর লাগিত না জানি। তবে ঈষৎ চ্যাপটা নাক ও দেহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোট দুইটি চোখের উপর টানা ভ্রু—ধনুকের মত বাঁকানো না হইলেও ঈষৎ বঙ্কিম, সেই মুখখানি হইতে যেন বয়সের ভার অনেকখানি কমাইয়া দিয়াছিল। হঠাৎ দেখিলে মণিপুরী মেয়ে বলিয়া ভ্রম হয়। অথচ সামনের দিকটা, গলা হইতে বক্ষ ও নাভিমূল, সাঁওতালী তরুণীদের মত সুগঠিত।

বয়সের মাপকাঠিতে নারীর রূপ, যৌবন ও দৈহিক সৌন্দর্য বিচারের যে পদ্ধতি আমাদের দেশে বর্তমান, তিনি যেন তার ব্যতিক্রম।

বাস্তবিক, তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় ছিল না তিনি সধবা, কি বিধবা, কি কুমারী। সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ দেখি নাই। থাকিলে কেমন মানাইত জানি না, কিন্তু না থাকার দরুন যেন মুখের শোভা আরো বাড়িয়াছিল। বেশীর ভাগ দিনই তিনি গেরুয়া পরিয়া স্নান করিতে আসিতেন। এক-একদিন লালপাড় শাড়িও পরিতে দেখিয়াছি। কালো পাড়ওলা বা স্রেফ সাদা থানও কখনো পরিতেন। কাশীর সম্পর্কে অনেক বদনাম শুনিয়াছিলাম। সধবা, অথবা, বিধবা কে যে কোন্ ভাবে কি পরিচয় লইয়া এখানে বসবাস করে তাহা একমাত্র বাবা বিশ্বনাথই জানেন। ইনি হয়ত বা সেইরূপ কোন একজন হইবেন।

বিচিত্ররূপিণী নারী। ওঁর পরিচয় জানিবার জন্য সব সময় আমার মনে একটা নিদারুণ কৌতূহল উঁকি মারিত!

এক-একদিন মনে হইত, হয়ত কোন ব্রহ্মচারিণী, সন্ন্যাসিনী। আবার এক-একদিন তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া অন্যরকম সন্দেহও জাগিত।

আমি গঙ্গার জলে গলা ডুবাইয়া দূর হইতে প্রায়ই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতাম।

তিনি কখনো পিছন ফিরিয়া, কখনো পাশ ফিরিয়া, কখনো বা আমার দিকে সম্মুখ করিয়া দুই হাত উঁচু করিয়া পিছন দিকে লইয়া গিয়া ভিজাচুল গামছা দিয়া পাকাইয়া পাকাইয়া জল নিঙড়াইতেন বেশ কিছুক্ষণ ধরিয়া।

তারপর গা, হাত, পা, মুখের জল সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া ভিজা গামছা দিয়া মুছিতেন। তাঁহার কাছে গঙ্গার স্নানটা পুণ্যকর্মের চেয়ে যেন বিলাসের বলিয়া মনে হইত।

আমার চোখের সঙ্গে তাঁহার চোখের দৈবাৎ মিলন ঘটিলে আমি লজ্জা পাইতাম, অথচ তাঁহার মুখে সত্যি কথা বলতে কি তার লেশমাত্র দেখি নাই। বরং আমার মনে হইত যেন তিনি তাঁহার সেই অনুপম দেহলাবণ্য আমায় ভাল করিয়া দেখাইতে চাহিতেছেন। সুঠাম, সুন্দর দেহশ্রীর যে তিনি অধিকারিণী, সে সম্বন্ধে যেন তিনি অতি-সচেতন ছিলেন।

জানি না ইহা আমার নিজস্ব কল্পনা কিনা।

তাই একেবারে মুখোমুখি সেই অনন্যসাধারণ নারীকে দেখিয়া একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। লজ্জা ও সঙ্কোচমিশ্রিত একটা ভয়ও বোধ হয় আমার মুখে-চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। যদি আগে জানিতে পারিতাম যে ইনি সেই নারী, যাঁহাকে স্নানের ঘাটে প্রায়ই দেখিতাম তাহা হইলে হয়ত আমার নৌকায় এমনি করিয়া উঠিতে দিতাম না। ছইয়ের ভিতর হইতেই মাঝিকে নিষেধ করিয়া দিতাম, বোল নেহি হোগা!

একেবারে বাঘের মুখে যেন আসিয়া পড়িয়াছি, আমার মনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন তিনি নিজের পরিচয় আগে দিয়া আমার সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ করিয়া লইলেন, বলিলেন, "স্নানের ঘাটে তোমাকে ওইরূপ অসময় প্রায়ই দেখি কেন ভাই? তুমি এখানে কি করো? ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পড়ো নাকি?"

বলিলাম, "না।"

"তবে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য করো?"

"না।"

"তাহলে এই কাশীতে কি হাওয়া বদলাতে এসেছো? কোন কঠিন ব্যয়রাম হয়েছিল?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলাম, "না।"

এবার তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তাহলে এখানে আর কি কাজ! তোমার মত একটা 'ইয়ং' ছেলে এখানে মিছি-মিছি বসে সময় নষ্ট করতে পারে, এ আমি কল্পনা করতে পারি না।"

কি জবাব দিব ভাবিতেছিলাম। হঠাৎ ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টিপিয়া তিনি বলিলেন, "ও বুঝেছি, তাহলে নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছো। বাপ-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে।"

বলিলাম, "না। ঈশ্বর সেদিক থেকে বাঁচিয়েছেন। বাপ-মা দুজনকেই অনেকদিন আগে কেড়ে নিয়েছেন।"

"তাহলে আর কি!" একটু ইতস্তত করিয়া কি যেন চিন্তা করিলেন, তারপর আমার মুখের উপর তাঁহার দুটি স্নিগ্ধ চোখ এমনভাবে মেলিয়া

ধরিলেন যেন মিথ্যাকথা বলিয়া তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে না পারি। তিনি আমাকে বলিবার সুযোগ না দিয়া নিজেই বলিলেন, "তোমার মত কতজনকে এই কাশীতে পালিয়ে আসতে দেখলুম। আমিই কতজনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। গোপনে তাদের কাছ থেকে ঠিকানা জেনে নিয়ে মা-বাবাকে চিঠি লিখে আনিয়ে নিয়েছি। কাজেই আমার চোখকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করো না ভাই। বরং সত্যি বললে, তোমার ভালই হবে।"

ঠিক এই সময় নৌকাটা কেদার ঘাটের সিঁড়িতে ভিড়াইয়া দিয়া মাঝি হাঁকিল, "আ গিয়া বাবুজী।"

ভদ্রমহিলা আগে নামিয়া পড়িলেন। তারপর আমার দিকে মুখটা ফিরাইয়া বলিলেন, "তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি, ফটকে চাবি পড়ে গেলে মহা ঝঞ্ঝাটে পড়বো। তুমি একদিন এসো ভাই আমার বাসায়। খুব কাছেই, কেদারের মন্দির ছেড়ে ডানহাতি গিয়েই প্রথম বাঁদিকে যে গলিটা তার শেষ বাড়ি। সামনে ভাঙা পাঁচিল আছে, ওখানে যাকেই জিজ্ঞাসা করবে রাণীমার বাড়িটা কোথায়, দেখিয়ে দেবে। খুঁজতে একেবারেই কষ্ট হব না।"

বলিলাম, "আচ্ছা যাবো একদিন।"

"ঠিক এসো ভাই।" বলিতে বলিতে দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়া তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন।

॥ চৌদ্দ ॥

রাণীমা! সারা পথ ওই একটি কথাই সেদিন আমার কানের ভিতর গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল। যেমন নাম তেমনি চেহারা। যে তাঁহার এই নাম-করণ করিয়াছিল, মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করিল।

পরের দিন সকালে একটি ছোট ছেলে আসিয়া আমার ঘরের কড়া নাড়িতে দরজা খুলিয়া দিলাম।

"কি চাই?"

ছেলেটি একটি সিকি পকেট হইতে বাহির করিয়া বলিল, "রাণীমাসী এটা আপনাকে দিতে বলেছেন।"

প্রশ্ন করিলাম, "কেন?"

ছেলেটি বলিল, "নৌকো ভাড়া। কাল তাঁর কাছে একেবারে পয়সা ছিল না বলে দিতে পারেন নি।"

কাল রাত্রে আট আনায় পুরা নৌকোটা ভাড়া করিয়াছিলাম তাহা তিনি কেমন করিয়া জানিলেন, ভাবিতে লাগিলাম। একটু পরে ছেলেটিকে বলিলাম, "না, পয়সা আমায় দিতে হবে না। তোমার রাণীমাসীকে বলো যে, আমি একলার জন্যেই তো পুরো ভাড়া দিয়ে নৌকোটা ভাড়া করেছিলুম।"

ছেলেটি আর বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল,

তেমনিভাবে বাহির হইয়া গেল।

পর পর দুই-তিনদিন স্নান করিতে গিয়া রাণীমাটির আর দেখা পাই নাই। কি জানি মনে হইল ভালই হইয়াছে।

একদিন বেলা বোধ হয় তখন বারোটা। খাবার আয়োজন করিতেছি। শালপাতা পাতিয়া মাটির গ্লাসে জল গড়াইয়া বসিতে যাইতেছি, এমন সময় দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ হল।

দরজা খুলিতেই দেখি সামনে দাঁড়াইয়া তিনি। রাণীমার হাতে ছোট একটি তামার ঘট, আর কাঁচা শালপাতায় মোড়া একটা দোনা।

বলিলাম, "আরে আপনি, এই এত বেলায়—"

"আজ কৃষ্ণপক্ষের শুক্রবার, মা সংকটার পুজো দিতে হয়। আটটার সময় স্নান করে গিয়েছিলুম। এই ফিরছি। উঃ, যা ভিড়! তোমাকে তাই প্রসাদ দিতে এলুম।"

ঘরের ভিতরে আসিয়া প্রসাদ রাখিবার জায়গা খুঁজিতেছি এমন সময় রাণীদি বলিলেন, "ও, তুমি বুঝি খেতে বসেছিলে? তাহলে ভালই হলো, প্রসাদটা একেবারে গালে দিয়ে তারপর খেতে বোসো। হাত পাতো।"

"হ্যাঁ, সেই ভালো।" বলিয়া আমি হাত পাতিলাম।

প্রথমে একটা তামার ঘট হইতে একটু চরণামৃত তিনি আমার গালে ঢালিয়া দিলেন। তারপর কিছু ফল ও মিষ্টি আমার হাতে দিলে, ফলের টুকরো যেমন মুখে দিয়েছি. অমনি রাণীদি বলিলেন, "মা সংকটা বড় জাগ্রতা দেবী। তাঁর কাছে বিপদে পড়ে যে যা প্রার্থনা করেন, তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, ঠাট্টা নয়। এখানের সবাই তা জানে। তুমি এইবেলা যেজন্যে এসেছো, মার কাছে মনে মনে মানত করো—দেখবে হাতে হাতে ফল পাবে।" বলিয়া এক স্নিগ্ধ সস্নেহ হাসি যেন আমার মুখের উপর ছড়াইয়া দিলেন।

আমার হাতের মধ্যে তখনো প্রসাদী পেঁড়া রহিয়াছে, তিনি বলিলেন, "আচ্ছা এখন সত্যি করে বলো তো তুমি কি জন্যে এখানে এসেছো? হাতে প্রসাদ, মনে রেখো। কোন প্রেমের ব্যাপার নয় তো!"

"না, না, ঠিক তা নয়।"

"তবে কি?" বলিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

বলিলাম, "আমি একজনকে খুঁজতে এসেছি এখানে।"

"কে সে?"

আমাকে একটু ইতস্তত করিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার ইয়ে—মানে যাকে তুমি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে, আর যে তোমায় ভালবাসে বলে তোমার বিশ্বাস ছিল কিন্তু কার্যকালে তোমারই এক বন্ধুর সঙ্গে পালিয়ে গেছে? কাশীতে তারা এসেছে এই মনে করে এখানে খুঁজতে এসেছো, এই

তো!" বলিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া ফিকফিক করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

"না—না—সে একেবারেই তেমন বিশ্বাসঘাতিনী নয়। বরং আমিই বলতে গেলে তার ওপর অবিচার করেছি।"

"কি রকম? আর কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে তার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলে?"

"না। এ আপনার মিথ্যে কল্পনা।"

"তবে কি? সত্যি করে বলো তাহলে?"

বলিলাম, "সে ছিল আমার খেলার সাথী, কৈশোরের লীলাসঙ্গিনী। আমি যে বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিই, সে বছর তার বিয়ে হয়ে যায়, ধনী এক জমিদারের সঙ্গে। তারপর দুর্ভাগাবশতঃ বিধবা হয়ে স্বামীর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বেচেকিনে একদিন আমারই ঘরে এসে ওঠে। আমি তখন একা একটা ঘর ভাড়া করে থাকি। আমাকে নিজে যেচে সে বিয়ে করতে চাইলে। বললে, এখন তো আমার অভিভাবক বলতে মাথার ওপর কেউ নেই, আর তুমিও তোমার নিজের অভিভাবক। কাজেই বিধবা বিবাহ হতে কোন বাধা নেই—"

রাণীদি আমার মুখের কথাগুলো যেন গিলিতেছিলেন। আমাকে থামিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তারপর?"

"তারপর আমারই কপালের দোষ বলতে হবে, সে যে সেই মুহূর্তে আমার কাছ থেকে তার জবাব প্রত্যাশা করেছিল তা আমি বুঝতে পারিনি, একটু ভেবে দেখবার সময় নিয়েছিলুম—মাত্র কয়েক ঘণ্টার। কিন্তু অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি ঘর শূন্য। একটা চিঠি লিখে চলে গেছে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি—"

বলিয়া আমি যখন ইতস্তত করিতে লাগিলাম, তিনি বলিলেন, "অবশ্য আমাকে যদি বলতে আপত্তি না থাকে, জিজ্ঞেস করতে পারি কি, সে চিঠিতে কি লেখা ছিল?"

মুহূর্তকয়েক চিন্তা করিয়া বলিলাম, "আপত্তি আর কি, লিখেছিল, আমি বিধবা, অন্যের উচ্ছিষ্ট গ্রহণে তোমার মনে যে সঙ্কোচ হচ্ছে, তা তোমার চোখ দেখে বুঝতে পেরেছি, তাই চিরদিনের মত তোমার পথ থেকে সরে যেতে চাই, যাতে তুমি সুখী হও।...সব চেয়ে পীড়াদায়ক তার সব কিছু টাকাকড়ি আমায় দান করে এক কাপড়ে চলে গেছে। তারপর আবার তাকে খুঁজতে বারণ করেছে।" এই পর্যন্ত বলিয়া, একটু থামিয়া শুধাইলাম, "বলুন এতে আমার দোষ কোথায়!"

আমি চুপ করিলে দেখি, রাণীদিও নিস্তব্ধ হইয়া আছেন। মুহূর্ত-কয়েক তেমনি থাকিয়া হঠাৎ তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বলিলেন, "কিন্তু ঠিক করেছে সে। কোন অন্যায় করেনি।"

বলিলাম, "রায়টা একতরফা হলো। যেহেতু আপনি স্ত্রীলোক তাই স্বজাতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছেন। আমার কথাটা না শুনেই, আমাকে ত্যাগ করে চলে যাওয়া কি উচিত হয়েছে? আপিসে গিয়েই তো আমি মনস্থির করে ফেলেছিলুম, ওকেই বিয়ে করবো। বড়বাবু, যিনি আমায় ভাল চাকরি দিয়েছিলেন তাঁর মেয়েকে বিয়ে করবো এই শর্তে, তবু সে চাকরির মায়া ত্যাগ করে, তাঁকে নাকচ করে দিয়ে এসেছিলুম। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই দেখি, ঘর শূন্য আর ওই চিঠি।" এই বলিয়া রাণীদিকে প্রশ্ন করিলাম, "বলুন এ কাজটা করা কি তার ঠিক হয়েছে?"

"হ্যাঁ, হয়েছে।" রাণীদি জোর দিয়া কেবল এই দুটি কথা বলিলেন না, তাহার সঙ্গে তাঁর নিজের এ সম্বন্ধে যা মতামত সেটুকু পর্যন্ত জুড়িয়া দিলেন। বলিলেন, "ভালবাসা অন্ধ, প্রেম অন্ধ। সে কোন ভালমন্দ, যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিবেচনার অপেক্ষা রাখে না। সেখানে মনে মনে প্রাণে প্রাণে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক, সেখানে এতটুকু ফাঁক, চুলপরিমাণ সংশয় বা সঙ্কোচ একটা বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করতে পারে, তা হয়ত অনেকেই জানে না। কিংবা অভিনয় করে।"

"কি বলছেন! অভিনয় করেছি আমি?"

"হ্যাঁ, তোমার মনকে তা জিজ্ঞেস করো, ঠিকই জবাব পাবে। যাক, এ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না ভাই, খাবার সময় হলো, আমারও খুব খিদে পেয়েছে, যাই এখন।" বলিয়া দরজার বাইরে আসিয়া আবার ভিতরে ঢুকিলেন।—"ওই দেখো, আসল কাজটাই ভুলে গেছি।" বলিয়া একটা সিকি লইয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এটা নাওনি কেন—সেদিনের নৌকাভাড়া!"

বলিলাম, "আপনি না এলেও তো আমাকে ওই আট আনা দিতেই হতো, তবে কেন মিছিমিছি—"

"বারে ছেলে! মিছিমিছি? জানো তীর্থস্থানে দানপরিগ্রহ করতে নেই! আমি এই চার আনা পয়সার জন্যে তোমার কাছে ঋণী হয়ে থাকবো চিরজীবন, তুমি বুঝি এই চাও? এত সস্তায় তোমায় কিস্তিমাত করতে দেবো না, বুঝেছো?"

বলিয়া সিকিটা আমার হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

॥ পনেরো ॥

মনটা খুব খারাপ হইয়া গেল। সারাদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলই সেই এক চিন্তা। রাণীদি যা বলিলেন, তাহা কি সত্য? প্রেম অন্ধ, ভালবাসা অন্ধ—সে কোন ভালমন্দ, যুক্তিতর্ক, বাছবিচারের অপেক্ষা রাখে না—এ কি সত্য?

একলা ঘরে থাকিতে সেদিন কেন জানি না ভাল লাগিতেছিল না। কখন

দুপুরটা কাটিবে, অপরাহ্ণ আসিবে, ঘরে চাবি লাগাইয়া বাহির হইয়া পড়িব পথে, তাহার জন্য বার বার ঘড়ি দেখিতে লাগিলাম।

কলিকাতা শহরে যেমন পথ আকর্ষণ করে, এখানে তেমনই ওই ঘাটগুলি। অগণিত সিঁড়ি জল হইতে উঠিয়া উপরে যেখানে মিলিয়াছে, সেখানে হয়ত কোন বৃদ্ধ বট শাখা-প্রশাখা বিস্তর করিয়া নিঃশব্দ দাঁড়াইয়া আছে জটা-জুটাবলম্বী তপস্বীর মত। কোথাও বা আলোছায়া মেশানো রহস্য, কোথাও বা পুরনো মন্দিরের ভাঙাচোরা দেওয়াল। রাত্রির অন্ধকার যত গভীর হয়, টিপটিপ করিয়া সন্ধ্যা হইতে যে আলোটা জ্বলে সেখানে, আমার চোখে যেন তাহা অজ্ঞাত কোন রহস্যপুরীর অঞ্জন মাখাইয়া দেয়। একা-একা ঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় আমার মনটা তাই সব কিছু ভুলিয়া সেই কল্পনার জগতে উধাও হয়।

সেদিন কিন্তু ওই ঘাটগুলিতে নিজেকে বড্ড একা ও অসহায় বোধ হইতে লাগিল।

তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে অগ্রসর হইলাম। একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করিয়াছি, বহুলোকের ভিড়ের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলে মন হইতে একাকীত্ব বোধটুকু তখনই দূর হইয়া যায়। আমিও সেই জনতার একজন, ইহা উপলব্ধি করিবামাত্র মনটা সহসা যেন সতেজ হইয়া উঠে। তাই বোধ হয় শোকাতাপা মানুষ নির্জনতা সহ্য করিতে পারে না, বহু লোকের মধ্যে বাস করিতে চায়। কাশীতে শোকসন্তপ্ত ব্যক্তির এত ভিড় বোধ হয় সেই কারণে। অন্য তীর্থে ঠিক এটি দেখা যায় না। যাহার কেহ নাই, সে যেন এখানে আসিলে সব কিছু পায়।

সেদিন তাই বিকাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে বহুলোকের জনতার মধ্যে নিজেকে লইয়া যাইবার জন্য মনের ভিতরটা আকুলিবিকুলি করিতেছিল। তাছাড়া ওই ঘাটটির একটি বিশেষত্ব ছিল, সকল শ্রেণীর মানুষ এখানে আসিলে মনের ভিতর কেমন যেন একটি স্বস্তি পায়।

কোথাও যেমন খোলকরতালধ্বনির সঙ্গে কীর্তন গান হইতেছে, কোথাও কথকতা, রামায়ণ পাঠ, আবার কোথাও বা বাউল ও ধর্মসংগীত। ঘাটের চাতালের উপর ছোট বড় মাঝারি দলে বিভক্ত হইয়া অসংখ্য শ্রোতার দল, কেহবা বসিয়া, কেহবা দাঁড়াইয়া শোনে এক-এক জায়গায়।

আবার ঠিক তেমনই ভিড় দহিবড়া ও জলফুচকাওয়ালার কাছে। এক এক জনকে ঘিরিয়া দশ-বিশজন স্ত্রী-পুরুষ। কাঁচা শালপাতার দোনায় দহিবড়া দিয়া তাহার উপর একটু লঙ্কার গুঁড়া, ইম্‌লিকা খাট্টা বা তেঁতুলের জল ছড়াইয়া এক-একজনের হাতে যেমন দিতেছে, তেমনি তাহারা গোগ্রাসে গিলিতেছে। আরো বেশী ক্রেতা জলফুচকাওয়ালার কাছে। আট-দশজন স্ত্রীপুরুষের হাতে পাতার দোনা দিয়া, এক-একটি করিয়া ফুচকা আঙুলে টিপিয়া মশলা জলগোলা হাঁড়ির ভিতরে ডুবাইয়া সে পরিবেশন করিতেছে ও

কাহার কয়টি হইল হিসাব করিয়া পয়সা লইতেছে।

ইহারই আশেপাশে কোথাও বা চিনাবাদাম, চানাচুর বিক্রয় হইতেছে। কোথাও গোলাপী গাণ্ডেরী। আবার কোথাও গরম চাটুর উপরে আলুর টিকিয়া।

তেমনি 'চানাচুর মজাদার' ঘুঙুর পায়ে ওখানেই সুর করিয়া আপনার খাদ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপনসহ বিক্রয় করে।

একদিকে যেমন কীর্তন, কথকতার কাছে ভিড়, অন্যদিকে তেমনই এইসব টুকিটাকি খাওয়ার দোকানে ভিড়। ঘাটে দাঁড়াইয়া এইসব তুচ্ছ জিনিস খাইতে খাইতে তাহাদের মুখে-চোখে যেন এক স্বর্গীয় তৃপ্তি উথ্‌লাইয়া পড়ে। এমন খাদ্য যেন জীবনে কেহ কখনো আস্বাদ করে নাই।

আবার অন্যদিকে সধবা, বিধবা ও বুড়ো-বুড়ীর দল যখন ভক্তিগদ্‌গদ চিত্তে সেই কীর্তন, কথকতা ইত্যাদি শ্রবণ করেন, তখন তাঁহাদের মুখ-চোখ দেখিলে মনে হয় যেন আর যে যাহা করিতেছে সব কিছু মিথ্যা। একমাত্র তাঁহারাই ইহকাল ও পরকালের সব পুণ্য সঞ্চয় করিতেছেন।

বাস্তবিক একই সঙ্গে পাশাপাশি দুই বিপরীত ইন্দ্রিয়ের, ত্যাগ ও ভোগের এমন সমন্বয় আর কোথাও প্রত্যক্ষ করা যায় না। একদল কেমন ভোগের ভিতর দিয়া আনন্দলাভ করিতেছে, পৃথিবীতে যেন ওই একমাত্র ইন্দ্রিয়রসনা সত্য, আর সব কিছুই মিথ্যা, অসার। তেমনি আর এক দলের কাছে ইন্দ্রিয়ের সংযমটাই যেন একমাত্র কাম্য। নহিলে ঈশ্বরের কৃপালাভ করা যায় না। শুধু নামগান আর নামশ্রবণ ছাড়া জীবের মুক্তি নাই!

এই ঘাটের এই জনতার সঙ্গে ওই অগণিত নরনারীর কামনাবাসনার সঙ্গে যেন অন্তরের কোথাও একটা অদৃশ্য যোগ আছে। তাই মনের ভিতরটা যখনই শূন্য বোধ হইত আমি এই ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইতাম। বহু লোকের ভিড়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আমি তাহাদেরই একজন, ইহা যেমন অনুভব করিতাম, তেমনি ভিড় হইতে কখনো বা নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া দূরে দাঁড়াইয়া সকলকে লক্ষ্য করিতাম।

"আইয়ে এক আদমি পাকরো! রামনগর, রামনগর, এক আদমি আইয়ে দাদা। ইয়ে শেষ নাও হ্যায়—"

রামনগরের শেষ খেয়াটি যখন যাত্রী লইয়া ওপারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিত, তখন আমি ধীরে ধীরে আসিতাম। যেখানে কীর্তন হইতেছিল, এবার সেখানে গিয়া দাঁড়াইতাম। ভিড় তখন পাতলা হইয়া গিয়াছে। হয়ত অনেক শ্রোতাই চলিয়া গিয়াছে। দেখিতাম যাহারা বসিয়া আছে তাহাদের অধিকাংশই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। নিকটেই কোন গলির ভিতরে হয়ত থাকেন তাই উঠিবার তাড়া নাই। কিংবা কীর্তন শুনিতে বসিয়া শেষ হইবার পূর্বে চলিয়া গেলে পুণ্য ষোল আনা হয় না, এরূপ বিশ্বাসও অনেকের আছে, তাই উঠে নাই।

আমি অনেক দূরের যাত্রী, তবু অন্তরে কোন ফিরিবার তাগিদ বোধ

করিতাম না। যতটা পারি সময় বাহিরে কাটাইয়া একসময় বাসায় গিয়া শুইয়া পড়িতাম। একদিন এইভাবে যখন দাঁড়াইয়া ছিলাম হঠাৎ রাণীদির কণ্ঠ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম।

"এক জায়গায় এইভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি তাকে খুঁজে পাবে? ঘুরতে হবে, এক জায়গায় বার বার। আজ কোন্ কোন্ জায়গায় গিয়েছিলে?" বলিয়া মুখ টিপিয়া যেন এক চিমটি রহস্যের হাসি আমার মুখের উপর ছুঁড়িয়া দিলেন।

কি জবাব দিব ভাবিতে যেটুকু বিলম্ব, তার মধ্যে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এইভাবে খুঁজলে কি তাকে কোনদিন পাবে? রীতিমত পরিশ্রম করতে হবে। এমন ধীরেসুস্থে, জিরিয়ে আরাম করাকে খোঁজা বলে না। ওই কথা ভেবে শুধু নিজের মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়। প্রেমে পড়া এত সহজ নয়। মানুষকে সে অমানুষ করে দেয়। খেয়ে, শুয়ে, ঘুমিয়ে, বেড়িয়ে কোথাও শান্তি নেই। সব সময় যেন ভিতরটা পুড়তে থাকে।"

বলিয়া চাপা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া উঠিলেন।

যে হাসি শুনিয়া আমার দুই কান জ্বালা করিয়া উঠিল। ভাগ্যিস নিকটে কোন লোক ছিল না। একবার চারিপাশে চোখটা বুলাইয়া লইয়া বলিলাম, "আমার মনের ভেতরটায় আগুন জ্বলছে কিনা, তা আপনি বাইরে থেকে কি করে বুঝলেন?"

রাণীদির ঠোঁটের প্রান্তে ঈষৎ হাসি দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। তিনি কহিলেন, "ইঁটের পাঁজার ভেতরে ইঁট যখন পুড়ে লাল হতে থাকে, তখন বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝা যায় না বটে কিন্তু কাছে গেলেই তার তাতটা গায়ে এসে লাগে।"

এই কথা শুনিয়া তাঁহার উপর খুব রাগ হইল। বলিলাম, "অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে, আমার মধ্যে প্রেম নেই, তার উত্তাপও নেই, কিছু নেই এই তো?"

আমার মুখের উপর চোখ রাখিয়া নিঃশব্দে একপ্রকার রহস্যময় হাসি হাসিলেন। তারপর বলিলেন, "মিছিমিছি তুমি আমার ওপর রাগ করছো। আচ্ছা তুমি বল তো, তাকে পাবার জন্যে তুমি কোথায় কোথায় খোঁজ করেছো? এই ঘাটগুলোতে আর মন্দিরে, এই তো? সত্যি বলছি কিনা?"

বলিলাম, "হ্যাঁ। আর কোথায় খুঁজবো বলুন? রামকৃষ্ণ মিশনেও খোঁজ করেছি। ধর্মশালাগুলো সব দেখেছি।"

আবার তেমনিভাবে নীরবে তিনি একটু হাসিলেন। তারপর কহিলেন, "কাশীতে একেবারে নিঃসম্বল হয়ে যারা আসে, তাদের কি ওসব জায়গায় খুঁজলে সন্ধান মেলে?"

"তবে কোথায় খুঁজতে হবে বলুন?"

"অসহায় বিধবাদের জন্যে এখানে অনেক রকমের ছত্তর, আশ্রম, শিল্প-

প্রতিষ্ঠান আছে। সেগুলোতে খোঁজ করেছো কি? তাছাড়া ছোট ছোট মঠ-মন্দির এমন সব আছে যেখানে শুধু বিকালের দিকে দু'খানা কীর্তন গান করলে, কি পুজোর যোগাড় করে দিলে থাকতে ও খেতে দেয়!"

বলিলাম, "এসবের সন্ধান তো জানি না!"

রাণীদি বলিলেন, "জানবার জন্যে যদি চেষ্টা করতে, নিশ্চয় পেতে।"

"আপনি সমস্ত দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে বুঝি আনন্দ পান?"

রাণীদি বলিলেন, "ঘাটের ওপরে দাঁড়িয়ে আর ঝগড়া করতে হবে না। ভাগ্যিস কোনো লোক নেই এদিকে। চলো নৌকোয় গিয়ে উঠি। রাত হয়ে যাচ্ছে। তোমায় তো আবার স্বপাকের ব্যবস্থা করতে হবে।"

"না, রাত্রে ও ব্যাপারটা রুটির দোকানে সারি।"

"বুঝেছি। সেই জন্যে বেশী রাত না হলে বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করে না। রোজ কত করে নৌকোভাড়া লাগে?"

বলিলাম, "এক পয়সাও না। হেঁটেই ঘুরি সব সময়। মধ্যেমিশেলে ভাল লাগে গঙ্গার বুক থেকে ঘাটের নৈশ দৃশ্য দেখতে বিশেষ করে ঘাটগুলো জন-বিরল হয়ে গেলে।"

"ওঃ, এর ভেতরেও আবার এত কাব্য!" বলিয়া মুচকি হাসিলেন। তার-পর সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিলেন, "আমি ভেবেছিলুম বুঝি সেই মেয়েটিকে খোঁজ করতে গিয়ে তোমার রাত হয়ে যায় বাসায় ফিরতে!"

বলিলাম, "হ্যাঁ, কথাটা মিথ্যা নয়।"

রাণীদি খুক্ করিয়া হাসিয়া নীরব হইয়া গেলেন। অর্থাৎ আমার কথাটা যে সত্য নয়, হাসির শব্দে তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

॥ ষোল ॥

নৌকায় উঠিয়া আমি ছইয়ের বাহিরে পাটাতনের উপর বসিয়া পড়িলাম। রাণীদির হয়ত ইচ্ছা ছিল আমার মুখোমুখি বসিবার, কিন্তু আমি ঘাটের দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলাম বলিয়া তিনি ছইয়ের মধ্যে গিয়া ঢুকিলেন।

নৌকা ছাড়িয়া দিল। মাঝিদের একজন হাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অপর ব্যক্তি গলুইয়ের কাছে বসিয়া দুই হাতে দুইটি দাঁড় টানিতে লাগিল।

ছপ্ ছপ্ দাঁড়ের একটানা শব্দের সঙ্গে মাঝে মাঝে 'ক্যাঁচকোঁচ' হালের একটা যন্ত্রণাদায়ক কাতরোক্তি শুনিতে শুনিতে আমরা দুজনে যখন আসিয়া পড়িলাম প্রায় মাঝগঙ্গায়, তখন রাণীদি, আমাদের মধ্যে এতক্ষণ যে একটা মৌন নীরবতার প্রাচীর গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা ভঙ্গ করিয়া প্রথম কথা বলিলেন।

"আচ্ছা সেই মেয়েটির কি নাম বল তো?"

বলিলাম, "শান্তি।"

"বয়েস আন্দাজ কত হবে?"

"আমার চেয়ে এক-আধ বছরের ছোট। তবে ছিপছিপে গঠন, দেখলে বয়সের তুলনায় কমই মনে হয়।"

"রংটা কি রকম—খুব ফর্সা? সুন্দরী?"

"না—।"

বলিয়া একটু চুপ করিতেই তিনি পুনরায় খোঁচা মারিলেন, "কি রকম বলছ না যে, ভুলে গেছ বুঝি?"

এর জবাব না দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলাম। অর্থাৎ উহা ভুলিবার নয়, চিরদিন সে-মূর্তি অন্তরে গাঁথা হইয়া আছে ও থাকিবে। কিন্তু লজ্জায় কিছু মুখ দিয়া প্রকাশ করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

রাণীদি এবার ছইয়ের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া আমার কাছে বসিলেন। তারপর হাসি-হাসি মুখে বলিলেন, "আমার কথা শুনলে খুব রাগ হয়. না? কি করবো বলো ভাই, তোমার মনের মত পছন্দসই ভাল কথা বলার অভ্যাস আমার নেই। তাছাড়া আমার মুখে আসেও না। আমি একটু স্পষ্টবক্তা।"

এবার আর মনের রাগ চাপিতে পারিলাম না। বলিলাম, "জানি আপনি প্রেম ভালবাসা কোন কিছুই বিশ্বাস করেন না। আমায় তাই ব্যঙ্গ করেন।"

জিব কাটিয়া রাণীদি বললেন, "ছি ভাই। ওকথা বলতে নেই। ব্যঙ্গ একেবারেই করছি না। তুমি তাহলে ভুল বুঝেছো আমায়। তাকে কেমন দেখতে জিজ্ঞেস করছি এইজন্যে যে আমি তো এখানে অনেকদিন আছি, অনেক মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ও রয়েছে, তাদের কাছে মেয়েটির সম্বন্ধে বললে, যদি কেউ হদিস দিতে পারে। এই কাশীর মত তীর্থে এসে, তুমি পুরুষমানুষ, মেয়েদের খোঁজ পাওয়া তোমার পক্ষে খুব কঠিন। কারণ তুমি তো শুধু বাইরে থেকে খোঁজ নিয়ে চলে যাবে, অন্তঃপুরে ঢুকতে পারবে না। তাছাড়া আমার তো মনে হয়, তুমি সন্ধান করছো শুনলে সে আর অন্তঃপুর থেকে বেরুবে না। তেমাকে তো সে আর দেখা দিতে চায় না।"

"কি করে জানলেন?"

"বাঃ, তুমি-ই বললে, বিশেষ করে তার চিঠিতে সেই কথাই সে লিখে রেখে গেছে। তাই তো সর্বস্ব দান করে দিয়ে বিবাগী হয়েছে।"

রাণীদি এই বলিয়া চুপ করিলে, আমিও কিছুক্ষণ নীরব রহিলাম। তার পর বলিলাম, "না, তাকে খুঁজে বার করতেই হবে যেমন করেই হোক।"

"কেন?"

"তাকে আমি শুধু মুখোমুখি কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবো। জানি সে আমায় ভুল বুঝে অভিমানভরে সর্বস্ব ত্যাগ করে চলে এসেছে, তাকে আমি বুঝিয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারাবো—"

রাণীদি হাসি চাপিয়া বলিলেন, "অর্থাৎ তাকে বিয়ে করতে রাজী করাবে, এই তো?"

"হ্যাঁ।"

"আর যদি সে তোমায় বিয়ে করতে রাজী না হয় তাহলে?"

বলিলাম, "তাহলে অন্ততঃ তার এই স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যা কিছু আমার ঘাড়ে চাপিয়ে গেছে, সব ফিরিয়ে দিয়ে ঋণমুক্ত হতে চাই।"

খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন রাণীদি।

"হাসছেন যে। কিছু অন্যায় বলেছি?"

"হ্যাঁ।" তখনো তাঁহার মুখে হাসি লাগিয়া ছিল।

"কি রকম?"

"থাক, তা শুনে লাভ নেই। তুমি তো এখুনি আমার উপর চটে উঠবে। আমার ভাই মুখটা খারাপ, তোমায় আগেই তা বলেছি।" রাণীদি বলিলেন, "সত্যিকারের প্রেম দুজনের মধ্যে একটা ঋণের বন্ধন রাখতে চায়, তা থেকে মুক্তি চায় না।"

বলিলাম, "তাই বলে একটা বিধবা মেয়ের টাকাকড়ি গয়নাগাঁটি সব কিছু আমি খেয়ে বসে থাকব আর সে বেচারী অভাব-অনটনের মধ্যে সারাজীবন কাটাবে! এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। আমার যখনই কথাটা মনে হয়, বুকের মধ্যেটা যে কি করে, তা যদি দেখাবার হত—"

"থাক ওসব কথা। বুঝেছি তুমি তাকে কত ভালোবাস। আমি তাই তাকে খোঁজ করবার জন্যে আমার যতটুকু সাধ্য করব। এখন পাওয়া না পাওয়া তোমার ভাগ্য। তবে এই কাশীতেই যে সে এসেছে, এ কথা তোমায় কে বললে?"

"কেউ বলেনি। বিধবা মেয়েছেলে, যার জীবনে আর কোথাও কোন সহায়-সম্বল নেই, তার পক্ষে এইরকম বড় কোন তীর্থস্থানে গিয়া আশ্রয় খোঁজা কি স্বাভাবিক নয়?"

রাণীদি যেন কি চিন্তা করিতে লাগিলেন, তারপর বলিলেন, "হতেও পারে, অসম্ভব নয়।"

আমি তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলাম, "সেইজন্যে সব বড় তীর্থগুলোয় আগে খোঁজ করব স্থির করেছি। কালীঘাট, তারকেশ্বর, নবদ্বীপ, এগুলো সব শেষ করে এখানে এসেছি। বাংলাদেশে—কলকাতার কাছে সে থাকবে না। জানে তাহলে আমি চট করে ধরে ফেলব। তাই অনেক দূর দেশে কোথাও চলে গেছে, এই আমার বিশ্বাস। আপনি কি বলেন।"

রাণীদি তেমনি গম্ভীর থাকিয়া উত্তর দিলেন, "কিছুই অসম্ভব নয়। তবে আমার চেয়ে তুমি তাকে চেনো বেশী?"

॥ সতেরো ॥

পরের দিন হইতে রাণীদি নিজে আমাকে সঙ্গে লইয়া খুঁজিতে বাহির হইলেন। বাঙ্গালীটোলার গলির অন্দরেকন্দরে ছোট ছোট এত যে ঠাকুরবাড়ি, দেবালয় ও মহিলাশ্রম, ছত্তর ইত্যাদি আছে জানিতাম না। কোনদিন ভোগের সময়, কোনদিন সন্ধ্যারতির সময়, কোনদিন বা কীর্তনের সময় সেগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। ইহা ছাড়া তাঁহার পরামর্শমত এক-একটি ঘাটে এক-একদিন ভোর হইতে বেলা একটা পর্যন্ত ধর্ণা দিতে লাগিলাম। কেদারের আগে তুলসী ঘাট, পঞ্চকোটের ঘাট, গোড়েন ঘাট, অহল্যাবাঈ ও মণিকর্ণিকা ঘাট কোনটাই বাদ রাখিলাম না।

কোন্ কোন্ দিন কোন্ ঘাটে পুজাস্নানের বিধিব্যবস্থা, তাহাও রাণীদির কন্ঠস্থ। তিনি তিথি হিসাব করিয়া আমাকে সেইমত নির্দেশ দিতেন। এক-একটি দেবতার এক-একটি বার প্রিয়। সেই দিনে, সেই মন্দিরে পুণ্যার্থীদের ভিড় লাগিয়া যায়।

যেমন মঙ্গলবারে সংকটমোচনের মন্দিরে, সকাল হইতে দলে দলে যাত্রীদের সমাবেশ হইতে থাকে। এবং সব চেয়ে বড় কথা, স্থানীয় লোকেরা স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে এইদিন মন্দিরে যাহার যেমন ক্ষমতা পুজা দেন, ভোগ দেন। সাইকেলে চাপিয়া বহুদূর হইতে ছাত্র-যুবকরা পর্যন্ত পুজা দিতে আসে।

সংকটমোচনের মন্দির একটি প্রকান্ড বাগানের ভিতরে। ফটকে ঢুকিয়া অনেকটা পথ বাগিচার মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাইতে হয়। সাইকেল-আরোহীরা ফটকের বাইরে ফুলের দোকানে সাইকেল রাখিয়া প্যান্ট পরিয়া হাতে পুজার ফুল বিল্বপত্র লইয়া ভিতরে গিয়া মিষ্টান্নের দোকান হইতে কেহ পেঁড়া কেহ বা লাড্ডু কিনিয়া মন্দিরের পুজারীর হাতে দেন।

মহাবীরের বিরাট মূর্তির সামনে হাত জোড় করিয়া কেহ প্রণাম করে। কেহ বা সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়ে

জাগ্রত দেবতা এই সংকটমোচন। মংগলবার এই মন্দিরে যেমন পুজার্থীর ভিড় হয়, তেমনি শুক্রবারে মা সংকটার মন্দিরে, সোমবারে বিশ্বনাথ, রবিবারে দুর্গাবাড়ি, শনিবারে শনির মন্দিরে গিয়াও দাঁড়াইয়া থাকিতাম।

ইহা ছাড়াও অনেক ছত্র আছে যেখানে দুপুরবেলা বারোটা বাজিলেই গরীব, দুঃখী, অনাথ, আতুরদের পেট ভরিয়া ভাত খাইতে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

এই সব জায়গায়ও তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে বাকী রাখিলাম না। কিন্তু কোথাও শান্তিকে খুঁজিয়া পাইলাম না।

মনের মধ্যে কেন জানি না দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই কাশীতে শান্তিকে একদিন নিশ্চিত খুঁজিয়া পাইব।

রাণীদি আমার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কেবল নিজে ঘুরিয়া দেখেন নাই, তাঁহার জানাশুনো পরিচিত বহু মহিলার কাছেও সন্ধান করিয়াছিলেন।

একদিন তিনি এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। মনটা সেদিন আমার খুব খারাপ। চুপ করিয়া ঘরের মেঝেয় সতরঞ্চি পাতিয়া শুইয়া আছি। এমন সময় দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ হইল।

তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজা খুলিতেই দেখি, রাণীদি।

"একি আপনি? এত রোদ্দুরে বেরিয়েছেন যে?"

"পরোপকার করতে গেলে ঘরে শুয়ে আরাম করা যায় না, তা বোধ হয় তোমার জানা নেই!"

বলিলাম, "যতদিন আপনাকে দেখিনি, জানতুম না। কিন্তু আপনাকে দেখার পর সে ধারণা বদলে গেছে। আপনাকে মিছিমিছি কত খাটাচ্ছি।"

রাণীদি সস্নেহে তিরস্কার করিয়া উঠিলেন, "থাক্। কলকাতার লোকেদের ওই শুকনো মুখের কৃতজ্ঞতা ঢের শুনেছি। এখন তাড়াতাড়ি জামাকাপড়টা পরে নাও ত?"

"কেন রাণীদি, কোথাও যেতে হবে?"

"একটা আশ্রমে নাকি শান্তি নামে একটি বাঙগালী বিধবা আছে। ঠিক তুমি যেমন তার বর্ণনা দিয়েছিলে, অনেকটা মিলেও যাচ্ছে তার সঙ্গে। তাই চুপিচুপি তোমাকে নিয়ে যেতে চাই সেখানে।"

"চলুন, চলুন।" বলিয়া মুহূর্তে ঘরে চাবি লাগাইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

বলিলাম, "একটি এক্কা করলে কেমন হয়? কোন্ দিকে যেতে হবে?"

রাণীদি বলিলেন, "অনেকটা দূর। সেই কবির চৌরার কাছে। ডাকো ওই এক্কাটিকে।"

আমরা এক্কায় চাপিয়া যখন সেই আশ্রমে গিয়া পৌঁছিলাম, তখনো পাঁচটা বাজে নাই। ভাদ্র মাসের কাটফাটা রোদে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে। রাণীদির মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম তাঁহার ওষ্ঠের উপরে জমিয়া শারদ প্রভাতে স্থলপদ্ম ফুলের পাপড়িতে শিশিরকণার মত দেখাইতেছিল।

আশ্রমটি ছোট। সামনে আছে কয়েকটি ফুলের গাছ। চামেলি, শিউলি ও বেল ফুলের গন্ধ ফটকে ঢুকিতেই নাকে আসিয়া কেমন যেন উন্মনা করিয়া তুলিল। আমি তখন চোরের মত এদিক-ওদিক তাকাইতেছিলাম। পাছে আমাকে দেখিতে পাইয়া ভিতরে লুকাইয়া পড়ে! তাই রাণীদিকে চুপিচুপি বলিলাম, "আমি বরং এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, আপনি আগে ভেতরে গিয়ে দেখুন, সত্যিসত্যি সেইরকম কেউ আছে কিনা। আপনি ডাকলেই আমি যাবো।"

রাণীদি আমায় ধমক দিয়া উঠিলেন, "গিয়ে কি দেখবো, আমি কি তাকে

চিনি? যে আমায় খবরটা দিয়েছে, সে মিথ্যে বলতে পারে না। মেয়েটি এখানে মন্দিরের সব কাজকর্ম করে। ঠাকুরের ঘর ধোওয়া থেকে ফুল গাঁথা, চন্দন ঘষা,—পাণ্ডেজী পুজো বা ভোগ কিছু ছুঁতে দেন না তাকে শুধু মেয়েমানুষ বলে।"

অগত্যা রাণীদির কথামত একসঙ্গে দুইজনে মন্দিরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইলাম।

রামজীর মন্দির। ছোট কিন্তু সুন্দর সাজানো। শ্বেতপাথরের রাম লক্ষ্মণ সীতার মূর্তি, সর্বাঙ্গে জরির পোশাক ঝলমল করিতেছে। একপাশে মহাবীরের একটি সিন্দুর লাগানো লাল মূর্তি।

আমরা প্রণাম করিয়া দর্শন করিতেছি, এমন সময় কতকগুলি পূজার বাসন মাজিয়া লইয়া একটি বিধবা মহিলা মন্দিরের ভিতরে ঢুকিয়া বিগ্রহের পিছনে সেই বাসনগুলি একে একে গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

রাণীদি বলিলেন, "ভাই একটু চরণামৃত দিন তো আমাদের!"

"দাঁড়ান। পূজারীজীকে ডেকে আনছি। তিনি এতক্ষণ এখানেই ছিলেন, এইমাত্র ভিতরে গেলেন।"

রাণীদি বলিলেন, "থাক্ থাক্ তাঁকে ডাকতে হবে না ভাই। আমরা একটু বসছি এখানে। তিনি আসুন। ভারী চমৎকার শান্তির জায়গা।"

মন্দিরের দরজার সামনে শ্বেতপাথরের বাঁধানো টানা দালান। ভিতর হইতে চামেলি ও শিউলি ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিষ্টি সৌরভ তখনো দালানটার মধ্যে হাওয়ায় যেন মিশিয়াছিল।

রাণীদি মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি বুঝি এখানে থাকেন?"

মেয়েটি বলিল, "হাঁ।"

"আচ্ছা আপনার নাম ত শান্তি?"

"কি করে জানলেন? আপনাকে এখানে তো আগে কোনোদিন দেখেছি মনে হয় না!"

রাণীদি বলিলেন, "ঠিকই বলেছো ভাই। আমি এখানে এই প্রথম এলুম। অনেক দূরে থাকি ত?"

"কোথায় থাকেন, কলকাতা?"

রাণীদি জবাব দিলেন, "না, সেই কেদারঘাটের কাছে। তবে ইনি থাকেন কলকাতায়।" বলিয়া আমাকে দেখাইলেন।

"উনি আপনার কে হন?" মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিলে রাণীদি একটুও ইতস্তত না করিয়া উত্তর দিলেন "ও আমার সম্পর্কে ভাইয়ের মতন।"

ভাইয়ের মতন! কথাটা আমার কানে যেন খট্ করিয়া বাজিল। আমি শুধু রাণীদির মুখের দিকে নীরবে তাকাইলাম।

রাণীদি আমার মুখের উপর একবার দ্রুত তাঁহার চোখটা বুলাইয়া লইয়া

সামনের বিগ্রহের উপর রাখিলেন।

পূজারীজী ঠিক সেই সময় আসিয়া একটি তাম্রপাত্র হইতে কুশি করিয়া একটু চরণামৃত আমার ও রাণীদির হাতে দিলেন।

চরণামৃত খাইয়া। আর একবার বিগ্রহকে প্রণাম করিয়া আমরা মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

বলা বাহুল্য যে আশা ও উদ্দীপনা লইয়া আমি গিয়াছিলাম তাহার শতাংশও অবশিষ্ট রহিল না তখন। রাণীদি আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "মনটা খুব ভেঙে পড়েছে, না? মনে মনে আমাকে খুব গালাগাল দিচ্ছ ত?"

"আপনার কি দোষ? আমার বরাতটাই মন্দ! নইলে কম চেষ্টা ত আপনি করলেন না আমার জন্য এতদিন ধরে।"

রাণীদি ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টিপিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের মন্দিরে দাঁড়িয়ে তোমার জন্যে মিথ্যে কথা পর্যন্ত বলতে হলো!"

মনটা খুব দমিয়া গিয়াছিল। বলিলাম, "মন্দিরে ঠাকুর দেবতার কাছে কেন মিথ্যে বলতে গেলেন? এর জন্যে আমি খুব লজ্জিত!"

"থাক, এত আর কথার আড়ম্বর দেখাতে হবে না। যা করেছি, তোমারই মান বাঁচাবার জন্যে!"

এবার একটু নীরব থাকিয়া বলিলাম, "সন্দেহটা আরো আপনি নিজেই জন্যেই বলুন!"

"হ্যাঁ, কথাটা মিথ্যা নয়। তোমার মত একটা অপরিচিত যুবকের সঙ্গে আমায় ঘুরতে দেখলে বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠা স্বাভাবিক!"

এবার একটু নীরব থাকিয়া বলিলাম। "সন্দেহটা আরো আপনি নিজেই এনে দিলেন—ভাইয়ের মতন বলে!"

রাণীদি এবার একটা দুষ্টু চাহনি দিয়া বলিলেন, "ওঃ. এসব ব্যাপারে ত দেখি কান খুব খাড়া!"

বাস্তবিক অদ্ভুত এই রাণীদি। যত তাঁকে দেখি তত বিস্ময় বাড়ে। এক-দিন তিনি বলিলিন, "এবার কি করবে? শান্তিকে ত এতদিন ধরে খুঁজে কোথাও পেলে না? কাশীর গলিঘুঁজিতে যেখানে যত ছোট বড় মন্দির, ছত্র, পাঠমন্দির ছিল সব দেখলুম।"

বলিলাম, "তাই ভাবছি।"

"ভাববার কি আছে, আমি বলি সোজা বাড়ি যাও। তুচ্ছ একটা মেয়ের জন্যে জীবনটাকে এইভাবে নষ্ট করো না। তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সামনে পড়ে রয়েছে অনন্ত ভবিষ্যৎ।"

কি জবাব দিব খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

রাণীদি কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন। "জানি আমার কথাটা

তোমার মনঃপূত হলো না। এটা তোমার দোষ নয়, তোমার বয়সের ধর্ম!"

"কি বললেন?"

"যা বলেছি, আজ বুঝবে না, তবে একদিন নিশ্চয় পারবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন অনুতাপ ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না, কারণ সময় আর যৌবন—দুটোই সচল। একবার চলে গেলে মাথা কুটে মলেও আর ফিরে আসে না! তাই আবার বলছি, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। 'বেঁচে থাক আমার মোহন বাঁশী/কত শত মিলবে দাসী'।" বলিয়া মুচকি হাসিলেন।

শেষকালে ওই ছড়ার সঙ্গে মুচকি হাসিটা যেন আমার সর্বাঙ্গে বিষ ছড়াইয়া দিল। তবু মনের রাগ চাপিয়া কহিলাম, "আপনার কাছে ত কিছু গোপন করিনি, সব বলেছি।"

"হ্যাঁ, সব বলেছো বলেই তোমাকে এই উপদেশ দিচ্ছি। এখন নেওয়া না নেওয়া তোমার খুশি!"

আমি কি বলিব যখন ভাবিতেছি, তিনি নিজের বক্তব্যের জের টানিয়া সহসা বলিয়া ফেলিলেন, "প্রেমই বলো, আর ভালবাসাই বলো, সবের মূলে সেই এক! বৈষ্ণব মহাজনদের ভাষায় যার নাম আদিরস! সব নদী যেমন সাগরে গিয়ে মেলে, তেমনি সকলের লক্ষ্য সেই এক জায়গায়। যতক্ষণ না সেখানে পৌঁছোয়, প্রেমের নামে জয়ঢাক বাজায়।" এই বলিয়া একটু থামিয়া খুক করিয়া একটু হাসিলেন। হাসি নয়, যেন বিদ্রূপের বাণ। হয়ত ঠিক স্থানে বিদ্ধ করে নাই ভাবিয়া আবার সান্ত্বনার সুরে বলিলেন, "রাগ করো না ভাই। ও হচ্ছে আমার মতে যেমন কীর্তনের পূর্বে গৌরচন্দ্রিকা, উপন্যাসের আগে ভূমিকা ঠিক তেমনি!"

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল, তাই রাণীদি থামিবামাত্র বলিলাম, "আপনার কাছে প্রেমের অর্থ যদি ওই হয় তাহলে সারা জগতে যে প্রেমের এত জয়গান, উপন্যাস যা ছাড়া হয় না, হতে পারে না, সব কি মিথ্যে? কাব্যসাহিত্য, গল্প-উপন্যাসে যা লেখা থাকে তা কি সত্যি হয় না কখনো বাস্তব জীবনে?"

"সত্যি-মিথ্যা বুঝি না ভাই, আমার যা ধারণা তাই বললুম।" থামিতে গিয়াও থামিলেন না, "একটা জিনিস নিশ্চয় লক্ষ্য করেছো যে ফুল ফুটলেই অমনি ভ্রমর ছুটে এসে তার চারপাশে গুনগুন করে, তারপর যেই বুকে মধুর স্বাদ পায় সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় সব গুনগুনানি। আরো উদাহরণ দেওয়া যায়। দেখো নদী যতক্ষণ ছুটে চলে ততক্ষণ কুলু কুলু ধ্বনি শোনা যায়, কিন্তু যেই সাগরের সঙ্গে মিলিত হয় অমনি সব কলকলানির অবসান। একে-বারে নিস্তব্ধ!

"আমার তো মনে হয় আমরা মুখে যে প্রেমের এতো বড়াই করি, তার সঙ্গে ওই ভ্রমরের গুনগুনানি আর নদীর কলকলানির কোন তফাৎ নেই। দুই-ই এক। তাই প্রেম না বলে একে 'পূর্বরাগ' বা মিলনের 'পূর্বস্তুতি' বলাই ঠিক। এর চেয়ে যথার্থ ও উপযুক্ত প্রতিশব্দ আর কিছু হতে পারে না ওর।"

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় আমার এ কথাগুলো তোমার কানে মধুবর্ষণ করছে না বুঝতে পারছি, কিন্তু কি করবো—"

রাণীদিকে থামাইয়া দিয়া বলিলাম, "তার মানে কাব্য, সাহিত্য, উপন্যাস কোন কিছুই আপনি বিশ্বাস করেন না?"

রাণীদিকে এইভাবে যে আঘাত করিব, বোধ হয় তিনি ভাবিতে পারেন নাই। তাই নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "ওসব ভাই বইয়ে পড়তে ভাল লাগে। বাস্তব জীবনে কি ওরকম দেখা যায়? এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন একেবারে মোক্ষম। যাকে বলে, প্রেমের চূড়ান্ত কথা।"

"কি বলেছেন?" উৎসুক হইয়া উঠি।

মৃদু হাসিয়া রাণীদি বলিলেন, "ওই যে, সেই গানটা শোনোনি? 'আমার আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা/তুমি আমারি, তুমি আমারি. মম হৃদয়-গহন-বিহারী'!"

এই সঙ্গে আরো বলিলেন, "যারা মুখে প্রেমের জয়গান করে বেড়ায় সব সময়, তাদের লক্ষ্য করেই বোধ হয় কোন সত্যদ্রষ্টা কবি লিখেছিলেন। নামটা কিন্তু ভাই মনে পড়ছে না। তবে ওমর খৈয়ামের মত শোনায়। অনেক কাল আগে পড়েছিলুম।"

বলা বাহুল্য আগ্রহ আরো বাড়িয়া উঠে। আমার চোখের উপর তখন নিজের শান্ত চোখ দুটি ধীরে ধীরে রাখিয়া রাণীদি বলিতে লাগিলেন, "প্রণয় সে যে গোপন ছোরায় গুপ্ত ঝরায় রক্ত/খুন হলো যে তার কাপড়ে রং দেখানো শক্ত।"

হঠাৎ দুজনের মাঝে যেন একটা নীরব যবনিকা পড়িয়া গেল। কাহারো মুখে আর কথা নাই। রাণীদিই তির্যক দৃষ্টি হানিয়া মুখ খুলিলেন, "এ ত আমার কথা নয়, নিশ্চয় তাহলে বিশ্বাস করছো? এর বেলা মুখে কথা নেই কেন?"

বলিলাম. "একটু আগেই ত আপনি বললেন এসব কথা কাব্যে সাহিত্যে পড়তে ভালো।"

"আরে আমার কথা বাদ দাও! আমি তোমায় জিজ্ঞেস করছি?"

এর জবাবে শুধু আমি তাঁকে প্রশ্ন করিলাম, "তাহলে প্রেম কাকে বলে? কি তার 'ডেফিনেশন্'?"

"এই মরেছে! না-না! দোহাই তোমার। রক্ষে করো ভাই! ও নিয়ে আর মাস্টারী করতে আমায় ডেকো না। তোমায় তো বলেছি অনেক আগে যে আমি তোমাদের মত বিদ্বান নই। কলেজ ইউনিভারসিটিতে লেখাপড়া শিখিনি, আমার বিদ্যের দৌড় এই কাশীর ঘাট, আর মঠমন্দির! চোদ্দ-পনেরো বছর ধরে সেখানে শুধু পাঠ, কথকতা, কীর্তন আর ভাগবত ব্যাখ্যা যা শুনেছি,

আমার পঁুজি সেইটুকু মাত্র।”

এই বলিয়া তিনি শুরু করিলেন, “ ‘ডেফিনেশন্’ বলতে তুমি ঠিক কি শুনতে চাও জানি না, তবে আমার মনে হয় ফুলের সঙ্গে তোমাদের এই তথাকথিত প্রেমের মিল ঘনিষ্ঠতম। ফুল যেমন ফোটে, ঝরে গিয়ে আবার ফোটে সেই একই গাছে। একটা কোন ফুলকে গাছ ধরে রাখতে পারে না চিরদিন। এ তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অথচ এই ফুল ফোটাও যেমন সত্য, ঝরে যাওয়াও তেমনি সত্য, সেই গাছেই আবার ফুল ফোটাও তেমনি কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এটাই ফুলের ধর্ম। পুষ্পধর্ম! ঠিক ওই ফুলের মত, একই মানুষের মনে তাই প্রেম বারংবার আসে যায়, তাকে না পেলে অপরকে সেস্থলে কেন বসানো যাবে না! এখানে মানুষের মনটা ওই পুষ্পধর্মী। একজনকে ভালবাসলে অপরকে আর ভালবাসা যাবে না কেন, প্রেমের নীতিধর্মে অন্তত এমন কথা লেখা নেই।

তেমনি একই মানুষের পক্ষে একাধিকবার প্রেমে পড়া স্বাভাবিক। এটাই সুস্থ, সবল মানুষের ধর্ম, দেহধর্ম। গাছের সঙ্গে এখানে তার অদ্ভুত মিল। মানুষের প্রেমকে এখানে পুষ্পধর্মী বলা যায়। প্রেমের ‘ডেফিনেশন’ বলতে তোমরা কি মনে করো জানি না, তবে আমার এর চেয়ে বেশী কিছু জানা নেই।”

খুব রাগ হইল। বলিলাম, “আপনার কথা শুনে মনে হয় প্রেম একটা অত্যন্ত ভঙ্গুর ঠুন্‌কো জিনিস। সেখানে কোন দৃঢ়তার ভিত্তি নেই।”

রাণীদির কণ্ঠে এবার বিদ্রূপ ঝলসিয়া উঠিল, বলিলেন, “হ্যাঁ, খুব দৃঢ় জানি! সেইজন্যে জাতকুল ভেঙে, বাপ-মায়ের চোখের জলে সংসার ভাসিয়ে যারা প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তাদের সে বাঁধন তত শীগ্‌গির ছিঁড়ে যায়। প্রেমের বিয়েতে তাই ডাইভোর্সের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী, শুধু আমাদের দেশে নয়, প্রেমের যেসব মহাতীর্থ সেই সব বিদেশের কথাও বলছি।”

তখন রাণীদি এমনভাবে তর্ক জুড়িয়া দিলেন, যেন প্রেম বলিতে কিছু নাই। সব মিথ্যা। এটাই আমার চোখের সামনে বিশেষভাবে তুলিয়া ধরিতে চান।

অমাকে এর কোন জবাব দিবার অবসর না দিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, “প্রেম বীর্যের পূজারী। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইতিহাসে তাই দেখা যায় স্বয়ম্বরা সভাতে, শৌর্যবীর্যের পরীক্ষায় যারা জয়ী হয়, তাদের গলাতেই মালা দিয়ে রাজকন্যারা ধন্য মনে করে। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বলচিত্ত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ প্রেমিকের দলে, তারাই হাতে জপমালা নিয়ে মুখে প্রেমের নামগান করে। এ এক ধরনের মানসিক ব্যাধি। যাদের দেহের রক্ত দূষিত তাদের যেমন একবার ঘা হলে কিছুতেই সারতে চায় না। সব সময় মাছি ভন্ ভন্ করে, তেমনি।”

রাণীদি বিশেষ করিয়া এই যে দৃষ্টান্ত দিলেন, পরোক্ষভাবে আমাকেই যে উদ্দেশ করিয়া, তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। রাগে আমার ভিতরটা যেন জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে থামাইয়া এবার বলিলাম, "প্রেম আর ভালবাসার মধ্যে কি কোন তফাৎ নেই? আপনি দেখছি 'খেজুর গাছ তেল পানা' করে দিলেন বক্তৃতা দিয়ে।"

রাণীদি এবার গলার স্বর নামাইয়া বলিলেন, "বক্তৃতা তো ভাই আমি দিতে চাইনি। তুমিই তো ইচ্ছে করে আমাকে তাতিয়ে দিলে। আচ্ছা, এবার আমি মুখে চাবি দিলুম।"

"না, একটা কথার আমি জবাব চাই। প্রেম ও ভালবাসার মধ্যে যে একটু পার্থক্য রয়েছে অর্থাৎ একসঙ্গে মানুষ একাধিকজনকে ভালবাসতে পারে কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে একনিষ্ঠতাই হচ্ছে শেষ কথা। তাই যথার্থ প্রেম একজনের সঙ্গেই হয়। কিন্তু ভালবাসতে পারে মানুষ অনেককে। এটা কি আপনি সমর্থন করেন?"

"না। আমার মনে হয় এখনো তুমি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারোনি। আচ্ছা সাজাহানের প্রেম তো বিশ্ববিখ্যাত। তাজমহল দেখে সবাই তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁর প্রেম সম্বন্ধে এত বড় কবিতা লিখে লোকের চোখে আঙুল দিয়ে বলে গেছেন 'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া'। সাজাহান যে একজন আদর্শ প্রেমিক, দুনিয়ায় যাঁর প্রেমের তুলনা হয় না, এটা নিশ্চয় স্বীকার করো—মানো তো?"

বলিলাম, "হ্যাঁ। মানবো না কেন?"

"কিন্তু এই সাজাহানের তখন যে একাধিক বেগম ছিল জানো কি? তাহলে একে কি আদর্শ প্রেম তুমি বলবে না?"

"তাহলে কি বলতে চান প্রেম বলে কিছু নেই? মানুষ চিরদিন একটা মরীচিকার পিছনে ছুটে মরছে!"

রাণীদি বলিলেন, "না, তাও বলি না। তবে সে অনেক বড় জিনিস, যা তোমার আমার মত মানুষের ধারণার ঊর্ধ্বে। সে সাধনার ধন, তার জন্যে কঠিন কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। যে দীঘি যত সুগভীর তার জল ওপরে তত স্থির ও স্তব্ধ। ওপর থেকে দেখে যেমন বোঝা যায় না তার সে গভীরতা কত সুদূরপ্রসারী, তেমনি সত্যিকারের যা প্রেম তা অন্তর্মুখী, তার বহিঃপ্রকাশ নেই; প্রেম বা ভক্তি কেউই এক জায়গায় স্থির থাকে না, ওর ধর্ম হোল নীচে থেকে ক্রমশ ঊর্ধ্বে ওঠা। হোমের শিখার মত একবার প্রজ্বলিত হলে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে তার গতি ওপরের দিকে যেতে চায়। এই মানসিক উন্নয়ন বা মনের ঊর্ধ্বগতিরই অপর নাম সাধনা। সেই জন্যেই তো চণ্ডাল মুন্দফরাস প্রভৃতি যে নীচকুলোদ্ভব, তার ওপরেও এই প্রেম বর্ষিত হয়।

"মানুষের প্রেমের সঙ্গে ভগবদ্‌প্রেমের তফাৎ যেমন সূক্ষ্ম তেমনি বিরাট। যেমন নিকট তেমনি সুদূর। মানুষ এক, তার মনও সেই এক, শুধু পাত্রভেদ।

তাই তো রামী ধোবানীর প্রেমও দেবী বাসুলীর প্রেমে এক হয়ে যায় চণ্ডী-দাসের কাছে। বেশ্যা চিন্তামণির প্রেমে পাগলা বিল্বমঙ্গল প্রেমের ঠাকুর ব্রজ-গোপালের প্রেমলাভে ধন্য হলো। মানুষের এই প্রেমই রূপান্তরিত হয় ভগবদ্ প্রেমে, তপস্যার আগুনে ভক্তিরস জ্বাল দিতে হয়। দুধ মরে যেমন ক্ষীর হয় তেমনি।

—ধান ভানতে শিবের গীত শুনে নিশ্চয় তোমার রাগ হচ্ছে আমার ওপর, না? ভাবছো খুব জ্ঞান দিচ্ছি! মোটেই না। আমার এ নিজস্ব মত। তোমাকে বিশ্বাস করতে বলি না। আর কাউকে কোনদিন বলিনি। তবু তোমায় যে আজ কেন মরতে বলতে গেলুম তাও জানি না!"

॥ আঠার ॥

রাণীদির সঙ্গে সেদিনের পর আর আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই! বোধ হয় আমার প্রতি তাঁর যতটুকু কর্তব্য ছিল সব শেষ করিয়া দিয়াছিলেন, অধিকন্তু ও-সম্পর্কে তাঁর যা মনোভাব তাহাও গোপন না করিয়া স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়া সেদিন আমার সঙ্গে তাঁর সকল সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াছিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর সম্বন্ধে আমারও আর কোন কৌতূহল ছিল না। তবু একদিন কেদারের গলির মধ্যে পথ হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ রাণীদির সেই ভগ্ন প্রাসাদের সামনে আসিয়া পড়িতে পা দুটা যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। মনে হইল, একবার খোঁজ লইয়া যাই।

সামনের ফটকের বড় দরজাটার বুকে ছোট কাটা দরজাটা উন্মুক্ত দেখিয়া মাথা নীচু করিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম। বড় উঠানটা পার হইয়া, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে দেখি, তাঁর দরজায় তালা ঝুলিতেছে।

ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় লোলচর্ম, নুব্জ দেহ এক বুড়ী লাঠির উপর ভর দিয়া দেহের অর্ধেকটা সামনের দিকে ঝুঁকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইলেন। বুড়িটির মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, গাল দুটি যেন মুখের ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে, অনেকদিনের পুরনো বিবর্ণ নিকেলের যে চশমাটা চোখে তার ডানদিকের কাঁচটা ফাটা, আর বাঁদিকে ডাঁটিটা নাই বলিয়া সাদা সুতা দিয়া কানের সঙ্গে বাঁধা।

কাছে আসিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দিদিমা, রাণীমার দরজায় তালা দেওয়া, কোথায় গেছে বলতে পারেন?"

"চুলোয়! বলিয়া লাঠির উপর ভর দিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া আমার মুখের উপর দুটি ঘোলাটে চক্ষু রাখিয়া যেন খিঁচাইয়া উঠিলেন, বলি আমার বুঝি পুজো-আহ্নিক নেই, মহারাণী কখন কোথায় কি কাজে ঘুরেছেন, তার হিসেব-নিকেশ রাখতে হবে!"

আর ঘাঁটাইতে সাহস হইল না। এই শ্রেণীর বুড়ীদের মুখের কোন

আগঢাক নাই। শোভনতা, ভদ্রতার কোন ধার ধারে না। এককালে যা ছিল এখন শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। ইহাদের দেখিলে কষ্ট হয়। বয়সের কুলকিনারা নাই। আটের কোঠা ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। 'মণিকর্ণিকা' পাইবার লোভে অর্থাৎ কাশীতে মরিলে ও মণিকর্ণিকার শ্মশানে চিতায় উঠিতে পারিলে একেবারে সশরীরে স্বর্গবাস! পুনর্জন্ম হইবে না! এই বিশ্বাস লইয়া একদিন কবে কোন্ কালে এখানে বাস করিতে আসিয়াছিল, তাহাও বুঝি বিস্মৃত হইয়াছে। এখন তাই শুধু যমকে দু'বেলা গালি পাড়েন। কেহ মরিয়াছে শুনিলে যেন ক্ষেপিয়া উঠে। মুখপোড়া যম কি চোখের মাথা খেয়েছে —দেখতে পায় না আমায়! কত লোক এলো আর ড্যাংডেঙিয়ে স্বর্গে চলে গেল এই আমার সামনে দিয়ে। চলতে চলতে কোন একটা মন্দির দেখিতে পাইলে অমনি দু'ফোঁটা চোখের জল ঝরিয়া পড়ে। বাবা বিশ্বনাথ, তোমার কি দয়া হবে না ঠাকুর! কত পাপ করেছিলুম গতজন্মে, তাই এমনি করে দগ্ধে মারছো। আর যে সহ্য করতে পারছি না। ডেকে নাও তোমার মণিকর্ণিকায়।

কি জানি কেন দেখা না হওয়াতে যেন পথ চলিতে চলিতে রাণীদির কথা আরও বেশী মনে আসিতে লাগিল। বাস্তবিক রাণীদির তুলনা হয় না। পরোপকারী উদার-হৃদয়, কোন মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিলে স্থির থাকিতে পারেন না। ক্ষমতার অতিরিক্ত করেন। সবই ভাল রাণীদির—যেমন মধুরভাষিণী, মধুরহাসিনী—তেমনি স্নেহময়ী, লক্ষ্মীস্বরূপিণী। শুধু একটা বড় দোষ, প্রেম-ভালবাসার কথা শুনিবামাত্র তাঁর কণ্ঠে যেন বিদ্রূপের হাসি ঝলকিয়া উঠে। তার প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা ভালবাসা নাই যেন তাঁর মনে। কেন কে জানে!

পরক্ষণেই মনে হইল, আগে পথেঘাটে, মন্দিরে কি স্নানের সময় যেমন মাঝে মধ্যে দেখা হইত, অনেকদিন আর তা হয় নাই! বোধ হয় আমাকে এড়াইবার জন্যই এদিকে আসা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আবার বিরূপ চিন্তা জাগে। কি সম্পর্ক আমার সঙ্গে তাঁর! পরস্যাপি পর। হয়ত জীবনে আর কোনদিন দেখাই হইবে না। তবু অযাচিত ভাবেও যে উপকারটুকু এখানে তিনি আমার করিয়াছেন, তার জন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ!

মনের মধ্যে এমনি সব চিন্তা লইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে অবশেষে গোড়েন-ঘাটে কোন লোকজন নাই, বেশ নির্জন দেখিয়া নীচে নামিয়া ঘাটের একটা বড় ভাঙা পাথরের সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলাম।

গঙ্গার ওপারে রামনগরের আকাশ থেকে দিনের শেষ আলোটুকু তখনো মুছিয়া যায় নাই। বিস্তীর্ণ বালুচর ছাড়াইয়া, দিগন্তে তীরভূমির বৃক্ষলতার শ্যামল রেখা ধীরে ধীরে ক্রমশ স্পষ্ট হইতে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল। রহস্যময়ী প্রকৃতির এই লীলার মধ্যে বোধ হয় নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়া-

ছিলাম। তাই কখন নিঃশব্দে আমার পিছনে এক ব্যক্তি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

কি, সিনারি দেখছেন নাকি? হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম।

ঘাড় ফিরাইতেই লোকটি বলিল, আপনি বুঝি কলকাতা থেকে এসেছেন?

কি করে জানলেন?

আরে ভাই এই কাশী মহাতীর্থে, সারা ভারত কেন, তাবৎ দুনিয়ার লোক আসে যায়, কিন্তু কলকাতার শরীরের পালিশই আলাদা, যার চোখ আছে দেখলেই চিনতে পারে।

বলিতে বলিতে পকেট হইতে একটি পানের ডিবা বাহির করিয়া আমার সামনে খুলিয়া ধরিলেন। আসুন এ কাশীর বিখ্যাত পান। চলবে তো?

মাপ করুন, পান খাই না!

লোকটি এবার পানের ডিবা পকেটে পুরিয়া একটি সিগারেটের প্যাকেট সামনে ধরিলেন, এটাতে আশা করি না করবেন না। পান খাওয়াটা অবশ্য অউট-অফ্-ফ্যাশান—আজকাল কলকাতায়। কিন্তু সিগারেট তো স্কুল থেকে বাপের পকেট মেরে খেতে শেখে ছেলেরা।

আমাকে তখনো নিষ্ক্রিয় দেখিয়া ভদ্রলোক নিজেই একটা সিগারেট আমার হাতে দিলেন। তারপর দেশলাই বাহির করিয়া নিজে একটা ধরাইয়া সেই জ্বলন্ত কাঠিটা আমার মুখের কাছে ধরিলেন।

লোকটিকে আগে দেখি নাই। বয়েস ঠাওর করা শক্ত। ঠিক যুবকও নয়, অথচ প্রৌঢ়ত্বে পেঁাছাইতেও বেশ দেরি। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বোধ হয় চার-পাঁচদিন কামান নাই, ছাঁটা গোঁফ, মাথার চুল বাব্রি করা, ঘাড়ের ওপর লতানো। গায়ে একটা আধময়লা আদ্দির পাঞ্জাবি, ভিতরে একটা জালি গেঞ্জি। তাহাতে সোনার বোতামের সঙ্গে সোনার চেন। বোতামের উপর মিনে করা 'এস'। নামের আদ্যক্ষর। অত্যধিক পান খাওয়ার ফলে দুটি ঠোঁট লালের বদলে কালচে মারিয়া গিয়াছে। কথা কহিলে জরদার গন্ধ আগে নাকে আসিয়া লাগে।

সিগারেটে পর পর দুইটা টান দিয়া লোকটি আমার সামনে আসিয়া বসিলেন। তরপর নিঃশব্দে একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিলেন, আপনাকে তো বেশ কিছুদিন ধরে দেখছি রাণীমার পিছনে ঘুরছেন। তা কিছু সেটেল হলো?

সেটেল্? কিসের সেটেল্?

মানে ওঁর পিছনে যাঁরা ঘোরাঘুরি করেন, তাঁরা তো দেখি এক কর্মেই আসেন! তাই জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করবেন না ভাই, আপনিও কি ফেঁসে গেছেন?

দেখুন আপনি কি সব বলছেন, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না!

লোকটি মুখে একপ্রকার সবজান্তার হাসি টানিয়া বলিলেন, আরে ভাই জানি। সবাই প্রথমে ওই কথাই বলেন। কারণ এসব গোপন কাজে যাকেতাকে

বিশ্বাস করা উচিত নয়। আপনি ঠিকই করেছেন। আপনার কোন দোষ দিই না, তবে শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। এই কাজে আপনার বাপ-মার আশীর্বাদে চোদ্দ বছর হাত পাকালুম তো। আপনাকে চুপচাপ একা ঘাটে বসে থাকতে দেখেই বুঝেছি রাণীদির সঙ্গে পোষায়নি। ছেলে-ছোকরাদের উনি পাত্তা দেন না কখনই। বড়লোকদের সঙ্গে ওঁর যত কাজ-কারবার। হাজার, দু' হাজারের কম কথা বলেন না! অবশ্য ওঁর ব্যাপার-স্যাপার আলাদা। মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যে কোন মহিলা এরকম একটা বিরাট ব্যবসা খুলে বসতে পারেন, কল্পনা করা যায় না। থাকগে সে-সব কথা। আমার কি দরকার ভাই নোংরা ঘাঁটার?

আমি তো লোকটির কথা শুনিয়া হতবাক। এত কথার পরও আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া, হঠাৎ তিনি কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরাইয়া দিয়া বলিলেন, আমি তো ভাই এ ব্যাপারে আপনাদের মত ইয়ংম্যানদের কোন দোষ দেখি না। ঘি আর আগুন কাছাকাছি থাকলে এ ঘটতে বাধ্য। আমার মনে হয় এর জন্যে দায়ী আমাদের সমাজ। বলিতে বলিতে মুখ হইতে পোড়া সিগারেটের শেষ টুকরাটা গঙ্গার জলে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন বিশ্বাস করুন ভাই, আমাদের যত কেস, তার অধিকাংশই আপনাদের মত ইয়ং ছেলেমেয়েদের ব্যাপার। হয় প্রাইভেট্ টিউটর, নয়ত বেশির ভাগ কোন আত্মীয়স্বজন, অর্থাৎ কোন 'তুতো' সম্পর্কিত দাদা-বোনের অবাধ মেলামেশায় ফেঁসে যায়। আপনারও কি তেমন কেস? কুমারী স্টুডেন্ট্, না কোন 'তুতো' বোনটোন!

এই পর্যন্ত বলিয়া একটু ঢোঁক গিলিয়া গলার স্বর নামাইয়া ফিসফিস করিয়া কহিতে লাগিলেন, তাই আপনাকে আগে থাকতে সাবধান করে দিচ্ছি, রাণীমার পাল্লায় একবার গিয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই। হাই রেট্। ওসব বড়লোকদের পোষায়। হাজারের নীচে কথাই কইবেন না। সেক্ষেত্রে আমাদের চার্জ মাত্র আড়াইশো টাকা সর্বসমেত। তার মধ্যেই থাকা-খাওয়া, ওষুধ-বিষুধ, ডাক্তারের চার্জ, এভ্রিথিং। অথচ কাকে-বকে টের পাবে না। আমাকে তেমনি নীরব দেখিয়া ভাবিলেন বুঝি টোপ গিলিয়াছে। তাই বলিলেন, বিশ্বাস না হয় চলুন আমার সঙ্গে। বাড়িটা দেখে আসবেন। একেবারে সরু গলির মধ্যে দুর্গের মত বিরাট বাড়ি, আর বাইরে থেকে দেখলে কিছু বোঝা যায় না। ফটকে লেখা আছে, 'বিশ্বনাথ যাত্রীনিবাস'। যাত্রীরা যেমন তীর্থদর্শনে আসে যায় থাকে, তেমনি আর কি! অথচ ওরই মধ্যে সব 'কাম ফতে'!

ভদ্রলোক যে দালাল, এক বিশেষ কর্মের, তাঁহার কথা হইতে বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম রাণীদির কথা। এই শ্রেণীর দালালরা অন্যের নামে নানা কুৎসা রটাইয়া নিজের কোলে ঝোল টানিতে চেষ্টা করে জানিতাম। তাই রাণীদির আসল ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য তাঁহাকে বলিলাম, আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কাল বিকেলে আপনার সঙ্গে যাবো, ছ'টার

সময় আমি এখানে হাজির থাকব।

'মক্কেল পাকড়েছি!' মনে করিয়া ভদ্রলোক উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং পকেট হইতে আর একটি সিগারেট বাহির করিয়া আমায় দিয়া বলিলেন, তাহলে এই কথাই পাকা রইল। কাল ঠিক বিকেল ছ'টায় আসব।

এইবার বলিলাম, রাণীদির কাছে তাহলে যাব না, কি বলুন?

খবরদার! অমন কাজ করবেন না। আমার কাছে আপনি 'কেস' দেন বা না-দেন তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু ওঁর খপ্পরে গিয়ে পড়বেন না। শুধু এইটুকু সাবধান করে দিচ্ছি।

আচ্ছা রাণীদির আসল ব্যাপারটা কি বলুন তো? কিছু বোঝা যায় না বাইরে থেকে!

একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, দু'চার দিনে বুঝবেন কি করে ভাই, আমার এই কাশীতেই জন্মকম্ম, এখনও পুরোটা বুঝে উঠতে পারিনি। তবে অদ্ভুত মহিলা! অসাধারণ বুদ্ধিমতী। তাছাড়া যৌবনকালে কি রকম সুন্দরী ছিলেন, এখনকার চেহারা দেখে নিশ্চয় অনুমান করতে পারেন। কাজেই কত বড়লোকের ছেলে, জমিদার, ব্যবসায়ীকে ঘায়েল করেছেন রূপ দেখিয়ে তা কল্পনা করতে পারবেন না। এই কাশী শহরেই ওর পাঁচ-ছ'খানা বাড়ি আছে। সবগুলোই বিরাট। যে বাড়িতে আছেন, দেখেছেন তো, এক-একটা ওব চেয়েও বড়। যে বাড়িটায় এখন রয়েছেন, ওটা ছিল মনসাপোতার রাজকুমারের পৈতৃক সম্পত্তি। রাজকুমার কখনই এখানে আসতেন না. এক-বার এসে হঠাৎ রাণীমাকে ঘাটে নাইতে দেখে নাকি একেবারে ফ্ল্যাট্। বলে যেমন করে হোক ওকে চাই। যত টাকা লাগে।

তারপর বুঝতেই পারছেন ভাই, কেবল রাজরাণী হয়ে বসলেন না উনি, তাঁর ওই বাড়িটা ছাড়া কাশীতে আরও যে দুটো বাড়ি ছিল, একে একে সব গ্রাস করে নিয়ে তাঁকে একদিন আমের আঁঠির মত ছুঁড়ে ফেলে দেন। আরও অনেক কেচ্ছাকাহিনী আছে, শুনলে গা ঘিন্ ঘিন্ করবে!

বলেন কি! কি রকম, তবু শুনি?

একসঙ্গে ঘন ঘন কয়েকটা টান সিগারেটে দিয়া তিনি বলিলেন. আমাদের মত কাজ তিনি করেন না। বলেন, ওতে পাপ হয়। কাজেই তিনি ও থেকে পুণ্য অর্জন করতে চান! বলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

তার মানে? আপনার কথা ঠিক ধরতে পারলুম না তো!

সে অনেক ব্যাপার ভাই। ভদ্রঘরের সব মেয়ে বিধবা কি কুমারী যেমনি হোক, তাদের নিজের বাড়িতে রেখে, আত্মীয় পরিচয় দিয়ে হাসপাতালে নার্সিং হোমে ব্যবস্থা করেন। তারপর সেই সব অবৈধ সন্তানদের নিজের কাছে রেখে মানুষ করে ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে নিঃসন্তান ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনেক টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। এইভাবে ডবল ইনকাম করেন। প্রথম যাঁদের কন্যা কলঙ্কিনী হন তাঁদের কাছ থেকে যতটা পারেন

দুয়ে নেন, তার পর সেই সন্তানগুলোকে নিয়ে ব্যবসা করে এত বিষয়সম্পত্তি করেছেন, বলা যায় না!

রাণীদির সম্বন্ধে আমার মনের ভিতর যে একটা মহিমময়ী মূর্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল, ভদ্রলোকের কথায় নিমেষে তাহা যেন ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মনটা ছি-ছি করিয়া উঠিল। তবু ভদ্রলোককে প্রশ্ন করিলাম, তাহলে এখানকার লোকেরা সবাই তাঁকে এত ভক্তিশ্রদ্ধা করে কেন?

সিগারেটে একটা বড় টান দিয়া বলিলেন, অসাধারণ বুদ্ধিমতী! মানুষের মুখকে কি করে বন্ধ করতে হয় তা ভাল করেই জানেন। দুহাতে তাই টাকা বিলোন, দানধ্যান করেন দেদার। গরীব-দুঃখীর কথা বাদ দেন, অনেক ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচা গোপনে যোগান, বিয়ে-থাতে অর্থসাহায্য করেন। সেদিক থেকে কেউ তাঁর এতটুকু ত্রুটি ধরতে পারবে না। সত্যিকারের রাণীমার ভূমিকায় অভিনয় করে হাততালি পান সর্বত্র। অথচ এর জন্যে বেশ কিছু পুণ্যসঞ্চয়ও তিনি করছেন এই তাঁর বিশ্বাস।

সেদিন রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাইতে পারিলাম না। রাণীদির মত মেয়ের ভিতরটা এমন কদর্য কেমন করিয়া সম্ভব হয়!

মনে পড়ে একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি কখনো জরিপাড় ভাল শাড়ি পরেন, কখনো বা সিল্ক গরদের ও বেনারসী, আবার কখনো গেরুয়া। আমার ঠাকুরমার মুখে শুনেছিলাম, একবার যাঁরা সন্ন্যাস নেন, গেরুয়া পরেন, তাঁদের আর অন্য বস্ত্র পরতে নেই।

রাণীদি মুখ টিপিয়া হাসিলেন, আমি যে সন্ন্যাস নিয়েছি, একথা তোমাকে কে বললে?

কহিলাম, না, তবে বেশী সময় গেরুয়া পরতে দেখি কিনা—তাই জানবার কৌতূহল হয়।

এবার জোর করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আমি যে কি, নিজেই জানি না। তাছাড়া এই অহেতুক কৌতূহল কেন তোমার মনে? কি হবে আমার পরিচয় জেনে? তোমার কি উপকারে আসবে? দুদিন পরেই তো চলে যাবে কোথায়—হয়ত জীবনে আর কখনো দেখাই হবে না। কাজেই যা জানো, অযথা তার চেয়ে বেশী আর জানতে চেয়ো না।

রাণীদির ধারালো রসনা। তাঁহার সহিত কথায় আঁটিয়া ওঠা শক্ত. তাই সেদিন হইতে আর ওঁর সম্বন্ধে কোন কৌতূহল প্রকাশ করি নাই। কিন্তু ভদ্রলোকের ওই কথা শুনিবার পর অত্যন্ত রাগ হইল। মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলাম, ওঁর ভণ্ডামির এবার শেষ করিব। আর চারদিন পরে কাশী ছাড়িয়া যখন চলিয়া যাইব স্থির, তখন যাইবার আগে তাঁর মুখোশটা একেবারে খুলিয়া দিব।

তাই পরের দিন সকালে একটু বেলা হইলে ধাওয়া করিলাম রাণীদির বাড়ি। সেখানে গিয়া দেখি, যথারীতি তালা ঝুলিতেছে।

ব্যাপার কি? নিকটে একটি ছেলেকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খোকা, রাণীদি কোথায় গেছে জানো?

ছেলেটি চট করিয়া বলিল, হাসপাতালে গেছেন।

হাসপাতালে! তাহলে তো ভদ্রলোকের কথাই ঠিক। ওই রকম কোন ব্যাপারে সেখানে গিয়াছেন নিশ্চয়ই!

বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। দুপুরের দিকে আবার আসিব। নিশ্চয় তখন রাণীদির দেখা মিলিবে, খাওয়াদাওয়া করিতে বাড়ি আসিবেন ত।

কিন্তু আশ্চর্য, বেলা তিনটার সময় গিয়া শুনিলাম তখনো রাণীদি ফিরিয়া আসেন নাই। কখন ফিরিবেন। কিংবা আদৌ ফিরিবেন, কিনা, তাহাও কেহ বলিতে পারিল না। একবার ভাবিলাম হাসপাতালে চলিয়া যাই, আবার মনে হইল, মেয়েলী কান্ড, সেখানে যাওয়া ভাল দেখায় না। তার চেয়ে রাত্রে বাড়ি ফিরিবার পথে একবার ঢুঁ মারিয়া যাইব, তখন দেখা নিশ্চয় মিলিবে।

কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। মনটা কেমন যেন বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ঘাটে গিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া শেষে একটা নৌকায় উঠিয়া বসিলাম। থোড়া ঘুমাও, মণিকর্ণিকাসে কেদার তক্।

তখন বিকাল। আরো অনেক নৌকা যাত্রী লইয়া গঙ্গায় দাঁড় বাহিতেছিল। বেশ কিছুক্ষণ গঙ্গার মধ্য দিয়া বাহিয়া আমার নৌকাটি যখন মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছে আসিয়া পড়িল, তখন চমকিয়া উঠিলাম। দেখি রাণীদি একটি চিতার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন, পুরোহিত তাঁকে মন্ত্র পড়াইতেছেন। তাঁহার হাতে একটি জ্বলন্ত নুড়ো, তাহা শবটির মুখে তিনবার ছোঁয়াইয়া তিনি চিতার বুকে ছুঁড়িয়া দিয়া গম্ভীর মুখে অদূরে মন্দিরের একটা ধাপে গিয়া বসিয়া পড়িলেন।

এই মাঝি. বাঁধকে বাঁধকে! বলিয়া আমি নৌকা ঘাটের কাছে আসিবামাত্র, লাফ দিয়া নামিয়া পড়িলাম।

রাণীদি আমায় দেখিতে পান নাই। গালে হাত রাখিয়া একদৃষ্টে চিতার দিকে চাহিয়া ছিলেন। আমি নিঃশব্দে তাঁহার সামনে গিয়া যেই দাঁড়াইলাম তিনি চমকিয়া উঠিলেন। এ কি! তুমি? এখনো তুমি এখানে রয়েছো? যাওনি?

তাঁর কথার জবাব না দিয়া আমি শুধাইলাম. এইমাত্র যাঁর মুখাগ্নি করলেন, তিনি কে? আপনার স্বামী?

আমার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া শুধু নীরবে তিনি তাকাইয়া রহিলেন। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তারপর একবার হঠাৎ তাঁর দেহটা মনে হইল যেন ঝাঁকানি দিয়া থামিয়া গেল। এবার মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, এই মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চিতাকে সামনে রেখে মিথ্যে বলবো না। উনি আমার স্বামী নন।

তাহলে কে? কৌতূহল চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়।

॥ উনিশ ॥

শ্মশানে ওই সময় আমার মুখ হইতে আচমকা রাণীদি সেই প্রশ্ন শুনিয়া প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেলেও মুহূর্তে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া শুধু একবার বলিলেন, এখন এখান থেকে চলে যাও, পরে বলব!

যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে এই কথাটা বলিলেন বটে কিন্তু আমার কানে যেন একটু বেসুরো ঠেকিল। মনে হইল এই ভাবে হাতে-নাতে আমার কাছে ধরা পড়িয়া যাওয়াতে আমার প্রতি বোধহয় বিরক্ত হইয়াছেন।

কিন্তু আমার অপরাধ কি! হিন্দুশাস্ত্র মতে সন্তানহীনা নারীই স্বামীর মুখাগ্নির অধিকারিণী জানিতাম। তাছাড়া একদিন তিনি নিজ মুখে বলিয়াছিলেন, আত্মীয়স্বজন বলিতে তাঁর কোথাও তিনকুলে কেহ নাই। একমাত্র বাবা বিশ্বনাথই তাঁর সব! তাঁর ইহকাল পরকাল! বলিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়াছিলেন।

যাহোক মুখে আর একটি কথাও না বলিয়া তৎক্ষণাৎ নৌকায় গিয়া উঠিলাম এবং মাঝিকে গোড়েন ঘাটে একটু তাড়াতাড়ি যাইতে আদেশ করিলাম। ছ'টার সময় কালকের সেই লোকটির সেখানে অপেক্ষা করিবার কথা। কতক্ষণে রাণীদির এই ব্যাপরাটা তার কাছে জানিতে পারিব, যেন মন আর ধৈর্য মানিতে ছিল না। বারে বারে তাই ঘড়ি দেখিতেছিলাম। কিন্তু ঘাটের কাছে আসিয়া লোকটিকে দেখিবামাত্র মনে হইল রাণীদির কথা তাঁকে না-বলাই ভালো। তাঁর সঙ্গে আমার এখনও যে সম্পর্ক আছে জানিতে পারিলে হয়ত সব চাপিয়া যাইবে। তার চেয়ে গোপনে তার পেট হইতে যদি আরো বাহির করিতে পারি, সেটা চেষ্টা করিব। রাণীদি যখন শ্মশানে কথা দিয়াছেন তখন সে সত্য নিশ্চয় রক্ষা করিবেন অন্তত এটুকু বিশ্বাস তাঁর উপর ছিল!

মাঝিকে ভাড়া চুকাইয়া দিয়া ঘাটে উঠিতেই তিনি একগাল হাসিয়া হাতের ঘড়িটা দেখাইয়া বলিলেন, একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ছ'টা। এর জন্য কলকাতার লোককে এত ভালোবাসি, তুলনা হয় না ভাই ওদের! বিদ্যায় বুদ্ধিতে আচার আচরণে, যেদিকে যাবে সারা ভারতে এর জুড়ি মিলবে না—বলিয়া একটা সিগারেট আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, কি, একটু বুঝি গঙ্গায় হাওয়া খেয়ে এলেন? বেশ করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি কাশীর যদি প্রকৃত রূপ কিছু থাকে, ত এই গঙ্গার ঘাটগুলো! এত অগণিত সিঁড়ি, ওপরের ডাঙায় চোরা মন্দির, বড় বড় ঝুরিনামা অশ্বত্থ বটের গাছ, গঙ্গার তীর বরাবর এই সব বড় বড় অট্টালিকা—সত্যি কথা বলতে কি এর তুলনা হয় না। পৃথিবীর আর কোথাও এ জিনিস নেই, পাবেন না। বিলেত আমেরিকা শুধু নয়, পৃথিবীর নানাদেশ থেকে মানুষ দলে দলে তাই আসে।

আর বড় বড় বজরা ভাড়া করে চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে সকাল, সন্ধ্যে, দুপুর সবসময় গঙ্গায় ঘুরে বেড়ায়। নিশ্চয় দেখেছেন, এতদিন যখন রয়েছেন এখানে।

বলিলাম, হ্যাঁ। আমার সবচেয়ে ভাল লাগে সন্ধ্যে বেলাটা। যখন ঘাটে ঘাটে বাড়িতে বাড়িতে আলো ঝলমলিয়ে ওঠে, মন্দিরে শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি শুরু হয়। অন্ধকারে গঙ্গার বুক থেকে এ দৃশ্যের তুলনা হয় না। আজ ছ'টায় আপনাকে কথা দিয়েছি। তাই এখনি নৌকা ছেড়ে দিলুম।

বেশ করেছেন! লোকটি সিগারেটটা চট করিয়া মুখ হইতে টানিয়া লইয়া কহিলেন, আজকের এই কাজটার জন্যেই ত আপনার এখানে আসা। এটাই সবচেয়ে ইমপরট্যাণ্ট, আপনার কাছে যেমন, আমারও তেমনি। তাহলে চলুন, আর দেরী নয়, শুভস্য শীঘ্রম্। কি বলেন?

বলিলাম, আর একটু এখানে বসে, তারপর যাওয়া যাবে কেমন?

আমার মুখের কথাটা লুফিয়া লইয়া লোকটি বলিলেন, হাঁ হাঁ, সেই ভাল। একটু অন্ধকার হলে বরং, কি দরকার যদি কেউ দেখে ফেলে আপনাকে। তবে আপনি যে ভয় করছেন, আমাদের বিশ্বনাথ সেবাশ্রম দেখলে, ধারণা করতে পারবেন না যে এর ভেতর এতবড় সেবাব্রত চলছে! বলিয়া হাসিতে গিয়া সিগারেটের ধোঁয়া গলায় আটকাইয়া কাশিতে লাগিলেন।

একটু পরে লোকটির সঙ্গে গলির ভিতর দিয়া গলি, আবার গলি, এমনি করিয়া বেশ কিছুক্ষণ ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে বিশ্বনাথ সেবাশ্রমের ভিতর আসিয়া ঢুকিলাম। উঁচু, পাঁচিল ঘেরা এক দুর্গের মত বাড়ি। যেমন লোকটি বলিয়াছিলেন, হুবহু মিলিয়া গেল।

বাহিরে আসিয়া ফিরিবার পথে লোকটিকে চুপি চুপি বলিলাম, আচ্ছা রাণীদির ওই সব ব্যাপারস্যাপারগুলো, যা বলছিলেন, কোনদিকে?

এই কাছেই। দেখবেন? চলুন। ওইদিক দিয়েই তো আমাদের যেতে হবে।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গলির পথ যেমন সংকীর্ণ তেমনি আলোর অভাব। কিছুদূর যাইবার পর হঠাৎ একটি বড় মন্দিরের সামনে আসিয়া লোকটি বলিলেন, আসুন এর ভেতরে। এটাই রাণীমার একটা আড্ডা।

আড্ডা? এ তো একটা মন্দির।

হাঁ! ফটকের ডানপাশে 'রাধাগোবিন্দর মন্দির' একটা ছোট পাথরে লেখা রয়েছে দেখলেন না?

ভিতরে ঢুকিতেই দেখিলাম। রাধাগোবিন্দের যুগল মূর্তি ফুল দিয়া সাজান। ধূপ দীপ জ্বলিতেছে, বিগ্রহের সামনে বসিয়া পুরোহিত মহাশয় আরতির প্রদীপ একটি একটি করিয়া জ্বালাইতেছেন। একটু পরে শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পুরোহিত মহাশয় বাঁ হাতে ঘণ্টা নাড়িতে নাড়িতে দাঁড়াইয়া

সেই পঞ্চপ্রদীপের ঝাড়টি লইয়া দক্ষিণ হস্তে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আরতি শুরু করিলেন।

দেখিতে দেখিতে অনেকগুলি ছেলেমেয়ে ও মহিলা আসিয়া মন্দিরের ভিতরে ও সামনে চত্বরে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল।

আরতি শেষ হইলে মহিলাদের সঙ্গে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলিও একসঙ্গে বসিয়া সুর করিয়া স্তব পাঠ করিতে লাগিল। তারপর স্তব শেষ হইলে পুরোহিত মহাশয় শীতলের প্রসাদ সকলের হাতে একটু একটু দিতে মন্দির নিমেষে ফাঁকা হইয়া গেল। পুরোহিত মশাই আমাদের হাতেও একটু প্রসাদ দিয়া গেলেন। রাস্তায় আসিয়া দালালটিকে নীচু গলায় প্রশ্ন করিলাম. সব মেয়েদেরই ত দেখলাম বেশ ভদ্রঘরের চেহারা।

হাঁ, কাল যা আপনাকে বলেছিলুম, হাতে হাতে তা মিলিয়ে পাচ্ছেন তো! আমার কাছে বাজে কথা পাবেন না ভাই। বলেছিলাম না অসাধারণ বুদ্ধিমতী, কারো বাপের সাধ্যি নেই, যে ধরতে পারে ওই সব মেয়েরা লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা. কলঙ্কিনী আর অন্যের সব অবৈধসন্তান এদের কাছে মানুষ হচ্ছে, ঠিক নিজের ছেলেমেয়ের মত। যেন এক-একটি ঘরে ভাড়া করে ওরা এক-একটি ছোট পরিবার বাস করছে। অথচ ওদের খাওয়া-পরা থেকে ডাক্তার ওষুধ পথ্য খুঁটিনাটি যা কিছু দরকার সব খরচ দেন ওই রাণীমা। একটা বিরাট যৌথ পরিবারের মত ওই মেয়েদের মধ্যেই সব কাজকর্ম ভাগ করে দিয়েছেন তিনি। মার মন্দিরের দৈনিক দেবসেবাটি পর্যন্ত! অসাধারণ পলিসীবাজ! যাতে কাশীর মত মহাতীর্থে মেয়েরা ঠাকুরের সেবা করে পুণ্য অর্জন করছে ভেবে খুশি থাকে। ওদিকে রাণীমার ধারণা এইভাবে তিনিও বিরাট পুণ্য অর্জন করছেন।

চলিতে চলিতে একটা পানের দোকানের কাছে থামিয়া দুইটি পান কিনিয়া একসঙ্গে গালে পুরিয়া, পকেট হইতে জরদার কৌটা বাহির করিয়া এক চিমটি মুখে ফেলিয়া, চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, এই একটা নেশা না হলে মন খুলে কথা কইতে পারি না।

বলিয়াই আবার শুরু করিলেন এমন সব কথা, যাতে রাণীদির বিরুদ্ধে আমার মন বিষাক্ত হইয়া ওঠে।

পানের পিচ ফেলিয়া, একটু নীচু সুরে বলিলেন, এটা কাশী মহাতীর্থ। তেত্রিশ কোটি দেবতার বাস এখানে। তাই একদিকে যত পুণ্য তেমনি অন্য দিকে তত অনাচার! কথায় যে বলে, পিদীমের ওপরে যত আলো নীচে তত অন্ধকার সেটা এখানে সব চেয়ে বেশী সত্য।

জানেন একবার সুনীতি চাটুজ্যে মশাই এসেছিলেন আমাদের লাইব্রেরীতে বক্তৃতা দিতে। তিনি যা বললেন শুনে তাজ্জব বনে গেলুম।

আমি তাঁর মুখে চোখে বিস্ময় দেখিয়া প্রশ্ন করিলাম, কি বললেন?

তিনি বললেন, এই কাশীধাম নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো শহর।

বেদ, পুরাণে যেমন কাশীর উল্লেখ আছে তার পূর্বেও নাকি পৃথিবীর কোন কোন প্রাচীন ইতিহাসে এর নাম পাওয়া যায়। পৃথিবীতে হয়ত এর চেয়ে পুরানো শহর আছে, কিন্তু সেসব স্থানে এক একবার এক একটা সভ্যতার উত্থান হয়েছে, আবার ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু একটানা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে মানুষ আর কোথাও বসবাস করে নি, যেমন এই কাশীধাম। এটা বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো 'লিভিং সিটি।'

কাজেই সবচেয়ে দীর্ঘদিন ধরে পুণ্যি জমতে জমতে যেমন পাহাড় প্রমাণ উঁচু হয়ে উঠেছে, তেমনি নামতে নামতে অনাচারও একেবারে পাতালে পৌঁচেছে! বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিয়া উঠিলেন। আমি তখন ভাবিতেছিলাম, অন্যকথা। রাণীদিকে এতদিন ভক্তিশ্রদ্ধা করিতাম ঠিকই কিন্তু এইমাত্র চোখে যা দেখিলাম, তাহা কল্পনাতীত। আমার মাথা যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরণে লুটাইয়া পড়িল। বাস্তবিক দেবী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইসব বিপথগামিনী মেয়েদের দেহ হইতে কলঙ্কের কালি মুছিয়া দেন নাই, তাদের নারীত্বের মর্যাদায় পুর্ণপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য শুদ্ধ পবিত্র জীবন-যাপনের সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন: অপূর্ব, অত্যাশ্চর্য, এ পরিকল্পনা। জনসেবা ও জনকল্যাণের এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে।

ছি ছি, তাঁর সম্বন্ধে মনে যে কুৎসিত ধারণা ওই লোকটির কথায় জন্মাইয়াছিল, তার জন্য নিজের কাছে নিজে যেন ছোট হইয়া গেলাম। ওই মূর্খ লোকটির কান মলিয়া দিয়া রাণীদি যে কত বৃহৎ ও মহৎ কাজ করিতেছেন তখনি তাহাকে বুঝাইয়া দিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু তার মুখের দিকে চাহিয়া সে বাসনা তিরোহিত হইল। গলি ছাড়িয়া বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িতে তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন, তারপর হাসিহাসি মুখে শুধাইলেন, তাহলে ভাই কাল সকালে আপনি আসছেন তো আপনার 'কেস'টা নিয়ে, আমি আজ রাত্রেই এদিকের সব ব্যবস্থা ঠিক ঠাক করে রাখবো?

একটু থামিয়া বলিলাম, না।

নিমেষে তাঁর চোখে মুখে আশাভঙ্গের যে করুণ ভাবটি ফুটিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া মায়া হইল। তাই সান্ত্বনার সুরে বলিলাম, সব দেখে গেলাম। এ সব ব্যাপারে আপনার ব্যবস্থার তুলনা হয় না। তবে আমার 'কেস'টা অন্য, আপনার এখানে চলবে না। কিছু মনে করবেন না, আপনাকে মিছিমিছি এত কষ্ট দিলুম।

কষ্ট কি! এই তো আমার কাজ! আচ্ছা নমস্কার! বলিয়া কপাল হইতে হাত নামাইয়া বলিলেন, তবে একটা উপকার আপনার করেছি ভাই স্বীকার করতেই হবে, আপনি এরপর রাণীদির পাল্লায় আর পড়বেন না, ঠিক কি না?

বলিয়া সবজান্তার হাসি হাসিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু কেমন যেন করুণ শুনাইল।

॥ কুড়ি ॥

পরদিন রাণীদির বাড়ি গিয়া দেখি, তিনি হবিষ্যির যোগাড়ে ব্যস্ত। পরনে লাল চওড়াপাড় কোরা মিলের শাড়ী, কপালে বড় একটা সিঁদুরটিপ, পায়ের আঙুলের ডগাগুলিতে কেবল আলতা ছোঁয়ানো, বোধ হয় মাথা ঘষিয়াছিলেন, তাই রেশমের মত ঘন কালো চুল সারাপিঠ ছাপাইয়া কোমরের নীচে পর্যন্ত ঝুলিতেছিল। ঘরের মেঝেয় বসিয়া তিনি আতপ চাল বাছিতেছিলেন। পাশেই এক টুকরা আঙট্ কলাপাতায় এক ডেলা সন্ধব লবণ, একটা কাঁচকলা, একটু ডাল বাটা। ছোট্ একটা মাটির ভাঁড়ে গব্যঘৃত। সদ্য মাজা চকচকে পেতলের ছোট একটা বোগনো হাঁড়ি একটু তফাতে দেয়ালের দিকে উপুড় করা রহিয়াছে।

তাঁর দেহে শাড়ী ছাড়া আর কোন অঙ্গাবরণ ছিল না বলিয়া আমাকে হঠাৎ দেখিতে পাইয়া, পিঠের দিক হইতে আঁচলটা টানিয়া বুকের সামনেটা ঢাকিতে ঢাকিতে বলিলেন, কি ব্যাপার, এই সাত সকালে যে। রাত্রে বোধহয় ঘুমোতে পারো নি কৌতূহলে? বলিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন। বলিলাম, রাখুন তো ওসব! আগে পা দুটো একটু বাড়িয়ে দিন প্রণাম করি, তারপর অন্য কথা!

তাঁর মুখে-চোখে কোথাও দুঃখের চিহ্ন নাই। কণ্ঠস্বর তেমনি পরিষ্কার। বরং সর্বাঙ্গে কেমন যেন একটা শুচিশুভ্র ও দীপ্তিময়ী ভাব।

ওমা, সে কি! সহাস্য মুখে বলিয়া উঠিলেন। হঠাৎ রাণীদির ওপর এত ভক্তি উথলে উঠল যে! জানো তো অতি ভক্তিকে শাস্ত্রে কিসের লক্ষণ বলে?

বলিলাম, জানি। কিন্তু আপনি যে এত সাংঘাতিক তা জানতুম না! সত্যি, ইচ্ছে করলে আপনি মানুষ খুন করতে পারেন!

চালবাছা বন্ধ রাখিয়া আমার মুখের ওপর এক ঝলক হাসি ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, তাহলে এত দিন পরে সত্যি সত্যি রাণীদিকে চিনতে পেরেছ!

, না না, ঠাট্টা নয়। ভাগ্যিস আগে চলে যাই নি! তাহলে আপনার সব কিছুই অজ্ঞাত রয়ে যেত। কিছুই জানতে পারতুম না।

তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হত না! আমি তো একটা সামান্য মেয়ে মাত্র।

প্রণাম করিতে করিতে বলিলাম, সামান্য নয়, আজ আমার চোখে আপনি অসামান্য। সামান্য হলে, এমনি করে সাত সকালে ছুটে আসতাম না। কারণ অপনি যে কত বড়, কাল জানতে পেরেছি।

রাণীদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, জানি কাল মন্দির দেখতে গিয়েছিলে, কিন্তু যার সঙ্গে গিয়েছিলে সে তোমায় কি বলেছে আর তুমি কি জেনেছ জানি না। তবে সব জানলে রাণীদির আর মুখদর্শন করতে ইচ্ছা করবে না!

বলিয়া এবার হাসি আর চাপিতে পারিলেন না॥

কহিলাম, যা চোখে দেখেছি, যা শুনেছি তারপর আর কিছু জানতে চাই না। সত্যি আপনাকে যত দেখছি তত যেন বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছে! এতবড় একটা বিরাট নারী কল্যাণব্রত যে গ্রহণ করেছেন, তা একদিনও তো ঘুণাক্ষরে আপনার মুখে শুনিনি।

এসব কি ঢাক পিটিয়ে বলার কথা ভাই! সবই তো বাবা বিশ্বনাথের কৃপা। তিনি যা দিয়েছেন তাই দিয়ে তাঁরই পুজো করছি। তাঁরই সন্তানদের সেবা তিনিই করিয়ে নিচ্ছেন তাদের দিয়ে! আমি কিছু নই।

বলিলাম, সত্যি আপনার এ পরিকল্পনা অদ্ভুত। তুলনা হয় না। এর জন্যে সমস্ত নারীসমাজ এক দিন আপনার জয়গান করবে নিশ্চয় জানবেন।

দুই হাতে কান চাপিয়া রাণীদি বলিলেন, আঃ! আপাতত তুমি বন্ধ কর তো জয়গান। আত্মপ্রশংসা শোনা পাপ! তুমি কি শেষ কালে আমায় অরো পাপে ডোবাতে চাও নাকি! এই বলিয়া হঠাৎ কথার মোড়টা এবার অন্যদিকে ঘুরাইয়া দিলেন। চাল বাছা হইয়া গিয়াছিল। উঠিয়া গিয়া সেই পিতলের উবুড় করা হাঁড়িটা তুলিয়া তার মধ্যে রাখিয়া দিয়া তিনি আবার সেখানে আসিয়া বসিলেন। তারপর এমনি ভাবে শুরু করিলেন, রাণীদি সম্বন্ধে যখন এতটা কথা জেনেছ, তখন তার শেষটুকুই বা বাকী থাকে কেন? তাছাড়া শ্মশানে বসে যখন সত্য করেছি বলব বলে, তখন তোমাকে সেকথা বলতে সঙ্কোচ মনে এলেও কিছু গোপন করব না। শোনো, হঠাৎ কয়েক দিন আগে হাসপাতাল থেকে একজন বেয়ারা এসে একটা চিঠি আমার হাতে দিলে। পড়ে দেখি এক ডাক্তারবাবু এখনি তাঁর সঙ্গে হাসপাতালে একবার দেখা করতে বলেছেন। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন। এ ডাক্তারবাবুর নামটা শোনা ছিল কিন্তু কোনদিন দেখিনি। যাহোক হাসপাতালে হাজির হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে তিনি বললেন, একজন 'পেসেন্ট', অবস্থা তার খুবই খারাপ, আপনাকে একবার দেখতে চান, তাই আপনাকে খবর দিয়েছিলুম। বলেই একটি বেয়ারাকে ডেকে তখনি আমায় তিনতলার সতেরো নম্বর 'বেড্' এ পৌঁছে দিতে বললেন।

কি ব্যাপার! কে এমন মরণাপন্ন রুগী আমাকে দেখতে চায়? ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই ঘরে ঢুকলুম! দেখি রুগীর গালভরা দাড়ি, চোখ দুটো কোটরগত, শীর্ণ চেহারা, একটা চাদর গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা। লোহার খাটে শুয়ে আছে।

কিন্তু কে সে ব্যক্তি, তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও চিনতে পারলুম না! অথচ রুগীটি তার জ্বলজ্বলে দুটো চোখ আমার মুখের ওপর রেখে এমনভাবে দেখছিল যেন এখনি গ্রাস করে ফেলবে। বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। এমন সময় ধরা-ধরা গলায় রুগী বলে উঠলো, আমার কাছে সরে এসো, তোমাকে একটা কথা বলবো বলে ডেকে পাঠিয়েছি। আমার এ শেষ অনুরোধ তোমায় রাখতেই হবে। বলো কথা দাও!

আমি যখন মনে ভাবছি, তুমি বলে কে রে বাবা, শেষ অনুরোধ বা আমায় করে কেন? তখন সে ধীর কণ্ঠে বললে, জানি তুমি আমাকে চিনতে পারোনি। অবশ্য না পেরে ঠিকই করেছো। তোমার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা একদিন করেছিলুম, তার ক্ষমা নেই। তারপর আমার মত এই শয়তানের নাম মন থেকে মুছে ফেলাই উচিত! বলতে বলতে তার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

আমি বললাম, কিন্তু আপনার এসব কথার অর্থ কিছুই তো আমি বুঝতে পারছি না। প্রথমত কে আপনি, আগে সেটা জানা দরকার। তাছাড়া আমার ঠিকানাই বা কে দিলে আপনাকে?

তখন ধীরে ধীরে রুগী বললে, আমি যে ব্যাঙ্কে কাজ করতুম, সেখানে তোমার একাউণ্ট ছিল। তুমি আসতে যেতে! অফিসের ভেতর থেকে কতদিন তোমায় দেখেছি, কাউণ্টারে। আমাকে চিনতে পারার আগে তোমার কাছে মিনতি করছি শুধু! তুমি কথা দাও, আমার এ শেষ অনুরোধ রক্ষা করবে।

তা কেমন করে সম্ভব। যাকে জানি না চিনি না!

মৃত্যু যার শিয়রে, সেই মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ অনুরোধ রক্ষা করাটাই তো মানুষের ধর্ম। এমন কি যে ফাঁসীর আসামী, তার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতে দ্বিধা করে না আইন। তাই দুহাত জোড় করে তোমায় মিনতি করছি। শুধু একবার মুখে বলো, আমার শেষ ইচ্ছা তুমি পূর্ণ করবে।

আমাকে তখনো চুপ করে থাকতে দেখে সে আস্তে শুধু বললে, সত্যি আমায় চিনতে পারোনি? আমি শঙ্কর।

এবার রাণীদি একটু থেমে আমার মুখের ওপর চোখ রেখে বললেন, সত্যি চিনতে পারিনি ভাই। বিশ্বাস করো।

সেই সুদর্শন পুরুষের এ কি পরিণতি হয়েছে! যেন কল্পনা করা যায় না!

তবু রাগে তখন আমার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলছিল। নাম শোনা মাত্র কে যেন আমার পিঠে সজোরে চাবুক কষিয়ে দিলে! যন্ত্রণায় আমার সারাদেহ জ্বলে উঠলো। শুধু মৃত্যুপথযাত্রী বলে মনে মনে ক্ষমা করে বললুম, ও. তুমি সেই শঙ্কর! বলো কি বলতে চাও? আমার অনেক কাজ আছে, এখনি যেতে হবে।

শঙ্করের গলাটা এবার কেঁপে উঠলো। খপ করে আমার হাত দুটো ধরে বললে, একদিন আমার এ দেহে তুমিই প্রথম প্রেমের আগুন জেলেছিলে, তাই তোমার হাতের আগুন পেয়ে যেন সেই দেহ পুড়ে ছাই হয়ে গঙ্গার জলে মিশে যায়। এই আমার শেষ মিনতি তোমার কাছে। বলো তুমি রাখবে? কথা দাও?

বললুম, কিন্তু তোমার ছেলেমেয়ে কোথায়? এ কাজ তাদের কর্তব্য। আমার কাজ তো নয়। ,

তারা যদি না থাকে? বলতে বলতে তার দু'চোখে জল ভরে এলো।

তারপর সামলে নিয়ে বললে, সব ছিল কিন্তু নিজের দোষে সব হারিয়েছি। মিথ্যে বলবো না, তাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে।

বললুম, তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাকে ত্যাগ করে তো জয়ন্তীকে বিয়ে করেছিলে। তার তো ছেলেপুলে হয়েছিল শুনেছি!

হ্যাঁ ঠিকই, তবে তারপরে আরও আছে যা শোনোনি।

কি বলছো আবোল-তাবোল, তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না!

শঙ্কর বললে, জয়ন্তীকে ডিভোর্স করে কমলাকে বিয়ে করেছিলুম—তারপর তাকে ছেড়ে দিল্লীতে যখন চাকরি করি অফিসের সহকর্মিণী এক পাঞ্জাবী মেয়েকে বিয়ে করি। আমার টি. বি. রোগ যেদিন ধরা পড়ল, সেই দিনই আমায় ছেড়ে সে পালালো পাঞ্জাবে। আজ আমার আপন বলতে কেউ কোথাও নেই। তুমি বিশ্বাস করবে না একদিন আমি ভালবেসেছিলুম ওদের সকলকেই। ঠিক তোমায় যেমন বেসেছিলুম।

ভালবাসার কথা ও মুখ দিয়ে আর উচ্চারণও করো না। ছি, ছি, তুমি মানুষ না পশু? কতগুলো মেয়ের সর্বনাশ করলে বল তো? বলে আমি রাগ করে যখন দরজা পর্যন্ত চলে এসেছি। পিছন থেকে আবার সে ডাকল, শোনো!

তারপর চোখের জল মুছে বলল, কিন্তু একদিন তুমিও তো বলেছিলে আমাকে ছাড়া আর কাউকে জীবনে ভালবাসতে পারবে না। তার আগে গঙ্গায় গিয়ে ডুবে মরবে। মনে আছে? কিন্তু এখানে তো গঙ্গায় জলের অভাব নেই। তারপর তুমি কি আর কাউকে ভালবাসনি? বলো, চুপ করে থেকো না। তাহলে আমি যে দোষে দোষী, তুমিও কি সেই একই অপরাধে অপরাধিনী নও! বলো, জবাব দাও। নইলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না।

শঙ্করের চোখ দিয়ে এবার বেশ কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

রাণীদি এই পর্যন্ত আসিয়া এমন ভাবে চুপ করিয়া গেলেন, যেন তাঁর আর কিছু বলিবার নাই। কিন্তু আমার মনে হইল নাটক সবচেয়ে যখন জমিয়া উঠিয়াছে, 'ক্লাইম্যাক্স'-এর মাথায় তিনি সহসা পর্দা ফেলিয়া দিলেন। তাই কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলাম। তারপর কি হলো? কি জবাব দিলেন আপনি?

রাণীদির চাল বাছা শেষ হইয়াছিল। মুঠি করিয়া ঘরের মেঝে হইতে চাল লইয়া সেই মাজা বোগ্‌নোটার ভেতর রাখিতেছিলেন। মুখটা ফিরাইয়া আমার চোখের দিকে তাকাইয়া শুধু বলিলেন, জবাব? কোন সত্যের জোরে দেবো? সে অধিকার আমারও নেই ভাই। নইলে শ্মশানে কাল আমাকে ওই ভাবে দেখতে পেতে? তুমি তো সবই শুনলে, তবে ওকথা আবার তুলছো কেন? একটু থামিয়া আবার বলিলেন, আশা করি রাণীদির সম্বন্ধে মনের ভেতরে যে কৌতূহল এতদিন চাপা ছিল, এখন তার নিরসন হয়েছে?

ছিঃ, ওকথা বলে আমায় অপরাধী করবেন না! জানেন তো এই মায়ের

জাতকে আমি মনে মনে কত ভক্তি, শ্রদ্ধা করি। তাই যিনি এই পথভ্রষ্টা মায়েদের সব কলঙ্ক মুছিয়ে, তাদের আবার নারীত্বের মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্রত নিয়েছেন, তিনি আমার চোখে সকল দোষগুণের ঊর্ধ্বে—দেবীর সমান, আগেই তো বলেছি।

মনে হইল রাণীদির চোখ দুটি যেন সহসা প্রসন্ন হয়ে উঠিল। এবার আমি খুব সঙ্কোচের সহিত তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা রাণীদি, বিশেষ একটা দৃষ্টান্ত ধরে, সকলকে বিচার করা কি ভুল নয়? সব মানুষের মন তো সমান হতে পারে না।

রাণীদি একটু হাসিয়া বলিলেন, এসব কথা মনস্তত্ত্ববিদরা বলতে পারেন ভাই. আমার বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় তো ওই ঘাটের সিঁড়ি পর্যন্ত। তোমায় আগেই বলেছি। তবে আমার মনে হয়, মানুষকে বাইরে থেকে দেখতে যতই ভিন্ন মনে হোক, আসলে মনোবৃত্তিগুলো কিন্তু সবার এক। সেখানে কোন পার্থক্য নেই। বিশেষ করে এই আদিম রিপুর! এর স্বভাবধর্ম বোধ হয়. মক্ষিকা-বৃত্তি বা বহুভোগেচ্ছা! তাই বিবাহে এত সব কঠোর অনুশাসন। এত ধর্ম-সাক্ষী করে, অগ্নি ও শালগ্রামশিলাকে ছুঁয়ে বেদ উপনিষদের মন্ত্র পড়ে শুধু দুটি মনকে এক ঠাঁই বেঁধে রাখার জন্যে এই সাত-পাকে বাঁধার এত কঠিন বাঁধন। বলিতে বলিতে হাসিয়া ফেলিলেন! তবু তো দেখছ, সুযোগ-সুবিধে পেলেই ফুট করে সে বাঁধন ছিঁড়ে যায়:

তাই নিজের মনকে যাচাই করার শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর হচ্ছে, পুরুষের পক্ষে স্ত্রী ছাড়া অপর স্ত্রীলোকের সংসর্গ। তেমনি মেয়েদেরও স্বামী ব্যতীত অপর কোন পুরুষের সঙ্গলাভ। সোনা যাচাই করে যেমন কষ্টিপাথরে ঘষে, আমার মনে হয় তোমাদের এই প্রেম ও ভালবাসা যাচাইয়ের ওই একমাত্র কষ্টি-পাথর!

, বলিলাম. তাহলে এত লোক যারা বিয়ে-থা করে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার করছে, তাদের ভেতরে কি ভাব-ভালবাসা নেই বলতে চান?

রাণীদি বললেন, আঃ, তুমি সব গুলিয়ে ফেলছো! আমি বলছি ওই বিশেষ প্রবৃত্তিটার কথা, যা স্ত্রী-পুরুষ সকলের রক্তে গোপন থাকে, সুযোগ-সুবিধা পেলেই অর্থাৎ পরপুরুষ বা পরস্ত্রীর সংস্পর্শে এসে তবে জাগ্রত হয়। তখন মানুষ নিজের মনটাকে চিনতে পারে!

তাই সেদিন বলছিলুম বিয়ে না করলে, একচক্ষু হরিণের মত মেয়েদের ওই একটা রূপেই দেখবে, তাদের সম্পূর্ণ পরিচয় কখনো পাবে না। দুনিয়াটা কি, তার কোথায় কত গভীর প্রেম, ভালবাসা এসব তখন নিজের মন দিয়ে যাচাই করতে পারবে। কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন! জানি এখন আমার কথায় মনে মনে হাসছো, কিন্তু একদিন এই গরীবের কথা বাসী হলে আমায় মনে পড়বে, ঠিক জেনো। বলিয়া হেসে গড়াইয়া পড়িলেন। যেন জীবনটা তাঁর কাছে একটা খেলার বস্তু।

কাশীতে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর বাস শুনিয়াছিলাম। কিন্তু চোখে-দেখি নাই। তাই কাশী হইতে বিদায় লইবার দিন, গাড়ি ছাড়িয়া দিলে কেবল একটি প্রশ্নই আমার মনে বার বার জাগিতে লাগিল, রাণীদির নাম যদি তেত্রিশ কোটির সঙ্গে জুড়িয়া দিই, তাহলে কি আমার পাপ হইবে?

॥ একুশ ॥

'বাবুজী, আপ্‌কো ধরম্‌শালা তো আগেয়ি?'

এক্কাওলার কণ্ঠস্বরে চমকিয়া উঠিতে, চিন্তার জাল ছিন্ন করিয়া মনটা যেন এক লাফে কাশী হইতে একেবারে হরিদ্বারে আসিয়া পড়িল। চাহিয়া দেখি, সত্যই তো এক্কাগাড়িটা ধর্মশালার ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া আছে।

সেই কন্‌খল হইতে এতক্ষণ যে এতটা পথ চলিয়া আসিয়াছি, কোন হুঁশই ছিল না! শ্যাম মহারাজ এইমাত্র আমায় জ্ঞান দিবার জন্য জীবন সম্বন্ধে যে সব গভীর তত্ত্বকথা বলিলেন, কি জানি কেন তার মধ্যে অনেক আগে শোনা রাণীদির কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনতে পাইয়া মনটায় হঠাৎ এমন ধাক্কা লাগিল যে পিছন দিকে ছুটিতে ছুটিতে কখন রাণীদির কাছে গিয়া হাজির হইয়াছিল জানিতে পারি নাই।

একদিন রাণীদির মুখের যে কথাগুলিকে ছোট মুখে বড় কথা ভাবিয়া একেবারে মনের কোণে ঠাঁই দিই নাই, মেয়েপণ্ডিতী ভাবিয়া বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সত্যি কথা বলতে কি শ্যাম মহারাজের মত জটাজুটধারী প্রবীণ সান্ন্যাসীর কথায় তাহার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

রাণীদি একজন সামান্য মহিলা, বোধ হয় মোহন্ত মহারাজের কন্যার বয়সী, বিদ্যার দৌড় যাঁর নিজের ভাষায় ঘেটো ইউনিভারসিটী, প্রায়ই রহস্য করিয়া বলিতেন, অর্থাৎ ওই কাশীর ঘাট পর্যন্ত, তার তুলনায় শ্যাম মহারাজ কেবল একটি মঠের মোহন্ত নন, বহু শাস্ত্রজ্ঞ, বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতি সব কিছুতেই অগ্রণী, প্রজ্ঞালব্ধ বহুদর্শী সান্ন্যাসী, তাই উভয়ের কথায় এত মিল কোথা হইতে আসিল, ভাবিতে গিয়া কেমন যেন সব জট পাকাইয়া যায়। একজন নারী, অপরজন পুরুষ। দৈহিক গঠন হইতে চিন্তাভাবনা ও কর্মক্ষেত্র যেখানে উভয়ের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী, সেখানে কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল? মনে হয় যেন দুই রকমের দুইটি বাদ্যযন্ত্রকে কেহ একেবারে বাঁধিয়া দিয়াছে। তবে কি নদীর দুই ধারা যেমন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইলেও একদিন সাগর-সঙ্গমে মিলিত হইয়া একই মহাসমুদ্রের সামিল হয়, তেমনি নর নারীর দুই পৃথক সত্তা যাহা অর্ধেক মানব ও অর্ধেক মানবী বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত, সেই দুইয়ের মিলনে পূর্ণ মনুষ্যত্বের অভিজ্ঞতা লাভে ধন্য। উভয়ে একই প্রবৃত্তির

সমান অংশীদার? একই সুধাপানে সার্থক জীবন? তাই কি একই কথার, একই সুরের প্রতিধ্বনি উভয়ের কণ্ঠে?

মনের মধ্যে সংশয়ের তুফান আরো উত্তাল হইয়া উঠে। নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হয়। দিগভ্রষ্ট নাবিকের মত পথের দিশা খুঁজিয়া পাই না। যদি রাণীদি ও মহারাজের কথা বাস্তবেরই রূপ হয় তাহা হইলে এতদিন ধরিয়া কি ভুল আদর্শকে আঁকড়াইয়া আছি? ভাবিতে ভাবিতে সারা পথ যে কোথা দিয়া চলিয়া গিয়াছে তা খেয়াল ছিল না। 'বাবুজী, ধরমশালা আ গিয়া' শুনিয়া চমকাইয়া উঠি।

এক্কাওয়ালা না ডাকিলে হয়ত এ চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইতাম না।

যাহা হউক গাড়ী হইতে নামিয়া যখন ভাড়া চুকাইয়া দিতেছি, সামনে দেখি সেই ভদ্রলোক যিনি দুদিন আগে এই ধর্মশালায় আসিয়াছেন ফ্যামিলি লইয়া। আমায় দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আজ কোন্ দিকে বেড়াতে গিয়েছিলেন ভাই?

বলিলাম, কন্‌খলে।

হ্যাঁ, ওই দিকটা আমারও বেশী ভাল লাগে। তবে মেয়েদের একেবারে পছন্দ নয়। বলে, কি এখানে দেখার আছে? কেবল গুচ্ছের ভাঙা মন্দির আর ভাঙা ঘাট, গঙ্গায় যত জল তার চেয়ে পাথরের নুড়ি বেশী। ও'রা সব আগেই চলে গেছেন 'হর কী প্যারী'। আমাদের ফিরতে একটু রাত হবে—দরোয়ানকে কাইন্ডলি একটু বলে রাখবেন! কেমন?

আচ্ছা। বলিয়া মনে মনে হাসিলাম। জানি যারা প্রথম এখানে তীর্থ করতে আসে সকলেরই পছন্দ ওই হরিদ্বার। কারণ 'হর-কী-প্যারী'কে কেন্দ্র করিয়া গঙ্গা, দোকান, বাজার, ভাতের হোটেল, স্টেশন প্রভৃতি সবই হাতের কাছে। এখানে তীর্থকর্ম বলিতে একমাত্র গঙ্গাস্নান। ব্রহ্মকুণ্ড—যেখানে ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে প্রথম গঙ্গাদেবী মর্তভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া পুরাণে কথিত, সেই স্বল্প পরিসর বাঁধানো ঘাটে গঙ্গার স্রোতে সর্বপ্রথম ডুবিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া সকাল থেকে যাত্রীরা তাঁদের শুভকার্য শুরু করে দেখিয়াছি। তারপর ওই ঘাটের উপরেই গঙ্গাদেবীর মন্দিরে পূজা ও অন্যান্য মন্দিরে নমস্কার করিয়া পয়সা ছুঁড়িয়া প্রণামী দেওয়া। তারপর ঘাট-সংলগ্ন ওই লম্বা বাঁধানো চত্বরে যে সব ছোটখাটো মন্দির ও বড় বড় অট্টালিকার নীচে, কোথাও বা মন্দিরের আনাচেকানাচে, কিংবা বড় গাছের তলায় ধুনি জ্বালাইয়া প্রায় নগ্ন বা নাগা সন্ন্যাসীরা যেখানে ভস্ম গায়ে মাখিয়া গঙ্গার দিকে নীরবে চাহিয়া কেহ বা ধ্যানমগ্ন, কেহ বা স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহাদের কাছে অনেক যাত্রী নমস্কার করিয়া, কিছু প্রণামী দিয়া, নিজেদের ভাগ্য, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু ভালো কথা শুনিবার আগ্রহ লইয়া যায়। তারপর ফিরিবার সময় পরস্পরের মুখে ওই এক কথা, এই দারুণ ঠান্ডায় কন্‌কনে শীতের হাওয়ায় আমাদের হাড় যেখানে কাঁপিয়ে দিচ্ছে, কেমন চুপ করে এ'রা একেবারে

উলঙ্গ হয়ে বসে আছেন। ওঁদের শীত লাগে না? ক্ষিদে তেষ্টা বলতে কিছু নেই?

যাহার বয়স কম, এমন কেউ বলিয়া ওঠে, গাঁজা খায়, সিদ্ধি ভাঙ খায় বলে' ওদের গায়ে ঠান্ডা বোধ হয় না। আবার একটু বেশী বয়সের প্রবীণরা বলেন, ভগবানের কৃপা যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের কি শীত গরমের অনুভূতি থাকে। নইলে এই রকম এলো জায়গায় গঙ্গার ধারে হাড়কাঁপানো শীতে সারারাত কি মানুষ একটা কম্বলের ওপর পড়ে থাকতে পারে! ভোরবেলা বেড়াতে এসে দেখলে, কষ্ট হয় মনে সত্যি!

এরকম কষ্ট করতে কে ওদের মাথার দিব্যি দিয়েছে? ঘরে বসে কি ভগবানকে ডাকা যায় না?

হয়ত যায়। কিন্তু পেটে তো কিছু দিতে হবে, তাই গঙ্গার তীরে বসে ভগবানের সাধনা যেমন করে তেমনি, লোকে দয়া করে কেউ হয়ত একখানা রুটি, কেউ বা এক মুঠো চাল, কেউ বা দু-চার পয়সা দিয়ে যায়, এইভাবে ওদের পেট চলে!

এমনি সব আলোচনা করিতে করিতে তখন তাহারা চলিয়া যায়, আবার আসে বৈকালে।

তখন এই ঘাটেই গঙ্গার দিকে বসে নানারকমের মুখরোচক খাদ্য লইয়া ফেরিওয়ালার দল। যখন গরম গরম মুখরোচক খাদ্য ঠান্ডায় সবাই তারিফ করিয়া খাইতে থাকে তখন একই ঘাটের একদিকে ত্যাগ আর একদিকে ভোগ —এ দৃশ্য চোখে বড় পীড়া দেয়। একই ঘাটের এক পাশে নগ্নদেহ কৌপীন আঁটা সর্বত্যাগী যত সন্ন্যাসী, অন্য দিকে তেমনি দামী শীতবস্ত্রে আবরিত দেহ নর-নারীর মুখে আনন্দ-উচ্ছ্বাস!

এইসব ভাবিতে ভাবিতে তখন নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিয়া হঠাৎ যেন মনে কেমন শূন্যতাবোধ করিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ধর্মশালার অধিকাংশ ঘরগুলিতে তালা ঝুলিতে থাকে। সারাদিন যে সব ঘরে লোকজন, মানে যাত্রীর কলকণ্ঠ শোনা যায়, বিকাল হইতেই তাহারা সব বেড়াইতে বাহির হইয়া যায় বলিয়া এই বিরাট বাগান-বাড়ির শূন্যতা তখন মনটাকে আরও বেশী ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। তাই একাকী ওই সময় ওই বিরাট ধর্মশালায় বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না। গরমের চাদরটা গায়ে জড়াইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম। মনে হইল অনেক দিন হর-কি-প্যারীর ঘাটে আমিও যাই নাই। দ্রুত পা চালাইয়া সেখানে হাজির হইয়া দেখি গঙ্গা দেবীর আরতি শুরু হইয়া গিয়াছে। শাঁখ ঘণ্টা বাজিতেছে। পুরোহিতরা বড় বড় প্রদীপের ঝাড় লইয়া, কেহ ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে দাঁড়াইয়া, গঙ্গার জলকে প্রদীপের আলোর দ্বারা হাত ঘুরাইয়া, নানা মন্ত্রসহকারে আরতি করিতেছেন।

তেমনি একই সঙ্গে উপরে গঙ্গাদেবীর মন্দিরে চলিতেছে আরতি। ঘাটের ওপরে পাশাপাশি দেব-দেবীর আরও যে তিন-চারটি মন্দির, সেখানেও শুরু হইয়াছে আরতি। একই ভাবে। শাঁখ ও ঘণ্টার ধ্বনিতে মুখরিত চতুর্দিক। দর্শকের দল মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছে ঘাটের চারিপাশে। বেশ একটা ভক্তির পরিবেশ! অনেকেই তখন পাতার দোনায় গোলাপফুলের পাপড়ির সঙ্গে ছোট একটি প্রদীপ জ্বালিয়া নৌকার মত গঙ্গার জলে ভাসাইতেছে। স্রোতের টানে হেলিতে দুলিতে সেই পাতার নৌকাগুলি, গঙ্গার বুকে যেন ফুল ও আলোর বরণডালা লইয়া গঙ্গাদেবীকে বরণ করিতেছে।

আবার গঙ্গার বুকে এখানে ওখানে অসংখ্য আলোর নৌকা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বেশ ভাল লাগে এই সময়টা এখানে। ছেলেখেলার মত, ছেলে বুড়ো, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে এই সময় এমনি একটি পাতার ভেলায় আলো জ্বালিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়াকে একপ্রকার গঙ্গা-পূজো বলিয়া মনে করে। যাদের প্রদীপটা একটু গিয়াই হঠাৎ নিভিয়া যায়, কিংবা স্রোতের টানে উল্টাইয়া ডুবিয়া যায়, তারা আবার একটি কিনিয়া জলে ছাড়ে। দাম বেশী নয়, এক আনা, দু'আনা, দু' পয়সা। ওখানে গোলাপফুলও অজস্র ফোটে, খুবই সস্তা, তাই সম্ভব হয়। ছোট ছোট পাতার খোলার নৌকার মধ্যে অনেক গোলাপফুলের পাপড়ি ও তার সঙ্গে ছোট একটি প্রদীপ। গোলাপের সুগন্ধের সঙ্গে ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে। সব মিলিয়া বেশ একটা পরিবেশ।

তাই আরতির সময় ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলে, মনে বেশ একটা শুচিতার ভাব জাগে।

তখন উভয়ের ওই হিমালয় গিরিশৃঙ্গ থেকে শনশনে হাওয়া, গঙ্গার ওই হিমশীতল জলের ওপর দিয়া আসিয়া সারা দেহকে কাঁপাইয়া তোলে, অথচ কাহারও কোন খেয়াল থাকে না।

আরতির পর শুরু হইয়া যায় তখনি ব্রহ্মকুণ্ডের ওই ঘাটের ওপরের দিকে চত্বরে ও নীচে কোথাও রামায়ণ গান, কোথাও বা ভজন ও কীর্তন। ছোট ছোট দলে এখানে ওখানে শতরঞ্জি বিছাইয়া একটা হারমোনিয়াম লইয়া একজন গানের যে লাইনটি গায়, সকলে একসঙ্গে হাতে তালি দিতে দিতে তাহাতে গলা মিলাইয়া গাহিতে থাকে। ইহাদের অধিকাংশই গাড়োয়ালী ও পাঞ্জাবী। তবে মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী অন্যান্য যাত্রীরাও ইহাতে অংশগ্রহণ করে নির্দ্ধিধায়, দেখিয়াছি। স্ত্রী-পুরুষ কেহ কাহারও পরিচিত নয়। তবে একই সঙ্গে ওই ভজন বা কীর্তনে যোগ দেওয়াকে পুণ্যকর্ম মনে করে তারা। এ যেন সেই একই গঙ্গার পুণ্যসলিলে একই সঙ্গে অবগাহন করিয়া দেহমন শুচি করিয়া লওয়া। সারা ঘাট জুড়িয়া সমবেত কণ্ঠে—"রঘুপতি রাঘব রাজা-রাম। পতিতপাবন সীতারাম।" যখন গাহিতে থাকে তখন তাদের কণ্ঠে কি গভীর আন্তরিকতা। মনে হয় যেন, সে কণ্ঠসংগীত নয়, উপাসনা—ঈশ্বরের চরণে আত্মনিবেদন।

সে গানের সুর যেন সামনের ওই নীলধারার কুলুকুলু ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হইয়া দূর থেকে দূরে ধ্যানমগ্ন স্তব্ধ গিরিশ্রেণীর কানে অমৃতবর্ষণ করিতে করিতে, আরো ঊর্ধ্বে, অনন্তে যেখানে নৈশ গগনের তিমিরলোকে লক্ষ্য কোটি তারকার চোখে আনন্দাশ্রু রূপে ছলছল করে, আর সেই সুরধ্বনি মনে হয়, যেন অমরাবতী হইতে নামিয়া আসিয়া নীলধারার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

তখন কিছুক্ষণের জন্য আমার আত্মবিস্মৃতি ঘটিত। মনে হইত, যে পৃথিবীতে আমি বাস করিতেছি এ যেন সে নয়, স্বর্গ-মর্তের মিলনতীর্থ—রূপহীন এক অপরূপ-জগৎ।

॥ বাইশ ॥

শ্যাম মহারাজের সঙ্গে সেদিন ওইরূপ আলোচনা হইবার পর সেই যে চলিয়া আসিয়া ছিলাম, তারপর আর অনেকদিন তাঁহাদের ওই মিশনে ঢুকি নাই। মনে পড়ে বেশ ক'দিন পরে, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, লালতারা বাগের দিকে বেড়াইতে গিয়া ভোলাগিরির মন্দিরের সামনে লালরঙের বাঁধানো গঙ্গার ঘাটটিতে কেহ নাই দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম। সামনে কূলে কূলে ভরা গঙ্গা। তাহার কালো জলে রাস্তার আলো পড়িয়া সে স্থানটিতে স্রোত ঘূর্ণিপাক খাইতেছিল। মনে হইতেছিল বুঝি গভীর আক্রোশে কাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত। সেইদিকে মুখটা ফিরাইতে, পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে আসিল। অনেকদিন ভুলিয়া গিয়াছিলাম কারখানার ম্যানেজারকে। হঠাৎ সেই সময় তাঁকে একটি টাঙ্গা হইতে ভোলাগিরির আশ্রমের ফটকে নামিতে দেখিয়া বুকটার ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। একদিন ইঁহারই কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম বলিয়া তিনি একটা চাকরি দিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা যেদিন শান্তি বিধবা হইয়া আসিয়া আমাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করিতে চাহিল, তাহাকে না বলিতে পারি নাই বলিয়া প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ ও ফলে চাকুরি যাওয়া—বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে। আমার জীবনটা সেদিন তছনছ করিয়া দিয়াছিল শান্তি, আমাকে না জানাইয়া সেইদিনই সে আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। থাক সেকথা এখন। শুধু ম্যানেজার মিঃ চৌধুরী নয়, তাঁর সঙ্গে সেই বৃদ্ধা মহিলা, সদানন্দ মিশনের শ্যাম মহারাজের মুখে শুনিয়াছিলাম যে একদিন উনি বিখ্যাত অভিনেত্রী ছিলেন, তাঁহাকে ওই গাড়ী হইতে হাত ধরিয়া নামাইয়া ম্যানেজারবাবু যখন মা বলিয়া ডাকিলেন এবং বলিলেন, মা তুমি কি তাহলে যাবে না এখন আমার সঙ্গে?

তিনি বলিলেন, না। গেলেই তো অশান্তি, আমি বেশ আছি এখানে, আমায় একটু শান্তিতে থাকতে দাও। তোমার ছেলেমেয়ে নিয়ে তুমি সুখে থাকো, আর কি বলবো। বলিয়া একটু থামিয়া, আবার বলিলেন, পারো যদি

সামনের মাসে মানিঅর্ডারের সঙ্গে কিছু টাকা বেশী দিয়ো। গুরু মহারাজের জন্মোৎসব সামনের মাসের শেষে। মনে করেছি এবার ওঁকে একটা মটকার ধুতি দেবো পরে পুজো করার জন্যে।

কত টাকা হলে হয়, বলো সেকথা। নইলে পরে আবার লিখবে ওই কম টাকায় কি কাপড় হয়?

একটু থামিয়া মা বলিলেন, অন্তত পঁচিশ-তিরিশ টাকার কম কি হবে!

বেশ তাহলে তিরিশ টাকাই পাঠাবো। বলিতে বলিতে দুজনে মন্দিরের ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতে যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। সর্বনাশ, তাহলে খুব বাঁচিয়া গিয়াছি! ভাগ্যিস শান্তি সেদিন আসিয়া পড়িয়াছিল। নইলে ওই অভিনেত্রীর ছেলে যে ম্যানেজারবাবু তাহা তো জানিতে পারতাম না। জাত-কুলের মাথা খাইয়া তখন ওঁর কন্যাকেই বিবাহ করিতে বাধ্য হইতাম।

তখন পূর্বের অনেক কথা মনে পড়িতে লাগিল। আমার মত এক ভ্যাগা-বণ্ডের সঙ্গে ম্যানেজারবাবু যখন তাঁর মেয়ের বিয়ের কথা বলিয়াছিলেন, তখনই আমার চিন্তা করা উচিত ছিল নিশ্চয় কোথাও কোন গলদ আছে। নইলে আমাকেই বা এমন সুপাত্র ঠাওরাইলেন কেমন করিয়া! কলিকাতা শহরে কি আমার চেয়ে ভাল পাত্র আর ছিল না! অবশ্য ম্যানেজারবাবু নিজে মুখে আমায় কোন কথা বলেন নাই। স্টোরকিপারবাবুকে দিয়া চাকরি দিবার আগেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া লইয়াছিলেন।

যদিও শান্তিকে উপলক্ষ করিয়া এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও তার ফলে চাকরি খতম হইয়াছিল। হঠাৎ উল্কার মত আসিয়া আমার জীবনটাকে এভাবে ওলোটপালোট করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছিল বলিয়া মনের ভিতর যত রাগ যত অভিমান জমিয়াছিল সেই মুহূর্তে সব জল হইয়া গেল। ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাইলাম, শান্তি যদি সেদিন ওইভাবে আসিয়া না পড়িত তাহা হইলে জাত কুল মান যেমন বাঁচিত না তেমনি জীবনের স্রোত হয়ত অন্য কোন দিকে আরো বাঁকিয়া যাইত।

থাক্, বাঁকাস্রোতের সে-পুরোনো কাহিনী এখানে আর পুনরুল্লেখ না করিয়া শুধু এই কথাটাই বলিতে চাই, সেদিন হইতে আমার মন যেন তার প্রতি আরো বেশী কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃতই সে আমায় ভালবাসিত, তাই ওই রকম জীবনের সবচেয়ে সঙ্কট মুহূর্তে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল. বুঝি আমাকে রক্ষা করিবার জন্য।

॥ তেইশ ॥

হরিদ্বারের চেয়ে কন্‌খলের ওই অঞ্চলটা আমাকে বেশী আকর্ষণ করিত কেন বলিতে পারিব না। বোধ হয় আধুনিক সভ্যতার আলো তখনও সেখানে অনুপ্রবেশ করিতে পারে নাই, তাই এত ভাল লাগিত। সত্যি কথা বলিতে

কি, ওইখানে যখন ঘুরিয়া বেড়াইতাম, কেবলি মনে হইত যেন পথ ভুলিয়া কোন তপোবনে আসিয়া পড়িয়াছি। এক জায়গায় এত মঠ, এত মন্দির সাধু-সন্ন্যাসীদের এত আখড়া থাকিতে পারে, চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। বোধ হয় ভারতবর্ষে যত রকমের ধর্ম সম্প্রদায় তাদের প্রত্যেকেরই একটা না একটা মঠ বা আশ্রম আছে। নিরঞ্জনী, উদাসী, দণ্ডী রামানুজ, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব হইতে শুরু করিয়া শঙ্করাচার্য সমর্থিত দশনামী সম্প্রদায়ের পুরী, গিরি, ভারতী, বন, পর্বত, সরস্বতী, সাগর, তীর্থ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামের কত মঠ আখড়া সেখানে বর্তমান। তারি মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে কেবল মনে সেই প্রাচীনকালের পুণ্যভূমি তপোবনের স্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠিত। বিশেষ করিয়া কনখলের ওই শেষপ্রান্তে যেখানে গুরুকুল, ঋষিকুল মহাবিদ্যালয়, চারিদিকে ঘন অরণ্যময় বনস্পতির ছায়াস্নিগ্ধ পরিবেশ, তারি মধ্যে মুণ্ডিত-মস্তক বেদ উপনিষদ পাঠরত কিশোর তরুণ সব ব্রহ্মচারীদের দেখিলে আশ্রম-পালিত ঋষিকুমার বলিয়া ভ্রম হইত। গুরুকুলের পাশ দিয়া বিপুল জলরাশি লইয়া প্রবাহিত নদীর মত যে হাতে-কাটা 'ক্যানেল', তাহার স্বচ্ছ জলে ঘন অরণ্যের স্থির প্রতিবিম্ব যখন শিহরিয়া উঠে কত অজানা পাখীর ডাকে তরুমর্মরে তখন সহসা স্মৃতিপটে জাগে কালিদাসের সেই মহাকাব্যে বর্ণিত তপোবন ও বেত্রবতী নদী।

হরিদ্বারের গঙ্গার সঙ্গে কনখলের গঙ্গারও যেন আকাশপাতাল প্রভেদ। সেখানে যেমন স্রোতস্বিনীর বুকে উচ্ছল কলোচ্ছ্বাস ও সর্বাঙ্গ পূর্ণতার আনন্দে টলমল, মনে হয় যেন গঙ্গা প্রতিমার মত রাজরাজেন্দ্রাণীর বেশে বর্তমান! এখানে সেই গঙ্গাকে দেখিলে চেনা যায় না, যেন কতকাল, কত যুগ যুগ ধরিয়া তপস্যায় মগ্ন! ক্ষীণ ধীরবাহিনী, কণ্ঠে মৃদু ওঙ্কারধ্বনি। গঙ্গার তীর বরাবর কোথাও বা কোন প্রাচীন মন্দিরের ভাঙা চত্বর খানিকটা জলে মগ্ন, অসংখ্য ঝুরিনামা বিরাট বট কোথাও জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর মত স্তব্ধ ধ্যান-মগ্ন। ঘাটগুলিতেও ভিড় নাই। তাই একটা অখণ্ড নীরবতা যেন বিরাজ করে সেখানে। স্নানার্থীর সংখ্যাও এদিকে তেমন বেশী নয়, গেরুয়াধারী, মুণ্ডিত মস্তক, সাধুসন্তরা যেন নিঃশব্দে স্নান করিতে নামেন। কেহ বা গঙ্গায় ডুব দিয়া, ঘাটে বসিয়া জপতপ করেন, কেহ বা কোমর পর্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া, আপন মনে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে গঙ্গার পূজা স্তব ইত্যাদি করিতেন। যখন কোন মন্দিরে শাঁখ ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে তখন তার ধ্বনি উপলখণ্ডময় গঙ্গার বুকের উপর দিয়া নিঃশব্দে ভাসিেত ভাসিতে গিয়া ওপারে গিরিশ্রেণীর পদতলে যেন প্রণত হয়। চারিপাশে কেমন একটা পবিত্র ও শান্তির পরিবেশ যেন। বিশেষ করিয়া কনখলের ওই রাজঘাটের গঙ্গায় আমি স্নান করিতে ভালবাসিতাম। আর ঠিক ওই ঘাটের বাঁদিকে উপরে যে রাধাকৃষ্ণের মন্দির তার চত্বরে আসিয়া যখন তখন বসিয়া থাকিতাম। এপার হইতে গঙ্গার ওই বিস্তৃত প্রসারিত রূপের সঙ্গে ওপারের ধ্যানমগ্ন গিরিশৃঙ্গ, ও এখানে ওখানে পুরনো

ভাঙা ঘাট মন্দিরে সব মিলিয়া মিশিয়া এমন স্বর্গীয় ছবি আমার চোখের সামনে কে যেন মেলিয়া ধরিত যা অত্যাশ্চর্য! যা কল্পনার অতীত! সে দৃশ্য যেন এক এক সময় এক এক রকম বিস্ময়ের সৃষ্টি করিত আমার চোখে। সকালে যাহা দেখিতাম, দুপুরে আর তাকে খুঁজিয়া পাইতাম না। আবার সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ অন্যরূপ, রাত্রে আলাদা! ওই গঙ্গার ভাঙা ঘাটে নাইতে নামিয়া জলে ডুব দিবামাত্র এক একদিন আমার সারাদেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, আমার মনে পড়িয়া যাইত এই সেই গঙ্গার আদি এবং অকৃত্রিম ধারা একদিন যা প্রথম এই মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিল শত সহস্র বৎসর পূর্বে। সঙ্গে সঙ্গে যেন আমার মন উধাও হইয়া যাইত—সেই সংখ্যাগণনার অতীতকালে, সেই পৌরাণিক যুগে। কেন আমার এমন অনুভূতি হইত জানি না। ইহা আমার মনের দোষ, না পুরাণের ভূত একা আমার ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসিত, বলিতে পারিব না।

মনে পড়ে তখন পাণ্ডাজীর বাড়িতে থাকি। অসুখ সারিয়া গেলেও পাণ্ডাজীর হুকুমে আরও কিছুদিন সেখানে বিশ্রাম লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এই সময়টা যেন আমার কাছে শাপে বর হইয়াছিল। নইলে ওই কনখল অঞ্চলটার ভিতর বাহির এমন অন্তরঙ্গভাবে দেখার সুযোগ পাইতাম না।

সাধারণত আমি বারোটা নাগাদ গঙ্গায় স্নান করিতে আসিতাম। কখনও বা ঘাটে স্নানার্থী দেখিলে, রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে গিয়া একটু অপেক্ষা করিতাম। একলা ওই গঙ্গার স্বচ্ছ জলে অবগাহন করিতে আমার খুব ভাল লাগিত।

সেদিন বোধ হয় মেয়েদের কি একটা পর্ব ছিল। ডুব দিয়া মাথা তুলিতেই শিহরিয়া উঠিলাম। দেখি একটা ফুলের মালা, বিল্বপত্র ও গোলাপের পাপড়ি আমার মাথায় আটকাইয়া আছে। কোন ঘাট হইতে স্রোতের টানে কার দেওয়া এই পুষ্পাঞ্জলি আমার কাছে ভাসিয়া আসিল কে জানে? হয়ত কোন বিরহিণী তরুণী তার প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষায় এই ফুলের মালার সঙ্গে গোলাপ ফুলের ডালিতে প্রদীপ জ্বালিয়া গঙ্গাদেবীকে মানত করিয়াছিল, স্রোতের টানে ডালা উলটাইয়া আলো নিভিয়া গিয়াছে দেখিয়া সে হয়ত গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে। ওখানে সকলের বিশ্বাস, যে যা মানত করিয়া ফুলের ডালা ভাসায় গঙ্গায়, যদি তা স্রোতের টানে উলটাইয়া না যায়, তা হইলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়! তাই সেই মালাটা হাতে লইতেই সর্ব প্রথম আমার মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিল এক রূপসীর সুন্দর দুটি ভ্রমরকৃষ্ণ চোখের পাতার আড়ালে টলটল করিতেছে মুক্তোর মত অশ্রুবিন্দু।

স্নান করিতে গিয়া তখন এমনি সব ফুলের মালা জলে ভাসিতে দেখিলে, আমার তরুণ মন কল্পনার রঙীন জালে নিমেষে জড়াইয়া যাইত। গঙ্গায় ডুব দিয়া মনকে বন্ধনমুক্ত করিতে গিয়া যেন আরও নিজেকে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতাম।

অবশ্য ওখানকার মেয়েদের সম্বন্ধে একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়া-

ছিলাম। তখন পাণ্ডাদের ঘরের বৌ-ঝিরা ছিল রক্ষণশীলা, অন্তঃপুরবাসিনী। স্ত্রী-স্বাধীনতার নাম পর্যন্ত কানে শোনে নাই। ও তল্লাটে সিনেমা ঢোকে নাই, হাই স্কুল, কলেজ বলিতেও কিছু ছিল না। চায়ের রেস্তোরাঁ কাকে বলে কেহ জানিত না। চায়ের নেশাকে মদের নেশার চেয়ে ভয়ঙ্কর ভাবিয়া লোকে উহা হইতে দশ হাত দূরে থাকিত। আগেই এ কথা বলিয়াছি, তাই পুনরুক্তি করিব না। ওখানে বিবাহিতা মেয়েরা ঘরে ও বাইরে ঘোমটা দিত। কুমারী তরুণীরাও যখন রাস্তায় বাহির হইত সঙ্গে অভিভাবক হিসাবে কেহ থাকিত। তাহারা সালোয়ার কামিজ ও ওড়নায় তাদের দেহ এমনভাবে ঢাকিয়া রাখিত যে মুখের সম্মুখভাগটুকু ছাড়া দেহের আর কোন অংশ চোখে পড়িবার উপায় ছিল না। ওখানকার মেয়েরা ছিল যেমন সুন্দরী তেমন রূপসী! আশ্চর্য তাদের গায়ের রং! দুধে আলতা বলিতে যা বোঝায় একেবারে হুবহু তাই।

সে যেন বসরাই গোলাপের হাট। যার দিকে তাকাও, চোখ যেন পলকহীন. স্তব্ধ হইয়া যায়। ছোট থেকে বড় মেয়েরা সবাই যেন রূপের ডালি। তার কারণ পাণ্ডারা অধিকাংশই কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, আর তাঁদের স্ত্রীরাও কাশ্মীরবাসিনী রূপসী। কাজেই বংশানুক্রমে তাঁদের সন্তান-সন্ততিরা সবাই রূপবান হইবে ইহা স্বাভাবিক। ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই সব লজ্জাবতী নারী. ঘরে বাইরে যাদের দেহের এতটুকু অংশ দেখিবার উপায় নাই, ইহারাই আবার গঙ্গার ঘাটে যখন স্নান করিতে নামে, বিশেষত কোন পর্ব বা যোগাযোগের দিন, তখন যেন লজ্জাসরমের কথা একেবারে মন হইতে তারা মুছিয়া ফেলে। সামনে যে গাত্রাবরণটুকু লইয়া ওই স্বচ্ছ কাক-চক্ষুর মত জলে অবগাহন করিতে নামে, দেখিলে মনে হয় যেন দেহের কোথাও কোন আবরণ নাই।

সেদিনের কথা আমি জীবনে ভুলিব না। একটু আগে ঘাটে গিয়া পড়িয়া-ছিলাম বলিয়া মন্দিরের উপর গঙ্গার দিকের চত্বরে বসিয়া ওপারে গিরিশ্রেণীর বুকে আলোছায়ার লুকোচুরি দেখিতেছিলাম। কখন নীচে গঙ্গার ঘাটে এক-দল তরুণী মেয়ে বিবাহিতা ও কুমারী স্নান করিতে নামিয়াছিল বুঝিতে পারি নাই। সহসা নারীকণ্ঠের কলধ্বনি শুনিয়া সচকিত হইয়া নীচের দিকে তাকাইয়া লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লইলাম। একসঙ্গে এতগুলি সুন্দরী তরুণীর প্রায়-উলঙ্গ দেহগুলি জলের ভিতরে থাকিলেও যেন প্রত্যেকটি অঙ্গ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

মাঝে মাঝে দু'একজন কৌপীনধারী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী পুরুষ ঘাটে নামিয়া কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা শূন্য কমণ্ডলু গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া উঠিয়া যাইতেছে।

সব চেয়ে আশ্চর্য, সেদিকে কাহারও কোন ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহাদের যেন পুরুষ বলিয়া মনেই করে না। কেহ কাহারও মুখে-চোখে জল ছিটাইয়া

মারিতেছে, কেহ বা একজনের দেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া একজন আর একজনকে ডুবাইয়া দিতেছে। কেহ খিলখিল করিয়া হাসিতেছে—কেহ বা গভীর জলে কাহাকে ঠেলিয়া দিতেছে। স্নান নয়, এইভাবে সকলে যেন জলক্রীড়ায় মত্ত।

তাহাদের দেখিয়া সহসা আমার মনে পড়িয়া গেল বৃন্দাবনে যমুনার জলে গোপিনীদের জলকেলির কথা। নীচে স্বল্পতোয়া স্বচ্ছ গঙ্গা নিমেষে আমার চোখে যেন যমুনায় রূপান্তরিত হইল। ঘাটের উপরেই রাধাকৃষ্ণের মন্দির, আর বাঁদিকে যে বিরাট বটবৃক্ষ, তাহা যেন তমালবৃক্ষে পরিণত হইল। মুহূর্তে মনটা যেন সেই দ্বাপর যুগে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ভাবিতে লাগিলাম, তবে কি গোপিনীরা যেমন ব্রজে একমাত্র পুরুষ বলিয়া মনে করিত তাহাদের পরমপ্রিয় সেই কৃষ্ণচন্দ্রকে, এখানেও কি উহারা নিজেদের তেমনি গোপিনী মনে করে গঙ্গায় নাহিতে নামিয়াছে।

উপরে মন্দিরে স্বয়ং কৃষ্ণ তো রাধিকাকে লইয়া উপস্থিত।

আবার কখনো মনে হইত বুঝি গঙ্গার কোলে আছে তাই, মান, ইজ্জত, সব রক্ষা করিবার ভার যেন মা গঙ্গাদেবীর। ওখানের সব মহিলার মধ্যে এইরূপ একটা মনোভাব লক্ষ্য করিতাম। পান্ডাদের রক্ষণশীল পরিবারে যেমন তেমনি পাঞ্জাবী ও গাড়োয়ালী মেয়েরা যারা বাহিরে গতর খাটাইয়া খায়, হাটে-বাজারে যাহাদের দেহের কোন অংশ কখনও বে-আব্রু দেখি নাই, তাহাদেরও অনেক সময় সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া, স্নানের ঘাটের অদূরে সাবান দিয়া পরনের একমাত্র বস্ত্র কাচিয়া তাহা আবার শুকাইয়া পরিতে দেখিয়াছি।

দিনের পর দিন গিয়াছে কিন্তু কখনও কোন মেয়ের ইজ্জতহানির বা নারীত্বের অপমান লইয়া কোন সংঘর্ষ বা বিবাদ হইতে শুনি নাই। অথচ রূপ-যৌবন কোন কিছুতেই তাহাদের কমতি ছিল না, বরং অতিরিক্ত দেখিয়াছি।

পন্ডিতজীর কথা এই সময় সব চেয়ে বেশী আমার মনে পড়িত—'ইয়ে তো স্বর্গ দোওয়ার হ্যায় জী'।

সত্যি কথা বলিতে কি, ধর্মের প্রভাব তীর্থের প্রভাব যে মানুষের মনে কতখানি আধিপত্য করিতে পারে, এখানে তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

একেবারে লেংটিসার সেই ছোট দোকানের মালিক দুধ দৈ ও পেঁড়া বিক্রেতা পাঁড়েজীকে দেখিয়া তেমনি বিস্ময়বোধ করিতাম। ওই রাজঘাটের গলিতে ঢুকিবার মুখেই একটুখানি দোকান, তার সামনে একটি ভাঙ্গা নড়-বড়ে বেঞ্চি পাতা। সকালে বেড়াইয়া যখন ফিরিতাম, বেঞ্চিতে বসিয়া এক গ্লাস গরম দুধ একটু একটু করিয়া খাইতাম। আবার ওই দোকানের সন্নিকটে বড় রাস্তার উপরে একটি সরকারী বাঁধানো বড় কুয়াতে পথিকদের তৃষ্ণা

নিবারণের ব্যবস্থা ছিল। একজন লোক কুয়া হইতে জল তুলিয়া তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির হাতে ঢালিয়া দিবার জন্য হামেহাল হাজির থাকিত। স্থানীয় লোকেরা যখন তখন সেখানে জলপান করিত, ওই কুয়ার জল নাকি খুব হজমী, এমনি একটা সুনাম ছিল তার। আমি ওই কুয়ার জল পান করিতে গেলে, কিন্তু আগে সেই পাঁড়েজীর দোকান হইতে একটি সরের লাড্ডু কিনিয়া খাইতাম। তারপর মিষ্টি মুখে জলপান করিতাম, জলের স্বাদ গুণ যতই থাক। অনেক সময় দিনে দু'তিনবারও সেখানে জল খাইতে যাইতাম। আর প্রতিবারই একটি করিয়া লাড্ডু লইতাম পয়সা না দিয়াই।

একদিন দুদিন পরে সে ঋণ শোধ করিয়া দিতাম। এই সূত্রে পাঁড়েজীর সংগে বেশ আলাপ জমিয়া গিয়াছিল। দিবারাত্র দোকান খোলা থাকিত ওইখানেই দু'চারখানা রুটি নিজে হাতে তৈরী করিয়া খাইত এবং ওই স্বল্প-পরিসর দোকানটুকুর মধ্যেই শুইয়া থাকিত।

হঠাৎ কিছুদিন দোকান ঠিক বারোটায় বন্ধ করিয়া সে কোথায় চলিয়া যাইত। আবার বেলা চারটায় কোন দিন বা সাড়ে চারটা বাজিয়া যাইত দোকান খুলিতে। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দোকান বন্ধ থাকে কেন, বাড়িতে কারও অসুখবিসুখ নাকি?

সে যা কহিল, শুনিয়া তাজ্জব বনিয়া গেলাম। তাহার এক গুরু আছেন। তিনি মৌনীবাবা নামে খ্যাত। মুখে কথা কহেন না। ওখান হইতে মাইল দেড়েক দূরে সে নিজ খরচায় হনুমানজীর একটি মন্দির তৈরী করিয়া দিয়াছে। ওই গুরু সেখানে থাকেন. যখন কন্‌খলে আসেন। সারা বছর তিনি নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান।

সম্প্রতি তিনি আসিয়াছেন, তাই প্রতিদিন আধসের দুধ ও একপোয়া ক্ষীরের পেঁড়া তাঁহার সেবার জন্য সেখানে সে লইয়া যায়। তিনি এবার মাস দুই থাকিবেন। কৌপীন ছাড়া যাঁর দেহে কোন বস্ত্র নাই, তার এই গুরু-ভক্তির বহর দেখিয়া আমার মুখ দিয়া কিছুক্ষণ কোন কথা বাহির হইল না। শুধু ভাবিতে লাগিলাম, ইহারা কোন্ যুগের মানুষ।

পূর্বেই বলিয়াছি কন্‌খলের ওই ভাঙাচোরা ঘাট, পুরনো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ সব যেন এক অদৃশ্য শক্তিতে আমাকে টানিত। বিশেষ কন্‌খলের ওই দক্ষ প্রজাপতির ঘাটটা। তখন তার কোন আকৃতি ছিল না। ভাঙাচোরা পাথরের বড় বড় স্তূপ এদিকে ওদিকে ছড়ানো। সেখানে পুরনো বটগাছের তলায় একটা বড় পাথরের নুড়ির উপর গিয়া মাঝে মাঝে বসিয়া থাকিতাম। সামনে দক্ষ প্রজাপতি মহাদেবের জীর্ণ ভগ্নপ্রায় মন্দির। তার একটু ওপাশে সতীকুণ্ড। ছোট একটা চৌবাচ্চার মত ঘেরা স্থান। সামান্য জল তাহার ভিতরে। এই জল স্পর্শ করিয়া পুণ্যলাভ করিতে আসে সতীনারীরা। চারিদিকে আশেপাশে আরো কত ধ্বংসস্তূপ। একটা বিরাট প্রাসাদ যে একদিন এখানে ছিল, তা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

একদিন সেই পাথরের নুড়ির উপর বসিয়া ক্ষীণস্রোতা গঙ্গার কুলুধ্বনি শুনিতে শুনিতে ওপারের গিরিশৃঙ্গের উপর অস্তগামী সূর্যের শেষরশ্মির দিকে তাকাইয়া ছিলাম। হঠাৎ মুখটা দক্ষ প্রজাপতির মন্দিরের দিকে ফিরাইতে সারাদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মনে হইল এই তো সেই পবিত্র ভূমি যেখানে একদিন দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল। স্বামীর নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া যেখানে সতী দেহত্যাগ করিয়াছিল, আর মহাদেব তার সেই মৃতদেহটা কাঁধের উপর তুলিয়া লইয়া এই সামনের সতীকুণ্ডের পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন।

ভাবিতে ভাবিতে মন কখন সেই পৌরাণিক কালে চলিয়া গিয়াছিল বুঝিতে পারি নাই। যদি জন্মান্তরবাদ সত্য হয়, তাহা হইলে সেদিন হয়ত আমিও এখানে উপস্থিত ছিলাম দক্ষযজ্ঞ দেখিবার জন্য, কে বলিতে পারে! দক্ষযজ্ঞে আমন্ত্রিত হইয়া হয়ত আসি নাই, যেসব দেবদেবী ঋষি-মহর্ষিরা এখানে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের চোখে দেখিয়া কিছু পুণ্যসঞ্চয় করিবার লোভে যে সেদিন ছুটিয়া আসি নাই এখানে কে বলিবে? অসম্ভব? কেন সম্ভব নয়? কুম্ভমেলায় এবারে যে দেড় কোটির মত পুণ্যার্থীর সমাবেশ হইয়াছিল, সারা ভারত কেন পৃথিবীর নানা দেশ হইতে নরনারী জাতিধর্ম নির্বিশেষে তবে জীবন বিপন্ন করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল কেন? কিসের লোভে? শুধু কি প্রয়াগের সেই সঙ্গমে ডুব দিবার জন্য, না ওই উপলক্ষে ভারতের যেখানে যত যোগী-মহাযোগী সাধক মহাসাধক ঋষি মহর্ষি গুহাবাসী তপস্বী, কিম্বদন্তী যারা হিমালয়ের যেখানেই সাধনামগ্ন থাকুন না কেন এই মহাযোগের আমন্ত্রণে যোগ দিবার জন্য সেই গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সংগমে আসিয়া উপস্থিত হন। তাই তো সবাই ছুটিয়া আসে সেই সব মহাপুরুষদের চোখে দেখিয়া জন্ম সার্থক করিতে ও তাঁহাদের পবিত্র দেহ-স্নাত পুণ্যসলিলের স্পর্শে শরীর মন শুদ্ধ ও পাপমুক্ত করিতে! ইহা যদি আজ সত্য হয় তবে সেই সত্যযুগেই বা উহা সম্ভব হইবে না কেন?

আমি হিন্দুসন্তান, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। ভারতের এই পুণ্যভূমিতে দুর্লভ জন্মলাভ করিয়াছি, একবার নয়, দুইবার নয়, বারংবার—যুগে যুগে, কালে কালে। আমি শঙ্কর মানি না। ভুয়োদর্শন বুঝি না। আমি কর্মফল মানি বিশ্বাস করি প্রারব্ধে—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'। এ আমার নিজস্ব অনুভূতি! সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। এর সত্য সপ্রমাণ করিবার জন্য আমি কোন দার্শনিক পণ্ডিতদের দ্বারস্থ হই না। ততক্ষণ কল্পনার আনন্দলোকে বিচরণ করিয়া ক্ষণিকের রোমাঞ্চিত সুখানুভূতিতে বঞ্চিত হইতে আমার মন চায় না। আমি আশাবাদী, আমি কল্পনাবিলাসী, আমি ভোগী, লোভী, আমি জন্ম-জন্মান্তরের কাঙ্গাল, আমার রক্তে একই সঙ্গে বহুজন্মের ক্ষুধা। আমি তাই রূপ থেকে ভ্রমণপিয়াসী। আমি স্রষ্টা! আপন বিশ্ব আপনার হাতে সৃষ্টি করি। কাহারো কৃপার পাত্র হই না কখনও।

॥ চব্বিশ ॥

মনে আছে একদিন স্নান করিতে গিয়াছিলাম। চারিদিকে প্রশান্ত নীরবতা। ঠিক দুপুর নয়, বারোটা বাজিতে কিছু বোধ হয় বিলম্ব আছে। হঠাৎ ক্লান্ত সুরে কোথা হইতে ঘুঘু-র ডাক কানে আসিতে চমকিয়া উঠিলাম। একলা ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া ছিলাম, হঠাৎ আপন মনে গুনগুন করিতে লাগিলাম, "যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিণী!"

গান শেষ হইবামাত্র শিহরিয়া উঠিলাম. দেখি পিছনে চুপচাপ দাঁড়াইয়া এক সন্ন্যাসী।

বলিলেন, বাবুজী আপ্ বাঙ্গালী হ্যায়?

হ্যাঁ। কি করে বুঝলেন তা? জিজ্ঞাসা করিলাম।

বাংলা গান তো আপনি গাইলেন। ভারী মিষ্টি গলা আপনার, আর একখানা গানা হামায় শোনাবেন? বাংলা গান হামি বহুত পিয়ার করি। বাংলা হামি বলতে পারি না। লেকিন বুঝতে পারি। বললাম, আমি কিন্তু গায়ক নই। এই গঙ্গার ঘাটে বসে, হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, বৃন্দাবনের যমুনা পুলিনের কথা। সেদিনও ঠিক এই সময় আমি সেখানে যখন স্নান করতে যাই, প্রকৃতি ঠিক এমনি মনোরম ছিল। দূর হতে এমনি ঘুঘু-র ডাক কানে এসেছিল।

চক্ষু বুজিয়া দু'হাত কপালে ঠেকাইয়া সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ ইয়ে তো সাচ্ বাত্ হ্যায়। মন্‌মে গঙ্গা যমুনা সব একহি বরাবর। অর্থাৎ মনের ভেতর গঙ্গা যমুনা সবই এক।

তারপর হঠাৎ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দুই চোখের দিকে তাকাইয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। একটু পরে যেন তাঁর সারাদেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, আপনি ঠিক বলেছেন! এই গঙ্গামে ওহি যমুনা হ্যায়! আমি দেখেছি এই ঘাটে একদিন গোবিন্দজীকে।

এবার যেন তাঁর কন্ঠস্বর আবেগে কাঁপিতে লাগিল। হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন বাবুজী আমি দেখেছি, এক গভীর রাত্রে। সেদিন পূর্ণিমা। গোবিন্দজী ওই মন্দির থেকে রাধারাণীকে নিয়ে এই ঘাটে নেমে আসছে। আমি দেখেছি। বলিতে বলিতে তাঁর দুই চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বলিলেন, দু'চোখ ভরে দেখেছি বাবুজী! সে কি রূপ মুখে বর্ণনা করতে পারব না। ভগবানজীকো কৃপা, কভি নেহি ভুলেগি।

আবার একটু থামিয়া কহিলেন, এই মন্দিরে যে মূর্তি আছে রাধাকৃষ্ণজীর —দেখা তো? একদম ওহি বিলকুল্। বলিতে গিয়া আবার তাঁহার চোখ দিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

বলিলাম, আপনি ভাগ্যবান। ভগবান আপনাকে নিজে দর্শন দিয়েছেন।

আপনাকে দেখলে পুণ্য হয়। বলিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতে গেলে তিনি আমার হাত চাপিয়া ধরিলেন, নেহি নেহি, ভগবান সব্ কি অন্তরমে হ্যায় জী! আপ্‌কো পর ভগবান কো কৃপা হ্যায়। নইলে কি তিনি তুমহারা কণ্ঠমে এমন সুন্দর সুর দিতেন। এত লোক আছে, ক'জন গাইতে পারে? বুঝিলাম তিনি ভিন্নভাষী, অবাঙ্গালী হইলেও সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ, ধর্মশাস্ত্র, বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি অনেক কিছু পড়িতে হইয়াছে তাঁহাকে এই সাধক জীবনে। আর শুদ্ধ বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের অনেক মিল আছে। তাই বলিতে না পারিলেও বুঝিতে পারেন। যাহা হউক, যখন গান ভালবাসেন বিশেষ করিয়া রাধাকৃষ্ণে গভীর অনুরাগ তখন দিলীপকুমার রায়ের মুখে শোনা, বৃন্দাবনলীলার সেই বিখ্যাত কীর্তনটি গাহিলাম, 'সেই বৃন্দাবন-লীলা অভিরাম ছবি, পড়ে মনে মোর পড়িছে কেবলই মনে।'

গান শেষ হইলে গঙ্গায় স্নান করিতে নামিলাম আমরা দুজনেই।

আমি বলিলাম, আপনি কি কাছেই থাকেন?

বলিলেন, হাঁ জী। একদম বগল মে'। আপ দেখা নেই মাতাজী কী?

বলিলাম, হাঁ-হাঁ, এই তো ছোট শিবমন্দির আর তার গায়ে বিরাট আখড়াটা, ওটা তো মাতাজীই বানিয়ে দিয়েছেন?

জী হাঁ। বলিয়া দু'হাত কপালে ঠেকাইলেন। ভগবান কো বহুত কৃপা গিরা উনকী পর। দেখা নেহি আপ?

হাঁ হাঁ দেখেছি। ছোট একটা দড়ির খাটুলিতে বসে থাকেন প্রত্যেক দিন। আর গঙ্গাস্নান করে যাবার সময় সবাই মেয়ে পুরুষ মাতাজী নমস্তে বলে রাস্তা থেকে হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়।

হাঁ, একদম দেবীকো মাফিক সব আদমী উনকো পূজা দেতা হ্যায়!

তখন প্রশ্ন করিলাম, আচ্ছা আপনারা কতজন থাকেন এই আখড়ায়?

বলিলেন, কৈ পঁয়ত্রিশ সাধু হোগা জী!

আচ্ছা এই পঁয়ত্রিশ জন আপনাদের খাওয়াদাওয়া, পরা, থাকার জন্য যা খরচ সবই তিনি দেন?

বলিলেন, হাঁ, তিনি তার জন্যে দেবোত্তর ট্রাস্ট্ করে দিয়েছেন। কিছু দেখতে হয় না। নিজের ঘরে নিজে ভজন পূজন করেন, তারি আয় থেকে সব চলে যায়। ওঁকে এবার প্রশ্ন করিলাম, আচ্ছা, আপনাদের ওখানে যাঁরা থাকে সবাই তো সন্ন্যাসী। গেরুয়া পরেন, মাথায় জটা দেখি কিন্তু মাতাজীকে তো গেরুয়া পরতে কোন দিন দেখিনি। রঙীন চুড়িদার পায়জামার ওপর সেই রঙের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে থাকেন দেখেছি।

তিনি বলিলেন, হাঁ! আমাদের আখড়ায় তো কোন জেনানা থাক'র নিয়ম নেই। উনি তো আমাদের সম্প্রদায়-ভক্ত নন। ওরি মধ্যে সম্পূর্ণ পৃথক একটা মহল আছে ওঁর। উনি সেখানে থাকেন একা। নিজের ঠাকুর দেবতাকে নিয়ে।

পান্ডাজীর মা একদিন বলিয়াছিলেন, উনি এককালে কলকাতার নাম করা

বাইজী ছিলেন। কত লোকের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন দিয়া কত ধনীকে পথে বসাইয়াছিলেন ঠিকঠিকানা নাই।

মনে হইল একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, ওঁর পূর্ব পরিচয় এ আখড়ার সাধু বাবারা কিছু জানেন কি না? কিন্তু তখনি আবার নিজেকে যেন কেমন অপরাধী মনে হইল। যাহারা তাঁকে দেবীজ্ঞানে মনে মনে ভক্তিশ্রদ্ধা করে, তাঁহাদের কাছে ওই কথা বলিয়া আমার কি লাভ? তাছাড়া সে তো অতীতের কাহিনী। কলিকাতায় সেই বিরাট শহরে মানুষ কবে কি করিয়াছে তাহার সাক্ষীপ্রমাণ বা কোথায়? সত্য কথা বলতে কি, একজন বাঙ্গালী মেয়েকে সবাই দেবীর চোখে দেখে—বাঙ্গালী ছেলে আমি, তাই মনে মনে ইহাতে গর্ববোধ করিতাম।

তবু একদিন অপরাহ্নে কৌতূহল সংবরণ করিতে না পারিয়া, মাতাজীকে একাকী বসিয়া থাকিতে দেখিয়া রাধাকৃষ্ণের মন্দির হইতে নামিয়া একেবারে তাঁহার সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। প্রণাম পায়ে হাত দিয়া করিতে না দিয়া বলিলেন, এইসা মাত করো বেটা, পাওমে হাত না দেনা!

কেন ঠাকুমা ওকথা বলছেন? আমি বাঙ্গালী আপনিও বাঙ্গালী। আপনি আমার বাপ-জ্যেঠার মায়ের বয়সী, তাই ঠাকুমা বলছি বলে রাগ করলেন না তো?

বহুকাল পরে বাঙ্গালী ছেলের মুখে ওই ঠাকুমা ডাক শুনিয়া একটু যেন চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুহূর্তে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, আও বেটা বৈঠো। বলিয়া নিজের পাশে সেই ছোট্ট খাটিয়ায় বসিতে বলিলেন।

আমি বলিলাম, বাংলায় কথা না বললে আমি বসবো না কিছুতেই। কত দূর থেকে এসেছি। আমি আপনার নাতি, আর এ আবদার রাখতেই হবে। হয়ত জীবনে আর দেখা হবে না কখনো।

তিনি এইবার বলিলেন, আমাকে না দেখলে তোমার জীবনে কিছু লোকসান হবে না, দাদু। বাংলা দেশ অনেককাল ছেড়েছি তাই ভুলে গেছি বাংলা কথা। ভুলে গেছি যে আমার জন্ম-কর্ম সব বাংলা দেশে, আমি বাঙ্গালীর মেয়ে। সে যেন অন্য এক মেয়ের কথা, অন্য এক যুগের কথা, যা এখন অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

বলিলাম, যা ইতিহাস, তাকে যদি চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হয়, তার চেয়ে বড় লাভ আর কি আছে, ঠাকুমা?

আমার এই তো শরীর, এতে দেখার মত কি আছে মানিক আমায় বল তো?

কিন্তু এ ভাঙা শরীর দেখতে তো তোমার কাছে আসিনি ঠাকুমা। তোমার এই শরীরের মধ্যে ইতিহাস লুকিয়ে আছে, সে সম্বন্ধে কিছু শুনবো বলে এসেছি।

ওমা সে কি কথা রে! কি শুনবি, মানিক আমার! কি আমি জানি কি বলবো। আমার কি কিছু এখন মনে আছে! সে তো গত জন্মের কথা। মতি বাইজী কবে মরে ভূত হয়ে গেছে! এখন যাকে দেখছিস সে এক আলাদা মানুষ। আগের জীবনের সঙ্গে তার কোন মিল নেই কোথাও—না কথায় না কাজে না চেহারায়।

ওসব বলে আমায় তাড়াতে পারবে না ঠাকুমা। আমি না শুনে উঠছি না, যখন তোমায় কাছে পেয়েছি।

এবার একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, কি শুনতে চাস বল। আমার কি ছাইপাঁস কিছু মনে আছে। এমন পাগল ছেলে তো দেখিনি!

বলিলাম, আচ্ছা যে সব কথা লোকের মুখে আপনার সম্বন্ধে শুনি তা কি সত্যি?

কি শুনিস, বল আগে বাবা ?

বলবো? কিন্তু কিছু মনে করবে না তো ঠাকুমা? আচ্ছা, যদি কোন অপরাধ বলে মনে করো তো নাতিকে ক্ষমা করো।

এই বলিয়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম, আচ্ছা ঠাকুমা, লোকে যে বলে একদিন তুমি এতবড় নামকরা সুন্দরী বাইজী ছিলে যে তোমার পাল্লায় পড়ে কত লোকে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন দিয়ে পথের ভিখারী হয়েছে—এ কি সত্যি?

মানিক আমার, তুমি তো যথেষ্ট বড় হয়েছো, লেখাপড়া শিখেছো, তোমার কি মনে হয় সত্যি?

আমার কাছে তো এ উপন্যাস বলে মনে হয়। তাই তো তোমাকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করছি। নাচে, গানে, রূপে সব দিক থেকে এতগুলো সম্পদ তখনকার কালে কলকাতায় নাকি আর ছিল না। সেই জন্য তোমার রেট ছিল সব চেয়ে বেশি। তুমি নাকি কলকাতার সেরা বাইজী ছিলে একদিন?

সেরা কি না জানি না, তবে তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, তুমি শাড়ী কিনতে গিয়েছো দোকানে, তোমার সামনে দোকানদার সাজিয়ে রেখেছে দশ টাকা দামের শাড়ী, বিশ টাকা, তিরিশ টাকা, একশো টাকার শাড়ী, তুমি যদি সবচেয়ে বেশী দামের শাড়ীটা কেনো, তার জন্যে কি অপরাধ দোকানদারের?

শুনেছি, তোমার জন্যে নাকি কত রাজা মহারাজা ফতুর হয়ে গেছেন!

সঙ্গে সঙ্গে দু' হাত কানে চাপিয়া তিনি কহিলেন, ছিঃ ওকথা বলতে নেই দাদু, শুনলে পাপ হয়! তোমায় তো আগেই বলেছি সে বাইজী মরে গেছে অনেক দিন, তার দেহটাও কবে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আজ যাকে দেখছ সে অন্য মানুষ, সকলে যাকে বলে মাতাজী!

বলিলাম, তা দেখেছি এখানে, সবাই ছোট বড়, ছেলেমেয়ে বুড়ো যুবো এমন কি ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীরাও সকলে ডাকে তোমাকে মাতাজী বলে, কত ভক্তি করে।

সহসা তাঁর চোখ দুটি যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, একই মানুষের জীবনে জন্মান্তর ঘটতে পারে তা নিশ্চয়ই জানো দাদু? নইলে দস্যু রত্নাকর মহর্ষি বাল্মীকি হলেন কি করে? চণ্ডাশোক পৃথিবীর সব সেরা সম্রাট বলে লোকের কাছে পুজো পান কেন?

বলিলাম, কিন্তু এর মূলে আছে এক আঘাত স্বীকার করেন তা? ভাগ্যিস কলিঙ্গ যুদ্ধের নৃশংস হত্যাকাণ্ড চোখে দেখে মনে আঘাত পেয়েছিলেন সম্রাট অশোক, তাই তো সব ছেড়ে অহিংসামন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তেমনি দস্যু রত্নাকর মানুষ খুন করে যাদের টাকা-কড়ি এনে দিত তারা যখন তার সেই পাপকর্মের অংশগ্রহণ করতে রাজী হলো না তখনি তো সে পথ ছেড়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে বসলেন। ম-রা-ম-রা করতে করতে শেষে একদিন রামনাম মুখ দিয়ে বের হলে তারপর সিদ্ধিলাভ হয়।

ঠিক বলেছো দাদু। তুমি কত লেখাপড়া শিখেছো, সবই জানো!

আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি কি করে সকলের মাতাজী হলে, একটু বলো না, আমার বড্ড জানতে ইচ্ছে করছে।

দাদু ওসব থাক ভাই। নিজে মুখে বলতে নেই! তাছাড়া ও জেনে তোমার বা কি লাভ হবে ভাই?

ঠাকুমা, দস্যু রত্নাকর কেমন করে মহর্ষি হলেন, চোখে দেখিনি, বইয়ে পড়েছি। সম্রাট অশোকের কাহিনী ইতিহাসে লেখা আছে। কিন্তু যাঁর জীবনে সেই জন্মান্তর ঘটেছে নিজের চোখে তাকে দেখার সৌভাগ্য তো মানুষের জীবনে ঘটে না, তাই আমাকে একটু দয়া করো। তোমাকে যখন কাছে পেয়েছি বাইজী থেকে মাতৃত্বে উন্নীত হবার ইতিহাস তোমার মুখ থেকে তা শুনে জীবন ধন্য হোক।

দাদু তুমি পুরুষ ছেলে, সে সব কথা বুঝবে না ভাই।

ঠাকুমা, তবু তোমার মুখ থেকে শুনবো, যা বুঝি না, বুঝতে চেষ্টা করবো।

এবার ঠাকুমা চুপ করিয়া গেলেন! তারপর বলিলেন, যেদিন আমার যা কিছু ছিল ধনসম্পদ সব এনে উজাড় করে দিলুম দরিদ্রনারায়ণ, সাধুসন্ন্যাসী, ফকিরদের সেবায়, সেই দিন যেন নতুন সূর্যোদয় হলো আমার জীবনে। 'মা' 'মা' ডাক, 'মাতাজী' 'মাতাজী' শুনে প্রাণ জুড়লো। আমার মনের মধ্যে জেগে উঠলো ধীরে ধীরে এক অত্যাশ্চর্য মাতৃত্বের প্রতিমা। নারী হয়ে জন্মেও আমি যে মাতৃত্বের স্বাদ পাই নি, যে মাতৃত্ব থেকে এতকাল বঞ্চিত হয়েছিলুম বা পাই নি তাকে ফিরে পেয়ে, তার রূপ দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লুম। দু'কানে অহরহ শুধু সেই মাতৃনাম শুনতে শুনতে কেমন করে যে আমি ওদের সকলের মা হয়ে গেছি জানি না, গর্ভে ধারণ করতে পারি নি তবু মনে হয়—যে দিকে চাই—এরা সবাই আমার নিজের সন্তান। সে এক অত্যাশ্চর্য অনুভূতি। শুধু 'মা' এই নাম শুনতে যে দুর্লভ মাতৃত্ব লাভ করেছি দাদু,

মাতৃত্ব জেগেছে আমার মনে-প্রাণে দেহের প্রতি রক্তকণায়—কেমন করে তা মুখে বলে কাউকে বোঝাতে পারবো না। আমার মনে হয় আমার জন্ম সার্থক। নারীর নারীত্বের পূর্ণতা যে মাতৃরূপে তাকে পেয়ে আমি ধন্য। তাকে আমি লাভ করেছি, এই নাম-গানের মধ্য দিয়ে, বিশ্বাস করতে পারবে কি দাদু?

বলিলাম, কেন পারবো না? সেদিন কৃষ্ণ-চৈতন্য মন্দিরে কীর্তন শুনতে গিয়েছিলুম—'হরেকৃষ্ণ হরে রাম' গাইতে গাইতে একজনের হঠাৎ ভাবসমাধি হয়ে গেল দেখলুম। সবাই বললে, হাঁ—ঠাকুরের কৃপা হয়েছে ওর ওপর।

হাঁ দাদু, নামের চেয়ে বড় তপস্যা আর কিছু নেই। মন্ত্রের চেয়ে নামের শক্তি কেবল বেশী নয় অনেক বড়। কানের মধ্যে দিয়ে মনের ভেতরে ঢুকে মাতৃত্বের বন্যা বইয়ে দেয়।

প্রশ্ন করিলাম, এই নাম কানে শোনার জন্যে বুঝি এইখানে সকাল বিকেল রোজ এসেই বসো!

এবার দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, গুরুজী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি শ্লোক প্রায়ই শোনাতেন, অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যা বলেছিলেন—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।

অর্থাৎ সর্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতেই সর্বভূতকে যিনি দর্শন করেন, তিনিই ভগবানের পরাভক্তি লাভ করেন।

ঠাকুমাকে চুপ করাইয়া দিয়া বলিলাম, ওসব গীতা-টিতার বড় বড় কথা আমার মাথায় ঢোকে না, তবে এটা বুঝতে পারলুম, একই জীবনে, একই মানুষের মধ্যে জন্মান্তর ঘটা সম্ভব! এই বলিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলাম। তারপর বলিলাম, ঠাকুমা নিশ্চয় এর মূলে ছিল এমন একটা নিদারুণ আঘাত যার জন্যে, নিজের জন্ম-কর্মস্থল, যশ খ্যাতি নাম প্রতিপত্তি সেখানে সাধু সন্ন্যাসী গরীব দুঃখী দরিদ্রনারায়ণদের জন্যে এরকম মঠ মন্দির আখড়া তৈরী না ক'রে এই সুদূর অঞ্চলে যেখানে কেউ আপনাকে জানে না, চেনে না, সেখানে এই সব করেছেন! সকলেই তো নিজের মানুষজনের কাছে নিজের নামকে চিরস্থায়ী করতে চায়, আপনি সব বিসর্জন দিয়ে এখানে চলে এসেছেন।

ঠাকুমা আমার কথার কোন জবাব না দিয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। তাই আবার বলিলাম, আচ্ছা ঠাকুমা, যারা আগুন নিয়ে খেলা করে, তাদের তো হাত আগুনে পোড়ে, এটা বিশ্বাস করেন তো?

হাঁ। এ আর নতুন কথা কি, সবাই জানে।

তাহলে এত মানুষ নিয়ে যখন আপনার কাজ কারবার ছিল, তখন কাউকে আপনি ভালবাসেন নি, কারুর প্রেমে পড়েন নি, এটা কি সম্ভব? আপনার মনটা তো ভগবান রক্তমাংসের বদলে পাথর দিয়ে তৈরী করেন নি। বলুন না সত্যি করে, আমার বড্ড শুনতে ইচ্ছে আপনার মুখ থেকে!

দূর—দূর। এই জন্যে বুঝি নাতি-সম্পর্ক পাতাতে এসেছিস। বড় দুষ্টু ছেলে তো। বলিয়া খপ্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে আমার দিকে পিছন ফিরিয়া হাঁটা দিলেন।

আমি তার পিছনে পিছনে খানিকটা গিয়া তারপর থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

তিনি আখড়ার মধ্যে ঢুকিয়া গেলেন।

মনে আছে ঠিক এক সপ্তাহ পরে একদিন বিকেলে ঠিক সেইখানে ঠাকুমাকে একা বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, 'ঠাকুমা নমস্কার' বলিয়া তাঁর পা ছুঁইবার জন্য নীচু হইলে তিনি সস্নেহ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আবার জ্বালাতে এসেছো দুষ্টু ছেলে! কি আবার চাও?

কিছুই চাই না, শুধু আপনার মুখ থেকে একটা সত্যি কথা শুনতে চাই। ...ঠাকুমা, প্রেম-ভালবাসা কি অন্যায়? পাপ?

ঠাকুমার মুখের রেখাগুলো সহসা যেন কঠিন হইয়া উঠিল। তখন প্রশ্ন করিলাম, সত্যি কি প্রেম বলে কিছু নেই সংসারে, ওটা মরীচিকা, মানুষ যার পিছনে ছুটে মরছে? আপনি একথা বিশ্বাস করেন?

এবার ঠাকুমা মুখ খুলিলেন, আমার গুরুজীর মুখে সব সময় একটি গান শুনতুম—'মনুয়া ভজন করনা চাই, মনুয়া প্রেম লাগনা চাই। মনুয়া সাধন করনা চাই!' গুরুজী বলতেন, এই বিশ্বসংসারটা দাঁড়িয়ে আছে প্রেম-ভালবাসার ওপরে। সাধনভজন করো কি সংসার ধর্ম করো, আগে প্রেম-ভালবাসা লাগাতে হবে! নইলে কোন কাজেই সিদ্ধিলাভ হবে না। তোমাকে কেউ ভালবাসবে না, তুমিও কাউকে আপন করতে পারবে না। তিনি উপদেশের ছলে বলতেন, ভাল করে চোখ মেলে তাকা চারিদিকে, তাহলেই বুঝতে পারবি এর অর্থ! এক সংসারে এক পরিবারে কত লোক নারী পুরুষ একসঙ্গে বাস করছে, ভিন্ন ভিন্ন ঘরে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মানুষ! এটা সম্ভব হতো না, যদি তার মূলে না থাকত প্রেম-ভালবাসার বন্ধন, নানা সূত্রে, নানা সম্পর্কে জড়িত!

গুরুজী বলতেন, ঠিক এমনিভাবে এক বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির, এক পাড়ার সঙ্গে অন্য পাড়া, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশ, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতি কোন না কোন প্রেমের সূত্রে আবন্ধ। তিনি বলতেন, বিশ্ব জুড়ে চলেছে এই প্রেমের লীলা। মাটির সঙ্গে বৃক্ষ লতা উদ্ভিদের প্রেম, নদীর সঙ্গে সাগরের প্রেম, আকাশের সঙ্গে পৃথিবীর প্রেম।

গুরুজী বলতেন, প্রেম-ভালবাসা না থাকলে এই সংসারটা কতকগুলো হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে ভরে উঠতো, পশুদের আবাসস্থলে পরিণত হতো।

তিনি বলতেন, সংসারটা একটা হাটের মতো। সেখানে মাংসের দোকানে যেমন ভিড়, মাছের দোকানে তেমনি। আবার তেমনি ভিড় তরিতরকারীর দোকানে, ফুলফলের দোকানে। যে যা ভালবাসে, সে তাই পেতে চায়।

মোদ্দা সব কিছুর মূলে রয়েছে এই প্রেম ভালবাসা। রুচিভেদে, আধারভেদে তা ভিন্ন হতে পারে! কিন্তু তাই বলে যে নিরামিষাশী সে যদি মাংসাশীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তার খাদ্যের নিন্দা করে, ও কিছু নয় অসার ভূয়ো বলে, তাতে তার কিছু এসে যায় না। ওটা একেবারে ব্যক্তিগত, রুচি-প্রবৃত্তি-নির্ভর।

এই বলিয়া ঠাকুমা একটু চুপ করিয়া পূর্বের কথায় ফিরিয়া গেলেন।

তিনি বলিলেন, আমার মনে হয় প্রেম ভালবাসা—ওটা সাধনার মন। সিদ্ধির পথে যারা অগ্রসর হতে পারে না, ডাকিনী-যোগিনীদের পাল্লায় পড়ে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আসে কিম্বা খানিকটা গিয়ে ফিরে আসে, কেউ বা ধৈর্যের অভাবে, তারা যেমন বলে সাধনা ভূয়ো, কিছু নয়, প্রেমের ব্যাপারটাও আমার মনে হয় তেমনি!

বলিলাম, সব তো বললেন কিন্তু আসল যে কথা আমি শুনতে চাই সেটা তো চাপা পড়ে গেল ঠাকুমা। না শুনে আমি উঠছি না আজ, নাতির এ আবদারটুকু রাখতেই হবে।

ঠাকুমা চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, প্রেম-ভালবাসা এসব কিছু নয়। তবে হাঁ, হঠাৎ সব ছেড়ে এখানে ছুটে এলাম কেন—অবশ্য তার একটা ছোট ইতিহাস আছে।

সেই ইতিহাসটাই তো আমি শুনতে চাই তোমার মুখ থেকে ঠাকুমা!

তখন তিনি এইভাবে শুরু করলেন, খুব ভোরে আমি গঙ্গাস্নান করতে যেতুম রোজ। একদিন বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছি দেখি সদরের পাশে দাঁড়িয়ে একটা লোক, ময়লা জামাকাপড়, একমুখ দাড়িগোঁফ, মাথাটা একটা ময়লা সিল্কের চাদরে ঢাকা। তাকে দেখেই আমার মনটা বিষিয়ে উঠল। গঙ্গাস্নান করে ঘাটের ওপরে শিবমন্দিরে পুজো করে বেশ পবিত্র ভাব মনে নিয়ে আসছিলুম। তাই ওই সাতসকালে ভিখিরীকে দেখেই মাথায় রাগ চড়ে উঠল। বললুম, ভিক্ষে করতে আসতে বুঝি সময় পেলে না? তাই এই সাতসকালে মানুষ কোথায় ঠাকুর দেবতার নাম করবে, না—। যাও এখান থেকে, এখন কোন ভিক্ষে দিতে পারব না।

লোকটা চাপা গলায় বলে উঠল, ভিক্ষে চাইতে আমি আসিনি।

তখন আমি চমকে উঠলুম। 'তবে এই সাতসকালে কি তোমার রূপ দেখাতে এখানে দাঁড়িয়ে আছো?

আপনার সঙ্গে পাছে দেখা না হয়, তাই ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। জানি আপনি রোজ গঙ্গাস্নানে যান। আপনাকে একটা কথা বলব বলে!

কি এমন গুরুতর কথা যে এই ভোরে এখনই শুনতে হবে? যাও এখান থেকে চলে, কোন কথা আমি তোমার শুনতে চাই না।

তাড়িয়ে দিচ্ছেন, আপনার দোরে এসে দাঁড়িয়েছি বলে?

না, তাড়িয়ে দিচ্ছি না। পরে আসবে। এখন আমি কোন কথা শুনতে চাই না!

কিন্তু আপনি না চাইলেও আমি চাই, আমাকে এখনি বলতেই হবে। নইলে পরে লোকজন এসে পড়বে।

কি এমন গোপন কথা যে লোকজন এসে পড়লে আর বলা যাবে না। হেঁয়ালি রেখে আসলে কি বলতে চাও, বলে ফেলো। আমি এখন কোথায় ঠাকুরঘরে যাব পুজো করতে তা নয়—

আমি ভিখিরী নই। ভিক্ষে চাইতে আসিনি। একদিন আমার অনেক ছিল, আজ সব হারিয়ে নিঃস্ব। তিন-চার দিন ছেলে দুটোকে খেতে দিতে পারিনি, তাই আপনার কাছে এসেছি কিছু টাকা ধার চাইতে।

ধার চাইতে তোমার লজ্জা করছে না! যাকে চিনি না, জানি না, তাকে ধার দেব কোন্ ভরসায়?

লোকটা এবার চুপ করে কি ভাবতে লাগল। বললুম, অনেক ছিল তাহলে গেল কি করে? রেসের মাঠে না শুঁড়ির দোকানে? না অন্য কোথাও—

মেয়েমানুষের ঘরে।

বললুম, তাহলে সেই মেয়েমানুষের ঘরেই গেলে না কেন যে তোমার সর্বস্ব গ্রাস করেছে। সে হয়ত দয়া করে কিছু উগরে দিতে পারে তোমার হাতে।

আমি তার কাছেই এসেছি। তবে দয়াপ্রার্থী নই। আমি শুধু ধার চাই। এই কথাগুলো বলতে বলতে তার মাথার চাদরটা খুলে ফেললে। তারপর একে একে গোঁফ দাড়ি। পরচুলো পরে ছদ্মবেশে এসেছিল।

এ্যাঁ, এ কি আপনি! আপনার এই অবস্থা কি করে হলো?

ভূত দেখলে যেমন মানুষ শিউরে ওঠে, তেমনিভাবে আমি চমকে উঠলুম চকদিঘার জমিদার কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণকে দেখে।

তখন চাপাগলায় তিনি বললেন, একদিন জুড়ি হাঁকিয়ে যার ঘরে এসেছি, বাড়ির চাকরবাকর থেকে আশপাশের লোকজন যাকে দেখেই সেলাম করতো, পাছে তারা কেউ চিনতে পারে, তাই এই ভোরে, এই রকম ছদ্মবেশে তোমার কাছে এসেছি।

বললুম, ছি ছি, এইভাবে কেউ নিজের সর্বনাশ করে? ছেলে মেয়ে সংসার যাঁর এত বড়।

তিনি বললেন, ওকথা বলে আমায় কোন লাভ নেই। আমার বাপপিতামহ একদিন যা করে—বিরাট জমিদারীর তিন ভাগ নাচ গান আর মদ মেয়েমানুষে স্ফূর্তি করে উড়িয়ে গেছেন, তাঁদেরই রক্ত তো আমার দেহে বইছে, কাজেই আমি বংশছাড়া হবো কি করে আশা করো?

তখনই তাঁকে বসিয়ে সিন্দুক খুলে এক হাজার টাকা হাতে দিয়ে বললুম, কাল আবার আসবেন, আমি যা পারি আরো কিছু দেবার চেষ্টা করবো।

সঙ্গে সঙ্গে সেই পরচুলাগুলো পরে, আগের মত ছদ্মবেশে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরের দিন ঠিক সময়ে তিনি এসে হাজির হতে আমি সেই বাড়ির দলিল দানপত্র সমেত তাঁর হাতে দিয়ে বললুম, এটা আপনাকে দিলুম।

তিনি কাগজটা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, দিয়ে নিতে নেই। দান প্রতিগ্রহ করা পাপ। এ বাড়ি একদিন আমিই তোমায় উপহার দিয়েছি, ভুলে যেয়ো না।

তখন আমি বললুম, বেশ। তাহলে এটা আমি আপনার ছেলে-মেয়েদের উপহার দিচ্ছি, তাহলে তো নিতে আপত্তি নেই?

আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যাদের দিতে চাইছো, তারা যদি—

একটু কেমন তাঁকে ইতস্তত করতে দেখে বললুম, মানে?

মানে আমার ছেলেদের তো আমি ভাল করেই চিনি—কিছু মনে করো না! বাইজীর সম্পত্তি শুনলে তারা হাত দিয়ে ছোঁবে না। গ্রহণ করা দূরে থাক।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো কে যেন একটা লোহার ডাণ্ডা সজোরে বসিয়ে দিলে আমার মাথায়। সমস্ত পৃথিবীটা যেন চোখের সামনে অন্ধকার হয়ে গেল। আর কোন হুঁশ রইল না আমার।

॥ পঁচিশ ॥

ঠাকুমা থামিলে আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, তখনই কি প্রশ্ন করিব যেন খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি যা বলিলেন, তা যদি সত্য হয় তাহা হইলে এ এক অত্যাশ্চর্য, অবিশ্বাস্য কাহিনী সন্দেহ নাই। এত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে ছেলেরা যাঁর দু'দিন অনাহারী, তাঁর পক্ষে কি এত টাকার বিষয়সম্পত্তি মুখের ওপর ওই ভাবে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব? জমিদার, রাজা-মহারাজাদের মেজাজের অনেক গল্প লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, বইয়েও পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সত্যি কথা বলিতে কি এ যেন সব অসম্ভবকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

একটু পরে ঠাকুমাকে বলিলাম, 'দারিদ্র্য-দোষঃ হরে গুণরাশিঃ!' এই কথাটা ছেলেবেলা থেকে গুরুজন ও শিক্ষকদের মুখে শুনে শুনে কান পচে গেছে, কিন্তু এ যে দেখি গুরুবাক্য, শাস্ত্রজ্ঞান সব মিথ্যা প্রমাণ করে দিলে। এত দম্ভ, এত আভিজাত্য যে নিজে না হয় না নিলেন, কিন্তু তাই বলে ছেলে-গুলোকে অনাহার থেকে রক্ষা করার জন্যে যখন বাপের বদলে তাদের দিতে চাইলেন, তখন যেন জমিদারী-দম্ভ আরও দশ হাত উঁচুতে উঠে গেল! সত্যি, এ যেন কল্পনার অতীত!

আমার কথাগুলো যেন ঠাকুমার কানে ঢোকে নাই। কেমন যেন তাঁকে একটু বিমনা বোধ হইতেছিল। তাই আবার যখন বলিলাম, দেখুন ঠাকুমা,

আমার তো মনে হয় আপনি যদি তাঁকে না দিয়ে ছেলেদের হাতে তুলে দিতেন, তাহলে বাপের এ দম্ভ চূর্ণ হয়ে যেত নিশ্চয়ই।

না দাদু, তুমি ছেলেমানুষ, ওদের কিছুই চেনো না। ভুলে যেয়ো না যে বাঘের বাচ্ছা বাঘই হয়!

সে তুমি যাই বলো, আমি হলে কিছুতেই এতখানি স্পর্ধা তার সহ্য করতুম না। তোমার মত বিখ্যাত মানুষের মুখের ওপর যে এই কথা বলতে পারে, তখনি ফেরত চাইতুম যে টাকাটা নিয়েছিল আগের দিন। তাই আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে, তারপর তুমি কি করলে?

কি করবো দাদু?

সে কি! এতখানি অপমান যে নিজে করলে না, তার ছেলেদের দিয়ে করালে, তার জন্যে তুমি কোন প্রতিশোধ নিলে না?

ঠাকুমার মুখে ঈষৎ ম্লান হাসি দেখা দিয়া সঙ্গে সঙ্গে মিলাইয়া গেল। বলিলেন, না দাদু, প্রতিশোধ নিইনি, তার বদলে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করেছিলুম। এত বড় সত্যটা আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যে। সত্যি বলতে কি, যখন সুখ্যাতির অহঙ্কারে আমার মাটিতে পা পড়তো না, ভাবতুম যার এতটুকু অনুগ্রহ পাবার জন্যে ধনী থেকে উচ্চশিক্ষিত, সমাজের কত সব বরণীয় ও পূজনীয় ব্যক্তি গোপনে গভীর রাত্রে আমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে জীবন ধন্য মনে করতেন, আমি তাদের সকলের মাথার মণি— সেই অহঙ্কার নিমেষে আমার চূর্ণ করে দিয়ে যেন দেখিয়ে দিলেন, আমার সত্য পরিচয় কি। যত বড় বাঈজী হই না কেন, মানুষ হিসেবে সমাজের কাছে আমি ঘৃণ্য অস্পৃশ্য, ওই আঁস্তাকুড়ের মত, আমার রোজগারের টাকাও হাতে ছুঁতে ঘেন্না করে। এ যে কত বড় আঘাত তুমি বুঝতে পারবে না দাদু। তুমি ছেলেমানুষ।

এবার আমি হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, তুমি যাই বলো ঠাকুমা, আমি কিন্তু এর মধ্যে তোমাদের একটা গভীর প্রেমের গন্ধ পাচ্ছি।

দূর দূর! প্রেম কোন্ চুলোয় পেলি? বরং বল্ এতবড় অপমানের কথা শুনিনি আগে কখনো!

বলিলাম, যেখানে ভালবাসা যত বেশি, সেখানেই তো মান-অপমান তত বড়। নইলে তার দুঃখে এক কথায় এতবড় বিষয়সম্পত্তি দান করতে যাবেন কেন? আর সত্যিকারের গভীর ভালবাসা ছিল বলেই, তার প্রমাণ তিনি দিলেন ওই ভাবে। নইলে এত বড় দুঃখ দৈন্য অভাব সত্ত্বেও কি কেউ হাতে পেয়েও এমন ভাবে ত্যাগ করতে পারে? এখানে যেমন দাতা তেমনি গ্রহীতা। দুজনের মন যেন একসুরে বাঁধা। দান যত বড়, ত্যাগ তার চেয়েও বড়। খুব আশ্চর্য লাগছে আমার! বাস্তবিক এরকম কাহিনী শোনা যায় না। সেই লোকটিকে একবার চোখে দেখতে পেলে চক্ষু সার্থক হতো।

ঠাকুমা বলিয়া উঠিলেন, তোমরা একালের ছেলে, তোমরা প্রেম ছাড়া কিছু

জান না। আমাকে যে এতবড় অপমান করলে, তার মধ্যে তুমি প্রেম দেখছ। বা রে ছেলে! তুমি আমার নাতি নও, যাও।—বলিয়া কৃত্রিম অভিমানে আমার চোখের দিকে তাকাইলেন।

বলিলাম, ঠাকুমা, যদি সত্যি ভালবাসা না থাকত তাহলে কি যার তার কথায় এইভাবে মানুষ সব কিছু বিসর্জন দিতে পারে? যার মুখের একটা কথার ঘায়ে তোমার চোখের সামনে সব পৃথিবীটা নিমেষে অন্ধকার হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গতিটাও এইভাবেই একেবারে ওলটপালট হয়ে গেল, সে মানুষের সঙ্গে তোমার কোন কিছু ছিল না, এ কথা বললে হাইকোর্টের জজও বিশ্বাস করবে না। কেন শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চেষ্টা করছ ঠাকুমা। নাতির কাছে তুমি ধরা পড়ে গেছ।

ছিঃ, ওকথা আর মুখে এনো না আমার সামনে, দাদু! তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে আমার মনের সে কথা বলে বোঝাতে পারব না। সে বড় মর্মান্তিক জ্বালা। একমাত্র আমার মত হতভাগিনী যারা, এ পাপের পথিক তারা ছাড়া কেউ বুঝবে না রে মানিক।...এসব কথা আর মুখে আনিস নি ভাই। যে জীবনটা কোন কালে পুড়ে ছাই হয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেছে, তার কথা কিছু কি এখন মনে আছে রে! মিথ্যে কথা কি তুমি আমার মুখ দিয়ে বলাতে চাও এখন?

জিব কাটিয়া বলিলাম, ছি ছি ঠাকুমা, আমাকে এমন অধম ভাববেন না। আমার শুধু জানার নেশা। প্রেম ছাড়া কি মানুষের কোন ইতিহাস থাকিতে পারে।

ঠাকুমা এবার কি ভাবিয়া বলিলেন, সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারলুম না। যতবার চোখ বোজাতে যাই, অমনি কতগুলো ছায়ামূর্তি যেন চারিদিক থেকে আমার বিছানাটা এসে ঘিরে ধরে। দেখি কত সতীনারীর মুখ, তারা কাঁদছে, কেউ অভিসম্পাত দিচ্ছে মাথার চুল ছিঁড়ে, কেউ বা বুক চাপড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাহাকার করছে। আবার দেখি সেই ভিড়ের মধ্যে, ছেঁড়া জামাকাপড় পরা ভিখিরির মত দৈন্যদুর্দশাগ্রস্ত কত ছেলেমেয়ের অনাহারী শুকনো মুখ, চোখে জল।

আমার পাপে আজ এদের এই দুর্দশা। আমি কেড়ে নিয়েছি ওই সব সতী নারী ও শিশুসন্তানের মুখের গ্রাস। আমি অপরাধিনী এদের কাছে। মনে হল সত্যি আমি নরকের কীট। আমারই লোভে নিভে গেছে কত ঘরে কত আলো।

সেই রাত্রেই স্থির করে ফেললুম, না আর অপরাধ বাড়াব না। বাইজী-জীবনটাকে শেষ করে দেব আজ রাত্রে। আমি তো মেয়ে, বিয়ে করলে সংসারে ছেলেমেয়ের মা হতে পারতুম ওদের মত। তারপর যদি আমার মত আর কেউ আমার স্বামীকে কেড়ে নিত আমার কাছ থেকে, তাহলে? আর এ পথে নয়, এই শেষ।

এই বলিয়া একটু থামিয়া ঠাকুমা বলিলেন, সে যেমন ঘৃণায় আমার সম্পত্তি ত্যাগ করে গেল, আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম সেই রাত্রে এই অভিশপ্ত জীবনের যা কিছু সঞ্চয়, আমিও যে ত্যাগ করতে পারি তাকে দেখিয়ে দেব।

বলিলাম, এখানেও যদি আমি বলি সেই দুই আর দুইয়ে চার, তাহলে কি রাগ করবে আমার ওপর ?

বড় দুষ্টু তুই। আর কোন কথা নয় এ সম্বন্ধে।

আচ্ছা ঠাকুমা, শুধু একটা কথা যদি বলো। তুমি যার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করলে, সে কি যে টাকাটা একদিন ঋণ বলে গ্রহণ করেছিল, তোমাকে কি ফেরত দিয়েছিল ?

জানি না, যা—বলিবামাত্র শঙ্খঘণ্টাধ্বনি হইল। ঠাকুমা উঠিয়া পড়িলেন, তোমার সঙ্গে বকবক করতে গিয়ে আরতির সময় হয়ে গেল।

তিনি বেশ একটু আগাইয়া গেলে বলিলাম, আমি কি দেখতে আসতে পারি ? তোমার ঠাকুরকে নমস্কার করব।

একটু থেমে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ এসো ভেতরে, ঠাকুর নমস্কার করবে যখন।

আসলে যার বাহিরের পোশাকে কোথাও কোন ত্যাগের চিহ্ন দেখি নাই, তার ভিতরটা কেমন দেখার কৌতূহল ছিল আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। জানিতাম, ঠাকুর নমস্কার করিতে চাহিলে কোন মানুষই না করিতে পারে না!

ভিতরে ঢুকিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা মহল এটা। ওই সাধুদের আখড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। মস্ত উঁচু পাঁচিল দিয়া পৃথক করা ঠাকুমার ঐ নিজস্ব মহলে কিন্তু কোথাও কোন বিলাসব্যসনের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। অতি সাধারণভাবে সাধু-সন্ন্যাসীদের মতই তিনি বাস করেন, যদিও ঘর সবসুদ্ধ চারটি।

ঠাকুরঘরটি একেবারে মাঝখানে। তিনি প্রথমেই শোবারঘরে গিয়া ঢুকিলেন। তারপর একটা কমণ্ডলু হইতে গঙ্গাজল লইয়া দুহাত ধুইয়া ঠাকুরঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

আমি ঠাকুরঘরের দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইতে দেখি, একটি বুড়োমতন চাকর তখনো ন্যাতা দিয়া ঠাকুরঘরের মেঝেটা মুছিতেছে। সামান্যই বাকী ছিল অবশ্য। সেটুকু মোছা হইয়া গেলে ঠাকুমা ভিতরে ঢুকিয়া ঠাকুরের সিংহাসনের সামনে যে আসন পাতা ছিল তাহাতে বসিলেন। সিংহাসনের উপর দেখিলাম ছোট্ট একটি সোনার নাড়ুগোপাল মূর্তি, চকচক করিতেছে। চারিদিকে ফুল দিয়া সাজানো। চাকরটি ধূপ জ্বালিয়া পাশে রাখিয়া দিল।

ঠাকুমা কোশাকুশি হইতে একটু জল হাতে লইয়া আগে আচমন করিয়া তারপর ফুলবিল্বপত্র লইয়া মন্ত্র পড়িয়া সেই মূর্তির উপর ছুঁড়িয়া দিতে লাগিলেন। পূজা শেষ হইলে চোখ বুজিয়া কয়েক মিনিট জপ করিলেন। চাকরটি তখন একটি রূপার থালায় কিছু মিষ্টান্ন ও তাহার পাশে রূপার

গ্লাসে জল রাখিয়া গেল। জপের পর ঠাকুমা আরতি করিলেন, ঠাকুরকে মাথা নীচু করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমিও দু'হাত জোড় করিয়া প্রণাম সারিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, নাড়ুগোপালের মূর্তি না?

তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। গুরুমহারাজজী এটি আমায় দিয়েছেন নিজে হাতে করে। তিনি আদেশ দিয়েছেন নিজে হাতে এর সেবা করতে। গুরুজী বলেছেন অনেক সন্তানের মা হলেও তুমি বাৎসল্য-স্নেহের স্বাদে বঞ্চিত। তাই শিশু-সন্তানের মত এর সেবা করলে সে অভাব তোমার মিটবে। তখন পূর্ণ মাতৃত্বে তুমি অভিষিক্ত হবে।

আমি বাহিরে আসবার জন্য পা বাড়াইয়াছি, চাকরটি একটি থালায় করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ আনিয়া আমার হাতে দিল।

প্রসাদ খাওয়া শেষ হইলে, একটি লম্বা মোরাদাবাদী গ্লাসে করিয়া জল লইয়া আসিল।

আমি জল খাইলে, সেই এঁটো গ্লাস ও থালাটা লইয়া চাকরটি ভিতরে পাতকুয়াতলায় ধুইতে লাগিল, আমি চলিয়া আসিলাম।

॥ ছাব্বিশ ॥

ধর্মশালা সর্বসাধারণের জন্য। সেখানে কখন কে আসে যায় থাকে—কে কার কড়ি ধারে!

সেদিন বিকালে ঘরে চাবি দিয়া কয়েক পা যাইতেই দেখি এক ভদ্রলোক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন উঠানের একপাশে। আমাকে দেখিয়া দ্রুত পা চালাইয়া আমার সামনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি বাঙালী?

উত্তর দিলাম, দেখে কি মনে হয়?

মাপ করবেন। আজই আমি এখানে এসেছি। এর আগে হরিদ্বারে কখনো আসিনি। রাস্তায় বাঙালী মনে করে দু'একজনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে খুব অপ্রস্তুত হয়েছি।

হাসিয়া ফেলিলাম।—এখানে অন্তত সে ভুল হবার আর কোন সম্ভাবনা নেই।

ভদ্রলোক হয়ত প্রৌঢ় কিন্তু এমন আঁটসাঁট দেহের বাঁধুনি যে খুব বেশী ছত্রিশ কি সাঁইত্রিশ বলিয়া মনে হয়। যা হউক এবার তিনি বলিলেন, আপনি এখানে অনেকদিন আছেন শুনে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এলুম। আচ্ছা বলতে পারেন, এখানে স্বামী সর্বানন্দর আশ্রম কোথায়?

এবারে তো মুস্কিলে ফেললেন। সাধু-সন্ন্যাসী তো এখানে এক-আধজন থাকেন না, এ যে সাধু-সন্ন্যাসীদের আড়ৎ! সারা ভারতে যেখানে যত সাধক সম্প্রদায় আছে, প্রায় প্রত্যেকের আস্তানা এখানে। হাতেপায়ে গুণে শেষ করতে পারবেন না, ধারাপাতের সটকেতে অর্থাৎ শতকিয়ায় কুলোবে না,

নাম্‌তায় গিয়েও থৈ পাবেন কিনা সন্দেহ!

বলেন কি? বিস্ময় তাঁর দুই চোখে।

হ্যাঁ, আপনি তো সবে আজ এসেছেন, দেখুন ঘুরেফিরে, তখন মিলিয়ে নেবেন আমার কথা! এ জায়গার নাম স্বর্গদ্বার। এদিকে হরিদ্বার থেকে কন্‌খল ওদিকে লক্ষ্মণঝুলো পর্যন্ত যত দূর যাবেন কেবল মঠ আর মন্দির। আর গেরুয়া, জটাধারী, নেড়ামুন্ডী, কৌপীনধারী, ছাই-ভস্ম-মাখা দেহ দেখতে দেখতে আপনার চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

ভদ্রলোক আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, না না, আমি যাঁর কথা বলছি তিনি তান্ত্রিক মহাসাধক।

বলিলাম, হাঁ হাঁ, এখানে অনেক মহাসাধক দেখলুম মশাই এ ক'মাসে। কারুর সঙ্গে কারুর কথা মেলে না। একজন বলে যদি দক্ষিণে যাও, আর একজন বলে উত্তরে, কেউ বলে 'দেখা হোগা', কেউ বলে 'হোগা নেই'। আমি মশাই এদের কাউকে বিশ্বাস করি না। যদি সত্যিকারের সাধু হয়, তাহলে তাদের কথার মিল একজনের সঙ্গে আর একজনের হবে না কেন?

একটু থামিয়া আবার কহিলাম, একদিন আপনার মত আমিও এখানে এসেছিলুম অনেক আশা বুকে নিয়ে, মহাসাধক সন্ন্যাসীদের নিশ্চিত সাক্ষাৎ পাবো বলে। কিন্তু এখন দেখছি 'অল্ বোগাস্'। সব বাজে মার্কা। তবে হ্যাঁ, আসল যাঁরা সত্যিকারের সাধু তাঁরা পাহাড়ের গুহা-গহ্বর থেকে বাইরে আসেন না। সেখানেই সাধন ভজন তপস্যা করেন। আর বাকী যা সব এধার ওধার দেখছেন, বেশীর ভাগ পেটভুখা!

ভদ্রলোক খপ করিয়া দু'হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, দেখুন সাধু-সান্ন্যাসী কার মধ্যে কি আছে, বাইরে থেকে তা বোঝা যার তার কর্ম নয়, তার জন্যেও মনে ধর্ম-বিশ্বাস থাকা চাই।

বলিলাম, আপনি যাই বলুন মশাই, আমরা একালের ছেলে, কিছু বিদ্যে-সিদ্যে আছে পেটে. হাতেকলমে প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু বিশ্বাস করতে নারাজ।

তিনি বলিলেন, জানি না আপনার এত অবিশ্বাসের কারণ কি, তবে—

তবে আসল কথাটা বলি শুনুন। চলুন, আপনি তো বেড়াতে যাচ্ছেন, আমার সঙ্গে চলুন কন্‌খলের দিকে আমি যাবো, ওদিকটা আপনাকে চিনিয়ে দিই। অনেক সাধু-সান্ন্যাসীদের মঠ, আখড়া ওদিকে রয়েছে। যেতে যেতে গল্প করা যাবে।

হাঁ হাঁ, তাহলে তো খুবই ভাল, চলুন।

রাস্তায় বাহির হইয়া আমি বলিলাম, আরে মশাই, হাতীঘোড়া কিছুই নয়, তাহলে আপনাকে সত্যি কথাটা বলি, আসলে আমি একটি মেয়েকে খুঁজতে বেরিয়েছি, কোথায় যে সে চলে গেছে, বেঁচে আছে কিনা, এটাই জানতি চাই। কিন্তু এক-জনকে এক এক রকম বলতে শুনলে কি তাদের ওপর বিশ্বাস থাকে

—কে আসল আর কে নকল সাধু বলুন তো?

ভদ্রলোক এবার কপালে দু'হাত জোড় করিয়া ঠেকাইয়া বলিলেন, আমি যার কথা বলছি, স্বামী সর্বানন্দ, তিনি তান্ত্রিক সিদ্ধ মহাযোগী, তিনি ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারেন। এমন কি ইচ্ছে করলে মৃত ব্যক্তিকেও চোখের সামনে এনে দেখাতে পারেন!

বলেন কি? এ যে বিশ্বাস হয় না?

বিশ্বাস না করার মতই কথা কিন্তু যাঁরা প্রকৃত মহাযোগী তাঁরা ইচ্ছা করলে সব পারেন।

বলিলাম, যে মানুষ এ পারেন, তাঁর ঘরে তো টাকা রাখার জায়গা হবে না মশাই!

ভদ্রলোক বলিলেন, সব চেয়ে বড় কথা তিনি কারুর কাছে কোন টাকা-পয়সা নেন না। স্রেফ একটা হরতুকী তাঁর দক্ষিণা।

হঠাৎ আমার শান্তির কথা মনে হইল। বলিলাম, আচ্ছা আমি যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তীর্থে তীর্থে তার খবরটা যদি আপনি দয়া করে একটু জেনে দেন।

ভদ্রলোক বলিলেন, ছি ছি, আমাকে ওকথা বলবেন না। আমি দয়া করার কে? আপনি নিজে গিয়ে তাঁর কাছে আপনার প্রার্থনা জানাবেন—যদি আপনার ওপর তাঁর দয়া হয় তো তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শন পাবেন।

বলিলাম, আচ্ছা দেখছি, কাল থেকে আমিও তাঁর সন্ধান করতে বেরুবো। কিন্তু যিনি এত বড় মহাসাধক, তাঁর কথা এতদিন এখানে রয়েছি, শুনিনি তো কারুর মুখে। চুপি চুপি আমি এখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে ঘুরেছি।

ভদ্রলোক বলিলেন, তিনি একবারে কোনরকম প্রচার পছন্দ করেন না, শুধু তাঁর ভক্তশিষ্য ছাড়া আর কেউ তা জানে না। তিনি বাঙ্গালী, আগে ছিলেন নবদ্বীপে। বয়স এখন অনেক হয়েছে, কিন্তু তাঁর গুরু দেহরক্ষা করলে, তাঁর ইচ্ছানুসারে সর্বানন্দ বাবা, এই আসনের উত্তরাধিকারী হন। তিনি যখন তারাপীঠে সিদ্ধিলাভ করেন, সেই সময় প্রথম আমার বাবা-মা তাঁর কাছে দীক্ষা নেন, তারপর থেকে আমাদের বংশের অনেকে তাঁর কাছে দীক্ষা নেন।

কি বললেন, তারাপীঠে সিদ্ধিলাভ করেন?

হাঁ, আপনি হঠাৎ তারাপীঠের নাম শুনে এমন ভাবে শিউরে উঠলেন কেন?

বলিলাম, না, থাক। সেসব কথা আপনাকে বলা উচিত হবে না।

না না বলুন না? ব্যাপারটা কি শুনলে কোন দোষ নেই!

তাহলে আমার কোন অপরাধ নেবেন না মশাই। আমি আপনার গুরুদেবের বা ওই তীর্থস্থানের নিন্দা করছি না। ধর্মের নামে যে কি ব্যভিচার চলছে, সেই কথাটাই বলছি। আমি মশাই যে মেয়েটির কথা বললুম, তার খোঁজে ওখানে গিয়ে এক দুষ্টচক্রের পাল্লায় পড়েছিলুম। আমায় একজন

বললে, এদিক ওদিক মিছিমিছি ঘুরে মরবেন কেন? তার চেয়ে ওখানে এক সিদ্ধ ভৈরব এসেছেন, তিনি নাকি ভূত ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারেন, তাঁর কাছে চলে যান।

সেইমত গিয়েছিলুম। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি যে তাঁর নাম করে তাঁর চেলাচামুণ্ডারা এরকম বীভৎস আচরণ করতে পারে। ছি ছি মশাই, সেসব কথা মুখে উচ্চারণ করতে ঘেন্না করে। গুরুর কাছে যাবার আগেই তাঁর চার-পাঁচজন চেলা এসে আমায় ঘিরে ধরলে। যেমন পুরীর মন্দিরে পুজো দিতে গেলে পাণ্ডাদের পাল্লায় পড়তে হয়। যাহোক তখনি তারা নিজেদের মধ্যে আপোসে স্থির করে ফেললে, আমি কোন্ পাণ্ডার ঘরে থাকবো। আমার আসার উদ্দেশ্য আগেই তাদের বলেছি, তারাও আমায় আশ্বাস দিয়েছে, বাবার কাছে নিয়ে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে দেবে। তবে তার জন্যে অবশ্য তেরাত্তির সেখানে কাটাতে হবে। তৃতীয় দিন অমাবস্যা, সেদিন শ্মশানে মাঝরাতে ভৈরব বাবা জ্বলন্ত চিতার সামনে পুজোয় বসবেন, তারপর ভোর হলে তাঁর কাছে নিয়ে গেলে তখন তাঁর মুখ দিয়ে যে কথা বেরুবে, তা নাকি একেবারে অব্যর্থ সত্য!

ওদের মধ্যে যিনি আমায় বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুললেন, তাঁর বয়স হয়েছে, পাকাদাড়ি একগাল, মাথায় একবোঝা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাকা চুল। ঘরে ঢুকেই তিনি ডাকলেন, ও মা, হাত-পা ধোয়ার জল আগে দিয়ে যাও, তারপর বাবুর বিছানা বাইরের ঘরে পেতে দাও।

যাচ্ছি বাবা, এখনি ভাতের ফ্যানটা গেলে!

একটু পরে জলের গাড়ু ও গামছা দিতে এলো একটি তরুণী যুবতী, বয়েস উনিশ-কুড়ির বেশী হবে না, রংটা কালো কিন্তু সারাদেহে যেন যৌবন উছলে পড়ছে। তাকে দেখিয়ে লোকটি বললে, ইনি আমার শক্তি—আপনার দেখাশুনা সেবা সব উনিই করবেন। যখন যা আপনার দরকার ওঁকে বলবেন, লজ্জা করবেন না।

যাই হোক, তারামায়ের মন্দিরে গিয়ে দর্শন করে, পুজো দিয়ে তারপর লোকটি বাড়ীতে মায়ের ভোগ এনে খাওয়ালে। ওদিকে তাঁর শক্তিও সারাদিনে বারকতক চা তৈরী করে আমায় খাওয়ালেন। কিন্তু রাত হলে খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার জন্য ব্যবস্থা করছি, লোকটি এসে বললে, বাবু পঁচিশটি টাকা দিতে হবে?

কি জন্যে?

আজ্ঞে কারণ সেবার জন্যে। আমি একা নয়, আমরা পাঁচজনে সেবা করবো —আগে মা-তারাকে ভোগ দেবো তারপর প্রসাদ পাবো আমরা। আপনি প্রসাদের ভাগ পাবেন।

কারণ অর্থাৎ মদ। বলিলাম, আপনারাই খান ও প্রসাদ। আমার দরকার হবে না।

লোকটি বলিল, না, কলকাতা থেকে আপনাদের মত সব ছোকরা বাবুরা আসে মাঝে মাঝে, আমাদের সঙ্গে সামনে প্রসাদ খান।

থাক ওসব বাজে-কথা। মোট কথা আসল যে ভৈরব তাঁকে একবার দর্শন করবো যখনই বলি, তখনি লোকটি বলে, এখন কারো সঙ্গে দেখা করেন না। তিনি দূরে বনের কাছে একটা কুঁড়েঘরে থাকেন।

এমনি করে দ্বিতীয় রাত্রে আবার এসে পঁচিশটি টাকা চেয়ে নিয়ে গেল, কারণ ভোগের জন্য।

শেষে অমাবস্যার দিন এসে বললে, একশোটি টাকা চাই। আজ রাতদুপুরে মহাশ্মশানে চক্র বসবে, তার জন্যে কারণ অন্তত পেটভরে খাওয়ার নিয়ম। বললুম, আপনার ভৈরববাবা একলা খাবেন তো? তার জবাবে লোকটা অদ্ভুত ধরনের হাসি হেসে বললে, না, চক্র কি একা হয়! সেখানে আরো অনেকে থাকবেন।

যাকগে মরুকগে! আজই তো শেষ। কাল ভোরে চলে যাবো ভৈরবের কথা শুনে।

গভীর রাত। বিছানায় শুয়ে কিছুতেই ঘুম হচ্ছে না। 'বল হরি হরি বোল' ধ্বনি অস্পষ্ট হলেও শ্মশানের দিক থেকে কানে এলো। ভাবলুম তাহলে লোকটা যা বলেছে সব সত্যি! শ্মশানে মড়া এসেছে। চিতার সামনে বসে ভৈরব চক্রে বসবেন।

খুব তেষ্টা পেয়েছিল, এক গ্লাস জলের জন্যে উঠে লোকটিকে যেই ডেকেছি, একটা ছেলে পনেরো-ষোল বছর বয়েস হবে, শুয়েছিল বাইরের দাওয়ায়, বললে, বাবু ওনারা তো কেউ ঘরে নেই।

কোথায় গেল এই রাত্রে?

আজ্ঞে, শ্মশানে গেছেন।

শ্মশানে গেছে? কেন?

আজ ওখানে ভৈরববাবার পুজো হবে মহাধুমধাম করে, চক্র বসবে। বলেই ছেলেটি বললে, বাবু রোজ আপনি ওদের এত টাকা দেন মদ খেতে, আমি সব এনে দিই কিন্তু একফোঁটা আমায় পেসাদ দেয় না!

তুই মদ খাস নাকি? এইটুকু ছেলে!

আজ্ঞে মদ আমরা সবাই খাই। আমার ছোট ভাইয়ের বয়েস পাঁচ বছর, সেও খায়। মা-বাবা সবাই খায়।

তোর বাড়ি কোথায়, তুই এখানে কি করিস?

আজ্ঞে এখানে এঁদের চাকরি করি। আমার বাড়ি এখান থেকে এক ক্রোশ পথ। বাবু, আমায় দুটো টাকা দেবে?

এখন টাকা নিয়ে কি করবি?

আজ্ঞে মদ খাবো একটু—অনেকদিন খাইনি।

এই রাত্রে মদ কোথায় পাবি?

আজ্ঞে এখানেই পাবো। পাঁচু মোড়লের বাড়িতে। আপনি ক' বোতল চান বলুন, এখুনি এনে দিচ্ছি।

না, আমি কিছু চাই না। দেখ তোকে দু'টো টাকা দেবো এখনি, যদি তুই শ্মশানে যেখানে চক্র হচ্ছে আমাকে নিয়ে যাস!

সেখানে যাওয়া একেবারে নিষেধ! দেখতে পেলে আর রক্ষা থাকবে না। আমার চাকরি এখনি চলে যাবে।

আচ্ছা তোকে আর দু'টো টাকা বকশিশ করবো, যদি নিয়ে যেতে পারিস?

নিয়ে যাবো, কিন্তু কাছে নিয়ে যেতে পারবো না। একটু তফাতে একটা আস্‌শেওড়া গাছের জঙ্গল আছে, তার আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকতে হবে।

বেশ তাই চল।

আশ্চর্য হয়ে গেলুম। চিতার আগুন তখন প্রায় নিভে এসেছে। অন্ধকারে সেই অস্পষ্ট আলোতে দেখি ইয়া জটাধারী ভৈরব মাঝখানে বসে আছেন, তাঁকে ঘিরে বসে আরো পাঁচজন। মদের বোতল তাঁদের চারপাশে। একটু পরে এক-জন ভৈরবী এসে ভৈরবের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর কাপড়চোপড় সব খুলে ফেলে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ালেন। ভৈরব তখন চন্দনবাটা নিয়ে কোমর থেকে তাঁর নিম্নাংগ সব পায়ের আঙুল পর্যন্ত মাখিয়ে, জবাফুলের মালা তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়ে দু'হাত ভরে ফুলবিল্বপত্র নিয়ে তাঁকে পুজো করতে লাগলেন, দেবী প্রতিমার মত। তারপর পুজো শেষ হলে ভৈরব তাঁর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতেই সঙ্গে সঙ্গে চক্রের আরো পাঁচজন ঘাড় হেঁট করে প্রণাম করলে। তখন সেই অবস্থায় ভৈরবী গিয়ে ভৈরবের কোলের ওপর ধীরে ধীরে বসলেন। তখন এক-একজন করে মেয়ে আগের মত উলঙ্গ হয়ে এসে বাকী পাঁচজনের সামনে দাঁড়াতে একই ভাবে তাদের দেহে চন্দন মাখিয়ে ফুলবিল্বপত্র দিয়ে পুজা করে প্রণাম করার পর, তারা একে একে সেই পাঁচজন পুরুষের কোলে উলঙ্গ মূর্তিতে গিয়ে বসলো। চিতার আগুন তখন একেবারে নিভে গেছে।

ছোকরাটা চুপি চুপি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে, বাবু শিগ্‌গির পালিয়ে চলুন, ওই দেখুন এদিকে যেন কে একজন আসছে। চলুন, শিগ্‌গির বনের মধ্যে ঢুকে পড়ুন, আমি চুপি চুপি আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাবো।

আমি যে লোকটির বাড়িতে উঠেছিলুম, তাকে ও তার সেই শক্তিকে ওই অস্পষ্ট চিতার আলোতে দেখেই চিনতে পেরেছিলুম। অন্য মেয়েদের ঠিক চিনতে না পারলেও, সকলেরই বয়েস বেশী, ওর মত তরুণী যুবতী কেউ নয়।

পরদিন ভোরে রক্তচক্ষু নিয়ে লোকটি বাড়ি ফিরলে আমি বললুম, চলুন, এবার ভৈরববাবার কাছে যাওয়া যাক।

সে বললে, না, হবে না। এ চক্রে কি নাকি বাধা পড়েছে। আবার এক মাস পরে এমনি অমাবস্যায় আসতে হবে।

আমি সেই যে চলে এসেছি আর যাইনি।

সত্যি কথা বলতে, তান্ত্রিক শুনলেই আমার মনটার মধ্যে সেই বীভৎস বামাচারের কথা মনে পড়ে যায়।

ভদ্রলোক এতক্ষণ মন দিয়া সব শুনিতেছিলেন। বলিলেন, আপনি কতগুলো ভণ্ড শয়তানের পাল্লায় পড়ে গিয়েছিলেন। সব তীর্থক্ষেত্রেই তো আজকাল ধর্মের দোহাই দিয়ে কত না নোঙরামি হচ্ছে!

আসলে তন্ত্রসাধনা অত্যন্ত কঠিন এবং উচ্চকোটি সাধক ছাড়া এ পথে সিদ্ধিলাভ দুরূহ, তপস্যা ছাড়া সম্ভব নয়। আমার কাছে তন্ত্র সম্বন্ধে কিছু বই আছে, আপনাকে পড়তে দেবো, পড়লে বুঝতে পারবেন।

॥ সাতাশ ॥

কথা ছিল পরদিন সকালে আমি সেই ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া খুঁজিতে বাহির হইব, কোথায় কোনদিকে তাঁর গুরু সেই তান্ত্রিক সাধকের আশ্রম! ভদ্রলোক নতুন আসিয়াছেন, পথঘাট কিছুই চেনেন না বলিয়া যে আমি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই ভাবে নিঃস্বার্থ পরোপকার করিতে আগ্রহী হইয়াছিলাম বলিলে মিথ্যাকে গোপন করা হয়। আসলে আমার স্বার্থটা এখানে বোধ হয় তাঁর চেয়েও বেশী। কারণ আমি সঙ্গী হইলেও আজ কি কাল, পরশু—একদিন না একদিন তিনি গুরুর আশ্রম খুঁজিয়া পাইবেন নিশ্চয়।

কিন্তু আমার সাহায্যে যদি তিনি আশ্রম খুঁজিয়া পান তা হইলে স্বভাবতই আমার প্রতি একটু কৃতজ্ঞতাবোধ করিবেন এবং আমার উদ্দেশ্য তাতেই সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ আমার জন্য তিনি গুরুদেবকে একটু বলিবেন যাতে শান্তিকে একেবারে চাক্ষুষ দেখিতে পাই—কোথায় কি ভাবে সে আছে। তখন আর আমায় পায় কে? একেবারে সোজা এখান হইতে পাড়ি জমাইব তার কাছে।

সারারাত এমনি সব আরো কত কল্পনা করিতে গিয়া রাত্রে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারি নাই। কতক্ষণে সকাল হইবে—এই চিন্তায় বারে বারে ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। আবার ঘড়ি দেখিয়া শুইয়া পড়িয়াছি।

তাই সকাল হইবামাত্র তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সারিয়া যখন প্রস্তুত হইতেছি, এমন সময় ভদ্রলোক হঠাৎ আসিয়া হাজির হইলেন।

বলিলাম, এই যে আমার হয়ে গেছে দাদা, একটু বসুন। জামাকাপড়টা বদলে নিই।

আমার কথা যেন ভদ্রলোকের কানে ঢুকিল না। তিনি খপ্ করিয়া তাঁর চাদরের ভিতর হইতে খানকয়েক বই বার করে আমার হাতে দিয়া বলিলেন, এগুলো আপনাকে দিতে এলুম—একটু উল্টেপাল্টে দেখবেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন, তন্ত্রসাধনা একটা ছেলেখেলার জিনিস নয়, কত উচ্চস্তরের ও কত কঠিন এর সাধনপ্রক্রিয়া।

বইগুলির নাম দেখিয়াই আমার শরীর ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। তাড়া-

তাড়ি তাঁর হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম, দাদা, এত বড় শাস্তি কেন আমায় দিচ্ছেন ভাই, আমি তো আপনাদের ধর্মের কোন নিন্দা করিনি বা কারুর প্রতি কোন কটাক্ষপাতও করিনি। ওইরকম মহাতীর্থে তন্ত্রসাধনার নামে কতকগুলো ঠগ, ভ্রষ্টাচারী যে ব্যভিচার ও নোঙরামি করে চলেছে, আমি শুধু সেইটাই আপনাকে জানিয়েছি।

তিনি বলিলেন, সেইজন্যেই তো এই বইগুলো আপনাকে একটু পড়ে দেখতে বলছি। এতে ভয় পাবার মত কিছু নেই, খুব সহজ বাংলায় সব ব্যাখ্যা দেওয়া রয়েছে, দেখুন না?

দু'হাত জোড় করিয়া বলিলাম, দোহাই দাদা, মাপ করুন। ওই বইগুলোর নাম পড়েই আমার যাকে বলে, 'আত্মারাম খাঁচাছাড়া'। আগমসার, নিগমসার আর একটা যেন কি তন্ত্রসার।

শেষ বইটার নাম করামাত্র তিনি বইটার একটা পাতা খুলিয়া ফেলিলেন, দেখুন ওই মদ সম্বন্ধে কি নির্দেশ আছে তন্ত্রসাধনায়—

বলিলাম, রক্ষা করুন দাদা, আমি পড়তে চাই না। তার চেয়ে আপনি বরং মুখে বলুন শুনছি। আপনি যখন এই ধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন, এ সম্বন্ধে অনেক কিছু নিশ্চয় পড়াশুনা আছে!

তিনি বলিলেন, অনেকেই কিছু না জেনেশুনে যখন তন্ত্র সম্বন্ধে কদর্থ করেন তখন শুনলে গা জ্বলে যায়; সত্যি খুব রাগ হয় মনে।

তাই বলে আমার ওপর কিন্তু সে রাগ ঝাড়বেন না দাদা—আমি আপনাদের ধর্ম নিয়ে বদর্থ করিনি, বরং যারা এ নিয়ে ব্যভিচার করছে, তাদের সম্বন্ধে আপনার কাছে নালিশ জানিয়েছি।

আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, যদিচ তন্ত্রসাধনা বলতে পঞ্চ 'ম'কারের সাধনা বোঝায়, অর্থাৎ মদ মাংস মাছ মুদ্রা মৈথুন এবং এই মদই সাধনার প্রধান অঙ্গ, তবু সকল ধর্মশাস্ত্রের মত এরও একটা নিয়ম-পদ্ধতি আছে। সত্যি মদের অনেক গুণ। প্রথমত এতে নষ্টস্বাস্থ্য উদ্ধার করে, শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখে, পরিশ্রম করতে সাহায্য করে, মনে সাহস এনে দেয়। তাই মদকে বাদ দিলে চলে না। তন্ত্রসাধনা করতে গেলে। এ সব-গুলোই মানুষের প্রয়োজন হয়। বিশেষত বীরাচারের সময়, যখন, একা ঘোর অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে শবসাধনা করতে বসে তখন যাতে মনে কোন ভয় না আসে, শরীরে কোন জড়তা না থাকে, বরং মনকে সাধনার প্রতি একাগ্র ও উন্মুখ করে তোলে—মদের যে অনেক গুণ, নিশ্চয় জানেন?

এই বলিয়া সেই বইটা মুড়িয়া আবার বলিলেন, তবে একটা কথা শুনলে বিস্মিত হবেন যে, এই তন্ত্রসাধনার জন্যে মদ বা 'কারণ' সেবারও কি বিধি-নিয়ম শাস্ত্রে আছে। মানে তার পরিমাণ যে কতটুকু কেউ জানে না। আসলে গলদ সেইখানে।

তার মানে ঠিক কি বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি না তো দাদা।

হ্যাঁ। সেই কথাটা বলার জন্যে তো বইটা এনেছি। এই দেখুন!

বলিলাম, আহা, আবার বইটই কেন? এই তো বেশ হচ্ছে দাদা—বেশ বুঝতে পারছি। মুখে বলুন।

পাছে আমার মুখের কথা বিশ্বাস না হয় তাই এইটা এনেছিলুম, 'কারণ সেবা' কাকে বলে পড়ে দেখতে। জানেন কি ছোট্ট চায়ের চামচের এক চামচেতে যতটুকু মদ ধরে, তন্ত্রসাধনায় তার নাম এক পাত্র! তবে অধিকারী ভেদে এই মাপ চলে। তিন, চার, পাঁচ বা সাত পাত্র! ব্যাস্, এই সাত পাত্রই হলো তন্ত্র সাধনার পূর্ণ পাত্র! তাহলে বুঝতে পারছেন, মোট মদের পরিমাণ কত-টুকু? এর দ্বারা কি কেউ মাতাল বেহেড হয়ে ব্যাভিচার করতে পারে—না করা সম্ভব?

আমি তো একেবারে অবাক! বলেন কি দাদা!

দেখুন তন্ত্রসাধনার কথায় কি লেখা রয়েছে। বলিয়া আবার পৃষ্ঠা খুলিতে যাইতেছিলেন। আমি হাত জোড় করিতে তিনি নিবৃত্ত হইয়া বলিলেন, এই মদের সঙ্গে তেমনি একটু মাছ ও মাংস সেবার নির্দেশ আছে, পাছে শুধু মদ খেলে শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে যদি কেউ একটা গোটা পাঁঠা বা বড় একটা মাছ আস্ত খেয়ে ফেলে তাহলে বদহজম, ভেদবমি তো হবেই, তাকে রুখবেন কি করে? এর সঙ্গে অপরিমিত মদ যথেচ্ছ চালালে কি আর সাধনায় মন যায়! বিশেষ করে শেষের দুটিতে মুদ্রা আর মৈথুনের ক্ষেত্রে—শক্তি বা উত্তরসাধিকা ছাড়া যা হয় না! তাই সেখানে এসেই একেবারে সব গেঁজে যায়। তখন দৈহিক ভোগলালসায় এমন উন্মত্ত হয়ে ওঠে যে তাদের এই সব কু-ক্রিয়ার ফলেই তন্ত্রমন্ত্র সব একেবারে রসাতলে চলে গেছে।

একমাত্র উচ্চকোটি সাধক ছাড়া মায়ের কৃপালাভে ধন্য হতে পারে না। এখন তাই কৌল তান্ত্রিকসাধক নেই বললেই হয়। কদাচিৎ তেমন মহাপুরুষের দর্শন মেলে!

আমাদের গুরুদেবের মুখে শুনেছি, তাঁর গুরুদেব তাঁর আমল থেকেই তন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন যে প্রথম প্রথম তন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে দু'চার দিন একটু নিয়ম মেনে সাধনা করে, তারপর সব ভুলে গিয়ে শুধুই গুচ্ছের মদ আর নারীদেহে আকণ্ঠ ডুবে থাকে। তাই তিনি শুধু কালীমন্ত্র দিয়ে ছেড়ে দিতেন। আমাদের গুরুদেবও তাই করেন।

আসলে কি জানেন, এই তন্ত্রসাধনা তো মন্ত্রমূলক নয়—ক্রিয়ামূলক। নরনারীর মিলন ছাড়া সম্ভব নয়। তাই তন্ত্রসাধনা এত গুহ্য গোপনীয়। এ অতি কঠোর ও কঠিন তপস্যা। অনুভূতি-গ্রাহ্য যাকে বলে 'হৃদয় অনুভব'।

অর্থাৎ এ কেবল দৈহিক মিলন নয়, এ অতি উচ্চস্তরের সাধনা—নারী-দেহের মধ্যেই যার কামনার লয় ও পূর্ণ ব্রহ্মত্ব লাভ।

স্বয়ং শিব এ সম্বন্ধে পার্বতীকে কি বলেছেন শুনুন—বলিয়া তিনি একটা

বই খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন—"মৈথুনং পরমং তত্ত্বং..."

থাক থাক, দাদা। ওই মৈথুন তত্ত্ব—বলিয়া দুই হাত জোড় করিতেই 'ওঃ স্যারি' বলিয়া তিনি জিব কাটিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, ওহো আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম ভাই যে আপনি ব্যাচিলার। এখনো বিয়ে-থা করেন নি। মাপ করুন, বিবাহিত ছাড়া এই তন্ত্রশাস্ত্রে অন্যের যে প্রবেশাধিকার নেই, এটা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম। কিছু মনে করবেন না ভাই।

না না—কিছু মনে করিনি। ভালোই হলো আপনি অনেক জ্ঞান দিলেন। যেসব কথা কখনো আগে শুনিনি আপনার মুখে তাই শুনলুম। আচ্ছা দাদা, অনেক দেরি হয়ে গেছে এবার তাহলে চলুন বেরিয়ে পড়া যাক। আসলে আপনার কাজটাই যে প্রধান, গুরুদেবের আশ্রমের সন্ধান, আজ যত বেলাই হোক না করে ফিরবো না।

হ্যাঁ, প্রতিজ্ঞা করেছেন। বেশ বেশ ভাই, তাহলে বড় ভাল হয়। চলুন।

রাস্তায় বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে প্রশ্ন করিলাম, আচ্ছা দাদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো? হঠাৎ এই নূতন বইগুলো আপনি কোথায় পেলেন? আপনার গুরুদেবের কি আদেশ আছে সব সময় এইসব বই সঙ্গে রাখতে হবে!

আরে না না রে ভাই। দেখছেন না একেবারে নূতন বই! আমি এখানে আসছি শুনে এক গুরুভাই লাস্ট মোমেণ্টে ট্রেন যখন ছাড়ো-ছাড়ো, ছুটতে ছুটতে এসে আমায় দিয়ে গেল বাবার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে।

তাই ভালো। আমি শুনে আশ্বস্ত হলুম।

ভদ্রলোক হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ, একটা কথা, এই প্রসঙ্গে আপনাকে বলতে ভুলে গেছি তন্ত্রসাধকরা কেবল উত্তরসাধিকাকেই মাতৃজ্ঞান করেন না, নারীমাত্রেই তাঁদের মা—সেখানে স্ত্রী, কন্যা, আপন-পর কোন ভেদ নেই। আমাদের গুরুদেব বলেন, মানুষ কথাটার গোড়াতেই প্রথম অক্ষরই তো 'মা'—এই মা থেকেই তো মানুষের উৎপত্তি। আহা, এত বড় এমন গভীর তত্ত্বকথা কত সহজে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন বলুন তো? জগতের আর কোন মহাপুরুষ এত বড় কথা মুখ দিয়ে বলেছেন কিনা সন্দেহ।

বলিয়া গুরুর উদ্দেশে দু'হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, জানেন তান্ত্রিকদের মহাতীর্থ তারাপীঠে তারামায়ের যে মূর্তি আপনি দেখেছেন সেটা কিন্তু আসল নয়। বাইরের লোক অনেকেই জানে না সেকথা। ওই মূর্তির তলায় সেটি গোপনে রাখা আছে। ছোট্ট পাথরের খোদাই করা মূর্তি। বহুকালের পুরনো তাই ক্ষয়ে গেছে। তবু এখনো স্পষ্ট বোঝা যায়, পার্বতীর কোলে বসে আছেন শিব আর সেই দেবাদিদেব মহেশ্বরকে তিনি তাঁর স্তন্যপান করাচ্ছেন। কাজেই যিনি মহাদেব তিনিও তাঁর ছেলে, আবার স্বামী।

আমি একথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম, তাই নাকি, বলেন কি?

হ্যাঁ, সেই জন্যেই তান্ত্রিকদের কাছে নারীমাত্রেই 'মা'। তাঁদের আরাধ্যা-

দেবী এই হরপার্বতীর ওই মূর্তিটাই ওর 'সিম্‌বল' বা রূপক।

ভদ্রলোকের যে ধর্মশাস্ত্রে এত পড়াশুনা আছে জানিতাম না। একটু থামিয়া আবার তিনি বলিলেন, জানেন গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে ঠিক এই রকমের কথাই বলেছেন ভগবান অর্জুনকে। আমি তোমায় "জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্‌" বলছি। শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান দিচ্ছি। বিশ্বটা কি ভাবে চলছে দেখ। এই বিশ্বের মূলে কে? একদিকে যোনি বা উদ্ভব স্থান জননী রূপিণী যিনি, তিনি হলেন মহৎ ব্রহ্ম। আর তার বীজপ্রদ পিতা হলাম আমি। আমারই সংকল্পে, আমারই ইচ্ছাতে এই বিশ্ব প্রসব করেছেন কে? সেই মহৎ ব্রহ্ম। মহৎ ব্রহ্ম মানে হচ্ছে ব্যাপক বিশাল প্রকৃতি, সেই পরমাপ্রকৃতি যিনি তিনি বিশ্বকে এই নানা রূপে বিবর্তিত করছেন প্রকাশ করছেন তাঁরই ইচ্ছায়।

এই ভাবে তার মুখে ধর্মবিষয়ের নানা কথা শুনিতে শুনিতে আমরা হাঁটিতেছিলাম। স্বামী সর্বানন্দজীর আশ্রমটা কোন দিকে নানা লোককে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অবশেষে সঠিক খবর পাইলাম এক ফুলওয়ালার কাছে। সে হর কী প্যারীর ঘাটে ফুল বিক্রয় করে। ফুলের ঝাঁকা লইয়া যাইতেছিল। তার ঘর ওই অঞ্চলে। সে বলিল, সোজা চলে যান চণ্ডীপাহাড়ে। তারপর খানিকটা ওপরে উঠে ডানহাতি যে পাকদণ্ডী মানে পায়ে চলা পথটা জঙ্গলের মধ্যে নেমে গেছে, তাই ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে ওই তান্ত্রিক মহাত্মার আশ্রম দেখতে পাবেন।

ফুলওয়ালা যা বলিয়াছিল সত্যি। তার নির্দেশমত পথে হাঁটিতে হাঁটিতে একসময় স্বামী সর্বানন্দজীর আশ্রমের দোরে আসিয়া হাজির হইলাম। বহু পুরনো একতলা বাড়ি। তিনদিকেই উঁচু পাহাড়। একটা পাহাড় হইতে ছোট্ট একটা ঝর্ণা নামিয়া গিয়াছে।

তিনি বলিলেন, দেখছেন তো, এদের কি রকম ভক্তি বাবার প্রতি। বাবার অনেক অলৌকিক কীর্তিকলাপ প্রচলিত আছে। তিনি এ সম্বন্ধে কি বলেন জানেন? তিনি বলেন, নাস্তিকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, তাদের মনে ঈশ্বর-বিশ্বাস জাগাবার জন্যে মাঝে মাঝে কিছু অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজন হয়।

মায়ের মুখে শুনেছি, বহু ভক্তের রোগকে নিজের দেহে টেনে নিয়ে তাদের ব্যাধিমুক্ত করে দিয়েছেন। তবে এইসব ক্রিয়া করতে গিয়ে গুরুদেবের শরীর কখনো কখনো এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যে তখন তাঁকে সামলাতে মায়ের প্রাণান্ত হয়। একাদিক্রমে হয়ত তিন-চার দিন একাসনে বসে পূজা হোম যাগযজ্ঞ করে চলেছেন তো চলেছেন, ঘুম নেই বিশ্রাম নেই, মুখে একফোঁটা জল পর্যন্ত দেন না। এইভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করেন তবু ভক্তদের বিমুখ করতে পারেন না। বলেন, ওরা তো আমার সন্তান, বিপদে পড়লে ওরা গুরুদেবের শরণাপন্ন তো হবেই। আমি তাদের একমাত্র ভরসা বিপদে-আপদে দুঃখে-শোকে।

আমি তো অবাক। যত শুনি, গুরু ব্রহ্ম ইত্যাদি স্তব, গুরু সম্বন্ধে তত বিস্ময় বাড়ে আর গুরুদেবের প্রতি আমার মন তত যেন আকৃষ্ট হইতে থাকে। মনে মনে মা-কালীকে ডাকি, তিনি যেন আমার প্রতি সদয় হন—আমার প্রার্থনা পূরণ করেন, শান্তির সঠিক খবর যেন তাঁর কৃপায় পাই। যেন চোখে তাকে একবার দেখতে পাই, কোথায়, কি ভাবে আছে সে! কতক্ষণে গুরুদেবের দর্শন পাই, তাঁর কৃপালাভ করি, মনের মধ্যে সেই তীব্র বাসনা চাপিয়া ভদ্রলোকের কথায় হুঁ হাঁ করিয়া সায় দিতেছিলাম।

জল বেশী নাই, সেইজন্য বোধ হয় ঝর্ণার কুলকুল ধ্বনি বেশী—ছোট ছোট উপলখণ্ডে ব্যাহত হইয়া যেন লাফাইতে লাফাইতে চলিয়াছে। পথে অনেকক্ষণ হাঁটিয়া তেষ্টা পাইয়া গিয়াছিল। ওই স্বচ্ছ জলধারা দেখিয়া তাই হাতে মুখে আগে ঠাণ্ডা জল দিয়া, তারপর আঁজলা ভরিয়া বেশ খানিকটা খাইলাম। ভদ্রলোক এতক্ষণ সমানে বকবক করিয়া বোধ হয় খুবই তৃষ্ণার্ত হইয়াছিলেন, তাই দুই আঁজলা ভরিয়া ঝর্ণার জল আমার চেয়ে অনেক বেশী খাইলেন। তারপর পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখটা মুছিতে মুছিতে বলিলেন, চলুন এবার ভেতরে যাওয়া যাক।

॥ আটাশ ॥

বাড়ির সামনে লম্বা পাঁচিলের গায়ে যে পুরনো রং-চটা দরজাটা বন্ধ ছিল, হাত দিয়া ঠেলিতেই তা খুলিয়া গেল। আমরা দুজনে তখন ঢুকিয়া পড়িলাম। ভিতরে অনেকখানি বাগান। সামনেই কিছু ফুলের গাছ। জবা, গোলাপ, গন্ধরাজ চামেলী প্রভৃতি। সব গাছেই ফুল ফুটিয়া আছে। অপূর্ব সুগন্ধ চারিদিকে। নিমেষে মনটা যেন এক পবিত্র ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ভিতরে সারা বাগানটায় অনেকগুলো বড় বড় ফলের গাছ। বড় বড় বেলগাছ চার-পাঁচটা, তাতে বড় বড় সাইজের কাঁচা বেল অসংখ্য ঝুলিতেছে প্রথমেই নজরে পড়িল। কিন্তু কোথাও কোন লোকজনের সাড়াশব্দ নাই দেখিয়া আমরা বাগানের ভিতর ঢুকিয়া সোজা এদিক ওদিক তাকাইতেই হঠাৎ চোখে পড়িল একেবারে ভিতরদিকে বড় বড় কয়েকটা লকেট ফলের গাছের ঝোপের আড়ালে ঘর দেখা যাইতেছে। পুরানো আমলের একতলা ছোট ছোট ঘর। সামনে একটি লম্বা বারান্দা।

আমরা জুতা খুলিয়া যখন সেই বারান্দায় উঠিতেছি, একজন বৃদ্ধা বাহির হইয়া আসিলেন পাশের ঘর হইতে! সুন্দরাকৃতি কিন্তু অতি সাধারণ চেহারা। কালো রং আধময়লা শাড়ী পরা, খালি গায়ে, মোটা শাড়ীর আঁচল জড়ানো, গৃহিণীর চেহারা। মাথার চুল সবই পাকা। সেই পাকা চুলের মধ্যে ডগডগে লাল সিঁদুর সিঁথিতে টানা, গলায় একটা রুদ্রাক্ষের মালা।

ভদ্রলোক আগেই ঢিপ করিয়া তাঁকে প্রণাম করিয়া, তাঁর পায়ের ধুলো লইয়া মাথায় ঠেকাইলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করিলাম।

তোমরা কে বাবা, কোথা থেকে এসেছো!

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন, মা, আমি আপনাদের সন্তান। কলকাতা থেকে এসেছি। আর এঁর সঙ্গে এখানে পরিচয়, বাবাকে দর্শন করতে এসেছেন আমার সঙ্গে।

বসো বাবা! বলিয়া গুরুমা একটা ছোট কম্বল পাতিয়া দিলেন। আমি ওঁকে ডাকছি।

আমরা বসিতে না বসিতেই তিনি ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন। খালি গা। লুঙ্গির মতো পরা একটুকরো লাল রঙের কাপড়। ডান হাতের উপরে তামার তারের সঙ্গে কয়েকটা ছোট বড় রুদ্রাক্ষ। বৃদ্ধ হইয়াছেন কিন্তু দীর্ঘ ঋজু দেহ, কপালে একটা বড় রক্তবর্ণ সিন্দুরের টিপ।

আমরা দুজনে পর পর প্রণাম করিলাম তাঁর পায়ে হাত দিয়া।

এইমাত্র পুজা শেষ করিয়া আসিলেন বলিয়া মনে হইল। চোখে মুখে একটু অদ্ভুত দীপ্তি। চোখ দুটি অসম্ভব উজ্জ্বল, যেন জ্বলজ্বল করিতেছে। এত বয়সে এরকমটা দেখা যায় না।

তিনি আমাদের দুজনকেই কুশল প্রশ্ন করিলেন। ভদ্রলোক যে তাঁর শিষ্য এবং তাঁর মা বাবা জেঠামশাইরাও সবাই তাঁর সন্তান শুনিয়া বলিলেন, আশা করি মায়ের কৃপায় তোমাদের সব মঙ্গল!

তখন মা বলিলেন, অনেক বেলা হয়েছে, তোমরা দুজনে প্রসাদ পেয়ে তবে যাবে বাবা।

ঘণ্টা-দেড়েক পরে, প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ আমরা ভোগ খাইতে বসিলাম। গুরুদেবও আমাদের সঙ্গেই একত্রে বসিলেন। তিনি অতি সামান্য আহার করিলেন। এতটুকু খাইয়া কি করিয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকে, আমার কাছে যেন আর এক বিস্ময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

যা হউক, আহার-পর্ব মিটিলে পর ঘণ্টাখানেক আরো বিশ্রাম লইয়া আমরা ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আগে গুরুমাকে প্রণাম করিয়া, তার-পরে বাবাকে প্রণাম করিবার জন্য তাঁর ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলাম। একটি দড়ির খাটিয়ায় তিনি শুইয়াছিলেন। উঠিয়া বসিলেন আমাদের দেখিয়া। ভদ্রলোক আগে ও পরে আমি প্রণাম করিয়া তাঁর পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিতে, তিনি আমার মাথার উপর হাতটা ঠেকাইয়া যখন আশীর্বাদ করিলেন, তখন ভদ্রলোক বলিলেন, বাবা ও একটি মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছে তীর্থে তীর্থে অনেক দিন ধরে কিন্তু কোথাও তার সন্ধান করতে পারছে না, কেউ সঠিক বলতে পারছে না, অনেক সাধুসন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিল। তাই আপনার কাছে যদিও একটু দয়া ভিক্ষা করতে আমার সঙ্গে এসেছে কিন্তু আপনাকে বলতে সাহস পাচ্ছে না। ও একবার দেখতে চায়, সে কোথায়, কি ভাবে আছে!

সঙ্গে সঙ্গে বাবার চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিল। দীর্ঘ বিস্ফারিত সেই চোখ দুইটি আমার মুখের উপর ফেলিয়া যেন কি দেখিতে লাগিলেন। কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু আমার মনে হইল যেন সহসা উজ্জ্বল টর্চের আলোয় চোখ ঝলসাইয়া গেল। তিনি একটু চুপ করিয়া তারপর বলিলেন, তাহলে বাবা তোমাকে সামনের অমাবস্যার দিন, ঠিক দুপুররাতে আসতে হবে এখানে।

হ্যাঁ, আপনি যখন আদেশ করছেন আমি নিশ্চয় আসবো। বলিয়া আবার একবার তাঁর পায়ের ধুলো লইয়া মাথায় দিয়া বিদায় লইলাম।

বাহিরে আসিতে ভদ্রলোক বলিলেন, আমি ভাবিনি যে বাবা এত সহজে রাজী হবেন। আপনার অসীম সৌভাগ্য বলবো। এক কথায় এইভাবে যে 'হাঁ' বলবেন সত্যি আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

সবই আপনার অনুগ্রহে দাদা। আপনার এ ঋণ আমি জীবনে ভুলবো না।

আরে ছি ছি ভাই, আমি কিছু নই। সবই ওই বাবার কৃপা! বলিয়া দু-হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইলেন।

ধর্মশালায় ফিরিয়া হিসাব করিয়া দেখিলাম, তখনো অমাবস্যার এগারো দিন বাকী।

এই এগারোটা দিন যেন এগারো বছরের মত আমার মনে হইতে লাগিল। শান্তিকে দেখিতে পাইব, তার খবর পাইব, এতদিনের পরিশ্রম সার্থক হইবে। কবে সেই দিনটি আসিবে, যেন ধৈর্য ধারণ করিতে পারিতেছিলাম না।

ভদ্রলোক দুই-দিন পরে চলিয়া গেলেন। তাঁকে কলিকাতার ট্রেনে চড়াইয়া প্রণাম করিলাম। আগেই তাঁর বাড়ির ঠিকানা লইয়াছিলাম, কলিকাতায় ফিরিয়া দেখা করিব বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

মহাসাধক, কৌলাচারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে তিনি যা বলিয়াছিলেন, কখনো তা মিথ্যা হইতে পারে না, এ ধারণা তাই মনে এমন ভাবে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে পুষ্করিণীর স্থির জলের উপরে সহসা একটা ঢিল কোথাও হইতে আসিয়া পড়িলে তাহা যেমন বৃত্তাকারে তাকে কেন্দ্র করিয়া ছোট হইতে ক্রমশ বড় আরো বড় হইতে থাকে—আমার মনের অবস্থা অনেকটা সেইরূপ। কাহাকেও ও-কথা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। ভালবাসার অনেক জ্বালা। একবার তার নাম কানে শোনা নয়, তাকে চাক্ষুষ দেখিতে পাওয়ার আনন্দ যে কত তীব্র ও বেদনাদায়ক একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ বুঝিবে না।

অমাবস্যার তখনও এগারো দিন বাকী। শনিবার অমাবস্যা, রাত বারোটায় স্বামী সর্বানন্দ মহারাজ যখন পূজোয় বসিবেন তখন আমাকে সেখানে হাজির হইতে আদেশ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এই এগারোটা দিন যেন তখন আমার কাছে দীর্ঘ এগারোটা যুগ বলিয়া মনে হইতেছিল। শান্তির কেবল

সংবাদ নয়, তাকে চোখে দেখিতে পাইব, আমার মন যেন ধৈর্য মানিতেছিল না, কবে সেই শুভ শনিবার আসিবে—তাহার জন্য অধীর আগ্রহে দিন গণনা করিতাম। প্রত্যহ ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আগে মনে হইত, আর কটা দিন বাকী!

যা হউক, এমনিভাবে যেদিন সত্যি ধৈর্যের অবসান হইল, সেদিন কিন্তু অন্য এক চিন্তা পাইয়া বসিল। বেলা যত বাড়িতে থাকে, তত মনে হয় চন্ডীর পাহাড়ের দিকটা যে রকম গভীর বনজঙ্গলে পূর্ণ, একা ওই পথে অন্ধকারে গভীর রাত্রে কেমন করিয়া যাইব! যত ভাবি তত যেন ভয় বাড়িতে থাকে। অবশেষে স্থির করিলাম, বিকালের দিকেই চন্ডীদেবীর মন্দিরে গিয়া অপেক্ষা করিব। তারপর পূজা সন্ধ্যারতি ইত্যাদি শেষ হইয়া গেলে ওখানে যে লোকটি মন্দিরের সব কাজকর্ম করে তাহাকে কিছু বকশিশ দিয়া সেই সাধু মহাত্মার আশ্রম পর্যন্ত পেঁৗছাইয়া দিতে বলিব। মন্দিরের নিকটেই একটি ছোট ঝোপড়ায় লোকটি স্ত্রী-পুত্র লইয়া বাস করিত দেখিয়াছিলাম। যা হউক এমনি সংকল্প লইয়া যখন সেখানে পেঁৗছিলাম, মনে হইল যেন মন্দিরের পিছনদিক দিয়া যে লোকটি নামিয়া যাইতেছে তাহাকে চিনি। ঠাকুমার মন্দিরের সেই চাকরটির মত।

এতটা চড়াই ভাঙিয়া উঠিয়া বেশ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তবু পিছনের দিকে খানিকটা যাইয়া ডাকিলাম, এই.. এই ভেইয়া...আরে এ নোকরজী?

হঠাৎ লোকটা থমকাইয়া দাঁড়াইল। তারপর যতটা নামিয়াছিল, দ্রুত উঠিয়া আসিয়া ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, কিস্‌কো নোকর-নোকর বোল্‌তা হায়—তুম্‌রা নোকর হ্যায় হাম না তুমারা বাপ কা হ্যায়?

এই খবরদার, মুখ সামালকে! ছোটা আদমী ছোটা মাফিক রহো!

ছোটা আদমী হাম্‌ না তুম?

এবার খুবই অপ্রস্তুতে পড়িলাম। বলিলাম, তুম তো মাতাজীকো নোকর হ্যায়—হুঁয়া দেখা তো রোজ কাজ-কাম করতা!

দেখা তো কেয়া হুয়া? মায়ীকা নোকর তো হাম্‌ জরুর হ্যায়, তুমকো কেয়া? হঠাৎ যেন তার চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিল, আর সেই সঙ্গে মুখের রেখাগুলিতেও পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। মাথার চুল পাকিলেও বেশ শক্ত-সামর্থ্য বলিষ্ঠ মজবুত চেহারা। তার গায়ের রংটাও যে এককালে ফর্সা ছিল দেখিলে বোঝা যায়। ও-দেশের কুলি বা মজুরের কাজ যারা করে তাদের সঙ্গে অনেক মিল আছে। আজকের মত তখন গণজাগরণ হয় নাই, তাই যারা ছোট কাজ করে তাদের এখনকার মত আপনি বলিয়া সম্বোধন করিতে হইত না, করিবার কথা তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। এবং এ যেন তার প্রাপ্য, এ কথাটা ভুলেও কখনও তাদের মনে আসিত না। ছোট-বড়র পার্থক্য ও সেই মত মানসম্মানও যথাযথ দিতে কেহ ভুল করিত না। এখনকার মত

মুড়ি-মিছরী তখন একদামে বিকাইত না।

তাই চাকরকে চাকর বলিয়া ডাকিয়া এমন যে একটা মহা অপরাধ করিয়াছি তাহা মনে হয় নাই। কিন্তু আমার মত একজন অপরিচিত ও অল্পবয়স্ক যুবকের মুখ হইতে উহা শুনিয়া বোধ হয় তাহার আত্মসম্মানে ঘা লাগিয়াছিল, সেই জন্য একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া আমি শুধু বলিলাম, তুমারা নাম তো মেরা জানা নেহি হ্যায়!

মুখটা বিকৃত করিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল, জানা নেহি তো কেয়া? আপ্‌ ভদ্র আদমী হোকে আদমীকো ইজ্জত দেনে নেহি জান্‌তা? ছি! বলিয়া আমাকে আর একটি কথাও বলিবার অবসর না দিয়া দ্রুত পিছু হাঁটিতে শুরু করিল।

মনে হইল তার চলনবলন কথার ভঙ্গী সব দিয়া সে যেন আমাকে আরও বেশী অপমান করিয়া চলিয়া গেল। আমি চুপ করিয়া সেখানে তেমনিভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অপমানে আমার মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত যেন জ্বালা করিতেছিল। একটু বাদে মন্দিরের কাজ করে যে লোকটি, সে আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল, বাবু উন্‌কো কেয়া বাত কিয়া, এতনে গোঁসা হো গিয়া!

আরে বাবা, উসকো নোকর বলা এইসে একদম গোঁসা হো গিয়া। নোকরকো নোকর নেহি বলেগা তো কেয়া হুজুর বলেঙ্গে?

জিব কাটিয়া লোকটি বলিল, হিঁয়া তো সব আদমি গঙ্গামায়ি কী নোকর হ্যায় জী!

উয়ো তো দোসরা বাত। লেকিন্‌ যিসকো হাম নোকরকো কাম করনে দেখা, বর্তন সাফাই, ঘর ধোলাই—ইয়ে সব তো হাম দেখা তব্‌ উসকো কেয়া বোলেগা বাতাও—হাম তো উস্‌কো নাম নেহি জানতা হ্যায় তো মেরা কসুর কেয়া বাতাও!

আরে বাবুজী, হাম তো গরীব আদমী হ্যায় কেয়া জানেগা! লেকিন উয়ো তো একরোজ বহুত সন্ত আদ্‌মী সৎ লোক থা, গরীব সাধু মহাত্মাকো সব কুছ দান কর্‌কে এইসা ফকির বন্‌ গিয়া।—বহুত পুন ভি কিয়া। আজ তো অমাবস্যা—শনিচার হ্যায় না?—ইসি লিয়ে মা-চণ্ডীকো পূজা চড়ানে আয়া থা। বহুত ভক্‌ত আদ্‌মি হ্যায়। সন্ত হ্যায় তো।

এমন সাধুপ্রকৃতির সন্ত্‌ আদমী যিনি, তিনি চাকরের কাজ করেন কি করিয়া, আমি তো ভাবিয়া পাইলাম না। ওরা এত গরীব যে কেউ নিঃস্বার্থে পয়সাকড়ি দিতে পারে দেখিলে ভাবে নিশ্চয় ধনী লোক হইবে। সে ধনী হোক বা রহিস আদমী হোক, আমার তাতে কিছু আসে যায় না। তবে হঠাৎ বিনা কারণে আমাকে ওই ভাবে 'বাপ' তুলিয়া কথা বলাতে আমার তো তাহাকে খুব ছোট লোক বলিয়া মনে হইল। যতই সন্ত ওরা ওকে বলুক না কেন!

ওখানকার লোকেরা এত গরীব যে কাউকে দানধ্যান করিতে দেখিলে সন্ত

বা সদাশয় সজ্জন ব্যক্তি মনে করে।

চারআনা বকশিশ দিব বলিতে, মন্দিরের সেই লোকটি খুশি হইয়া রাত বারোটার সময় আমায় গুরুজীর আশ্রমে পেঁাছাইয়া দিয়া গেল।

গুরুমা আমায় দেখিয়া পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতে তিনি বলিলেন, জুতোটা খুলে রেখে, ওই বালতিতে জল রয়েছে হাতমুখ ধুয়ে, নিঃশব্দে ঠাকুরঘরে গিয়ে বসে পড়ো বাবা। উনি পুজোয় বসেছেন। তোমার জন্যে সামনে যে কম্বলের আসনটা পাতা আছে, তাতে শুধু বসে থাকবে চুপচাপ। মুখে একটি কথাও কইবে না। কোন কিছু জিজ্ঞেসও করবে না। তাহলেই কিন্তু তোমার সব কাজ পণ্ড হয়ে যাবে মনে থাকে যেন।

বলিলাম, মা আপনি যখন বারণ করছেন তখন একটি কথাও কইবো না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

একটা বাঘছালের আসনে বসিয়া গুরুদেব তখন পূজা করিতেছিলেন। সেদিন যে চেহারা দেখিয়াছিলাম, এখন একেবারে অন্য মূর্তি, যেন অন্য মানুষ। পরনে রক্তবস্ত্র, কপালে রক্তচন্দনের রেখা, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, খালি গা, পঞ্চমুণ্ডীর আসনে উপবিষ্ট, তাঁর সামনে প্রজ্বলিত ধুনি। আশে-পাশে পূজার নানা উপচার। টকটকে লাল সিঁদুর মাখা ত্রিশূল, করোটী, কিছু হাড়গোড়, রক্তচন্দন ও জবাফুল। মন্ত্র পড়িয়া অগ্নিতে যখন আহুতি দিতেছিলেন, তখন লকলকে অগ্নিশিখায় গুরুদেবকে মনে হইতেছিল যেন কাপালিকের মত। আগুনের ধোঁয়ায় কেমন যেন শ্মশান-ধূমের গন্ধ পাইতে-ছিলাম!

চুপটি করিয়া বসিয়া পূজা দেখিতেছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে পূর্ণাহুতি দিয়া তারপর গুরুদেব করোটী হইতে সিঁদুর লইয়া একটা টিপ আমার কপালে দিলেন, তারপর আমার হাতে রক্তচন্দন মাখা জবাফুল বিল্বপত্র দিয়া তিনবার মন্ত্র পাঠ করাইয়া সেই অগ্নিকুণ্ডে আমায় অঞ্জলি দেওয়াইলেন।

অঞ্জলি দেওয়া শেষ হইলে 'মা তারা' বলিয়া হঠাৎ এমন এক হুংকার ছাড়িলেন যে ভয়ে সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।

তখন আমার মুখের উপর তাঁর দুই জ্বলন্ত চোখ রাখিয়া বলিলেন, ওইদিকে অন্ধকারে চেয়ে থাকো। যাকে তুমি দেখতে চাও, সেই মানুষটিকে চোখ বুজিয়ে চিন্তা করলে এখুনি দেখতে পাবে।

ঘরের মধ্যে অন্য কোন আলো ছিল না। শুধু ধুনির নিভন্ত আগুনের রক্তিম আভায় গুরুদেবের মুখটা দেখা যাইতেছিল। তিনি তাঁর সেই চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি আমার মুখের উপর ফেলিয়া, শিরদাঁড়া খাড়া করিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন।

আমি কতক্ষণ চোখ বুজিয়া ছিলাম জানি না, একসময় চমকিয়া উঠিলাম। দেখি শান্তি বদ্রীনাথের পথে হাঁটিয়া যাইতেছে। কয়েকজন সঙ্গিনীর সঙ্গে।

আনন্দে আমার বুকের রক্ত নৃত্য করিয়া উঠিল। কিন্তু একটু পরেই একটা বিরাট পাথরের চাঁই পাহাড়ের চূড়া থেকে গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া শান্তির সঙ্গে আরো কয়েকজনের মাথায় পড়িলেই সেইখানেই তাহাদের মৃত্যু হইল। আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া সেখানে পড়িয়া গিয়াছিলাম। আর কিছু মনে নাই।

॥ ঊনত্রিশ ॥

যতদিন শান্তিকে খুঁজিয়া পাই নাই, মনে তবু একটা সান্ত্বনা ছিল যে একদিন না একদিন হয়ত তার সঙ্গে দেখা হইবে। কখনো কল্পনাও করিতে পারি নাই যে ওইভাবে বদ্রীনাথের পথে তার অপঘাত মৃত্যু ঘটিতে পারে। মনে পড়িয়া গেল সংবাদপত্রে কিছুদিন আগে পড়িয়াছিলাম বটে বদ্রীনারায়ণ-তীর্থযাত্রীদের পাথরচাপা পড়িয়া মৃত্যুর খবর। হায়, তখন কে জানিত যে শান্তিও ওই দলে ছিল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে সেদিন চোখের সামনে তার এই মৃত্যুদৃশ্য প্রত্যক্ষ করিবার পর হইতে সব কিছুতেই যেন কেমন অনীহা বোধ করিতে লাগিলাম। এমন নিরুৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলাম যে কিছু আর ভাল লাগে না, কোন কাজেই মন দিতে পারি না। যেদিকে তাকাই সব যেন কেমন শূন্য বোধ হয়। আমার জগৎ হইতে রূপ রস গন্ধ সব যেন নিমেষে মুছিয়া গিয়াছে। চারিদিক ধূসর, বিবর্ণ।

আমার তখনকার সে মনের অবস্থা কাহাকেও বুঝাইতে পারিব না।

ধর্মশালার বাগানে গাছে গাছে কত রঙের ফুল ফুটিয়া থাকিত। সেই দিকে তাকাইয়া আমার মনে হইত তাহারা যেন বাহিরে নয়, আমার মনের মধ্যে ফুটিয়া আছে, আর কত মৌমাছি সেখানে গুঞ্জন করিতেছে। সেই বাগানে তেমনি ফুল ফুটিয়া আছে কিন্তু সে ফুলে আর গন্ধ নাই, মধু নাই, কোন মৌমাছির গুনগুনানিও যেন সেখানে নাই।

হর-কী-প্যারীর গঙ্গার ঘাটে বসিলে কিংবা কন্‌খলের সেই দক্ষ-প্রজাপতির সুপ্রাচীন ভগ্নমন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র মনটা যেমন নিমেষে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকে উধাও হইয়া যাইত, এখন সেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিলে শুধু চোখে পড়ে কতগুলো ভাঙা ইঁটপাথরের স্তূপ আর গঙ্গার ওঁ-কার ধ্বনিতে শুনি যেন কার রোদনের সুর।

কেন এমন হয়? আহারে বিহারে নিদ্রায় জাগরণে কোথাও যেন আর আনন্দ নাই, সুখ নাই। যে হরিদ্বারকে আমি মনে মনে ভাবিতাম মর্ত্যের স্বর্গ, যার তুল্য এমন পবিত্রভূমি শুধু ভারতে কেন সারা দুনিয়ায় কেহ খুঁজিয়া পাইবে না বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, আশ্চর্য সেখানেও যেন মন আর বসিতেছিল না। সেতারের একটা তার ছিঁড়িয়া গেলে যেমন অন্য সবগুলি তারে বেসুরো

আওয়াজ দেয়, তেমনি তখন আমার মনের অবস্থা। কেন এমন হয়? মনটা চিরিয়া চিরিয়া অনুসন্ধান করি। তবে কি ইহার মূলে সেই একজনের অন্তর্ধান! সে ছিল বলিয়াই সব কিছুতে সুর ছিল! জীবনে রং, রস ও গন্ধ সব ছিল! সবের মূলে কি তবে সেই একের অস্তিত্ব? ফুল একদিন ফুটিয়া ঝরিয়া গেলেও তার গন্ধ যেমন কখনো হারায় না, তার নির্যাসের মধ্যে ভরা থাকে, প্রেম জিনিসটা বোধ হয় সেই নির্যাসের মত। একদিন যে সে আমায় তার মনটা দিয়াছিল, তারই সেই মধুময় রোমাঞ্চিত অনুস্মৃতি কি তবে আমার অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল? এতদিন সে ছিল বলিয়া বুঝিতে পারি নাই, আজ সে আর এ পৃথিবীতে নাই, একথা মনে হইবার সংগে সংগেই তাই চারিদিক এমন মরুভূমির মত শুষ্ক, রুক্ষ বোধ হইতেছে?

এ অনুস্মৃতি যত পুরনো হয় তত বোধ হয় তার মাধুর্য বাড়ে। বিশেষত যদি তাতে জড়াইয়া থাকে প্রথম বসন্তের শিহরণলাগা হর্ষপুলক! সে স্মৃতি যাহার আছে, সে কোনদিন বোধ হয় তা ভুলিতে পারে না। বিচ্ছেদ, বিরহ সত্ত্বেও সে মরে না। যেন এক অদৃশ্য রজ্জুর বন্ধনে মনের অস্থিতে মজ্জাতে জড়াইয়া থাকে। ফল্গুর ধারার মত সে অন্তঃসলিলা, বাহির হইতে চোখে দেখা যায় না, অথচ গোপনে অন্তরকে রসধারায় সিঞ্চিত করিয়া রাখে। হয়ত ইহারই অপর নাম প্রেম! কে জানে? তবে কেন আমার এমন হয়!

যেদিন মনটা খুব ফাঁকা লাগিত হর-কী-প্যারীর ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকিতাম অনেক রাত পর্যন্ত। ভাবিতাম আমার যাত্রা তো শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে আর এখানে কেন? শান্তিকে খুঁজিবার জন্যই একদিন পথে বাহির হইয়াছিলাম, শান্তি যখন সে দায়িত্ব হইতে আমায় মুক্তি দিয়া গিয়াছে, এবার তাহলে আবার ফিরিতে হইবে।

এমনি নানা চিন্তায় যখন মনটা উদ্‌ভ্রান্ত, হঠাৎ চমকিয়া উঠি, দেখি ঠাকুমার সেই চাকরটি খাবার বিলাইতেছে। দু'খানা করিয়া বড় বড় পুরী ও একটা করিয়া লাড্‌ডু। যত সাধু, সান্ন্যাসী, ভিখিরি, মাগন—ঘাটের যেখানে যে আছে, সকলকে একে একে দিয়া যাইতেছে। নিশ্চয় ঠাকুমা তাহার নোকরকে দিয়া পাঠাইয়াছেন দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্য। কন্‌খলের গঙ্গার ঘাটে ভিখিরি, মাগন, সাধু, সান্ন্যাসী খুব কম বলিলেই হয়, তাই বোধ হয় ইহাদের কথা মনে করিয়া মাতাজীর মাতৃহৃদয় কাঁদিয়া ওঠে। চাকর দিয়া এইভাবে খাবার বিতরণ করে।

একবার মনে হইল উহাকে নিজে গিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু সংগে সংগে মনে পড়িয়া গেল, ওই লোকটা আমাকে বাপ তুলিয়া গাল দিয়াছিল। কি জানি কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে গেলে যদি আবার আরো কিছু বলে! তাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কি দরকার আমার ওকে জিজ্ঞাসা করিবার?

কিছুক্ষণ পরে বিতরণ শেষ হইলে গঙ্গার ঘাটে একটি ভিখারী জল খাইতে আসিলে, আমি তাহাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে যাহা বলিল

তার অর্থ হইতেছে, প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার পরে যখন ঘাটে আর ভিড় থাকে না, তখন ওই মহাত্মা সাধুসজ্জন, দরিদ্রনারায়ণদের ওইভাবে সেবা করেন। আসলে উহা ঠাকুরমার দান ইহা তাহারা কেহ জানে না। সকলের ধারণা ওই লোকটিই নিজে তাদের খাওয়ায়। মনে করিলাম হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া দিই। সেদিনের গাল দেওয়ার উপযুক্ত প্রতিশোধটা তাহা হইলে লওয়া হইবে। ও যে একটা চাকর, যত সন্ডাগন্ডার দিন হউক না কেন তখন, তবু ওই ভাবে সকলকে পুরি ও মিষ্টি কিনিয়া বিলাইতে যা খরচা ওর মত চাকরের পক্ষে যে তাহা অসম্ভব ব্যাপার, সে কথাটা তাহাদের বুঝাইয়া দিই। কিন্তু কি জানি কেন, সেকথা উহাদের কাছে বলিতেও আর প্রবৃত্তি হইল না। সেদিনটা ছিল অমাবস্যা।

আবার ঠিক পরের পূর্ণিমার রাত্রে আমি হর-কী-প্যারীর ঘাটে সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। দেখি ঠিক যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমনি ভাবেই আগের মত একটি ছোকরা মাথায় ঝুড়ি লইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, আর সেই লোকটি দুখানা করিয়া গরম পুরী ও একটি করিয়া লাড্ডু প্রত্যেককে দিতেছে। সাধু, সন্ন্যাসী, ভিখিরী, মাগন, গরীব-দুঃস্থ সবাই নিজের জায়গায় স্থির হইয়া বসিয়া আছে, কেহ আগ বাড়াইয়া উঠিয়া আমায় দাও বলিয়া হাত পাতিতেছে না। তারা জানে প্রত্যেককে না দিয়া সে যাইবে না। উহাও এক অভিনব দৃশ্য বলিয়া মনে হইল আমার কাছে। কারণ আমাদের দেশে বা অন্য কোন মন্দির কি তীর্থক্ষেত্রে দেখিয়াছি, কেহ যদি কিছু পয়সা বা খাদ্য এইভাবে গরীব দুঃখীকে দান করিতে যায়, তাহা হইলে চারি-দিক হইতে সকলে দাতাকে ঘিরিয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। কে আগে লইবে সেজন্যও বটে, আবার মিথ্যা বলিয়া ঠকাইয়া দুই-তিনবার ভিড়ের মধ্যে হাত পাতিয়া লইবার জন্য তাদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি পর্যন্ত বাধিয়া যায়। ইয়ে হ্যায় স্বর্গদ্বার, তাই বুঝি এখানে দাতার নিকট হইতে ছিনাইয়া আগেভাগে লইবার বা বেশী কিছু আদায়ের জন্য কোন প্রতিযোগিতা নাই। সবাই জানে, দাতা এইভাবে পুণ্য অর্জন করিতেছে তাহাদের খাদ্য দিয়া, ইহাতে গরজ দাতারই গ্রহীতার চেয়ে।

শুধু দূর হইতে লক্ষ্য করিতাম। কোনদিন কাছে গিয়া দাঁড়াই নাই। এক-দিন বিনা দোষে যে সে আমায় গাল দিয়াছিল, এটা তাহাকে দেখা মাত্র মনে পড়িয়া যাইত। এবং সঙ্গে সঙ্গে রাগে গা-টা জ্বলিয়া উঠিত। তাই আড়ালে তার আসল পরিচয় জানিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু সকলের মুখে ওই এক কথা। ওখানে যারা গরীব দুঃখীকে এইভাবে কিছু বিনাস্বার্থে দানধ্যান করে, তারা সবাই তাদের চোখে মহাত্মা অর্থাৎ মহৎ অন্তঃকরণ ব্যক্তি।

আমার কাছে কিন্তু তখনো পর্যন্ত কনখলের সেই নেংটি পরা দোকানদার পাঁড়েজীর চেয়ে বড় মহাত্মা আর কেউ ছিল না। যার অনেক আছে, সে অনেক দান করিতে পারে, কিন্তু ওই ছোট্ট দোকানের মালিক, যে নেংটি পরিয়া থাকে

সব সময়, তার গুরু ও দেবদ্বিজে যে ভক্তি দেখিয়াছি, তার তুলনা কোথায়? তবু কি জানি কেন, ওই লোকটার আসল পরিচয় কি জানিবার জন্য আমার মনে কৌতূহল বাড়িতে থাকে। যে দোকান হইতে এত পুরী মিঠাই কিনিয়া খয়রাত করিত, পরদিন সেখানে খাবার খাইতে খাইতে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা উয়ো কোন্ হ্যায় ভাইয়া, যো হিঁয়াসে খাবার লে গিয়া কাল রাতকো, ঘাটমে সাধু লোককো খিলানে?

উয়ো তো মহাত্মা হ্যায় জী—ভারী আদ্মি, রইস আদমী—বহুত পুন্ কিয়া থা। লেকিন কাঁহাকো রহেনেবালা, উয়ো ম্যায় নেহি জানতা জী!

এমনিভাবে আরো দু'চারজনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কিন্তু সকলের মুখে ওই এক কথা—মহাত্মা হ্যায়—বহুত পুন্ (পুণ্য) কিয়া।

সেই চাকরটি কিন্তু দিনের বেলা এদিকে কখনো আসে না। রাত্রের দিকে ওই পূর্ণিমা আর অমাবস্যায় আসে কেবল খাবার বিলাইতে।

পরের অমাবস্যার দিন আবার যখন ওইভাবে সেই নোকরটি একের পর একের হাতে দু'খানা পুরীর সঙ্গে একটা লাড্ডু দিতেছিল, হঠাৎ আমি তাহাদের ভিতর গিয়া হাতটা বাড়াইয়া দিলাম। এই সূত্রে যদি আমায় কিছু বলে, তাহা হইলে উহাকেই কথাটা জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু লোকটি কোন কথা না বলিয়া, শুধু নিঃশব্দে একবার আমার মুখের দিকে তাকাইল।

তারপর এমন বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া আমার হাতে দিল যে আমি উহা লইয়া তাহার সামনে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। তখন সে কিছু বলিল না। একটু পরে বিতরণ শেষ হইলে সে আমার কাছে আসিয়া ভারী গলায় বলিয়া উঠিল, কাহে তুম্ মিঠাই লিয়া, আউর কাহে ফেক্ দিয়া?

আমি বলিলাম, আমার হাতে যখন খাবার দিলে তখন মনে হলো যেন তুমি কুত্তাকে খাবার দিচ্ছো! তাই ঘেন্নায় ফেলে দিয়েছি।

হাঁ, তুম্ তো কুত্তাসে ভি আউর নীচু হ্যায়!

কি, আমি কুত্তার চেয়ে অধম? রাগিয়া উঠিলাম।

হাঁ, যে গরীবদুঃখীর মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে আবার তাকে রাস্তায় ফেলে দিতে পারে, সে আমার কাছে কুত্তারও অধম!

রাগে সর্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল, বলিলাম, তুম্ তো নোকর হ্যায়—এতনা বড়া বড়া বাত্ মাত্ কহো। মাতাজী মিঠাই ভেজতা আর তুম্ ইয়ে লোককো বোলা তুম্ খুদ্ খিলাতা হ্যায়। তুম্ তো ঝুট আদ্মী। তাই কুকুরের চেয়েও তুমি আরও ইতর, আরো ছোটলোক।

কেয়া, হাম্ ইতর আদ্মী! ছোটলোক! হঠাৎ তার চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল, খবরদার! মুখ সামালকে!

আমি বলিলাম, হাম ইয়ে লোককে সব বোল্ দেগা যে তুম্ নোকর হ্যায় মাতাজীকো। ইয়ে মিঠাই মাতাজী নে ভেজতা হ্যায়।

খবরদার, নোকর ফিন্ মাত্ বোল!

তব্ কেয়া বোলেগা? আমীর?

আমার সে কথার কোন জবাব না দিয়া লোকটা যেন ক্ষেপা কুকুরের মত রাগে গরগর করিতে করিতে চলিয়া গেল।

ছোটলোক চাকরের এত বড় স্পর্ধা! আমি তাই মনে মনে হাটে হাঁড়ি ভাঙিয়া দিব প্রতিজ্ঞা করিলাম। ওর মনিবের কাছে গিয়া একদিন তার এই প্রভুভক্তির কিছু নমুনা দিয়া আসিব। ব্যাটা পরের ধনে পোদ্দারী কি ভাবে করিতেছে, তিনি হয়ত তা ঘুণাক্ষরেও জানেন না। জানেন না যে তিনি চাকরের হাত দিয়া যে দানখয়রাত করেন, চাপিয়া গিয়া কি ভাবে সে লোকের কাছে নিজে মহাত্মা ও রইস আদ্মী নাম কিনিতেছে।

মনিবকে মেয়েছেলে পাইয়া ব্যাটা খুব যে ঠকাইতেছে, একথা আমার কাছে জানিতে পারিলে হয়ত তখনি তাকে দূর করিয়া দিবেন। তাহা হইলে এক ঢিলে দুই পাখী বধ করা হইবে। আমাকে অপমান করার এর চেয়ে বড় প্রতিশোধ আর কি ভাবে লইতে পারি!

রাগে আমার সর্বাঙ্গ তখনও রিরি করিতেছিল। একে মনটা কদিন ধরিয়া ভাল ছিল না, তার উপর একটা ছোটলোক চাকরের হাতে এইভাবে সকলের সামনে অপমানিত হওয়ার জ্বালা যেন সারাদেহে বিষ ছড়াইয়া দিতেছিল। তাই উহাকে জব্দ করিবার এর চাইতে বড় অস্ত্র আর কিছু হইতে পারে না ভাবিয়া মনে কিছুটা শান্তি ফিরিয়া আসিল। সুযোগ বুঝিয়া ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু পরে মনে পড়িয়া গেল তিনি নিষেধ করিয়াছিলেন যেন পুনরায় তাঁর কাছে না যাই।

তাই চিন্তায় পড়িলাম, কোন মুখে আবার তাঁর কাছে যাইব? যদি কথা না বলেন? মুখ ফিরাইয়া থাকেন? কিংবা চাকরটা যদি ইতিমধ্যে মিথ্যা করিয়া আমার নামে তাঁর কাছে চুক্লি খাইয়া থাকে!

সেই চাকরটাকে জব্দ করিতে না পারা পর্যন্ত আমার গায়ের জ্বালা যেন মিটিতেছিল না! হরিদ্বার ছাড়িয়া চলিয়াই যাই তো তার আগে ব্যাটাকে উত্তমমধ্যম শিক্ষা দিয়া তবে যাইব। একটা মূর্খ গাড়োয়াল চাকরের এত বড় আস্পর্ধা দেখিয়া লইবই।

ঠাকুমার কাছে যাইবার এক সুযোগ হঠাৎ মিলিয়া গেল। জানিতাম না যে সেদিন জন্মাষ্টমী। মনটা ভাল ছিল না বলিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে বৈকালে কন্খলের বাজারে গিয়া হাজির হইতেই দেখি পূজার ডালি হাতে লইয়া অনেক মেয়ে-পুরুষ চলিয়াছে, আবার পাঁড়েজীর দোকানের সামনে আসিতে দেখি সেখানেও ভিড়। সকলেই মিষ্টান্ন কিনিয়া ফুলের ডালি সাজাইতেছে। এত ভিড় অন্তত পাঁড়েজীর দোকানে কোনদিন আগে দেখি নাই। তাই তার দোকান হইতে অভ্যাসবশত সরের লাড়ু কিনিয়া খাইতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আজ কি পর্ব, সবাই পূজো দিতে যাচ্ছে, কোথায়?

সে কহিল, আজ জন্মাষ্টমী। ভগবান কৃষ্ণজীকা জনম্‌দিন। উসি লিয়ে পূজা চড়ানে যাতা হ্যায় সব রাধাগোবিন্দজীকো মন্দিরমে।

বলিলাম, সে তো অনেক রাতে পূজো হয়!

পাঁড়েজী বলিল, হাঁ, কৃষ্ণজীকী জনম্‌ হুয়া গভীর রাত মে—পূজা লাগেগা ওহি টাইমমে। লেকিন এতনা রাতমে আদমি লোক তো আনে নেহি স্যেকতা! আভি মন্দিরমে পূজারিকে পাশ পূজা রাখকে চলা যাতা, কাল সুবা আকে প্রসাদ লে যায়েগা।

চট্‌ করিয়া মাথায় বুদ্ধি খেলিয়া গেল। হাতটা ধুইয়া পাঁড়েজীকে বলিলাম, আমায় আট আনার ক্ষীরের মিষ্টি একটা দোনায় করে দাও তো। আমি এখুনি ওই ফুলের দোকান থেকে কিছু ফুল কিনে আনছি। এইভাবে ফুল ও মিষ্টান্নের দোনা হাতে লইয়া রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে না গিয়া ঠাকুমার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। তাঁহাকে বলিলাম, আজ জন্মাষ্টমী—আপনার গোপালের মন্দিরে আমি এই পূজোটা দিতে এসেছি।

তাঁর গোপালের জন্যই যে আমি মনে করিয়া এতদূর হইতে পূজা দিতে আসিয়াছি, ইহা শুনিয়াই বোধ হয় তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, পূজো কিন্তু সেই দুপুররাতে হবে, কাল সকালে এসে তাহলে প্রসাদ নিয়ে যেয়ো।

ভালই হইল। আমি ঠিক এই সুযোগটারই অপেক্ষা করিতেছিলাম। কাল যখন প্রসাদ লইতে আসিব, তখনি তাঁর ওই গুণধর চাকরটির স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিব। আজ পূজার দিন, আজ আর মন খারাপ করিয়া না দেওয়াই উচিত।

ঠাকুমা বলিলেন, পূজোটা তুমি ভেতরে দিয়ে এসো, আমার লোক আছে, সে নিয়ে ঠিক জায়গায় রাখবে। তখনও সন্ধ্যার দেরি ছিল। ঠাকুমা বাইরে তাঁর সেই খাটুলীতে বসিয়াছিলেন। পূজার ডালি হাতে তখন যারা গঙ্গার দিকে রাধাগোবিন্দের মন্দিরে যাইতেছিল, তারা 'মাতাজী নমস্তে' বলিয়া তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম জানাইতেছিল এবং মাতাজীও হাত তুলিয়া তাদের যেন আশীর্বাদ করিতেছিলেন।

মাতাজীর মন্দিরে ঢুকিবার সময় ভাবিতেছিলাম, চাকরটা আমায় দেখিয়া নিশ্চয় চমকিয়া উঠিবে। সে কল্পনা করিতে পারে নাই যে আমি এইভাবে সেখানে পূজো দিতে আবার আসিতে পারি। কিন্তু ভিতরে ঢুকিয়া লোকটিকে দেখিতে না পাইয়া, এদিক ওদিক তাকাইয়া ডাকিতে লাগিলাম, আরে এ ভেইয়া নোকরজী, কাঁহা গিয়া তুম্‌?

কৌউন হ্যায়? বলিয়া লোটা হাতে করিয়া বাগানের ভিতবে কোণের একটি ছোট ঘর হইতে সে বাহির হইয়া আসিল। বুঝিলাম পায়খানায় গিয়াছিল। তাই আমায় দেখিয়া প্রথমটা কেমন একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। বলিলাম, ইয়ে পূজা কাঁহা রাখেগা? মাতাজী তো তুমকো দেনে

বোলা!

জেরা ঠেরিয়ে। হাম আভি আ-রহা। বলিয়া চট করিয়া স্নানের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তারপর কি ভাবিয়া স্নানের ঘরের দরজার উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল, উয়ো ঘরমে বইঠিয়ে জেরা—ম্যায় আভি আতা হুঁ।

পাশের যে ঘরটি দেখাইয়া দিল উহা যে তারই শয়নকক্ষ জানিতাম না, ভিতরে পা দিয়াই বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু এ কি! সামনের টেবিলের উপর একগাদা ধর্মপুস্তক। চৈতন্য-চরিতামৃত, রাধাতন্ত্র, কৃষ্ণলীলামঞ্জরী, রামকৃষ্ণ-কথামৃত, বিবেকানন্দর বাণী, তার সঙ্গে মোটা মোটা আরো কয়েকটা তন্ত্র-শাস্ত্রের বই।

চৈতন্য-চরিতামৃত বইটা টেবিলের সামনেই পড়িয়াছিল। কৌতূহলবশতঃ তার প্রথম পাতাটা খুলিতেই শিহরিয়া উঠিলাম, তাতে যে নামটা লেখা তাহা দেখিয়া।

প্রথমত এতগুলো বাংলা বই এ ঘরে কেন? ভাবিলাম হয়ত মাতাজীর বই। তাঁর ঘরে জায়গা নাই তাই এখানে রহিয়াছে।

তিনি বাঙ্গালীর মেয়ে জানিতাম। নহিলে চাকরের ঘরে থাকিবে কেন? সে তো ওদেশীয় লোক—গাড়োয়ালী জন-মজুর, পড়ালেখা জানে না!

যখন এমনি সব চিন্তা করিতেছি—. জেরাসে দের হো গিয়া, বলিয়া কুণ্ঠার সঙ্গে সে যেই ঘরে ঢুকিল, আমি প্রথমেই প্রশ্ন করিলাম, এহি সব কিতাব্ কিস্‌কা?

মেরা! আউর কিস্‌কা হোগা! সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়া উঠিল।

ইয়ে তো সব বাংলা কিতাব হ্যায়! তুম্ কেয়া বাংলা পড়নে জান্‌তা?

হাঁ, ম্যায় তো বাঙলা-মে বহুত রোজ রহা। বাঙলা পড়নে ভি জানতা।

এবার আমার সন্দেহ যেন আরো দৃঢ় হইয়া উঠিল। নীরব দৃষ্টিতে কয়েকটা মুহূর্ত তার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলাম, মিথ্যা কথা—আপনি বাঙ্গালী, সত্যি করে বলুন, হু আর ইউ?

তখনো তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিলাম, ওই বইটাতে যাঁর নাম লেখা—হঠাৎ চোখে পড়লো, আপনি কি সেই ব্যক্তি? সত্যি বলুন। এই ঠাকুরের ঘরে দাঁড়িয়ে মিথ্যা বলবেন না। কি আপনার পরিচয় সত্যি বলুন!

তখনো তাঁকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বলিলাম, আমি ঠিক এমনি একজনের নাম জানি, যিনি একসময় ছিলেন উত্তর বাংলার চকদীঘার বিখ্যাত জমিদার, আপনি কি সেই ব্যক্তি? সত্যি বলুন! চুপ করে থাকবেন না!

কৌতূহল আর চাপিতে না পারিয়া বলিলাম, তাঁরও নাম কিন্তু ছিল কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী—ওই বইটায় এইমাত্র যাঁর নাম দেখলুম! আপনি তবে কি সে-ই ব্যক্তি?

হঠাৎ যেন স্বপ্ন দেখিয়া তাঁর ঘুম ভাঙিয়া গেল, মুখে-চোখে তেমনি একটা ভাব ফুটিয়া উঠিল। গম্ভীর ও ধীর কণ্ঠে কহিলেন, এই ঠাকুরঘরে দাঁড়িয়ে

মিথ্যে বলবো না, হাঁ ওই নামটা একদিন আমার ছিল বটে, যখন ছিলাম মদ্যপ.. লম্পট, বেশ্যাসক্ত এক উচ্ছৃংখল জমিদার। কিন্তু তারপর অনেকদিন চলে গেছে। তারও মৃত্যু ঘটেছে। এখন তাই ওই নামটা শুনলে কেমন যেন অপরিচিত, অন্য কোন লোকের বলে মনে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে নীচু হইয়া তাঁকে প্রণাম করিতে গেলে, তিনি আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন, ছিঃ, চাকরের পায়ে হাত দিলে যে পাপ হয় তা জানো না!

বলিলাম, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি না জেনে আপনাকে যা-তা বলে কত অপমান করেছি।

না, কোন অপমান তুমি আমায় করোনি। আমায় যেমন দেখছো—এই তো আমার সত্যি পরিচয়। কোন অন্যায় তুমি করোনি।

বিস্ময়ে আমার কণ্ঠ বুজিয়া আসিতেছিল, 'বাট্ হাউ ইজ্ ইট্ পসিবল্? আই ওয়ান্ডার!'

আমার মুখ দিয়া হঠাৎ এই কথাটা বাহির হইয়া পড়িল।

মাতাজীর সঙ্গে ওই জমিদারের যে কি সম্পর্ক সেটা আমি জানিতাম, তিনি ঘুণাক্ষরেও তা জানিতেন না। ঠাকুমার কাছে আমি সত্যবন্ধ ছিলাম কাউকে বলিব না। কিন্তু একটা বেশ্যা, যার জন্য মানুষ সর্বস্বান্ত হইয়াছে, তাকে কেমন করিয়া আবার মা বলিয়া ডাকিতে পারে সেই ব্যক্তি, এ রহস্য যখন মনের মধ্যে বিরাট প্রশ্ন হইয়া উঠিতেছিল—সেই সময় আমার কানের কাছে মুখটা লইয়া গিয়া তিনি বলিলেন, সেক্সপীয়ারের সেই অমর কথাটা স্মরণ করো—"There are more things in heaven and earth Horatio, than are dreamt of in your Philosophy—'

বলিলাম, কিন্তু সেই আপনি আর এই আপনি কি করে এক মানুষ হতে পারেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না! মাথার মধ্যে সব যেন গোল-মাল হয়ে যাচ্ছে। যদি দয়া করে একটু বলেন এর রহস্য কোথায়—

দার্শনিকের মত ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন, সমস্ত জগৎটাই তো রহস্যময়। মানুষ নিজেই জানে না সে কে, কোন্‌টা তার আসল পরিচয়। অভিনেতার মত একই মানুষ কখনও রাজা সাজে, কখনও বা চাকর, কখনও সাধু, কখনও বা শয়তান...

না না, ওই বলে আমায় ফাঁকি দিলে চলবে না। আমি জানতে চাই, হাউ ডু ইউ কাম্ হিয়ার!

॥ ত্রিশ ॥

সেদিন আমার চোখে ঘুম আসিল না। সত্যি কথা বলিতে কি, এমন নাটকীয় ঘটনা আমার জীবনে এই প্রথম! আমার যা কিছু ভাবনা চিন্তা যত কিছু ধ্যানধারণা সব মস্তিষ্ক নিঙড়াইয়া লইলেও, কখনো কল্পনা করিতে পারিতাম না যে সেই চকদীঘার প্রবলপ্রতাপ জমিদার এই মাতাজীর নোকর!

একদিন মাতাজীর সঙ্গে জমিদারবাবুর কি সম্পর্ক ছিল মনে পড়িয়া গেল। ঠাকুমার কাছে সেদিন বিশেষ করিয়া এই জমিদার সম্বন্ধে জানিবার একান্ত কৌতূহল প্রকাশ করিলে তিনি ধমক দিয়া থামাইয়া দিয়াছিলেন। হঠাৎ দমকা হাওয়া লাগিয়া ছাইচাপা আগুন যেমন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, এতদিন পরে সেই কৌতূহল যেন আহার নিদ্রা ভুলাইয়া দিল। তাই মহাকবি সেক্সপীয়ারের সেই দার্শনিক উক্তিটা তিনি শোনাইয়া আমার প্রশ্নটাকে এড়াইয়া গেলেও আমার মন উহাতে একটুও সান্ত্বনা লাভ না করিয়া বরং রহস্যকে আরও জটিলতর করিয়া তুলিয়াছিল। যদিও সে স্থান কাল পাত্র এখন আর নাই। সব কিছুরই রূপান্তর ঘটিয়াছে—সেই বাইজী আজ মাতাজী, তাঁর বিলাসকক্ষ এখন পবিত্র দেব-মন্দির, তবু কেন জানি না চোখের সামনে দেখিয়াও মাতাজীর সঙ্গে কেমন করিয়া তাঁর পুনর্মিলন হইল, কেমন করিয়া এই প্রভুভৃত্য ও মাতাপুত্রের সম্পর্ক স্থাপিত হইল। যত চিন্তা করি তত যেন রহস্য আরো ঘনীভূত হইয়া উঠে। সত্যি আমার কাছে উহা ছিল তখন যেন পৃথিবীর নবম আশ্চর্য! আজ মনে হয় সবই ঠাকুরের কৃপা। একদিন যে জমিদারবাবুর পরিণতির কথা জানিবার জন্য আমার মনে আকুতির অন্ত ছিল না তা যেন ঠাকুর চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার জন্য এই রকম এক নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া তার মধ্যে আমায় টানিয়া আনিয়াছিলেন। জানি তিনি প্রেমের ঠাকুর। বিশেষ করিয়া পরকীয়া প্রেমের গুরু, যদিও—কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবান! বুঝি, এর পিছনে সকলই তাঁরই লীলা! পরকীয়া প্রেমের রহস্য তাই এত গুহ্য ও আমাদের মত মানুষের জ্ঞানের অতীত।

এইসব চিন্তা যখন রাতের ঘুম কাড়িয়া লইয়াছিল, অকস্মাৎ মনে পড়িয়া যায় মাতাজী সেদিন বলিয়াছিলেন, তাঁর গুরু বলেন, প্রেম ছাড়া জগতে কোন কিছুই সম্ভব নয়। তিনি সর্বদা মুখে যে গানটি গাহিতেন, তাহাও আমি ভুলি নাই।

'মনুয়া প্রেম লাগানা চাই / মনুয়া ভজন করনা চাই / মনুয়া সাধন করনা চাই!' অর্থাৎ আগে চাই প্রেম, সাধন ভজন সব তার পরের কথা।

কিন্তু কোথায় সেই জমিদার! আর কোথায় এই মাতাজী! কি করিয়া, কোথা দিয়া কোন পথে যে এ প্রেম আসিতে পারে সেইটা সারারাত ধরিয়া ভাবিয়াও কিছুতে মাথায় আনিতে পারিলাম না।

তাই পরদিন সকালে উঠিয়া প্রসাদ লইবার ছলে আগেই সেখানে গেলাম। যখন গিয়া হাজির হইলাম তখন নিস্তব্ধ মন্দির! কোথাও এতটুকু সাড়াশব্দ নাই। চোরের মত আমি ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এদিকে ওদিক দেখিতে দেখিতে সেই নোকরের ঘরের সামনে যাইতেই তাঁর দেখা পাইলাম। বলিলাম, মাতাজী কোথায়? তাঁকে দেখছি না তো?

তিনি সারারাত ধরে পূজো করে এই ভোরে ঘুমিয়েছেন। উঠতে অনেক বেলা হবে। কেন, তাঁর সঙ্গে কোন দরকার আছে?

বলিলাম, প্রসাদটা নিতে আসতে বলেছিলেন কি না! তাছাড়া একটু প্রণাম করে..

প্রসাদ আমার কাছে আছে, দিচ্ছি। বলিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া সেই প্রসাদের দোনাটা আনিয়া আমায় দিলেন।

আমি সেটা আগে মাথায় ঠেকাইয়া, তারপর তাঁর হাতে একটু দিয়া বাকীটা নিজে খাইয়া তাঁর কাছে একটু জল চাহিলাম।

তিনি হাত ধুইয়া আমার জন্য জল আনিতে ঘরে ঢুকিলে আমি তাঁর পিছনে গিয়া দাঁড়াইলাম। গ্লাসটা তাঁর হাত হইতে লইয়া, জল খাওয়া শেষ হইলে, জিজ্ঞাসা করিলাম, এটা কোথায় রাখবো?

হাম্‌কো দিজিয়ে! বলিয়া তিনি হাত বাড়াইলে আমি বলিলাম, না না, ছিঃ—এ আমার এঁটো গ্লাস!

কথাটা শেষ করিতে না দিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, ইয়ে তো নোকরকা কাম। ছিঃ কেন? হিন্দীতেই অবশ্য সব বলিলেন। আমি বাংলায় বলিলেও অভ্যাসবশত হিন্দীটাই তাঁর মুখ দিয়া যেন আগেই বাহির হইয়া পড়িত।

এই সুযোগে আমি আসল কথাটা বলিয়া ফেলিলাম, জানেন, কাল রাতভোর ঘুমোতে পারিনি!

কেন, তোমার ইন্‌সমনিয়া রোগ আছে নাকি?

না না, ওসব কিছু নয়।

তব্‌ রাত্‌মে নিদ্‌ নেহি গিয়া কাহে?

একটু থামিয়া জবাব দিলাম, আমার একটা ভারী ব্যায়রাম আছে, তার নাম কৌতূহল, একবার ধরলে আর নিস্তার নেই তার হাত থেকে।

আরে শিলাজতু খা লেও—উস্‌সে আচ্ছা দাওয়াই হিঁয়া কুছ নেহি, জেরাসে মধু মিশাকে লেগা তো আউর ভি আচ্ছা হ্যায়। ব্যস, সকালমে এক খোরাক, আউর রাতমে নিদ্‌ যানেকা পহেলে এক খোরাক। দেখো আজ খাকে—কেয়া তাজ্জব খেল হ্যায় উসমে!

বুঝিলাম আমার ওই কথার ভিতর যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছিল তা তিনি ধরিতে পারেন নাই। কিংবা আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, তিনি যখন বাঙালী 'কৌতূহল' কথাটার অর্থ হয়ত সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াই ওইভাবে ন্যাকা সাজিতেছেন, পাছে কালকের সেই কথাটা লইয়া আবার তাঁকে বিরক্ত করি। তাই একটু থামিয়া আবার প্রশ্ন করিলাম, দেখুন সত্যি কি আপনি সেই ব্যক্তি? আমার মন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না—ওই নাম তো অন্য কোন লোকের থাকতে পারে? বলুন না দয়া করে, আপনি কি সত্যি সত্যি সেই জমিদার! আমি যেন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, এমন কি করে সম্ভব হতে পারে?

হঠাৎ তিনি যেন একটু গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। আমার মুখের উপর

অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ফেলিয়া প্রশ্ন করিলেন, আমি যেই হই না কেন, আমার সম্বন্ধে তোমার এত কৌতূহল কেন? তার আগে আমায় জানতে হবে, কে তুমি? সত্যি করে বলো—স্পাই ইনফরমার? না কোন স্বদেশী গুণ্ডা—হয়ত কোন এক সাহেব খুন করে এখানে এইভাবে গা ঢাকা দিয়েছো! সত্যি করে বলো। নইলে আমি পুলিসে খবর দেবো। খাবারওলা, মুদী, পোস্ট আপিসের পিওন, চণ্ডী মন্দিরের নোকর—তাদের কাছে গোপনে আমার পরিচয় খোঁজ করে বেড়াচ্ছ কেন? অনেকদিন থেকে তোমায় দেখছি এখানে ওখানে সেখানে! বলো কি কাজ তুমি এখানে করো?

সর্বনাশ! পুলিস, গোয়েন্দা—বলে কি! আমার বুকের ভিতরটা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এ যে হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। প্রেমের সূত্র খুঁজিতে আসিয়া শেষে কি পুলিসের খপ্পরে পড়িব! লোকটা তো অদ্ভুত প্রকৃতির! বেশ কথা বলিতেছিল, হঠাৎ একেবারে রুদ্রমূর্তি, যেন অন্য মানুষ!

আমাকে নীরব দেখিয়া তিনি বলিলেন, আমার পিছনে কেন তুমি লেগেছো এতদিন? কে তুমি? কি তোমার মতলব, সত্যি করে বলো। এখানে মাতাজীর কাছেও তোমায় আসতে দেখেছি, কি দরকারে এসেছিলে? কি জন্যে আবার ঘাটেও দেখি প্রায়ই, আমি কি করছি দূর থেকে সব লক্ষ্য করো। কে তুমি, এখানে কি করতে এসেছ সত্যি বলো, নইলে পুলিসে দিলে ডাণ্ডার চোটে তোমার আসল পরিচয় সব বেরিয়ে যাবে, মনে রেখো:

পুলিসের নাম শোনামাত্র আমার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। ওই সময়টায় যুদ্ধের ঠিক আগে, গান্ধীজীর নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সরকারের সিংহাসন টলমল করিতেছিল—ইহার উপর আবার সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ একেবারে তুঙ্গে উঠিয়াছিল, রাজপুরুষরা প্রাণভয়ে সর্বদা কণ্টকিত। সন্দেহের কোন কারণ না থাকিলেও যুবক দেখিলেই বিনা বিচারে তাহাকে দিনের পর দিন রুদ্ধদ্বার কারাকক্ষে অন্ধকারে বন্দীজীবন যাপন করিতে হইত। বিশেষ করিয়া বাঙালী যুবক মাত্রেই যে তাহাদের শত্রু, এই ধারণা তখন ওই ধুরন্ধর রাজপুরুষদের মনে কেমন করিয়া না-জানি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সারা ভারত জুড়িয়া পুলিসের তাণ্ডবলীলা—ধরপাকড় চলিতে-ছিল, তাই ভয়ে ভয়ে আর কোন কিছু না বলিয়া তাঁহাকে কহিলাম, আমি কে, কেন এসেছি এখানে তা শুনলে কি বিশ্বাস হবে আপনার?

সত্য গোপন করে যদি মিথ্যা না বলো, তাহলে কেন বিশ্বাস হবে না! যব্ সাচ্ বলে গা, কাহে বিশওয়াস্ নেহি হোগা?

বলিলাম, আমি একজনকে খুঁজতে এখানে এসেছিলুম।

উয়ো কোন হ্যায় তুমারা সাচ কহো? ও তোমার কে সত্যি বলো!

ও তো মেরা সহেলী থা।

সহেলী? তোমার পিয়ারী? উয়ো কাঁহা রয়তি? বাঙালী থা?

বলিলাম, হাঁ, উয়ো ভি বাঙালী থা!

তব্ কেয়া হুয়া—উসকো পাত্তা মিলা?

নেহি জী, উয়ো তো মর গিয়া!

কেয়া, গুজর্ গিয়া? আহা, কৈ বেমার হুয়া থা?

নেহি, বদ্রীনাথকে পথে পাথর গিরকে চাপা পড় গিয়া থা, উয়ো একেলী নেহি—আউর সঙ্গী ভি থা, সবকো একসাথ দেহান্ত হো গিয়া।

তো ফিন্ হিঁয়া কেয়া কাম হ্যায় তুমারা?

কুছ নেহি। লেকিন ইয়ে স্বর্গদ্বার ছোড়কে মন তো নেহি জানে চাহতা।

তিনি বলিলেন এবার, তো মাত যাও—রহো হিঁয়া—ভগবানকো নাম করো। হিঁয়া খানা-পিনাকা কুছ অভাব নেহি। ইয়ে তো গঙ্গামায়ীকো পুন্ভূমি হ্যায়। হঠাৎ যেন তাঁর কণ্ঠস্বর সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিল।

লোকটা সত্যি আমার কথা বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছিল।

তারপর তাই বলিল, আচ্ছা, আমার সম্বন্ধে তোমার কেন এত কৌতূহল এবার বলো তো, আমি কিছুতেই ভেবে প্যাচ্ছি না কাল থেকে!

কিছু না—স্রেফ কৌতূহল। বিশ্বাস করুন অনেকের মুখে অনেক রকম শুনেছি, আবার ঠাকুমার এখানে নোকরের কাজ করতে দেখেছি—তাই শুধুই কৌতূহল। এখানে এসে অনেক রকমের নর-নারীকে দেখলুম। সত্যি ভাবা যায় না, এরা সব বর্ণচোরা মাণিক এমন সব যে এক একজনের পরিচয় আবিষ্কার করে আমি বিস্মিত হতবাক। সত্যি বলছি, আপনাদের এই গঙ্গামায়ীর রাজত্ব যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি বিচিত্র।

একটু থামিয়া কি যেন তিনি চিন্তা করিলেন। তারপর ধীর কণ্ঠে কহিলেন, সত্যি কি তুমি শুধুই কৌতূহল নিবারণ করতে চাও?

হ্যাঁ, সত্যি বলছি। এই মা'র মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে বলবো না। বিশ্বাস করুন, আমার কোন কিছু মতলব নেই। আউর হাম্ গোয়েন্দা বা ইনফরমার ভি নেহি!

সহসা আমার উপর আরো এক দফা গলা চড়াইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, হাম্ ভি কিসিকো নোকর নেহি হ্যায়!

কথাটা বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে আবার সংশোধন করিয়া লইলেন, না, মিথ্যা বলবো না, আমি চাকর ঠিকই, তবে ওই গোবিন্দের নোকর। সেবক। আর ম্যায় তো মাতাজীকো বেটা হুঁ। ছেলের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক কি কখনো চাকরের হতে পারে? আভি সব কুছ সমঝ গিয়া তো? ক্লিয়ার?

হ্যাঁ, এবার সব পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর কিছু বলতে হবে না। তবে আমি ভুল ধারণাবশতঃ চাকর বলে আপনার মনে যদি আঘাত দিয়ে থাকি তো কসুর মাফ কীজিয়ে।

আরে নেহি নেহি ভেইয়া। বলিয়া প্রসন্ন হাসিতে এবার আমার মুখেও হাসি ফুটাইয়া তুলিলেন।

কসুরকে বাত কুছ নেহি—হিঁয়া সব আদমী তো গঙ্গামাঈকী সেবক হ্যায়, নোকর হ্যায়! ক্লিয়ার? এখন সব পরিষ্কার হয়েছে, আশা করি!

ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, দেখুন সত্যি কথা বলতে কি, আসল জায়গাটায় এখনো অন্ধকার তেমনি রয়ে গেছে। ক্লিয়ার হয় নি। মানে সেই মুলুক থেকে এখানে এইভাবে আপনার মত বিরাট জমিদারকে কে আনলো এবং তা কেমন করে সম্ভব হলো সেটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না।

তাঁকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিলাম, তবে পাণ্ডাজীর মায়ের মুখে শুনেছি, যারা অন্যায় করে, পাপকর্ম করে সারাজীবন ধরে, তারাই নাকি এখানে আসে গঙ্গার পবিত্র ধারায় স্নান করে শেষ বয়সে তাদের দেহমন থেকে সেই সব কলঙ্কের দাগ ধুয়ে মুছে প্রায়শ্চিত্ত করতে।

এবার হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন তিনি, না, ওসব কিছু নয়! পাপপুণ্য আমি ওসব বিশ্বাস করি না। বলিয়া আমার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া বলিলেন, তুমি ছেলেমানুষ, আমার কথা বুঝবে না। তবু যখন জিজ্ঞেস করছো, মিথ্যা বলবো না। তবে তার আগে তোমায় দিব্যি করতে হবে এই গোপালের মন্দিরে দাঁড়িয়ে যে কোনদিন কাউকে একথা বলবে না।

আমি বলিলাম, শুধু আমার কৌতূহল মেটাতে চাই—তাই অন্য কাউকে কখনো বলবো না প্রতিজ্ঞা করছি।

তিনি বলিলেন, তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে, আমি এখানে পাপের প্রায়-শ্চিত্ত করতে আসিনি, এসেছিলুম শুধু আমার ছেলের সত্যরক্ষা করতে!

তার মানে?

হ্যাঁ, তার মানে তুমি বুঝতে পারবে না। ছেলের বাপ না হলে এর গুরুত্ব ধারণা করা সম্ভব নয়। তুমি বিশ্বাস কর—তুমি হয়ত বুঝতে পারবে না যে কখনো কখনো ছেলের কথা গুরুবাক্যের চেয়েও গুরুভার মনে হয় বাপের কাছে। নিশ্চয় আমার কথাটা তুমি বুঝতে পারবে না—তুমি কেন, পৃথিবীর আর কেউ হয়ত আমার এ ব্যথা বুঝতে পারবে না, কেন আমি ছেলের সত্য-পালন করার জন্য সারা ভারত খুঁজে বেড়িয়েছি একজনকে!

কথা বলিতে বলিতে নিমেষে তাঁর চোখমুখের ভাব বদলাইয়া গেল, যেন সে লোক নন, তিনি এক অন্য মানুষ।

একটু থামিয়া বলিলেন, কথাটা তাহলে খুলেই বলি। তোমাকে তো বলেছি, আমি একদিন মাতাল, চরিত্রহীন, লম্পট ছিলুম। বিষয়সম্পত্তি সব কিছু উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলুম। সেই সময় এক চরম দুর্দিনে একজনের কাছে টাকা কর্জ করেছিলুম। সেদিন সে টাকা না পেলে আমার ছেলে দুটো হয়ত বাঁচতো না। থাক সে-সব কথা। হ্যাঁ, এই ছেলে দুটো কি করে যে আমাদের বংশছাড়া হলো জানি না। এদের বড়টা ডাক্তার হয়ে বিলেতে এম. ডি. করতে গিয়ে সেখানেই মেম বিয়ে করে বাড়িঘর কিনে বসবাস করছে। কোনো দিন আর দেশে ফিরবে না—শুধু এই বাপের জন্যে ঘেন্নায়, সেকথা মাকে স্পষ্ট

জানিয়ে দিয়েছিল।

এদিকে ছোট ছেলেটা ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করে আমেরিকায় গিয়ে বড় চাকরি পেয়ে যায়। সে মাকে লিখলে, বাবার যেখানে যত ঋণ আছে সব তাঁকে শোধ করে দিতে বলো—যেন দেশে যখন যাবো কেউ না আমায় দেখিয়ে বলতে পারে আমি ওই জোচ্চোরের ছেলে! যত টাকা লাগে আমি সব দেবো, মাসে মাসে। বাপকে আমি ঋণমুক্ত দেখতে চাই একেবারে এই আমার শেষ ও একমাত্র প্রার্থনা, তাঁর কাছে বলো।

আমার বংশের ছেলে যে হঠাৎ কি করে এমন চরিত্রবান ব্রিলিয়াণ্ট হলো আমি নিজেই তা জানি না। আমার স্ত্রী জানতেন, পাছে আমার বিষাক্ত হাওয়া ছেলেদের গায়ে লাগলে বিপথে যায় তাই তাদের রামকৃষ্ণ মিশনের পবিত্র পরিবেশে সরিয়ে দেন। তারপর তারা স্কুলে কলেজে লেখা-পড়ায় এত ভাল হয়ে ওঠে যে এগজামিনে ফার্স্ট হয়ে স্কলারশিপ্ নিয়ে নিজেদের উন্নতির পথ বেছে নিয়েছিল। আমি এসবের কোন খবর রাখতুম না। তখন শুধু মদ আর মেয়েমানুষে ডুবে থাকতুম।

বললে বিশ্বাস করবে না, ছেলেদের ওই চিঠি দেখে মনে হলো, এখনি আমার মাথায় বজ্রপাত হোক। তাদের চিঠি যেন আমার বুকে শেলাঘাত করলে। তখন থেকে মদ ও মেয়েমানুষ সব ছেড়ে দিলুম মায়ের নামে শপথ করে। ধিক্কার এলো জীবনে। আর না—আমি যা করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করবো স্থির করে ফেললুম। আমার জন্যে ছেলেদের মাথা যেন আর হেঁট না হয় দেশ ও দশের কাছে!

তখন থেকে শুরু করলুম ছোট ছেলের টাকায় আস্তে আস্তে ঋণ শোধ করতে। এইভাবে অবশেষে একদিন যখন সত্যি সত্যি নিজেকে ঋণমুক্ত বলে ভাবতে যাব, হঠাৎ মনে পড়ে গেল—আরে, একদিন এক বেশ্যার কাছ থেকে যে টাকা ঋণ করেছিলুম, সেই ঋণ যতক্ষণ শোধ করতে না পারছি ততক্ষণে তো আমি প্রকৃত ঋণমুক্ত হবো না। কিন্তু সেই বেশ্যাকে পাবো কোথায়? সে তো অনেককাল আগেই কলকাতার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত বেচেকিনে দিয়ে কোথায় চলে গেছে কেউ তা জানে না। তাই বেরিয়ে পড়লুম তার খোঁজে। ছেলের সত্যরক্ষা করবোই করবো প্রতিজ্ঞা করলুম, নইলে আমার এ জন্ম বৃথা! বিবাগী হয়ে এই লাইনের অনেক নামকরা মেয়েমানুষ তীর্থে বাস করে জানলুম।

যাক সে-সব অনেক কথা। মানে তাঁকে খুঁজে বার করার জন্য যেন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। এইভাবে সাড়ে পাঁচ বছর কেটে যাবার পর এই হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় আসি এবং দৈবক্রমে এখানে তার সাক্ষাৎ পেয়ে যাই।

বলিয়া হঠাৎ তিনি চুপ করিয়া গেলেন। তারপর একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, সে অনেক ব্যাপার, থাক সেসব, তুমি বুঝবে না ছেলেমানুষ।

না—তবু বলুন না। আমি বুঝতে চেষ্টা করব। বলিয়া যখন তার নিকট আবদার ধরিলাম তখন তিনি শুরু করিলেন, পেলুম তো দেখা! কিন্তু তখন তিনি আর সে মানুষ নন, মাতাজী হয়ে গেছেন। তাই যখন সেই টাকা হাতে করে তাঁকে দিতে গেলুম তিনি বললেন, এ টাকা যার কাছ থেকে নিয়েছিলে তাকে দাওগে। বলে মুখটা তিনি খিঁচিয়ে উঠলেন। উয়ো ঝুটা হ্যায়, হাম পাওসে ভি ছুঁতা নেহি, উয়ো পানিমে ডাল দেও! ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন আমার দিক থেকে। যেন আমার সর্বাঙ্গে পাপ, কলঙ্ক।

আমি বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলুম তাঁর মুখের দিকে। এবার ক্রুদ্ধ চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন, যার কাছ থেকে টাকা ঋণ করেছিলে সে মরে গেছে। তুম্ যিসসে লিয়া থা রুপিয়া, ও তো আভি জিন্দা নেহি!

আমি দু'হাত জোড় করে বললুম, মাতাজী, এ যদি তুমি না নাও তোমার কাছে তাহলে আমি ঋণী থেকে যাব চিরদিন। আমার ছেলের কাছেও মুখ দেখাতে পারব না—সত্যভ্রষ্ট হবো। তার কাছে আমি যে সত্যে আবদ্ধ তা থেকে একমাত্র তুমিই আমায় মুক্তি দিতে পারো।

তিনি পয়সাকড়ি যে হাত দিয়ে ছোঁন না। বললেন, গঙ্গামে ফেঁক দেও ইয়ে সব।

সত্যিকারের দেবী। বিষয়সম্পত্তি সব বিলিয়ে দিয়ে সত্যিকারের সান্ন্যাসিনী হতে পেরেছেন, তখন বুঝতে পারলুম। মনে খুব শ্রদ্ধা হলো, টাকা যখন নেবেন না সত্যি সত্যি, তখন সাধুসন্ন্যাসীদের বিলিয়ে দেব। তখন সবে কুম্ভমেলা শেষ হয়ে গেছে। সাধুসন্ন্যাসীরা অধিকাংশই চলে গেছেন। তবু এখানে ওখানে অনেক সাধুসন্ন্যাসীকে ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে দেখেছিলুম।

যাহোক, পরের দিন সকালে উঠে ভীমগোড়া ছেড়ে একটু এগিয়ে যেতেই দেখি একটা পাহাড়ের গুহায় এক জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসী—গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে রক্ততিলক, সামনে ধুনি জ্বলছে, সেখানে কতকগুলো মড়ার হাড়, ও দু'তিনটে খুলিতে সিঁদুর মাখানো, একটা ত্রিশূল তাঁর ডানপাশে মাটিতে পোঁতা রয়েছে।

আমি চেয়ে ছিলুম তাঁর মুখের দিকে। তিনি একটু পরে বললেন, বেটা, কেয়া দেখ্ রহো?

বলিলাম, আপকো!

ইধার আও, বৈঠো! বলে আমাকে কাছে ডাকলেন।

আমি তাঁর কাছে গিয়ে বসলে তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন, কোথায় ঘর? এখানে কি জন্যে এসেছ?

বললুম, ঘর বাংলা দেশে, এখানে কুম্ভমেলায় এসেছিলুম।

তিনি বললেন, কুম্ভ তো খতম হয়ে গেছে, তবে এখনও কি করছো এখানে?

এই বলে তিনি এমন ভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যেন আমার বুকের ভেতরে তাঁর দৃষ্টি চলে গিয়েছে।

আমি যখন ভাবছি কি বলবো তখন তিনি বললেন, সত্যি করে বলো, আমি তোমার বাপের তুল্য, মিথ্যা বলতে নেই!

তখন আমি কিছু গোপন না করে সব কথাই তাঁকে বললুম। তারপর সেই টাকাগুলো পকেট থেকে বার করে বললুম, এগুলো গ্রহণ করে আপনি আমায় ঋণমুক্ত করুন।

তিনি বললেন, একজনের ঋণ কি আর একজন শোধ করতে পারে বেটা! ইয়ে কই হো সেক্‌তা?

আপনি যখন আমায় ছেলে বলেছেন, তখন বলে দিন, কি করলে মনে শান্তি পাই? এ টাকা নিয়ে কি করব, এ ঋণ কি করে শোধ করবো?

তিনি বললেন, মাত্‌ শোচো। কিছু ভেবো না। যার ঋণ তাকেই তুমি শোধ দিতে পারবে, যদি বেটা আমার কথা শোনো। আমার প্রকৃত সন্তান হতে পারো!

দু'হাত জোড় করে বললুম, ওঁর কাছে যদি সত্যি ঋণমুক্ত হতে পারি, তাহলে আপনি যা বলবেন তাতেই আমি প্রস্তুত।

তিনি বললেন, আমি তোমায় দীক্ষা দিতে চাই, তবে আমি তান্ত্রিক সন্ন্যাসী—আমার এ সাধনার পথ কিন্তু খুব কঠিন। ভাল করে ভেবে দেখো, পারবে কিনা?

বললুম, যত কঠিন হোক, আমি পারবো নিশ্চয়। এর ফলে আমি সেই বাইজীর ঋণমুক্ত হতে পারি ও তার চেয়েও গুরুতর আমার ছেলের কাছে আমি যে সত্যবন্ধ তা থেকেও মুক্তি পাই!

সন্ন্যাসী থাকতেন উত্তরকাশী থেকে অনেক নীচে পাহাড়ের এক অন্ধ গহ্বরে! আমি তখন তাঁর সংগে সেখানে চলে গেলুম।

এই বলিয়া তিনি যেই থামিলেন, আমি বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, ওরে বাপ, তান্ত্রিকসাধনা সে তো শুনেছি ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক! যার তার কাজ নয়! পঞ্চ 'ম'কারের সাধনা করতে গিয়েই সবাই ব্যর্থ হয়!

জমিদারবাবু এবারে দীপ্তভংগীতে কহিলেন, হাঁ, তুমি যা বলছো ঠিকই। কিন্তু ব্যর্থ আমি হইনি। গুরুজী পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তো জানতেন না যে ছেলেবেলা থেকেই ওই পঞ্চ 'ম'কারের সাধনা ছাড়া আর কিছু করিনি। আমার সিদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। মা বলে একদিন সব পরিত্যাগ করেছিলুম। কাজেই অল্পদিনেই তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে ফেললুম!

বলিলাম, অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে বামাচার করেছিলেন নিশ্চয়?

হাঁ হাঁ—ওটাই তো আসল! ওই পরীক্ষায় পাস করলেই তবে ডিগ্রী মেলে। দীক্ষালাভ হয়। অবশ্য এ পরীক্ষা খুবই কঠিন সন্দেহ নেই। কল্পনা করতে পারো, এক পরমাসুন্দরী গাড়োয়ালী তরুণী উলঙ্গ হয়ে এসে আমার সামনে

দাঁড়ালো! আমিও উলঙ্গ হয়ে তখন পুজোর আসনে। ঘৃণা লজ্জা ভয় সব কিছু জয় করে তবে বামাচার। তাই সেই নিরাভরণা যুবতীর কোমর থেকে পা পর্যন্ত শুধু চন্দন মাখিয়ে দিয়ে তার গলায় হাতে ক'রে ফুলের মালা পরিয়ে তারপর তার যোনিকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করতে হলো। এখানেই পরীক্ষা শেষ নয়। আমার হাঁটুর ওপর সেই উলঙ্গ মাতৃমূর্তি এসে বসলে, গুরুদেব মা তারার আসল মূর্তির একখানি চিত্র সামনে এনে ধরলেন। উমার কোলে মহাদেব বসে আছেন, উমা মহাদেবকে স্তন্যদান করছেন। সেই মাতৃরূপিণী নারী তখন ঠিক তেমনি করে তাঁর স্তন আমায় পান করালেন। সেইদিন থেকে বিশ্বসংসারের সকল নারীই আমার কাছে মা হয়ে গেছে। তন্ত্রসাধনার মূলমন্ত্র ওই মাতৃমন্ত্র!

গুরুদেব বললেন, যা এবার তোর মাকে গিয়ে টাকা ফেরত দিগে যা। তখন মা-মাগো বলে মাতাজীর চরণে এসে প্রণাম করে বললুম, এবার ছেলের কাছ থেকে প্রণামী নিয়ে তাকে ঋণ থেকে মুক্ত করো মা!

মাতাজী মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, বেটা, মায়ের ঋণ কি ছেলে কখনো শোধ করতে পারে?

তাহলে আমাকে তোমার মন্দিরের সেবক করে নাও—দেবতার সেবার সঙ্গে মায়ের সেবা এক হয়ে যাক।

এই বলিয়া জমিদার চুপ করিলেন। এবার সব ক্লিয়ার?

বলিলাম, কিন্তু আপনার স্ত্রী ও ছেলের কি হলো?

ও-হো-হো, তোমায় বলতে ভুলে গেছি। আমি যখন তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, সেই সময় আমার স্ত্রী হঠাৎ কলেরায় মারা যান। তখন বাড়ি গিয়ে ছেলেকে চিঠি লিখে দিই, তোমার মা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সঙ্গে সব সম্পর্ক আমার শেষ। শেষ জীবনটা আমি তাই কোন তীর্থস্থানে শান্তিতে কাটাতে চাই।

বলিলাম, তার মানে হরিদ্বারে আসার আগেই ওদিকটা ভগবান ক্লিয়ার করে দিয়েছিলেন!

হ্যাঁ, এও ভগবানের অসীম কৃপা। বলিয়া দুহাত কপালে ঠেকাইয়া তিনি বলিলেন, তুমি নিশ্চয় ভাবছো, তান্ত্রিক হয়ে এই গোবিন্দের সেবক হয় কি করে, না? তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি। তুমি ছেলেমানুষ, তাই জানো না যে—যে কৃষ্ণ সে-ই কালী। যে কালী সে-ই কৃষ্ণ।...যাও ভাগো, এখুনি পুজোর যোগাড় করতে হবে আমায়। 'অল্ ক্লিয়ার নাউ'!

আমি হতবাক।

॥ একত্রিশ ॥

জমিদারবাবুর মুখে এইমাত্র তাঁর জীবনের যে কাহিনী শুনিলাম, পথে চলিতে চলিতে সারাক্ষণ মনটা যেন সেই সত্য অথচ অদ্ভুত অসম্ভব অত্যাশ্চর্য রহস্যের অতলে তলাইয়া গিয়া তার আসল স্বরূপ কোথায়, তারই সন্ধানে বুঝি অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছিল।

কখন যে গৌড়ীয়মঠের সামনে আসিয়া পড়িয়াছি খেয়াল ছিল না। হঠাৎ খোল-করতালের সঙ্গে কীর্তনের সুর কানে আসিতে যেন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। মন্দিরের চত্বরে গিয়া দেখি সেখানে কথকতা চলিতেছে। জনৈক বাঙালী গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্ত তখন কহিতেছেন—

'রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহন।
অন্যথা বিশ্বমোহঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ॥

যখন কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে বিরাজ করেন তখন মদনমোহন হন অন্যথা তিনি বিশ্বমোহন হইয়াও মদনমোহিত।

এই বলিয়া একটু থামিয়া আবার শুরু করিলেন—সাধক ভক্তের দর্শন এই যে—পরমাত্মারূপিনী বুদ্ধিমতী প্রধানা প্রকৃতি খালি পরম পুরুষের ভোগার্থে অর্ধাংশারূপে বিকাশ হইয়া অশেষ বিশেষ রূপে লীলারস পুষ্ট করিতেছেন। সাংখ্যকারও তাই বলিয়াছেন—বুদ্ধিমতী প্রকৃতি পুরুষের ভোগার্থে বহুধা হইয়া বিচিত্র দেহ ধারণ করিয়াছেন। অতএব প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও একটু সমালোচনা করা যাক, যাহাতে সাধারণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা সংসিদ্ধ হয়।

যেমন কোন মহাত্মা নারী নরকের দ্বার আর কোন মহাত্মা নারীর সর্বপ্রকল্পকে স্বর্গের সোপান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ কাহারও কথা মিথ্যা নয়, অসংযমীর পক্ষে নরকের (দুঃখের) দ্বার, সংযমীর পক্ষে স্বর্গের (সুখের) সোপান। আগুন যেমন একটি ভীষণ পদার্থ, কিন্তু বিশেষরূপে আকর্ষণ করিয়া তাহা হইতে লোকহিতকর নানাপ্রকার উপাদেয় ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ; নইলে একটু শৈথিল্যে ঘর দোর পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দেয়। বিষয়-আশয় সম্বন্ধেও তদ্রূপ, মন যদি স্বছে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিষয় গ্রহণ করে তবেই রক্ষা, নচেৎ রজঃ তমগুণের আবর্তে প্রবেশ করিয়া মানুষকে একেবারে অমানুষ করিয়া দেয়।

সোজা কথায় বিষয় ত্যাগ তো হইতেই পারে না, প্রকৃত প্রস্তাবে বাসনা ত্যাগ। ত্যাগের মানে প্রকৃতির উন্নততর নিয়মে ভোগ করা, অর্থাৎ যে ভোগের আর বিরক্তি আসে না, ইহারই নাম বিষয়ে অনাসক্ত!

একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন, যে মায়ের স্তন পান করিয়া জীবন রক্ষা হইয়াছে কিন্তু একটু ভাবের তারতম্যে সেই স্তন দর্শন করিয়া

আত্মহত্যা পর্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রকৃত দ্রষ্টব্য উহারা এক পায়ে ডুবায়, এক পায়ে উঠায়। কারণ যে রমণী সহধর্মিণীরূপে ধর্মের সাহায্য করতঃ স্বর্গের সোপান প্রস্তুত করিয়া দেয়, সেই রমণী আবার স্বৈরিণীরূপে ঘাড়ে ধরিয়া নরকে নিক্ষেপ করে। যে রমণী পতির মঙ্গল কামনায় দেবতার চরণে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রক্ত প্রদান করে, সেই রমণী আবার স্বহস্তে ছুরিকা-ধারণ পূর্বক পতির বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করে।

স্বর্গ-নরকের চাবিকাঠি একরকম উহাদেরই হাতে। ঘৃণায় উপেক্ষায় রমণীর প্রাণে ব্যথা দিবেন না। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই তিন শক্তিই উহাদের নিকট বর্তমান দেখা যায়। গর্ভে ধারণ করিয়া সৃষ্টি করে। বুকের রক্ত দিয়া পালন করে, আবার রক্ত পান করিয়া সংহার করে। অতএব দীনভাবে প্রণাম করিয়া অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ভগবান লীলার জন্য আধ আধ ভাবে প্রকাশ হইয়া প্রকৃতি পুরুষ রূপে মরজগতে বিহার করিতেছেন।

সুতরাং উহারাই বন্ধন মুক্তির কর্তা। আত্মায় আত্মায় রমণ করে বলিয়া ইহাদের নাম রমণী। আর একটি নাম নারী।

ন অরি নারী অর্থাৎ ইহারা কাহারও শত্রু নয়।

আর এক নাম অবলা। এস্থলে অবলা শব্দে বলহীন হইতে পারে না। কারণ উহারা স্বয়ং শক্তি, শক্তি অর্থেই বল। যেমন সকল বস্তুতেই আগুন আছে বলা যায় কিন্তু আগুনে আগুন আছে বলা পাগলামি মাত্র। অতএব উহারা শক্তিমতী নয়, শক্তি, আর এক নাম প্রকৃতি। 'প্র' শব্দে প্রকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ, কৃতি অর্থে কর্তা, সুতরাং উহারাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কর্তা। এবং প্রকৃতি পুরুষের মিলনই ব্রহ্ম, তাই কপিলদেব সাংখ্যদর্শনে প্রকাশ করিয়াছেন—

"প্রকৃতৌ উপরতায়াং পুরুষঃ স্বরূপেণবাহানি...ইত্যাদি।" অর্থাৎ এ শ্লোকের মূল অর্থ এই যে, প্রকৃতির সহিত পুরুষ যদি মৃতবৎ অর্থাৎ স্বসুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তি দূরে নিক্ষেপ পূর্বক পরমার্থ (ভগবত বিষয়) প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সমস্ত পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন। এই প্রকৃতি যে কেবল ভোগবিলাসের ক্ষেত্র তাহা নহে, মোক্ষেরও ক্ষেত্র। আরও উদ্বাহ-তত্ত্বে স্মৃতিবাক্যে প্রকাশ—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহ গৃহিণীগৃহমুচ্যতে
তয়াহি সহিতঃ সর্বাণ পুরুষার্থান সমুশ্নতে॥

গৃহকে গৃহ বলা যায় না গৃহিণীর সহিত যুক্ত হইলে তবে গৃহ বলা যায়, অতএব এই গৃহিণীর সহিত যুক্ত হইয়া সমস্ত পুরুষার্থ অর্থাৎ ধর্মার্থ কাম-মোক্ষাদি সকল উপভোগ করিবে।

আরও এক কথা, ব্রহ্মা স্বীয় কন্যার রূপে, ইন্দ্র গুরুপত্নীর রূপে, চন্দ্রও গুরুপত্নীর রূপে মোহিত হইয়া ধৈর্যচ্যুত হইয়াছিলেন। এমন কি ব্যাস, পরাশর, বিশ্বামিত্র, দুর্বাসা প্রভৃতি ষাট হাজার বৎসর তপস্যা করিয়াও মোহিনীর মোহজালে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তচূড়ামণি রামানন্দ রায়ের

নিকটে শত শত ষোড়শ বর্ষীয়া দেবদাসী থাকিয়াও কিছুই করিতে পারে নাই, বরং তাঁহার নানারকম ভাবের উদ্‌গম হইত।

এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি যে পুঁথি দেখিয়া পাঠ করিতেছিলেন, তাহা বন্ধ করিলে সঙ্গে সঙ্গে খোল করতালি বাজিয়া উঠিল এবং নামকীর্তন শুরু হইয়া গেল।

আমি আর অপেক্ষা না করিয়া সোজা তখন ধর্মশালার পথ ধরিলাম। এই মাত্র নরনারীর মিলনতত্ত্বের যে সুন্দর ব্যাখ্যা শুনিলাম, তার অন্তর্নিহিত অর্থ সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলেও কেন জানি না সে চিন্তায় শান্তির মুখ-খানি মনে আসিয়া যায়। বোধ হয় একদিন তাহাকে জড়াইয়া মনে মনে যে কল্পনার স্বর্গ রচনা করিয়াছিলাম, জানিতে পারি নাই যে কখন সেই কনখল হইতে গঙ্গা ভাগীরথী ধর্মশালার পথটা আঁকিয়া বাঁকিয়া সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল শান্তির আলয়ে আমায় লইয়া।

॥ বত্রিশ ॥

হঠাৎ একদিন সকালের ট্রেনটা চলিয়া গেল, একদল বাঙালী যজমানকে পাণ্ডিতজী সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন।

একটি পুরুষের সঙ্গে পাঁচজন মেয়েছেলে। তার মধ্যে সবাই সধবা, বয়স তিরিশের নীচে, কেবল একজন বিধবা বয়স্কা মহিলা ছিলেন। এছাড়া একটি পাঁচ-ছ বছরের ফুটফুটে ফ্রকপরা মেয়ে!

আমি যে ঘরটাতে থাকিতাম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকের মহলটিতে তাঁহারা উঠিয়াছিলেন।

মাঁঝখানে বাঁধানো একটা বিরাট চত্বরের ব্যবধান থাকলেও যাতায়াতের পথে প্রায়ই তাঁহাদের সঙ্গে চোখাচোখি হইত। কারণ চত্বর অতিক্রম করিয়া বাগানে ঢুকিবার যে ফটক, ঠিক তাহার পাশেই ছিল আমার ঘর।

বিদেশে একজন বাঙালী আর একজনকে দেখিবামাত্র যেমন আলাপ করিতে ছুটিয়া আসে, বলা বাহুল্য এখানে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল না।

পাণ্ডাজীর ছড়িদার ঈশ্বরলাল স্টেশন হইতে তাহাদের মালপত্র সব লইয়া আসিয়া বুঝাইয়া দিবার পর, সেই দলের ভদ্রলোকটি আমার কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি এখানে কবে এসেছেন ভাই?

তা অনেকদিন হলো!

চেঞ্জে এসেছেন বুঝি?

এবার চিন্তায় পড়িলাম, কি জবাব দিব। আমি হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে আসি নাই, কিংবা জীবন দর্শন করিতেও নয়। মনের মানুষ খুঁজিতে আসিয়াছি—এ কথাও বলিতে পারিলাম না। পাছে উহা শুনিলে অন্য কিছু মনে করেন বা আমায় ভুল বোঝেন, তাই সংক্ষেপে শুধু ঘাড়

নাড়িলাম। তাঁহার প্রশ্নের সম্মতিসূচক জবাব ভাবিয়া ভদ্রলোক চুপ করিয়া গেলেন।

অবশ্য এক অর্থে মিথ্যা বলি নাই। চেঞ্জ-এর জন্য আমি যে এখানে থাকিয়া গিয়াছিলাম তাহা সত্য। তবে সে চেঞ্জ দৈহিক নয়। মানসিক। বাস্তবিক যত দিন যায়, নব নব রহস্যের দ্বার কে যেন আমার চোখের সামনে খুলিয়া ধরে। আমি মুগ্ধ। হতচকিত। একে উপলক্ষ করিয়া যে বহু বিচিত্র মনের খোরাক মিলিয়াছে—দেহ মন পূর্ণ তাহাতে। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার স্মৃতির ছোট বড় নানা সম্পদে উঠিয়াছে উথলিয়া।

বাস্তবিক আমার মনের তখনকার অবস্থা ভাষায় ঠিক প্রকাশ করিতে পারিব না। বৈরাগ্যও নয় কিংবা হতাশাও নয়। বাস্তবের সঙ্গে আদর্শের সংঘাতে বিশ্বাস অবিশ্বাস মেশানো এক প্রকার ধোঁয়াশা আমার মনকে তখন চতুর্দিক হইতে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে পরিচিত পরিবেশ ও নরনারীদের সংসর্গ এড়াইবার জন্য হাজার মাইল দূরের সেই সম্পূর্ণ অজানা অপরিচিত নূতন আবহাওয়া, সাধুসন্ন্যাসীদের পবিত্র তীর্থ ছাড়িয়া যাইতে যেন মন সরিতেছিল না। যদিও জানিতাম এখনি ছাড়িয়া যাইতে হইবে, বেশি আর দেরি নাই।

শান্তিকে খুঁজিতে সেদিন কেন সব ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম, এখন অবশ্য মনে করিলে হাসি পায়। জীবন-সত্য অনুসন্ধান করিতে, না দূর হইতে পিছনে ফেলিয়া আসা জীবনের সত্যকে যাচাই করিতে সে কথা এখন থাক।

যাহা হউক, আমি ওই বলিয়া চুপ করিলে ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করিলেন, এ জায়গাটা খুব স্বাস্থ্যকর শুনেছি, তবে মাছ মাংস নাকি এখানে একেবারে ঢোকা নিষিদ্ধ, লুকিয়ে চুরিয়েও খাবার উপায় নেই, এ কি সত্যি?

হ্যাঁ, যা শুনেছেন সত্যি।

আপনার অসুবিধে হয় না? বাঙ্গালীর ছেলে, এতদিন মাছ না খেয়ে এখানে রয়েছেন কি করে?

বলিলাম, অভ্যেস হয়ে গেছে। তাছাড়া এখানে দুধ, দই মিষ্টি খাবারের অভাব নেই ; যেমন সস্তা, তেমনি জিনিসও ভাল।

তাই নাকি? গাড়িতে আসতে আসতে ওই কথাই আর একজন ভদ্রলোক বলছিলেন বটে!

কথাটা বলিতে গিয়া ভদ্রলোকের রসনাটা এবারে সরস হইয়া উঠিল। মোটাসোটা বেঁটেখাটো চেহারা, দেখিলেই পেটুক বলিয়া ধারণা হয়। বলিলেন, রাবড়িটা নাকি এখানে খুব সস্তা শুনেছি! তবে যাই বলুন মশাই, কাশীর রাবড়ির লোকে যে কেন এত সুখ্যেত করে বুঝলাম না। একেবারে মিষ্টি কম। জোলো আস্বাদ। কেবল আমি নই, আমার স্ত্রীরও মোটে ভাল লাগেনি। সে বল্লে, কতকগুলো সরের চাপড়া, আর মিষ্টি ঘনদুধে ডোবানো।

না স্বাদ, না গন্ধ। কি বলেন মশাই, রাবড়ির একটা নিজস্ব স্বাদ থাকবে না? সন্দেশ খেয়ে দেখেছি, তাও মুখে ভাল লাগে না। আমার তো মশাই রাবড়ির কাছে আর কিছু লাগে না। কলকাতায় অনেক বড় বড় দোকান আছে, সব জায়গায় খেয়ে দেখেছি, কিন্তু ওর মত স্বাদ কারুর নয়। আপনি কি বলেন? ,

কাশীতে গিয়াছিলাম বটে তবে রাবড়ির স্বাদ লইয়া গবেষণা করিবার সাধ বা সাধ্য ছিল না। তাছাড়া কলিকাতায় দ্বারিক ভাল কি ভীম নাগ আরো ভালো উহা পরীক্ষা করিবার সুযোগও কখনো আসে নাই। তাই ওই সব ঔদরিকতত্ত্ব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তাঁহাকে সমর্থন করিয়া বলিলাম, আপনি ঠিকই বলেছেন।

হাঁ-হা—বাবা, আমরা হলুম কলকাতার লোক, আমাদের জিবকে ঠকানো এত সোজা না। কি বলুন? বলিয়া আত্মগর্বে স্ফীত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিলাম, নিশ্চয়।

এখানে রাবড়ি তাহলে খুব ভাল, আপনি বলছেন?

চেহারা দেখে তো সেই রকম মনে হয় তবে আমি খেয়ে দেখিনি।

কেন দেখেননি? পেটের গোলমাল বুঝি, ডাক্তারের নিষেধ! আমি মশাই আপনাদের মত ডাক্তারের কথাকে বেদবাক্য মনে করতে পারি না। ডাক্তারের সব কথা মেনে যদি চলতে হয়, তাহলে সত্যি কথা বলতে কি, মিষ্টি খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়। যদি একটা দু'টো মিষ্টি না খেলুম, তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কি! যেমন রোগ তেমনি ওষুধ তো আছে, নইলে ডাক্তারের কাছে লোক যাবে কেন? বলুন?

হাসিতে গিয়াও পারিলাম না। তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া কেমন মায়া হইল। বলিলাম, ঠিক কথা, যে ক'দিন পারেন, ইট্ ড্রিঙ্ক য়্যান্ড বি মেরী।

আসুন দাদা, হাতে হাত মেলান! এতদিন পরে একটা মনের মানুষ পেলুম। বলিয়াই নিজের হাতটি আমার সামনে বাড়াইয়া দিলেন।

আমিও আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার হাতটা ধরিয়া একটু ঝাঁকাইয়া দিলাম। বেশ 'মাই ডিয়ার' গোছের লোক তিনি। পকেট হইতে খপ করিয়া একটা সিগারেট বার করিয়া বলিলেন, নিন একটা ধরান।

এবার দেশলাই জ্বালিয়া, আগে আমার সিগারেটের মুখে আগুন দিয়া তারপর নিজেরটায় দিলেন। প্রথম টানে ধোঁয়াটা গলায় আটকাইয়া গেলে খানিকটা কাশিয়া চোখমুখ লাল করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, আলাপ করবো পরে, এখন আসি। দেখিগে গিন্নীরা সব কেমন গোছগাছ করলেন। আমার মশাই এইসব বাজে ঝামেলা সহ্য হয় না। ওই যে সব হাঁড়িকুড়ি বিছানা-মাদুর গোছগাছ বাঁধাছাদা, আমি ওর ভেতর নেই। ওসব হাঙ্গামা আমার স্ত্রী করেন। এসব বিষয়ে তিনি খুব এক্সপার্ট, আলাপ করলেই বুঝতে পারবেন। আমি তাই পোঁছে দিয়েই সরে পড়েছি। এইভাবেই কাশী, গয়া, এলাহাবাদ, দিল্লী

ঘুরে এখানে এসেছি। ফেরার পথে ঠিক করেছি, আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন হয়ে যাবো। কেমন, প্রোগ্রাম ঠিক করিনি?

বলিলাম, ভালই করেছেন।

এইসব কাজ মশাই যা বলবেন, আমি না করবো না। তবে ওই হাঁড়িকুড়ি বাক্সটাক্স গোছানোর মধ্যে আমি নেই। ওটা মেয়েদের ডিপার্টমেন্ট, মেয়েদের হাতে থাকাই ভালো।

বলিলাম, তার চেয়ে হোটেলে উঠতে পারেন, কোন হাঙ্গামা থাকে না।

গলাটা নামাইয়া তিনি বলিলেন, রামো, হোটেলে গুচ্ছের পয়সা যায় কেবল! যেদিন যেটা খেতে ইচ্ছা হলো, সে খাবার স্বাধীনতা তো থাকে না। এই ধরুন না কেন, কাশীতে মশাই মাছ এত সস্তা যে কি বলবো! একেবারে তিন-চার রকম কিনে হাজির করলুম। ইয়া বড় বড় পাব্দা, এই চিতলের পেটি, বাঁশপাত্তি, খয়রা—

বলিলাম, আপনাদের সঙ্গে তো অনেক বিধবা রয়েছেন দেখলুম।

একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া তিনি উত্তর দিলেন, উনি খুব ধার্মিক মহিলা তাই কোন অসুবিধা হয় না। উনি উপোস করে ঠাকুরের প্রসাদ খান, তাছাড়া কোনদিন হবিষ্যি, কোনদিন শুধু ফলমূল, দুধ খেয়েই কাটিয়ে দেন। ওঁর বিশ্বাস তা না হলে পুণ্যি হয় না। বলেন, তীর্থ করতে এসেছি, খেতে আসিনি তো? খাওয়া তো আছেই জীবনভোর, পোড়া পেট যতদিন থাকবে! এখানে তো জীবনে আর দুবার আসছি না।

বলিলাম, কথাটা ঠিকই। বিধবা মানুষ তীর্থ করতে এসেছেন, আর হয়ত কখনও আসবেন না।

আমি মশাই কারো ধর্ম-বিশ্বাসে হাত দিতে যাই না। যাঁর যেমন খুশী তিনি তাই নিয়ে থাকুন। 'বিশ্বাসে মেলায় বস্তু তর্কে বহুদূর!' কি বলেন ভাই, ভালো করিনি!

হ্যাঁ, ঠিকই করেছেন।

আচ্ছা, এখন তাহলে আসি। পরে আলাপ হবে। দেখি এখন গিন্নীদের কি হুকুম!

বলিতে বলিতে কয়েক পা চলিয়া গিয়া, আবার ফিরিয়া আসিলেন।— আসল কথাটাই ভুলে গেছি, আপনার নামটাই জিজ্ঞেস করা হয় নি!

বলিলাম, অলোক রায়।

ব্রাহ্মণ?

না, কায়স্থ। আপনার নামটি কি জিজ্ঞেস করতে পারি?

নিশ্চয়। আমার নাম শ্রীনিবারণ হালদার। আমরা ব্রাহ্মণ। তবে অনেকে প্রশ্ন করেন, কালীঘাটের হালদারদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে কিনা? বলি, না। আমাদের তিন পুরুষের বাস ওই বেহালাতে। জন্ম, কর্ম সবই আমার ওইখানে।

বলিলাম, আপনি কোথায় চাকরি করেন?

কোথাও না। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন।

তবে?

ওই যে বললুম, জন্ম কর্ম সব ওইখানে!

তার মানে কোন কাজ-কারবার করেন ওইখানে?

ঠিক ধরেছেন। কিন্তু কি করে বুঝলেন ভাই এক কথায়!

বলিলাম, সোজা হিসেব। চাকরি না করলে মানুষ ব্যবসা করে। নইলে তার চলে কি করে?

ঠিক ধরেছেন। এর চেয়ে সোজা হিসেব আর কিছু নেই। তবে ভাই ওই অঙ্ক জিনিসটা ছেলেবেলা থেকে আমার মাথায় ঢোকে না। আর কেউ বুঝিয়ে দিলে চট করে বুঝতে পারি। বলিয়া সিগারেটের শেষ অংশটা মুখ হইতে ছুঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আবার নিজের প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিলেন। বলিলেন, আমাদের ওখানে কি কখনো গিয়েছেন ভাই?

বলিলাম, না।

যদি কোনদিন যান, তাহলে দেখতে পাবেন হালদার কোম্পানীর বাস রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে লেখা ঘোলসাপুর, কুলপি, হাজিপুর, ডায়মণ্ডহারবার। চারখানা গাড়ি আমার ওইখানেই খাটে, আর দুখ্যান্য বজবজ, মোমিনপুর। তা আপনার বাপমায়ের আশীর্বাদে আমার অফিসেই ড্রাইভার, ক্লিনার, মেকানিক, টিকিটচেকার সব মিলিয়ে প্রায় পনের ষোল জন চাকরি করে।

বলিলাম, আপনি একাই মালিক, না ভায়েদের শেয়ার আছে?

জিব কাটিয়া নিবারণবাবু বলিলেন, কারুর সঙ্গে শেয়ারের কারবার করবেন না কখনো। তা সে ভাই হোক, কি অন্য কোন লোক হোক। এটা ঠাকুরের কৃপায় আমার একার। তাছাড়া আমি তো ভাইয়েদের মত বিদ্বান নই, দুতিনটে পাস করিনি, লেখাপড়া শিখিনি। আমি একটা মুখ্যু। তিনবার চেষ্টা করেও ম্যাট্রিকটা পাস করতে পারিনি। তাই অনেক দিন বেকার বসে থাকার পর, ধারদেনা করে একটা পুরনো বাস কিনে মেরামত করে নিজেই চালাতে শুরু করে দিই। সেই বাস-ই আমার লক্ষ্মী! তারই কৃপায় ক্রমশঃ একটি থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটে—এখন ছ'টার মালিক মায়ের কৃপায়।

এই বলিয়া আবার একটি সিগারেট আমার হাতে দিয়া আর একটি ধরাইয়া বলিলেন, ভাই অবশ্য আমার আছে। একজন নয়, আরো দুজন—তারা পাছে ছোট ভাইকে খেতে দিতে হয় বলে, যে যার আগেই সরে পড়েছিল। বড়জন টাটায় চাকরি করে। আর মেজ জামালপুর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে। সেখানে যে যার কোয়ার্টারে থাকে, নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে। আমার ওই একটি মেয়ে। বাপের আমলের বড় বাড়ি বাগান পুকুর সবই আছে, ভাঙাচোরা অবস্থায়, কিন্তু আমি ওই ভায়েদের যৌথের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে নিজেই আলাদা বাড়ি করেছি, রায় বাহাদুর রোডে। হখন পরিচয় হল ভাই যদি কোন-

দিন ওদিকে যান, আসবেন একবার গরীবের বাড়িতে। ঠিকানা মনে রাখার দরকার হবে না। আমার নামটা মনে না থাকলেও ক্ষতি নেই। শুধু বলবেন, হালদার কোম্পানীর বাড়ি কোন্‌টা। অন্ধও দেখিয়ে দেবে। বাড়ির সঙ্গেই গ্যারাজ করেছি। আচ্ছা আসি ভাই, গিন্নীর ওদিকে গোছগাছ হয়ত সব শেষ হয়েছে।

আবার কয়েক পা গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখুন ভাই, ওই আমার বড় রোগ, আসল কথা লোককে জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাই। কিছু মনে করবেন না যেন। আসলে আপনি কি করেন, কোন্ আপিসে চাকরিবাকরি করেন, এটা জিজ্ঞেস না করে নিজেরটাই কেবল বলে চলেছি, দেখুন তো আপনি কি মনে করলেন!

না-না, আমি কিছুই মনে করিনি। আপনি যা করেছেন সত্যি তা পাঁচ-জনকে বলার মত। এই বাজারে লেখাপড়া না শিখে শুধু বুদ্ধির জোরে যে এতবড় ব্যবসাটা চালাচ্ছেন, সে কি যা-তা ব্যাপার! আপনার পনেরো-ষোল জন কর্মচারী যদি থাকে, অন্ততঃ পক্ষে পনেরো-ষোলটা পরিবার প্রতিপালিত হচ্ছে আপনার অনুগ্রহে।

নিবারণবাবু খপ করিয়া দুই হাত কপালে ঠেকাইলেন, আরে ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। আমার অনুগ্রহ নয়, যে যার ভাগ্যে করে খায়। আমার স্ত্রী বলে, আমরা ওদের ভাগ্যে করে খাচ্ছি।

বলিলাম, তবু একজনকে তো তার জন্যে উদ্যোগ-আয়োজন করতে হয়, নইলে হাওয়া খেয়ে তো মানুষের অন্নের সংস্থান হয় না!

এ কথাটা অবশ্য ঠিকই বলেছেন। বলিয়া নিবারণবাবু কণ্ঠে একপ্রকার সুর টানিয়া সহসা নীরব হইয়া গেলেন। তারপর যে কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, হঠাৎ আবার সেই প্রসংগ তুলিয়া বলিলেন, হাঁ, যে কথাটা জিজ্ঞেস করছিলুম ভাই, আপনি কোন্ অফিসে...

কোন অফিসে-ই নয়।

সহসা নিবারণবাবুর চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।—অর্থাৎ কোন ব্যবসা করেন আমার-ই মত! কেমন? আপনার মুখ দেখেই ধরতে পেরেছি।

ইহার পর আমি কি উত্তর দিব ভাবিতে লাগিলাম।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, লজ্জা পাচ্ছেন কেন?

বলিলাম, যদি আপনার অনুমান ঠিক হতো তাহলে লজ্জার কোন কারণ থাকত না সত্যি। কিন্তু যে চাকরিও করে না, ব্যবসাও করে না, তার কি লজ্জা পাওয়া উচিত নয়?

নিবারণবাবুর মুখের রেখাগুলি সহসা যেন একটা আঘাত খাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। একপ্রকার শূন্য অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, আমি বেকার, বিশ্বাস করুন।

না-না। সে কেমন করে হয়! আপনি একটা ইয়ংম্যান, দিব্যি স্বাস্থ্য, অসুস্থ কিংবা রুগ্ন নন, আপনি বেকার? এ কথা বললে আমি কেন কেউই বিশ্বাস করবে না।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, দুর্ভাগ্য আমার।

নিবারণবাবু হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, আপনার ছেলেমেয়ে কটি?

তার মানে! একটা ঢোঁক গিলিয়া এবার জবাব দিলাম, বিয়েই এখনো করিনি—

এই তো মশাই, আসল জায়গায় ভুল করে বসে আছেন!

আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া তিনি বলিলেন, স্ত্রীভাগ্যে ধন, আমাদের বাঙ্গালীদের মধ্যে যে কুসংস্কারটা আছে, জানি না আপনি তা বিশ্বাস করেন কিনা, আমি তো মশাই করি। যাকে বলে একেবারে ভুক্তভোগী! তবে বলি শুনুন—বিয়ের আগে আপনার মত আমিও বেকার ছিলুম। আমার এক বন্ধুর একখানা বাস ছিল, তাতে লাভ হতো না, ড্রাইভার আর কনডাক্টারের সঙ্গে একত্রে ঘুরে বেড়াতে তার আত্মসম্মানে লাগত। তাই শুধু অফিস সাজিয়ে সে বসে থাকতো। তার অফিসে বসে সারাদিন আড্ডা মারতুম, মাটির ভাঁড়ে চা খেয়ে আর বিড়ি ফুঁকে। একদিন পাড়ার এক ঘটক এসে বললে, বাবু, একটা ভালো মেয়ে আছে, বিয়ে করবেন?

বন্ধু তখন ব্যবসাটা বেচে দেবার মতলব করছে। এক পাঞ্জাবী ড্রাই-ভারকে। নগদ এক হাজার টাকা আর বাকীটা সে কিস্তিতে শোধ দেবে বলছে, কিন্তু বন্ধু তাতে রাজী নয়।

বিয়ের কথা শুনে আমি ঘটককে বললুম, দু হাজার টাকা আমার নগদ চাই, আর কিছু দিক না-দিক এসে যায় না!

ঘটক এবার মাথাটা চুলকে বললে, বাবু, আপনি যদি কিছু কাজকর্ম করতেন, তাহলে দু'হাজার কেন, আরও বেশী আমি পাইয়ে দিতুম।

ধমক দিয়ে উঠলুম ঘটককে, আমি কাজকর্ম করি না তোমাকে কে বললে? আমি তো শেয়ারে অনেক দিন ধরে এর সঙ্গে মোটরবাস-এর ব্যবসা করি।

থতমত খেয়ে এবার ঘটক জবাব দিল, ও, তাই আপনাকে সব সময় কোম্পানীর অফিসে দেখি!

হ্যাঁ। নইলে কি প্রত্যেক দিন এখানে ভেরাণ্ডা ভাজতে আসি!

উৎসাহে ঘটকের চোখমুখ জ্বলে উঠল। বললে, তাহলে আর ভাবনা নেই, আজ আমি সব ঠিক করে ফেলবো। আপনার দুই ভাই ভাল চাকরি করছে। তারপর নিজের বাড়িঘর সব রয়েছে, আবার আপনি যখন ব্যবসা করছেন তখন আপনিও সোনার টুকরো পাত্র!

বন্ধুকে একটু টিপে দিলাম। পাত্রীর পিতা এলে যেন সেইভাবে কথা বলে। ব্যস, বিয়ে হয়ে গেল। তখন সেই নগদ দু হাজার টাকার সঙ্গে স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়ে মোটরবাসটা কিনে ফেললুম। তারপর নিজেই ড্রাইভারের

পাশে বসে, ঘোলসাপুর থেকে হাজিপুর দিনে চারবার যাতায়াত করতে লাগলুম।

ফলে প্রথম মাসেই লাভ করলুম তিনশো টাকা, বিশ্বাস করো ভাই! কাঁচা পয়সার 'বিজ্‌নেস্‌'—নিজে না দেখলে পাঁচজনে তো লুটেপুটে খাবেই।

সেই সূত্রপাত। সেই থেকে দিনে দিনে আয় বেড়েই চললো।

আমার স্ত্রী বলে, দ্যাখো আমিই তোমার লক্ষ্মী। বিয়ের আগে তোমার সংসারে কি ছিল, আর এই ক'বছরে কি হয়েছে!

এই বলিয়া একটু থামিয়া আবার শুরু করিলেন, শাস্ত্রে যে বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন, কথাটা মিথ্যে নয় ভাই। তাই আমি বলি কি, একটা বিয়ে করে ফেলুন আগে, তারপর দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

বলিলাম, নিজের পেট চালানো দায়, তার ওপর আবার একজনের দায়িত্ব ঘাড়ে নেবো! কি যে বলেন! আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে আমি একমত হতে পারলুম না।

তিনি বলিলেন, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা! আচ্ছা আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করবেন, কথাটা সত্যি কি মিথ্যা।

বলিলাম, আপনার স্ত্রীকে সাক্ষী মানতে হবে না। আপনার কথাই আমি বিশ্বাস করছি।

যদি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন, তাহলে আর দেরি করবেন না। যেমন করে হোক একটা বিয়ে করে ফেলুন। দেখবেন আপনার 'লাক' ফিরে যাবে।

তারপর সিগারেটের টুকরোটা মুখ থেকে ফেলিয়া দিয়া বন্ধুর মত দরদী কণ্ঠে কহিলেন, আরে ভাই, ঘাড়ের ওপর বোঝা চাপলে তখন কি আর এই-ভাবে এক জায়গায় চুপচাপ বসে থাকতে পারবেন? যেমন করে হোক ঘাড়ের বোঝাটা নামাবার জন্যে ছুটোছুটি করে একটা কিছু উপার্জনের পথ আপনি-ই আবিষ্কার করে ফেলবেন। তখন বুঝতে পারবেন, আমার কথাটা কতখানি খাঁটি।

আমি তো ভাই বেকার ছেলে দেখলেই আগে বলি একটা বিয়ে করতে। ও রোগের ওই এক ওষুধ।

বলিয়া আমার মুখের উপর ঈষৎ হাসিয়া, চুপ করিয়া গেলেন। তারপর পিছন ফিরিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া পুনরায় কহিলেন, ওই যা, আপনার নামটা যেন কি বললেন ভাই!

অলোক রায়।

বাঃ, ভারী সুন্দর নাম, আপনার বাপ-মা দিয়েছিলেন তো? আমার নামটা কিন্তু বড় বিচ্ছিরী। নিবারণ হালদার। সত্যি বলছি, মা-বাবার ওপর এক এক সময় বড় রাগ হয়, এত নাম থাকতে আর খুঁজে পেলেন না কিছু। আমার স্ত্রীও বলে যখন তখন, তোমার নামটা কে রেখেছিল বল তো!

বলি, কি করে জানবো? আমি নিজে যে রাখিনি সেটা তো বুঝতে পারো।

তার উত্তরে আমার স্ত্রী বলে, তুমি বোকা, যখন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলে তখন ওই নামটা বদলে আর একটা সুন্দর নাম রাখলেই পারতে।

বলি, সে ভুলটার জন্যে এখন খুব আফসোস হয়।

এই বলিয়া একটু থামিয়া তারপর আপন মনেই হাসিয়া উঠিলেন। এবং হাসির শেষ রেশটুকু মুখ হইতে মিলাইবার পূর্বেই কহিলেন, অবশ্য এর জন্যে এখন আর আমার কোন দুঃখ নেই। আমার অর্ধাঙ্গিনীর নামটি ভারী চমৎকার। সে ওটা পুষিয়ে দিয়েছে। তার নাম ঊষসী, আমার নতুন বাড়ির নাম দিয়েছি তাই 'ঊষসী'! আমার গিন্নী অবশ্য বলেছিল, "নিবারণ কুটির" রাখতে। আমি বললুম, না, তোমার এমন সুন্দর নামটা অন্ততঃ দশজনে জানুক। বড় রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে কত লোকের নজরে পড়ে। তাছাড়া তোমার জন্যেই যখন আমার সব, তখন তোমার নামে বাড়িটা হওয়া উচিত। গৃহিণী কথাটাও গৃহ থেকেই এসেছে, কি বলুন ভাই! আমি মুখ্যু মানুষ, লেখাপড়া শিখিনি, কিন্তু আমার মনে হয়, ওই গৃহ কথাটা থেকেই গৃহিণীর উৎপত্তি! কি, ঠিক বলিনি?

এই বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তারপর সহসা হাসিটা বন্ধ করিয়া বলিলেন, স্ত্রী ছাড়া পুরুষের যখন অন্য গতি নেই, আমার মনে হয়, ওই যে পণ্ডিতেরা লিখে গেছেন—পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমন্তপঃ, ওটা ভুল! অন্ততঃ এ যুগে আর চলে না। তাই আমার মনে হয়, এখন ওই 'পিতা' কথাটাকে কেটে সেখানে 'স্ত্রী' বসিয়ে দেওয়া উচিত। স্ত্রী মানে ভাগ্যলক্ষ্মী! কাজেই একটা বিয়ে আপনি আগে করে ফেলুন ভাই কথা শুনে, দেখবেন হাতে হাতে ফল পাবেন! হ্যাঁ আপনার গোত্রটা কি বলুন তো ভাই!

এবার হাসিয়া ফেলিলাম।—কি, হাতের কাছেই পাত্রী 'রেডি' আছে নাকি? মনে হচ্ছে, যেন আপনি এখুনি একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে চান'

নিবারণবাবু এবার হাসিয়া বলিলেন, আমার স্ত্রীর কিন্তু সত্যি সত্যি এ বিষয়ে খুব হাত-যশ আছে, পাড়ার বহু মেয়ের বিয়েতে সে ঘটকালি করেছে। তাকে-ই বলবো।

সেই সময় সেই ফ্রকপরা মেয়েটি আসিয়া বলিল বাবু, মা তোমায় ডাকছে, শিগ্‌গীর এসো!

হ্যাঁ, চলো যাই। বলিয়া আমার দিকে পিছন ফিরিতে ফিরিতে বলিলেন, আচ্ছা ভাই, এখন তবে আসি। পরে আবার আলাপ করবো। আমরা এখানে এক হপ্তা থাকবো বলে এসেছি।

বলা বাহুল্য, তিনি বিদায় হইলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

প্রথম দর্শনেই যিনি তাঁর জীবনের কোন কাহিনী বোধ হয় শোনাইতে বাকী রাখেন নাই—আবার এর পরে আরো কি বলিবেন, তাহা কল্পনা করিয়া মনে শিহরিয়া উঠিলাম।

বাগানের ফটকের পাশেই আমার ঘর। যাতায়াতের পথে তাই নিবারণবাবু একবার করিয়া ঢুঁ মারিয়া যাইতেন।—এই যে ভাই, কি হচ্ছে? চা খাওয়া হয়ে গেছে? কিংবা প্রশ্ন করিতেন, আজ কোন্ দিকে বেড়াতে যাবেন? ইত্যাদি।

এইভাবে বিনা আহ্বানেই একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া, আমার খাটিয়ার উপর জাঁকাইয়া বসিয়া, পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া নিজে একটা ধরাইতেন ও আমায় একটা দিতেন। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিতে শুরু করিতেন, এখানকার খাবারদাবারগুলো, যাই বলুন ভাই, কাশীর চেয়ে অনেক ভালো। রাবড়ি অনেক সরেস। তবে ওই যা বললুম, মিষ্টি একটু কম, আমরা কলকাতার লোক একটু মিষ্টি রাবড়ি খেতে অভ্যস্ত, তাই যত সরেস আর খাঁটি দুধের তৈরী হোক না কেন, আমাদের ঠিক 'অ্যাপিল্' করে না। আমার স্ত্রীরও মত ঠিক আমারই মত!

নিবারণবাবু জিজ্ঞাসা করেন, এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?

আমি কোনদিন'ও রাবড়ি কিনিয়া খাই নাই, তাই একটু থামিয়া বলিলাম, আপনার স্ত্রী ঠিকই বলেছেন!

স্ত্রীর প্রশংসায় ভদ্রলোক যেন পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন, হাজার হোক আমার স্ত্রী খাস বাগবাজারের মেয়ে তো! আমার শ্বশুরবাড়ি বাগবাজারে। বুঝলেন ভাই, সেইজন্যে বিশেষ করে মিষ্টান্নের ব্যাপারে দেখছি, ও যা বলে তার উপর আর কথা চলে না! আমার স্ত্রী বলে, এদেশের লোকে খাঁটি জিনিস খায় বটে তবে এদের রুচিজ্ঞানের বড় অভাব। বাঙ্গালীর মত সব জিনিসকে রসিয়ে, মজিয়ে, তারিয়ে খাবার শিক্ষা এদের নেই। তার মানে বাঙ্গালীর 'কালচারটা' এরা পাবে কোথায়! আমার স্ত্রী ঠিকই বলে।

ভদ্রলোক বড়ই স্ত্রৈণ। তাহার কারণও অবশ্য যথেষ্ট ছিল। আমার সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীর তখনও পর্যন্ত মুখোমুখি আলাপ হয় নাই, তবে আসা যাওয়ার পথে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, রং ফর্সা নয় তবু তাঁহাকে দেখিতে বেশ ভাল—যেমন মুখের গড়ন, তেমনি সুগঠিত দেহ।

নিবারণবাবুর ওই থসথসে ভুঁড়িওলা, বেঁটে কালো চেহারার পাশে তাঁহাকে রীতিমত সুন্দর দেখায়। তাছাড়া তাঁর চলনেবলনে এমন একটা আভিজাত্য ছিল যে দেখিলেই মনে হয় খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে।

একদিন নিবারণবাবু হঠাৎ ঘরে আসিয়া বলিলেন, আপনি তো ভাই এখন আছেন ঘরে?

তখন বোধ হয় বেলা সাড়ে বারোটা কি একটা হইবে। আমি দিবপ্রাহরিক বিশ্রামের আয়োজন করিতেছিলাম। বলিলাম, হ্যাঁ। এই দুপুর-রোদে কোথায় যাবো! কেন বলুন তো?

এই, মানে উনি বলছিলেন, তোমরা ঘুরে এসো আমি থাকি। জানি এখানে ভয়ডর কিছু নেই, সাধুসন্ন্যাসীদের জায়গা। তবু হাজার হোক আপনি

বাঙ্গালী, দেশের লোক, একটু নজর রাখবেন। অবশ্য মেয়েটা রইলো। ছড়িদারকেও বলে রেখেছি। সেও বলে, 'কুছ্ ডর নেহি বাবুজি, ইয়ে তো স্বর্গদোওয়ার হ্যায়'—তবু আমরা খাস কলকাতা শহরের মানুষ, মুখে যে যতই বলুক, বাইরের লোকজনকে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারি না, কি বলুন?

বলিলাম, না-না, এ সে জায়গা নয়। ঈশ্বরলাল ঠিকই বলেছে। আপনি নির্ভাবনায় চলে যান।

তিনি সে কথায় কান না দিয়া বলিতে লাগিলেন, পরশুদিন চণ্ডীর পাহাড়ে উঠে আমার স্ত্রীর পায়ে খুব ব্যথা হয়েছে। তাই আজ মনসার পাহাড়ে যেতে চাইছে না। তাছাড়া অম্বলের অসুখ আছে কিনা, কাল বেশ খানিকটা রাবড়ি খেয়ে পেটটাও আজ ঠিক নেই।

বলিতে বলিতে পকেট হইতে একটি নতুন সিগারেটের প্যাকেট বাহির করিয়া তাহার মুখটা ছিঁড়িয়া কহিলেন, ওই তো দেখা যাচ্ছে মনসা পাহাড়, খুবই নীচু কি বলুন। আমার তো মনে হয় চণ্ডী পাহাড়ের তুলনায় এ কিছুই নয়। যেতে আসতে বড় জোর ঘণ্টা দুই, আর কি! বলিয়া হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকাইয়া লইয়া আবার নিজের বক্তব্যে ফিরিয়া আসিলেন, এখন ধরুন একটা, তিনটে কি বড় জোর সাড়ে তিনটের ভেতরেই আমরা ফিরতে পারবো নিশ্চয়ই!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি এখন পাঁচটা পর্যন্ত আছি, তার আগে ঘর থেকে বেরুব না। আপনি ততক্ষণ ঘুরে আসুন।

এবার একটা সিগারেট প্যাকেট হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন এবং নিজেরটা ধরাইয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ঘুমাই নাই। জানলা দিয়া বাইরের লকেট ফলের গাছটার দিকে তাকাইয়া ছিলাম। পাকা পাকা থোলো থোলো অরেঞ্জ রঙের ফল, ডালে ডালে ঝুলিতেছে। ঘন সবুজ পাতার ফাঁকে ঠিক যেন মনে হইতেছে কমলালেবু রঙের ফুল গুচ্ছ গুচ্ছ ফুটিয়া রহিয়াছে।

হঠাৎ দেখি একটা ছোট্ট পাখী উড়িয়া আসিয়া একটি ফলের উপর বসিল। ঠোঁট দিয়া বার বার ঠোক্কর মারিয়া কোন ফলের গায়ে ছিদ্র করিতে না পারিয়া আবার উড়িয়া গিয়া অপর একটি ডালে বসিয়া ঠিক সেইভাবে অন্য ফলে আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও কোন সুবিধা হইল না। বোধ হয় ফলগুলি তখনও পাকিতে দেরি ছিল, গায়ের রং সোনালি দেখিয়া বুঝিতে পারে নাই—অথচ রসের লোভও ত্যাগ করিয়া সে যেন উড়িয়া যাইতে পারিতেছিল না!

বিছানায় শুইয়া পাখীটিকে লক্ষ্য করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম, আহা, রূপের মোহে পড়িয়া বেচারীর কি ব্যর্থতা!

সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, উহার কি অপরাধ? বিশ্বপ্রকৃতির সর্বত্রই তো এই

লীলাখেলা চলিতেছে। আগে রূপ পরে রস। রূপের ভিতরে থাকে রস, যেমন ফুলের মধ্যে মধু। রূপ বাহিরের সৌন্দর্য, আর রস অন্তরের মাধুর্য। রূপের সাধনা ছাড়া তাই বুঝি রসতত্ত্বে পেঁছানো যায় না!

বৈষ্ণব মহাজনদের কথা মনে পড়িয়া যায়। তাঁহাদের রচিত বাছা বাছা কয়েকটি পদ লইয়া মনের মধ্যে গুনগুন করিতেছি, "চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিতে মোর, সে হইতে মোর হিয়া থরথর—মন্মথ জ্বরে ভোর—"। এমন সময় সোনার চুড়ির কঙ্কনধ্বনি কানে আসিতে চমকাইয়া উঠিলাম। পিছন ফিরিয়া দেখি একেবারে আমার বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া নিবারণবাবুর স্ত্রী! ইতিপূর্বে কোনদিন তাঁর সংগে মুখোমুখি আলাপ হয় নাই। বরং লক্ষ্য করিতাম, আমার ঘরের কাছ দিয়া যাতায়াত করিবার সময় সলজ্জভাবে মাথার কাপড়টা যেন একটু বেশী টানিয়া দিয়া মুখটা আমার দিক হইতে তিনি ঘুরাইয়া লইতেন।

সত্য কথা বলিতে কি, নারীর এই সলজ্জ ভংগীটি আমার ভালই লাগিত। ভদ্রঘরের মহিলারা পরপুরুষের সংগে এইভাবে যে ঈষৎ ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলেন, তাহাতে যেন তাঁহাদের মর্যাদা ও আভিজাত্য আরও বাড়িয়া যায়।

তাই স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে একেবারে বিনা নোটিশে আমার ঘরের মধ্যে দিবাদ্বিপ্রহরে একেবারে একা দেখিয়া প্রথমটা একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। তবু অপরিচয়ের সংকোচ কাটাইয়া আমি প্রথম কথা বলিলাম।

নিবারণবাবু বলছিলেন, আপনার পায়ে খুব ব্যথা হয়েছে, আপনি নিজে তাই কষ্ট করে এতটা না এসে, মেয়েকে দিয়ে আমায় একটু খবর পাঠালেই পারতেন, আমি যেতুম।

সুমিষ্ট কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন, মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাছাড়া দরকারটা যখন আমার নিজের—

সংগে সংগে আমি খাটিয়া হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম, আপনি বসুন এখানে।

না না, আপনি উঠবেন না। আমি বসতে আসিনি। এখুনি চলে যাবো।

আমি খাটিয়াতে আবার বসিতেই তিনি ধীর অচঞ্চল কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, আপনি বোধ হয় আমায় চিনতে পারছেন না?

এবার তাঁর মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া একটু ভাবিয়া বলিলাম, ঠিক মনে পড়ছে না তো কোথায় দেখেছি!

আমি কিন্তু আপনাকে চিনি! আপনার নাম তো অলোক রায়?

হ্যাঁ। বিস্মিত কণ্ঠে এবার প্রশ্ন করিলাম, আপনি আমায় চেনেন বলছেন, অথচ আমি তো কিছুতেই মনে করতে পারছি না যে কখনও আপনাকে দেখেছি কোথাও!

সে অবশ্য অনেক দিনের কথা, আপনার মনে থাকা হয়ত সম্ভব নয়—কিন্তু আমি ভুলিনি। এবং জীবনে কোন দিন বোধ হয় ভুলতেও পারবো না!

শেষের এই কথাটা আমার কানে এমনভাবে ধাক্কা দিল যে আমি সচকিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে আরও ভাল করিয়া তাকাইলাম।

তিনি বলিলেন, আচ্ছা আপনি কখনও বাগবাজার অঞ্চলে কারও বাড়িতে কিছুদিন গৃহশিক্ষক ছিলেন? মনে পড়ে?

বুকের মধ্যেটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। পাছে মুখে সে ভাব প্রকাশ পায় তার জন্য যতদূর সম্ভব উদাস কণ্ঠে বলিলাম, না, কিছুই তো মনে পড়ছে না!

আমার সেকথার জবাব না দিয়া খপ্ করিয়া তিনি বলিয়া ফেলিলেন, যে বাড়িতে একটি যুবতী মেয়ে ছিল, একদিন গভীর রাত্রে তার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে আপনি হাতে-নাতে ধরা পড়ে যান সেই মেয়ের বাবার কাছে, মনে পড়ে? আর সেই রাতদুপুরে তিনি আপনাকে দারুণ অপমান করে তাড়িয়ে দেন বাড়ি থেকে, বদনাম দিয়ে?

অপমানে লজ্জায় আমার সমস্ত শরীর মন কাঁপিতে লাগিল। তবু কণ্ঠে জোর দিয়ে বলিলাম, বিশ্বাস করুন, যা শুনেছেন সব মিথ্যা। একেবারে ডাহা নির্জলা মিথ্যা। এর মধ্যে একবিন্দু সত্যি নেই। মিছিমিছি ওই কলঙ্কের অপবাদ আমার মাথায় দিয়ে তিনি আমায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন!

যদি আপনার কথাই সত্যি বলে ধরতে হয়, তাহলে সেদিন এর একটুও প্রতিবাদ না করে মুখ বুজে সব অপমান মাথায় তুলে নিয়েছিলেন কেন?

দেখুন, সত্যি বলছি আমি নির্দোষ! আপনি বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, যিনি আমায় দুর্দিনে রাস্তা থেকে তুলে এনে ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন—তাঁর যুবতী বিবাহযোগ্য মেয়ে যে চুপি চুপি আমার জামার পকেট থেকে পয়সা চুরি করে নেয় ঘুগনি আলুকাবলি খাবার জন্যে, এ যদি তার বাবাকে বলতুম তখন, তিনি কি তা বিশ্বাস করতেন? প্রায়ই আমার পকেট থেকে পয়সা কে চুরি করে বুঝতে পারতুম না! একদিন গভীর রাতে চোর মনে করে তার হাতটা চেপে ধরেছি। যেই সে চেঁচিয়ে উঠেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে বাবা দরজার খিল খুলে বেরিয়ে এসে আলো জ্বালতেই দেখেন, তাঁর মেয়ের হাতটা আমার হাতের মধ্যে রয়েছে—বুঝতেই পারছেন, তখন আমার অবস্থা!

বাঃ, চমৎকার যুক্তি তো আপনার। এত বড় অপমান, এত বড় অপবাদ বিনা প্রতিবাদে মাথায় তুলে নিলেন? আপনি যতই যা বলুন, কোন লোকই কিন্তু এটা বিশ্বাস করবে না। এত অপমান কোন মানুষের পক্ষে বিনা অপরাধে কি কখনো মুখ বুজে সহ্য করা সম্ভব!

জানেন কেন বলিনি! তার প্রধান কারণ, ভদ্রলোক ছিলেন ভীষণ বদরাগী—প্রথমতঃ আমার কোন সাক্ষীপ্রমাণ ছিল না, যতই বলি না কেন, তিনি আমার সেকথা বিশ্বাস করতেন না। দ্বিতীয়তঃ হয়ত মেয়েকে আমারই সামনে মেরে খুন করে ফেলতেন—

তাতে আপনার কি? যে অপরাধী তার শাস্তি হত! ভালই তো!

এবার আমি বললাম, কিন্তু তবু কি তিনি আমার কথায় বিশ্বাস করতেন,

অপমান না করে রেহাই দিতেন?

নিবারণবাবুর স্ত্রী একটু থামিয়া যেন কি চিন্তা করিলেন। তারপর চাপা গলায় বলিয়া ফেলিলেন, তার মানে আপনি নিশ্চয় মনে মনে মেয়েটিকে ভালবাসতেন। নইলে এত বড় অপমান কেউ এমন মুখ বুজে সহ্য করতে পারে না। এ আপনি একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। তা সত্যি সত্যিই যদি তাকে ভালবেসেছিলেন, সে কথাটা বললেই পারতেন। এই বলিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং গলার মধ্যে যেন কি একটা চাপিয়া লইলেন।

একটু চুপ করিয়া তারপর আমি বলিলাম, দেখুন একথা আমি কাউকে কোন দিন বলিনি, নেহাৎ আপনি খুঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন বলে—যা সত্যি আপনাকে বলেছি। আপনি বিশ্বাস করুন বা না-করুন তাতে কিছু এসে যায় না আমার। কিন্তু একটা ব্যাপার আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না, এইসব একান্ত প্রাইভেট কথা আপনি জানলেন কি করে? তাদের সংগে কি আপনার কোন আত্মীয়তা ছিল? না আপনি ওখানেই থাকতেন?

কোন জবাব না দিয়া তিনি শুধু তেমনি নীরব হইয়া রহিলেন, যেন কি বলিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। মনের মধ্যে কিসের একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। আরো কিছুক্ষণ ওই ভাবে কাটিয়া যাইবার পর তিনি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন, যদি বলি, আমি-ই সেই হতভাগিনী। বিশ্বাস করবেন? এবার চেয়ে দেখুন তো ভাল করে, চিনতে পারেন কিনা?

মুহূর্তে আমার সর্বাংগ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। হ্যাঁ, এই তো সেই। তবু মুখে বলিলাম, না, না, তা কি করে সম্ভব—

আপনি ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু আমি পারিনি। বলিয়া হঠাৎ ধপ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া আমার দু'পা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন।

বলুন আমায় ক্ষমা করেছেন!

ছি ছি, এ কি করছেন, আগে পা ছাড়ুন! বলিয়া পা দুইটি সরাইয়া লইতে গেলে তিনি আর চোখের জল চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু আমার পায়ের উপর গড়াইয়া পড়িল।

তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, শুধু একবার মুখে বলুন যে আমার সেদিনের অপরাধ ক্ষমা করেছেন নইলে আমি মরেও শান্তি পাবো না! বলুন, চুপ করে থাকবেন না। জানি আপনার সংগে আমি যে ব্যবহার করেছি, তা ক্ষমার অযোগ্য। তবু নির্লজ্জের মত ভিক্ষা চাইছি, নইলে বুকটা কিছুতেই যেন হাল্‌কা করতে পারছি না। বিশ্বাস করুন, এই তীর্থস্থানে দাঁড়িয়ে আমি মিথ্যে বলিনি! সেই দিন থেকে সব সময় আমি ঠাকুরের দোরে মাথা খুঁড়েছি, একবার যেন দেখা পাই। তাহলে চোখের জলে পা ধুইয়ে দিয়ে আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। এতদিন পরে ঠাকুর যখন দয়া করেছেন তখন একবার শুধু বলুন যে আমায় ক্ষমা করেছেন। আর কিছু চাই না!

ঠিক এই সময় মেয়েটি ঘুম ভাঙিয়া মা, মা, বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াতেই নিবারণবাবুর স্ত্রী সচকিত হইয়া উঠিলেন। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিতে মুছিতে ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

আমি কিছু বলিতে পারিলাম না। শুধু হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পরের দিন নিবারণবাবু তাঁর স্ত্রীর শরীর খারাপের অজুহাতে সকলকে লইয়া একেবারে হরিদ্বার ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যায় গাড়ি। বিকালেই স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হইলেন।

শুধু যাইবার আগে মালপত্তর সব টাঙ্গায় চাপাইয়া নিবারণবাবু আমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়া এক টুকরো কাগজে তাঁহার বাড়ির ঠিকানা লিখিয়া দিয়া বলিলেন, কলকাতায় ফিরে কিন্তু নিশ্চিত দেখা করবেন। তারপর দরজার কাছে হঠাৎই থামিয়া বলিলেন, আপনার বিয়ের কথা ভুলিনি। একটা ব্যবস্থা যেমন করে হোক করবই জানবেন।

এত দুঃখের মধ্যেও হাসি চাপিতে পারিলাম না।

উঁহাদের টাঙ্গা ছাড়িয়া দিলে, শুধু একটা কথাই বারে বারে মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল। মানুষের জীবনে নাটকীয় ঘটনা ঘটে লোকের মুখে শুনিয়াছি কিন্তু আমার মত ঠিক এই রকম নাটক কি কখনো অন্য কাহারো জীবনে ঘটিয়াছে? কেহ শুনিলে কি সত্য বলিয়া ইহা বিশ্বাস করিবে? জানি না।

এর দিন কয়েক পরেই ওখানের পালা চুকাইয়া সেই যে চলিয়া আসিয়াছিলাম, আর ও-মুখো হই নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ এক ॥

অনেক দূর হইতে আজ যখন পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখি, যে পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসিয়াছি তাহা কেবলি আঁকাবাঁকা, তখন চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে এক সময় মনে হয় বুঝি নদীর মত মানুষের মধ্যেও আছে এক দুর্বার স্রোত, ধাবমান কালের সঙ্গে অদৃশ্য রজ্জুতে বাঁধা, কোন এক স্থানে বিশেষ কোন গণ্ডীর ভিতর তাই সে অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না। কে যেন তাকে ছুটাইয়া লইয়া বেড়ায়। কোন্ দিকে পথ, কোন্‌টা বিপথ, কোথায় কত লাভ-লোকসান কোন কিছুই হিসাব না করিয়া শুধু পথে বাহির হইয়া পড়ে। সে জানে সে শুধু পথচলা পথিক, তাই চলিতে হইবে। সে যে মানুষ! অনন্তকালের!

তাই তো জীবনের অপর নাম গতি! আর গতির দৈন্যই তো মৃত্যু! উপনিষদের কথা মনে পড়ে—চরৈবেতি, চরৈবেতি,। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

চলিতে চলিতে শ্রান্ত পথিক থামে কিন্তু একেবারে থামিয়া যায় না, স্রোতস্বিনীর মত আপন বেগে পথের সন্ধানে পথে বিপথে দেশে বিদেশে, বনজঙ্গলে ও কত মরুপ্রান্তরে ঘুরিয়া মরে। তাই বলিয়া একবারে মরিয়া যায় না। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অদৃশ্য থাকিয়া আবার কোথাও 'অয়ম্ অহম্ ভো' বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া চমক লাগাইয়া দেয়।

যত ভাবি তত যেন নদীর সঙ্গে মানুষের জীবনের সাদৃশ্য আরও বেশী স্পষ্ট দেখিতে পাই। আরও গভীরে প্রবেশ করিলে দেখি কখন যেন উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

বাস্তবিক নদীর সঙ্গে অদ্ভুত মিল মানুষের! এক নদীর যেমন অনেক ধারা, অনেক শাখানদী, উপনদী, ভিন্ন ভিন্ন নামে কত দেশে-বিদেশে প্রবহমাণ অথচ সেই একই নদী যখন যাত্রাশেষে সাগরমোহনায় আসিয়া পেঁছয় তখন তাকে দেখিয়া যেমন বোঝা যায় না, তার পিছনে কত ইতিহাস, কত রুক্ষ প্রান্তর, বন্ধ্যা মাটির বুকে একদিন সে কত ফুল ফুটাইয়াছে, কত ফল ফলাইয়াছে, মানুষের বেলাও বুঝি এমনি হয়। জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া যখন দাঁড়ায় তখন তাহাকে দেখিয়া ধারণা করিতে পারা যায় না যে, এই একই মানুষের কত বিচিত্র কাহিনী, নানা রূপে বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছে—জানা অজানা কত পথের ধারে, দেশ বিদেশ কত মরুপ্রান্তরে, কত বনজঙ্গলে। 'একোহম্ বহুস্যামি' উপনিষদের এই বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে কত সত্য তা আজ নিজের দিকে তাকাইলে বেশ বুঝিতে পারি।

তাই এতকাল পরে আবার সেই সব টুকরো কাহিনী ছেঁড়া সুতোর মত দেশ-বিদেশের পথের ধুলা হইতে কুড়াইয়া লইয়া ময়লা সাফ করিয়া গিঁট বাঁধিয়া বাঁধিয়া

একসূত্রে নানা ফুলের মালা গাঁথিয়া পাঠকদের উপহার দিবার চেষ্টা না করিয়া শুধু এইটুকু বলিয়া রাখি, যাহাদের উপলক্ষ করিয়া আমার জীবনের স্রোত বারে বারে বাঁকিয়া গিয়াছে, তারা অধিকাংশই নারী। কে কোন্ পথে কি সূত্রে কেমন করিয়া কখন আমার জীবনে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের কাহিনী না বলিয়া বরং একদিন যারা আমার এই নিস্তরঙ্গ জীবনে ঢেউ তুলিয়াছিল, বান ডাকাইয়াছিল, দু'কূল ভাঙিয়া ভিতর বাহির একাকার করিয়া দিয়াছিল, জল সরিয়া গেলেও নদীর বুক হইতে সে চিহ্ন যেমন সহজে মিলায় না তেমনি করিয়া আমার এ বক্ষপটে একদিন যারা গভীর দাগ রাখিয়া গিয়াছিল, বিস্মরণের এই গোধূলি লগ্নেও যাহাদের ভুলিতে পারি নাই শুধু তাহাদের কথাই এখানে বলিতে চাই।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা সত্য যাহা উপলব্ধি করিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হয়, যে নদীতে স্রোত যত বেশী তার কূল তত ভাঙাচোরা। তেমনি যে মানুষের মন যত বেশী ভাবপ্রবণ তার জীবনের গতিপথও তত আঁকাবাঁকা! নদীর মত সে-ও যে আপন কূল আপনি ভাঙিয়া ফেলে—তা জানিতে পারে না। বাহিরের আঘাতে যতটুকু ক্ষতি হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি সে নিজেই করে অন্তরের ঘাত প্রতিঘাতে।

তাই পিছনের দিকে চাহিলে যখন দেখিতে পাই বাল্য, কৈশোর, যৌবন, এমন কি প্রৌঢ়ত্বের সুবিস্তীর্ণ তটভূমি বরাবর কোথাও সোজা সরল পথে না বহিয়া জীবনের স্রোত কেবলই আঁকাবাঁকা হইয়া পাক খাইয়া গিয়াছে, তখন অন্য কাহাকেও দোষারোপ না করিয়া নিজের ভাগ্যকেই বারংবার অভিসম্পাত দিই। এক এক সময় ভাবি এর মূলে হয়ত বিধাতার চক্রান্ত। সব মানুষকেই তিনি সৃষ্টি করেন সত্য, তবু উহার ভিতর হইতে বাছিয়া লইয়া কাহারো কাহারো চোখে তিনি নিজের হাতে রঙের তুলি বুলাইয়া পৃথিবীতে পাঠান।

কেন তাঁর এ পক্ষপাতিত্ব জানি না। বোধ হয় বিশ্বসংসারে অকৃপণ হস্তে তিনি সে সৌন্দর্যের ভাণ্ডার উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন। এবং অহরহ দিতেছেন, তাহা উপলব্ধি না করিয়া যারা চক্ষুষ্মান হইয়াও অন্ধের মত জগতের কোথাও সুন্দরকে দেখিতে পায় না, তাহাদেরই চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবার জন্য এই ব্যবস্থা।

আগে ভাবিতাম, বুঝি শিল্পীর দৃষ্টি লইয়া যারা জন্মায় তাদের মত ভাগ্যবান আর হয় না। তেমনি আজ জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া এটা বুঝিয়াছি যে তাহাদের মত এমন হতভাগ্য চিরদুঃখী জীবও বুঝি জগতে আর দ্বিতীয় নাই।

আগে মনে মনে তাহাদের ঈর্ষা করিতাম। ভাবিতাম যেখানে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সুন্দর, সর্বপ্রথম কেমন উপভোগ করে। কিন্তু তখন বুঝি নাই যে ভালোকে পাইবার যেমন আনন্দ আছে তেমনি না পাওয়ার যন্ত্রণা আরো ভয়ংকর, আরো মর্মান্তিক! তুষের আগুনের মত বুকের ভিতরটা নিঃশব্দে জ্বলিতে থাকে, যখন দেখে সেই সুন্দর তাহার চোখের সম্মুখে রহিয়াছে, অথচ

তাহাকে পাইবার বা বুক ফাটিয়া গেলেও মুখে সে কথা প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা তাহার নাই!

মনে পড়ে ছেলেবেলায় চিন্ময় আমায় বলিত, তুই বড় হলে আর্টিস্ট হবি! তোর মাইরি যা চোখ, সবচেয়ে সেরা ঠিক সুন্দরী মেয়েটার সঙ্গে ভাব জমিয়ে দিস! এত খেলার সঙ্গিনীর ভেতর থেকে ঠিক শান্তিকে বেছে নিয়েছিস্।

জ্যাঠাইমা কোন ভাল-মন্দ রান্না করিতে গেলে, আমাকে রান্নাঘরে ডাকিয়া আগেভাগে একটু চাখাইয়া লইয়া বলিতেন, দেখ তো, নুন ঝাল মিষ্টি সব ঠিক হয়েছে কিনা?

আবার পাড়াপড়শীর কাছে যখন দুপুরে পান খাইতে খাইতে গল্প করিতেন তখন বলিতে শুনিয়াছি, এইটুকু ছেলে হলে কি হয়, ছোঁড়াটার জিবের যা তার বুড়োদের হার মানিয়ে দেয়।

জেঠামশাইয়ের বাইরের ঘরে ভাঙা চেয়ার-বেঞ্চিগুলো সাজাইয়া পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কাপড় টাঙাইয়া চকখড়ির সঙ্গে লাল কালি গুলিয়া যখন খেলাঘরের থিয়েটার করিতাম, বলা বাহুল্য পাড়ার বারোয়ারী উপলক্ষে যে থিয়েটার যাত্রা হইত তাহারই অনুকরণ করিয়া, তখন আড়াল হইতে জেঠামশাইকে বলিতে শুনিয়াছি, ওর লেখাপড়া হবে না ছাই, বাপের মত থিয়েটার দলে সঙ্ সাজবে।

আবার বাবা ছিলেন দেশের থিয়েটার ক্লাবের 'মাস্টার'! একাধারে তিনি ছিলেন সব—সর্ববিদ্যাবিশারদ। অভিনেতা, সঙ্গীতশিক্ষক, নৃত্যশিক্ষক, নাট্য-পরিচালক আবার পেণ্টারও! স্টেজের জন্য সিন্, উইংস্ ও অন্যান্য দৃশ্যপট যাহা কিছু প্রয়োজন তিনি আঁকিতেন। সহকারী হিসাবে দুই-একজন বন্ধুকে লইয়া রং, তুলি, সিরিষ আঠা, নতুন কাপড়, পেরেক, কাঠের ফ্রেম ইত্যাদির সাহায্যে কাজ করিতেন। রবিবার বা অন্য কোন ছুটির দিন সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত চিত্রকরের কাজ করিয়া আবার সন্ধ্যায় আগামী নাটকের জন্য মহড়া দিতেন।

কখনো পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া হাতে একটা বেত লইয়া, সখির দলের ছেলেদের শিক্ষা দিতেন! এক-দুই-তিন···এক-দুই-তিন···এক···দুই···তিন···চার···পাঁচ, অর্থাৎ তাহাদের দলের পুরোভাগে থাকিয়া তাহাদের সঙ্গে নিজে নৃত্য করিতেন, কাপড় মালকোচা দিয়া পরিয়া পায়ে ঘুঙুরের পটি বাঁধিয়া! কাহারো পদক্ষেপে একটু ভুল হইলে, অমনি সপাং করিয়া তাহার পায়ের উপর বেত্রাঘাত করিতেন।

তারপর নাটকের বিভিন্ন চরিত্রগুলি কেমন করিয়া অভিনয় করিতে হইবে, ভাব ভঙ্গী ও অভিব্যক্তি সহকারে, জনে জনে দেখাইয়া দিতেন।

যখন ছোট ছিলাম, বাবা আমায় সঙ্গে লইয়া ছুটিছাটার দিনে ক্লাবে যাইতেন।

অনেকের ধারণা ললিতকলার প্রতি আমার যে অনুরাগ, তাহার জন্ম সেই সময় ওই বাবার ক্লাব-এ। শৈশবেই মানুষের মন থাকে সব চেয়ে বেশী সজাগ ও গ্রহণযোগ্য। রঙ, রূপ, সুর, অভিনয় ইত্যাদি ওই সময় সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়া কেমন করিয়া অনুপ্রবেশ করিয়াছিল আমার অন্তরে, সম্পূর্ণ অগোচরে,

আমি জানিতে পারি নাই।

আবার কেহ কেহ বলেন, পিতার রক্ত হইতে উহা আমার মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। উত্তরাধিকার সূত্রে এই শিল্পী মন আমি লাভ করিয়াছি।

জানি না ইহার কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা! মোট কথা রূপ ও রসের ক্ষেত্রে আমার নির্বাচনটা সব সময় লক্ষ্য করিয়াছি, যাহাকে বলে একেবারে অভ্রান্ত ছিল।

স্কুলে ড্রয়িংয়ের ক্লাসে আমিই বরাবর আঁকাতে ফার্স্ট হইতাম। রং ও তুলি লইয়া যে সব ছবি আঁকিতাম, শিক্ষক মহাশয়দের মুখে তাহার প্রশংসা করিতে শুনিয়াছি।

আসল কথা, বাল্যকাল হইতেই আমার মনটা ছিল শিল্প-সচেতন। কিন্তু তখন বুঝি নাই যে ইহার জন্য পরে নানা প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং বারংবার আমার জীবনের গতিকে ইহা বাঁকাপথে লইয়া যাইবে!

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—এই তিনটি ব্যাপারে নাকি মানুষের কোন হাত নাই!

তবু ভাবিতে বসিলে মনে হয়, সত্যি মানুষের জীবনে বিশেষ করিয়া ওই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ক্ষেত্রে কিছু করণীয় নাই।

যদিও মানুষকে আপন ভাগ্যনিয়ন্তা বলা হয়, শ্রম, অধ্যবসায় ও ন্যায়নিষ্ঠার দ্বারা সে ইচ্ছামত পথে তাহার জীবনকে পরিচালিত করিতে পারে, তথাপি এই তিনটি জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে শত চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু করিবার নাই, সব তার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতার বাইরে।

কথাটা কেমন যেন কানে বাজে। স্বতঃ-বিরোধী বলিয়া মনে হয়। তবু আবার একটু অনুধাবন করিলে দেখা যায় ইহার চেয়ে সত্যি বুঝি আর কিছু নাই। নইলে যে মানুষ আজন্ম ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে লালিতপালিত, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় মূল্যবান পালঙ্কে ঘুমাইয়া জীবনের সত্তর কি আশিটা বছর কাটাইয়া দেয় হঠাৎ সে রাস্তায় পড়িয়া ধুলোময়লার উপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে কেন?

তেমনি কবে কোন্‌ বিশেষ ক্ষণটিতে শিশু অন্ধকার মাতৃজঠর ত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীর আলোতে ভূমিষ্ঠ হইবে ইহাও কেউ জানে না। সবচেয়ে আশ্চর্য জননী, যাহার গর্ভে দশমাস দশ দিন তিলে তিলে বর্ধিত, যার খাদ্যের জারক রসে পুষ্ট হইয়া যার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস লইয়া, যার রক্ত মাংস মজ্জায় মানবদেহ লাভ করিল, সেই জননীও জানে না কোন্‌ বিশেষ শুভ মুহূর্তে সন্তানের মুখ দর্শন করিতে পারিবে?

বাস্তবিক পক্ষে বিবাহ ব্যাপারটাও অনুরূপ। কখন কাহার চোখে কোন্‌ মেয়ে ভাল লাগে এবং কেন লাগে তাহাও যেন এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ঢাকা!

আমার জেঠাইমাকে যখন তখন বলিতে শুনিতাম, জপ তপ কিবা করো মরতে জানলে হয়!

আবার দ্বিপ্রহরে পানের মজলিসে পাড়া-প্রতিবেশিনীরা যখন জেঠাইমাকে

ঘিরিয়া বসিয়া, কার মেয়ের বিয়ে হইতেছে না, বারে বারে লোক দেখিতে আসিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে শুনিতেন, তখন পা ছড়াইয়া ভিজে চুলের রাশ পিঠের উপর বিছাইয়া রোদের দিকে পিছন ফিরিয়া পানের ডাবর হইতে এক এক-জনের হাতে এক একটি পান সাজিয়া দিয়া সব শেষেরটি নিজের গালে পুরিয়া দিতে দিতে বলিতেন, জন্ম মৃত্যু বিয়ে, এর ওপর মানুষের কোন হাত নেই। ও বিধাতার লিখন। ও যার হাঁড়িতে যে চাল দিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে হবেই হবে। কারও সাধ্যি নেই, তাকে ঠেকায়। এই বয়সে আমি ঢের দেখলুম!

বলিয়া খপ্ করিয়া পানের বোঁটার ডগায় চুনের ভাঁড় হইতে একটু চুন তুলিয়া লইয়া দাঁতে কামড়াইয়া তারপর বলিতেন, আমার মা বলত বিধাতাপুরুষ যখন মেয়ে গড়ে তার আগেই তার জন্য বর তৈরী করে পাঠিয়ে দেন।

সত্যি কথা বলিতে কি আমার জন্য যে বিধাতাপুরুষ কোন মেয়ে তৈরী করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। তার কারণ যে গুণ থাকিলে বিয়ের বাজারে পাত্র হিসাবে গণ্য হইতে পারি, তাহার একটিও আমার ছিল না। না নিজস্ব ঘরবাড়ি জমিজমা, না লেখাপড়ার খ্যাতি, না একটা কোন ভাল অফিসে চাকরি।

তাই বিবাহের আশা কোনদিন মনে স্থান দিই নাই।

কিন্তু সেখানেও ভগবান বাদ সাধিয়াছিলেন। ওই যে কথাটা কিছুক্ষণ আগে বলিতেছিলাম, শিল্পসচেতন মন বা রূপদৃষ্টি! ছেলেবেলা হইতে ঈশ্বর আমার চোখ দুটোর ভিতর যত রাজ্যের সৌন্দর্য ভরিয়া দিয়াছিলেন, জানিতাম না যে উহাই আমার জীবনে সবচেয়ে বড় বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। তাই যেদিন বিবাহের সময় সত্যি সত্যি উপস্থিত হইয়াছিল, তখন কোন মেয়েকেই আর চোখে লাগিত না।

জেঠাইমা দেশে গেলে ছলেবলে কৌশলে কত মেয়েকে বাড়িতে আনিয়া দেখাইতেন। কিন্তু কোনটাই আমার পছন্দ হইত না। সব নাকচ করিয়া দিতাম।

শেষে বিরক্ত হইয়া তিনি বলিতেন, তোর বৌকে তাহলে কুমারটুলি থেকে অর্ডার দিয়ে তৈরী করে আনতে হবে।

জেঠাইমা সেকেলে পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মহিলা। তাঁহাকে কেমন করিয়া বুঝাইব ভাবিয়া পাইতাম না যে তাঁহার পছন্দের সঙ্গে কোথায় আমার অমিল।

সত্যি কথা বলিতে কি, তখন বুঝি নাই যে প্রত্যেক পুরুষের মনের মধ্যে লুকানো থাকে এক-একটা বিশেষ ধরনের নারীর মূর্তি। আর্টিস্টের ভাষায় যাহাকে বলা যায় মডেল। এ তাহার ব্যক্তিগত রুচি দিয়া তৈরী!

এক শিল্পীর মডেলের সঙ্গে অন্য শিল্পীর মডেলের মিল হয় না, এও ঠিক তেমনি—প্রত্যেকে আপন মনের মাধুরী দিয়া তাকে গড়ে, তাহার মুখের বেঁকা চোখের চাহনি ও গঠন, হাসিবার ভঙ্গি, চিবুকের গঠন, কপালের উপর ঝুলিয়া পড়া কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ, এমন কি তাহার দাঁড়াইবার বিশেষ ভঙ্গীটুকু হইতে কোমরে শাড়ী জড়ানোর ঠাট্ পর্যন্ত প্রত্যেকটি তাহার নিজস্ব পছন্দ দিয়া তৈরী। একের

সঙ্গে অন্যের সেখানে মিল হয় না।

ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর তাই ভিন্ন ভিন্ন মডেল!

তাই বিবাহের জন্য কোন মেয়ে পছন্দ করিতে গেলে, কোথায় যে প্রকৃত বাধা আমি কাহাকেও বুঝাইতে পারিতাম না।

কোন মেয়ে আমার চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলে, আমি তার মধ্যে আগে খুঁজিতাম আমার সেই মডেল-কে। তাহার মুখের সেই চপল আর মধুর হাসি ওষ্ঠের প্রান্তে সেই বিশেষ বঙ্কিম ভঙ্গিমাটুকু, চোখে বন্য হরিণীর চাহনি, দুরন্ত-যৌবনা পাহাড়ী নদীর মত যার দেহখানি, স্বল্পতোয়া অথচ কল্লোলিনী বেগবতী! এ যদি শুধু কবির কল্পনা হইত, বলিবার কিছু ছিল না। কিন্তু বাস্তব জীবনে এক দিন আমি যে তাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার সাহচর্য লাভে ধন্য হইয়াছি, কেমন করিয়া তাহা অন্যকে বুঝাইব! যে তাজমহল দেখিয়াছে, অন্য কোন অট্টালিকা কি তাহার মন ভুলাইতে পারে? যে কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে হরিদ্বারের গঙ্গার উপর রজতকিরণধারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে দু'চোখ ভরিয়া, তাহার কাছে পল্লীর কচুরীপানা ভরা নদী কেমন লাগে, জিজ্ঞাসা করিলে সে কি বলিবে!

ফুলের বুকে রং কে দেয় জানি না, কোথা হইতে সে পায় এত রূপ, রস ও গন্ধ, মানুষের কাছে তাহার ঠিকানা যদিও অজ্ঞাত তবু মানুষ প্রথম তাহার বুকে রঙের পরশ কোথা হইতে পায় তাহা জানি। বাল্যের সেই ক্রীড়াসঙ্গিনী, চোখ বাঁধিয়া লুকোচুরি খেলিবার সময় কানের কাছে মুখটা আনিয়া চুপি চুপি বলিয়া দেয়, আমায় যেন চোর করিসনি ভাই লক্ষ্মীটি। কিংবা বাড়ি হইতে আচার চুরি করিয়া আনিয়া, চুপি চুপি তাহার হাতটি মুখের মধ্যে ভরিয়া দিয়া বলে, কাউকে বলিসনি কিন্তু তোকে আচার খাইয়েছি, তাহলে মা জানতে পারলে আর রক্ষে রাখবে না!

তারপর কুঁড়ি যেমন ধীরে ধীরে বড় হইয়া একদিন তাহার উপরের সবুজ আবরণ উন্মোচন করিয়া রঙীন পাপড়ির স্পর্শে গাছের বুকে প্রথম রঙের শিহরণ জাগায়, ঠিক তেমনি ভাবে সেই বালিকা খেলুড়ী কখন কিশোরীরূপে পুরুষের হৃদয়বৃন্তে ওই ফুলের কুঁড়ির মত প্রথম রঙ ধরায়, তাহা কেহ জানিতে পারে না। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে কখন যে সেই ক্রীড়াসঙ্গিনী লীলাসঙ্গিনীতে রূপান্তরিত হইয়া পুরুষের অন্তরের অন্তস্তলে নিজের মডেলকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়, তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারে না। তারপর যত বয়স বাড়িতে থাকে, তখন খেয়াল হয়, কেন অন্য কোন মেয়েকে চোখে ধরে না! সেই বিশেষ মডেলটি চোখের সামনে আসিয়া যেন সর্বাগ্রে দাঁড়াইয়া পড়ে।

তাই দেখিয়াছি অন্য মেয়ে, যাহার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ, এমন নিখুঁত সুন্দরী নাকি হয় না! নাক, মুখ, চোখ প্রত্যেকটি যাহাকে বলে অতুলনীয়। আমার জেঠাইমার ভাষায়, আহা যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকরুণ, চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে না—কিন্তু কেন জানি না সেই মেয়েকেও আমার মনে ধরিত না। পোটোপাড়ার তৈরী প্রতিমার মত মনে হইত।

বরং দেখিয়াছি যে মেয়ের সমালোচনা করিতে গিয়া জেঠাইমা ঠোঁট বেঁকাইতেন, ম্যাগো, ওই মেয়েকে আবার রূপসী বলে, কি আছে ওর ছিরি! নাক টিকলো নয়, চোখগুলো ছোট ছোট, খাই-মুখটা বড়, কথা বলতে গেলে আগে দাঁতগুলো দেখা যায়, বেহায়ার মত কথায় কথায় হেসে লুটিয়ে পড়ে। গায়ে-গতরেও তেমনি, বিধাতা মাংস দিতে ভুলে গিয়েছিল, কি আছে ওর। কি দেখে ছোঁড়ারা ওতে মজে জানি না। বলা বাহুল্য, জেঠাইমার সুন্দরী তালিকা হইতে নাম কাটিয়া দেওয়া তেমন কোন মেয়েকে বরং কখনো হয়ত চোখে ভাল লাগিত, যদিও পছন্দ হইত না।

তাই জেঠাইমা যখন বলিতেন, যার হাঁড়িতে যে চাল দিয়ে এসেছে তার সঙ্গে তার বিয়ে হবেই হবে, কেউ তা রোধ করতে পারবে না—তখন চুপ করিয়া থাকিতাম।

আবার এক-একদিন রাগ সামলাইতে না পারিয়া মন্তব্য করিতেন, এতসব ভাল জিনিস দেখেও মনে তোর ধরলো না, শেষে মরবি কোন আঁস্তাকুড়ে মুখ থুবড়ে, দেখিস আমার কথা মিথ্যে হবে না।

জেঠাইমার কথা শুনিয়া সেদিন শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলাম। কারণ মুখ ফুটিয়া সেকথা কাহাকেও বলিবার নয়। জেঠাইমার ভাষায় বলিতে গেলে মুখ থুবড়ে পড়িয়াছিলাম সত্যি, তবে সেটা আর যাই হোক আস্তাকুঁড়ে নয়।

কারণ শান্তি ছাড়া আরো যে দু'চারটি নারী আমার জীবনে আসিয়াছিল, যদি তাহাদের কাহারো সহিত জীবনটাকে বাঁধিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত আজকের এ কাহিনী অন্যরূপ হইত। কিন্তু সেখানেও ছিল বুঝি অভিশাপ! কেন বলিতেছি।

একটা জিনিস আমি বারবার লক্ষ্য করিয়াছি, অন্য সকলের ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক, কি জানি কেন আমার জীবনে ঠিক তাহার উল্টো ঘটিয়া যায় অর্থাৎ যাহা অস্বাভাবিক আমার মন সেই দিকে ছুটিয়া চলে। মনটাকে যুক্তির শাণিত অস্ত্রে চিরিয়া চিরিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি, ইহার মূলে সেই 'মডেল'। যাহাকে গোপনে একদিন মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, তখনো বুঝি বিসর্জন দিতে পারি নাই।

নচেৎ ভদ্রাকে ছাড়িয়া, তাহার মা'র প্রতি আমি এমন উন্মাদের মত আকৃষ্ট হইলাম কেন।

অথচ ভদ্রা কেবল যে তরুণী কিশোরী, নবোদ্গত-যৌবনা ছিল তাই নয়, ঈশ্বর তাহাকে আরো একটি দুর্লভ ঐশ্বর্য দিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন, সে তাহার অত্যাশ্চর্য কণ্ঠস্বর। সুধাময়ী, কোকিলকণ্ঠী বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি করা হয় না। রূপের যেটুকু ঘাটতি ছিল অপ্সরা-বিনিন্দিত সেই মধুকণ্ঠ দিয়া ঈশ্বর যেন সুদে আসলে সব পোষাইয়া দিয়াছিলেন!

অবশ্য মায়ের সঙ্গে মেয়ের আকৃতি প্রকৃতি কোন কিছুতেই মিল ছিল না।

মেয়েকে যদি মেঘনা নদীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহা হইলে মাকে স্বচ্ছন্দে পদ্মা বলা যাইতে পারে।

ব্যাপারটা তাহা হইলে খুলিয়া বলি।

সকল নদী যেমন উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়, মানুষের জীবনটাও তেমনি স্বভাবের পথ ধরিয়া চলে, ইহাই ছিল আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তখন জানিতাম না যে, পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। গ্রীষ্মের পর যেমন বর্ষা আসে আবার শীতের পর বসন্ত—বাইরের প্রকৃতিতে যেমন ঋতু পরিবর্তনের পালা চলে, ঠিক তেমনি ভাবে আসে বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য প্রভৃতি মানুষের জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, যেমন দৈহিক রূপ পালটায় তেমনি মনের প্রবৃত্তিগুলোরও পরিবর্তন ঘটায়।

অথচ যে বয়সের যা, সাধ-আহ্লাদ অর্থাৎ ভোগ, তৃষ্ণা যদি কোন কারণে অতৃপ্ত থাকে বা না-ই মেটে, মন হইতে তাহা একেবারে অবলুপ্ত হইয়া যায় না, যতক্ষণ না সে কামনা, বাসনা পরিতৃপ্ত হয় ততক্ষণ মনের অবচেতনায় লুকাইয়া থাকে, সত্যি কথা বলতে কি ইহা আগে জানিতাম না। সেইজন্য বোধ হয় ভদ্রার মত তরুণী, কিশোরী, নবোদ্গতা-যৌবনা নারী কাছে থাকিলেও আমার মন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে নাই। কারণ কিশোরী তরুণীকে যত রূপে যত ভাবে কল্পনা করা যায়, তার সকল রসের আস্বাদে আমার মন কানায় কানায় পূর্ণ। শুধু একটা জিনিস শান্তি যা দিতে পারে নাই, সে সঙ্গীত। শান্তি গান গাহিতে জানিত না। অথচ আমি গান ভীষণ ভালবাসিতাম। ঈশ্বর ভদ্রার কণ্ঠে সেই সুর দিয়াছিলেন, যাহা আমাকে পাগল করিয়া দিত। ভদ্রা জানিত, তাহার গান আমি কেবল ভালবাসি না, তাহার গান শুনিলে আমি সব কিছু ভুলিয়া যাই।

তাই যে গানগুলি আমার বিশেষ প্রিয়, তাহার কণ্ঠ হইতে যেন কানে সুধা বর্ষণ করিত, সেইগুলি যখন তখন গাহিয়া সে আমার মনকে কেবল চঞ্চল করিয়া তুলিত না, দেহ হইতে যেন ছিনাইয়া লইয়া যাইত তাহার কাছে। পূর্ণিমার রাত্রে পাহাড় নদী, বন উপবনের দিকে তাকাইয়া যেমন মানুষ বিহ্বল হইয়া যায়, ভাবে এই তো স্বর্গ, ইহার চেয়ে সুন্দর স্থান বুঝি পৃথিবীতে আর নাই, অথচ সে রজনী প্রভাত হইলে স্বপ্ন ছুটিয়া যায়, আমার মানসিক অবস্থাটাও ঠিক তেমনি হইত। যতক্ষণ ভদ্রার কণ্ঠের সুর আমার কানে, আমার প্রাণে গুঞ্জন করিয়া বেড়াইত, ততক্ষণ যেন আমি অন্য এক জগতে চলিয়া যাইতাম, তারপর সুরের সে রেশ কাটিয়া গেলেই আমি তখন ভদ্রার মায়ের কাছে গিয়া বসিতাম।

ভদ্রার মাকে আমি বৌদি বলিয়া ডাকিতাম। তাঁর সঙ্গে আমার যে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল তাহা নয়, নেহাতই পাড়া-প্রতিবেশিনীর পর। তবে পরকে আপন করিতে হয় কত শীঘ্র তা যেমন তিনি জানিতেন তেমনি তাকে পর করিয়া দিতে বেশী বিলম্ব হইত না।

কথাটা তাহা হইলে আরো একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। তখন আমি বেকার। তাই দিনকতককের জন্য মামার বাড়ী থাকিতে গিয়াছিলাম। কলিকাতার উপকণ্ঠে, মাত্র চার পাঁচ মাইল দূরে এই গোবিন্দপুর গ্রামটি হইলেও তখনো সভ্যতার এতটুকু আলো সেখানে পেঁছায় নাই। বাঁশবন, শিয়ালের ডাক, কাঁচা রাস্তা, ডোবা পুষ্করিণী, বনজঙ্গল, মশা, ম্যালেরিয়া সবই ছিল। তৎসত্ত্বেও সেখানকার বাসিন্দারা তেমন কোন অসুবিধা বোধ করিত না, তার কারণ বোধ হয় মাত্র এক আনার একখানা থার্ডক্লাস রেলের টিকিট কাটিলেই, পনেরো মিনিটের মধ্যে একেবারে শহরের বুকে শিয়ালদায় আসা যাইত। তাছাড়া একটা সাইকেল ছিল মামাতো ভাইয়ের, তার উপর ছিল আমার বেশী ভরসা।

আমি জানিতাম না, কবে মামার বাড়ির সন্নিকটে জমি কিনিয়া একটি নতুন ধরনের বাড়ি তৈরী করিয়া ভদ্রারা সেখানে বসবাস শুরু করিয়াছিল।

মনে পড়ে প্রথম যেদিন মামার বাড়ির সদরে পা দিই, হঠাৎ নারীকণ্ঠের সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত কানে যাইতে চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। 'আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও' এই গানটির অন্তরা 'বিশ্ব হৃদয় হতে ধাওয়া, আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া'র সঙ্গে তান লাগাইয়া যে অপূর্ব সুরসৃষ্টি করিয়াছিল আজো তাহা ভুলি নাই। সেই গাছপালা ঘেরা পল্লীপ্রকৃতির মধ্যে তাহার সেই কণ্ঠের মাধুর্য যেন নিমেষে ছড়াইয়া গেল চারিদিকে। আশ্চর্য কণ্ঠস্বর, যত চড়িতে থাকে তত যেন সুধা আরো বেশী ঝরে। মামার বাড়ির ভিতরে কে এমন সুধাকন্ঠী আসিল, কোথা হইতে পাইল সে এমন অমরার কণ্ঠ, ভাবিতে ভাবিতে ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেখি ভদ্রা ও তাহার মা একখানি মাদুরে বসিয়া আছেন, আর ভদ্রা গান গাহিয়া আমার মামীমাকে শোনাইতেছে।

আমাকে দেখিয়া মামীমা উঠিয়া আসিলেন, ওমা আলোক তুই, ঘরে আয়। কেমন আছিস্? সেই দুবছর আগে এসেছিলি, তারপর একটা চিঠিপত্র দিয়েও খোঁজ করতে নেই!

কে মামীমা ওই মেয়েটি? কি আশ্চর্য গলা ওর! প্রথমেই আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলাম।

আমাদের পাড়ায় নতুন বাড়ি করে ওরা এসেছে আজ বছর দুই হলো। আয় তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ভারী ভাল মানুষ!

ভদ্রার মায়ের পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতে গেলে, তিনি পা দুটি সঙ্গে সঙ্গে সরাইয়া লইয়া বলিলেন, থাক ভাই। পায়ে হাত দিতে হবে না।

আমি তখন ভদ্রাকে দেখাইয়া বলিলাম, কি আশ্চর্য গলা আপনার মেয়ের, এমন গলা পেলে রেডিও কি গ্রামোফোন কোম্পানী একেবারে লুফে নেবে।

তার জন্যে ভাগ্য করে আসা চাই! বলিয়া একটা গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন তিনি।

বলিলাম, কেন, কোন চেষ্টা করেছেন কোনদিন?

কে করবে ভাই ওসব ! ওর বাবা একরকমের মানুষ। বলে, মেয়েছেলে গান-বাজনা শিখে কি বাইজিগিরি করবে। যা শিখেছে ও, তা শুনে শুনে—ওই রেডিওর গাওয়া গান শুনে। কেউ ওকে শেখায়নি পর্যন্ত !

এ্যা, বলেন কি ? এমন ফিনিশড্ গলা ! অথচ কেউ গান শেখায়নি ?

হাঁ ভাই, তুমি শুনে আশ্চর্য হয়ে যাবে ! একটা হারমোনিয়ম পর্যন্ত ওর নেই। ওর বাবাকে বলে বলে আমি হয়রান হয়ে গেছি। কিন্তু ওই বললুম না, এক রকমের মানুষ তিনি। তবে তুমি যদি ভাই একটু চেষ্টা কর ওর জন্যে !

নিশ্চয়ই করবো, এমন গলা কি কখনো কেউ নষ্ট করে ?

এবার ভদ্রার মা আমার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া মামীমাকে বলিলেন, ঠিক এইরকম দেখতে আমার এক দেওর ছিল দিদি—সে যদি আজ বেঁচে থাকতো, তাহলে আমার ভদ্রার ভাবনা কি ছিল ! সে ওর গান বড্ড ভালবাসতো। হঠাৎ দেশে গিয়ে কলেরায় মারা গেল। ওর অদৃষ্ট মন্দ, নইলে ভগবান তাকে কেড়ে নেবে কেন ?

বেশ তো বৌমা, আজ থেকে আলোককেই তুমি দেওর মনে করো। ওই তোমার সব করে দেবে। ছেলেবেলা থেকে ও খুব গান-বাজনা ভালবাসে।

চলে যাবার সময় তিনি বলিলেন, আজ থেকে তাহলে আমি তোমার বৌদি হলুম, মনে থাকে যেন ! তারপর সরস কণ্ঠে কহিলেন, অবশ্য তুমি ভুলতে চাইলেও, আমি ভুলতে দেবো না। দিদির যখন অনুমতি পেয়েছি ! তাহাড়া, আমার বাড়ি এই কাছেই, মাঝখানে শুধু ওই ছোট্ট বাঁশবনটা না থাকলে এখান থেকেই আমার বাড়িটা তোমায় দেখিয়ে দিতুম। কাল বিকালে তোমার গান শোনার নেমন্তন্ন রইল। ঠাকুরপো, যেয়ো কিন্তু !

ঠাকুরপো সেই ডাকটির মধ্যে এত যে একটা মধু আছে, সেদিন তা প্রথম উপলব্ধি করিলাম তাঁর কণ্ঠে।

মামীমা বলিলেন, হাঁ হাঁ যাবে—তোমাকে আর এত করে বলতে এখন হবে না ! ও এখানে থাকতে এসেছে, চাকরির চেষ্টায়।

সত্যি কথা বলিতে কি, বৌদি যে ভদ্রার মা এ কথা মামীমা বলিয়া না দিলে আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। ভাবিতাম বুঝি তাঁরা দুই বোন। মা ও মেয়ের চেহারার মধ্যে কোথাও এতটুকু সাদৃশ্য ছিল না, বরং বৌদির মুখে, চোখে দেহে যেরূপ পরিপূর্ণতা ছিল, সিঁথিতে সিঁদুর না দেখিলে তাঁহাকে আমি অবিবাহিত ভরা যুবতী কোন মেয়ে বলিয়া মনে করিতাম, গায়ের রংও মেয়ের চেয়ে মায়ের ছিল অনেক চড়া। সুন্দরী, রূপসী না হইলেও, সুদর্শনা বলিলে বোধ হয় ভুল হয় না। হাসিবার সময় তাঁহার ঠোঁটের একটা বিশেষ ভঙ্গী আমাকে যেন হঠাৎ শান্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিত।

কিন্তু মা ও মেয়ের মধ্যে যে আকাশপাতাল প্রভেদ ছিল তা কেবল আকৃতিতে নয়, প্রকৃতিতেও বটে। আগে তা বুঝিতে পারি নাই।

ভদ্রা সলজ্জ ও স্বল্পভাষিণী, যদিও আমিই ছিলাম তার সঙ্গীতের একমাত্র সমঝদার ও উৎসাহদাতা। ওর মা তেমনি উজ্জ্বলা, রসভাষিণী ও মধুসঙ্গিনী।

বলা বাহুল্য পরের দিন হইতে আমি উহাদের বাড়ি যাইতে শুরু করিয়াছিলাম এবং বৌদির অনুরোধে গানের একজন মাস্টারের চেষ্টাও করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে ভদ্রা শুধু-গলায় প্রায় রোজই আমায় গান শোনাইত। যেদিন তাহাদের বাড়ি না যাইতাম, একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছি, আমার সব চেয়ে প্রিয় গানগুলি সে এমন উচ্চকণ্ঠে গাহিত যাহাতে আমার কানে কেবল নয়, মর্মে গিয়া প্রবেশ করে।

আমার ঘর ও ভদ্রাদের বাড়ির মধ্যে শুধু একটি বাঁশবনের ব্যবধান থাকিলেও, ভদ্রার গান আমি ঘর হইতে স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। কতদিন ভোরবেলা তাহার গান শুনিয়া আমার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে, আবার কতদিন রাত্রে তাহার গান শুনিয়া চোখে ঘুম আসে নাই, বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করিয়াছি।

ভদ্রার কণ্ঠে যে আমি কতখানি মজিয়াছি একমাত্র বৌদি তাহা জানিতেন। ভদ্রা জানিত কিনা তাহার মুখের ভাব হইতে উহা অনুমান করিতে আমি পারিতাম না। তবে বৌদি ঠাট্টা করিয়া যখন তখন বলিত সে নাকি আমার প্রেমে পড়িয়াছে। সে যখন কলসী লইয়া ঘাটে জল আনিতে যায়, আমার ঘরের জানলার দিকে বার বার তাকায়। আবার আমি যখন সাইকেল চাপিয়া কলকাতা হইতে মামীমার জন্য কোন জিনিসপত্র কিনিতে যাই তখন জানলার পাশে দাঁড়াইয়া ভদ্রা নাকি আমাকে দেখে। আমার সাইকেলের বেলটা নাকি তার এতই সুপরিচিত যে যখনই তার শব্দ ওর কানে আসিত, সব কাজ ফেলিয়া কোন ছুতায় নাকি সে ঘরে চলিয়া গিয়া বাঁশগাছের ফাঁকের ভিতর দিয়া আমায় দেখিত!

কথাটা যে বৌদি মিথ্যা বলে নাই, তার প্রমাণ অবশ্য আমি হাতে হাতে পাইয়াছিলাম। তবু ভদ্রাকে আমি সেভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই কোনদিন। এবং এই কারণেই যে তাহার মনের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে তিলে তিলে বিষ পুঞ্জীভূত হইতেছিল, তাহাও সেদিন কল্পনা করিতে পারি নাই।

যতক্ষণ আমি ভদ্রাদের বাড়ি থাকিতাম, ওর মায়ের নিকট বসিয়াই গল্পগুজব করিতাম। বৌদি ও দেওরের মধ্যে যেমন সকল রকম রঙ্গতামাসা হাসি-ঠাট্টা চলে তেমনি ভাবেই কখন কি আলাপ-আলোচনা করিতে করিতে কোথা দিয়ে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত, এক-একদিন খেয়াল থাকিত না।

॥ দুই ॥

সংসারে কি স্ত্রী, কি পুরুষ কেহই একা নয়—নানা সম্পর্কের বন্ধনে জড়িত তাদের জীবন। রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও আত্মীয়তার সম্পর্ক, বন্ধুবান্ধব পাড়া-প্রতিবেশী আপন পর সকলের সঙ্গেই কত না বিচিত্র সম্পর্কের বন্ধন।

তবুও সত্যি বলিতে কি, দেওর বৌদির মত এমন মধুর সম্পর্ক বাঙালীর সংসার ছাড়া বোধ হয় আর কোথাও নাই। সামান্য দুটি কথা, কিন্তু কি অসামান্য তার ব্যঞ্জনা। কোন ব্যাকরণের ভাষায় যার ব্যাখ্যা মিলে না। কাব্য সাহিত্য ও উপন্যাসে যত কল্পনা আছে, যত গান আছে, যত ভাব আছে—কোন কিছুতেই বুঝি তা ব্যক্ত করা যায় না। পূর্ণিমার রাত্রে চামেলীর দেহহীন গন্ধের মত সে এক রূপহীন অপরূপ সম্পর্ক।

বাঙালীর সংসারে এই দেওর ও বৌদি যেন এক পৃথক সৃষ্টি, ভিন্ন জগৎ! বয়স বা মানের তারতম্য থাকা সত্ত্বেও বন্ধনহীন সে এক অপূর্ব বন্ধন। বাইরে যেটুকু দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বেশী থাকে ভিতরে অন্তরের অন্তস্তলে, লজ্জা-সরম, গোপনতা, শ্লীল-অশ্লীল—সর্বকিছু নিয়ম নিষেধের ঊর্ধ্বে, যেন এক নির্মল মুক্ত আকাশ!!

বৌদির চোখে এই দেওর বস্তুটি কখনো স্নেহভাজন ভাই, কখনো বন্ধু, কখনো সহচর, কখনো বা অনুচর, আবার ক্ষেত্রবিশেষে গুপ্তচরও। পতি পরম গুরু যার চেয়ে বড় নারীর জীবনে আর কিছু নাই, সেই গুরুর কাছেও বলা যায় না, এমন গোপনীয় দুঃসাধ্য কাজে দ্বিধাহীন চিত্তে বৌদির পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে একমাত্র যে ব্যক্তি, সে এই দেওর! মোট কথা একাধাবে স্নেহভাজন, প্রীতিভাজন, আস্থাভাজন, সকল কর্মে-অকর্মে নারীর জীবনে এমন নির্ভরস্থল আর হয় না! মরুর বুকে যেন মরূদ্যান, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরটির যেন এক দ্বীপ। দেওরের কাছেও বৌদি যেন এক মাধুর্যের খনি! মায়ের স্নেহ, বোনের ভালবাসা, সঙ্গিনীর প্রীতি অনুরাগে জড়ানো প্রিয়ভাষিণী, সকল কর্মে প্রশ্রয়দায়িনী বিপদতারিণী, কখনো দেবী, কখনো বা প্রিয়বান্ধবী।

এখন যুগের পরিবর্তন হইয়াছে, সে দিনকাল আর নাই। জানি না আজও বৌদি ও দেওরের সম্পর্কের মধ্যে ততখানি মাধুর্য আছে কিনা।

থাক বা না থাক, সে হিসেবে আমার কোন প্রয়োজন নাই। যদি কেহ ইহাকে অর্থহীন উচ্ছ্বাস বলিয়া উপহাস করে, তাহাকেও আমার কিছু বলিবার নাই। কারণ ইহা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী। সকলের মনের কথা জানি না।

বোধ হয় এতকাল আমার অন্তরে বৌদির ওই স্থানটি শূন্য ছিল বলিয়া মরুর বুকে সহসা নদীর আবির্ভাবে কুলুকুলু ধ্বনিতে দুকূল ছাপাইয়া গিয়াছিল।

আমার জীবনে সেই প্রথম, এর আগে কখনো কোন নারীর মুখে 'ঠাকুরপো' ডাক আমি শুনি নাই। সেদিন আজ ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে কিন্তু এখনো সেই ডাকটি যেন আমার দুকানে ভরিয়া আছে। সে ডাক তো শুধু তাঁর মুখের কথা নয়, তার সঙ্গে যেন তাঁর কণ্ঠের সমস্ত সুধা, অন্তরের সব আবেগ মিশানো, আরো কিছু যার বর্ণনা করা যায় না, যার মাধুর্য কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়কে তৃপ্তিদান করে না, সে যেন ভিতরে ভিতরে সমস্ত অন্তরকে অমৃতময় করিয়া তোলে। অতুল-

প্রসাদ সেনের কণ্ঠে গাওয়া ঠুংরির তানের মত। হ্যাঁ, ভদ্রার মায়ের কণ্ঠে সেই ঠাকুরপো ডাক যেন আমায় সম্মোহিত করিয়া ফেলিত। আমি তাঁর প্রতি এক সম্মোহিত আকর্ষণ অনুভব করিতাম।

বৌদির সঙ্গে গল্প করিতে গিয়া এক-একদিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ন'টা সাড়ে ন'টা এমন কি দশটাও বাজিয়া যাইত। তখন হয়ত ভদ্রার ঠাকুমা আসিয়া ঘরের দোরে দাঁড়াইয়া কণ্ঠে বিরক্তি চাপিতে চাপিতে বলিতেন, বৌমা মেয়েটা যে ঘুমে ঢুলে পড়ছে, এখনো খেতে দাওনি? দশটা বাজতে আর দেরি নেই। কি এত তোমাদের দিনরাত হাসি গল্প বুঝতে পারি না, বাপু!

হ্যাঁ রে আলো, বাড়ি যাবি না?

না, ঠাকুমা। আজ আপনার এখানেই থাকবো মনে করেছি।

সে আর এমন কি বেশী কথা। কিন্তু তোর মামীমা রাগ করবে না? তাঁকে বলে এসেছিস্?

নাগো মা, তোমার সঙ্গে ও রসিকতা করছে। এখুনি যাচ্ছে, আজ ওর মামাতো ভাইয়েরা নাকি কোথায় নেমন্তন্নে গিছে। তাই একলা বাড়িতে মন বসছে না বলেই এখানে রয়েছে।

আজকলে তো দেখি ওর মনটা সব সময় এখানেই পড়ে থাকে। আমার নাতনীর টানে বোধ হয়। বলিয়া ঠাকুমা আমার মুখের উপর একঝলক হাসি ছিটাইয়া দিয়া চলিয়া যান।

ঠাকুমা আমাকে খুব স্নেহের চোখে দেখিতেন। কালীঘাট হইতে সাইকেলে করিয়া তাঁহার পুজার গঙ্গাজল আমি যখন তখন আনিয়া দিতাম। ইহা ছাড়া কলিকাতা হইতে কোনদিন ভাল জর্দা কিনিবার জন্য পয়সা দিয়া যাইতেন। কোনদিন বা খাম পোস্টকার্ড, আবার কখনো বা রাতবেরাতে অসুখবিসুখ হইলে ডাক্তারের বাড়ি হইতে তাঁকে ওষুধ আনিয়া দিতাম। অম্ল অজীর্ণ রোগে তিনি প্রায়ই ভুগিতেন। তাই আমার প্রতি তিনি সব সময়ই সদয় ছিলেন।

ভদ্রার বাবা আসানসোলের নিকট কোন কারখানায় এ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যানের চাকরি করিতেন। প্রতি মাসের শেষে একদিন দুদিনের জন্য বাড়ি আসিতেন।

ঠাকুমা তাঁর নিকট আমার সম্বন্ধে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেন। বলিতেন, সত্যি, এমন পরোপকারী ভাল ছেলে আজকালকার দিনে দেখা যায় না!

ভদ্রার বাবাও চলিয়া যাইবার সময় আমাকে বলিতেন, একটু দেখো বাবা, মেয়েরা সব একলা থাকে, তোমাদের ভরসায় আমি নিশ্চিন্ত থাকি।

একদিন কিন্তু হঠাৎ ভদ্রার বাবার কণ্ঠস্বর ভিতর হইতে আমার কানে আসিল। ঠাকুমার সঙ্গে কি সব আলোচনা করিতে করিতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, সব সময় ওই ছোঁড়াটা এ বাড়িতে পড়ে থাকে কেন মা, ওর কি ঘরবাড়ি নেই? ভদ্রা বড় হয়েছে, লোকে কি মনে করে!

এবার ঠাকুমা নিম্নকণ্ঠে যাহা বলিলেন, তাহাও আমি শুনিতে পাইলাম।

তিনি বলিলেন, ছেলেটা সত্যি সত্যি বড্ড ভালো ! বৌমা তাই ওকে একটু আদরযত্ন করে। ভালমন্দ রান্না করে খাওয়ায়-দাওয়ায়। ছেলেটার মা-বাপ কেউ নেই মামীর কাছে এসে রয়েছে, আর চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছে। বৌমার ইচ্ছে ভদ্রার সঙ্গে ওর বিয়ে দেয়। আমি বলি কি, তোর কারখানায় একটা কিছু চাকরি ওকে যদি করে দিস, তাহলে ও আমাদের একেবারে কেনা হয়ে থাকবে। আর বিয়ে করতে ওর তরফ থেকে কোন বাধাও থাকবে না !

এর মাস তিনেক পরেই ভদ্রার বাবা আমার জন্য কারখানায় একটি চাকরি ঠিক করিয়া চিঠি দিলেন বৌদিকে, যেন এখনি আমাকে তাঁর কাছে পাঠাইয়া দেন।

অনেকদিন পর চাকরি পাইব শুনিয়া মনটা বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বৌদির মুখের দিকে তাকাইয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। দুই তিন দিন তিনি আর আমার সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করেন না, যেন আমি তাঁর কাছে কি একটি অন্যায় করিয়াছি !

এদিকে চাকরি করিতে যাইব বলিয়া ভিতরে ভিতরে সব যোগাড়যন্ত্র করিয়া যেদিন বৌদির কাছে বিদায় লইতে গেলাম, হঠাৎ তিনি নাটকীয়ভাবে বলিয়া উঠিলেন, না, তোমার যাওয়া হবে না। এসব ছোটলোকের চাকরি তুমি করতে পারবে না।

বলিলাম, কিন্তু আপনিই তো আমার জন্যে কারখানায় এ চাকরি ঠিক করেছেন বৌদি !

না, আমি করিনি। করেছেন আমার স্বামী, তোমার মেসোমশায়—আমার শাশুড়ীর পরামর্শে। তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চান ওঁরা, আমি বুঝতে পেরেছি ওঁদের মতলব। তাই আমিও ঠিক করেছি, তোমাকে যেতে দেবো না সেখানে। এ চাকরি করতে দেবো না !

আমি ভয়ে ভয়ে বলিলাম, কিন্তু এই জন্যে মেসোমশাই যদি আপনাকে কিছু বলেন ?

আমি ওঁকে লিখে দিয়েছি কাল, কারখানার চাকরি তোমার শরীরে কুলোবে না বলে তুমি যাচ্ছো না। আমার শাশুড়ী যদি তোমাকে চাকরির কথা বলেন, তুমি ওই কথাই তাঁকে বলো !

কিন্তু বৌদি, আমার মামীমাকে কি বলবো ? তিনি জানেন, আপনার দৌলতে আমার এ চাকরি হয়েছে, আমি কাল সকালের গাড়ীতে আসানসোল রওনা হচ্ছি।

নিঃশব্দে আঁচল দিয়া চোখের দুই কোল মুছিতে মুছিতে তিনি বলিলেন, তাঁকে যা বলবার আমি বলবো'খন। তোমার তার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না।

বলিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া তিনি মামীমার কাছে আসিলেন। তারপর রান্নাঘরে ঢুকিয়া মামীমাকে বলিলেন, দেখো দিদি, বেটাছেলে হয়ে যখন জন্মেছে তখন চাকরি যেখানে হোক, আজ না হয় দুদিন পরে একটা কাজ জুটবেই জুটবে

—তাই বলে জেনেশুনে কারখানার ওই আবহাওয়ায় ওর মত ছেলেকে আমি পাঠাতে চাই না। চরিত্রটাই মানুষের কাছে সব চেয়ে দামী—ক'টা টাকার জন্যে যদি সেটা নষ্ট হয় তখন তো তুমিই দিদি আমায় দুষবে, বৌমা জেনেশুনে কেন আমার ছেলেটার এতবড় সর্বনাশ করলে?

মামীমা কি বুঝিলেন জানি না। একটু থামিয়া বলিলেন, তুমি ওর মঙ্গলটাই আগে চাইবে আমি জানি। তবু প্রথমটা কারখানার নাম শুনে আমার ওই কথাটাই মনে হয়েছিল। কিন্তু আমার ছেলেরা বললে, মা, মেসোমশাই নিজেই যখন কারখানায় কাজ করেন তখন তুমি এত ভাবছো কেন?

বৌদি হাসিয়া উঠিলেন, মেসোমশাই কারখানায় কাজ করেন, তবে তিনি থাকেন অনেক উঁচুতে, 'এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ফোরম্যান'-এর চাকরি করেন!

বৌদির মনটাকে সেইদিন ভাল করিয়া বুঝিলাম, চিনিলাম।

॥ তিন ॥

বৌদি বাড়ি চলিয়া গেলে মামীমা আমার ঘরে আসিয়া বলিলেন, মন খারাপ করিসনি, তোর ভালোর জন্যেই বৌমা তোকে এ কাজ করতে দিতে রাজী নয়। তোকে যে সত্যি সত্যি কতখানি ভালোবাসে, কত আপন ভাবে আজ তা বুঝলুম। দেখিস ওই বৌমাই তোকে একটা ভালো কোন চাকরি যোগাড় করে দেবে। শুনেছি ওর মামাশ্বশুর না খুড়শ্বশুর খুব বড় চাকরি করেন।

মামীমা জানিতেন না যে সেদিন বৌদির জন্য ওই নিশ্চিত চাকরিটা হারাইয়া আমি মনে এতটুকু দুঃখ পাই নাই, বরং সেই না-পাওয়ার মধ্য দিয়া যা পাইয়াছিলাম তার চেয়ে বড় সম্পদ জীবনে আর কখনও পাই নাই, সে আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত ধন—কুবেরের ঐশ্বর্য তুচ্ছ তার কাছে। সেই প্রথম জানিলাম, এ সংসারে অন্তত এমন একজন আছেন যিনি আমার ভালোমন্দ লইয়া চিন্তা করেন, আমার ভালোমন্দ নিজের আপন বলিয়া মনে করেন। সেদিনের সে আনন্দের স্মৃতি আজও মনে তেমনই রোমাঞ্চ জাগায়। উহার অনুভূতি ও মূল্য আমার মত শৈশবে মাতৃ-পিতৃহারা স্নেহ-বুভুক্ষু ছাড়া কেহ বুঝিবে না। বৌদি ও আমার মধ্যে যে সূক্ষ্ম ব্যবধানটুকু আপন-পর-রূপে মনের গভীরে প্রচ্ছন্ন তখনও ছিল, তা কোথায় নিমেষে বিলুপ্ত হইয়া গেল!

বৌদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার ফলে বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে মানুষটা অত্যন্ত তেজী প্রকৃতির, যখন যাহা ভালো মনে করেন তাহা করিবেনই। তাঁর কাজে বাধা দিবার ক্ষমতা কারো নাই—না তাঁর স্বামীর, না শাশুড়ীর, না অন্য কারো। ইহার কারণটাও লক্ষ্য করিয়াছিলাম—তাঁর মধ্যে কোন ভেজাল বা কাজে কোথাও এতটুকু ফাঁকি ছিল না। যার প্রতি যতটা কর্তব্য, সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া করিতেন। স্বামী কন্যা শাশুড়ী বা আত্মীয়স্বজন কাহারো মনে সেজন্য তাঁর

বৌদি বলিলেন, তুমি যাই বলো, পাড়াগাঁ আমার ভালো লাগে।

এর পরে একদিনের কথা ভুলি নাই। তখন চৈত্র মাস। বৌদির বাড়ীর ভিতরে উঠানের একধারে একটা ছোট বাতাবীলেবু গাছ ছিল, সেই বছর প্রথম তাতে ফুল থোপা থোপা ফুটিয়াছিল। সেদিন বৈকালে হঠাৎ কি একটা কাজে তাঁহার খোঁজে গিয়াছিলাম। ভিতরে গিয়া চমকিয়া উঠিলাম, দেখি সেই মাটির উঠান গোবরমাটি দিয়া লেপা, শুকনো খটখট করিতেছে, আর একটা মাটির উনুন তৈরি করিয়া সেইখানে লেবুগাছের তলায় বৌদি রান্না করিতেছেন। বলিলাম, এ কি, অমন সুন্দর রান্নাঘর ছেড়ে এখানে যে!

—খেয়াল! বলিয়া শাড়ির আঁচলাটা বুকের দিকে টানিয়া দিয়া বৌদি বলিলেন, এসো, এখানে বসো। মাছ ভাজছি, গরম গরম দুখানা খেয়ে যাও। দেখবে রান্নাঘরের চেয়ে এখানে খেতে কত ভালো লাগবে!

—বৌদি, ইউ আর রিয়েলি রোম্যান্টিক! এর তুলনা মেলে না।

—যা বলার বাংলায় বলো সাহেব। জানো তো, আমি মুখ্যু পাড়াগেঁয়ে ভূত!

হাসিয়া উঠিলাম।—ভূত নয় পেত্নী! ব্যাকরণে ভুল করলে নম্বর কাটা যাবে।

—পণ্ডিতমশাই, নম্বর কাট তাতে দুঃখ নেই, তবে ফেল করিয়ে দিও না যেন। বলিয়া বৌদি ঠোঁটের কোণে ছোট্ট একটু হাসি চাপিতে গেলেন।

আমি গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলাম, তাহলে আরো ভালো করে পরীক্ষা দিতে হবে। অন্ততঃ আরো দুখানা কড়া করে ভাজা মাছ চাই, নইলে ঠিক বিচার করা যাবে না!

বৌদি হাসিয়া বলিলেন, কী দুষ্টু ছেলে!

এমন সময় খিড়কির দরজা দিয়া ঠাকুমা প্রবেশ করিলেন। উঠানে পা দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, ছি ছি, এমনি করে ভিখিরীর মত ছেলেটা যে ওই মাটিতে বসে খাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ না বৌমা। ওরে ও ভদ্রা, কোথায় গেলি, একটা আসন দিয়ে যা তো দিদি তোর আলোকদাকে!

বলিলাম, না না ঠাকুমা, বৌদির দোষ নেই—আমিই নিষেধ করেছি। এমন পরিষ্কার খটখটে ঝকঝকে উঠোন, এখানে কোন কিছুর দরকার করে না।

—না গো মা, মাটিতে বসে বাবুর কাব্যি হচ্ছে! বলিয়া বৌদি অস্ফুট স্বরে কহিলেন, বলে দিই মাকে সেকথা তাহলে?

—না, প্লীজ, বৌদি!

মিনতি করিতে না করিতে বৌদি শুরু করিয়া দিলেন, জানো মা, এই নিয়ে বাবুর কত কাব্যি! বলে কিনা মাথার ওপর এমন নীল আকাশ আর তোমার যে গাছে প্রথম ফুল ফুটেছে তার তলায় এমনিভাবে মাটির উনুনে রান্না করতে করতে যখন নিজে হাতে খেতে দিচ্ছ, মাটিতে বসে যদি তা না খাই তাহলে নাকি সব মাটি! একেবারে কবিতার ছন্দপতন!

ঠাকুমা মুখে হাসি টানিয়া বলিলেন, আসলে বৌদির হাতের রান্না মিষ্টি লাগে, তাই এত কাব্য ! ঠিক কিনা বলো তো বাবা ?

হাসিয়া ফেলিলাম। বৌদির প্রতি আমার আকর্ষণ যে কত গভীর তা তিনি মনে মনে ভালোই বুঝিতেন, যদিও হঠাৎ কখনও কখনও তা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন এইভাবে। বৌদির মনে অবশ্য ইহার জন্য কোনরূপ সঙ্কোচ বা দ্বিধা ছিল না। বরং লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সেই চাকরির ঘটনার পর থেকেই, আগে যতটুকু আড়াল রাখিয়া চলিতেন তাহা একেবারে ঘুচিয়া গিয়াছিল।

ঘরের আসবাবপত্র খাট বিছানা আলমারি প্রভৃতি সাধারণত একই জায়গায় একইভাবে থাকে দিনের পর দিন বছরের পর বছর। কিন্তু আশ্চর্য বৌদির ঘরে যখনই ঢুকিয়াছি, দেখি সব কিছুই ওলটপালট। আগে যেখানে যা ছিল এখন তা সেখানে নাই, অন্যভাবে সাজানো। সবচেয়ে বিস্ময় বোধ করিতাম যখনই দেখিতাম, শুধু চোখে ভালো লাগিত না, মনে হইত যেখানে যে জিনিস রাখা আছে বুঝি এর চেয়ে ভালোভাবে আর সাজানো যায় না !

একদিন জিজ্ঞাসুদৃষ্টি আমার মুখের ওপর ফেলিয়া হঠাৎ বৌদি প্রশ্ন করিলেন, যখনই আমার ঘরে ঢোকো, চেয়ে চেয়ে এমন ভাবে কি দেখ বলো তো ! যেন হাতি ঘোড়া কত কি অমূল্য সম্পদ আছে এখানে !

—ঠিকই বলেছেন। বলিলাম, হ্যাঁ, শুধু অমূল্য সম্পদ নয়, তার চেয়েও অনেক বেশী মূল্যবান এমন কিছু আছে যা লক্ষ টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায় না !

—তোমাকে নিয়ে আর পারি না ! আঃ, হেঁয়ালি ছেড়ে সোজা কথায় বলো ! জানো তো আমি মুখ্যু, তোমার মত কবি নই !

হাসিয়া ফেলিলাম। আপনি কবি নন, তবে তার চেয়ে বেশি—কবির কল্পনা ! আপনি জানেন না যে আপনার মধ্যে কত বড় আর্টিস্ট রয়েছে !

—যাও, ওই বলে তোষামোদ করে আমার মন ভোলাতে হবে না ! আমি জানি আমি কি। কী করবো বলো, নোংরা-নোংরা অপরিষ্কার কোন কিছু আমি সহ্য করতে পারি না ! তাই নিজে সংসারে গতরটাকে পিষে দিই।

বলিলাম, ওকথা বলে আমার চোখকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করবেন না। সংসার সব মেয়েরাই করে, সবাই নিজের সংসারকে ভালবাসে, কিন্তু এমনিভাবে রান্না-ভাঁড়ার থেকে শোবার ঘরকে পর্যন্ত নিত্য নতুন রূপে গোছাতে কখনও কাউকে দেখিনি।

—থামো ! ক'টা মেয়েকে দেখেছ যে পণ্ডিতী ফলাতে এসেছ ! বলিয়া দ্রুত আমার মুখের উপর তির্যক দৃষ্টি হানিয়া বৌদি বলিলেন, তবে হ্যাঁ, একঘেয়েমি জিনিসটা একেবারে আমার ধাতে সয় না। আজকে যেটা ভালো লাগে, কিছুদিন পরে আর ভালো লাগে না। আরো ভালো আরো ভালো মনটা চায়। কি করব ভাই, ওটা আমার স্বভাবের দোষ। ছেলেবেলায় মার কাছে এজন্যে কম বকুনি খাই নি !

—দোষ! কি বলছেন? বলুন যে গুণ! সকলের মধ্যে এটা থাকে না, মানুষ এ নিয়ে জন্মায়। এরই নাম শিল্প-চেতনা। এইজন্যে ছোট বড় যে-কোন কাজ তার হাতের স্পর্শে সুন্দর হয়ে ওঠে। এইজন্যে আর্টিস্টের মূল্য সব টাকা পয়সার ঊর্ধ্বে! তেমনি আবার সেই সুন্দরকে উপলব্ধি করার দৃষ্টিও সকলের থাকে না। সমালোচকের মূল্যও কম নয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে শিল্পীর চেয়ে বেশি।

বৌদি হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আর নিজের দাম বাড়াতে হবে না ঠাকুরপো, বুঝেছি সব। আমি যেমন আর্টিস্ট, তুমি তার তত বড় সমালোচক হয়েছ—তা এখন একটু থামবে কি! তোমার মুখের প্রশংসা শুনে শুনে কান পচে গেছে। আর্টিস্ট হয়েছি! রোমান্টিক হয়েছি! এখনও আরো কত বাকি জানি না।

বলিলাম, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি!

সহসা তাঁর কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল। মুহূর্ত কয়েক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কৈ যাদের জন্যে সংসারে গতর পিষে মরছি, তাদের মুখে তো একদিনও এতটুকু কিছু শুনিনি।

বুঝিলাম এ রাগের আসল কারণটা তাঁর স্বামী। তাই একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম, ছোট মুখে বড় কথা শোনাবে, তাই যদি অনুমতি করেন তাহলে একটা কথা আমি বলব—

—থাক্, খুব হয়েছে! এত ভনিতা না করে আসল কথাটা বলে ফেল! যেন বৌদির কত মানসম্ভ্রম বাঁচিয়ে কথা বলো!

বলিলাম, আপনি মনে করছেন আমি ঠাট্টা করছি!

বৌদি কণ্ঠে বিদ্রূপ চাপিয়া কহিলেন, পাগল! দেওরের সঙ্গে কি বৌদির সেই সম্পর্ক! আর দাম বাড়াতে হবে না, বলে ফেলো মনের কথাটা।

বলিলাম, আপনি মিছিমিছি দাদার ওপর রাগ করছেন। আসলে আপনি দাদার মনটা ভরিয়ে রেখেছেন। জানেন তো, শূন্য কলসী থেকেই আওয়াজ বেশি দেয়, ভরে গেলে আর শব্দ বেরোয় না!

—আচ্ছা, দয়া করে এবার মুখটা বন্ধ করুন। আমার স্বামীর 'ক্যারেকটার সার্টিফিকেট' তোমার কাছ থেকে নিতে চাই না!

স্বামীর প্রতি তাঁর মনে কোথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন আক্রোশ ছিল, মুখে ব্যক্ত না করিলেও কাজের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িত। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে বৌদি পারিতেন না। কিন্তু আমি বুঝিয়াও বোকা বনিয়া থাকিতাম।

ইদানীং একটা পরিবর্তন আমি বৌদির মধ্যে লক্ষ্য করিতাম। সন্ধ্যার পর যেন তিনি অন্য মানুষ। ভাল করিয়া চুল বাঁধিয়া রঙিন শাড়ি পরিয়া, কপালে বড় সিঁদুরের টিপ দিয়া সাজগোজ করিয়া থাকিতেন। একদিন এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে গেলে বৌদি চটিয়া উঠিলেন, কেন, চিনতে পারছ না বুঝি? সেই বিনা

মাইনের ঝি, রাঁধুনী, ঘরনিকুনি, ঝাড়ুদারনীকে দেখতে পাচ্ছ না বলে খুবই অসুবিধা হচ্ছে বুঝি? তারপর সহসা গম্ভীর হইয়া গেলেন, এখন থেকে সারাদিন সংসারের, কিন্তু সন্ধ্যের পর আর কারুর নয়!

মনে পড়ে সেদিন ছিল শুক্লা চতুর্দশী। সন্ধ্যা থেকেই চাঁদের আলোয় বৌদির ফুলবাগান ও সামনের বারান্দাটা অপূর্ব সুন্দর দেখাইতেছিল। আমি হঠাৎ গিয়া পড়িতে, বৌদি বারান্দায় বসিয়াছিলেন, আমায় তাঁর পাশে বসিতে বলিলেন। তারপর ভদ্রাকে বলিলেন, একটা গান কর তো মা!

মায়ের কোন কথার ওপর কথা বলার সাহস ভদ্রার ছিল না। তাই সে তখনই গান ধরিল—'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে!'

এই সময় হঠাৎ দেখি ভদ্রার বাবা ফটক দিয়া ঢুকিতেছেন। সাধারণত তিনি যখন থাকিতেন, আমি বিশেষ যাইতাম না। তাই তাঁকে দেখিয়া আমি যখন উঠিতে চাহিলাম, বৌদি বলিলেন, না, তুমি যাবে না—বসে থাকো এখানে।

— কিন্তু উনি যে এসেছেন!

—আসুন না, তাতে তুমি চলে যাবে কেন?

॥ চার ॥

বৌদির আদেশ অমান্য করিবার সাধ্য যে আমার ছিল না, তা তিনি জানিতেন ভাল করিয়া। তাই সুবোধ বালকের মত তাঁর পাশে বসিয়া রহিলাম। ভদ্রাও তেমনি গান গাহিতে লাগিল। ভদ্রার বাবা শুধু নিঃশব্দে বারান্দায় আমাদের পাশ দিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

বৌদির কথা বলিতে পারিব না, কিন্তু আমার মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সেতারের মত এতক্ষণ যে সুর ধ্বনিত হইতেছিল, সকলের অগোচরে নিমেষে যেন তাহার তার ছিঁড়িয়া সুর কাটিয়া গেল, কেন তা জানি না।

মনে পড়ে একদিন 'চিত্রা' সিনেমায় 'চণ্ডীদাস' দেখিতে যাইবেন বৌদি আমার সঙ্গে। আমি যথাসময়ে উপস্থিত হইলে বৌদি সাজগোজ করিয়া বাহিরে আসিলেন। কিন্তু আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কী দেখছ এমন করে শাড়ীটা মানায়নি, এই তো? না মানায়, তাতে তোমার কি?

কী জ্বালা, আমি কি কিছু বলেছি নাকি?

আবার বলবে কি করে, তোমার চাউনি আমি চিনি, আমার কাছে লুকোতে চেষ্টা করো না। বলিতে বলিতে খপ্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। হয়ত রুমাল বা কিছু ভুলিয়া গিয়াছেন, যখন ভাবিতেছি, দেখি সেই শাড়ীটা বদলাইয়া সুন্দর ফিরোজা রঙের একটা ঢাকাই পরিয়া আসিলেন।

সত্যি এই শাড়ীটা তাঁকে খুব মানাইয়াছিল। তবু সেকথা চাপিয়া প্রশ্ন

করিলাম, এ কী, শাড়ীটা বদলালেন কেন? বেশ তো ছিল!

আমার খুশি! বলিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইলেন।

আসলে এই বিশেষ শাড়ীটা আমার পছন্দেই তিনি কিনিয়াছিলেন ফিরিওলার কাছে। একদিন দুপুরে গিয়া দেখি, বৌদির বারান্দায় খুব ভিড়। অনেক শাড়ীর মধ্যে কোনটা কিনিবেন মনস্থির করিতে পারিতেছিলেন না। পাড়া-প্রতিবেশিনী যাঁরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁরা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী কার চোখে কোন্‌টা ভাল বলিতেছিলেন। শেষে বৌদি আমায় প্রশ্ন করিলেন, তোমার কোন্‌টা ভাল লাগে? আমি যেটা দেখাইলাম, সেটাই তিনি তখন কিনিয়া ফেলিলেন।

ওই শাড়ীতে তাঁকে যত সুন্দরই দেখাক আমার মন কিন্তু তখন অন্য কথা চিন্তা করিতেছিল। নীরবে কিছুক্ষণ হাঁটিবার পর বৌদি বলিলেন, এই শাড়ীটা চিনতে পারছ না, তুমিই পছন্দ করেছিলে একদিন!

আমি বলিলাম, এ ছাড়া কি আপনার কোন শাড়ী ছিল না?

কেন থাকবে না! অনেক আছে।

তাহলে বিশেষ করে এটাই বা পরতে গেলেন কেন? ছি ছি, ভদ্রা বা ঠাকুমা কি মনে করছেন!

এতে মনে করাকরির কি আছে, আমি তো বুঝি না।

বলিলাম, যে শাড়ীটা পরে সেজেগুজে বেরুলেন, আমি যাওয়ার পরই হঠাৎ সেটাকে বদলে ফেললেন কেন, তাঁদের কি কিছু বুঝতে বাকি থাকে!

এতক্ষণে যেন বৌদি আমার কথার আসল অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। সহসা আমার মুখের উপর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলিয়া উঠিলেন, হোক মনে. আমি তো সেটাই চাই। বুঝুক!

এরপর আমার পক্ষে আর কোন কথা বলা সাজে না, তাই চুপ করিয়া রহিলাম।

এই শাড়ীর প্রসঙ্গে আর একদিনের কথা জানি। সেদিন সন্ধ্যার পর গিয়া দেখি বৌদি ও ভদ্রা ঘরের মধ্যে সাজগোজ ও প্রসাধনে ব্যস্ত। বিয়ের নিমন্ত্রণ, তখনই যাইবেন সেখানে। আমি বলিলাম, বৌদি, তাহলে এখন চলি। একলা সব খাবেন না, পেটুক দেওরের জন্যে কিছু ছাঁদা বেঁধে আনবেন কিন্তু!

কথা শেষ করিতে না করিতেই ঠাকুমা বারান্দায় বাহির হইয়া বলিলেন, এসেই চলে যাবে কেন, বৌমা ছাড়া কি বাড়িতে আর লোক নেই! বুড়ী হয়েছি বলে ঠাকুমার সঙ্গে দু'দণ্ড গল্প করলে জাত যাবে না!

ঠাকুমা যতদূর সম্ভব কণ্ঠে মধু মিশাইয়া কথাগুলি বলিলেন বটে, কিন্তু সেই মধুর ভিতরে যে একটু হুল ছিল সেটাই যেন আমার কানে আসিয়া বিঁধিল।

অগত্যা আর ফেরা হইল না। বসিয়া ঠাকুমার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিলাম। এমন সময় ভদ্রার গলা শুনিতে পাইলাম, মা, বাবা এত দাম দিয়ে তোমায় পুজোয় যে শাড়ীটা কিনে দিয়েছেন, সেটা পরো না আজ।

মাগো, তোর বাবার যেমন পছন্দ—ও পরে ভদ্র সমাজে যেতে পারব না!

কী যে তুমি বলো, ঠিক নেই! এতদিন তো বাবাই তোমার জন্যে সব শাড়ী কিনেছেন, তুমি পরেছো!

তুই চুপ কর্ তো! ছোট মুখে বড় কথা শুনলে গা জ্বলে যায়! পছন্দ-অপছন্দের তুই কি বুঝিস?

ওই কথাগুলি কানে আসিবামাত্র আমার যেন নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হইতে লাগিল। কারণ বৌদি যে শাড়িটা পরিয়াছিলেন, জানালার ফাঁক দিয়া আমার চোখে তাহা পড়িয়াছিল। গরদের উপর সারা গায়ে জরির বুটি ও চওড়া জরির পাড়ওলা ওই শাড়ীটা, বৌদি টাকা দিয়াছিলেন, জওহরলাল পান্নালাল-এর দোকান হইতে পছন্দ করিয়া আমি কিনিয়া আনিয়াছিলাম। কী জানি, পাছে আরো কিছু শুনিতে হয় এই আশংকায় তৎক্ষণাৎ একটি জরুরী কাজের অছিলায় ঠাকুমার কাছ হইতে উঠিয়া বাড়ি চলিয়া গেলাম।

॥ পাঁচ ॥

বৌদির প্রতি আমার, এই সম্মোহিত অনুরাগের মূল্য যে কোথায় কেহ তাহা জানিত না, এমন কি বৌদিও না। জীবনে কাহারও কাছে কখনো উহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই। ভগবান যা হইতে আমায় চিরদিন বঞ্চিত করিয়াছেন, যাচিয়া সাধিয়া ভিক্ষুকের মত মাগিয়া সে তৃষ্ণা মিটাইবার প্রবৃত্তি কখনো হয় নাই। কেবল শৈশবে কিংবা যৌবনে নয়, বলিতে লজ্জা নাই, এখনও পর্যন্ত স্বভাব হইতে উহা যায় নাই। ওই একটা জায়গায় ছিল সব চেয়ে বড় ঘা—হিমালয়প্রমাণ অভিমান! জানি এ অভিমান তাহারই সাজে যার অনেক আছে, ভালবাসার, আদর করিবার, সোহাগ কাড়াইবার আপনজন। সেদিক হইতে আমি নিঃস্ব। বিশেষ করিয়া শূন্যতা ছাড়া আর কিছু ছিল না, তবু উহা পূর্ণ করিবার লালসায় হাত বাড়াই নাই কাহারো দিকে। যেচে মান কেঁদে সোহাগ পাইবার জন্যে মাথা নীচু করিতে পারি নাই অন্য কারো কাছে। বুকের ভিতরটা জ্বলিয়া পুড়িয়া গিয়াছে, তবু জানিতে দিই নাই কাহাকেও। বোধ হয় ইহার জন্য আমার জন্মলগ্নে শনির দৃষ্টি দায়ী। তাই সরল সোজা পথে না চলিয়া জীবনের ধারা বার বার বিপরীত মুখে গিয়াছে।

জ্যাঠাইমার কথা মনে পড়ে। ছেলেবেলায় আমার উপর রাগ হইলে বলিতেন, উল্টো বিধাতার সৃষ্টি! বিশেষ করিয়া যদি কেহ আমাকে ভাল ছেলে বলিয়া উল্লেখ করিত, জ্যাঠাইমা তাঁর মনের সব ঝাল ঝাড়িতেন তার ওপর। ছড়া কাটিয়া বলিতেন, 'যার হাতে খাইনি সে বড় রাঁধুনী, আর যার ঘর করিনি সে বড় ঘরণী!' লোকের কি, মুখে ভাল ছেলে বলেই খালাস—যাকে ঘর করতে হয় ওর সঙ্গে সে-ই জানে, জ্বলেপুড়ে মলুম! খিদে পেলে বলতে জানে না খেতে দাও,

অসুখ হলে মুখে চাবি দিয়ে পড়ে থাকবে,—কখন ওর খিদে পাচ্ছে, কী অন্য কিছু খেতে ইচ্ছে করে, তা তোমাকে ওর মনের ভেতর ঢুকে জানতে হবে !

জ্যাঠাইমার কথাটা মিথ্যা নয়। ও সম্বন্ধে আর কোন মন্তব্য করিতে চাহি না। শুধু এর একমাত্র ব্যতিক্রম দেখিলাম বৌদিকে। তিনি কেমন করিয়া একেবারে আমার মনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিলেন জানিতে পারি নাই। আমার জীবনে কোথায় আসল শূন্যতা, একমাত্র তিনিই ধরিতে পারিয়াছিলেন। যে দিন কোন ভাল কিছু রান্না করিতেন, আলাদা করিয়া একটা বাটিতে তুলিয়া রাখতেন। আমি না খাওয়া পর্যন্ত যেন তাঁর মনে শান্তি ছিল না। যদি কোনদিন মুখ ঘুরাইয়া লইতাম, রোজ রোজ ভাল না—না, আমি খাব না ! তখন নিজের হাতে মুখে গুঁজিয়া দিয়া বলিতেন, উঃ, বিষ নেই কুলোপানা চক্কর ! আবার রাগ দেখানো হচ্ছে ! সেদো ভাত খাবি, না হাত ধুয়ে বসে আছি ! তোমার মনের ভেতর কি আছে, আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। বলিয়া ঈষৎ হাসিতেন।—তোমার দুষ্টুমি আমি ভাল করে চিনি, তুমি এই বলে আমার মনটাকে নেড়ে দেখতে চাও, আসলে বৌদির ভালবাসা কতখানি খাঁটি কত আন্তরিক। নাও, গিলে নিয়ে আমার চোদ্দ পুরুষকে উদ্ধার কর ! বলিতে বলিতে তাঁর কণ্ঠস্বর সহসা স্নেহার্দ্র হইয়া আসিত, তিনি বলিতেন, মনে রেখো এ সংসারে আমি ছাড়া কেউ নেই যে তোমার মনের ভেতর ঢুকতে পারে।

কখন আমার দু' চোখের কোলে জল আসিয়া পড়িয়াছিল জানি না, বৌদি তাঁর শাড়ীর আঁচল দিয়া চট করিয়া আমার চোখ মুছাইয়া লইয়া বলিলেন, ছিঃ, বুড়ো খোকার চোখে মানায় না !

হঠাৎ একটু বেসামাল হইয়া পড়িয়াছিলাম, বৌদির মুখের ওই কথা শুনিয়া নিজেকে সংযত করিতে গিয়াও পারি নাই। জীবনে এমন অনুরাগভরা একান্ত স্নেহের স্পর্শ এর আগে আর কখনো পাই নাই।

এইভাবে ছোটোখাটো নানা ঘটনার মধ্য দিয়া বৌদি আমার মনটাকে এমন ভাবে কাড়িয়া লইয়া ছিলেন যে দু'চারদিন তাঁহাকে না দেখিলে মনটা এমন চঞ্চল হইয়া উঠিত যে কোন কাজে মন দিতে পারিতাম না।

কিছুদিন হইল কলিকাতার এক নামী কোম্পানির প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক ক্যানভাসিং করিবার জন্য দুই মাসের জন্যে একটা চাকরি জুটিয়া গিয়াছিল। স্কুলে স্কুলে পাঠ্যপুস্তক লইয়া হেডমাস্টার মশাইদের সঙ্গে দেখা করিয়া সেই বই যাহাতে তাঁদের স্কুলের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়, তার জন্যে চেষ্টা করিতে হইবে। এই কাজেই রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বর্ধমান প্রভৃতি শহরে গিয়া দুই-চারিদিন করিয়া থাকিতে হইত। তিন-চারদিন পরে বাড়ি ফিরিয়া বৌদির কাছে গিয়া দেখিয়াছি, যেন তিন-চার মাস আমায় দেখেন নাই ! যেদিন ফিরিতাম তাঁর চোখে মুখে এমনি একটা আগ্রহ ও আকুতি দেখিয়া আরো যেন তাঁর প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিতেন আরো কতদিন লাগিবে শেষ হইতে। তিনি

যে আমার জন্যে মনে মনে কতখানি অধৈর্য হইয়া উঠিতেন, তাঁর কথায় তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িত। এ জগতে আমার সামান্য অদর্শনে এত অধীর ও এমন ব্যাকুল হইতে কখনও কাহাকেও দেখি নাই। তাই আমার মন কৃতজ্ঞতার বদলে তাঁর চিন্তায় সব সময় বিভোর হইয়া থাকিত।

একটা বিশেষ ঘাট ছিল যেখানে বৌদি স্নান করিতেন। গ্রামের সকলে যেখানে স্নান করিত সেখানে নাহিতে তাঁর প্রবৃত্তি হইত না। সকলের গায়ের ময়লা এবং আরো কত কি যে ঘাটের জলে ভাসিত! তাই পরাণ মালীর বাগানে যে ঘাট ছিল, যেখান হইতে জল লইয়া মালী গাছপালায় দিত, সেই ঘাটটাই নির্জন ও নিরিবিলি বলিয়া তিনি পছন্দ করিতেন। মালীকে তিনি পূজায় কাপড় দিতেন, যখন তখন দু'চার আনা বখশিশও করিতেন বলিয়া তাঁর সেখানে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। বারোয়ারীর ঘাটে নাহিতে আমারও ঘেন্না করিত, তাই মালীকে আমিও পয়সা দিয়া হাত করিয়াছিলাম। দুপুরে স্নান করিতে গিয়া এক-একদিন বৌদির সঙ্গে সেই ঘাটে দেখা হইয়া যাইত। বৌদি আগে স্নান করিয়া গেলে জলে নামিলেই বুঝিতে পারিতাম। উৎকৃষ্ট বিলিতি লাক্স সাবান তিনি ব্যবহার করিতেন, ঘাটের কাছে জলেতে সেই গন্ধ মিশিয়া থাকিত অনেকক্ষণ।

একদিন বৌদি নিজেই বলিয়া ফেলিলেন, তুমি যে চন্দন সাবানটা মাখো— ঘাটে গেলেই আমি বুঝতে পারি তুমি আগে স্নান করে চলে গেছ কিনা।

এই সময় একদিন ঘাটে গিয়া দেখি বৌদি আগে জলে নামিয়া গিয়াছেন। আমায় দেখিয়া বলিলেন, কি, তুমি যে আজ বর্ধমান যাবে বলেছিলে, গেলে না?

যাবো। তিনটের গাড়িতে। অফিস থেকে বইপত্তর টাকাকড়ি বুঝে নিয়ে এলুম এইমাত্র।

বৌদি বলিলেন, কবে ফিরবে?

বলিলাম, তিন-চার দিন লাগবে।

না চার দিন নয়, তিন দিনে কাজ সেরে তোমায় আসতে হবে। বলিতে বলিতে ঘাটে আসিয়া বসিলেন, সাবান মাখিবার জন্য।

যথা আজ্ঞা, দেবী! বলিয়া আমি তখন জলে নামিয়া গেলাম। ডুব দিয়া একটুখানি সাঁতার কাটিয়া, সাবান মাখিতে আসিয়া দেখি, বৌদি আমার সাবানটা মাখিতেছেন।—একি, পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে কি হয় জানেন?

জানি। বলিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তারপর জলের ঝাপটা দিয়ে চোখের মুখের সাবান ধুইতে ধুইতে বলিলেন, জানো একদিন তুমি যখন সাঁতার কাটছিলে, আমি চুপি চুপি করে তোমার এই সাবান মেখেছিলুম। ওঃ, কী চমৎকার গন্ধ! তোমায় বলতে লজ্জা নেই, তিন-চারদিন আমার বালিশে ও চাদরে শুতে গিয়েও সেই গন্ধটা আমি পেয়েছি। বলিয়া সাবানটা আর একবার মুখে গলায় ও পিঠের

দিকে ঘষিয়া লইয়া বলিলেন, এই নাও, ধরো—

বলিলাম, না, এর জরিমানা স্বরূপ আপনার ওই সাবানটা আমি আজ মাখব !

ওরে দুষ্টু, তোমার মতলব বুঝতে পেরেছি। আজ চলে যাবে বলে আমার সাবানটা গায়ে মেখে নিচ্ছ। এর গন্ধটা যতক্ষণ নাকে থাকবে বৌদির কথাটা মনে পড়বে।

তাহলে আমি যদি বলি, আপনিও আমার সাবানটা মেখেছেন সেই উদ্দেশ্যে ! তাহলে ? আগেই তো কবুল করেছেন, তিন-চারদিন এর গন্ধ থাকে !

বয়ে গেছে আমার তোমার কথা মনে করার জন্যে ! বলিয়া ঝপ করিয়া তাঁর হাতে যে সাবানের ফেনাটা ছিল আমার মুখের ওপর ছুঁড়িয়া দিলেন।

ফেনাটা মুখের চেয়ে বেশি চোখে আসিয়া লাগিল ! দুই হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিলাম, উঃ, বড্ড জ্বালা করছে, বৌদি !

একটু জ্বলুক। তবে যদি বৌদির কথা মনে পড়ে !

বলিয়াই দু'আঁচলা জল দু'হাত ভরিয়া আমার চোখেমুখে ঝাপটা দিয়া ধুইয়া দিলেন।

এমনি এক-একটা রসিকতার ভিতর দিয়া তাঁর মনের যে চিত্রটা আমার চোখে ফুটিয়া উঠিত, তাহাতে তাঁর প্রতি আমার আকর্ষণ আরো বাড়িয়া যাইত।

॥ ছয় ॥

একদিন দুপুরবেলা বৌদি আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। গিয়া দেখি বারান্দায় রোদে একগাদা পুরনো বই তিনি গোছ করিতেছেন। সেলাই ছিঁড়িয়া বইয়ের পাতাগুলি সব এলোমেলো হইয়া গিয়াছে।

কী করছেন ?

দেখো না ভাই, আমার বইগুলোর সব সেলাই খুলে কেমন হয়ে গেছে। এগুলোকে তোমায় ভাল করে কলকাতা থেকে বাঁধাই করে এনে দিতে হবে।

দেখিলাম সবগুলিই বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী। বঙ্কিমচন্দ্র, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, শরৎচন্দ্র প্রমুখের সব গ্রন্থাবলী।

এসব কার বই, বৌদি ?

কেন, বৌদি মুখ্যু বলে এই বইগুলো যে তাঁর বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না !

ছি-ছি, কী যে বলেন। আমার মুখে কোনদিন কি সেকথা শুনেছেন ? আর কোনদিন যেন আপনার মুখে একথা না শুনি।

আচ্ছা ঘাট হয়েছে, আর বলব না।

আচ্ছা বৌদি, আপনি তো আচ্ছা লোক ! এইসব ভালো ভালো বই আপনার আছে, কোনদিন তো বলেন নি ?

ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি টিপিয়া লইয়া বলিলেন, কেন, তাহলে আরো একটু বেশি

ভক্তি করতে !

আঃ, সব-সময় এমন হুল ফুটিয়ে কথা বলেন কেন বলুন তো ?

বুঝেছি, শুধু মধু খেতে ভালো লাগে, না ?

আবার ?

এবার বৌদি বলিলেন, জানো বিয়ের পর যখন কলকাতার বাসায় থাকতুম, তখন আমার এক দেওর ছিল যে এইসব বই আমায় কিনে উপহার দিয়েছিল। একলা দুপুরটা বৃথা না ঘুমিয়ে এইসব বই পড়তুম। কতবার করে যে পড়েছি তার ঠিক নেই। তাছাড়া একটা লাইব্রেরি থেকেও ঠাকুরপো সপ্তাহে তিন-চারখানা করে উপন্যাস ও গল্পের বই এনে দিত। নভেল নাটক অনেক পড়েছি। যা ঠিক বুঝতে পারতুম না, ঠাকুরপো বুঝিয়ে দিত। তবে সত্যি বলতে কি, কবিতা-টবিতা আমি বিশেষ পড়িনি, বুঝি না—ও আমার ধাতেও সয় না।

হাসিয়া বলিলাম, তা সইবে কেন, আপনি নিজেই যে একটি সাক্ষাৎ কবিতা !

যাও, ঠাট্টা করতে হবে না। তোমার মত সবেতেই কাব্য যদি না পাই দেখতে !

বিশ্বাস করুন বৌদি, আপনার সব কাজকর্ম যেমন, আপনার মনটাও তেমনই যেন ছন্দে গাঁথা।

এ সব ঢের শুনেছি, এবার নতুন কিছু আমদানি করো ভাই ! বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সত্যি বৌদি, আপনাকে যত দেখি বিস্ময় বাড়ে তত। আরও কত কি রত্ন আছে আপনার মধ্যে দেখতে ইচ্ছে করে।

থাক্, আর এত তেল দিতে হবে না। আরও কী চাও, তাই বলে ফেলো ভণিতা না করে।

আর কি চাই জানি না বৌদি, তবে যা পেয়েছি জীবনে কখনও তা কারও কাছে পাইনি।

ফের হেঁয়ালি করছ ! আমি তোমার ওই সব কাব্যি বুঝতে পারি না, কত বার বলেছি ! কী পেয়েছ শুনি ?

এর জবাব মুখে না দিয়া শুধু তাঁর দুটি স্নেহকোমল চোখের উপর নীরবে তাকাইয়া রহিলাম। বৌদিও কয়েকটা মুহূর্ত তেমনই নীরব থাকিয়া নরম সুরে বলিলেন, না দিলে কি পাওয়া যায় ঠাকুরপো !

কী বলছেন বৌদি ? আপনাকে দিতে পারি এমন কি আছে আমার ? আপনিই তো কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখিয়েছেন।

এবার একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, দেওয়ার মধ্যে দিয়েই তো পাওয়া ঠাকুরপো। মেঘ জল দেয়, আবার সেই জলই তো মেঘ হয়ে বৃষ্টির ধারা নামে, তুমি কি জানো না ?

ফাইন ! ভেরি গুড্ ! কে বলে আপনি কবি নন্ ?

নিমেষে বৌদির মুখটা গোলাপী হইয়া উঠিল। বলিলেন, তোমার মত কবির পাল্লায় যখন পড়েছি, কবি না করে কি তুমি ছাড়বে! তারপর একটুখানি হাসি ঠোঁটের প্রান্তে টিপিয়া লইয়া কহিলেন, তাহলে এতদিন ছিলুম রোমান্টিক, আর্টিস্ট, এবার তার সঙ্গে যোগ হলো কবি! তুমি এর পরে আরও কি উপাধি দেবে ঠাকুরপো?

॥ সাত ॥

সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমা। বৌদি ঘটা করিয়া সত্যনারায়ণের সিন্নী দিলেন, দাদার মাহিনা বাড়িয়াছে, পদোন্নতি হইল বলিয়া। পাড়াশুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সত্যনারায়ণের সিন্নী পাঁচালী-পাঠ হরির লুটের পর সকলকে বাটি ভরিয়া সিন্নী ও বাতাসা প্রসাদ বণ্টন করিতে বেশ রাত হইয়া গেল। তখন বোধ হয় রাত দশটা। বৌদি গামছা ও শাড়ী লইয়া ঘাটে গা ধুইতে গেলেন। যাইবার সময় আমায় বলিলেন, ঠাকুরপো, তুমি একটু আমার সঙ্গে এসো তো ভাই, ঘাটে একটু দাঁড়াবে।

পূর্ণিমার রাত। পরাণ মালীর বাগান ও ঘাটে কেবল নয়, সারা দীঘির জলে যেন জ্যোৎস্নার প্লাবন নামিয়াছে। বৌদি জলে ঝুপ করিয়া নামিয়া পড়িলেন, তারপর আমায় বলিলেন, তুমি তো সারাক্ষণ কম পরিশ্রম করোনি, সকলকে প্রসাদ বিলি করতে গিয়ে ঘেমে গেছ, একটু গা-টা ধুয়ে নাও না!

আমার মনের ইচ্ছাটা যেন বৌদি অন্তর্যামীর মত বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আবারও বলিয়া উঠিলেন, আমার ওই শাড়ীটা পরে নামো, গামছা তো আমি এনেছি—গা মুছে তারপর তোমার ধুতিটা পরে নিয়ো।

আমি নিমেষে প্রস্তুত হইয়া জলে নামিয়া পড়িলাম। তারপর ডুবসাঁতার কাটিতে কাটিতে আগাইয়া গেলাম। বৌদিও যে নিঃশব্দে আমার পিছু পিছু সাঁতার দিতেছিলেন বুঝিতে পারি নাই। সহসা নাটকীয় ভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'মরা গাঙে এত জ্যোৎস্না কিসের প্রতাপ?'

এ কি, আপনি এসে পড়েছেন?

হ্যাঁ! বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর পড়োনি। প্রতাপ আর শৈবলিনীর সেই সাঁতারের দৃশ্যটা মনে পড়ছে?

বলিলাম, আপনি কি কোনদিন অভিনয় করেছেন?

হাসিয়া ফেলিলেন, করব না কেন, এই তো করছি!

তার মানে, আপনি শৈবলিনী, আর আমি প্রতাপ!

হ্যাঁ, মন্দ কি! নইলে জমবে কেন নাটক।

।। আট ।।

এই ভাবে রঙ্গচ্ছলে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও বৌদির ভিতরের যে রূপটা তখন আমার চোখে ধরা পড়িত তা দেখিয়া আমার মুখে কথা ফুটিত না, বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া যাইতাম। কখনও ভাবিতাম বুঝি মাতৃত্বটাই তাঁর মধ্যে সবচেয়ে প্রবল, আবার তাঁর সেই চেহারা দেখিয়া মনে হইত বুঝি রোমাণ্টিক ভাবটা আরও বেশি!

একদিন কথার মাঝে হঠাৎ থামিয়া বৌদি তাঁর দুটি বিস্ফারিত চোখ আমার মুখের উপর মেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা ঠাকুরপো, সত্যি বল তো, যখন-তখন এমন হাঁ করে চেয়ে থাকো কেন আমার মুখের দিকে? আমার পটল-চেরা চোখও নয়, ফুলের পাপড়ির মত ঠোঁটও নয়, গোলাপ ফুলের মত রংও ভগবান দেননি, তাহলে কি দেখো? বলিতে বলিতে ছোট্ট একটু হাসি ওষ্ঠপ্রান্তে টিপিয়া কহিলেন, এক এক সময় আমার মনে হয়, জীবনে যেন তুমি কোন মেয়েছেলে দেখোনি!

বলিলাম, ঠিকই ধরেছেন।

তার মানে? বলিয়া এমন ভাবে মিষ্ট ভঙ্গীতে ভ্রূ বাঁকাইলেন যে আমি হাসিয়া ফেলিলাম।

হাসছো যে বড়! এবার শাসনের সুরে বলেন।

বলিলাম, তার মানে আপনার কথাটাই ঠিক। দেখেছি অনেক মেয়ে তবে এমন আর কখনো দেখিনি।

যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না, আমি জানি—কেমন দেখতে আমায়।

বৌদি, রূপটা কি শুধু বাইরের?

থাক্, ওই বলে আর আমার মন ভোলাতে হবে না—একটা পাঁচ বছরের শিশুও জানে, রূপটা বাইরে দেখা যায় বলেই চোখ টানে আগে তার দিকে। বলিয়া কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া প্রশ্ন করিলেন, ভেতরে আবার রূপ থাকে নাকি, সেটা কেমন ধারা দেখতে শুনি তোমার মুখে?

ও তো চোখে দেখা যায় না বৌদি। ফুলের ভেতরে গন্ধের মতন গোপন থাকে।

ওঃ, সে গন্ধ বুঝি কেবল তুমি একলা পাও—সংসারের আর কেউ পায় না। বলিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন।

আর কেউ বলিতে কাকে বোঝায় আমি তা জানিতাম। আসল অভিমানটা তাঁর স্বামীর উপর, তাঁর ধারণা তিনি তাঁকে উপেক্ষা করেন। তাই তাঁকে তুষ্ট করিবার জন্য বলিলাম, ফুলের বাগানে যার বাস, তার নাকে তেমন গন্ধ লাগে না, অথচ বাইরের কেউ তার ধারে কাছে আসামাত্র তার মনপ্রাণ ভরে ওঠে

সুগন্ধে।

থাক, আর ভাঁওতা দিতে এসো না ঠাকুরপো, তোমার মত ভাল ভাল কথা বলতে না পারলেও, সব বুঝি।

কিচ্ছু বোঝেন না। আমি বাজী রেখে বলতে পারি। আচ্ছা, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তো আপনাকে 'ভাঁওতা' দিতে পারেন না।

ওমা, কি সর্বনেশে কথা। এর ভেতরে বিশ্বকবি এলেন কোথা থেকে? আমাকে তিনি তো দেখেননি কোনদিন!

বলিলাম, উনি যে বিশ্বকবি, ওঁর একটা তৃতীয় নয়ন আছে, যা দিয়ে তিনি সব মানুষের মনের ভিতরটা দেখতে পান।

যাও, মিছিমিছি কতগুলো আবোলতাবোল বলে আমায় আর ভোলাতে হবে না।

না—না, বিশ্বাস করুন বৌদি, তিনি কখনো মিথ্যা বলতে পারেন না।

বেশ তো, কি বলেছেন শুনি?

তিনি বলেছেন, নারীর ভেতরে দুটো রূপ আছে—বর্ষা আর বসন্ত। বর্ষা ঋতু হলো মাতৃত্বের প্রতীক, আর বসন্ত হলো প্রিয়ার। এই এক একটা রূপ নিয়ে নারী জন্মায়। কদাচিৎ এই দুয়ের সম্মিলন হয় কোন কোন নারীতে। সংসারে সেই নারী দুর্লভ।

এই বলিয়া চুপ করিলে বৌদি বলিলেন, থামলে কেন, বলে যাও—তোমার বৌদি তাহলে এর মধ্যে কোন্ ঋতুটা তোমার বিশ্বকবির মতে?

কি জবাব দিব যখন চিন্তা করিতেছি, বৌদি হাসিয়া বলিলেন, বুঝেছি, লজ্জা করছে বলতে যে এ দুটোর কোনটাতেই তোমার বৌদি নেই, এই তো?

ঠিক বলেছেন। বলিয়া খপ করিয়া তাঁর হাত দুটি চাপিয়া ধরিলাম, বিশ্বাস করুন বৌদি, আপনার মত এমন নারীত্বের পরিপূর্ণ রূপ আর কখনো দেখিনি। বর্ষা বসন্ত দুই-ই যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে আপনার মধ্যে। আপনাকে ঠিক মুখে বলে তা বোঝাতে পারবো না। মনে হয় যেন কানায় কানায় ভরা দীঘির জলে অসংখ্য পদ্মফুল ফুটে আছে—সাদা লাল!

চুপ দুষ্টু! বলিয়া বৌদি আমার মুখের উপর খপ করিয়া তাঁর ডান হাতটা চাপা দিয়া বলিলেন, থাক, আর রবি ঠাকুরের ওপর কলম চালাতে হবে না। ঢের হয়েছে!

ভাল গান থামিলে যেমন শ্রোতার মুখেচোখে একটা সুরের আবেশ লাগিয়া থাকে, বৌদির হাতটা মুখের উপর থেকে সরাইতে গেলে, কানের নিচে গালে একটা মৃদু চিমটি কাটিয়া বলিলেন, এই শেষ, ফের যদি এমন সব কথা শুনি তোমার মুখে, তাহলে কিন্তু ঘরে ঢুকতে দেব না বলে রাখলুম।

ঘরে ঢুকতে না দেন তো বয়েই গেল! বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবো। তবু আমার চোখে এমনি থাকবেন আপনি চিরদিন।

নিমেষে বৌদির গালের ওপর একটা গোলাপী আভা দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। ঘরে যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন জানো তো অতিরিক্ত ভক্তি কিসের লক্ষণ—

জানি! শেষকালে এই আমার পুরস্কার!

দূর হও দুষ্টু! বলিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

॥ নয় ॥

বৌদি জানিতেন না যে পাড়াবেড়ানীরা, যাঁরা দুপুরে আসিয়া তাঁর ঘরে বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আড্ডা জমাইতেন এবং আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেন, তাঁরাই আবার বৌদির আড়ালে তাঁর সম্বন্ধে কত বক্রোক্তি করিতেন। অর্থাৎ তিনি যে অত্যন্ত ধড়িবাজ মহিলা, ছুঁড়ি মেয়েটার লোভ দেখাইয়া আমায় দিয়া চাকরের মত খাটাইয়া লইতেন আর আমি এমনি বোকা হাঁদা যে ভদ্রা আমার প্রেমে হাবুডুবু খাইতেছে ভাবিয়া ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া রাজকন্যার স্বপ্ন দেখিতেছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্য ইহার জন্য বৌদি নিজেই অনেকটা দায়ী। তিনি রঙ্গচ্ছলে অনেক সময় তাঁদের কাছে গল্প করিতে করিতে, আমি যে তাঁর মেয়ের গান শুনিয়া কিরূপ মজিয়াছি এবং তাঁর মেয়েও মনে মনে আমাকে ছাড়া আর কারুর গলায় মালা দিবে না, এই স্বপ্নে বিভোর—এই সব বলিতেন। সেইজন্য আমি নাকি বৌদির মন যোগাইতে ব্যস্ত! যখন তখন তাঁর বাড়িতে ধন্না দিই—ইত্যাদি।

একদিনের কথা মনে পড়ে। তাঁদের সামনে আমাকে পাইয়া বৌদি হঠাৎ ভদ্রাকে সেখানে ডাকিলেন, তারপর তামাশা দেখিবার জন্য বলিলেন, ঠাকুরপো, একবার ভদ্রার পাশে দাঁড়াও তো দেখি কেমন মানায়?

মায়ের কথায় অবাধ্য কখনো হয় নাই ভদ্রা, তাই আসিয়াছিল কিন্তু ওই কথা শুনিয়া, মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, যাও মা, আমার এসব ভাল লাগে না—তোমায় কতদিন নিষেধ করেছি—তুমি সকলের সামনে আমায় এমনি করে অপমান করো কেন?

ওলো থাম থাম, এতো আর রাগ দেখাসনি, বলি আমাদেরও একদিন বয়েস ছিল! সব জানি—আমরা অন্ধ নই! বলিয়া একজন প্রবীণা ফোঁস করিয়া উঠিলেন।

তখন একসঙ্গে সকলে হাসিয়া উঠিতে, বৌদি আমাকে দেখাইয়া বলিলেন, ওঁর কথা শুনে হেসে বাঁচি না। বলে কি না বৌদি, আমি মরে গেছি তখুনি বুঝবেন, যখন ভদ্রার গান শুনেও চোখের পাতা না খুলি।

এবার একজন বলিয়া উঠিলেন, বাবা, দেখালি বটে তোরা একটা প্রেম! এ-কালের ছেলেমেয়েদের খুরে খুরে নমস্কার!

আমি সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি করিয়া উঠিলাম। না, না, মাসিমা বিশ্বাস করবেন না, বৌদির কথা সব বাজে।

মোটা দাসগিন্নী এবার মুখ খুলিলেন, বাবা, আমাদের না হয় বয়েস গেছে কিন্তু চোখ-কান তো যায় নি। বলি এ বাড়ির মাটি কামড়ে পড়ে আছো কি জন্যে তা কি আমরা জানি না? ভাবছো, ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পাবে না!

এবার সকলে এমন এক হাসির রোল তুলিলেন যে, আমি লজ্জায় পালাইতে পথ পাইলাম না।

সেদিন সন্ধ্যায় বৌদিকে গিয়া বলিলাম, সত্যি বলছি বৌদি, কাল থেকে আর আমি আসবো না।

মুচকি হাসিয়া তিনি কহিলেন, কেন, কি এমন অপরাধ করলুম যে হঠাৎ একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে ফেললে?

না, না—ঠাট্টা নয়। আপনি নিজে যদি এই সব বলেন, তাহলে পাড়ার লোকেরা কি ভাববে বলুন তো?

আমি তো মিথ্যে বলিনি! তুমি তো নিজেই বলেছ ওর গান শুনলে তোমার ঘুম ভেঙ্গে যায়—এরকম মিষ্টি গলা জীবনে শোন নি…

বলিলাম, হ্যাঁ, সত্যি আমি ওর গান খুব ভালবাসি।

বৌদি এবার আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, যার গান শুনে পাগল, সেই মানুষটাকে তুমি মনে মনে ভালবাস না, এ কি কখনো সম্ভব হয় ঠাকুরপো! চুপ করো, আমাকে আর বেশি জ্ঞান দিতে এসো না।

বলিয়া আমাকে জোর করিয়া থামাইয়া দিলেন, আমি আর তাঁর সঙ্গে তর্ক করিতে না পারিয়া নীরব রহিলাম।

পাড়া-প্রতিবেশীদের মত আমার মামী ও মামাতো ভাইয়েদেরও ধারণা ছিল ওই রকম। মুখে কিছু প্রকাশ না করিলেও বিড়ালের ভাগ্যে যদি শিকে ছিঁড়ে অর্থাৎ ভদ্রার মত ধনীর কন্যার সঙ্গে আমার বিয়েটা লাগিয়া যায়, তাহা হইলে কেবল আমার কপাল ফিরিবে না, সেই সঙ্গে তাদেরও গ্রামে মান-সম্মান বাড়িয়া যাইবে। চাই কি কুটুম্বিতার ফলে, ভায়েদেরও একটা ভাল চাকরি-বাকরি জুটিয়া যাইতে পারে। তাই এ তরফ হইতে কোন দিন কোন আপত্তিই দেখা দেয় নাই। বরং যত ঘনিষ্ঠতা বৌদির সঙ্গে বাড়ে ততই মঙ্গল, মামী-রা ভাবিতেন।

ফলে বৌদির সঙ্গে এত মেলামেশা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

ক্যানভাসিংটা তখনো শেষ হয় নাই। বোধ হয় চার দিন পরে বর্ধমান হইতে ফিরিয়া যখন বৌদির কাছে গিয়া বসিলাম, তখন তিনি গল্পের ফাঁকে একসময় বলিয়া বসিলেন, এখনো ক'দিন তোমার বাকী।

বলিলাম, আর চার-পাঁচ দিনেই শেষ হয়ে যাবে।

তখন বৌদি হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি তো পরের বই নিয়ে কাজ করো—এই সঙ্গে তোমার কাজও শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা এইভাবে পরের কাজ না করে, তুমি নিজে যদি কিছু বই কিনে ক্যানভাসিং করো, তাহলে তো তোমার লাভ বেশি হয়। আর তার জন্য বাইরে যেতে হয় না এই কলকাতাতেই কত স্কুল রয়েছে !

বলিলাম, তা যায়। কিন্তু আপনার মাথায় এসব ব্যবসা-বুদ্ধি এলো কোথা থেকে ?

বৌদি হাসিয়া বলিলেন, না, তোমার দাদা সেদিন বলছিলেন, তাই তোমায় বললুম।

এবার বৌদিকে বলিলাম, নিজে বই কিনে ব্যবসা করতে গেলে অনেক টাকার দরকার বৌদি, সে ক্ষমতা তো আমার নেই। তার চেয়ে দাদা যদি একটা ভাল কোন চাকরি যোগাড় করে দেন সেই ভরসায় রয়েছি।

আমিও তাকে তোমার জন্য বলে রেখেছি। তবে যতক্ষণ না পাও—এটা করলে তো বেশ দুটো পয়সা পেতে পারো।

বলিলাম, তা হয়ত পারি, কিন্তু আসলটারই যে অভাব।

আচ্ছা ঠাকুরপো, কত টাকা লাগে তা তো আমি জানি না ভাই, তবে আমার এই তাগা দুটোতে ছ'ভরি সোনা আছে, এটা নিলে কি তোমার চলবে ?

চমকিয়া উঠিলাম। কি বলছেন, আপনার এই গয়না বিক্রি করে ! না না—সে আমি কিছুতেই পারবো না।

কেন পারবে না ? এ আমার নিজের গয়না। আমার মায়ের দেওয়া। তুমি ভাবছ, আমার স্বামী, শাশুড়ী কি বলবেন ? কিচ্ছু বলবেন না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে নিয়ে যাও। বলিয়া তাগা জোড়া তখনি খুলিয়া আমার হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

তোমার যখন সময় হবে, আমায় কিনে দিয়ো, যদি বৌদির গয়না নিতে আপত্তি থাকে। ব্যস্, এর পর তো আর কিছু বলার নেই ?

কি বলিব ! আমার মুখে তখন কথা সরিতেছিল না। বোবার মত বৌদির স্নেহ-ভালবাসার গভীরতার অতলে যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম।

তুমি পুরুষ মানুষ। লজ্জা কি আমার থেকে নিতে ! তুমি আমাকে তাহলে আপন বলে মনে করো না !

এবার নিজেকে সামলাইয়া বলিলাম, এরপর আর কথা নেই বৌদি। জানি আপনার চেয়ে আমার আপনজন কেউ নেই। তবু ভয় হয় যদি ব্যবসায় লাভ না করতে পারি !

তুমি ঠিক পারবে, তোমার মধ্যে সে জিনিস আছে। আর দুর্ভাগ্যবশত যদি তেমনই কিছু ঘটেই, তাহলে বৌদি তোমার নামে আদালতে নালিশ করবে না। বুঝেছো ? যাও, রাত হলো বাড়ি গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে ঘুমোও গে।

সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন রাত্রে একেবারে দু'চোখ এক করিতে পারি নাই। বৌদির সেই কথাগুলি যা জীবনে কখনো কারুর মুখে শুনি নাই, বারে বারে আমার মনের মধ্যে সুরের মত বাজিতে লাগিল রাতভোর।

॥ দশ ॥

ক্যানভাসিংয়ের কাজ যেদিন শেষ হইল, হিসাব-নিকাশ চুকাইয়া বাড়ি ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

ঠিক চার দিন বৌদির সঙ্গে দেখা নাই। বাড়িতে গিয়া দেখি, বৌদি অন্য দিনের চেয়ে যেন একটু বিশেষভাবে সাজিয়াছেন। চুল বাঁধিয়াছেন পাতা কাটিয়া, পায়ে মোটা করিয়া আলতা পরা, সপ্তমীর চাঁদের মত কপালে জ্বলজ্বলে বড় সিঁদুরের টিপ, সুগন্ধি পান-জর্দার রসে ঠোঁট দুটি রাঙানো, জরির পাড় ও আঁচলা দেওয়া একখানি গরদের শাড়ীতে অপূর্ব মানাইয়াছে। সামনের বারান্দায় দু'টি পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিলেন। সামনেই ফুলের বাগানে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, কত গোলাপ, রজনীগন্ধা, চাঁপা, করবী—দক্ষিণের মৃদু বাতাসে ফুলের গন্ধ মাখা। পাশের বড় নিমগাছটার বিস্তারিত শাখার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের মৃদু আলো আসিয়া বৌদির মুখে ও পা দু'খানির উপর পড়িয়াছিল। কি জানি কেন, তাঁর পা দু'খানির উপর চুম্বকের মত আমার দু' চোখ কে টানিয়া লইয়া গেল। আমি খপ্ করিয়া আগেই তাঁর সেই সুন্দর আলতা-পরা পা-দুটিতে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া ফেলিলাম।

ছিঃ ছিঃ, একি কাণ্ড ! বলিয়া বৌদি শিহরিয়া উঠিলেন, ঠাকুরপো, এ তোমার ভারী অন্যায় ভাই। বলিতে বলিতে পা দুটি সরাইয়া লইলেন।

কেন, বৌদিকে কি প্রণাম করা অপরাধ ?

তা নয়, তবে আজই বা এত ভক্তি উথলে উঠলো কেন ?

সত্যি, আপনাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে এই মুহূর্তে যদি একটা বীণা পেতুম, তো আপনার হাতে তুলে দিতুম, ঠিক সরস্বতীর মত মনে হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে দুহাত কপালে ঠেকাইয়া তিনি বলিলেন, দেখ ভাই, ঠাকুরদেবতাকে নিয়ে এইভাবে ইয়ারকি করা আমি একেবারে পছন্দ করি না। আর কোন দিন তুমি এমনি করে পায়ে হাত দেবে না বলে দিলুম। তাঁর গলার মধ্যে কি যেন কাঁপিতে লাগিল, তুমি কি আমায় পাগল করে দেবে না কি ঠাকুরপো !

বিশ্বাস করুন, আমাদের কলেজে একবার সরস্বতী পুজোয় যে প্রতিমা এনেছিলুম, ঠিক এই রকম। এই মুহূর্তে সেই মূর্তিটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

চুপ্ করো, চুপ্ করো ঠাকুরপো, তোমার পায়ে পড়ি—ওকথা শুনলে পাপ হয়। আমি তুচ্ছ একটা মেয়েমানুষ !

কেন ওকথা বলছেন বৌদি। এই মানুষের ভেতরেই তো দেবতার বাস। একটা বিশেষ ক্ষণে কি বিশেষ মুহূর্তে সেই মানুষের মূর্তিতে কি দৈব ভাব আসতে পারে না। থিয়েটারে যেমন একই মানুষ শয়তানের অভিনয় করে, তখন তার ওপর ঘৃণা হয়, অথচ সেই মানুষ যখন দেবতা সাজে, তখন ভক্তিতে কি মাথা নোয়ান না তার পায়ে ?

তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে !

বলিলাম, আপনি মিথ্যা রাগ করছেন, অন্য কোন দিন তো পায়ে হাত দিই নি, আজ বিশেষ ভাবে এমন সেজেছেন যে, সত্যি হাতে একটা বীণা দিলে সাক্ষাৎ বীণাপাণি !

বৌদি বলিয়া ফেলিলেন, পোড়া কপাল ! বিশেষ সাজ আবার কোথায় দেখলে ? আজ আমার বিয়ের তারিখ তাই ভাল একখানা শাড়ী পরেছি।

সে কি ! একথা তো আগে বলেন নি ! দাদা কৈ, তিনি নিশ্চয় এসেছেন আজ !

পোড়া কপাল ! তাঁর কি ছাই মনে আছে এ দিনের কথা ? আর থাকলেই বা কি ? কাজ আর কাজ—এ ছাড়া আর কিছুই তিনি বোঝেন না ! বলিয়া একটু ম্লান হাসিলেন।

কি বলছেন বৌদি ! কিন্তু দাদাকে দেখে তো তেমন মনে হয় না ?

তুমি তো বাইরেটা দেখছো, ভেতরটা তো দেখা যায় না। তারপর কতকটা স্বগত উক্তির মত করিলেন, আসলে যে গোড়ায় গলদ, আমার বিয়েই হয়েছিল একটা হচ্‌পচ্‌ !

বলিলাম, সে আবার কি ! শুনেছি আপনার বাবা তো একটা ছোটখাটো জমিদার ছিলেন।

হ্যাঁ, সে এক লম্বা ইতিহাস—থাক। বলিয়া চুপ করিলেন।

যদি আপত্তি না থাকে, আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে বৌদি !

বৌদি বলিলেন, আপত্তি আর কি ! যা হবার তা তো হয়ে গেছে। সেদিন আর তো ফিরে আসবে না। যেমন সব হয় জমিদারের ক্ষেত্রে। আমার জেঠা-মশাই ছিলেন খুব ধড়িবাজ, বাবার একটু মদ ও মেয়েমানুষের ঝোঁক ছিল, জেঠামশাই তাতে আরো ইন্ধন যুগিয়ে বাবার অংশটুকু সব লিখিয়ে নিয়েছিলেন ! তারপর তিনি যখন মারা গেলেন, জেঠামশাই দেখালেন তাঁর বিপুল দেনা। আমাদের বসতবাড়িটা নিলামে তুলে জেঠামশায় বেনামীতে কিনে নেন। আমার তখন মাত্র তেরো বছর বয়েস। জেঠামশাই, একটা দোজবরে দুটি ছেলেমেয়ে আছে, এমন এক পাত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করাতে মা রেগে আমায় নিয়ে মামার বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। যশোর জেলার এক গণ্ডগ্রামে। তারপর বড় মামা অনেক চেষ্টা করে এই তোমার দাদার সঙ্গে আমার বিয়ে দেন ! ওঁর তখন তিরিশ বছর বয়েস, আর আমার তেরো। বয়েস ভাঁড়িয়ে ওঁরা বলেছিলেন পাত্রের এই

তেইশ! উনি আসানসোলে কারখানায় কাজ করতেন আর বছরে দু'বার দেশে যেতেন। একবার বড়দিনের ছুটিতে, আর একবার পুজোয়। এই ভাবে বিয়ের পর পাঁচটা বছর আমার সেখানে কেটে যায়। কোন সাধ-আহ্লাদই মেটেনি। তারপর ছোট দেওরের চাকরি হতে, কলকাতায় বাসা করে শাশুড়ী মা আমাকে নিয়ে সংসার পাতেন।

এই বলিয়া সহসা বৌদি গম্ভীর হইয়া গেলেন। বোধ হয় পূর্বের সেই বেদনা-দায়ক স্মৃতি এতদিন পরে আবার জাগিয়া উঠিল। এর পরে আর কথা না কহিয়া আমিও নীরব হইয়া গেলাম। বৌদির প্রতি সহানুভূতি আমার মনে আরো বাড়িয়া গেলেও, সেই বিশেষ ক্ষণটি আমারই জন্য যে নষ্ট হইয়া গেল তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, না, এর জন্যে তোমার কোন দোষ নেই—বরং তোমাকে আজ বলতে পেরে যেন মনটা অনেক হালকা হলো।

তাহ'লে আজ আপনার হাতে মিষ্টি না খেয়ে উঠছি না!

বৌদি ম্লান হাসিয়া বলিলেন, বেশ, তাই হবে। বলিয়া ঘরে উঠিয়া গেলেন।

বৌদির মত এত অনুরাগ ও এত রাগ, মানে সব রিপুগুলোই এমন প্রবল, আর কখনো কাহারো মধ্যে দেখি নাই। সেদিনের কথাটা এখন মনে হইলে হাসি পায়! একবার জেঠাইমার অসুখের চিঠি পাইয়া হঠাৎ দেশে চলিয়া গিয়াছিলাম, যাইবার সময় বৌদির সঙ্গে দেখা হয় নাই। ঠাকুমার মুখে শুনিলাম, ওখানে কপিবাগানে এক নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সেখানে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে কীর্তন শুনিতে গিয়াছেন।

ফিরিতে প্রায় উনিশ-কুড়ি দিন হইয়া গেল।

দুপুরবেলা ঘাটে স্নান করিতে গিয়া ঠাকুমার সঙ্গে দেখা হইতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, যাক বাঁচলুম! কখন এলে ভাই?

বলিলাম, এই তো কিছুক্ষণ আগে।

তারপর গলাটা নামাইয়া বলিলেন, আচ্ছা ভাই, আমি কি তোমায় বারণ করেছি, আমাদের বাড়ি যেতে?

সে কি! কে বলেছে একথা?

তখন দিব্যি দিয়া বলিলেন, আমার মাথা খাও, এ কথা যেন ঘুণাক্ষরেও আমার বৌমা জানতে না পারে! তার ধারণা আমি ও আমার ছেলে গোপনে নাকি চাই না যে তুমি আর ও-বাড়িতে যাও। সেই জন্যে কিছু না বলে তুমি চলে গেছ দেশে।

কি জ্বালা, এসব কথা কি করে তাঁর মনে এলো!

কি জানি বাবা!

আমি বলিলাম, এসব নিশ্চয় যাঁরা দুপুরে ওঁর কাছে পান খেয়ে গল্প করতে

আসেন তাঁদের কাজ !

নারায়ণ জানেন ! কিন্তু গোপালের সঙ্গে কি জানি হয়েছে বৌমার, আজ তিনদিন ভাত খায়নি। শরীর খারাপ বলে কাঁচা সাবু জলে চটকে দু'গাল শুধু মুখে দেয়। আচ্ছা বলো তো বাবা তুমি, বাড়ির বৌ যদি না খেয়ে এইভাবে শুকিয়ে থাকে, সেখানে আমি কি করে মুখে ভাত তুলি ? বাবা, তুমি যদি একবার এখুনি গিয়ে ওকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে দুটো খাওয়াতে পারো ! মেয়েটা খেয়েদেয়ে স্কুলে চলে যায়, সাড়ে চারটেয় বাড়ি ফেরে। সে এসবের কিছুই জানে না ! তার কানে যদি যায়, সে-ই বা কি ভাববে ! বড় হয়েছে, সবই বুঝতে পারে।

কোনরকমে দু'টো ভাত মুখে দিয়া বৌদির ঘরে ঢুকিয়া দেখি, তিনি পিছন ফিরিয়া একটা বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া আছেন। বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ভাবিয়া আস্তে আস্তে ডাকিলাম, বৌদি—বৌদি !

কোন সাড়া নাই। নীরব দেখিয়া এবার গায়ে হাত দিয়া বলিলাম, বৌদি ঘুমোচ্ছেন নাকি, উঠুন, খাবেন না ?

আমার হাতটা গা থেকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন, এখান থেকে দূর হয়ে যাও ! কেন আমার ঘরে ঢুকেছো, কে ডেকেছে তোমায় এখানে ? বেরিয়ে যাও শিগগির। যেখানে ছিলে এতদিন, সেখানে থাকো গে—আমি তোমার কে ? পর বৈ তো নয়। বলিয়া বালিশে মুখটা ডুবাইয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারপর চোখের জলে ভাঙা ভাঙা গলায় বলিতে লাগিলেন, জানি, পর কখনো আপন হয় না···

বৌদি, কি যা-তা বলছেন ! শুনুন আগে আমার কথাটা···

না, না, তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না—তুমি চলে যাও আমার সামনে থেকে···

যতক্ষণ না আপনি খাচ্ছেন, আমি এখান থেকে এক পা নড়বো না। দেখি আমাকে এখান থেকে কি করে তাড়াতে পারেন !

ওঃ, গায়ের জোর দেখাতে এসেছেন ! মুখে আর দরদ দেখাতে হবে না, চিনেছি সবাইকে ! বলিয়া আবার ফোঁপাইয়া উঠিলেন, তুমি আমার কে যে তোমার কথা আমায় মানতে হবে ?

একটু থামিয়া বলিলাম, কেউ নয়—পরস্য পর ! আপনি ভুল করেছেন আমায় আপন ভেবে—আমি তার জন্যে ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে। আর কোন দিন আসবো না—শুধু এখন উঠে দুটি খান আমার সামনে।

একে বালিশে মুখ ঘষিয়া দুই গাল গোলাপী হইয়া উঠিয়াছিল, তার ওপর দুই চোখে জল তখনো টলটল করিতেছিল—সহসা আমার কথার জবাব দিবার জন্য উঠিয়া বসিলেন, ক্ষমা ? ক্ষমা এত সস্তা ? ক্ষমা চাইলেই বুঝি দেওয়া যায় !

॥ এগারো ॥

বাস্তবিক পক্ষে স্নেহ ভালবাসা যেখানে যত বেশি, রাগ ও মান অভিমান সেখানে তদধিক হওয়াই স্বাভাবিক—ক্ষমা চাইলেই দেওয়া যায় না! এর চেয়ে খাঁটি সত্য আর কিছু নাই! প্রকৃত ভালবাসা তা সে যে ধরনের হোক, যাচাই করিবার এত বড় কষ্টিপাথর জগতে বুঝি আর দ্বিতীয় নাই।

তাই বৌদি রাগের বশে বলিলেও, আসলে বৌদির মুখ হইতে সেই সত্যটি যে আমার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি হয়ত তা বুঝিতে পারেন নাই! তাছাড়া এত বড় যে ব্যাপার বৌদি করিয়া বসিয়াছেন, ভুল হইলেও তার মূলে যে আমি, ইহা শোনা অবধি বৌদির প্রতি একদিন স্নেহের যে ঋণ ছিল তাহা যে সহস্রগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল, তাহাও বোধ করি তিনি জানিতেও পারেন নাই। তবু সেদিন আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া বৌদি সত্যই আমার মুখ রক্ষা করিলেন। তিনি খাইয়া আসিলে বলিলাম, আচ্ছা বৌদি, কেন মিথ্যে এমনি করে নিজের শরীরকে কষ্ট দেন বলুন তো।

আগুন নিভিলেও ঝাঁজ তখনো যায় নাই।

বৌদি বলিয়া উঠিলেন, থাক আর এত দরদে কাজ নেই। যা করতে এসেছিলে, তা হয়ে গেছে তো! এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও!

না—না, এ রাগের কথা বৌদি, সত্যি বলছি, আপনার মত এমন বুদ্ধিমতী, সর্বগুণসম্পন্না নারীর কাছে এটা আশা করি নি।

থাক, আর বক্তৃতা দিতে হবে না। কার কাছে কি আশা করা যায়, তোমার মুখে তা শোভা পায় না! মেয়েদের মন যদি সত্যি বুঝতে তাহলে ও কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারতে না।

এবার হাসিয়া উঠিলাম।

সব তাতেই তোমার রঙ্গ তামাশা না। এর মধ্যে হাসির কি দেখলে শুনি!

বলিলাম, মেয়েদের মন সম্বন্ধে বেদ পুরাণে মুনি ঋষিরা কি বলেছেন জানেন তো? 'দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ?' তা আমি তো কোন ছার!

নিমেষে বৌদির মুখের রেখাগুলি খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, জানি, যদি পুরুষের বদলে ওগুলো মেয়েরা লিখতো তাহলে পুরুষের চরিত্র সম্বন্ধেও ঠিক ওই কথাই বলতো।

একটু থামিয়া বলিলেন, আসলে এই পুরুষ জাতটাই বেইমান নেমোখারাম! ওদের বিশ্বাস করতে নেই।

বৌদির প্রতি আমার এত গভীর আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর ধারণা ভদ্রার গানে কেবল মজি নাই, প্রেমেও। মুখে প্রকাশ না করিয়া মনের ভিতর

লুকাইয়া রাখিয়াছি। যে কোন যুবকের পক্ষে হয়ত সেটাই স্বাভাবিক, বৌদির অনুমানে ভুল নাই। তবু সব কিছুর যেমন ব্যতিক্রম আছে আমায় ক্ষেত্রে যে তেমনি ঘটিতে পারে তিনি যেন ইহা বিশ্বাস করতে পারিতেন না। তাই আমার মনটাকে যাচাই করিবার জন্য তাঁর কন্যাকে লইয়া মাঝে মাঝে এইরূপ কৌতুক করিতেন যে লজ্জায় আমার যেন মাথা কাটা যাইত।

সেবার জামাই-ষষ্ঠীর দিন হঠাৎ আমায় নিমন্ত্রণ করিয়া ঠিক সত্যিকারের জামাইয়ের মত নতুন কাপড় পরাইয়া, নিজের হাতে বোনা পশমের বড় আসন, আলমারী হইতে বাহির করিয়া বড় থালায় করিয়া পোলাও প্রভৃতি সুখাদ্য রচনা করিয়া থালার চারিপাশে ভিন্ন ভিন্ন বাটিতে সাজাইয়া খাইতে দিলেন।

আমি সবে খাইতে শুরু করিয়াছি, এমন সময় ঠাকুমা একটা প্রদীপ জ্বালিয়া আমার থালার পাশে রাখিতে গিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কি হ্যাংলা নাতজামাই রে, বাবা, আলোটা আনতে স্বর সইলো না, খেতে লেগেছে এরি মধ্যে।

বলিয়া ধমক দিয়া উঠিলেন, এই হাত বন্ধ। ওঠো। হাত ধুয়ে আগে দিদি-শাশুড়ী, তারপর শাশুড়ীকে নমস্কার করে তবে খেতে বসতে হয়, এও জানো না? কি অসভ্য জামাই রে বাবা?

আমি উঠিয়া দাঁড়াইতেই বৌদি ছোট মেয়ের মত হাততালি দিয়া হাসিয়া উঠিলেন, দেখছো মা, সত্যি জামাই হবার কি ইচ্ছে মনে।

থাক হয়েছে বসো, এত ভক্তিতে দরকার নেই। এটা তোমার রিহার্স্যাল্। পরীক্ষা করে দেখছি, সত্যি তুমি এর যোগ্য কিনা?

ঠাকুমা খুশিতে গদগদ হইয়া ডাকিলেন, ওরে ও ভাদু, কোথায় গেলি, দেখে যা তোর বরের কীর্তিটা!

এই বলিয়া ভদ্রার ঘরে ঢুকিয়া, হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন, এ কি তোর মুখ অন্ধকার কেন? রাধিকার মনে কিসের ব্যথা? ঘরেই স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র—

ভদ্রা চাপা গলায় গর্জন করিয়া উঠিল, দেখো ঠাকুমা, আমাকে নিয়ে তোমাদের এই রকম খেলা আমার ভাল লাগে না। বাবা এলে এবার আমি ঠিক বলে দেবো!

ভয় দেখাস নি, যা-যা—ওই যে 'পেটে ক্ষিদে আর মুখে লাজ', সব জানি লো—সব জানি—।

ভদ্রার মত আমি রাগি নাই, আমার বরং চোখে জল আসিয়াছিল। এই প্রথম! এমনভাবে আদর করিয়া থালা সাজাইয়া কেহ আমায় কখনো খাইতে দেয় নাই।

আবার একদিন দেখি বিখ্যাত স্বর্ণকার এম. বি. সরকার এণ্ড সন্‌স এর দোকানের একটা অলঙ্কারের তালিকা খুলিয়া বৌদি মনোযোগ সহকারে কি দেখিতেছেন। কি, গয়না গড়াবেন বুঝি? প্রশ্ন করিতে তিনি বললেন, আমি গড়াবো না, ভদ্রার জন্যে একসেট চুড়ি গড়াতে দেবার কথা উনি বলে গিয়েছেন,

যামিনী স্যাকরা কাল আসবে অর্ডার নিতে। কলকাতায় যে পাড়ায় আমরা থাকতুম ওর বাসা সেই গলির মধ্যে হলে কি হয়, বড় বড় সব লোকের বাড়ির কাজ ও করে। তাঁরা ওর বাঁধা খদ্দের। সত্যি এত ভাল কারিগর দেখা যায় না। যে একবার ওকে দিয়ে গয়না করিয়েছে অন্য কারুর কাজ তার চোখে লাগবে না। আমার অর্ধেক গয়না ওর তৈরি!

বলিতে বলিতে অলঙ্কারের তালিকাটি আমার হাতে দিলেন, দেখো তো, এই কটা চুড়ির ডিজাইনের মধ্যে কোন্‌টা তোমার পছন্দ হয় ঠাকুরপো?

না না—আমি এসবের কি জানি! তাছাড়া যার গয়না তারই তো পছন্দ করা উচিত।

তা জানি। বলিয়া আড়চোখে একবার আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, তাকেই দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সে ভারটা তোমার ওপরে দিয়েছে।

অসম্ভব! এ হতেই পারে না। এটা স্রেফ আপনার গুল্‌পট্টি।

মাইরি বলছি ঠাকুরপো, তুমি বিশ্বাস করো, আমি ওকে এটা দিয়ে যখন বললুম, কোন্‌টা তোর পছন্দ হয় দেখ তো মা, ও বললে আমি কি জানি? তোমাদের যেটা ভাল লাগে দাও গে!

এবার বৌদি হাসি হাসি মুখে বলিলেন, তোমাদের বলতে বিশেষ করে কাকে বোঝায়, তা কি আবার বলে দিতে হবে নাকি? তার মানে আমার পছন্দের ওপর ও মেয়ের আস্থা নেই! তাহলে তো বলতো, তুমি পছন্দ করলেই হবে!

এরপরে চুড়ি যখন তৈরি হইয়া আসিল, তখন আবার এক কাণ্ড। নতুন চুড়ি নাকি কোন আইবুড়ো মেয়েকে নিজে পরিতে নাই। এমন কি কোন মেয়েদেরও পরাইতে নাই। পুরুষকে দিয়াই পরাইবার রীতি। তাই ভদ্রার হাতে যখন সেই নতুন চুড়ি আমাকে পরাইতে বলিলেন আমি একেবারে অস্বীকার করিলাম, না, এ আমি পারবো না বৌদি, মাপ করুন! এমন সৃষ্টিছাড়া নিয়ম তো কখনো শুনি নি। এ আপনার দুষ্টুমি বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু নয়।

মাইরি বলছি ঠাকুরপো, আচ্ছা আমার কথা যদি বিশ্বাস না করো, তাহলে তোমার মামীমাকে জিজ্ঞেস করো—তিনি কি বলেন!

কিন্তু আমি তো এমন কথা আগে শুনিনি?

বৌদি এবার বলিলেন, আহা যেন কত মেয়েকে দেখেছে যে জানবে তাদের মেয়েলী নিয়মকানুন। চুপ ক'রে এখন যা বলছি, ভাল ছেলের মত করো তো?

অগত্যা ভদ্রার হাতটা লইয়া একে একে সেই দশগাছা চুড়ি যখন পরাইয়া দিলাম, সে আর এক মুহূর্ত সেখানে অপেক্ষা না করিয়া একেবারে ঘরের ভিতর গিয়া ঢুকিল।

এবার বৌদি আস্তে আস্তে বলিলেন, কেমন সুন্দর মানিয়েছে চুড়িগুলো ভদ্রার হাতে বল তো? আমার মেয়ের রংটা না হয় নেই—তাই বলে গড়নপেটনে কোথাও এতটুকু খুঁত পাবে না!

বলিয়া এমন ভাবে জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে তাকাইলেন, যেন আমারও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, এবং আমার মুখ থেকে তা শুনিতে চাহেন।—তাই আমাকে নীরব দেখিয়া তিনি প্রশ্ন করিলেন, কথা কইছো না যে! চুপ করে আছো কেন?

বলিলাম, যা বলবার সবই তো আপনি বললেন, তাই চুপ করে শুনছিলুম! জানেন তো আপনার মুখের কথা শুনতে আমি কত ভালবাসি।

থাক থাক, যথেষ্ট হয়েছে! ভাগ্যিস মুখটা ছিল!

কেন আমি কি মিথ্যে বলেছি বলুন তো?

না মিথ্যে বলবে কেন—বৌদির সব ভাল। এমন কি বৌদির রাগও ভাল লাগে, বৌদি কাঁদলেও ভাল লাগে। তোমায় গাল দিলেও নাকি আরো মিষ্টি লাগে!

শেষ কথাটা বলিতে গিয়া হাসি চাপিতে পারিলেন না। মুখে একটা অদ্ভুত স্নেহ জড়ানো ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, দূর হও আমার সামনে থেকে!

তখনো তেমনি তাঁর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, কৈ এখনো গেলে না যে?

আর একবার ওই কথাটা বলুন—দূর হও, তবে যাবো।

এবার মুখে কাপড় চাপিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতর তিনি নিজেই চলিয়া গেলেন।

একবার জন্মাষ্টমীর দিন বৌদিকে লইয়া মিনার্ভা থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম। সারা রাত্রি ধরিয়া চারিখানি নাটকের অভিনয় এক সঙ্গে এক টিকিটেই দেখা যাইবে। যতদূর মনে পড়ে, জন্মাষ্টমী, আত্মদর্শন, কৃষ্ণসুদামা ও কিন্নরী। তখন পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের পাশাপাশি সিট-এ বসিবার রেওয়াজ ছিল না। তাই মাঝ রাতে আত্মদর্শনের দ্বিতীয় অঙ্কের পর ড্রপ পড়িলে যখন পান বিড়ি সিগারেট ভিতরে আসিয়া ফেরিওয়ালারা বেচিতে শুরু করিল, তখন বৌদির জন্য পান ও জর্দা কিনিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। মেয়েদের দোতলায় তিনতলায় বসিবার ভিন্ন আসন ছিল। কিন্তু কোন্ তলায় বৌদি বসিয়াছেন জানিতাম না। তাই পাশের দরজার কাছে গিয়া দেখিলাম বহু লোক।

কেউ খাবারের ঠোঙা হাতে, কেউ বা লেমনেড পান দোক্তা হাতে লইয়া সেখানে অপেক্ষা করিতেছে। এক একজন যেমন ঝিকে বলিতেছে, বেলেঘাটার সন্তোষিণী চৌধুরীকে ডেকে দাও তো? অমনি নিচের সিঁড়িতে যে ঝিকে নাম বলিল সে চীৎকার করিয়া তখনি সেই নামটা দোতলায় ঝিয়ের কানে দিল, আবার দোতলার ঝিটিও ঠিক সেই ভাবে চেঁচাইয়া উঠিল, ওগো বেলেঘাটার সন্তোষিণী চৌধুরী গো। এমনি ভাবে সেই নামটি নিচে হইতে ঝিয়েদের কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে হইতে যথাস্থানে গিয়া পেঁছায়। আমিও বৌদির নাম বলিতে

প্রথম ঝিটি হাঁক পাড়িল, "ওগো গোবিন্দপুরের পুষ্প মজুমদার গো।"

এর আগে কখনো মেয়েদের লইয়া থিয়েটার দেখি নাই। তাই যতক্ষণ না বৌদি নামিয়া আসিলেন, ততক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একটা নতুন জিনিস উপভোগ করিতে লাগিলাম।

বৌদি এ প্রথার সঙ্গে অনেক আগেই পরিচিত ছিলেন। যখন কলকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতেন, তাঁর দেওরের সঙ্গে নাকি অনেক থিয়েটার দেখিয়াছিলেন। তাই আমার মুখে উহাদের ওই অদ্ভুত প্রথার কথা শুনিয়া, তিনি বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, ওমা, বুড়ো খোকা এও জানো না?

বারে, কি করে জানবো। আমি কি কখনো আগে কোন মেয়েছেলে নিয়ে থিয়েটারে এসেছি?

ওমা, এই প্রথম আমায় নিয়ে এলে? তার মানে "একেবারে গাঁইয়া!" হাসিয়া পানের খিলি পর পর দুটি মুখে ভরিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

থিয়েটার যখন ভাঙিল তখন ভোর হইলেও গ্যাসের আলো রাস্তায় জ্বলিতে-ছিল। বিডন স্ট্রীট হইতে আমাদের ট্যাক্সিটা ডান দিকে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ট্রাম লাইন ধরিয়া কিছুটা যাইতেই দেখি কাঁধে ছোট একটা মই লইয়া একটি লোক গ্যাসের আলো একটির পর একটি নিভাইয়া চলিয়াছে। ওদিকে ময়লা ফেলা টিনের হাত-গাড়ি তেমনি ময়লা ভরিয়া ঘড় ঘড় শব্দ করিয়া যাইতেছে। বিবেকানন্দ রোডের কাছে ট্যাক্সিটা আসিলে লম্বা হোস পাইপের একটা মুখে হাত চাপিয়া জল দিয়া তোড়ে রাস্তা ধুইতেছিল যে উড়িয়া লোকটি, ট্যাক্সিটা কাছে আসিয়া পড়িতেই সে জলের পাইপটা বন্ধ না করিয়া পাইপের মুখটা এমন ভাবে তুলিয়া ধরিল যে তোড়ে জল আমাদের গাড়ির মাথা ডিঙ্গাইয়া একেবারে রাস্তার অপর পারে গিয়া পড়িল।

মিষ্টি ভোরাই হাওয়ার সঙ্গে সদ্য ধোয়া পিচের রাস্তার একটা অদ্ভুত গন্ধ মুখেচোখে আসিয়া লাগিলে, কখন যে দু'চোখ ঘুমে ঢুলিতে শুরু করিয়াছিল জানিতে পারি নাই।

হঠাৎ বৌদির আঙ্গুলের স্পর্শ কানে লাগিতে, বন্ধ চোখ দুটি খুলিয়া গেল। তিনি কানটা টানিয়া বলিয়া উঠিলেন, একেবারে কচি খোকা—বলি বউয়ের সঙ্গে রাত জাগবে তবে কি করে শুনি? নাও এমনি করে আর ঢুলে ঢুলে ঘাড় ব্যথা করতে হবে না—পাটা গুটিয়ে শুয়ে পড়ো, আমার এই কোলে মাথা দিয়ে! বলিয়া সরিয়া গিয়া যতটা পারেন গদির ওপর স্থান করিয়া দিলেন!

আমাকে একটু ইতস্তত করিতে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, হয়েছে, আর বুড়ো খোকার লজ্জা করতে হবে না। বৌদির কোলে মাথা রেখে ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নাও। গোবিন্দপুর পেঁছিবার মধ্যে বেশ একটা ঘুম দিতে পারবেথন।

সত্যি, বৌদির কোলে মাথা রাখিয়া কখন যে গভীরভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়া-ছিলাম, জানিতে পারি নাই। একেবারে লেকের ভিতর দিয়া বজবজ লাইনের

বন্ধ ফটকের কাছে ট্যাক্সিটা কখন দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, বুঝিতে পারি নাই। লম্বা একটা মালগাড়ি চলিয়া গেলে গেট পার হইয়া খানিকটা যাইতেই বৌদি আবার কানটা ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, ওগো কচি খোকা এবার ওঠো, দেখো বাড়িতে প্রায় এসে গেছি—

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম—সত্যি তো এসে গেছি।

একদিন দেখি বৌদির দু'টি পা হাঁটুর নীচ হইতে গোড়ালী পর্যন্ত কাপড়ের পাড় দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া শক্ত করিয়া বাঁধা, আর বৌদি উপুড় হইয়া শুইয়া আছেন, ভদ্রা তাঁর কোমরের উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়াই ভদ্রা নামিয়া পড়িল।

বলিলাম, একি কাণ্ড!

ভদ্রা হাসিয়া ফেলিল, দেখুন না, যত বলছি দাঁড়াবো না, তোমার লাগবে, মা শুনছে না কিছুতেই…

তুই নাম। বলিয়া একটা ধমক দিয়া তিনি বলিলেন, মরে গেলুম যন্ত্রণায়। হাড়গুলোর ভেতর যেন ঝন্ঝন কন্কন্ করছে! মা বুঝি রঙ্গ করার জন্যে তোকে দাঁড়াতে বলেছে? তুই বেরো, দূর হ এখান থেকে। ঠাকুরপো, তুমি একটু দাঁড়াও ভাই কোমরের ওপরে। বেশ করে দু'পা দিয়ে মাড়িয়ে দাও তো?

দোহাই রক্ষা করুন। আমাকে এবার পাপে ডোবাবেন নাকি, আমার দ্বারা এ সম্ভব নয়।

আচ্ছা পরে না হয় প্রায়শ্চিত্ত করো, একসঙ্গে অনেকগুলো নমস্কার করে—

না-না—বৌদি আমি পারবো না। মাপ করুন। তার চেয়ে ভদ্রাকে ডাকুন —ও যেমন দাঁড়িয়েছিল—দিক্।

ওর দেহটা এত হাল্কা যে কিছু হলো না। সারা দেহটায় যে কি যন্ত্রণা হচ্ছে যদি বুঝতে তাহলে না বলতে পারতে না।

আচ্ছা যখন আপনি বলছেন, আমি দাঁড়ালে যন্ত্রণা যদি কিছু কমে তখন দাঁড়াচ্ছি।

কিন্তু তার আগেই ওঁর পায়ে দড়িগুলো খুলিয়া ফেলিয়া বলিলাম, ছিঃ ছিঃ, এমন নিটোল সুন্দর পা-দুটো কালসিটে পড়ে কি বিশ্রী দেখাচ্ছে!

থাক, পা দুটো নিয়ে কাব্যি পরে করো ঠাকুরপো, আগে যন্ত্রণার হাত থেকে আমায় বাঁচাও তো!

অগত্যা, বৌদির কথামত তাঁর পিঠের ওপর আগে একটা পায়ের চাপ দিয়া বলিলাম, কি, লাগছে না তো, দেখুন!

না, খুব আরাম লাগছে। দুটো পা দিয়ে বেশ শক্ত করে কোমরটা মাড়িয়ে দাও তো ভাই।

আমি আগে তাঁর পায়ে প্রণাম করিয়া তারপর অতি সন্তর্পণে যখন দু পা

তুলিয়া দিয়া বৌদির উপর দাঁড়াইলাম, তিনি আঃ বলিয়া মুখে আরামসূচক শব্দ করিয়া বলিলেন, ভরসা করে আরো জোরে চাপ দিয়ে মাড়িয়ে দাও—ভয় নেই তোমার। বৌদি মরবে না তাতে।

॥ বারো ॥

সেদিন খুব গরম পড়িয়াছিল, ঘরে না ঘুমাইয়া মামীমার সঙ্গে আমিও ছাদে মাদুর বালিশ লইয়া তাঁহার পাশে গিয়া শুইয়াছিলাম। ভোর হইতে না হইতে এত পাখি একসঙ্গে ডাকিতে শুরু করিল যে বিরক্তির সঙ্গে ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘরে গিয়া আরো একটু ঘুমাইব বলিয়া যেমন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি, চমকিয়া উঠিলাম। দেখি ওই ভোরে বৌদি পুকুর হইতে স্নান করিয়া পিতলের চকচকে ঘড়া কাঁখে লইয়া সিক্তদেহে আসিতেছেন। পাতলা শাড়ীটা তাঁর দেহের সঙ্গে এমনভাবে লেপটাইয়া আছে যে দেহের প্রতিটি রেখা সুস্পষ্ট চোখে পড়ে। কারণ ভিতরে কোন অন্তর্বাস ছিল না। এত ভোরে হয়ত কেহ দেখিবে না মনে করিয়া ওই-ভাবেই ভিজা কাপড়ে গা মাথা না মুছিয়া, ভরা কলসী হইতে ছলাৎ ছলাৎ জল উপচাইয়া গড়াইয়া গা বাহিয়া, গায়ের কাপড় আরো ভিজাইয়া, ধবধবে নিটোল উরুর নিম্নাংশ দিয়া গড়াইয়া পড়িলেও তিনি ধীর মন্থর পদে মাটির রাস্তায় তাঁর ভিজা পায়ের ছাপ ফেলিয়া হাঁটিতেছিলেন।

আমার সঙ্গে যে ওই অবস্থায় অকস্মাৎ এই সময় তাঁর চোখাচোখি হইতে পারে, তা তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। তাই চোখটা নামাইয়া মুখটা অন্য দিকে ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন এমনভাবে যেন আমায় দেখিতে পান নাই।

বৌদির সে রূপ আগে কোনদিন দেখি নাই। তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেও, আমার চোখ দুটি যেন তাঁর দেহের সঙ্গে আটকাইয়া গিয়াছিল। নিমেষে আমার চোখের সামনে শিল্পী হেমেন্দ্র মজুমদারের আঁকা সেই 'সিক্তবসনা' ছবিটি যেন ভাসিয়া উঠিল।

পিছন হইতে মনে হইল যেন বৌদিকে দেখিয়াই শিল্পী বুঝি ওই চিত্রটি আঁকিয়াছিলেন। তেমনি গুরু নিতম্বিনী, তেমনি জলসিক্ত শাড়ীটা দেহের সঙ্গে যেন অবিচ্ছিন্ন ভাবে সাঁটিয়া গিয়াছিল, তেমনি উর্ধ্বাঙ্গের পীনোন্নত বক্ষের এক-পাশে একগোছা ভিজা চুল ঝুলিতেছিল, বাঁ হাতে কলসীর গলাটা যেখানে ছিল তেমনি বেড়িয়া আছে, তাহাতে মোটা সোনার তাগা। ছবির সঙ্গে অনেক মিল।

সেদিন সন্ধ্যায় গিয়া দেখি বৌদির মুখ ভার, অন্যদিনের মত উৎসাহভরে বসিতে না বলিয়া কেমন যেন মুষড়াইয়া আছেন। আরো মুহূর্ত কয়েক তেমনি থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, যাও, তোমার সঙ্গে আর কথা কইব না, অসভ্য কোথাকার! তোমার ওই চোখ দুটোকে সত্যি তখন আমার গেলে দিতে ইচ্ছে করছিল। ছি ছি ছি, কোন ভদ্রঘরের বৌ-ঝি যখন পুকুর থেকে ডুব দিয়ে ভিজে

কাপড়ে যায়, তার দিকে কেউ একেবারে অমনিভাবে তাকায় ? যেন দু' চোখ দিয়ে একেবারে গিলে খাচ্ছিলে ! এর নাম বুঝি ভাল ছেলে ? তোমার ভেতরে আবার এসব আছে কে জানতো—

তাঁকে আর বলিতে না দিয়া কহিলাম, বৌদি বিশ্বাস করুন আপনি যা ভাবছেন তা নয় ! এই আপনার গা ছুঁয়ে বলছি। আপনাকে তখন ঠিক বিখ্যাত শিল্পী হেমেন মজুমদারের আঁকা "সিক্তবসনা" ছবির মত দেখাচ্ছিল।

আমার হাতটা বৌদি তাঁর হাতের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, থাক, আর সত্যকে ঢাকবার জন্যে কতগুলো মিথ্যা বলো না। আমি সব বুঝেছি। একেই বলে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ !

এবার বৌদির বাঁ হাতটা দু'হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিলাম, বৌদি প্লিজ, আমায় ভুল বুঝবেন না। আপনার মুখ থেকে একথা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না।

বৌদি বলিলেন, অনেক রকমই তো তোমার মুখে শুনেছি, কখনো কবি, কখনো আর্টিস্ট, কখনো অভিনেত্রী, কখনো দেবী। এই বলিয়া একটু থামিয়া কণ্ঠে ব্যঙ্গ চাপিয়া বহিলেন, এতদিন ছিলুম শিল্পীর প্রেরণা, এবার করলে একেবারে শিল্পীর আঁকা ছবি ! এর পরে আরো কি আমায় করবে তাই ভাবছি !

বৌদির এ কথায় মনে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলাম, তাই বলিয়া ফেলিলাম, জানি আমার কথা আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু এখনি যদি হাতে হাতে প্রমাণ দিই, তাহলে—?

বৌদি বলিলেন, যাও বাজে কথা বলো না। এখনি তোমার কাছে কে প্রমাণ চেয়েছে ?

আপনি না চাইলেও, আমি সেই ছবিটা আপনাকে এখনি চাক্ষুষ দেখাতে চাই। নইলে আমার মন কিছুতেই সুস্থির হবে না।

কিন্তু এখুনি সে ছবি তুমি কোথায় পাচ্ছো যে দেখাবে ?

বলিলাম, আপনার ঘরেই আছে।

সে কি ! আমার ঘরে আছে মানে ? বৌদি অবাক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাইলেন।

আপনি যেদিন বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের পুরনো গ্রন্থাবলীর সঙ্গে কতকগুলো মলাট ছিঁড়ে যাওয়া মাসিক বসুমতী বাঁধাতে দিয়েছিলেন, তারই একটাতে সেই ছবিটা ছিল দেখেছি। দাঁড়ান, এখনি আপনাকে এনে দেখাচ্ছি, বলিয়া আমি বৌদির ঘরে ঢুকিয়া বইয়ের সেলফ হইতে খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই পত্রিকাটি আনিয়া বৌদির সামনে ফেলিয়া দিলাম।

বৌদি যখন সেই 'সিক্তবসনা' ছবিটি হাতে লইয়া নিবিষ্ট মনে দেখিতেছিলেন তখন বলিলাম, এখন বুঝতে পারছেন তো যা বলেছি সত্যি কিনা ?

বৌদি মনে মনে খুব লজ্জা পাইয়াছিলেন। সেদিন অন্তর্বাস ছাড়া একেবারে ওই রকম ফাইন্ শাড়ী পরিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া পিছনের দিকে ভিজা শাড়ীর ফাঁকে ফাঁকে যে তাঁর দেহটাও ওই রকম ছবিটার মত স্পষ্ট দেখাইয়াছিল, নিজে চোখে দেখিতে সেদিন পান নাই, তাই ছবিটা দেখিয়া তাঁর মনটা ছি-ছি করিয়া উঠিল।

বাস্তবিক ছবির সঙ্গে অনেকখানি যে বৌদির মিল ছিল তা তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া তিনি বলিলেন, তুমি যাই বলো ঠাকুরপো, মিল হয়ত কিছু আছে কিন্তু আসলে ওরকম সুন্দর সুগঠিত দেহ মেয়েটির বলেই ছবিটি সত্যি সত্যি এত ভাল লাগে চোখে!

বলিলাম, ছবিটাতে তো মেয়েটির পিছনদিকটাই বেশি দেখানো হয়েছে, আপনি কি করে জানলেন যে পিছন থেকে ভিজে কাপড়ে আপনাকে ওরকম দেখায় কিনা?

সঙ্গে সঙ্গে বৌদির মুখে চোখে একটা গোলাপী আভা যেন ফুটিয়া উঠিল। সলজ্জ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, যাও, বাজে বকো না।

আপনার ঘরে যদি দেওয়াল-জোড়া বড় আয়না থাকতো, তাহলে নিজেই বুঝতে পারতেন, সত্যি কিনা?

আচ্ছা হয়েছে, অসভ্য কোথাকার! বলিয়া খপ্ করিয়া বইটা মুড়িয়া ফেলিলেন, সব কিছু কেবল তোমারই চোখে পড়ে! তারপর গলার স্বরটা নামাইয়া কহিলেন, বিশেষ করে যে বলার একমাত্র অধিকারী—যখন যৌবন ফেটে পড়তো দেহে—একটা ভাল-মন্দ কখনো তার মুখে তো শুনিনি!

আগে তো বলেছি বৌদি, শিল্পীর চোখ ভগবান সকলকে দেন না। কদাচিৎ যারা সে সৌভাগ্য লাভ করে তারাই অন্যকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—সুন্দরকে।

এই বলিয়া একটু হাসিয়া বলিলাম, তবে এর জন্যে শিল্পীর ভাগ্যে পুরস্কার যেমন জোটে তেমনি তিরস্কারও কম মেলে না! নিজেই দেখলেন!

ছি, রাগ করো না ভাই। আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলুম, তোমার ভিতরটা এত সুন্দর বলেই তুমি বৌদির সব কিছু সুন্দর দেখো।

বলিলাম, ওকথা বলবেন না বৌদি, আপনার ভেতরে ভগবান যে কত ঐশ্বর্য দিয়েছেন, তা আপনি জানেন না!

বৌদি আমার হাতে মৃদু একটা চিমটি কাটিয়া বলিলেন, জানি। সবচেয়ে দুঃখ যে তোমার মত আর কেউ তা দেখতে পায় না!

না—না—এটা আপনার ভুল। সকলেই আপনাকে ভালবাসে।

তবে তোমার মত নয়। বলিয়া আমার মাথায় খুশিভরা একটা চাঁটি মারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যাও ভাগো—বাড়ি পালাও। অনেক রাত হয়েছে।

সেবার বর্ষা শেষ হইতে না হইতেই হঠাৎ ভদ্রা টাইফয়েড রোগে পড়িল।

এখনকার মত তখন ক্লোরোমাইসেটিন ওষুধ আবিষ্কার হয় নাই। তখনকার চিকিৎসা পদ্ধতিতে এই রোগ থেকে আরোগ্যলাভ করিতে কারো চোদ্দ দিন, কারো বা একুশ কিংবা একচল্লিশ দিন লাগিয়া যাইত। অবশ্য রোগের গুরুত্বের উপর কম বেশি দিন নির্ভর করিত।

যাহোক ভদ্রা চৌদ্দ দিনেই সারিয়া উঠিল। সমানে একশো পাঁচ ডিগ্রী জ্বর তার সঙ্গে পেটের ফাঁপ ও মাথার যন্ত্রণা, ভুল বকুনি ইত্যাদি সব কিছু খারাপ উপসর্গ তার মধ্যে দেখা দিলেও বড় ডাক্তারের চিকিৎসা ও তার সঙ্গে উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষার দরুণ দ্রুত রোগ সারিয়া গিয়াছিল।

ভদ্রার বাবা গোপালবাবু মেয়ের চিকিৎসার জন্য আপিস হইতে এক মাসের ছুটি লইয়া বাড়ি আসিয়াছিলেন। ওখান হইতে দুই মাইল হাঁটিয়া গিয়া ও অঞ্চলের সবচেয়ে বড় চিকিৎসক নগেন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিতেন। কিন্তু তিনি যে সব ওষুধ লিখিয়া দিতেন, তাহা আনিবার জন্য সাইকেল লইয়া আমাকেই ছুটিতে হইত ভবানীপুরে। আবার জ্বর যখন একাদিক্রমে পাঁচ ডিগ্রীতে থামিয়া রহিত, তখন মাথায় বরফ দিয়া সে জ্বর নামাইবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিত।

'আইসব্যাগে'র মধ্যে বরফ ভরিয়া হয়ত সারারাত রুগীর মাথায় ধরিয়া বসিয়া থাকিতে হইত। মাঝে মাঝে বরফ গলিয়া গেলে, সে জল ফেলিয়া, আবার নূতন করিয়া বরফ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ব্যাগে ভরিতে হইত।

বলা বাহুল্য, প্রথম প্রথম দু'চার দিন ভদ্রার বাবা, মা ও ঠাকুমা রাত জাগিয়া মাথায় ব্যাগ দিতেন। কিন্তু তারপরেই তাঁরা একে একে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন ঠাকুমাই একদিন আমায় বলিলেন, বাবা, তুমি যদি রাত্রে এসে রুগীর মাথায় বরফটা দাও, তাহলে বড্ড উপকার হয়। গোপালের বয়স হয়েছে, ক'দিন রাত জেগেই পেটখারাপ হয়ে পড়েছে।

আমি আগে ওষুধপত্র কিনিয়া আনিতাম, বর্ষা মাথায় করিয়া ছুটিতাম, এখুনি ওষুধ না পড়িলে রোগীর জ্বর হয়ত আরো বাড়িয়া যাইবে! সারাদিন ধরিয়া দেখি ঠাকুমা রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিতেন, আমিও মাঝে মাঝে তাঁদের বিশ্রাম করিতে দিয়া নিজেই রোগীর শয্যার পাশে গিয়া বসিতাম।

ক্রমশ যত দিন যায় ভদ্রার বাবা শুধু রোগীর ঘরে বসিয়া থাকেন আর সিগারেট টানেন মুহুর্মুহু। ডাক্তারের বাড়ি ছোটা, রোগীর রিপোর্ট দিয়া আবার ওষুধ কিনিয়া আনা, বরফ হঠাৎ রাত্রের দিকে ফুরাইয়া গেলে বরফ কিনিয়া আনিয়া তারপর রাত জাগিয়া বসিয়া রোগীর সেবা করা—এ সবই আমার ঘাড়ে আসিয়া পড়িত। বৌদি এর জন্যে মনে মনে স্বামীর ওপর ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করিতেন।—তুমি দেখতে পাচ্ছো না, ঠাকুরপো মুখে কিছু বলতে পারে না বলে রাতের পর রাত জাগছে, আবার ছুটছে ডাক্তারের বাড়ি! তুমি তো এই কাজগুলো করে ওকে একটু বিশ্রাম দিতে পারো।

এর জবাব দেন ঠাকুমা, গোপালের শরীর ভাল থাকলে কি যেতো না বৌমা

—কি করবে, আপিসে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে এসেছে চিরদিন, তার দেহ কি এত ছোটাছুটি বিশেষ করে এই বর্ষায় পোষায় !

এক কথায় ডবল ডিউটি দিতে হইত আমায়। বৌদি মনে মনে ইহার জন্য স্বামী ও শাশুড়ীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন। ভদ্রার বাবার উপর রাগ করিয়া এক এক দিন বলিতেন, ওষুধপত্রগুলো তুমি এনে দিতে পারো না ? ও কেন সব কিছু করবে, তোমার কি চক্ষুলজ্জা বলে কিছু নেই ? পাড়ার লোকেরা কি ভাবে বল তো ?

অবশ্য পাড়ার মেয়েরা রোগী দেখিতে আসিয়া বৌদিকে বলিতেন, সত্যি ছেলেটা যে তোমার মেয়েকে কত ভালবাসে, এখন বুঝছি ভাই।

ঠাকুমা হাসি চেপে বলেন, রুগীর কাছ ছেড়ে ছেলে দু'দণ্ড বাইরে থাকতে পারে না।

বৌদির এসব কথা শুনিতে মোটেই ভাল লাগিত না। কেমন করিয়া আমাকে ওরই মধ্যে একটু বিশ্রাম ও আরাম দিবেন, সব সময় সেই চিন্তা করিতেন।

রাত্রে উঠিয়া দু'বার স্পিরিট-ল্যাম্পে চা তৈরি করিয়া খাইতে দিতেন, যাহাতে রাত জাগার ক্লেশ কিছুটা লাঘব হয়। মাঝরাতে এক একদিন আসিয়া আমার হাত হইতে বরফের ব্যাগটা কাড়িয়া লইয়া নিজে মেয়ের মাথায় দিতে বসিতেন। আমাকে জোর করিয়া তাঁর ঘরে পাঠাইতেন একটু ঘুমাইবার জন্য।

পরপর আটটি রাত জাগার ফলে, নবম দিন যখন ব্যাগ হাতে করিয়া বসিয়াছি, রাত্রি বারোটা বাজিতে না বাজিতেই দু'চোখে এমন ক্লান্তি যে কেবলই ঢুলিয়া পড়িতেছিলাম। বৌদি আসিয়া বলিলেন, যাও একটু শুয়ে নাও গে—

না, আপনিও তো রোজ খানিকটা করে জাগছেন।

ঠাকুমা এবার বলিলেন, তুমি একটু ঘুমোও বাবা। একটু পরে আমি এসে বৌমাকে ছেড়ে দেবো। তোমার ওপর কম অত্যাচার আমরা করছি ! কি করি বল, গোপালের শরীর ক'দিন রাত জেগেই এত দুর্বল হয়ে পড়েছে কি বলবো !

বলিলাম, সবই তো আমি জানি ঠাকুমা। আমি যখন রয়েছি, কেন এত কুণ্ঠা আপনাদের ? এরকম বড় ব্যায়রাম হলে মানুষ কি করবে, নিরুপায় !

তোমার মত বুঝদার ছেলে ক'টা আজকাল মেলে বাবা। তোমার জন্যেই এত বড় দায়টা যে কাটল কে না জানে !

বৌদি তাঁর ঘরে বিলাতী খাটের উপর স্প্রিংয়ের গদি ও নেটের মশারী টাঙাইয়া সুন্দর ধবধবে বিছানা করিয়া রাখিয়াছিলেন আমার জন্য, সেখানেই ইদানীং দু-তিন ঘণ্টা ঘুমাইয়া লইতাম।

সেদিন তখনো রাত শেষ হয় নাই, ঠাকুমার ডাক শুনিয়া হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গেলে চমকিয়া উঠিলাম। দেখি বৌদি আমার পাশে ঘুমাইতেছেন, তাঁর একটি হাত আমার বুকের উপর।

অতি সন্তর্পণে তাঁর হাতটি বিছানার উপর নামাইয়া রাখিতে গেলে বৌদি

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন, তুমি উঠছো কেন, ঘুমোও না—মা তো রয়েছেন, তাঁকে আমি বসিয়ে শুতে এসে দেখি কি ঘাম তুমি ঘামছো! তাই পাখাটা নিয়ে তোমায় বাতাস করতে এসে কখন এখানে যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি। তুমি ঘুমোও, আমি যাচ্ছি আমার বিছানায়।

বলিলাম, ঠাকুমা আমায় ডাকছেন যে?

কেন ডাকছেন দেখছি, তোমাকে উঠতে হবে না, ঘুমোও তো!

না না, আমি তো এতক্ষণ ঘুমোলুম, আমি যাচ্ছি।

বৌদি ও আমি দু'জনেই মশারীর ভিতর হইতে বাহিরে পা দিয়াই চমকিয়া উঠিলাম। দেখি দরজার সামনে অন্ধকারের মধ্যে একটা চেয়ারে বসিয়া আছেন দাদা নিঃশব্দে। তাঁর মুখে যে অর্ধ-জ্বলন্ত সিগারেট, তারই আগুনে মনে হইল যেন তাঁর চোখ দু'টি হিংস্র জানোয়ারের মত জ্বলিতেছে।

বৌদি কোন কথা না বলিয়া শুধু নিঃশব্দে নিজের বিছানায় গিয়া ঢুকিলেন।

আমি ধীরপায়ে ঠাকুমার কাছে গিয়া দাঁড়াইতে তিনি বলিলেন, তুমি বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলে, গোপাল তোমায় ডাকতে গিয়ে ফিরে এসেছে। তারপর একটু থামিয়া বলিলেন, তুমি এবার এখানে বসো বাবা—আমি একটু গা-টা গড়িয়ে নিই। বৌমাকে ঝিমুতে দেখে তাকে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে আমি বসেছিলুম রাত দেড়টার সময়। বয়েস হয়েছে আমার—বেশিক্ষণ একভাবে বসে থাকলে পিঠের চালটা টনটন করতে থাকে।

আমি কোন কথা না বলিয়া শুধু বরফের ব্যাগটা তাঁর হাত হইতে লইয়া নিঃশব্দে ভদ্রার কাছে গিয়া বসিলাম।

দাদা অন্ধকারে সেই চেয়ারে ঠিক তেমনি বসিয়া রহিলেন, শুধু আর একটা নতুন সিগারেট মুখে জ্বালাইয়া।

।। তেরো ।।

ইদানীং লক্ষ্য করিতাম ভদ্রা বড় একটা আমার সামনে বার হইত না। বরং আমাকে দেখিলে দ্রুত ঘরে ঢুকিয়া যাইত। বৌদি না ডাকিলে কাছে আসিত না। তখন তার মুখের ভাবটা আমার মনে হইত যেন ছোট ছেলেমেয়েদের "বসে আঁকো" প্রতিযোগিতার ছবির মত। আর যাই হোক উহাকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ প্রেমের আভিধানিক কোন সংজ্ঞাতেই ফেলা যায় না।

মনে আছে, এর কয়েকদিন পরে আমার বই কেনা-বেচার বছর পূর্ণ হইলে যখন হিসাবনিকাশ করিতে গিয়া দেখিলাম বেশ কিছু লাভ হইয়াছে, তখন সে আনন্দের ভাগ সর্বপ্রথম যাঁকে দিবার জন্য আমার মন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, বলা বাহুল্য তিনি বৌদি। যিনি কেবল মুখে উপদেশ দেন নাই, নিজের দেহ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া দিয়া আমায় এই স্বাধীন ব্যবসায়ে অনুপ্রাণিত করিয়া

ছিলেন। জানিতাম এ শুভ সংবাদ শুনিলে আমার চেয়ে বোধ হয় তিনি আরো বেশি খুশি হইবেন, তাই তাঁকে চমক লাগাইবার জন্য 'দিলখুশা কেবিন' হইতে মোগলাই পরটা, চপ, কাটলেট্ লইয়া গিয়া তাঁর হাতে দিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, এ কি, এসব আবার এনেছো কি জন্যে!

আমার মুখ হইতে কথা বাহির হইবার পূর্বেই হাসি টিপিয়া তিনি বলিলেন, বুঝেছি!—'ডাকচেন মোরে, কিন্তু চাচ্চেন তোমারে!' অর্থাৎ আমার জন্যে এনেছো মুখে বললেও আসলে কার জন্যে এনেছো জানি। তাকেই ডাকছি।

খপ্ করিয়া তাঁর হাতটা চাপিয়া ধরিলাম, এ আমি আপনারই জন্যে এনেছি, বিশ্বাস করুন।

এবার হাসি-হাসি মুখে বলিলেন, কে বললে যে বিশ্বাস করিনি? তারপর একটু থামিয়া কহিলেন, এতে লজ্জার কি আছে? এটাই তো স্বাভাবিক। আমি হলেও এইরকম করতাম। সবাই করে। তাই তুমি মুখে কথাটা বলতে পারছো না দেখে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ থেকে ওই কথাটা তোমায় বললুম। তিনি কত সহজে বলে গেছেন—তোমার মনের কথাটা ভেবে দেখো তো! তুমি নিশ্চয় পড়েছো 'নীলদর্পণ' বইটা! মনে আছে?

বলিলাম, না।

ও, সেই জন্যে বোকার মত চেয়ে আছো, বুঝেছি। বইটা তো আমার ঘরেই রয়েছে, তুমি পড়ে দেখো। আদুরি এসে সুন্দরীকে যখন এই কথাটা বলছে—আমি তো হেসে বাঁচি না। মাইরি ঠাকুরপো, কি অদ্ভুত লেখা! লোকটি আচ্ছা রসিক ছিলেন বটে! এই বলিয়া একটু থামিয়া আবার বৌদি শুরু করিলেন, ওঁর সম্বন্ধে একটা গল্প শুনেছিলাম আমার নিজের ঠাকুরপোর কাছে। ওঃ, হাসতে হাসতে সেদিন দম বন্ধ হবার উপক্রম। জানো ঠাকুরপো, জামাই বুড়ো হলে যেমন হয়, জামাইষষ্ঠীতে কে আর তাকে নেমন্তন্ন করে! কিন্তু দীনবন্ধু মিত্র করলেন কি, জামাইষষ্ঠীর দিন এক ঠোঙা ভাল ভাল খাবার কিনে নিয়ে চুপি চুপি সেজেগুজে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ভেতরে না ঢুকে বারবাড়িতে একটা সিঁড়ির ওপর উবু হয়ে বসে সেই ঠোঙা থেকে খাবার খেতে শুরু করলেন।

একটু পরে বাড়ির চাকর জামাইবাবুকে ওইখানে ওইভাবে বসে খাবার খেতে দেখে ছুটে বাড়ির ভেতর গিয়ে গিন্নীমাকে ডেকে সেকথা যেমন বলা অমনি তিনি ছেলে বৌ নাতিপুতি নিয়ে সেখানে এসে অবাক হয়ে যান। চাকর যা বলেছে, সত্যি তো! বৃদ্ধা শাশুড়ী ঠাকরুণ তখন জামাইয়ের কাছে গিয়ে লজ্জিতকণ্ঠে বলেন, ছি ছি বাবা, এখানে এইভাবে বসে কি খেতে আছে, চাকর-বাকররা কি মনে করছে বলো তো?

দীনবন্ধুবাবু তখন উঠে দাঁড়িয়ে গিলে করা ধুতি ও চাদর সামলে নিয়ে টিপ্ করে শাশুড়ীর পায়ে গিয়ে প্রণাম করে বললেন, মা, আজকের দিনে যাতে আমার শ্বশুরবাড়ির অকল্যাণ না হয়, সেইজন্যে নিজেই এসে মিষ্টিমুখ করে জামাইষষ্ঠী

পালন করছি। আপনি হয়ত ভুলে গেছেন জামাইকে—কিন্তু জামাই হয়ে আমার কর্তব্য তো শ্বশুরবাড়ীর কল্যাণ অকল্যাণ আগে দেখা!

এবার বৌদি জোর হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, সেই থেকে যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন আর বাদ যায়নি তাঁর।

বলিলাম, হঠাৎ দীনবন্ধু মিত্তিরের ভূত আপনার ঘাড়ে এখন চাপলো কেন?

বৌদি হাসিয়া কহিলেন, জানি তুমি এনেছো ভদ্রার জন্যে, আর লজ্জায় সে কথাটা মুখে বলতে আটকাচ্ছিল, তাই বললুম ওইভাবে অন্যের জবানীতে।

ছি ছি বৌদি—আপনার মুখ থেকে এ কথা শুনবো আশা করিনি!

তেমনি হাসি-হাসি মুখে তিনি বলিলেন, আচ্ছা তুমি এর জন্যে এত সঙ্কোচ বোধ করছো কেন? এটাই স্বাভাবিক। আমি হলেও এরকম করতুম। সবাই যা করে।

সবাইয়ের সঙ্গে আমায় একদলে ফেলবেন না, দোহাই বৌদি! কতবার আপনাকে বলেছি একথা!

এই বলিয়া হঠাৎ চুপ করিলে তিনি বলিলেন, ওঃ, রাগ হলো বুঝি বৌদির ওপর? আচ্ছা বাবা, স্বীকার করছি, তুমি দলছাড়া, গোত্রছাড়া, অসাধারণ! হয়েছে তো? আর মুখটা অমন গোমড়া করে থেকো না, একটু হাসো!

তখনো নীরব দেখিয়া বলিলেন, ওঃ কি জ্বালায় পড়েছি, দেওরের সঙ্গে বুঝি একটু ঠাট্টা করারও উপায় নেই?

এবার বলিলাম, কিন্তু তার একটা সময় অসময় আছে তো?

বৌদি হাসিয়া উঠিলেন, তাহলে কোন্ সময়টায় ঠাট্টা আর কখন বা রাম-গড়ুরের ছানার মত বসে থাকতে হবে, আগে থেকে সেটা তোমায় জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

সত্যি বলছি, আপনার ওই কথায় কতখানি আঘাত যে পেয়েছি আজ তা বলে বোঝাতে পারবো না।

আহা-হা···বাছারে! দেখি কোথায় আঘাত লেগেছে, একটু হাত বুলিয়ে দিই! বলিয়া তিনি আমার বুকে হাত দিতেই হাতটা সরাইয়া দিয়া বলিলাম, অনেক আশা করে এইগুলো কিনে এনেছিলুম আপনার জন্যে।

হঠাৎ বিশেষ করে আজ আমার জন্যে তোমার মনে এত আশা, এত উৎসাহ জাগবে—কি করে তা জানবো ভাই?

আজ আমার জীবনে একটা বিশেষ দিন। এক বছর পূর্ণ হলো আমার স্বাধীন ব্যবসার, যে ব্যবসা করতে আপনি কেবল উৎসাহ দেননি, নিজের গায়ের গয়না খুলে দিয়েছিলেন। তাই সর্বপ্রথম সেই লাভের টাকা দিয়ে আপনাকে দেবার জন্যে খাবার এনেছি।

বৌদি জিভ কাটিয়া বলিলেন, ছি, এ কি করলে, ব্যবসায় প্রথম লাভ হয়েছে, তার জন্যে সবার আগে ঠাকুর-দেবতার পুজো না দিয়ে আমার জন্যে কতকগুলো মোগলাই খাবার এনেছো! যাও আগে বাঁড়ুজ্যেদের ঠাকুরঘরে পুজো দিয়ে

এসো ষোল আনার। নইলে কিন্তু আমি খাবো না—আগেই বলে দিচ্ছি। ব্যবসায় আরো যাতে বেশি উন্নতি হয়—প্রথম লাভের টাকায় পুজো দিয়ে ঠাকুরের কাছে মানত করতে হয় জানো না ? বামুনের ঘরের বলদ, এটা আবার বলে দিতে হয় নাকি ? তুমি কি নাস্তিক ?

বলিলাম, নাস্তিক কি আস্তিক কোন দিন তা ভেবে দেখিনি, তবে আপনার ওই মঠ-মন্দিরের দেবতার চেয়ে আমার কাছে মানুষ অনেক বড়। জীবনে যা কিছু পেয়েছি, এই মানুষেরই কাছে। তাই সর্বপ্রথম আমার সেই দেবতাকে পুজো দিয়েছি।

নিমেষে বৌদির দেহটা যেন অজ্ঞাতে শিহরিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, ঠাকুরপো, এসব বলতে নেই, শুনলে আমার পাপ হবে ভাই।

পাপ আপনার কিসের ? যদি হয় তো আমার হবে। জানেন রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন—'দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই তোমারে। তোমারে যা চাহি দিতে, দিই তা দেবতারে।'

আমি চুপ করিলে বৌদি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আমার চোখের উপর হইতে মুখটা সরাইয়া লইয়া বলিলেন, যাও এমনি করে তাকিয়ো না।

কেন, তাতেও কি আপনার পাপ হয় ?

জানি না, বলিয়া বৌদি আবার মুখটা ঘুরাইয়া আমার চোখের উপর রাখিয়া বলিলেন, এক এক সময় আমার মনে হয়, যে তুমি কোন মরুভূমিতে বাস করতে, দু'চোখে তাই অনন্ত তৃষ্ণা। এত পেয়েও সে তেষ্টা যায় না ! একটু থামিয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন, আমার যা কিছু ছিল সবই তো তোমায় দিয়েছি নিঃশেষ করে। তবে কেন এমন করে চাও ! আরো কিছু চাও ? তুমি বড় হয়েছো, এত লেখাপড়া জানো, নিশ্চয় এটা বুঝতে পারে। আমার আর দেবার মত তোমায় কিছু নেই। ভাঁড়ার শূন্য। এই বলিয়া একটু থামিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমার ওই বুড়ো রবি ঠাকুর যা বলেছেন, এবার আমাকেও তাই বলতে হবে—

আরো যদি চাও। মোরে কিছু দাও।
আমি ফিরায়ে দিব গো তাই।

তোমার ওই বুড়ো রবি ঠাকুরের কিন্তু যাই বলো খুব রস ! সেই গানটা নিশ্চয় জানো ?

এবার নিজের মনেই হাসিয়া উঠিলেন। তারপর আস্তে বলিয়া ফেলিলেন, তোমার সঙ্গে কিন্তু ওই গানটার খুব মিল আছে !

তাই নাকি ? আগে তো কোন দিন শুনিনি একথা আপনার মুখে !

হাসিভরা দুই চোখ তুলিয়া বৌদি বলিলেন, কেন, শুনলে কি কিছু দিতে, কিছু পাওনা হতো ! আহা রে, বড্ড ভুল হয়ে গেছে ! কিন্তু এখনো তো সে ভুল শোধরানো যায় ভাই !

বলিলাম, আচ্ছা তার আগে এটা তো খেয়ে নিন, ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।

ভয় নেই, ঠাণ্ডা হতে দেবো না। তাই বলে যদি মনে করে থাকো, এইসব খাবারই আবার তোমায় ফেরত দেবো রবি ঠাকুরের ওই গানের মর্যাদা রক্ষা করতে, তা হলে কিন্তু ভুল করবে। কারণ এইসব পিঁয়াজ রসুন দেওয়া বিজাতীয় খাদ্যের চেয়ে আমি বৈষ্ণব রসের ভক্ত বেশি।

এবার হাসি চাপিতে পারিলাম না।

বৌদি বলিলেন, হাসছো যে ?

বলিলাম, তার মানে রবি ঠাকুরের চেয়ে বিদ্যাপতি আপনার বেশি প্রিয়, এই তো ?

ঠিক ধরেছো।

অর্থাৎ লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু/তবু হিয়া জুড়নো না গেল।

অসভ্য ! বলিয়া মাথার চুল টানিয়া দিলেন—এসব দিকেও জ্ঞান টনটনে ! সহসা বৌদির গাল দুটোতে গোলাপী আভা দেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল।

বৌদি হাঁক পাড়িলেন, ওরে ভাদু, শিগগির আয় তো মা !

ভদ্রা আসিয়া দাঁড়াইলে, সেই খাবারের বাক্সটা তার হাতে দিয়া তিনি বলিলেন, এগুলো একটু স্টোভ জেলে গরম করে আন্ তো মা !

এগুলো কি ?

বৌদি বলিলেন, তোর আলোকদা বইয়ের ব্যবসায়ে খুব লাভ করেছে, তাই তোর জন্যে আমার জন্যে এত সব মোগলাই এনেছে !

সহসা ভদ্রার মুখটা যেন কেমন বিমর্ষ হইয়া যায়। ধীরপদে সে চলিয়া গেল।

॥ চৌদ্দ ॥

নিজস্ব স্বাধীন ব্যবসায়ে লাভ হওয়ার ফলে মনে এত উৎসাহ জাগিয়াছিল যে এবার বাংলার বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালীদের কাছে বই বিক্রয় করিবার জন্য প্রথমেই ভাগলপুর গিয়াছিলাম। সেখানে বিখ্যাত সাহিত্যিক বনফুলের সহিত সাক্ষাৎ হয় লাইব্রেরিতে। তিনি একটা ফতুয়া গায়ে বারান্দায় বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া সাগ্রহে কাছে ডাকিলেন। তারপর নিজের বই বাছিয়া অনেকগুলি বই লইয়া লাইব্রেরিয়ানকে সেগুলি কিনিতে বলিলেন। তিনি বোধ হয় তখন সেই লাইব্রেরির সেক্রেটারী ছিলেন। তারপর তিনিই বলিয়া দিলেন মোক্ষদা গার্লস স্কুলে যাইতে। সেখানের প্রধান শিক্ষক তখন সুরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি যে বিখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মাতুল আগে জানিতাম না। তিনিও লেখক। তাঁর ঘরে ঢুকিয়া দেখি বেঁটেখাটো একটি ভদ্রলোক, মাথাভর্তি পাকাচুল, গেরুয়ারঙের একটা লুঙ্গির উপর গেরুয়া ঢোলাপাঞ্জাবি গায়ে ও পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় মুখে চুরুট ছিল।

যাহোক তিনি অনেক বই কিনিলেন স্কুলের লাইব্রেরি ও প্রাইজের জন্য এবং সেই সঙ্গে আমায় খুব উৎসাহ দিলেন, বলিলেন, বাংলার বাইরে এভাবে কোন বাঙালী যুবক বাংলা সাহিত্য প্রচার করবার কাজে ব্রতী হয়নি। বাঙালীর ছেলেরা চাকুরি ছাড়া কিছু বোঝে না। ভীতু। ঘরকুনো। তোমাকে দেখে আমার খুব ভাল লাগছে। তুমি নিশ্চয় খুব উন্নতি করবে। জেনো এর চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু নেই। এই বলিয়া নিজের লেখা বই 'বৈরাগ্যযোগ' এক কপি আমায় উপহার দিয়া বলিলেন, আমার এই বইটা যদি তুমি কিছু বিক্রি করে দাও তো ভাল হয়। আমার পাব্লিশারের কাছে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তার কাছে গেলেই তোমায় বই দেবে।

ব্যবসা করিতে গিয়া যে এমন সব বড় বড় বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ পাইব, কখনও কল্পনা করি নাই।

মনে পড়ে পরের দিন কোন্ একটি স্কুল হইতে ফিরিতেছিলাম। বেলা প্রায় বারোটা। কড়া রোদে ঘামিতে ঘামিতে হাঁটিতেছিলাম। হঠাৎ পিছন হইতে আমার কানে আসিল, কে যেন আমায় ডাকিতেছে, ও মশাই, শুনুন ?

পিছন ফিরিতেই দেখি একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, প্রায় ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছেন।

কাছে আসিতে বলিলেন, শুনলুম আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন বই নিয়ে!

বলিলাম, ঠিকই শুনেছেন।

তখন তিনি কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন, আপনার কাছে শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের কোন বই আছে ?

আজ্ঞে না। ওসব বই রাখি না।

তাহলে কি বই রাখেন ? অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের বই ছাড়া যেন আর কিছু বিক্রয়-যোগ্য পুস্তক থাকিতে পারে না। হতাশ হইয়া পড়িলেন মনে হইল। তারপর বলিলেন, শরৎ কেমন আছে বলতে পারেন, শুনেছিলুম তার অসুখ !

আমি তো অবাক। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত বিরাট লেখকের সঙ্গে আমার পরিচয় যে আছে তিনি তা ধরিয়াই লইয়াছেন, যেহেতু আমি কলকাতায় থাকি এবং বই লইয়া আমার কারবার ! তখনও আমি তাঁকে চোখে দেখি নাই, শুধু বই পড়িয়াই মুগ্ধ !

তখনও ভদ্রলোক নিজের ধ্যানেই আছেন। আমাকে নীরব দেখিয়া বলিলেন, আমি ইন্দ্রনাথের দাদা। শরতের সঙ্গে দেখা হলে বলবেন তাকে, আমার নাম···।

কি নামটা বলিয়াছিলেন তা একেবারেই মনে নাই।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় লইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে মনের মধ্যে একটু গর্ব অনুভব করিতে লাগিলাম, নিশ্চয় আমাকে দেখিলে তাহা হইলে মনে হয় না যে আমি নগণ্য একজন ক্যানভাসার ! তাহলে এত বড় বড় লেখক, সাহিত্যিক আমার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করিতেন না। ভাগলপুর থেকে পাটনা হইয়া বাড়ি

ফিরিতে প্রায় এক মাস সময় লাগিল। টাকা-পয়সার সঙ্গে বেশ একটা অহঙ্কার মনের ভিতর লইয়া যেদিন যখন বৌদির সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম, তখন তিনি যে বাড়ি ছিলেন না জানিতাম না। তাঁর ঘরে উঁকি মারিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া তাঁকে দেখিতে না পাইয়া যখন ফিরিবার কথা চিন্তা করিতেছি, হঠাৎ ভদ্রার ঘরের দিকে তাকাইতেই তার সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল। তাকে দেখিয়া মনে হইল, সে বোধ হয় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তাই চোখে চোখ পড়িবামাত্র সে ইশারা করিয়া আমায় ডাকিল।

তার ঘরের কাছে যাইতেই সে ভিতরে ডাকিল, শুনুন!

কি বল! বলিয়া তার সামনে গিয়া দাঁড়াইতে সহসা তার মুখের সব রেখাগুলি একসঙ্গে যেন কঠিন হইয়া উঠিল। আমার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে বলিল, আপনি বাবার কারখানায় চাকরি পেয়েও গেলেন না কেন? জানেন আজকের দিনে একটা চাকরির জন্যে লোকে মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি করছে!

একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম, কারখানায় চাকরি আমার দেহে সহ্য হবে না।

বাজে কথা! এত হাজার হাজার লোকের সহ্য হচ্ছে, আর আপনার হবে না কেন? এদিকে আপনি যে টো-টো করে চষে বেড়াচ্ছেন সারা দেশ ক্যানভাসারি করে, সেটা তো বেশ সহ্য হচ্ছে!

এই বলিয়া কণ্ঠস্বর একটু কঠিন করিয়া ভদ্রা হঠাৎ বলিয়া বসিল, আসলে আপনি এখান থেকে অন্য কোথাও যেতে চান না। তাই লোক-দেখানো একটা বইয়ের ব্যবসা করেন। আর মা তার জন্যে গা থেকে গয়না খুলে দিয়েছেন আপনাকে!

কি বলছো তুমি?

ঠিকই বলেছি। কিন্তু এই করে লোকের চোখে ধুলো দিতে পারবেন না। সকলেই এখন জেনে গেছে, কেন আপনি এ বাড়িতে আসেন। আমার গান শুনতে নয়, ওটা আপনার ছলনা!

এই বলিয়া গলার মধ্যে কি যেন চাপিয়া লইয়া বলিল, আসলে আপনি আসেন আমার মায়ের জন্যে, তাঁকে দেখতে আমার চেয়ে অনেক ভাল। আমি সব জানি।

ছি ছি! তুমি মেয়ে হয়ে এত বড় কথা মুখে উচ্চারণ করতে পারলে?

ভেবেছিলুম কোনদিন বলবো না। কিন্তু পাড়ার লোকেরা যখন কানাকানি করে আমার মায়ের চরিত্র নিয়ে, তখন যে ঘেন্নায় আমার মাথা কাটা যায়। ভদ্রার গলার স্বর যেন কাঁপিতেছিল। সে একটু থামিয়া বলিল, আমার বাবা আজকাল ছুটি পেলেও কেন বাড়ি আসেন না জানেন?

কণ্ঠের রাগ চাপিয়া বলিলাম, তিনি টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। ছুটির দিনে খাটলে অনেক 'ওভারটাইম' পান, তাই আসেন না এই তো শুনেছি!

ভদ্রা বলিল, আমাকে যতটা ছেলেমানুষ আপনি মনে করেন, ততটা আমি নই। যা শুনেছেন সব ভুল। আমার বাবা তো আগে এরকম ছিলেন না। কোন

ছুটিতে না এলে মা তখনি টেলিগ্রাম করতেন। তাঁর কোন অসুখ করলো কিনা সেই চিন্তায় সারারাত ঘুমোতে পারতেন না।...ওঃ, আপনি আমাদের যে কত বড় সর্বনাশ করেছেন যদি বুঝতেন, তাহলে আর এ বাড়ি মাড়াতেন না! আমার মায়ের সমস্ত মনটাকে আপনি কেড়ে নিয়েছেন আমাদের কাছ থেকে। বলিতে গিয়া আর চোখের জল সামলাইতে পারিল না।

ছি ছি, ভদ্রা! নিজের মায়ের সম্বন্ধে তুমি যা-তা কি বলছো, বুঝতে পারছি না!

কি করে বুঝবেন? বলিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে সে বলিল, আপনি তো বাইরে বাইরে থাকেন। ঘরের মধ্যে যাকে দিনরাত মায়ের সঙ্গে বাস করতে হয়, তার চেয়ে কি বেশি জানেন? আপনার চোখ থাকলে নিশ্চয় তা বুঝতেন!

থরথর করিয়া ভদ্রার দেহ এবার কাঁপিয়া ওঠে। বলে, একটা কিছু ভাল রাঁধলে মা আগে বাটি করে তুলে রাখেন আপনার নাম করে। আহা, বেচারার মা-বাপ নেই, কে-ই বা আদর করে ভালমন্দ একটু খেতে দেয়!

চুপ করিয়া ছিলাম। বলিলাম, এর মধ্যে তো তাঁর অন্তরের স্নেহটাই প্রকাশ পায়।

ভদ্রার চোখ দুটো এবার রাগে জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল।—সেই জন্যে বোধ হয় আপনার সাইকেলের ঘণ্টা বাজলে, যেখানেই থাকুন ছুটে জানালায় এসে দাঁড়ান আপনাকে দেখার জন্যে! জানেন, আরও কত সাইকেল তো ঘণ্টা বাজিয়ে চলে যায়, কিন্তু আপনারটা চিনতে কখনও তাঁর ভুল হয় না!

একটু ঢোক গিলিয়া বলিলাম, তোমার মুখখানাও তো আমি জানালার পাশে দেখতে পাই!

সে আপনাকে দেখার জন্য নয়। মায়ের ওপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে জানবেন।

ছি ছি ছি! তোমার মুখে কি কিছু আটকায় না? নিজের মা—

এবার খপ করিয়া আমার পা দুটো জড়াইয়া ধরিয়া ভদ্রা বলিল, জানি হয়তো এ আমার মনের পাপ—আপনার কোন অপরাধ নেই। তবু আপনি কথা দিন শুধু, এখান থেকে চলে যাবেন। আপনার পায়ে ধরছি—আমাদের কি সোনার সংসার ছিল, আপনি এসে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে কি করেছেন, আপনি তা জানেন না!

ভদ্রা, কত বড় যে মিথ্যা অপবাদ তুমি আমার মাথায় তুলে দিচ্ছ তুমি জানো না। বেশ, তবু তুমি যখন বলছো, এখান থেকে আমি কালই চলে যাবো, তোমায় কথা দিচ্ছি।

ভদ্রা এবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার একটি হাত ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধস্বরে বলিল, আমি যে আপনাকে এইসব বলেছি, মাকে শুধু নয়, কাউকে কোনদিন বলবেন না—কথা দিন!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে আমি বলিলাম, হাঁ, কথা দিচ্ছি।

পরদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বৈঠকখানা-ঘরে বসিয়া দেশে যাইবার জন্য যখন স্যুটকেস-এর মধ্যে জামাকাপড় পাট করিয়া গুছাইতেছিলাম, হঠাৎ আমার চুলের পরিচিত সুগন্ধ নাকে আসিতে মুখ ঘুরাইয়া দেখি সামনে বৌদি।

তিনি গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, তুমি নাকি আজ এখান থেকে চলে যাচ্ছো? তোমার মামীমার মুখে শুনলুম!

শুধু ছোট্ট করিয়া বলিলাম, হাঁ।

মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, কেন?

একটা চাকরির সন্ধান পেয়েছি। এর জবাব কি দিব, ভাবিয়া না পাইয়া চট্ করিয়া ওই কথাটা বলিয়া ফেলিলাম।

তিনি এবার ঢোক গিলিয়া তেমনি ধীরে প্রশান্ত স্বরে বলিলেন, আমি জানি তুমি কেন চলে যাচ্ছো! আমাকে মিথ্যে স্তোক দেবার চেষ্টা করো না!

স্যুটকেসটার ডালা চাপিয়া বন্ধ করিতে গিয়া বলিলাম, যদি জানেন, তবে আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?

তবু তোমার মুখ থেকে জানতে চাই, কি শুনেছো?

বৌদি, মাপ চাইছি, আমায় আর এ অনুরোধ করবেন না। আমি পারবো না তা মুখে উচ্চারণ করতে।

না, তবু তোমার মুখে শুনতে চাই কেন চলে যাচ্ছো?

বলিলাম, পাঁচজনে নানা কথা আপনার সম্বন্ধে রটাচ্ছে, সেটা আমি আর সহ্য করতে পারছি না বলেই চলে যাচ্ছি।

তিনি বলিলেন, তাতে করে তোমার সঙ্গে আমার যে কলঙ্ক রটেছে, তা কি আমার দেহ থেকে মুছে যাবে? তাছাড়া সে ভাবনা আমার, তুমি পুরুষ, তোমার কি? বরং তুমি চলে গেলে সবাই ভাববে, বুঝি যা রটেছে তা সত্যি!

বলিলাম, কিন্তু আমি থাকলে তো আরো বেড়ে যাবে বৌদি!

বাড়ুক। নিমেষে যেন তাঁর চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিল। বলিলেন, কত দূর ওরা বাড়তে পারে আমিও তা দেখতে চাই। শুধু তুমি বলো, চলে যাবে না! আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করো, যাবে না! বলো, চুপ করে রইলে কেন?

তাঁর হাতটা বুকের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া বলিলাম, মাপ করুন, আমি তা পারবো না।

কেন পারবে না? তোমার জন্যে যদি এত বড় কলঙ্ক আমি মাথায় নিতে পারি, আর তুমি এটুকু পারবে না আমার মুখ চেয়ে?

না—না—না। এ অনুরোধ আমায় করবেন না। আমি একজনের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ চলে যাবো বলে!

কে সে? কার কাছে এমন প্রতিজ্ঞা করেছ শুনতে চাই।

না—না, জিজ্ঞেস করবেন না। আমি পারবো না তা বলতে।

শুধু তার নামটা বলো, আর কিছু চাই না! অনুরোধে যেন বৌদি ভাঙিয়া পড়িলেন, দোহাই তোমার, চুপ করে আছো কেন, বলো?

তখনো আমায় নীরব দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, এই বুঝি তোমার বৌদির প্রতি ভালবাসার নমুনা?

মনে হইল, গলার মধ্যে কি যেন চাপিতে গিয়াও পারিতেছেন না! ভাঙা ভাঙা গলায় বলিলেন, অথচ তোমার জন্যে আমি কি না করেছি! যাক, তোমায় বলতে হবে না নাম। শুনতে চাই না। তার কথাটাই যদি তোমার কাছে আমার চেয়ে বড় হয়, বেশি মূল্যবান মনে করো তো দরকার নেই। বুঝলুম তোমায় এতদিনে!

বলিয়া অভিমানভরে দরজার দিকে অগ্রসর হইলে, আমি তাঁর হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, দোহাই বৌদি, আমায় ভুল বুঝবেন না। আপনি যদি এ কথা বলেন, তাহলে আমার চেয়ে অকৃতজ্ঞ পৃথিবীতে আর দু'টি নেই! আপনার ঋণ আমি এ জীবনে শোধ করতে পারবো না।

চুপ করো, এ কথা তোমার মুখে অনেকবার শুনেছি, এর পর আর শুনতে চাই না। এই বলিয়া আঁচলের প্রান্ত দিয়া চোখ মুছিয়া কহিলেন, তুমি না বললেও আমি জানি কে বলেছে!

জানেন? সত্যি বলছেন? আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম। তাহা হইলে অন্ততঃ প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধ হইতে মুক্তি পাই।

বৌদি এবার আস্তে বলিলেন, জানি, উনি বলেছেন!

ছি ছি, বৌদি, মিছিমিছি দাদার নামে দোষ দেবেন না। তিনি আপনাকে সন্দেহ করেন, এমন কথা আগে কখনো শুনিনি তো আপনার মুখে!

বৌদির গলায় যেন আগুনের ঝাঁজ! হাঁ, স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহ করে এ কথাটা আগে না বলে খুবই অন্যায় করেছি। আগে জানলে হয়ত বৌদির প্রতি তোমার দরদ আরো উথলে উঠতো!

না না, অন্ততঃ আমি তাহলে আর যেতাম না।

বৌদি বলিলেন, সেই জন্যেই ঘুণাক্ষরে কোন দিন তোমায় জানতে দিই নি।

চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ইদানীং সেইজন্যে বোধ হয় বৌদির ভালবাসার মাত্রাটা আমার উপর কিছু বেশি ও অপ্রত্যাশিত ছিল যার জন্য মনে মনে আমি লজ্জা পাইতাম।

এবার গভীর দৃষ্টি আমার মুখের উপর ফেলিয়া বৌদি বলিলেন, তাহলে নিশ্চয় এ আমার শাশুড়ী ভিন্ন কেউ নয়!

জিব কাটিয়া বলিলাম, আরে রাম রাম!

বৌদি যেন আর ধৈর্য ধরিতে পারিতেছিলেন না। আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, ঠাকুরপো তোমার পায়ে পড়ি বলো কে বলেছে?

আরে ছি ছি, এ কি করছেন ! বলিয়া বৌদির হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলাম, কিন্তু আমিও আর পারছি না নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ! তবে আপনি অন্য কাউকে এ কথা বলবেন না, দিব্যি করুন !

আবেগে থরথর করিয়া তাঁর গলা তখন কাঁপিতেছিল। বলিলেন, না এই তোমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করছি ।

একটু ইতস্তত করিয়া এবার চাপাকণ্ঠে বলিলাম, ভদ্রা !

অ্যাঁ ! বলিয়া শুধু মুখ দিয়া একটা শব্দ করিয়া উঠিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। আর কোন কথা আমাকে বলিলেন না ।

তারপর বজ্রাহতের মত স্থির হইয়া কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন ।

আমিও মুখে একটি শব্দ না করিয়া শুধু তাঁর দিকে চাহিয়া রহিলাম হতভম্বের মত ।

।। পনেরো ।।

মনে পড়ে বৌদিকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার পর মনটা এমনি ভাঙিয়া পড়িয়াছিল যে অনেকদিন পর্যন্ত কোন কাজকর্ম করিতে পারি নাই। দীর্ঘদিনের অসুস্থ রোগীর মত নিজেকে কেবল দুর্বল মনে হইত না, দেহের সব শক্তিও কে যেন হরণ করিয়া লইয়াছিল ।

বৌদির সঙ্গে আর দেখা হইবে না, তাঁর কাছে আর যাইতে পারিব না, সে পথ আমার কাছে চিরদিনের জন্য বন্ধ—একথা মনে হইলে যেন মনের ভিতরটা অনুশোচনায় পুড়িয়া যাইত। নিজেকে বৌদির কাছে অপরাধী বলিয়া মনে হইত।

আমারই কাঙালমনের ভিক্ষাপত্র ভরিয়া দিবার জন্য নিঃশেষে যদি অন্নপূর্ণার মত নিজেকে বিলাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে তাঁর সেই দেবী প্রতিমার মূর্তিতে কেহ এতটুকু কলঙ্ক দিতে সাহস করিত না। তাই নিজেকে কেবলই বৌদির কাছে অপরাধী বলিয়া মনে হইত।

বৌদিকে নানাভাবে, নানারূপে দেখিয়াছিলাম—কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি সেদিনের তাঁর যে মূর্তি দেখিয়াছিলাম, আজো তা ভুলি নাই। সেদিনের কথা মনে পড়িলে ঘৃণায় সর্বাঙ্গ রিরি করিয়া উঠে।

মেয়েকে ছাড়িয়া মায়ের সঙ্গে যে আমার দুর্নাম রটিতে পারে ইহা যেমন কল্পনাও করিতে পারি নাই, তেমনি সেই মেয়ে যে নিজের মুখে সেকথা আমায় আমায় বলিতে পারে, ইহাও আমার সকল কল্পনার অতীত ছিল।

তাই কেবল বিস্মিত হই নাই, স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম।···কেবল আমি নয়, সবাই জানিত যে বৌদি যেমন জেদী প্রকৃতির তেমনি আবেগপ্রবণ, একবার যাহা মনে করেন, তাহা হইতে তাঁকে টলাইবার ক্ষমতা কারো নাই। কারণ ইহার মূলে

ছিল যে সত্য, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিত না। সত্যকে যেমন মানুষ ভয় করে তেমনি ভক্তিও করে।

তাই যে কথা আমি মুখে উচ্চারণ করা পাপ মনে করিতাম, বৌদির বারংবার অনুরোধ ও কণ্ঠের আকুলতায় আর নীরব রহিতে পারি নাই। কোনরকমে শুধু বলিয়াছিলাম, 'ভদ্রা!' সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'এ্যাঁ' বলিয়া একবার শুধু শিউরিয়া উঠিয়া এমনভাবে চুপ হইয়া গেলেন যে আমার মনে হইল সেই ঘরের দেওয়াল, দরজা জানালা, ছাদ, পায়ের তলার মাটি সব যেন নিমেষে ভূমিকম্পে কাঁপিয়া উঠিয়া স্থির হইয়া গেল।

বৌদির সে মূর্তি আজো ভুলি নাই! নিজের পেটের সন্তান, একমাত্র মেয়ে যে একথা বলিতে পারে তাহা বোধ হয় তিনিও কল্পনা করিতে পারেন নাই।

তাই বৌদির সেই জগদ্ধাত্রীর মত উজ্জ্বল মূর্তি চোখের সামনে উদয় হইবামাত্র মনে পড়িত, এই দেবী প্রতিমার গায়ে যে কলঙ্ক লাগিয়াছে, তার মূলে আমি এ কথাটা ভুলিতে পারিতাম না কিছুতেই।

পল্লীগ্রাম জায়গায় হয়ত এ কথা আর লুকোছাপা নাই কাহারো কাছে। বিশেষ করিয়া মেয়েমহলে রাণীর মত তিনি মাথা উঁচু করিয়া থাকিতেন, সকলের কাছে সে মাথা যেন হেঁট করিয়া দিয়াছি আমি!

আমি তাঁহাকে ফেলিয়া দূরে চলিয়া আসিয়াছি অথচ বৌদিকে সেই অবস্থায় মুখ বুজিয়া হয়ত সবই সহ্য করিতে হইতেছে।

কতদিন রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি—আমি যেন চুপি চুপি চলিয়া গিয়াছি তাঁর কাছে। তাঁর ম্লান মুখ, শীর্ণদেহ; কোথায় চলিয়া গিয়াছে দেহের সে দীপ্তি, সে জৌলুস। এ এমন জিনিস যে প্রতিবাদ করিয়া, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিবার উপায় নাই। নইলে সব জানিয়া শুনিয়া বৌদি এইভাবে নিজের সন্তানের কাছে পরাজয় মানিয়া লইতেন না।

এমনি কত সব স্বপ্ন দেখিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। আর সারারাত চোখের পাতা এক করিতে পারিতাম না। মনে পড়িত বৌদি সেদিন বলিয়াছিলেন চলিয়া যাইব শুনিয়া, তুমি চলিয়া গেলে তো আমার দেহে যে কলঙ্ক লাগিয়াছে, তাহা মুছিয়া যাইবে না, বরং বাড়িবে!

ওকথা কানে শুনিবার পর আমার পক্ষে যে সেখানে আর থাকা সম্ভব নয়, ইহা বৌদি আগে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ভদ্রা বলিয়াছে একথা শুনিবার পর আর মুখ দিয়া কোন শব্দ বাহির করেন নাই। কেন তা একমাত্র তিনি জানেন, যিনি গর্ভে সেই কন্যাকে ধারণ করিয়াছিলেন।

মনে আছে বেশ, কোন রকমে দিনগত পাপক্ষয় করিয়া চলিতাম। কাজে কোন উৎসাহ-উদ্দীপনা পাইতাম না। সেই বইয়ের ব্যাগটা হাতে লইলেই মনে পড়িয়া যাইত, বৌদি নিজের গা থেকে গহনা খুলিয়া দিয়া আমাকে এই ব্যবসায়ে

একদিন অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। সেই ব্যাগের মধ্যে যেন বৌদির স্পর্শ, তাঁর স্মৃতি আমাকে আরো তাঁর কথাটা মনে পড়াইয়া দিত। কোন রকমে ক্লান্ত দেহটা লইয়া মেসের অন্ধকার ঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া ঘর ছাড়িয়া বাইরে চলিয়া আসিতাম। সেই মেসবাড়িতে যাহাদের সঙ্গে আমাকে থাকিতে হইত তারা অধিকাংশ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, তাদের কথাবার্তাগুলো আমার কানে যেন অসহ্য লাগিত। তাই কোনদিন গোলদিঘীতে যাইয়া চুপচাপ রাত পর্যন্ত বসিয়া থাকিতাম, কোনদিন বা শিয়ালদহ স্টেশনে গিয়া যাত্রীদেব ব্যস্ততা, তাদের ছোটাছুটি, কোলাহল, কুলির সহিত পয়সা লইয়া ঝগড়া ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে সময়টা একরকম কাটিয়া যাইত।

একা থাকিলে সন্ধ্যার সময়টা বিশেষ করিয়া বৌদির কথা মনে পড়িয়া কেমন যেন উতলা হইয়া পড়িতাম। নারীর স্নেহভালবাসা যে পুরুষের মনে কতখানি শক্তি ও কিরূপ প্রেরণা যোগায়, বৌদিকে ছাড়িয়া আসিয়া তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলাম। নারী শুধু বিলাসের সামগ্রী নয়, নারী পুরুষের জীবনে শক্তিস্বরূপিণী! এইজন্যই বোধ হয় শাস্ত্রে নারীকে 'শক্তি' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এমনি নানা চিন্তাভাবনায় যখন মন উদ্বেল হইয়া উঠিত, এক-একদিন বৌদির মুখের একটি কথা মনে পড়িয়া দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনার মত কাজ করিত। বৌদি স্কুলে কলেজে শিক্ষা পান নাই, কিন্তু হঠাৎ করিয়া এমন একটি কথা বলিতেন যা রীতিমত ভাবাইয়া দিত। মনে পড়ে একদিনের কথা। বলিয়াছিলেন, দেওয়ার মধ্যে দিয়েও তো পাওয়া যায়, ঠাকুরপো। সত্যি তাই যদি বৌদির বিশ্বাস. তা হইলে আমার মতন তাঁর মনটাও কি এমনি উতলা হয়? এমনি সন্ধ্যাবেলায় তিনিও আকাশের দিকে অন্ধকারে তাকাইয়া থাকেন?

এমনি করিয়া কাটিয়া যায় দিনের পর দিন। মনে আছে সেবার পাটনায় গিয়াছিলাম বই লইয়া। সপ্তাহখানেক পরে স্টেশনে আসিয়া কলকাতার টিকিট কাটিয়া ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। তুফান মেল কি কারণে এক ঘণ্টা লেট্ ছিল। যা হউক ট্রেন স্টেশনে আসিলে থার্ড ক্লাস কামরায় উঠিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছি। দু-তিনটি কামরায় উঠিতে চেষ্টা করিয়া ভিড়ের দরুণ ফিরিয়া আবার শেষের দিকের একটা কামরার উদ্দেশ্যে হন্তদন্ত হইয়া যাইতেছি হঠাৎ কানে আসিল পিছন হইতে, 'এই আলো, আলোক' বলিয়া কে যেন আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। হঠাৎ পিছন ফিরিয়া বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতেছি, এমন সময় দেখি ফাস্ট ক্লাসের জানলার ভিতর দিয়া মুখ বাড়াইয়া আছে চিন্ময়। একসময় স্কুলে আমার সঙ্গে পড়িত। টেস্ট পরীক্ষায় দুবার ফেল করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। তারপর আমাদের গাঁ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, আর খবর পাই নাই। অনেক দিন পরে এক পুরনো বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম, সে নাকি বোম্বেতে ভাল চাকরি পাইয়াছে। খুব চালাক-

চতুর ছিল সে। আমাদের ক্লাসে ওর মত এমন সবজান্তা ছেলে আর কেউ ছিল না। তাই মনে মনে ওকে সবাই পছন্দ করিত। বিশেষ করিয়া খেলাধুলায় ও খুব ওস্তাদ ছিল। আমাদের স্কুলের ফুটবল ক্লাবের ক্যাপ্‌টেন ছিল।

হাতছানি দিয়া ডাকিয়া বলিল, হাঁ করে কি দেখছিস, এখুনি ঘণ্টা পড়বে, উঠে আয় আগে।

বলিলাম, এটা যে ফার্স্ট ক্লাস, আমার থার্ড ক্লাস টিকিট।

তা জানি, ওঠ আগে, আমার ফার্স্ট ক্লাস টিকিট, আমার সঙ্গে একজন সারভেণ্ট যেতে পারে, তা বোধ হয় জানিস না!

এতদিন পরে দেখা, প্রথম আলাপেই আমায় চাকর বানাইয়া দেওয়ায় মনটা একটা ধাক্কা খাইল। এর আগে কখনো ফার্স্ট ক্লাসে চড়ি নাই। ইংরাজ রাজত্বে ফার্স্ট ক্লাস কামরার চেহারাই ছিল আলাদা। আগাগোড়া গদিমোড়া, ঝকঝকে সুন্দর কামরা। আলো পাখা, আবার শুইয়া পড়িবার জন্য গদির সঙ্গে রিডিং লাইট, কাঁচের দরজা দেওয়া বাথরুম—সত্যি কথা বলিতে কি আমার ওই বেশ-ভূষা লইয়া ও-গাড়িতে তাহার পাশে বসিতে লজ্জা করিতেছিল। সে ছাড়া দ্বিতীয় প্যাসেঞ্জার ছিল না সেই কামরায়। আবার মুখের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সে বলিল, ব্যাপার কি, হাতে ওই পুরনো টিনের ব্যাগটা নিয়ে ছুটোছুটি করছিলি, তুই রেলে ক্যানভাস্ করিস নাকি? তোর ওর ভেতরে কি আছে? আশ্চর্য মলম, হাত-কাটা তেল, না আরও কিছু?

ইহাতে আমার আত্মসম্মানে খুবই ঘা লাগিল। ওর বেশভূষা একেবারে পাক্কা সাহেবের মত। গায়ের কোটটা খুলিয়া সামনের আলনায় ঝুলাইয়া দিয়াছে। মোটা কফ্‌ওলা সিল্কের শার্টের উপর ওয়েস্ট কোট্, গলায় নেক্‌টাই। দেখলেই বোঝা যায় খুব বড় কোন চাকরি করে।

কিন্তু বড় চাকরি করে বলিয়া ওইভাবে আমাকে হেনস্থা করিবার কোন অধিকার তার নেই। বলিলাম, পরের স্টেশনে আমি নেমে যাবো ভাই চিন্ময়।

কেন, ভয় করছে? এ গাড়িতে তোমায় দেখলে চেকার এখুনি ছুটে আসবে? আসুক না। চিন্ময় চ্যাটার্জীও রয়েছে। তার সারভেণ্টের টিকিটটার বদলে সেই টাকায় তোকে ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কেটে দেবো। বোস ভাল করে চেপে সুস্থ মনে গদির ওপর। কতকাল পরে দেখা বল তো! সত্যি সত্যি তুই এখন কোথায় চাকরি করছিস? তোর মত ভাল ছেলে নিশ্চয় কোন ভাল চাকরি করিস্?

আমাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া বলিল, তোকে ঠাট্টা করে ক্যানভাসার বলেছি বলে রাগ করিস নি। বন্ধুর সঙ্গে কি ঠাট্টা করতে নেই? বলিয়া পকেট হইতে দামী একটা সিগারেট কেস্ বাহির করিয়া নিজে একটা ধরাইয়া আমার হাতে একটা গুঁজিয়া দিল।

বলিলাম, না ভাই, আমি খাই না সিগারেট।

কি, এখনো তেমনি ক্লাসের ফার্স্ট বয় আছিস দেখছি। আমি ম্যাকলীন

হেলবার্নের ওয়েলফেয়ার অফিসার। চার বছর এই পোস্টে আছি। তারপর তুই এখন কি করছিস, সত্যি বল তো ?

বলিলাম, তুই যা বললি তাই।

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, যাঃ, ইয়ারকি মারিস নি।

বলিলাম, সত্যি বলছি। ক্যানভাসারি করি, দাদের মলম, হাতকাটা তেলের নয়—বইয়ের।

এ আমি বিশ্বাস-ই করি না, তোর মত ভাল ছেলে এ কাজ করতে পারে না। গুল মারছিস ?

বলিলাম, মাইরি।

ভাল চাকরি করে বলিয়া চিন্ময়ের সেই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাগুলিতে যে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিতে পারে ইহা একবারও তার মনে হইল না।

ঠিক চারটে বাজিলে সাদা উর্দি পরা, কোমরে চওড়া লাল রঙের বেল্ট, মাথার পাগড়ীতে চকচকে পিতলের তকমায় কেলনার কোম্পানী কেটারার্স, ই. আই. আর লেখা এক মুসলমান খানসামা দুটি পৃথক ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম, চা, দুধ, চিনি, আলাদা আলাদা পটে সাজাইয়া এবং তার সঙ্গে স্বতন্ত্র একটি প্লেটে উৎকৃষ্ট কেক ও প্যাস্ট্রি লইয়া একটি চিন্ময়ের সামনে দিয়া অপরটি আমায় দিতে আসিলে আমি নিষেধ করিলাম, না না, আমায় দিয়ো না, তুমি নিয়ে যাও।

চিন্ময় বলিয়া উঠিল, না, তুমি দাও তো ওকে।

বলিলাম, মিছিমিছি আমার জন্য এত সব আড়ম্বর ভাল লাগে না ভাই।

খানসামাটা চলিয়া যাইতে চিন্ময় বলিল, ভয় নেই এর জন্যে বিল তোমায় দিতে হবে না। তাছাড়া আমারও গ্যাঁট থেকে যাবে না। ওটা আমার সার্ভেণ্টের একাউণ্টে যাবে।

আর কথা বলিতে পারিলাম না। তার মুখের ওই 'সারভেণ্ট' কথায় আমার মুখের খাবার যেন নিমেষে তিক্ত হইয়া উঠিল।

এরপর রাত আটটায় ডিনার খাইবার জন্য সে প্রস্তুত হইল। আল্‌না হইতে কোটটা লইয়া গায়ে পরিয়া, আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া গলার টাইটা ভালভাবে বাঁধিয়া, চুলটা ব্যাকব্রাশ করিয়া কহিল, ভাই আলো, তোমার খাবারটা এখানে দিয়ে যাচ্ছে। আমি যাচ্ছি 'ডাইনিং কারে' খেতে, ওখানে তো তোমার মত ধুতি-পাঞ্জাবি পরে গেলে ঢুকতে দেবে না। ওটা সাহেবদের জন্যে—ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জার ছাড়া কারো যাবার হুকুম নেই ! তবে আমার মত যারা বড় চাকরি করে তারা ঢুকতে পারে, কেবলমাত্র সাহেবী পোশাক পরে।

এত সব ব্যাখ্যা না করিলেও পারিত চিন্ময়, কারণ আমিও ইংরেজ রাজত্বে বাস করি। থার্ড ক্লাসের প্যাসেঞ্জার, ফার্স্ট ক্লাসে কখনো চড়ি নাই তবে রেলের ওই আইন-কানুনগুলো জানিতাম।

চিন্ময়ের স্বভাবটা যে কিছুমাত্র বদলায় নাই, বরং বয়সের সঙ্গে আরো বাড়িয়া

গিয়াছে, ইহা আগে যদি বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে কিছুতেই তার কথায় 'ফার্স্ট' ক্লাসে' উঠিতাম না।

বলা বাহুল্য, অনেক রাত পর্যন্ত সে ঘুমাইতেই দিল না! নিজের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিল। কত বড় আপিসে সে চাকরি করে, সাহেব কত ভালবাসে, কত বেকার ছেলের চাকরি করিয়া দিয়াছি ইত্যাদি। তারপর নিজের উপার্জনেই সে যে ইতিমধ্যে কলকাতায় বাড়ি-গাড়ি করিয়াছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা এম. এ. পাশ এক বিদুষীকে বিবাহ করিয়াছে—সগর্বে বলিয়া একটু থামিয়া কহিল, জানিস, আমার বৌদি কেবল ম্যাট্রিক পাস, আর দাদা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একজন অফিসার এবং নিজে এম. এ. পাস। অহংকারে তার মুখটা যেন আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

হাসিয়া ফেলিলাম, দাদার ওপর তুই তাহলে খুব টেক্কা দিয়েছিস বল!

না ভাই, টেক্কা-ফেক্কা বুঝি না, বিয়েটা স্রেফ 'লাক্', আমার ভাগ্যে জুটে গেছে! শ্বশুরমশাই এক বড় ব্যবসার মালিক, আমার সঙ্গে কথা বলে তিনি মুগ্ধ। ক'টা পাস করেছি জিজ্ঞেস না করে কত উপার্জন করি সর্বপ্রথম জানতে চেয়েছিলেন এবং সেটাই ছিল তাঁর কাছে ইউনিভারসিটির ডিগ্রীর চেয়ে অনেক বড়। তাঁর ধারণা বি. এ., এম. এ. পাস করেও সেই তিরিশ-চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরির জন্যে যখন ঘুরতেই হবে, তার চেয়ে লেখাপড়ার পেছনে বৃথা সময় নষ্ট না করে, আগেই রোজগারের ধান্দা অনেক ভাল! এই পর্যন্ত বলিয়া, একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, দাদা এখনো বাড়ি করতে পারেন নি। সরকারী কোয়ার্টারে থাকেন। তিন-চারটে বাচ্চা হয়েছে, খুবই টানাটানি তাঁর।

সব দিক থেকেই দাদাকে যে হারাইয়া দিয়াছে, তার জন্য মনে বেশ একটা অহংকার লক্ষ্য করিলাম।

হাওড়ার স্টেশনে ট্রেন হইতে নামিলে, আমার বিছানা ব্যাগটা সে তার কুলিকে হুকুম করিল তার বিছানা স্যুটকেসের সঙ্গে লইতে।

আরে না-না, থাক ভাই, ওটা আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি।

মুখ থেকে সিগারেটের শেষটুকু ফেলিয়া চিন্ময় বলিল, যাচ্ছি মানে? তোকে কে যেতে দিচ্ছে! আমার বাড়িতে চল, সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে দুপুরটা লম্বা একটা নিদ্রা দিয়ে বিকেলে চা খেয়ে তারপর যাবি। আমি নিজে তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবো আমার গাড়ি করে।

নাছোড়বান্দা। বলিল, একবেলা তোর মেসের ভাত পেটে না পড়লে বুঝি পেট কামড়াবে! চল!

বুঝিলাম, ওর মনের আসল দুর্বলতা কোথায়? অর্থাৎ ওর বাড়িঘর ও বিদুষী স্ত্রীকে আমায় দেখাইতে চায়।

সত্যি ওর বাড়িটা দেখার মতন। ছোট্ট হইলেও ডিজাইনটি ভারী সুন্দর।

গাড়িটা পুরনো হইলেও এই নূতন বাড়িটা যে তার নিজের উপার্জন দিয়া করিয়াছে, ইহাতে তার যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে স্বীকার করিতেই হইবে। ড্রয়িংরুমটা তেমনি সুন্দর করিয়া সাজানো মূল্যবান আসবাবপত্রে।

ড্রয়িংরুমের পাশেই ছিল একটি সুসজ্জিত ঘর। সেখানে খাট বিছানা আলনা টেবিল চেয়ার সবই সাজানো। চিন্ময় বলিল, জামাটামা সব আলনায় খুলে রেখে ততক্ষণ ভাল করে আরাম কর। আমি এখুনি আসছি ওপর থেকে।

বলিলাম, একটু মাসিমাকে ডেকে দে, তাঁকে আগে প্রণাম করবো। অনেক দিন দেখিনি।

দেখছি তাঁর পুজো শেষ হয়েছে কিনা।

একটু পরে চিন্ময় আসিয়া বলিল. মা সবে পুজোয় বসেছে, অনেক দেরি হবে। আমার স্ত্রী এখনো বাথরুমে।

সামনের দেওয়ালে একখানা বড় ফোটোর দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলাম, এই নিশ্চয় তোর স্ত্রী? কন্‌ভোকেশন্‌-এর পোশাক, হাতে গোল করা ডিগ্রীর কাগজটা!

চিন্ময়ের মুখে একটু গর্বের হাসি দেখা দিতেই বলিলাম, সত্যি. তুই যে কোনদিন বিয়ে করবি, তা ভাবতেও পারিনি কেউ! ওঃ, কী সাংঘাতিক নারী-বিদ্বেষ ছিল তোর ছেলেবেলায়, মনে পড়ে? তুই বলতিস. প্রেমফ্রেম সব বাজে. টাকাটার চেয়ে বড় কিছু না। নারীর ভালবাসা, প্রেম মুখে বলতেই ভাল শোনায়. আসলে সব ভুয়ো! অভিনয়! যেখানে যত টাকা সেখানেই তত ভালবাসা। এমন কি মা, যার স্নেহ-ভালবাসা জগতে অতুলনীয়, সেখানেও এই! যে সন্তান বেশি উপার্জন করে. তাঁকে বেশি স্নেহ করেন, বেশি ভালবাসেন মা। কত প্রমাণ চাস, বাজী ফেল্‌ আমি এখুনি দেখিয়ে দেবো।

চিন্ময় মুখে আঙুল চাপিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিল. এই চুপ! একে মা মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ পেলে আর রক্ষা থাকবে না! এই নিয়ে আমারও স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই রাগারাগি হয়। আমি যত বলি টাকাটা প্রেম. ভালবাসার চেয়ে অনেক বড়, তত রেগে যায়। শেষে বলে, হাঁ সেটা কেবল তোমার কাছে! জীবনে কোনদিন কোন মেয়েকে যদি ভালবাসতে একথা মুখে উচ্চারণ করতে পারতে না! এই বলিয়া সে সাবধান করিয়া দিল. ছেলেবেলার কোন কথা একেবারে ওর সামনে তুলিসনি ভাই! দেখি এতক্ষণে হলো কিনা ওর!

আমাকে সেখানে বসাইয়া সে ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরেই স্ত্রীকে লইয়া আসিয়া আমার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল, এই আমার ছেলেবেলার বন্ধু আলোক রায়—আর একে তো দেখেই বুঝতে পারছিস. শেলী, নামটা একটু ইংরিজী ধরনের হলেও, ভেতরটা কিন্তু একেবারে গাঁইয়া, গঙ্গাস্নান, পুজাপার্বন, উপবাস কিছুই বাদ দেয় না।

আচ্ছা ঢের হয়েছে, এখন থামো। বৌয়ের এত ব্যাখ্যানা করতে হবে না।

বলিয়া শেলী শুরু করিল, আপনার গল্প ওঁর মুখে অনেক শুনেছি, আপনি নাকি সাংঘাতিক রোমাণ্টিক এবং যাকে বলে লেডিস্‌ম্যান তাই ছিলেন !

বলিলাম, ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। বরং ওকেই সেকথা বলা যেতে পারে। আপনি নিশ্চয় তার পরিচয় এতদিনে পেয়েছেন ?

হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ পেয়েছি, খুবই যাকে বলে হাড়ে হাড়ে, রোমান্স্ যে পথে হাঁটে তার একশ হাত দূরে উনি থাকেন। আমি বলি তোমার বিয়ে করা উচিত হয়নি !

না, না, এ বললে আমি বিশ্বাস করবো না কিছুতেই, ওর ওপরটা ঠিক নারকেলের খোলার মত—সেটা বাদ দিয়ে ভেতরে ঢুকলেই দেখবেন, কত সরস সুন্দর !

কিন্তু আগেই যে খোলা ছাড়াতে গিয়ে দাঁত ভেঙে যাবে। ভেতরের স্বাদ পাবেন কোথায় ?

একটু হাসিয়া আবার বলিলেন, জানেন, আমি ওকে বলি যে ভগবান যখন তোমায় সৃষ্টি করেন তখন হাতের কাছে মাটির বদলে ছিল কতগুলো লোহার টুকরো আর পাথরের নুড়ি-নোড়া। তাড়াতাড়ি সেইগুলো সব তোমার মনের ভেতরে ভরে দিয়ে তোমায় সংসারে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি।

বলিলাম, পুরুষের মন কঠিন শক্ত হওয়াই তো উচিত। পুরুষকে তো প্রতি পদে জীবন সংগ্রাম করতে হয়—'স্ট্রাগল্ ফর একজিস্‌টেনস্' যাকে বলে। সেটা তো অস্বীকার করতে পারেন না ?

মুচকি হাসিয়া বলিলেন, সেটা তো বাইরের জন্যে—অন্তঃপুরেও কি তাই !

এমনি সময় ভিতর হইতে সুদৃশ্য ট্রেতে সাজাইয়া চায়ের সঙ্গে চপ্ কাটলেট দিয়া গেল ঝি !

বলিলাম, এত সকালে এসব কোথা থেকে এল ? রেস্তোরাঁ থেকে নাকি ?

রেস্তোরাঁর খাবার আমরা ছুঁই না। বাড়িতে সব সময় এসব তৈরি থাকে। তাছাড়া ভাল রাঁধুনী কুক্ আছে, সে-ই সব করে !

এরপরে দুপুরের আহার করিতে টেবিলে বসিয়া বিস্ময় আরো বাড়িয়া যায়। ভাতের বদলে ফ্রায়েড্ রাইস্, মাছের ফ্রাই, চিকেন-কারী এবং তার সঙ্গে সন্দেশ।

বলিলাম, চিন্ময়, এত সব কি দরকার ছিল ? দু'টো মাছের ঝোল ভাত হলেই হতো।

তার মানে, দরকার হয়ত তোমার ছিল না, আমরা কিন্তু এতেই অভ্যস্ত। তোমাদের ওইসব ডাল, চচ্চড়ি, মাছের ঝাল, কুলের অম্বল খাওয়া একেবারে দূর করে দিয়েছি। রাত্তিরটা আমরা চিকেন্ স্যাণ্ডউইচ, সুপ্, বিরিয়ানী খাই। বলছি আজকের রাত্তিরটা থেকে যা, সে সব খেয়ে যেতিস, কাল সকালেই তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবো, তা তুই যখন রাজী নস, কি আর করবো !

সত্যি বলিতে কি, ওর ওই হঠাৎ বড়লোকিয়ানা দেখিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলাম,

কোনরকমে তাড়াতাড়ি বিদায় হইতে পারিলে যেন বাঁচি। স্ত্রীর আসল নাম ওটা, না ডাকনাম, জিজ্ঞাসা করিতে চিন্ময় বলিয়াছিল, আসল নামটা শুনলে তুই হাসবি। নেহাতি গেঁইয়া। শেফালী। মনে আছে ছেলেবেলার সেই গানটা —"শেফালী তোমার আঁচলখানি বিছাও শারদপ্রাতে"—বিকৃতস্বরে গাহিয়া বলিল, ওর নামের সঙ্গে ওই গানটা মনে পড়ে বলে, প্রথম দিনই ওটা কেটে ছেঁটে শেলী করে দিয়েছি—কি ভাল করিসনি?

শেলী বলিল, হ্যাঁ খুব বাহাদুর তুমি, সবাই জানে। এখন থামবে কি?

এই সময় মাসিমা অর্থাৎ, চিন্ময়ের মা পূজা সারিয়া ঠাকুর-ঘর হইতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিধবা, শুচিশুভ্র আভরণ। কপালে চন্দনের টিপ। নমস্কার করিয়া বলিলাম, চিনতে পারেন?

মা কখনো ছেলেকে ভুলতে পারে বাবা!

এরপর দুপুরবেলা রাতজাগা ঘুমটা যখন বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে, হঠাৎ চমকাইয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। ওপরের ঘরে ওদের স্বামী-স্ত্রীতে টাকাকড়ির হিসাব লইয়া তর্কাতর্কি চলিতেছে। মাত্র দু আনার হিসাব মিলাইতে পারিতেছিল না শেলী, তাই তার উপর তম্বি করিতেছে চিন্ময়, কিসে খরচ করেছো বলো!

রাগের চোটে শেলী বলিয়া উঠিল, জানি না বলছি তো! দু' আনা পয়সার জন্যে তুমি মরে যাচ্ছো একেবারে, কাল থেকে তোমার খরচের হিসাব আমি রাখতে পারবো না। বলে দিলুম! তোমার পয়সা আমার হাত দিয়ে ছুঁতে ঘেন্না করে। আমাকে তুমি কি চাকরের অধম মনে করো!

দাঁতে দাঁত চাপিয়া চিন্ময় বলে, তোমার বাবা বড়লোক হতে পারে, তোমার কাছে তাই ওটা কিছু নয়। কিন্তু যাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়, সে জানে ওর কত দাম।

দেখো, বাপ তুলে কথা বলো না বলছি। তোমার ওই দু আনা পয়সা আমি কালই সুদসুদ্ধ ফেরত দেবো।

দু আনা পয়সার তোমার কাছে কোন মূল্য নেই, জানো পাঁচটা পয়সা ফেললে একটা লোক পাইস্ হোটেলে পেট ভরে ভাত-ডাল তরকারি খেতে পারে? হিসেবটা আমি আগে বুঝি, সেখানে দু' পয়সা যা দুটো টাকাও তাই।

ওপরের ঘরে ওরা জানালা বন্ধ করিয়া ঝগড়া করিলেও, ঢালাই করা ছাদের নীচ হইতে যে বেশ স্পষ্টই শোনা যায়, ইহা তাহারা বোধ হয় তখন ভাবিতে পারে নাই।

যাহোক চিন্ময়ের বিবাহিত জীবনের যে চিত্র সেই মুহূর্তে আমার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তাহাতে উহার প্রতি ঘৃণাই জাগিল। মনে হইল এখনো সে ঠিক তেমনি আছে। বিশ্বাস করে, স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা সব ঝুটা মিথ্যা, একমাত্র টাকাই জগতে সত্য!

বিকেলে চা-পর্ব শেষ হইলে, আমাকে একা কিছুতেই ছাড়িল না চিন্ময়।

নিজে গাড়ি চালাইয়া আমায় বাসায় পেঁছাইয়া দিতে আসিল।

তাহাকে আমার মেসের ঘরটা দেখাইতে একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। গলির ভিতরে গাড়ি ঢুকাইতে বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও সে শুনিল না। বলিল, যখন এতদূর এলুম, চল্ তোর ঘরটা দেখে যাই!

সেই অন্ধকার গলির একতলার একটা ঘরে কেরোসিন কাঠের তক্তপোষের উপর একটা পুরনো শতরঞ্চি পাতা আর মাথার দিকে একটা পাতলা কম্বল জড়ানো বালিশ ও বিছানার চাদর গোটানো ছিল। একটা দড়ির আলনায় আমার লুঙ্গি, গামছা ও একখানা ধুতি পাঞ্জাবি ঝুলিতেছিল। তার পাশে একটা বড় ট্রাঙ্কে কিছু বইপত্র ছিল ভরা।

চিন্ময় ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া কহিল, ইস্! এইখানে তুই থাকিস? কত দিতে হয় মাসে?

বলিলাম, থাকা খাওয়া, সব নিয়ে বারো টাকা। দু বেলা দু'কাপ চা সমেত!

চিন্ময় বলিল, আমার ড্রাইভারও এর চেয়ে অনেক ভালো ঘরে থাকে। শ্যামবাজারের কাছে একটা দোতলা বাড়িতে ভদ্রলোকের মেস-এ!

এই বলিয়া পকেট হইতে রুমাল বার করিয়া নাকে চাপিয়া মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তারপর একটি কথাও না বলিয়া নিজের গাড়িতে উঠিয়া নিমেষে স্টার্ট দিয়া গলি ছাড়িয়া বড় রাস্তায় গিয়া পড়িল।

আমি নিঃশব্দে দরজার কাছে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভিতরে চলিয়া আসিলাম।

॥ ষোল ॥

চিন্ময় চলিয়া গেলে মনে মনে কেমন একটা ধিক্কার জাগিল। কিছুই ভাল লাগে না। সব যেন বিষাক্ত মনে হয়। কেবল অপমান বা হেনস্থা নয়, দুই পায়ের তলায় আমার মনুষ্যত্বকে সে যেন দলিয়া পিষিয়া থেঁৎলাইয়া দিয়া গিয়াছে—বার বার এই কথাটাই যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার অন্তরাত্মাকে দংশন করিতে থাকে।

এক এক সময় মনে হয়, তাহাকে গিয়া বলি, তুমি যতই বড় হও—তুমি সাহেবের চাকর। তার হুকুম ছাড়া তোমার উপায় নেই কিছু করার। অনুমতি নিতে গেলে চিঠিতে "ইয়োরস্ মোস্ট ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্ট্" অর্থাৎ আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায় লিখতে হয়।

চিন্ময় আমাকে যত ছোট ভাবুক, তার চেয়ে কিন্তু আমি যে অনেক বড়, আমি স্বাধীন ইচ্ছামত যখন যা খুশি করতে পারি, কাহাকেও তার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয় না—সে স্বাধীনতার মূল্য যে কত বড়, তা বোধ হয় চিন্তা করিবার শক্তিও সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

অর্থ ছাড়া যে আর কিছু বোঝে না, শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতির মাপকাঠি যাহার

কাছে শুধুই টাকা, তাহার নিকট আমার পরিচয় নগণ্য ক্যানভাসার হওয়াই স্বাভাবিক। সে কেমন করিয়া বুঝিবে আমার ওই চামড়ার স্যুটকেস্‌টা কেবল বইয়ের ভার বহন করিবার বস্তু নয়, উহা জ্ঞানের সুধাভাণ্ড, শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতির অমৃতরসে কানায় কানায় ভরা! আমি কেবল অর্থের লোভে সে ভার বহন করি না। দেশ-বিদেশে সেই জ্ঞানের অমৃত সুধা পরিবেশন করিতে যাই। "দধি বেচনম্‌, হরি ভেটনম্‌"—সেই বৃন্দাবনের গোপীদের ভাষায় যাকে বলে একই সঙ্গে হরি দর্শন ও দধি বিক্রয়। কেবল ব্যবসা নয়, সেই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সেবা করিতেছি বলিয়া মনের ভিতর একপ্রকার সুখ ও আনন্দ অনুভব করিতাম।

কত ছোট বড় জ্ঞানী-গুণী শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সৌভাগ্য হইয়াছিল ওই স্যুটকেস্‌-এর দৌলতে তাহা বলিবার নহে। স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরি, পুস্তক-ব্যবসায়ী—বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের বাহিরে যেখানে গিয়াছি, কেউ মনে করিতেন না যে, শুধু আমি ব্যবসায়ী, তাহাদের কাছে লাভ করিতে আসিয়াছি। বরং তাঁহাদের চোখে আমি যেন শিক্ষা-সংস্কৃতির একজন প্রতিনিধি, মান-সম্ভ্রমের পাত্র ছিলাম।

উপরন্তু ইংরেজ-রাজত্বে কলিকাতা শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান ছিল বলিয়া বাহিরের লোকেরা একজন কলিকাতাবাসীকে সব সময় খাতির শ্রদ্ধা করিতেন ও নিজেদের শিক্ষাদীক্ষার পরিচয় দিতে ভুলিতেন না।

তাই এক এক দিন খুব রাগ হইত। ইচ্ছা করিত চিন্ময়কে সঙ্গে লইয়া গিয়া দেখাই, যব বড় চাকরি সে করুক না কেন, তার চেয়ে কত বেশি সম্মান আমার এই ক্যানভাসিং ব্যাগের।

মনে পড়ে পাটনায় প্রথম ক্যানভাসিং করিতে গিয়া যেখানে উঠিয়াছিলাম, উহার নিচের তলায় ছিল 'পাইস হোটেল' আর দোতলার চার-পাঁচটি ঘরে বারো তেরোজন আইন কলেজের পড়া ছাত্ররা থাকিত।

নিচে পাইস হোটেলে খাইতে বসিয়া 'ঠাকুর থোড়া লবণ দিজীয়ে' যেই বলিয়াছি, হঠাৎ আমার আশেপাশে যাহারা খাইতেছিল হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল। একজন ছোকরা বলিল, আরে, কেয়া বুরা বাত্‌ বোলতা হ্যায়! অর্থাৎ এ কি খারাপ কথা বলছেন?

খারাপ কথা কি বলিলাম, বুঝিতে না পারিয়া তার মুখের দিকে তাকাইতেই ছোকরাটি বলিল, ঠাকুর বল্‌তা হ্যায় নাপিতকো। আব্‌কো কলকাতামে জিসকো ঠাকুর বলতা, হামারা হিঁয়া উসকো "বাবাজী" কহতা হ্যায়, যো খানা পাকাতা!

কসুর মাপ্‌ কিজীয়ে। বাবাজী নুন দিতে আসিলে তাকে বিনীত কণ্ঠে কহিলাম।

তখন সেই ছোকরাটি বলিল, আপনি তো দেখছি কলকাতার লোক, বোধ হয় আজই এসেছেন?

বলিলাম, ঠিক ধরেছেন। কিন্তু কি করে জানলেন আমি কলকাতা থেকে

আসছি ?

সে হাসিয়া বলিল, কলকাতার পালিশ আলাদা—ভারতবর্ষে আর কোথাও তা নেই। যারা দশজনের সঙ্গে মিশেছে, তারা এক চাউনিতে ধরতে পারে। বলিয়া বেশ যেন আত্মগর্ব অনুভব করিতে লাগিল। শেষে বলিল, কোথায় উঠেছেন আপনি ?

বলিলাম, কোথাও উঠি নি। একটা বইয়ের দোকানে বিছানা স্যুটকেস্ রেখে খেতে এসেছি। তারপর একটু থামিয়া বলিলাম, একটা ভাল থাকার জায়গা কোথায় পাবো যদি বলে দেন তো বিশেষ উপকৃত হবো।

ছোকরাটি বিহারী হইলেও বাংলায় বেশ কথা কহিতেছিল। বলিল, খেয়ে নিন, তারপর আপনাকে নিয়ে গিয়ে দেখাবো।

খাওয়া শেষ হইলে হাত মুখ ধুইয়া আমি যখন বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিতেছি কত দিতে হবে, ছোকরাটি তখন ভিতর থেকে বলিয়া উঠিল, আপনাকে পয়সা দিতে হবে না। আমি দিয়ে দিয়েছি। চলুন আপনাকে থাকার জায়গাটা দেখাই।

বলিলাম, না না, সে হয় না। আপনি কেন দেবেন পয়সা !

ছোকরাটি হাসিয়া বলিল, আপনি আমাদের এখানে প্রথম এসেছেন, আপনাকে অতিথি হিসাবে আপ্যায়ন করা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করি।

সে কি !

হাসিয়া এবার ছোকরাটি বলিয়া উঠিল, আপনাদের কলকাতায় যখন যাবো তখন আমায় খাইয়ে দিয়ে শোধ দেবেন ! এ আমার দেশের শহরে এসেছেন ভুলে যাবেন না। বলিতে বলিতে সিঁড়ি দিয়া ওই বাড়ির দোতলায় উঠিয়া একটা ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, একটা 'সিট' মাত্র খালি আছে। এখানে যে ছিল সে ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে দেশে চলে গেছে। আমরা উপস্থিত তেরোজন স্টুডেন্ট্, সবাই ল কলেজে পড়ি, এইখানে থাকি। দেখুন এটা কি আপনার পছন্দ হয় ? অবশ্য এখানে এখনি খাটিয়া দিয়ে যাবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের মত এতগুলি শিক্ষিত ছাত্রদের সঙ্গে থাকতে পারবো, এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারে ?

ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে ছোকরাটি আমার সঙ্গে সেই বইয়ের দোকানে গিয়ে একটা মুটে ডাকিয়া তার মাথায় আমার বিছানা ও স্যুটকেসটা তুলিয়া দিয়া বলিল, এই যা, এটা আমার ঘরে পেঁছে দিয়ে আয় !

মুটেটা চলিয়া গেলে বইয়ের দোকানের মালিক ছোকরাটিকে ভিতরে চেয়ারে বসাইয়া খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। বলিলেন, আপকো লিয়ে কোম্পানীস্ ল, নিউ এডিশন্ এক কপি কাল কলকাতাসে ভেজা, লিজিয়ে—বলে একটা বই তার হাতে দিলেন। ছোকরাটি বলিল, আউর উয়ো যে অর্ডার দিয়া থা, চার-পাঁচ কিতবকা উয়ো কব্ মিলেগা ?

উসকো অর্ডার তো বিলাইত্মে ভেজা। আভি ইণ্ডিয়ামে নেহি মিলা।

ঠিক হ্যায়। বলিয়া আমায় লইয়া চলিয়া আসিল। তৎক্ষণে আমার বিছানা পাতা রেডি।

ছোকরাটির নাম রাজেন্দ্রকুমার। সে আমাকে বিশ্রাম করিতে বলিয়া কলেজে চলিয়া গেল। শুধু যাইবার আগে বলিল, তালাচাবি এখানে রয়েছে। যখন বাইরে যাবেন তালা দিয়ে চাবিটা বাবাজীর কাছে রেখে যাবেন।

রাজেন্দ্রকুমার চলিয়া গেলে দরজায় ছিট্‌কিনি দিয়া একটু দিবানিদ্রা দিয়া লইলাম। তারপর বইয়ের ব্যাগটা লইয়া সেই বইয়ের দোকানে গিয়া দেখা করিলাম। বিরাট দোকান। পাটনা শহরের সবচেয়ে বড় পুস্তকবিক্রেতা। তবে হিন্দী আর ইংরেজী বই-ই সেখানে পাওয়া যায়! বাংলা বই বিশেষ রাখে না। মালিক বলিলেন, রাখলে বিক্রি হয়, বহু বাঙালী আছেন এখানে, তবে আমরা রাখি না কারণ বাংলা জানে না আমার কর্মচারীরা। তাছাড়া ওর জন্যে আলাদা হিসেব-নিকেশ বড় ঝঞ্ঝাট। অন্য আরো সব বইয়ের দোকান আছে, তাঁরা বাংলা বই বিক্রি করেন।

তবু আমি বইগুলি স্যুটকেস হইতে বাহির করিয়া মালিকের সামনে রাখিতে তাঁর চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বাঃ, কি সুন্দর গেট্‌-আপ! আমাদের হিন্দী-উপন্যাস তো এরকমের ছাপা দেখিনি!

বলিলাম, রাখুন না যদি পছন্দ হয়ে থাকে।

একে একে বই বাছিতে বাছিতে প্রায় আমার স্যুটকেসটা শূন্য! তিনি বলিলেন, এইগুলো সব মেমো করে দিন।

উপন্যাস, প্রবন্ধ, শিশুসাহিত্য যা কিছু ছিল প্রায় সবই নিলেন। তারপর আমায় বলিলেন, রাজেন্দ্রকুমারের সঙ্গে আপনার কি আগে জানাশোনা ছিল?

বলিলাম, না। কেন বলুন তো?

সে কি, উনি কলেজ যাবার সময় বলে গেলেন, আপনার কাছ থেকে বইপত্র রাখার জন্যে! এই বলিয়া আমার মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলিয়া বলিলেন, জানেন উনি কত বড়লোকের ছেলে, রহিস আদমি! বিরাট জমিদার ওঁর বাবা। আমাদের বিহারে এত বড় জমিদার খুব কম আছে। বাড়ির ফটকে হাতী বাঁধা, লোকলস্কর সিপাই বরকন্দাজ যে কত তার সীমা নেই। রাজেন্দ্রকুমার বাপের একমাত্র ছেলে। তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, ও সব চেয়ে ছোট। ল'টা পাস করে ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেতে যাবেন, এই ওর বাবার ইচ্ছা। এত বড় জমিদারী—তার কত মামলা-মোকদ্দমা!

আমি তো শুনিয়া হতবাক। এত বড় জমিদারের ছেলে কিন্তু কোথাও বাইরে তার কোন প্রকাশ নাই। একেবারে সাধারণ মানুষের মত, ওই পাইস্‌ হোটেলে খায় আর তার ওপরের ঘরে থাকে আরো সব ছাত্রদের সঙ্গে। এমন বিনয়ী ও ভদ্র ধনীর সন্তান আর কখনো দেখি নাই।

সেদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিয়া প্রথমেই রাজেন্দ্রকুমারের হাত দুটো ধরিয়া

বলিলাম, আপনাকে চিনতে পারিনি, আপনার পরিচয় জানতুম না, তাই কিছু মনে করবেন না ভাই! আমি আপনার কাছে নেহাতই সামান্য ব্যক্তি!

দেখুন এসব কথা আমি পছন্দ করি না। মানুষ সব সমান। ভাগ্যক্রমে আমি জমিদার ঘরে জন্মেছি—আপনি তা পারেন নি!

ব্যস, এরপর ক্রমশই আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। একই ঘরে তার সঙ্গে থাকি, অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘরে তার সহপাঠীরা আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া কলিকাতার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করে। কেউ বলে, আপনি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন? কেউ বা বলে উদয়শংকরের নাচের কথা। কেউ বা সিনেমার কথা তোলে। ভাই, আপনারা কলকাতায় বেশ আছেন। যা কিছু ভাল, যা কিছু শ্রেষ্ঠ সব কিছুই আস্বাদ করতে পারেন। আমরা হতভাগ্য জীব!

বলিলাম, কেন, কলকাতা তো কাছেই। গেলেই পারেন—কত হোটেল, থাকার জায়গা। ছুটি কাটাতে দু'চার দিন থেকে আসতে পারেন!

আড্ডায় মজিয়া গিয়া রাজেন্দ্রকুমার একদিন বলিয়া ওঠে, দাদা, কাননবালার মত অভিনেত্রী ভারতবর্ষে আর দুটি নেই বলে আমার বিশ্বাস। ওঃ, 'মুক্তি' ছবিতে যা অভিনয় করেছেন, সত্যি বলছি এক মাস রাত্রে ঘুমোতে পারিনি!

এই বলিয়া একটু থামিয়া আবার বলিল, আমার বড্ড ইচ্ছা একবার কাননবালার সামনে বসে তাঁর মুখের গান শুনি। এর জন্যে যদি বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করতে হয় তাতেও রাজী। দাদা, আপনাকে একটু ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আমি আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবো। আপনার সঙ্গে নিশ্চয় পরিচয় আছে কাননবালার!

একটু ঢোঁক গিলিয়া সত্য চাপিয়া বলিলাম, আছে ঠিকই, কিন্তু এখন তিনি এত বড় হয়ে গিয়েছেন যে আমার মত সামান্য ব্যক্তির কথা কি আর মনে আছে! রাজেই ও কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়—আগেই বলে দিচ্ছি।

আপনি কলকাতার মানুষ, আপনি ইচ্ছা করলেই সবই পারেন।

মুস্কিল ওই সব ছেলে-ছোকরাদের ধারণা, যেহেতু আমি কলকাতার মানুষ এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির কারবারী, আমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, উদয়শঙ্কর, শিশির ভাদুড়ী, কাননবালা হইতে তাবৎ বিশিষ্ট ব্যক্তি সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে! আমি ইচ্ছা করিয়া তাহাদের এড়াইতে চাহি!

কয়েকদিন পরে দেখি, রাজেন্দ্রকুমার ও তার বন্ধুরা সবাই আমায় মাস্টারবাবু বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছে।

বলিলাম, আমি তো মাস্টারি করি নাই কখনো, তবে মাস্টারবাবু বলেন কেন আপনারা? আমার তো একটা পৈতৃক নাম আছে!

রাজেন্দ্রকুমার হাসিয়া উঠিল।—সে তো একটা নাম মাত্র, কিন্তু আপনি যে সব সাবজেক্ট-এ মাস্টার—যা জিজ্ঞেস করি, দেখি কি অসাধারণ জ্ঞান, যেন জ্ঞানের ভাণ্ডারী! নাচ, গান, থিয়েটার, সাহিত্য, শিল্প যে কোন কথাই তুলি দেখি

সুন্দরভাবে কেমন বুঝিয়ে দেন ! তাই আমরা আপনাকে এখন থেকে ওই নামেই ডাকবো, রাগ করবেন না যেন।

হাসিয়া বলিলাম, রাগ করবো কেন ? হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর গল্পটা জানেন না ! যেমন মাস্টার তেমনি ছাত্র !

না না, ও বললে শুনবো কেন ? আপনি দিনরাত তো বইয়ের জগতে বিচরণ করছেন, আপনার জ্ঞান কি সোজা !

আবার হাসিলাম, 'নিরণ্য পাদপ দেশে এরণ্ডেব দ্রুমায়তে'—জানেন তো এর মানে কি ? যেখানে কোন গাছ নেই সেখানে ভেরেণ্ডা গাছই বনস্পতির তুল্য ।

এক এক সময় মনে হইত চিন্ময়ের কাছে গিয়া এইসব বলিয়া তার সেই অপমানের জ্বালা মিটাই। কিন্তু তাও পারিতাম না—আমার আত্মসম্মানে যেন আঘাত লাগিত।

কিন্তু কি জানি কেন, তারপর হইতে মনটা যেন আর এখানে টিকিতেছিল না, কলিকাতার এই দূষিত পরিবেশ ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইবার জন্য মনটা আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কোথায় যাইব ? বৌদির কথা সব প্রথম মনে হইলেও, সে পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ, মামারবাড়িতেও ওই একই কারণে যাইবার মুখ নাই। আর দেশে জ্যাঠাইমার কাছে যাইবার কথা চিন্তা করিতে ভয় হয়। তাঁর ধারণা আমি ব্যবসা করিয়া খুব যেমন উপার্জন করিতেছি, তেমনি বদখেয়ালীতে সব উড়াইয়া দিতেছি। জ্যাঠাইমাকে পাছে কিছু দিতে হয়, সেই ভয়ে বাড়ি যাই না।

মনে আছে এর আগে জেঠাইমার অসুখের সংবাদ পাইয়া যখন দেশে গিয়াছিলাম, তিনি এক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে কন্যাসমেত আমার সামনে আনিয়া হাজির করিয়াছিলেন। তারপর আমি একেবারে না করিয়া দিলে কন্যার পিতা কেবল অনুনয় বিনয় নয়, দু'হাত ধরিয়া মেয়েদের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন। মেয়ের চোখেও জল লক্ষ্য করিলাম। বলিলেন, তুমি যদি না বিয়ে করতে পারো তো তোমার পরিচিত শহরে তো অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, তাহলে তাদের কারো সঙ্গে যোগাযোগ করে দাও আমি চিরদিন তোমার কাছে ঋণী থাকবো। শেষে বলিলেন, দোজবোরে হলেও ক্ষতি নাই, শুধু দুটো খেতে পরতে দিলেই যথেষ্ট, তার বেশি কিছু চাই না।

দোজবোরের কথা কানে যাইতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল দেবুদার কথা। বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বড়। কিন্তু বন্ধুর মত ইয়ারকি মারিতে লজ্জা বোধ করি না। এক সঙ্গে সিগারেট খাইতাম। আমার একজন ধনী সহপাঠীর এক মামাতো ভাই। বাপের একমাত্র ছেলে, কিন্তু বিয়ে হয় নাই, বাপের অবস্থা ভাল, খাওয়াপরার কষ্ট কখনই হইবে না, যদিও বেকার। যা হোক সেখানেই আমার চেষ্টায় অবশেষে সেই ভদ্রলোক কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন। যাক সেসব অবান্তর কথা !

মোদ্দা আমি যখন ভাবিতেছিলাম অন্য কোথাও চলিয়া যাইবার কথা ঠিক সেই সময় দৈবপ্রেরিতের মত একদিন যে কোম্পানীর বই লইয়া আমি কাজ করি, সেখানে হিসাবনিকাশ মিটাইতে গেলে একখানি খামের চিঠি মালিক আমার হাতে তুলিয়া দিলেন, বলিলেন, দিন-চারেক আগে এসেছে। পড়ে আছে।

আমার সব চিঠিপত্র এইভাবে তাঁর ঠিকানায় আসিত। আমি এক এক সময় সেখানে গিয়া লইয়া আসিতাম।

চিঠিখানা পড়িয়া আমি স্তম্ভিত। রাজেন্দ্রকুমার লিখিয়াছে, আমি যেন এই মুহূর্তে তার সঙ্গে দেখা করি। জরুরী প্রয়োজন।

রাজেন্দ্রকুমারের আমার সঙ্গে কি এত জরুরী কাজ থাকিতে পারে, ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। এবং পথেই মনস্থির করিয়া ফেলিলাম। রাত্রের ট্রেনে চাপিয়া পরদিন সকালে তার সঙ্গে গিয়া দেখা করিতেই সে বলিয়া উঠিল, এই যে মাস্টার সাহেব, আপনি এসেছেন! আমি আপনার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

কেন, কি ব্যাপার ভাই? জিজ্ঞাসা করিতে সে যা বলিল তা শুনিয়া আমি হতভম্ব। অর্থাৎ তার বাবা কিছুদিন হইল মারা গিয়াছেন, সে মৃত্যু স্বাভাবিক বলিয়া ঘোষিত হইলেও তার পিছনে ছিল দুশমন ম্যানেজারের কারসাজি। প্রায় এক লাখ টাকার মত হিসাব সেই ধূর্ত ম্যানেজার দিতে না পারিয়া—তার পিতার চরিত্র খারাপ ছিল, তাঁর জন্য মদ-মেয়েমানুষে সব খরচ করিয়াছে বলিয়া মিথ্যা জাল সই দেখাইয়া পুলিসের কাছে রেহাই পাইলেও, রাজেন্দ্রকুমার তাকে কেবল দূর করিয়া দেয় নাই, তার যত অনুচর সবাইকে তাড়াইয়া দিয়াছে। এখন জমিদারীর অবস্থা শোচনীয়। হাল ধরিবার মত উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে, যে যেভাবে পারে লুটিয়াপুটিয়া খাইতেছে। তাই তার ইচ্ছা, এই ম্যানেজারের দায়িত্ব যাহাতে আমি গ্রহণ করি। আমার হাত দুটি ধরিয়া গাঢ়স্বরে সে আমায় বলিল, মাস্টারবাবু, বলুন রাজী আছেন?

বলিলাম, ভাই, আমি তো এসব কাজ কিছু জানি না, তবু এ দায়িত্ব তুমি জেনে শুনে আমায় দিতে চাও কেন ভাই?

মাস্টারবাবু, শুধু আপনার মত শিক্ষিত ভদ্র প্রকৃতির মানুষ চাই, তাহলেই সব সোজা হয়ে যাবে দেখবেন। আমাদের দেশ বাড়িঘর আপনার খুব ভাল লাগবে। এমন সুন্দর প্রকৃতির পরিবেশ যে দেখলে ভুলতে পারবেন না। চারিদিকে ছোট ছোট পাহাড়, বনজঙ্গল, নদী। পাহাড়ের মাথা থেকে দূরে হিমালয়ের তুষারশৃঙ্গও দেখা যায়। চলুন মাস্টারবাবু, আজই আমরা রওনা হই।

এরপর আর না বলিতে পারিলাম না। কিন্তু পরদিন প্রায় অপরাহ্ণবেলায় সেখানে পেঁাছিয়া চোখ ধাঁধিয়া গেল। যেমন বিরাট জমিদারবাড়ি তেমনি বিরাট ফটক, সেখানে হাতী বাঁধা। ভিতরে ঢুকিয়া বিস্ময়ের উপর আরো বিস্ময় বাড়িয়া গেল। সুসজ্জিত হাতী আমাদের লইয়া যাইবার জন্য নদীর ঘাটে অপেক্ষা

করিতেছিল। আমরা দুইজনে তাহাতে চাপিয়া সেই বিরাট ফটকের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিলে শাঁখ বাজিয়া উঠিল। তারপর রাজেন্দ্রকুমার আমাকে লইয়া গিয়া যে মহলে ঢুকিল, তাহা দেখিয়া আমার চক্ষুস্থির। গরীবের ছেলে, কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে জীবনের ধারা এইভাবে কোথা হইতে আমায় এখানে লইয়া আসিবে!

যাহোক্ মনে মনে ভগবানকে বলিলাম, এ আমায় কি নতুন পরীক্ষায় ফেললে প্রভু।

পরদিন সকালে ঠাকুরঘরে যখন শাঁখঘণ্টা বাজাইয়া গৃহদেবতার পূজা হইতেছিল, তখন আমাকে লইয়া রাজেন্দ্রকুমার সেখানে গেল। তারপর পূজা শেষ হইলে পুরোহিত মশাই মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে ফুল বিল্বপত্র চন্দন আমার মাথায় দিয়া আশীর্বাদ করিলে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

ঠিক সেই মুহূর্তে পিছনের দরজার পর্দাটা সরিয়া গেল। আমি চাহিয়া দেখি এক ফর্সা বিরাটকায় মহিলা, পরনে ধবধবে সাদা গরদের থান, গলায় মোটা সোনার চেনের হার, একমাথা সাদা চুল লইয়া ঠাকুরের মূর্তির দিকে তাকাইয়া আছেন। তাঁর হাতে জপের মালা।

রাজেন্দ্র বলিল, আমার মা।

তাঁর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে, তিনি মালাটা আমার মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন, সত্য ও ধর্মের পথে সব সময় চলবে বাবা—এই ঠাকুরের সামনে এই প্রতিজ্ঞা করো। আশীর্বাদ করি ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন।

বলিলাম, মা, আমি কিছু জানি না, ঠাকুর যা করাবেন তাই করবো। আবার প্রণাম করিলাম।

॥ সতেরো ॥

পরদিন রাজেন্দ্রকুমার নিজে আমাকে লইয়া পৌঁছাইতে আসিল আমার বাসস্থানে, অর্থাৎ ম্যানেজারের কোয়ার্টার-এ। জমিদারবাড়ি হইতে বেশ দূরে—বোধ হয় বারো-তেরো মাইলের কম নয়। হাতী ও তাজা ঘোড়া জোতা সুদৃশ্য টাঙা গাড়ি প্রস্তুত দুই-ই।

রাজেন্দ্রকুমার বলিল, মাস্টার সাহেব কিসে যাবেন বলুন?

বলিলাম, হাতীতে আসার সময় খুব 'এন্জয়' করেছি। ভাই, এত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য তোমাদের এদিকে আগে জানতুম না। হাতীর ওপর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বেশ মজা লাগে, মনে হয় যেন একটা চলন্ত পাহাড় থেকে দেখছি!

তাহলে চলুন, হাতীতেই যাওয়া যাক।

মাহুত হাতীটা লইয়া আসিতে, পা মুড়িয়া সে বসিয়া পড়িল। আমরা তার

পিঠে সুদৃশ্য মখমলের গদিমোড়া ও তাকিয়া দেওয়া হাওদায় মাথায় উপরে পাল্কীর মত রেশমী পর্দার ঝালর দোলানো আসনে পাশাপাশি উঠিয়া বসিলাম। হাতী চলিতে শুরু করিলে, রাজেন্দ্রকুমার বলিল, আরো অনেক ভাল ভাল দৃশ্য যাবার পথে দেখতে পাবেন।

কথাটা মিথ্যা নয়। কত বিচিত্র গাছপালা, বনজঙ্গল, আঁকা-বাঁকা পথ। চড়াই উৎরাই, দেহাতী গাঁ, ক্ষেতখামার, পর্ণকুটীর, মজা খালের পুরোন সাঁকো প্রভৃতি পার হইয়া আসিলাম। সব কিছুই যেন নতুন ছবির মত আকর্ষণ করে, আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকি।

সিনেমার ছবির মত দৃশ্যের পর দৃশ্য চোখের পর্দায় ফুটিয়া ওঠে। হাতী যে ওই বিরাট কলেবর লইয়া দ্রুত বনজঙ্গলের ভিতর দিয়া হাঁটিতে পারে, ভাবিতে পারা যায় না।

অনেকক্ষণ এইভাবে চলিবার পর হঠাৎ এমন এক সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম যে রাজেন্দ্রকুমারকে বলিলাম, হাতীটাকে একটু দাঁড় করাইতে। যেন চোখ ফেরানো যায় না! মনোরম সে দৃশ্য! এক জায়গায় কয়েকটা ছোট পাহাড়. মাথায় বুকে গায়ে কত রকমের গাছগাছালি। কোনটায় ফুল ফুটিয়াছে। কাহারো বা কেবল পাতার বাহার রং-বেরঙের। সবচেয়ে সুন্দর নিচে ওই যে লেকের মত জলাশয়—তার স্থির জলের ওপর পাহাড় ও গাছপালার প্রতিবিম্ব, যেন কাঁচে-বাঁধানো একখানি ছবি মনে হয়।

বিউটিফুল! বলিয়া উচ্ছ্বাস করিতে রাজেন্দ্রকুমার কহিল, এর চেয়ে আরো ভাল দেখতে পাবেন, আরো খানিকটা গেলে। অবশ্য আর বেশি পথও নেই আমাদের।

সত্যি এর পর যত যাই, মনে হয় যেন এ জায়গাটার তুলনা হয় না। এই ভাবে আরো কিছুটা যাইবার পর, একটি উঁচু টিলার উপরে একটি টালির সুন্দর বাংলো এবং টিলার সারা গায়ে এখানে ওখানে ফুলগাছের ঝোপঝাড় লতাকুঞ্জ দেখিয়া বলিলাম, বাঃ, কি সুন্দর বাংলোটা! ভারী আর্টিস্টিক্! তা এটা নিশ্চয় কোন সাহেবসুবোর হবে, না রাজেন্দ্র?

সাহেবের কথা আপনার মনে হলো কেন মাস্টার সাহেব?

বলিলাম, তোমাদের এদিকে পাটনা ও ভাগলপুরে দেখেছি এইরকম দিশী খোলার চালওলা বড় বড় বাংলোতে সব সাহেবসুবো, উচ্চপদস্থ, ইংরেজ কর্মচারী থাকে। বাস্তবিক ওই একটা জাত বটে। ইংরেজদের সৌন্দর্যবোধের তুলনা হয় না। যেখানেই দেখবে সুন্দর কোন প্রাকৃতিক পরিবেশ, ওরা ঠিক আছে সেখানে। তুমি যাই বলো ভাই, এটা স্বীকার করতেই হবে! 'ব্রিটিশ এণ্ড বেস্ট!' সাধে কি বলে ওদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্য জাত!

আপনার কি ওটা খুব ভাল লাগছে মাস্টার সাহেব?

বলিলাম, হাঁ। কেন, তোমার চোখে কি ভাল লাগছে না?

সে চুপ করিয়া রহিল। আমি হাসিয়া ফেলিলাম। জানো, রাজেন্দ্র, বিলিতী বইয়ে ছেলেবেলা থেকে এমনি সব টালির বাংলো আর তার চারিপাশে ফুলের বাগান উঁচু পাহাড়ী জায়গায় দেখে মনে মনে ভাবতুম, এরকম বাড়িতে যারা বাস করে তাদের জীবন ধন্য!

এরই মধ্যে হাতীটা দ্রুতপায়ে কখন যে সেই বাংলোটার বাগানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল বুঝিতে পারি নাই। সহসা যেন ছুটিয়া একেবারে সেই টিলার উপর উঠিয়া বাংলোটার সামনে আসিয়া হাতীটা দাঁড়াইয়া গেল। রাজেন্দ্রকুমার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া পড়িয়া কহিল, নেমে আসুন মাস্টার সাহেব!

এখানে কেন ভাই?

বলছি, চলুন আগে! বলিয়া আমায় লইয়া সেই বাড়িটার বারান্দায় উঠিল চতুর্দিকে তাকাইয়া বলিলাম, বাঃ ফাইন, কি চমৎকার দৃশ্য, দূরে ছোট ছোট অসংখ্য চালাঘর গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে।

এবার কাঁচের দরজায় যে মখমলের পর্দাটা ঝুলিতেছিল, উহা সরাইয়া ভিতরে ঢুকিতে আরো চমক লাগিল। একেবারে বিলিতী ধরনে সাজানো, কার্পেট, সোফা কাউচ, দেওয়ালে বড় বড় বিলিতী ছবি, তার মধ্যে পঞ্চম জর্জ ও কুইন্ ভিক্টোরিয়ার দুখানি ছবি সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো—সবচেয়ে বড় যদিও খুব পুরনো, দেখিলেই বোঝা যায়। মাথার উপরে লম্বা সাইজের বড় টানা পাখা ঝুলিতেছিল। আমরা সোফায় বসিতেই লম্বা দড়ি টানিয়া বাহিরে বসিয়া দুটি ছেলে আমাদের হাওয়া করিতে লাগিল। মাথার উপর সেই টানা পাখাটা পেণ্ডুলামের মত এদিক ওদিকে দুলিতে লাগিল। টানা পাখা আগে কখনো দেখি নাই। কলিকাতায় ঘরে ঘরে ইলেকট্রিক পাখা। এখানে বিহারের এই সুদূর পল্লীতে বনজঙ্গলভরা গাঁয়ে তা কল্পনাতীত! এখানে কেরাসিনের আলো আর হাতপাখা তালপাতার। সুন্দর হাওয়া হয় এই টানা পাখায়। বরং ইলেকট্রিক পাখার চেয়ে আরো আরামদায়ক মধুর লাগে! মিনিটকয়েক পরেই চা আসিয়া গেল। সুন্দর দামী ট্রেতে টীপট্ সমেত! মনে মনে ভাবিলাম, নিশ্চয় পথের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য কুমার এখানে একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়াছে! কিন্তু এ কার বাড়ি? তাই চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়া রাজেন্দ্রকে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই, এ বাংলো যাঁর সেই গৃহস্বামীকে তো এখনো দেখলুম না! বাড়িতে তো চাকর-বাকর লোকজন দেখছি অনেক, মালিক বুঝি অনুপস্থিত?

রাজেন্দ্রকুমার চায়ে চুমুক দিতেছিল। পেয়ালাটা মুখ হইতে সরাইয়া কহিল, দেখেননি?

বলিলাম, কে, না তো? কোথায়?

ঈষৎ হাসি ঠোঁটের কোণে চাপিয়া রাজেন্দ্রকুমার জবাব দিল, এই তো আমার সামনে বসে যিনি চা খাচ্ছেন!

এঁ্যা! চমকিয়া উঠিলাম। সত্যি, কি বলছো তুমি?

হ্যাঁ, মাস্টার সাহেব, সত্যি। আগে জানাইনি, যদি আপনার পছন্দ না হয় তখন অন্য বাড়ির ব্যবস্থা করবো। কিন্তু দূর থেকে বাংলোটা দেখে যখন আপনি এত উচ্ছ্বাস করলেন, তখন ভাবলুম আপনাকে আরো চমক দেবো। একেবারে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বলবো। সত্যি, আপনার মত কলকাতার শহরবাসীর কাছে এ জায়গা ও এই বাংলো যে এত ভাল লাগবে তা ভাবিনি। মনে মনে একটু সন্দেহ ছিল।

মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এ কি সত্যি, না আমি স্বপ্ন দেখছি! নইলে কল্পনা এমনিভাবে কি বাস্তবে পরিণত হতে পারে? কি জানি? বোধ হয় এরই নাম—"পুরুষস্য ভাগ্যম্—দেবাঃ ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যাঃ"—দেবতারাই জানে না, তো মানুষ কোন্ ছার!

রাজেন্দ্রকুমার বলিল, তবে আপনি ঠিকই বলেছেন, সাহেবসুবোদের জন্যেই এটা তৈরি হয়েছিল। আমার ঠাকুরদাদা দুর্দান্তপ্রতাপ জমিদার ছিলেন। তিনি লেখাপড়া বেশি না শিখলেও ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিস-সুপারিনটেন্ডেন্ট, কমিশনার সাহেব প্রভৃতির সঙ্গে খুব দোস্তী ছিল। তাঁদের নিয়ে শিকার, পার্টি, মাইফেল, নাচগান, খানাপিনা প্রভৃতি প্রায়ই চালাতেন এখানে। আমার বাবা কিন্তু এই সাহেব-তোষণ মনে মনে অপছন্দ করতেন। কিন্তু ঠাকুর্দা তাঁকে বোঝাতেন, ইংরেজ রাজা, তাকে যত তুষ্ট রাখতে পারবে তোমার জমিদারীতে তত প্রতাপ খাটাতে পারবে। ঠাকুরদাকে প্রজারা তাই যমের মত ভয় করতো। বাবাকে কিন্তু প্রজারা খুব ভালবাসতো। তিনি ঠাকুরদার মত প্রজা ঠেঙিয়ে, ঘরদোর জ্বালিয়ে কখনো তাদের উদ্‌ব্যস্ত করেননি। তিনি ছিলেন একেবারে তাঁর বিপরীত চরিত্রের। তাই ঠাকুরদার মৃত্যুর পর তিনি এ বাংলোটাকে ম্যানেজারের বাংলো করে দেন। তিনি বলেন, ম্যানেজার হলো জমিদারের প্রতিনিধি। এক কথায় জমিদারী সত্যিকারের পরিচালনা করেন তিনি-ই। জমিদার শুধু নামে—সইসাবুদ করেন কাগজপত্রে। তাই বাবার মত এই যে, জমিদারের যেমন আভিজাত্য ও সম্মান, তাঁর ম্যানেজারেরও ঠিক সেই রকম থাকা উচিত।

একটু থেমে বলিল, চলুন আপনাকে বাড়ির ভেতরটা দেখাই।

সত্যি, ভিতরে গিয়া বিস্ময় আরো বাড়িয়া গেল। প্রায় সবই বিলিতী ধরনে তৈরি। শ্বেত-পাথরের মেঝে সব ঘরে, তিনখানি সুসজ্জিত শোবার ঘর, ডাইনিং হল। বাথরুমে দাঁড়ানো দেওয়াল জোড়া-আয়না, বাথ্‌টব্ তার সঙ্গে, ঠাণ্ডা জলের গরম কল লাগানো। শ্বেতপাথরের চৌকি বসিয়া স্নান করার জন্য, এ ছাড়া পৃথক একটা পাথরের টেবিল—বসিয়া সাবান বা তেল মাখার জন্য, কাপড়চোপড় রাখার সুন্দর আলনা। ভেতরে টানা বারান্দা, তার সামনেই ফুলের গাছে নানা-রকমের ফুল ফুটিয়া আছে। এ ছাড়া রান্নার জায়গা, চাকরবাকর, মালী, ঘোড়ার আস্তাবল, টাঙা, গোয়াল, মুরগীর ঘর সব আশেপাশে নিচের দিকে ছড়ানো।

রাজেন্দ্রকুমার ঘরের ভিতর আসিয়া আবার ড্রয়িংরুমে বসিয়া বলিল, মাস্টার

সাহেব, এখানের যা কিছু সব-ই আপনার সেবার জন্য। বলিতে বলিতে হাঁক দিল, আরে এ মাহাতো—

জী সরকার! বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে এক বলিষ্ঠ চেহারার দেহাতী প্রৌঢ় ঘরে ঢুকিয়া দু হাত কপালে ঠেকাইয়া ঘাড়টা যতদূর পর্যন্ত নীচু করা যায়, হেঁট হইয়া রাজেন্দ্রকে ও আমাকে প্রণাম জানাইল।

তাহাকে রাজেন্দ্র বলিল, ইনিই আমাদের নতুন ম্যানেজার সাহেব, আজ থেকে এখানে থাকবেন। ওঁর সেবার যেন কোন ত্রুটি হয় না দেখবে!

নেহি, জী সরকার। বলিয়া আবার তেমনি আগের মত ভঙ্গিতে নমস্কার করিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম কি?

হুজুর, গঙ্গা মাহাতো। দু' হাত জুড়িয়া উত্তর দিল।

তোমার ঘর, মুলুক কোথায়?

জী সরকার নজদিক্‌সে, বালিয়া জেলায়।

রাজেন্দ্র কহিল, আচ্ছা যাও, এখন বাবুর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলো গে বাবাজীকে।

দু' পা গিয়া, থমকিয়া দাঁড়াইয়া গঙ্গা মাহাতো জিজ্ঞাসা করিল, হুজুর তো মুরগী খান?

হাঁ-হাঁ, মুরগী, ডিম, মাছ, মাংস সব খান। সে চলিয়া গেলে রাজেন্দ্র বলিল, এই লোকটাকে দেখে বোঝা যায় না। দুর্দান্ত সাহস আর তেমনি গায়ে ক্ষমতা। ওর বাবা ছিল বিখ্যাত ডাকাত—কেবল ওদের জেলা নয়, আশেপাশে দেহাতীরা তার নাম শুনলে ভয়ে কাঁপতো। এ এই বাংলোর ইনচার্জ। আপনার সেবা ও দেখভাল্ করার যা কিছু সব এই মাহাতো করবে। আপনি শুধু হুকুম করবেন, ব্যস্। অবশ্য তা করার দরকার হবে না—ও একেবারে 'ওয়েল-ট্রেন্‌ড্'। ভোরের চা থেকে যখন যা কিছু দরকার সব জানে—আপনি নতুন, একদিন বলে দিলেই হলো! এ বাংলোর যত নোকর লোকলস্কর সব ওকে ভয় করে এবং ওর কথায় চলে। আপনার এতটুকু অসুবিধে হবে বলে মনে করি না তাই।

বলিলাম, রাজেন্দ্র ভাই, তুমি এত কুণ্ঠাবোধ করছো কেন, আমি গরীবের ছেলে, আমার কাছে এ তো স্বর্গবাসের সমান!

একটু পরেই কাছারী হইতে নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি সব কর্মচারীরা আসিয়া আমাকে নমস্কার করিল। খবর তাহারা আগেই পাইয়াছিল। রাজেন্দ্র আমার সঙ্গে তাদের পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল, নায়েববাবু, আমাকে কালই পাটনায় রওনা হতে হবে। সামনেই পরীক্ষা! তাই মা পুরোহিতকে দিয়ে ভাল দিনক্ষণ দেখে ম্যানেজারবাবুর অভিষেকের দিনটা বলে পাঠাবেন, সেইমত আপনি সব ব্যবস্থা করবেন। যাতে সব প্রজারা এই 'পুণ্যাহ' উৎসবে যোগ দিতে পারে, আগে থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে খবর ভেজে দেবেন।

হাঁ হুজুর, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না—সব ঠিক মত হয়ে যাবে। আপনি খবর পাবেন।

ওরা সব চলিয়া গেলে, রাজেন্দ্রকুমার বাড়ি ফিরিয়া যাইবার পূর্বে বলিল, মাস্টার সাহেব, আমাদের কতগুলো প্রাচীন কুলপ্রথা আছে, জানি তা অর্থহীন কুসংস্কার, আপনার রুচিপ্রদ হবে না! তবু আপনাকে সেগুলো মেনে চলতে অনুরোধ করছি—যাতে মা মনে এতটুকু আঘাত না পান।

তুমি নিশ্চিত থাকো ভাই, যে পুজোর যে মন্ত্র জানি। তাছাড়া ভুলে যেয়ো না—আমি ক্রীশ্চানও নই, মুসলমানও নই।

তা জানি। আপনি শিক্ষিত ও কলকাতার শহরে থাকলেও, ঠাকুর-দেবতার প্রতি আপনার ভক্তিশ্রদ্ধার অভাব নেই।

বলিলাম, হাঁ, এদিক থেকে আমি যাকে বলে গোঁড়া, হিন্দুদের ষষ্ঠীপুজো থেকে দুর্গাপুজো সব কিছু আমার ভাল লাগে। সত্যি বলতে কি আমাদের যা কিছু পালপার্বণ, বার ব্রত উৎসব সব আমার কাছে প্রিয়। নিজে অংশ গ্রহণ করতে না পারলেও কেউ করছে দেখলে পূর্বপুরুষের রক্ত যেন আমার প্রতিটি লোহিত-কণায় আনন্দের ঢেউ তোলে। কেউ জানে না কাউকে বলিনি, তুমি বিশ্বাস করো ভাই আমি হিন্দু এবং এই ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মেছি, এই পরিচয়টাই আমার কাছে সবচেয়ে বড়।

এক্সকিউজ মি, আমি আপনার কথাবার্তা থেকে সেটা আগেই বুঝেছিলুম—তাই আমি যা বলেছি তার জন্যে ক্ষমা করুন।

আরে না-না, কিছু নয়! তুমি জমিদার হিসেবে তোমার কর্তব্য করেছো, আমি তোমার ম্যানেজার যখন হয়েছি তখন আমাকে নিশ্চয় এগুলো বলে দেওয়া তোমার প্রয়োজন। পাছে কোন ভুলভ্রান্তি না করে বসি।

হাঁ মাস্টার সাহেব, আমাদের জমিদারবংশের মানমর্যাদা সম্মান আভিজাত্য বলতে যা কিছু সব এখন থেকে আপনার হাতে কেবল নয়, আপনিই তার একমাত্র রক্ষক, এটা তো বুঝতেই পারছেন।

কিন্তু আমার কোন দোষ নেই ভাই, এ লাইনের আমি কিছুই জানি না—'র', একেবারে আনাড়ী—তুমিই আমায় জোর করে ধরে এনে এই সিংহাসনে বসিয়েছো, এটা মনে রেখো। ময়ূর-পুচ্ছধারী সেই দাঁড়কাকের গল্পটা জান তো?

মাস্টার সাহেব, শুধু 'অনেস্টি' দরকার, আর কিছু চাই না। আপনার মত এমন সত্যিকারের ভদ্র শিক্ষিত 'অনেস্ট ইয়ংম্যান' আমি আর দেখিনি।

প্লিজ, ওসব কথা এখন রাখো ভাই। যে গুরুদায়িত্ব তুমি আমার ঘাড়ে দিয়েছ তার মর্যাদা যদি রক্ষা করতে পারি, তখন এসব বললে শোভা পায়।

আচ্ছা মাস্টার সাহেব, নমস্তে। বলিয়া আমার কাছে বিদায় লইয়া সে হাতীর পিঠে চড়িয়া চলিয়া গেলে আমি ভাবিতে লাগিলাম, সত্যি, এরকম বড়লোকের ছেলে যে এত বিনয়ী হতে পারে, কল্পনা করা যায় না। তাছাড়া তার বন্ধুপ্রীতি

দেখিয়াও অবাক হইয়াছিলাম। ওই নগণ্য হোটেলে যে সে থাকিতে পারে, ইহাও ছিল আমার ধারণার অতীত। মনে আছে, একদিন তাকে একথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে তার উত্তরে বলিয়াছিল, আমার সহপাঠী বন্ধুরা যেখানে থাকে সে জায়গার চেয়ে আমার কাছে প্রিয় আর কি হতে পারে! তাদের অবস্থা ভাল নয় বলে কি তাদের ছোট করার জন্য বড় হোটেলে আমার থাকা উচিত হতো বলুন!

ইহার পর আমি কোন জবাব দিতে পারি নাই। মনে মনে শুধু তার এই বন্ধুপ্রীতির প্রশংসা করি নাই, কলিকাতা হইলে এ অবস্থায় কোন ধনীপুত্র কি করিত তাহা ভাবিয়া লজ্জায় মুখ বন্ধ করিয়াছিলাম।

সত্যি বলিতে কি, রাজেন্দ্রকুমার যে এত ধনী আগে তা ভাবি নাই। তবু যে উহার অনুরোধে এই চাকরি লইতে রাজী হইয়াছিলাম সে শুধু ওর প্রতি আমার মনে কোথায় যেন একটা গভীর মুগ্ধতা প্রচ্ছন্ন ছিল।

যা হোক সেদিন থেকেই যেন আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হইল। ক্যানভাসার হইতে জমিদারের ম্যানেজার। পিছনের দিকে চাহিয়া আজ তাই হাসি পায়, সত্যি সত্যি ম্যানেজার মানে জমিদারের প্রতিনিধি এই কথাটার অর্থ যে কি, আগে জানিতাম না।

॥ আঠারো ॥

বাস্তবিক পক্ষে সেদিন হইতে আমার জীবনের ইতিহাসে যে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইল তাহা কেবল অভিনব নয়, অত্যাশ্চর্য বটে। কি বলিব, আমার অবস্থা অনেকটা সেই আরব্য রজনীর আবু হোসেনের গল্পের মত! এ যেন কোন্ মন্ত্রবলে রাখাল রাতারাতি রাজা হইয়া গেল। তুচ্ছ 'ক্যানভাসার' হইতে একেবারে জমিদারের ম্যানেজার! আগে ভাবিতাম ম্যানেজার মানে উচ্চতম কর্মচারী, আপিসে যেমন হেড ক্লার্ক, কিন্তু এখানে আসিয়া সে ধারণা সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। জমিদারের কর্মচারী হইলেও তার খাতিরসম্মান কম নহে।

সত্যি এমন ঝকঝকে বোম্বাই খাটে স্প্রিংয়ের গদিমোড়া পুরু বিছানায় নেটের মশারীর ভিতরে এর আগে যেমন কখনও শুই নাই, তেমনি শ্বেত-পাথরের টেবিলে বসিয়া গরম গরম গব্যঘৃতভাজা পুরীর সঙ্গে আলুভাজা বেগুনভাজা চিকেনকারী, একবাটি গরম ক্ষীর ও দুটো কাঁসাকাঁদ সন্দেশও আগে কখনও খাই নাই।

সেসব দিনের কথা মনে পড়িলে এখন হাসি পায়! ওই সুন্দর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়া যেন ঘুম আসিত না।

সে এক অদ্ভুত অনুভূতি! ওইরকম সুখাদ্যও জীবনে আগে খাই নাই। প্রথম দিন রাত্রে মনে আছে খাওয়ার পর পাচক আসিয়া তার রান্না, হুজুরের মুখে কেমন লাগিল জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে বলিলাম, চমৎকার রান্না করেছ বাবাজী। মুরগী তুমি এত সুন্দর রাঁধতে শিখলে কেমন করে? তোমরা তো বিহারী ব্রাহ্মণ,

মাছমাংসও খাও না শুনেছি।

সে হাত জোড় করিয়া বলিল, হুজুর যা শুনেছেন তা ঠিকই। তবে আমি বিহারী নই বাঙালী, বর্ধমান জেলায় পেঁড়োয় এখনও আমাদের পৈতৃক ভিটে আছে। লেখাপড়া শিখিনি, পেটের জ্বালায় দেশ ছেড়েছি। এই বিহারেই আমার আঠারো বছর কেটে গেল হুজুর! প্রথমে পাটনায় একটা চালের গুদামে চাকরি করতুম, তাতে যা পেতুম দু'বেলা খেয়ে আর কাপড়জামা কেনার পয়সা থাকতো না। শেষে একদিন সে কাজ ছেড়ে দিলুম! ব্রাহ্মণের ছেলে, গলায় পৈতেটা ছিল। সেটা দেখিয়ে একদিন পিনটু হোটেলের মালিকের কাছে দুঃখ জানালে তিনি দয়া করে চাকরি দেন। তিনি বাঙালী। সেইখানেই প্রায় সাত বছর চাকরি করেছিলুম। ভালই ছিলুম।

বলিলাম, তাই তোমার রান্না এত সুন্দর। পিনটু হোটেলে আমি খেয়েছি, পাটনা শহরের সবচেয়ে ভাল হোটেল এখন।

হাঁ, হুজুর। পাঁচ আনা পয়সায় এত সুন্দর বাঙালীর খাদ্য কেউ দেবে না।

বলিলাম, তা তুমি এখানে এলে কি করে?

আজ্ঞে আগে যিনি ম্যানেজার ছিলেন তিনি বিহারী হলেও কলকাতার শহরে লেখাপড়া শিখেছিলেন, স্কুল-কলেজে। তাই বাঙালীর নানা খানা তিনি ভয়ানক ভালবাসতেন। আগে যে বিহারী বাবাজী ছিল, তার রান্না একেবারেই রুচতো না তাঁর মুখে। তিনি একদিন পিনটু হোটেলে খেতে এসে, যে খাবার দিচ্ছিল তাকে চুপি চুপি বলেন, তোমাদের এখানে সবচেয়ে ভাল রাঁধে কে? সে আমার নামটা করে দেয়, বলে, হরিদাস—সে বাঙালী! তখন তার হাতে কিছু পয়সা গুঁজে দিয়ে চুপি চুপি আমার সঙ্গে দেখা করে বলেন, তুমি যা মাইনে পাও তার ডবল দেব, যদি আমার রান্নার কাজ করো। তাছাড়া থাকার নিজস্ব ঘরও পাবে। বাবু খুব মেজাজী ছিল হুজুর। সব কিছু তাঁর ভাল চাই।

লোকটির বড় দোষ বড্ড বেশি বকে। বলিলাম, আচ্ছা তুমি যাও হরি। তুমি যখন বাঙালী, তাছাড়া বাঙালীর হোটেলে চাকরি করেছ, তখন বাঙালী খানাই আমায় দিয়ো।

হুজুর যা হুকুম করবেন করে দেব। তবে মাছ-মাংসটাই আমি ভাল রাঁধতে শিখেছি হুজুর, আগের মনিবের কৃপায়। তিনি যদিও বিহারী, তরিতরকারী একেবারেই পছন্দ করতেন না। বলতেন, এইসব 'গ্রাস্' আমায় দিয়ো না। আমি তো গরু ছাগল নই।

এই বলিয়া দু' হাত কচলাইতে কচলাইতে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে বলিল, হুজুর যদি হুকুম করেন, কাল আপনার জন্যে মোরগমসল্লা করি।

মোরগমসল্লার নাম শুনিয়াছিলাম, বড়লোকে খায় হোটেল-রেঁস্তোরায়, সবচেয়ে দামী খাদ্য—কখনও খাই নাই, কিনিবার মত সঙ্গতিও ছিল না, তাই ওই নামটা কানে যাইবামাত্র রসনা লোলুপ হইয়া উঠিল। কিন্তু হরি যাতে বুঝিতে

না পারে, জীবনে কখনও উহার স্বাদ কিরূপ জানি না, তাই হরিকে উদাসীনভাবে প্রশ্ন করিলাম, তুমি মোরগমসলা রাঁধিতে পারো ?

আজ্ঞে হাঁ হুজুর, আপনি কলকাতার মানুষ, আপনার হয়ত ভাল লাগবে না, তবে আগের মনিব ওটা খেতে খুব ভালবাসতেন। বলতেন, আমি কলেজে পড়ার সময় কলকাতার দিলখুসা হোটেলে খেয়েছি। কিন্তু তুমি তার চেয়েও ভাল রাঁধো।

তাই নাকি ? আচ্ছা করো কাল। বলিলে সে চলিয়া যায়।

এমনিভাবে নিত্য নূতন রকমের মুরগী রাঁধিয়া যখন সে আমায় প্রশ্ন করিত, আজ কেমন হয়েছে হুজুর ? তখন সত্যিই আমি খুব মুস্কিলে পড়িতাম। যাহা কখনও খাবার সৌভাগ্য হয় নাই, তার ভালমন্দ কি বুঝি ! তবু না বুঝিয়া মান বাঁচাইবার জন্য সব দিন ভাল বলিতাম না। খুঁত কিছু একটা ধরিতাম।

দু হাত কচলাইয়া হরি বলিত, হুজুর আপনারা বড়লোক, কলকাতা শহরের বড় বড় কত হোটেলে খেয়েছেন, বুঝতেই পারেন, তাদের সঙ্গে আমি পারব কেন !

আমি বড়লোকও নই এবং কোনদিন যে বড় হোটেলের মুখ দেখি নাই, সেকথা চাপিয়া গিয়া সব সময় চাকরির খাতিরে সকলের কাছে এমন ভাব দেখাইতাম যাতে চাকরবাকর থেকে কর্মচারী সকলের চোখে আমার সেইরূপ পদমর্যাদা বজায় থাকে। রাজেন্দ্রকুমার বার বার করিয়া এই কথা বলিয়া গিয়াছে, আমার আভিজাত্য ও সম্মানের সঙ্গে স্বয়ং জমিদারের আভিজাত্য ও সম্মান জড়িত। সব সময় মনে রাখবেন যেন ম্যানেজার জমিদারের-ই প্রতিনিধি।

সত্যি, পরের দিন হইতে একেবারে জমিদারের মত ব্যবস্থা দেখিয়া আমি হতবাক ! একেবারে নূতন জীবন।

শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্বে ভৃত্য দিয়া গেল মর্নিং-টী।

তারপর গোসলখানা হইতে ফিরিয়া দেখি, টেবিলে 'ব্রেক-ফাস্ট' সাজানো। দুটি ডিমসিদ্ধ, সঙ্গে ক্রীমক্র্যাকার বিস্কুটে মাখন দেওয়া একটা প্লেট ও গরম চা। তার পাশেই আবার পৃথক প্লেটে ক্ষীরের প্যাঁড়া ও কালাকাঁদ সন্দেশ ও এক গ্লাস গরম দুধ !

স্নানের সময় বাথরুমে যাইতে দেখি, একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের সরল দেহাতী তরুণ দু'রকমের তেল লইয়া হাজির। মাথায় দিবার সুগন্ধ জবাকুসুম ও গায়ে সরষের তেল।

তেল মাখার সেই পাথরের টেবিলটায় বসিলে তরুণটি আগে আমার মাথায় গন্ধ তেল দিয়া, তারপর আমার পায়ে ও সারা গায়ে ঘষিয়া ঘষিয়া তেল মাখাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তখন কল খুলিতে দেখি একটাতে ঠাণ্ডা, একটায় গরম জল তৈরি। বাথটবে ঠাণ্ডা গরম জল মিশাইয়া প্রথমে তোয়ালে দিয়া গা হইতে তেল রগড়াইয়া তুলিয়া, তারপর বিলিতি লাক্স সাবান মাখিয়া জলভর্তি বাথটবে স্নান সারিয়া ঘরে আসিয়া জামাকাপড় বদলাইবার পর ভৃত্য আসিয়া বলিল, হুজুর,

খানা লাগায়া।

হ্যাঁ, চলো। বলিয়া খাবারঘরে গিয়া দেখি টেবিলে উৎকৃষ্ট সুগন্ধ আতপ চালের ভাত, তার সঙ্গে ছোট একটা বাটিতে গব্যঘৃত আর থালার ওপরে আলু-ভাতে, মাছভাজা ও থালার পাশে পাশে বিভিন্ন বাটিতে ডাল, মাছের ঝাল, মাছের অম্বল, দৈ, মিষ্টি ইত্যাদি সাজানো।

ভৃত্যটি সেখানে হাজির, হুজুরের যদি আরো কিছু লাগে, ছুটিয়া রান্নাঘর হইতে আনিয়া দিবার জন্য।

বলা বাহুল্য এত খাওয়া জীবনে কখনো খাই নাই। তার অর্ধেক ফেলিয়া উঠিয়া যাইতাম। একবার মনে হইল হরিকে ডাকিয়া নিষেধ করি, এত খাবার যাতে না দেয়—নষ্ট না করিতে। কিন্তু বলিতে গিয়া হঠাৎ মনে পড়িল, রাজেন্দ্র-কুমারের সতর্কবাণী। আমার সঙ্গে জমিদারের মানমর্যাদা জড়িত। অতএব গরীব ক্যানভাসারের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে। বড়লোকের অভিধানে, নষ্ট, অপচয় বলিয়া ত কোন কথা নাই!

যা হোক, উপস্থিত বেকার। কোন কাজকর্ম নাই। নরম বিছানায় একটু দিবানিদ্রা দিয়া, তারপর যথারীতি বৈকালিক চা ও জলখাবার খাইয়া যখন খাদ্য হজম করিবার জন্য আশে পাশে একটু হাঁটিতে যাইব ভাবিয়া ফটকের কাছে গিয়াছি, দারোয়ান সেলাম দিয়া বলিল, হুজুর আব্‌কো কেয়া ঘুম্‌না হ্যায়?

বলিলাম, হ্যাঁ, একটু ঘুরে বেড়িয়ে তোমাদের এদিকটা দেখে আসি!

হুজুর তব টাঙে মে যাইয়ে। আব্ কো খাস্ টাঙা হ্যায়, বোলাই?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ডাকো। বলিতে সে ছুটিয়া আস্তাবলের দিকে চলিয়া গেল।

সত্যি, ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে আমি এখন ক্যানভাসার নই! জমিদারের প্রতিনিধি! আমার পক্ষে পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে যাওয়া মানে জমিদারের সম্মানের হানি।

টাঙায় করিয়া অল্প একটু যাইবার পর সোজা একটা মেটে রাস্তা উঁচুনীচু পথে বনজঙ্গলের ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে দেখিয়া টাঙাওলাকে বলিলাম, এ পথটা কোথায় গেছে?

সে বলিল, হুজুর, ইয়ে তো স্টেশন তক্ গিয়া, অর্থাৎ রেল স্টেশন পর্যন্ত গেছে সেই রাস্তাটা।

জিজ্ঞাসা করিলাম, এখান থেকে স্টেশনটা কত দূর?

কম্‌সে কম্ সাত-আট মিল্ হোগা। অর্থাৎ কিনা কমপক্ষে সাত আট মাইল

সেদিন নৈশ ভোজনটা বেশি হইয়া গিয়াছিল।

হরি চমৎকার রাঁধিয়াছিল 'মোরগমসল্লা'। একটা গোটা ছোট মুরগী মসল ভরা। সম্পূর্ণ খাইয়া ফেলিয়াছিলাম। তার সঙ্গে গব্যঘৃতে ভাজা লুচি, তরকারী ক্ষীর ও সন্দেশ সব ছিল।

হরিকে বলিলাম, সত্যি তুমি ভাল রেঁধেছো মুরগীটা—তাই খুব বেশি খেয়ে ফেলেছি।

কিচ্ছু ভাববেন না হুজুর, এ কলকাতার কলের জল নয় যে খেলে অম্বল হয়। এখানের কুয়োর জল ভারী হজমি—দু'তিন গ্লাস খাবেন রাত্রে, ব্যস, হজম বিলকুল!

খাওয়াটা বোধ করি বেশিই হইয়াছিল এবং ঘরে গিয়া তৈরি বিছানা মশারী ফেলা দেখিয়া তখনই সুখশয্যায় আরামে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। জলতেষ্টায় মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিলে মশারী হইতে বাহির হইবামাত্র শিউরিয়া উঠিলাম। কে যেন ঘরের মধ্যে রহিয়াছে!

কোন্ হ্যায়? কে—কে ওখানে? ভয়ে কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

হুজুর, হাম পাংখাওয়ালী। নারীকণ্ঠ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বালিশের তলা হইতে টর্চটা লইয়া টিপিয়া দিতেই দেখি, এক তরুণী যুবতী ঘরের অন্ধকার কোণে বসিয়া আছে, পাখার দড়ি তার হাতে!

আলোটা চোখে পড়তেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল। উদ্ভিন্না যৌবনা! যৌবনের ঔদ্ধত্য যেন তার দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গে বাঁধন-ছেঁড়া, শাসন হারা।

কাহে তুম্ রাতমে ঘরকা অন্দরমে ঘুষা! নিকালো, বাহার যাও, আভি! ধমক দিলাম।

হুজুর, হাম্ তো রাত্ পর ডিউটি হিঁয়াই দেতা হ্যায়।

ওই যুবতীর সঙ্গে এত রাত পর্যন্ত অন্ধকারে শুইয়া ছিলাম, কথাটা চিন্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গ যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এত রাত পর্যন্ত ওরই হাতের টানা পাখার হাওয়ায় ঘুমাইয়াছি!

হুজুর, হাম্‌কো কেয়া কসুর হ্যায়—

না না, তোমার কোন অপরাধ নেই। যাও তুমি ঘর থেকে, আমার পাখার বাতাসে দরকার নেই। আর কোনদিন তুমি আমার ঘরে ঢুকবে না! বলিয়া মেয়েটিকে ঘর থেকে বার করিয়া দিয়া দরজায় খিল্ আঁটিয়া দিলাম। ঘরের এপাশে-ওপাশে ঘর ও বারান্দা। চাকর-বাকররাই বন্ধ করে, তাই নিজে উহা করিতে যাই নাই। মেয়েটাকে তাড়াইয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ইহাতে জমিদারের আভিজাত্যে ঘা লাগিল নাকি! আগের ম্যানেজারের ঘরে এইভাবে সারারাত ডিউটি দিতে সে অভ্যস্ত ছিল, নহিলে এতখানি স্পর্ধা হইবে কেন? আর কেহ আপত্তি করে নাই বা কেন?

অতঃপর তাহার স্থলে একটি পাখাটানা ছেলে বদলি হইয়াছিল, হুজুরকে রাত্রে হাওয়া দিবার জন্য।

আমার সৌভাগ্য। ভগবানের আশীর্বাদে সেই বৎসরেই জমিদারীর আয় একেবারে দ্বিগুণ হইয়া গেল। জমিদারগৃহিণী যত খুশী হইলেন, তার চতুর্গুণ হইল রাজেন্দ্রকুমার। সে বলিল, দেখলেন মাস্টার সাহেব, আপনি বলেছিলেন,

জমিদারীর কাজ কিছু জানেন না, পারবেন না। কিন্তু আমি জানতুম, আপনিই ঠিক উপযুক্ত ব্যক্তি।

তারপর বলিল, মাস্টার সাহেব, মা বলেছেন আপনার বেতন দেড়শো টাকা ছিল, এখন থেকে আড়াইশো টাকা হলো!

বলিলাম, মাকে আমার প্রণাম দিয়ো ভাই। জানি না এতে আমার যোগ্যতা কতখানি!

রাজেন্দ্রকুমার বলিল, আসলে আপনি যে নিজে প্রতিদিন বাহারীতে আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলিয়ে দেখতেন এবং যখন তখন দূর গ্রামাঞ্চলে নিজে গিয়ে প্রজাদের সঙ্গে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনে ব্যবস্থা নিতেন, তাতেই তো সবচেয়ে বড় কাজ হয়েছে!

বলিলাম, হাঁ, তা জানি। নায়েববাবু একদিন আমায় হাত কচ্‌লে বলেছিলেন, স্যার, আপনি যদি ওইভাবে চাষাভুষোগুলোর সঙ্গে এত মেলামেশা করেন, তাতে শুধু আপনার সম্মানের হানি হবে না, জমিদারেরও সম্মানহানি হবে। আর আমাদের পজিশন নষ্ট হয়ে যাবে!

রাজেন্দ্রকুমার বলিল, আমাদের কাছেও এ অভিযোগ এসেছিল। যে এনেছিল তাকে ধমক দিয়ে বলেছি, ম্যানেজার সাহেবের কাজের কোন অভিযোগ আমি কারুর কাছে শুনতে চাই না। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন করবেন—আমি তাঁকে বলে দিয়েছি!

সত্যি একটা বছর যেতে-না-যেতেই আমি যেন একটা জমিদার বনিয়া গিয়াছিলাম! যদিও নামে ম্যানেজার; কিন্তু লোকলস্কর, হাজার হাজার প্রজা থেকে শুরু করিয়া নায়েব, গোমস্তা, খাজাঞ্চী, পাইক, বেয়ারা—সবাই আমার হুকুমের দাস! তাদের কার সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করিতে হইবে, অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

॥ উনিশ ॥

বোম্বাইয়ের 'গেটওয়ে অফ্ ইণ্ডিয়া'র সামনে তাজমহল হোটেল তখন ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা অভিজাত হোটেল বলিয়া খ্যাত ছিল। সায়েবসুবোরা ও রাজা মহারাজা প্রভৃতি ধনী ব্যক্তি যাঁরাই বিলাত যাইতেন ওই হোটেলে উঠিয়া তারপর ওখান হইতে জাহাজে চাপিয়া নির্দিষ্ট দিনে রওনা হইতেন।

ব্যারিস্টারী পড়িতে যাইবার জন্য রাজেন্দ্রকুমারকে সেদিন জাহাজে উঠাইয়া দিয়া জেটিতে দাঁড়াইয়া সাহেব-মেমদের সঙ্গে আমিও রুমাল নাড়িতে নাড়িতে তাহাকে বিদায় জানাইয়া যখন হোটেলে ফিরিয়া 'লিফ্‌টের' কাছে যাইতেছি, হঠাৎ চিন্ময়ের সঙ্গে দেখা!

আরে আলোক, তুই এখানে কি করছিস? তারপর কণ্ঠে বিদ্রূপ চাপিয়া

কহিল, কি রে, এখানেও কি ক্যানভাসিং চালিয়েছিস নাকি? কৈ, তোর সে স্যুটকেসটা কোথায়?

রাগে যেন সর্বশরীর গরম হইয়া উঠিল। মনটা একে ভারাক্রান্ত। সবে রাজেন্দ্রকুমারকে বিদায় দিয়া আসিয়াছি। সে আমার মনিব নয়, আমার বন্ধুর অধিক ছিল।

এবার পকেট থেকে "ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট্"-এর একটা প্যাকেট বার করিয়া বলিল, কলকাতা থেকে আমাদের ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার পিয়ারসন সাহেব এসেছেন, আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি, চার দিন হয়ে গেল।

বলিলাম, কত নম্বর ঘরে আছিস?

একটু থেমে উত্তর দিল, ওই যে দূরে লালমতন বাড়িটা, ওটাও একটা ফার্স্ট ক্লাস হোটেল, ওর সেকেন্ড ফ্লোরে, সাতাশ নম্বর ঘরে আমি আছি।

বললাম, কেন, তুই এখানে থাকিস না?

তুই একটা গাধা, স্বয়ং সাহেব যে হোটেলে উঠেছেন সেখানে আমি থাকবো কি করে?

বললাম, ও, ভুলে গেছি তুই তো তাঁর 'ইয়োর মোস্ট্ ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট'।

চটিয়া উঠিল চিন্ময়, কোন্ শালা নয় শুনি, ইংরেজ রাজত্বে যে যত বড় চাকরিওলা হোক, সব ব্যাটাকেই দরখাস্ত করতে গেলেই ওটা লিখতে হবেই হবে। তুই ব্যাটা কোনদিন চাকরি করলি না, তোকে বলা যা, গরুকে ঘাস খাওয়ানো তা!

এই বলিয়া একটা সিগারেট মুখে ধরাইয়া বলিল, খাবি নাকি একটা?

না।

এবার একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলিল, আমি এখন সাহেবের কাছে যাচ্ছি, একটু কাজ আছে। তুই সন্ধ্যের সময় আয় না আমার ওখানে, আমার হোটেলটা দেখবি—একটু আড্ডাও দেওয়া যাবে! আর রাত্রে ডিনারটা আমার ওখানে সেরেই আসবি!

বলিলাম, না, আমার খাবার নষ্ট করতে পারবো না।

কেন এত ভয়! কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়ি উঠেছিস্ নাকি?

বলিলাম, না, আমি এখানেই আছি।

এখানেই মানে...

এই হোটেলে, চারতলার চারশো ষোল নম্বর ঘরে।

নিমেষে চিন্ময়ের মুখের ছবি পাল্টাইয়া গেল, যেন জীবনে এমন অসম্ভব কথা কখনো শোনে নাই! একসঙ্গে ঘন ঘন সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়া একটু পাশে সরিয়া গেল নামের বোর্ডটার কাছে। যেন তখনো সংশয় দূর হইতেছিল না মন হইতে।

আমি আঙ্গুল দিয়া আমার নামের কার্ডটা দেখাইয়া দিলাম। চিন্ময়

পড়িয়া বলিল, এ, রায়, ম্যানেজার হীরাডাঙা স্টেট্। এ কার নাম?

কার আবার? আলোক রায়, দেখলি তো?

কিন্তু ম্যানেজার লেখা! তুই তো ক্যানভাসার, ম্যানেজারীর কি বুঝিস?

তখনো মনে সন্দেহ। তাই চট্ করিয়া হাতের ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল, চল্ তোর ঘরটা দেখে আসি। সাহেবের কাছে যাবার এখনো আধ ঘণ্টা বাকী!

আমার ঘরে ঢুকিয়া চিন্ময়ের বিস্ময় যেন আরো বাড়িয়া যায়। বলিলাম, এখানে পাঁচ দিন এসেছি। আমাদের জমিদারবাবুকে এইমাত্র বিলেতের জাহাজে তুলে দিয়ে এলুম। তিনি ব্যারিস্টারী পড়তে গেলেন। পরশু ফিরবো।

তুই এখানে পাঁচদিন আছিস, কই দেখা তো একদিনও হয়নি! আমাকে তো রোজই আসতে হয় সাহেবের কাছে।

বলিলাম, হোটেলের তিনতলায় থাকতেন জমিদার। বেশির ভাগ সময় সেখানেই থাকতাম—তাছাড়া রোজই মার্কেট করতে ব্যস্ত থাকতে হতো।

ভাই, সত্যি ভারী আনন্দ হোল তোর এই উন্নতি দেখে। বলিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু ফিরিবার দিন বোম্বাই মেলে যে কামরায় ওর সাহেব যাইতে ছিলেন, ওই কামরায় আমায় উঠিতে দেখিয়া চিন্ময়ের মুখ যেন সহসা কালি মাড়িয়া গেল। সে তার সাহেবকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। দরজার কাছে প্ল্যাটফর্মে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমার সঙ্গে একটি কথাও কয় নাই। ট্রেন ছাড়িবার দেরি দেখিয়া, আমি হুইলারের স্টলে গিয়া যখন একটি বই কিনিতেছিলাম, চিন্ময় আমায় বলিল, কিছু মনে করিসনি ভাই, সাহেব রয়েছে বলে তোর সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। যাহোক তোর ঠিকানাটা আমায় বল তো, লিখে রাখি ডায়েরীতে। হঠাৎ একদিন গিয়ে পড়তে পারি কিন্তু।

খুব ভাল, আয় না। তবে একটা চিঠি দিস আগে।

সত্যি সত্যি চিঠি না দিয়াই একদিন চিন্ময় গিয়া হাজির হইয়াছিল। বলিল, ইস্টারের চারদিন ছুটি, ভাবলুম তোর জমিদারীটা দেখে যাই।

ওই চারদিনে ম্যানেজারের ওখানে কি রকম প্রতিপত্তি—বাসস্থান হইতে খাওয়া-দাওয়া সব কিছু হালচাল দেখিয়া তার চক্ষুস্থির। বলিল, তুই তো দেখছি একটা ক্ষুদ্র নবাব—এ যে চোখে দেখেও বিশ্বাস করা যায় না।

আমারই পাশের ঘরে, আমার মাননীয় অতিথি হিসাবে আদর-আপ্যায়নের তার কোন ত্রুটি হয় নাই। হাতীর পিঠে চড়িয়া ক'দিন চারিদিক ঘুরিয়া দেখিয়া চলিয়া যাইবার সময় বলিল, এ ভগবানের আশীর্বাদ, নইলে এ কখনো সম্ভব হয়—তুই কি বুঝিস জমিদারীর! কি বলিস?

মুখে আমি কিছুই বলিলাম না। শুধু যে ওর সেই দম্ভ ও আমার প্রতি হেনস্থার প্রতিশোধ যে নিতে পারিয়াছি, এজন্যে নিঃশব্দে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

জানাইলাম।

॥ কুড়ি ॥

রাজেন্দ্রকুমার জানিত আমি বই পড়িতে ভালবাসি। আমার অবসর বিনোদনের একমাত্র সাথী বই। এর চেয়ে প্রিয় আমার কাছে আর কিছু নাই। তাই সে পাটনা হইতে মাঝে মাঝে ভালো ভালো সব বিলিতী নভেল ও গল্পের বই কিনিয়া আমায় পাঠাইয়া দিত। বোধহয় যাহাতে আমি কোন নিঃসঙ্গতা বোধ না করি কিংবা তার কাজকর্মে শৈথিল্য আসিয়া না পড়ে।

যা হোক দিব্য জমিদারী চালে রাত্রে নৈশ ভোজনের পর তৈরি বিছানায় শুইয়া মশারীর কাছে বাহিরে একটা টেবিল-আলো জ্বালাইয়া আরামে বই পড়িতে পড়িতে যখন ঘুমাইয়া পড়িতাম, পাখাটানা ছেলেটা আসিয়া আলো নিভাইয়া দিয়া যাইত।

এইভাবে যখন বেশ দিনগুলো একটা ছন্দবদ্ধ সনেটের মত হইয়া গিয়াছিল, বেশ মনে পড়ে একদিন সদ্য হাতে আসা 'হলকেইনে'র উপন্যাস "দি ওম্যান দাউ গেভেস্ট মী" পড়িতে পড়িতে কত রাত হইয়াছে হুঁশ ছিল না, বইয়ের মধ্যে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম। সহসা একটা অদ্ভুত ধরনের বন্য গন্ধ নাকে আসিতে সচকিত হইয়া উঠিলাম। প্রথম যেদিন শালবনে বেড়াইতে যাই, কাঁচা শালপাতার গন্ধের সঙ্গে সোঁদা লালমাটির এক প্রকার মিশ্রিত সৌগন্ধ নিমেষে কেমন যেন উন্মনা করিয়া তুলিয়াছিল। অবিকল সেই গন্ধ এত রাত্রে ঘরের মধ্যে কোথা হইতে আসিল!

মশারী হইতে মুখ বাহিরে আনিতেই সারাদেহ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত শিহরিয়া উঠিল। দেখি মাথার কাছে দাঁড়াইয়া এক তরুণী—কিশোরী নয় অথচ যুবতীও বলা যায় না—কৈশোরের বাঁধন-ছেঁড়া নবলব্ধ সে এক যেন রূপাতীত রূপ! বৈষ্ণব কবির ভাষায় "কৈশোর যৌবন দুহুঁ মিলি গেলা।"

বাস্তবিকপক্ষে আমার মত নীরস গদ্য-লেখকের কলমে তার বর্ণনা সম্ভব নহে।

যদি বলি প্রথম বসন্তে বিকচোন্মুখ ম্যাগনোলিয়ার কুঁড়ি গাঢ় সবুজ পত্রাঞ্চলের আড়ালে সবে একটি কি দুটি পাপ্‌ড়ি মেলিতে শুরু করিয়াছে, ইহাকে ক্যামেরায় তোলা ফোটো হয়ত বলা চলে কিন্তু শিল্পীর আঁকা ছবি কিছুতেই বলা যায় না। কারণ রঙের সংমিশ্রণে ও তুলির যাদুতে বস্তুকে অতিক্রম করিয়া মর্মগত প্রাণের যে স্পন্দন ছবিতে ধরা পড়ে, ফটোতে তা সম্ভব হয় না একেবারে।

কেমন করিয়া বুঝাইব—তাহার দুই চোখে ছিল কস্তুরী গন্ধে মত্ত হরিণীর দৃষ্টি আর সর্বাঙ্গে যেন সারা অরণ্যের বুকে জাগা প্রথম ফাগুন হাওয়ার শিহরণ।

মনে আছে তাহার দিকে তাকাইয়া মুহূর্ত কয়েক যেন বাক্যহারা হইয়া গিয়াছিলাম। তারপর হঠাৎ একসময় গলায় জোর দিয়া বলিলাম, তুম কোউন হ্যায় ?

কাঁপা-কাঁপা গলায় সে উত্তর দিল, সরকার, হম তো আব্‌কা নয়া পাংখা-ওয়ালী হ্যায়। আব্ নিদ্ গিয়া সমঝা, ইসিলিয়ে আব্‌কো বাতি বুতানে আয়া থা। মেরা কসুর মাপ কীজীয়ে সরকার। বলিয়া দুই-হাত জোড় করিল অপরাধিনীর মত!

এবার ধমক দিলাম, কোন্ তুমকো ইয়ে কামমে ভেজা ?

অমনি দু'হাত জুড়িয়া কহিল, সরকার, মাহাতোজী নে ভেজা ?

এ্যাঁ, কি বললে! মাহাতোজী তোমায় পাঠিয়েছে ? কথাটা কানে শুনিয়াও যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না। কারণ গংগা মাহাতোর মত এমন অদ্ভুত বিশ্বাসী, সুদক্ষ ও কর্তব্যপরায়ণ সেবক পাওয়া ভাগ্যের কথা! দু'তিন মাসের মধ্যেই তার নিখুঁত সেবাযত্নে আমি কেবল অভিভূত হইয়া পড়ি নাই, সেই প্রবীণ সদাবিনম্র সাত্ত্বিক চেহারার মানুষটির আচার-আচরণের প্রতি আমার মনে যেন একটা শ্রদ্ধার ভাবও জাগিয়া উঠিয়াছিল। যেমন নিরাসক্ত সদাপ্রসন্ন নির্লোভ ভাব মুখে-চোখে, তেমনি এত খাদ্যসম্ভারের মধ্যে থাকিয়াও সে কিছু স্পর্শ করিত না। নিরামিশাষী, নিজে হাতে পাক করিয়া ভোজন করিত। প্রতিদিন ভোরে উঠিয়া প্রাতঃস্নান করিয়া তুলসীদাসী রামায়ণের দু'চারটি শ্লোক সরবে সুরেলা কণ্ঠে পাঠ না করিয়া মুখে জল দিত না।

যাহা হউক, সেই মেয়েটিকে তখন বাহিরে যাইতে বলিয়া আমি মাহাতোকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া পাঠাইলাম।

একটু পরে সে হন্তদন্ত হইয়া আমার সামনে আসিয়া যথারীতি বিনম্র ভঙ্গীতে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

মাহাতোজী, তুমি এই নতুন মেয়েটাকে আমার ঘরে পাঠিয়েছো পাখা টানার জন্যে ?

জী সরকার!

তার এই সরল উক্তি শুনিয়া রাগ সামলাইতে পারিলাম না।

কেন ? তুমি জানো না আমি একদিন এরকম একটা মেয়েকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম! আমি পছন্দ করি না কোন মেয়েছেলে।

হ্যাঁ হুজুর, জানি। উয়ো ছোকরীকো আপনার পছন্দ হয় নি। তাই অনেক ঢুঁড়ে বাছাবাছি করে এতদিন পরে একে পেয়েছি আপনার সেবার জন্য। একেবারে শুদ্ধ বন্য ফুলের মত—কৈ মরদ হাতসে ভি ছুঁয়া নেহি আভিতক।—অর্থাৎ, সে বুঝাইতে চাহিল একেবারে ভার্জিন অক্ষতযোনি মেয়ে!

এবারে আরো এক পর্দা গলা চড়াইয়া দিয়া কহিলাম, আমি কি তোমায় কোনদিন সেবাদাসীর কথা বলেছি ?

'রাম কহো জী!' বলিয়া জিভ কাটিয়া সে নীচু সুরে বলিল, হুজুর আপনি কেন বলবেন? আমি তবে কেন আছি? আপনার সব কিছু দেক্‌ভাল করা, আপনার সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভার তো আমার ওপর! সারাদিনের খাটুনির পর রাত্রে আপনার গা হাত পা ডলাইমলাই করে, পাখা টেনে হাওয়া করে আরাম দেবার জন্যই ওকে লাগিয়েছি হুজুর!

দেখো মাহাতোজী, তোমাকে আমি ধার্মিক মানুষ বলে ভেবেছিলুম, কিন্তু এখন দেখছি তুমি তা নও—

হুজুর, কসুর মাপ কিজীয়ে। মনিবের সেবাই তো আমার ধর্ম—আগের সব মনিবকেই তো আমি এইভাবে সেবা করে এসেছি। তাঁরা তো কোনদিন আমার প্রতি বিরূপ হন নি। বরং খুশি হয়ে বকশিশ করেছেন—

মাহাতোজী, মনে রেখো সব মানুষ এক নয়। সকলের চরিত্রও সমান নয়। আগের ম্যানেজাররা যা পছন্দ করতেন, আমি তা করি না। আজ থেকে তোমাকে তাই সাবধান করে দিলুম। আর কোনদিন তুমি এ চেষ্টা করো না। তাহলে কিন্তু আমি তোমার নামে রিপোর্ট করবো রাজেন্দ্রকুমারের কাছে, মনে রেখো। তোমার যদি বকশিশের প্রয়োজন হয় তো আমায় বলো, আমি খুশি মনেই তোমায় দেবো—তার জন্যে আমাকে এভাবে মেয়ে ঘুষ দিয়ে তুষ্ট করার চেষ্টা করো না।

এবার দু হাত জোড় করিয়া অপরাধীর মত বলিয়া উঠিল, সরকার, আউর কভি নেহি হোগা, মুঝে মাপ্‌ কীজিয়ে।

আচ্ছা যাও। তবে মনে রেখো সব মানুষের প্রকৃতি এক নয়।

জী সরকার। বলিয়া পুনরায় স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে অভিবাদন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু সেই থেকে আমার প্রতি তার ভক্তি এত বাড়িয়া গিয়াছিল, যেন আমি তার চোখে একটা দেবতা বিশেষ!

॥ একুশ ॥

বিলাত হইতে মাঝে মাঝে রাজেন্দ্রকুমার আমায় চিঠি লিখিত। জমিদারী কাজকর্মের কথা তাহাতে থাকিত না। সেখানে কেমন তার পড়াশুনা হইতেছে, সেখনাকার মানুষজন কেমন, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতায় সে যে কিরূপ মুগ্ধ, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাহারই বর্ণনায় পূর্ণ থাকিত অধিকাংশ চিঠি।

একবার সে লিখিল, মাস্টার সাহেব, আমার স্ত্রীর চিঠিতে জানতে পারলুম আমার মাতাজীর শরীরটা কিছুদিন থেকে ভাল যাচ্ছে না। আমাদের ফ্যামিলি চিকিৎসক তো দেখছেন, তাছাড়া পাটনা থেকে আরো বড় ডাক্তার এনে দেখিয়েও বিশেষ সুবিধা হচ্ছে না।

এক বছর ধরে তাঁদের ওষুধ খেয়েও মাতাজীর দুর্বলতা কমছে না, তাই তাঁর ইচ্ছা কলকাতায় থেকে বড় ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করান।

আমার মেসোমশায় লছমন তেওয়ারী খুব বড় ব্যবসায়ী! বড়বাজারে তাঁর বিরাট বাড়ি, গাড়ি ও অনেক লোকজন আছে। মাতাজী সেখানে গিয়ে থাকবেন, তাঁরাই সব দেক্ভাল করবেন, আপনি শুধু ভাল ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেবেন! আপনি কলকাতার মানুষ—কোন্ ডাক্তার ভাল আপনার নিশ্চয় জানা আছে।

তথাস্তু।

অতএব দিনক্ষণ দেখিয়া একদিন মাতাজীকে লইয়া কলিকাতা রওনা হইলাম এবং দেখি যথাসময়ে লছমন তেওয়ারী গাড়ি ও দুজন কর্মচারী লইয়া হাওড়া স্টেশনে হাজির। ভারী অমায়িক মানুষ এই তেওয়ারীজী। এত যে বড়লোক, ধনী ব্যবসায়ী, বেশভূষা দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। ভদ্র শিক্ষিত বাঙালী বলিয়া ভুল হয়। তেমনি পরিষ্কার বাংলা ভাষায় কথা বলেন। বয়স যে পঞ্চাশের অনেক বেশি, চেহারা দেখিয়া তা বুঝিবার উপায় নাই। বেশ শক্তসমর্থ মজবুত দেহ।

আমার বয়স যে এত কম তা তিনি আশা করেন নাই। তবু তিনি যত বড় ধনী হোন্, লেখাপড়ায় আমি যে তাঁর চেয়ে অনেক বড়, ইহা ভোলেন নাই। আমার সঙ্গে সম্ভ্রমের সঙ্গেই কথা কহিলেন।

স্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখি, দুটি বড় গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে। একটিতে মাতাজী, তাঁর দাসী ও তেওয়ারীজী উঠিলেন। আর একটিতে আমি তাঁর দুই কর্মচারীর সঙ্গে উঠিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

যথাসময়ে বড়বাজার অঞ্চলে এক বিরাট চারতলা বাড়ির ফটকের ভিতর গাড়ি প্রবেশ করিল। বড় প্রশস্ত উঠান, চারদিকে ঘর সমানে একই ভাবে চারতলা পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে।

আমরা সকলে গাড়ি হইতে নামিতে তেওয়ারীজী রাজেন্দ্রকুমারের মা ও তাঁর পরিচারিকাকে লইয়া উপরে চলিয়া গেলেন। তারপর নিচে আসিয়া ড্রাইভারকে বলিলেন, আমায় হোটেলে পেঁাছাইয়া দিতে।

তখনকার দিনে সম্ভ্রান্ত অভিজাত হোটেল হিসাবে ক্যালকাটা হোটেলের খুব খ্যাতি ছিল। জজ ব্যারিস্টার জমিদাররা মফঃস্বল হইতে আসিয়া ওখানেই উঠিতেন। তাছাড়া ওই হোটেল সম্বন্ধে আমার মনে একটু দুর্বলতাও ছিল। ওই অঞ্চলে অলিগলির মধ্যে সস্তার মেসে যখন থাকিতাম, কতদিন অন্ধকারে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে একাকী বসিয়া ওই বিরাট চারতলা বাড়ির আলোকোজ্জ্বল ঘরগুলির দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছি তাহা ভুলি নাই।

মির্জাপুর স্ট্রীট ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের সংযোগস্থলে এই হোটেলটির দক্ষিণে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। বিরাট অবারিত হাওয়া বাতাস আলো। ওর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বেশী দামের তিনতলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ঘরটি আমি

পছন্দ করিলাম। ওটাই নাকি ভি. আই. পি. রুম। সবচেয়ে বেশী দামী। বাস্তবিক ওই ঘরটি হইতে দক্ষিণে আমহার্স্ট স্ট্রীটের অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে, তেমনি পশ্চিমের জানালা দিয়া মীর্জাপুর স্ট্রীট ও গোলদীঘি ছাড়িয়া ইউনিভারসিটি বিল্ডিং পর্যন্ত দেখা যায়। যেমন আলোবাতাস তেমনি সাজানো সুসজ্জিত ঘরটি। ওই ঘরটি পছন্দ করিলে আপিস হইতে একটা বড় খাতা লইয়া আসিল একজন কর্মচারী। উহাতে আমার নাম ধাম ঠিকানা, কোথা হইতে আসিতেছি, কোথায় যাইব এবং কতদিন থাকিব ইত্যাদি যেমন ছাপানো আছে, সেইমত লিখাইয়া স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

একটু পরে স্বয়ং ম্যানেজারবাবু আমার ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। মেদবহুল স্থূলাকৃতি। বড় হোটেলের ভালো-মন্দ খাইয়া ভোগে থাকা চেহারা ; মসৃণ মুখে প্রশান্ত হাসি।

নমস্কার করিয়া বলিলেন, আপনার খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে কোন স্পেশাল ফ্যান্সি থাকলে দয়া করে বলবেন, এখানে সবরকম ব্যবস্থাই আছে।

বলিলাম, আপনাদের মেনু কার্ড দেখেছি।

এবার একটু হাসিয়া বলিলেন, আমরা রাত্রে লুচির সঙ্গে মাংস দিই— মুরগীতে আপনার বাধা নেই তো ?

না, বাধা কিসের ?

এই-মানে সকলে তো এটা খায় না, তাই জিজ্ঞেস করে নিলুম আগে— কিছু মনে করবেন না।

ভদ্রলোকের কোন দোষ নাই। তখনকার দিনে, বিশেষতঃ হিন্দুদের সমাজে উহা নিষিদ্ধ মাংসরূপে গণ্য হইত। বড় বড় লোকেরা অনেকে মা-বাবাকে লুকাইয়া হোটেল-রেস্তোরাঁয় যাইয়া খাইতেন। উনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে, একজন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম ম্যানেজারবাবুর নাম যতীন-বাবু। আর তাঁর সহকারী যিনি তাগড়াই চেহারার সুশ্রী যুবক, ঝকঝকে মুখে সুন্দর গোঁফ, তাঁর নাম দেবেনবাবু। সৌম্য, শিষ্ট, ভদ্র—দেখিলে ধনীর সন্তান বলিয়া মনে হয়।

একটু পরে আমি অফিসঘরে গিয়া দেখি যতীনবাবু নাই, তার বদলে ওই যুবকটি রহিয়াছেন। আমায় দেখিয়া তিনি বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে কহিলেন, কিছু বলবেন ?

না, যতীনবাবুর কাছে এসেছিলুম।

তিনি বলিলেন, উনি একটু ওপরে গেছেন, কি দরকার বলুন ?

আচ্ছা বলতে পারেন, এখানে এখন ভাল নামী ডাক্তার, মানে খুব নামকরা কে আছেন ?

তিনি তাঁর ঠোঁটের ওপরে সুশোভিত গোঁফের দুপ্রান্ত একটু মুচড়াইয়া বলিলেন, সবচেয়ে বড় বলতে ডাঃ বিধান রায়, কিন্তু সব সময় তাঁকে পাওয়া মুশকিল। তবে তাঁর পরেই যাঁর নাম, তিনি ডাঃ অমল রায়চৌধুরী—খুব

ভাল ডাক্তার।

তিনি কোথায় থাকেন, ঠিকানাটা যদি দয়া করে বলে দেন।

আর একবার গোঁফের প্রান্ত চুমড়াইয়া বলিলেন, আরে এই তো আমাদের পাড়ায়। শ্রদ্ধানন্দ পার্কটা ছেড়ে একটু এগিয়ে গিয়ে স্কট লেন, তার ভেতরে এগিয়ে একটু গেলেই দেখবেন বঙ্গবাসী কলেজ হোস্টেল—ব্যস, তার ডানদিকে ছোট্ট একটা গলি, যাকে জিজ্ঞেস করবেন দেখিয়ে দেবে বাড়িটা।

সত্যি সত্যি হোটেলের খুব কাছে। বিকেলবেলা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করিলাম। নিজের বাড়িতেই নীচের তলায় তিনি রুগী দেখেন। অনেকগুলি লোক অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি আমায় বলিলেন সাড়ে ছ'টার সময় আসিতে।

তখনো ঘণ্টা দুই বাকি। আমি হোটেলে ফিরিয়া চা-জলখাবার খাইয়া যথাসময় ডাক্তারবাবুর বাড়ি আসিয়া তাঁর গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে বসিয়া বড়বাজারে রাজেন্দ্রকুমারের মাসীর বাড়ি উপস্থিত হইলাম। রাজেন্দ্রকুমারের মেসোমশাই নীচে বড় ফরাস পাতা মোটা মোটা তাকিয়া দেওয়া বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া ছিলেন। ডাক্তারবাবুকে লইয়া উপরে চলিয়া গেলে আমি নীচে বসিয়া রহিলাম।

ডাক্তারবাবু গাড়িতে উঠিয়া বসিলে তাঁর হাতে বত্রিশটি টাকা তেওয়ারীজী দিলেন।

॥ বাইশ ॥

বড় ডাক্তারের ওষুধ খাইয়া দেখিতে দেখিতে পনেরো দিনের মধ্যেই বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন জমিদার-গৃহিনী। তখন আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করিবার ধুম পড়িয়া গেল। তিনি অনেকদিন পরে কলিকাতায় আসিয়াছেন—আজ কোন্নগর, কাল লিলুয়া, পরশু বজবজ, তার পরের দিন হয়তো টালীগঞ্জ। সব ধনী আত্মীয়দের বাড়ি নিমন্ত্রণ খাইয়া কোথাও বা দু'তিনদিন থাকিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।

আমি তখন বেকার। ডাক্তারকে আনা, নিয়মিত রিপোর্ট দেওয়া, ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজ ফুরাইয়া গিয়েছে।

এই সুযোগে একবার মামীমার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব বলিয়া স্থির করিয়া ফেলিলাম। আসল উদ্দেশ্য কিন্তু বৌদির সংবাদ নেওয়া। ওখানকার আবহাওয়া কেমন, আমাকে জড়াইয়া একদিন যে কলঙ্ক বৌদির নামে রটিয়াছিল—তারপর তাঁহাকে চিঠি লিখি নাই। কতদিন মনে হইয়াছে, বইয়ের ব্যবসার জন্য একদিন যে টাকা, তাঁর গায়ের অলঙ্কার বিক্রি করিয়া লইয়াছিলাম, মানি অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দিই! কিন্তু সাহসে কুলায় নাই। পাড়াগাঁ জায়গা, পোষ্ট অফিসের পিওনটাও ওই পাড়ার লোক, হাজারীদা বলিয়া সবাই ডাকে, কি জানি যদি তার মুখ থেকে পাড়ায় জানাজানি হইয়া যায়! আমি

গোপনে বৌদিকে টাকা পাঠাই—চিঠি লিখি, তাহা হইলে বৌদির মুখটা কোথায় থাকিবে! অথচ বইয়ের ব্যবসা যখন তুলিয়া দিয়াছি এবং যথেষ্ট উপার্জন করিতেছি, তখন বৌদির টাকাটা শোধ দিতে না পারা পর্যন্ত মনে মনে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিতাম। জানি না বৌদি কি ভাবিতেন। হয়তো বা একেবারে মন থেকে আমায় মুছিয়া ফেলিয়াছেন!

যা হোক কৌতূহল বুকে চাপিয়া একদিন সন্ধ্যার সময়, গাঁয়ের পথেঘাটে যখন সবে অন্ধকার নামিতেছে, চুপি চুপি মামার বাড়ি গিয়া ঢুকিলাম। তখনও পাড়ার কোন কোন বাড়িতে শাঁখ বাজিতেছিল। মামীমা উঠানে তুলসী-তলায় প্রদীপ জ্বালাইয়া গড় হইয়া মাটিতে প্রণাম করিতেছিলেন।

উঠিয়া সহসা আমাকে দেখিয়া যেন চমকাইয়া উঠিলেন, অপরিচিত কোন ব্যক্তি মনে করিয়া। তারপর দু'পা আগাইয়া বলিয়া উঠিলেন, ওমা, তুই! পোড়া কপাল আমার, বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে, বলি ভরসন্ধ্যেবেলা কে ঢুকলো আবার বাড়িতে! তোকে একেবারে চিনতে পারি নি।

আলো, তবে মুখে বলবো না বাবা এই ভর সন্ধ্যেবেলায়. তোর চেহারাটাও বেশ বদলে গেছে—বালাই ষাট ষষ্ঠীর দাস. বেঁচেবর্তে থাকো—যে যেখানেই থাক না কেন? মা-বাপকে খেয়ে বসে আছিস ছেলেবেলায়, একটা আহা বলার কেউ নেই—তাই এত ভেবে মরি। তা বলে একটা চিঠি দিয়েও কি খোঁজ নিতে নেই রে, মামীটা মলো কি বাঁচলো! যতক্ষণ সামনে থাকিস মামী বলতে অজ্ঞান, তার পর চোখের আড়াল হলেই আর মনে থাকে না! দু'তিন বছর হয়ে গেল, কোথায় কি ভাবে আছিস—একটা খোঁজখবর পর্যন্ত নেই, ভাবনাও হয় না?

বলিলাম, ছেলেটা যে ভালই আছে, চেহারাটা দেখেই তো বুঝতে পারছো—চিনতেই পারোনি মামী।

আবার হাসছিস? মামীর দোষ ধরছিস? লজ্জা করে না। মামীর বুঝি বয়েস হয় নি? চোখের জোর দিন দিন কমে যাচ্ছে—তায় সন্ধ্যে হয়েছে!

তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ভরসন্ধ্যেবেলা উঠোনে দাঁড়িয়ে মামীর সঙ্গে ঝগড়া করবি না ভেতরে যাবি?

তুমি বললেই যাবো মামী।

শোন একবার ছেলের মুখের কথা? যেন নতুন মানুষ। ঘরদোর চেনে না। এইজনেই বলে, জন জামাই ভাগনা. তিন নয় আপনা!

এবার ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, আচ্ছা, আমি না হয় পর, কিন্তু ওই বৌটা কি দোষ করলো, তোকে দেওর বলে কত ভালো না বাসতো. আর তুইও তো বৌদি বলতে অজ্ঞান হতিস্—তাকেও একটা চিঠি দেওয়ার কথা মনে হয়নি। আহা, দেখা হলে কত চোখের জল ফেলত, বলতো দিদি, তুমি কি ওর খবর পেয়েছো? ভদ্রার বিয়ের সময় হানটান করতে লাগল তোর ঠিকানার জন্যে, নেমন্তন্নর চিঠি দেবে বলে! ও, কি ঘটা করে বাজনা-বাদ্যি,

সানাই, রোসনচৌকি বসিয়ে মেয়ের বিয়ে দিলে। পাড়াসুদ্ধ মেয়েপুরুষকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালে। মেয়েদের আবার গায়েহলুদের দিন আলাদা করে নেমন্তন্ন হলো। ওঃ, এমন খাওয়াদাওয়া ও ঘটার বিয়ে আমাদের গ্রামে আগে কখনো দেখিনি।

তেমনি জামাই হয়েছে। অনেকটা তোর মত দেখতে তবে বোম্বাইতে নাকি খুব বড় চাকরি করে।

বিয়ের দিন কেঁদে মরি। তোরই তো ওর জামাই হবার কথা। তোকে সেইজন্যে কত ভালবাসত ভদ্রার মা। তা এমনি হতচ্ছাড়া, পোড়াকপালে তুই যে ঠিক সেই সময় বেপাত্তা হয়ে গেলি। তোর ঠিকানা পাবার জন্যে কত সাধ্যিসাধনা করলে। আমি তোর দেশের ঠিকানাটা দিয়ে বললাম—দেখ ভাই সেখানে লিখে, যদি খোঁজ পাও!

দেশ থেকে তোর জ্যেঠাইমা নাকি চিঠি দিয়েছিল, সে একটা বাউন্ডুলে ভবঘুরে কোথায় কখন থাকে কেউ জানে না। কাজেই কোন্ ভরসায় তোর অপেক্ষায় থাকবে?

হাসিয়া বলিলাম, যাক, জ্যেঠাইমা আমায় খুব বাঁচিয়েছেন। ভাগ্যিস ঠিকানা জানতেন না!

তার মানে? মামীমা বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

মানে আমার সঙ্গে জামাইয়ের চেহারার যতই মিল থাকুক, আমি তো তার মত বড় চাকরি করতুম না। তাই আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে কিছুতেই দিতেন না। বরং আমায় নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে আমার সামনে মেয়েকে আর একজনের হাতে সঁপে দিচ্ছেন, আমায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা চোখে দেখতে হতো।

চুপ কর। আমি কেন, পাড়ার সব মেয়েরাই জানতো তোর সঙ্গেই ভদ্রার বিয়ে হবে। তাই বিয়ের দিন সকলের কি আপসোস? বলে, দিদি, তোমার ভাগ্নেটা সত্যি হতভাগা, নইলে ছেলেবেলায় মা-বাপ খেয়ে বসে থাকবে কেন? ওর সঙ্গেই তো ভদ্রার বিয়ে হবার কথা। ভদ্রাও মনে মনে ওকে ভালবেসে ফেলেছিল।

দেখো মামী, ওসব কথা শুনে আমার লাভ কি! যা হবার তা তো হয়ে গেছে।

হ্যাঁ রে, তোর এর জন্যে দুঃখু হচ্ছে না?

বলিলাম, না, বরং খুব আনন্দ হচ্ছে। বিশ্বাস করো মামী।

বাস্তবিক পক্ষে ইহা যে আমার কাছে কত আনন্দের সংবাদ, তাহা আমি ছাড়া আর কেহ বুঝিবে না। সর্বপ্রথম মনে হইল তবে কি ভদ্রা তার মার সঙ্গে আমার যে কলঙ্কের কথা বলিয়া কাহারো কাছে উহা কহিতে নিষেধ করিয়াছিল তার মূলে সত্য নাই? যদি সত্য থাকিত, তাহা হইলে মামী ও পাড়ার মেয়েরা শুধু আমার কথা তুলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিবেন কেন?

মামীমা আমাকে তাঁর ঘরে বসাইয়া আলো আনিতে গিয়াছিলেন, হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া ঘরে ঢুকিলে আমি তার পায়ের কাছে দশখানা দশ-টাকার নোট রাখিয়া নমস্কার করিলাম।

মামীমা স্তম্ভিত, হতচকিত! নোটগুলি হাতে তুলিয়া মাথায় ঠেকাইয়া কহিলেন, এত টাকা কি জন্যে দিলি?

বলিলাম, এ তোমায় প্রণামী দিলুম মামী, তুমি তোমার খুশিমত খরচ করো। আমি এখন ভালো চাকরি পেয়েছি তোমাদের আশীর্বাদে।

ওমা, এই ভাল খবরটা তো আগে বলবি!

তুমি বলতে দিলে কই মামী? বলিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

সত্যি তুই ভাল চাকরি পেয়েছিস?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সত্যি। আমি কি এতই অপদার্থ যে তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না!

বালাই ষাট, এ কথা বলতে আছে? মামী কি তোর পর নাকি? আমি এখুনি এই টাকা থেকে পুরুতবাড়িতে তোর নামে পুজো পাঠাচ্ছি।

না না—ও থেকে পাঠাতে হবে না। এই নাও মামী দশটা টাকা। যদি পুজো দেবার ইচ্ছা তোমার হয়ে থাকে তো এটা থেকে দাও। বলিয়া আরো দশটা টাকা তাঁর হাতে দিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, দেখ, কথায় কথায় ভুলে গেছি বলতে যে গোরার বিয়ে হয়ে গেছে! একটা নাতিও আমার হয়েছে এই আট মাস হলো, তবে বড্ড রোগা, জন্ম থেকেই ভুগছে।

বলিয়াই তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন, বৌমা, তুমি কি ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছো নাকি?

না, মা, চালটা ধুয়েছি। মাছের ঝোলটা নামিয়েই ভাতের হাঁড়ি বসাবো।

ভালোই হয়েছে। আর একজনের চাল তুমি ওইসঙ্গে নাও। আর শিগ্‌গিরই এসো এ-ঘরে। দেখে যাও তোমার এক আইবুড়ো ভাশুর এসেছে।

বৌমার আসিতে একটু বিলম্ব হইল। কারণ শাড়ী বদলাইয়া মুখ পরিষ্কার করিয়া একটা বড় সিঁদুরের টিপ পরিয়া তবে ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

মামীমা বলিলেন, এতদিন যে আলোর নাম আমার মুখে শুনতে, এই সেই তোমার আইবুড়ো ভাশুর।

বৌমা দুহাত কপালে জুড়িয়া আমায় নমস্কার জানাইলে পকেট হইতে আরো দশখানা নোটের গোছা বৌমার হাতে দিয়া বলিলাম, আলো নাম শুনেছিলে, এখন নিশ্চয় হতাশ হচ্ছো আলোর বদলে অন্ধকার দেখে, না?

বৌমা ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিতে মামীমা বলিলেন, রংটা কালো তাতে কি হয়েছে, কিন্তু এমন চোখ নাক মুখ, ঠিক কেষ্ট ঠাকুরের মত।

বৌমা চলিয়া যেতে বলিলাম, বড্ড রোগা!

আমার কপাল। যখন বৌ এসে দুধে আলতায় দাঁড়ালো, এই লক্ষ্মী-ঠাকরুণের মত সুন্দর ছিপছিপে চেহারা। সবাইয়ের মুখে প্রশংসা ধরে না।

তারপর যেই ছেলেটা পেটে এলো, কি যে কালব্যাধি ধরলো! যা খায় হজম হয় না। অম্বলের জ্বালায় বুক জ্বলে যায়। কত ডাক্তার ওষুধ বদ্যি টোটকা করলুম, যে যা বলেছে—কিছুতেই আর কিছু হয় না। বাচ্চাটা হবার পর আরো শরীর ভেঙে গেল। এখন ডাক্তার বলছে, হাওয়া-বদল করতে। সাঁওতাল পরগণার কোথাও দেওঘর কি মধুপুরে মাস দুই তিন গিয়ে থাকতে। ওখানে ইঁদারার জল নাকি এমনি হজমী যে রোগ চলে যায়। ওষুধ লাগে না।

এই বলিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, যাও বললেই তো যাওয়া যায় না বাবা। এতগুলি তো চাই।—রেলভাড়া, সেখানে বাড়ি-ভাড়া, থাকা খাওয়া—কি নয়।

গোরা আপিসের কো-অপারেটিভ থেকে লোন নেবার জন্য দরখাস্ত করেছে। কিন্তু তাও তো মাসে মাসে কিছু কিছু মাইনে থেকে কেটে নেবে। কিন্তু বৌটা বড় লক্ষ্মীমন্ত বাবা, বিয়ের পাকা-দেখা হবার মাস থেকে হঠাৎ গোরার চাকরিতে একটা প্রমোশন হয়। তাই বলি আগে বৌটা তো বাঁচুক—তারপর যা হয়—নুন-ভাত খেয়ে না হয় থাকবো। ভাগ্যি তোর মামা আট ন' বিঘে ধানজমি রেখে গিয়েছিল তাই তো আর যাই হোক ভাতের দুঃখটা নেই। মানিক দেখাশুনো করে জমিটা, তাতে পুরোপুরি চালটা ঘরে আসে। নইলে তিনটে নাবালক ছেলে রেখে তোর মামা মারা গেলেন, কি করে তাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলুম বল! যা হোক্ এখন তিনটি ছেলেই মানুষ হয়েছে। যা রোজগার করে তাতেই একরকম চলে যাচ্ছে তো! ধার দেনা কি বলতে একটা পয়সাও কেউ পায় বলতে পারবে না বাবা—জোর করে বলতে পারি। একটু বোস্, তোর জন্যে চা জলখাবার করে আনি। তার আগে চল আমার নাতিকে দেখবি। বড্ড বদঅভ্যেস, অসময়ে ঘুমোবে আর রাতদুপুর অবধি জেগে থেকে মাকে জ্বালাবে! এইজন্যেই আরো বৌ সারতে পারছে না।

কিগো, রাজাবাবুর ঘুম ভাঙলো! ওর নাম রেখেছি রাজা। বলিয়া সস্নেহে নাতিকে ঢাকা মশারীর ভেতর হইতে বার করিয়া আমার কোলে দিতেই সে চিল-চীৎকার করিয়া উঠিল। মামীমা বলিলেন, ওই রকম, অচেনা মুখ দেখলে তার কোলে যাবে না।

বাচ্চার দু'হাতে দুখানা দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিলাম, ওকে একটা রুপোর ঝিনুক-বাটি কিনে দিয়ো মামীমা!

আবার ওকে আলাদা করে দিতে হবে না টাকা, এই তো আমায় দিলি, বৌমাকে দিলি—

বা রে, ওর মুখ এই প্রথম দেখছি, খালি হাতে কি দেখতে আছে! আমি ওর জ্যেঠা হই যে।

বড্ড রোগা তাই মনে স্ফূর্তি নেই। দেখছিস তো, নোট দুটোকে রাগের চোটে দুমড়ে মুচড়ে ফেলেছে। অত্যধিক রাগ। মা বাপ আর আমি—এ

ছাড়া কাকাদের কাছেও যায় না।

ইতিমধ্যে বৌমা ছুটিয়া আসিয়াছিল ছেলের কান্না শুনিয়া। মামীমা বলিলেন, নোট দুটো আস্তে আস্তে ওর হাত থেকে নিয়ে নাও তো বৌমা। কাল খোকা যখন আপিসে যাবে, ওকে দিয়ো। কলকাতা থেকে কিছু কিনে আনবে।

এই বলিয়া তিনি বলিলেন, তুমি ওকে আমার কোলে দিয়ে যাও, আমি ততক্ষণ এর সঙ্গে কথা বলি। তুমি তোমার ভাশুরের জন্য চা হালুয়া চট করে তৈরি করে নিয়ে এসো।

বৌমা চলিয়া গেলে বলিলেন, হ্যাঁ রে, তা তুই কোন্ আপিসে চাকরি করিস? কি নাম আপিসের?

বলিলাম, আপিস নয়, এক জমিদারী স্টেট-এ কাজ করি। সে অনেক দূরে একেবারে বিহার ও নেপালের বর্ডারে। বনজঙ্গলে থাকতে হয়। সে বিহারী-দের দেশ, তারা হিন্দীতে ও মৈথিলী ভাষায় কথা বলে—বাংলা জানে না।

ওমা কি সর্বনেশে কথা! তাহলে সেখানে তুই থাকিস কেমন করে? তোর কথাই যদি না কেউ বুঝতে পারে! তাহলে খাওয়াদাওয়া কি ভাবে করিস? কে রান্নাবান্না করে দেয়? বিয়ে করেছিস নাকি?

থামো! ওকথা মুখে উচ্চারণ করো না।

কেন, কি হয়েছে? এত টাকা যখন রোজগার করছিস, বিয়ে-থা করবি না কেন? ওই বনজঙ্গলে তাহলে বাঁচবি কি করে? ভাল খাবিদাবি তবে তো শরীরটা থাকবে, কাজ করতে পারবি!

কেন, আমার শরীরটা দেখে কি তোমার মনে হচ্ছে, না খেয়ে আছি? বরং বিয়ে করলে অর্ধেক ভাগ তো খেয়ে ফেলবে তোমার বৌ!

তাহলে কি তুই বিয়ে করবি না তাকে খেতে দেবার ভয়ে?

মনে মনে বলিলাম, তোমার বৌ আর নাতিকে দেখিয়া—যদিবা কখনো বিয়ে করিতাম, চিরদিনের মত ঘেন্না ধরিয়া গিয়াছে। এই বিয়ের পরিণাম! অথচ নতুন বৌয়ের যে ফোটো বাঁধানো রহিয়াছে—বেশ ভাল দেখিতে, এই কদিনে তার যে এই হাড়সার হইয়াছে ভাবিতে গেলে চোখে জল আসিয়া পড়ে।

ঠিক এই সময় হঠাৎ খোলকরতাল ও কীর্তন গান কানে ভাসিয়া আসিল। মামীমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেউ মারাটারা গেছে নাকি, কীর্তনের আওয়াজ পাচ্ছি!

বালাই ষাট, মারা যাবে কেন? হ্যাঁ, এখানে কোনো বুড়োমানুষ মরলে কীর্তন গেয়ে পথে পথে পয়সা খৈ ছড়াতে ছড়াতে শ্মশানে নিয়ে যায় ঠিকই, তবে এ হরিসঙ্গীত হচ্ছে তোর বৌদির বাড়িতে। আজ সাত দিন ধরে 'কেষ্টমঙ্গল' হচ্ছে—চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত। আজই শেষ দিন—শেষ হয়ে গেল। আমি যাই রোজই শুনতে। পাড়ার সব মেয়েপুরুষ ভেঙে পড়ে। ভদ্রার মা বৌটা বড্ড ভাল রে। পাড়ায় সবাই ধন্যি ধন্যি করে। যেমন বড়লোক

তেমনি মনটা উঁচু। গরীব দুঃখীকে দানধ্যান করে, দু'হাতে বিলোয়। বড্ড ভালো গুরু পেয়েছে—মেয়েটার বিয়ে দিয়ে মন্ত্র নিলে। ধুমধাম করে পাড়ার সব বামুনভোজন করালো, কাঙালী দুঃখীদেরও পেটভরে লুচিমণ্ডা খাওয়ালো। এখন খুব ঠাকুর-দেবতায় মন দিয়েছে। রোজ পুজো না করে জল খায় না।

আমি তো অবাক। তাই নাকি!

হ্যাঁ রে। যা না, তোর বৌদিকে দেখে আয় না—কত আনন্দ করবে দেখিস এতদিন পরে তোকে দেখে!

একটু পরে গিয়া দেখি, উৎসব শেষ, কেউ কোথাও নাই। মাটিতে দু'তিনটে সতরঞ্চি পাতা, দু'তিনটে কারবাইড-এর লম্বা লম্বা আলো মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে এখানে ওখানে।

পায়ের জুতোটা সিঁড়িতে খুলিয়া, আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠিয়া বাঁদিকে বৌদির যে ঘর তার দরজা আধভেজানো দেখিয়া বাহির হইতে উঁকি মারিতে গিয়া চোখের পলক ফেলিতে পারিলাম না। মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম বৌদির দিকে।

একটা চৌকির উপর সুন্দর করিয়া সাজানো পিতলের রাধাকৃষ্ণের মূর্তি। তার সামনে বসিয়া আছেন বৌদি ধ্যানমগ্ন তপস্বিনীর মত। পাশে ধূপদানিতে তিনচারটি ধূপকাঠি একসঙ্গে জ্বলিতেছে। তার সংগে ফুলের গন্ধে ভিতরটা যেন পবিত্র মন্দিরের মত মনে হইতেছিল। বৌদির গলায় তুলসীর মালা, কপালে দুই ভ্রূর মাঝে শ্বেতচন্দনের বড় টিপ, পরনে লালপাড় গেরুয়া রঙের গরদের শাড়ী।

মূর্তির দিকে একমনে তাকাইয়া বৌদি বোধহয় জপ করিতেছিলেন। একটু পরে হাত দুইটা কপালে ঠেকাইয়া, হেঁট হইয়া মাটিতে মাথাটা ঠুকিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া বসিতেই আমায় দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু সংগে সঙ্গে তাঁর মুখের রেখাগুলো যেন কঠিন হইয়া উঠিল। তারপর কণ্ঠে গাম্ভীর্য টানিয়া কহিলেন, তুমি এতদিন পরে—কি মনে করে এখানে?

আপনাকে দেখতে বৌদি।

বৌদির চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি! তাঁর কণ্ঠে যেন শ্লেষ ঝরিয়া পড়িল। এতদিন একটা চিঠি দিয়েও যার খোঁজ নেবার কথা মনে হয়নি, আজ হঠাৎ তাকে দেখার ইচ্ছা হলো কেন জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

বৌদি. কেন চিঠি লিখিনি আপনাকে তা তো আপনি জানেন। আমার জন্যে যে কলঙ্ক আপনার রটেছে, আবার চিঠি দিলে পাছে তা জানতে পারলে পাঁচজনে আরো কলঙ্ক রটায়, তাই অতি কষ্টে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে-ছিলুম।

ওটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। দশজনের নাম করে মিথ্যে বলেছিল তোমায়। আমার

নিজের পেটের মেয়ে মায়ের নামে এই কলঙ্ক দিয়েছে ভাবলে আমার লজ্জায় তোমায় মুখ দেখাতে ইচ্ছা করে না। যেদিন বুঝলুম এটা ভদ্রার রটনা, সেইদিন থেকেই উঠে-পড়ে লাগলুম একটা বিয়ে দিয়ে ঘর থেকে দূর করে দেবার জন্যে!

বৌদির দু'চোখ দিয়ে জল ঝরিতেছিল। বলিলেন, তুমি কথাটা সত্যি কি মিথ্যে জানার জন্যে একটা দিনও রইলে না, পালিয়ে গেলে। তাতে যে বৌদির ওপর সন্দেহ লোকের আরো বাড়বে একবারও ভেবে দেখলে না। তার পর থেকে তিন দিন মুখে ভাত দিইনি, বাইরে মুখ দেখাইনি। তিন রাত্তির শুধু কেঁদেছি আর ঠাকুরকে ডেকেছি, যদি আমি সতীলক্ষ্মী হই তো তুমি এর বিচার করো ঠাকুর। বললে বিশ্বাস করবে না ঠিক তিন দিন পরে পাড়ার সব বৌ-ঝি, গিন্নীবান্নীরা এসে বলে, বৌমা তোমাকে পথেঘাটে দেখতে পাই না ক'দিন, তাই এলুম খবর নিতে, তোমার শরীর ভাল আছে তো? তারপর তারাই বলে, তোমার সেই দেওরকেও দেখি না আজকাল, কোথায় গেছে? আহা, ছেলেটি বড় ভাল, পরোপকারী। যাক গে, ওসব কথা শুনে তোমার কি হবে?

বলিয়া চোখের জল আঁচলের প্রান্তে মুছিয়া কহিলেন, যাক, ভালই করেছিলে তুমি চলে গিয়ে, খুব ভাল শিক্ষা দিয়েছিলে আমায়, সেইদিন থেকে মনে মনে কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছিলুম—পুরুষজাতটা বেইমান নেমোকহারাম, ভালবাসার মূল্য বোঝে না, যদি ভালোবাসতে হয় এই মনটাকে ঠাকুরের চরণে উৎসর্গ করবো।

এমনভাবে বৌদি সমস্ত অপরাধ আমার মাথায় চাপাইয়া দিলেন যে আমি নিজে অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি বলিব যেন কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। তবু মুহূর্তকয়েক নীরব থাকিয়া বলিলাম, খুব ভাল করেছেন বৌদি। সত্যি আপনার মত এমন রোমান্টিক ও ইমোশনাল যে কোন মেয়েছেলে হতে পারে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না, আপনার মত মনকে সাধারণ মানুষের সাধ্য নেই বুঝবার। ঠাকুর-দেবতাই আপনার একমাত্র উপযুক্ত। তাঁরা তো কথা বলেন না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা। তুমি আমারি...।' আপনি তো পড়েছেন এ কবিতা। এ তো আপনার জন্যেই কবি লিখে গেছেন।

জানি। তোমাকে আর বেশী বিদ্যে ফলাতে হবে না!

বলিলাম, আচ্ছা বৌদি, তাহলে আসি।

চলে যাচ্ছো? কিছু না বলেই যে!

থাক বৌদি, এখন আপনি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন—কালকের দিনটা আমি আছি, কাল আসবো'খন।

ঠিক এসো কিন্তু। দেখা না করে পালিয়ো না যেন!

বদলে আমি চিরজীবন আপনার কাছে ঋণী থাকতেই চাই।

এরপর বৌদি শান্ত হইয়া গেলেন। আমাকে ঠাকুরের প্রসাদ দিয়ে বলিলেন, বিয়ে করেছো তো?

না। আপনি তো নিষেধ করেছিলেন, বলেছিলেন, বিয়ে করলে আমি সুখী হতে পারবো না। তোমার মন বোঝে এমন মেয়ে পাওয়া সংসারে দুর্লভ!

কথাটা কিন্তু মিথ্যে নয় ঠাকুরপো। তুমি হয়ত তোমার মনকে চেনো না, কিন্তু আমার চেয়ে বেশি তো কেউ জানে না।

এবার উঠিয়া দাঁড়াইলাম, চলি। দুপুরে খেয়েদেয়ে চলে যাবো।

বৌদি বলিলেন, কিন্তু কলকাতা থেকে যাবার আগে একবার দেখা করে যাবে তো?

বলিলাম, নিশ্চয়। তবে সেটা কবে এখন দিনটা বলতে পারছি না। জানেন তো কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

কলিকাতায় যাইতে তেওয়ারীজী কয়েকদিন পরে বলিলেন, আমি সম্প্রতি একটা বিরাট বাগানবাড়ি কিনেছি মধুপুরে। সেখানে আপনাদের মাতাজী দিন দশেক থেকে তারপর আপনার সঙ্গে বাড়ি ফিরবেন। ওখানে আপনার থাকা-খাওয়ার অসুবিধে হবে না—ক'টা দিন শুধু আমাদের সঙ্গে নিরামিষ খাবেন, কেমন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়। একটা নতুন জায়গা এই সুযোগে দেখা যাবে আমার। খুব আমার আনন্দ হচ্ছে। তেওয়ারীজীকে বলিলাম।

যাবার আগের দিন বৌদির সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। বলিলাম, কালই চলে যাচ্ছি সন্ধ্যার ট্রেনে।

বৌদি ছাড়িলেন না। লুচি তরকারী মিষ্টি একপেট খাওয়াইয়া দিলেন। বলিলেন, আবার কবে আসবে ঠাকুরপো?

বলিলাম, ঈশ্বর জানেন। তবে কলকাতায় এলে নিশ্চয় দেখা হবে।

বিদায় নেবার সময় হইয়া আসিলে হঠাৎ বৌদি স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, এখন আমি বড়লোক দেওরের বৌদি, তাই একটা জিনিস তোমার কাছে চাইবো ঠাকুরপো, না বলতে পারবে না কিন্তু।

যদি আমার সাধ্যে কুলোয় নিশ্চয় দেবো বৌদি, আপনি কোন দ্বিধা না করে বলে ফেলুন কথাটা।

দেখো ঠাকুরপো, অনেকদিন থেকে আমার পাথরের রাধাকৃষ্ণের মূর্তি কেনার শখ। কিন্তু এত দাম যে আমার সাধ্যের বাইরে। অন্য কারুর পয়সায় আমি কিনবো না, একমাত্র তুমি যদি আমায় উপহার দাও তো নিতে পারি।

কত দাম পড়বে বলুন?

আমার ইচ্ছা ছিল তোমাকেই কিনে দিতে বলবো। চিৎপুরে একটা পাথরের দোকানে দেখে এসেছি। কালো কষ্টিপাথরের কৃষ্ণমূর্তি আর জয়পুরের

শ্বেতপাথরের তৈরি তেমনি শ্রীরাধার মূর্তি। তা তুমি তো কালই চলে যাচ্ছো!

হ্যাঁ, বৌদি। আমার অনেক কাজ করতে হবে কাল। দামটা আপনার কত চেয়েছে তারা বলুন?

দুটোতে মিলিয়ে সাড়ে তিনশো টাকা!

তৎক্ষণাৎ পকেট হইতে টাকা বাহির করিতে বৌদি বলিলেন, দাঁড়াও আমি ডাকছি দুলালকে। আমার গুরুভাই, সে-ই কিনে আনবে গিয়ে। এখানে কাছেই থাকে।

তখন একটি বছর তিরিশ-বত্রিশের ছোকরা, গলায় তার তুলসীর মালা পাঞ্জাবির ওপরে উঁকি মারিতেছে, আসিয়া বলিল, দিদি, আমায় ডাকছেন?

হ্যাঁ, ভাই। এঁকে একটু ভাল করে দেখে নাও। তুমি আমাকে সেই মূর্তি দু'টি কাল কিনে এনে দেবে, কিন্তু মনে রেখো যখন কৃষ্ণের চোখ দু'টো আলাদা কিনবে, ঠিক যেন এঁর মতন হয়।

এর পর আমি আর এক মুহূর্ত সেখানে না দাঁড়াইয়া টাকাটা বৌদির হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলাম, ছি ছি বৌদি, এ কি করলেন, এরা কি ভাবছে বলুন তো?

ভাবুক গে—

আমি দ্রুতপায়ে রাস্তায় চলিয়া আসিলে বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম ছোকরাটির গলা, দিদি, আমি একা যাবো না—আপনাকে নিয়ে যাবো, আপনি চোখ পছন্দ করে দেবেন।

বেশ তাই হবে।

সত্যি বলিতে কি, ঠাকুর-দেবতাকে লইয়া বৌদি যে এইভাবে চিন্তা করিতে পারেন, ইহা আমার কাছে এক পরম বিস্ময়। নিজে না শুনিলে বিশ্বাস করিতাম না কিছুতেই। বাস্তবিক, বিচিত্ররূপিণী এই নারী!

॥ তেইশ ॥

সেদিন মামীমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইবার সময়, তাঁর হাতে আড়াইশো টাকা দিয়া বলিলাম, মামী, এই টাকাটা তুমি রাখো, গোরাকে দিয়ো। সে যেন অতি অবশ্য বৌমা ও ছেলেকে নিয়ে চেঞ্জে যায়। সত্যি ওদের দেখে বড্ড কষ্ট হলো। এমন ফুটফুটে বৌ ঘরে এনেছো, নাতিও হয়েছে, কোথায় সবাই মিলে দুটো দিন একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে তা নয়...

আর বলিসনি বাবা, সবই আমার কপাল, নইলে এমন হবে কেন? বৌমাকে দেখতে কেমন ছিল—বিয়ের ফোটোটা তো দেখলি, ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে।

বলিলাম, সত্যি মামী, ওটা দেখে আমি আরো দুঃখ পেয়েছি। তাই গোরা যেন নিশ্চিত যায় আর তাকে বলো আমি বিশেষ করে বলে গেছি।

হ্যাঁ বাবা, তারও কি মনে শান্তি আছে। দুটো দিন একটু হেসে খেলে বৌ নিয়ে ভোগ করতে পারলে না। সঙ্গে-সঙ্গেই বলতে গেলে বাচ্চা হলো। তারপর থেকেই ভোগান্তি। গোরা তো বলছে, একেবারে দুটো মাস চেপে থাকবো মা। আপিসের সবাই বলছে মাঘ, ফাল্গুন—এই সময়টা নাকি ওদিকের জলহাওয়া খুব ভাল।

সত্যি বলিতে কি, বৌমাকে দেখিবার দিন হইতে বেচারী গোরার কথা ভাবিয়া মনটা এত খারাপ হইয়া গিয়াছিল তা বলিবার নয়। সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, তেমনি ওর মধ্যে একটা রোমাণ্টিক ভাব ছিল, আমি জানিতাম। ঠিক বয়সেই সে তাই বিবাহ করিয়াছিল। কিন্তু সেই বিবাহের কী পরিণাম! জীবনের প্রথম স্বপ্নমধুর দিনগুলি ফুলের মত ফুটিতে না পারিয়া ঝরিয়া গেল।

তার সে ব্যথা যেন আমার বুকে আরো বেশী বাজিতেছিল। কেন তাহা জানি না। আহা বেচারী!

পরের দিন সকালে হোটেল হইতে 'ব্রেকফাস্ট' করিয়া একবার চিন্ময়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। অনেকদিন খবর নাই, তাই যাহাতে আপিস যাইবার পূর্বেই একটু বসিয়া দুটো গল্পগাছা করিতে পারি সেই জন্য ট্যাক্সি করিয়া তার বাড়িতে গিয়া হাজির হইলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় চাকর দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, সাহেব তো কলকাতার বাইরে গেছেন।

কোথায় গেছেন? কবে ফিরবেন? জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, তা জানি না।

আচ্ছা, তাহলে তোমার মেমসাহেবকে একটু খবর দাও। বলো আলোক-বাবু এসেছেন।

চাকরটা এবার মাথা চুলকাইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। বলিলাম, যাও, আমার নামটা বললেই হবে।

এবার একটু সঙ্কোচ-ভরা কণ্ঠে সে উত্তর দিল, মেমসাহেবও তো নেই এখানে!

তিনিও কি তাঁর সঙ্গে গিয়েছেন?

তা জানি না।

তাহলে চিন্ময়বাবুর মা তো আছেন, তাঁকে একবার ডেকে দাও।

দিচ্ছি। আপনি বসুন ঘরে। বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

একটু পরে মাসীমা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। তাঁর কপালে চন্দনের ফোঁটা, সারা দেহে ফুল ও ধূপের গন্ধ। বোধ হয় এইমাত্র পূজা-আহ্নিক শেষ হইল।

ওমা তুমি! কবে এলে? কোথায় না বেহারের বনজঙ্গলে তুমি চাকরি করছ, চিনুর মুখে একদিন শুনেছিলুম!

হ্যাঁ মাসীমা, ঠিকই শুনেছিলেন। আচ্ছা মাসীমা, চিন্ময় বুঝি বৌকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে গেছে?

তাহলে তো বাঁচতুম বাবা। বৌ তো বাপের বাড়ি। চিনু আপিসের কাজে চলে গেছে বোম্বে। কবে আসবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। যাবার সময় জিজ্ঞেস করতে রেগে উঠলো, আমি কি খেলা করতে যাচ্ছি! আপিসের কাজ যখন শেষ হবে চলে আসবো।

বলিয়া একটু এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। বোধ হয় চাকরটা কাছে আছে কিনা। তারপর গলাটা নামাইয়া কহিলেন, আমার পোড়া কপাল! কি চোখে যে সে বৌকে দেখেছিল, ভগবান জানেন। প্রথম দিন থেকেই খটাখটি স্বামী-স্ত্রীতে। লেখাপড়া জানা বড়লোকের মেয়ে, সে সহ্য করবে কেন? অন্যায় শুনলে চুপ করে থাকতে পারে না। আমার কানে সব কথা আসে বাবা। নীচের ঘরে থাকলে কি হয়! রাতদুপুরে স্বামী-স্ত্রীর তর্কাতর্কি, ঝগড়া মনোমালিন্য। বৌমা বলে, তোমার কাছে টাকাটাই সব। ইহকাল পরকাল সব তোমার টাকা। তোমার বিয়ে করা উচিত হয় নি আমায়। এখন বুঝতে পারছি, আমার বাবার অনেক টাকা বলেই তুমি তার মেয়েকে বিয়ে করেছিলে। এই ভাবে ঝগড়া লেগেই থাকে। ছেলে তো ইদানীং অর্ধেক দিন বাড়ি থাকে না, আপিসের কাজে বাইরে-বাইরে ঘোরে।

এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ মাসীমা চোখে আঁচল দিয়ে কেঁদে ফেললেন। আজ এক বছর হলো, বৌমা বাপের বাড়ি চলে গেছে। বলেছে, স্বামীর ঘর আর করবে না!

কী সর্বনাশ! তারপর?

তারপর আর কি? ছেলেও বলেছে, চাই না ও বৌ। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব!...তখনি বারণ করেছিলুম বাবা, একে বড় লোকের মেয়ে, তায় এম এ. পাস, তোর সঙ্গে কি করে বনিবনা হবে? তখন ছেলে বলে উঠলো, টাকায় দুনিয়া বশ মানে মা, ও তো একটা সামান্য মেয়েছেলে! তুমি কিছু ভেবো না। ...এখন হলো তো? ছেলে এখন বলে, আর একটা বিয়ে করে দেখিয়ে দেবো আমি পুরুষের বাচ্চা। ভেবেছে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে আমায় জব্দ করবে!

আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাসীমা, তা ওর বাপ-মা-ই বা কেমন? মেয়েকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আপনার কাছে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

তবেই হয়েছে। পয়সার দেমাকে তারা ফেটে পড়ছে। বাপের চেয়ে মা আরো এক কাঠি সরেস! তিনি নাকি খুব বড়লোকের মেয়ে। জামাইয়ের ওপর রাগ তারই নাকি বেশী। বাপ লোকটা কিন্তু মোটের ওপর মন্দ নয়। শুনেছি চিনুকে তার নাকি এত ভালো লেগেছিল যে একরকম স্ত্রীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেয়েকে ওর হাতেই সমর্পণ করেন। এখন নাকি তাই মেয়েকে নিয়ে বাপ-মায়ের মধ্যে দারুণ অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। মা বড় জেদী—মেয়েকে এখানে পাঠাতে চান না।

বলিলাম, মা না হয় রাগী কিন্তু বাপের উচিত ছিল আপনাকে চিঠি-পত্র লেখা!

পোড়া কপাল! ও তরফ একেবারে চুপচাপ। তাছাড়া তোমার বন্ধুটিকে তো জানো, কি রকম বদ্‌রাগী! আমায় আগে থাকতে শাসিয়ে রেখেছে, যদি কোন চিঠিপত্র তুমি তাদের লিখেছো জানতে পারি, তাহলে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো। আর ফিরবো না কোনদিন মনে রেখো!...এখন আমি কি করি বল তো বাবা! মাসীমা আবার চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

তাঁকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, মাসীমা চুপ করুন। চোখের জল ফেলবেন না। এ স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, দু'দিন পরে নিজেরাই ভুল বুঝতে পেরে মিটিয়ে নেবে, আপনি দেখবেন। আমি তো বৌঠানের সঙ্গে কথা কয়ে দেখেছি, শিক্ষিতা, বেশ বুঝদার, জ্ঞানবুদ্ধি ভালই। সত্যিকারের আভিজাত্য আছে তার মধ্যে। চমৎকার মেয়ে!

মাসীমা চোখের জল মুছিয়া বলিলেন, একজনের থাকলে কি হবে বাবা, আর একজন যে তেমনি একালষেঁড়ে, গোঁয়ারগোবিন্দ! তোমাকে আর বেশি কি বলবো, পেটে ধরেছি যখন, আমি তার মা—তুমি তো ছেলেবেলা থেকে ওকে দেখছো, জানো ওর চরিত্র সবই।

ও কথার জবাব না দিয়া বলিলাম, মাসীমা, আমি আজই চলে যাবো রাত্রের গাড়িতে, তবু সারাদিনটা আছি, আপনি যদি ঠিকানাটা দেন তো আমি নিজে গিয়ে বৌঠানের হাতেপায়ে ধরে যেমন করে হোক তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারি।

সর্বনাশ! মাসীমা যেন ভয়ে শিউরে উঠিলেন। খবরদার এ কাজ করো না বাবা! যদি ঘুণাক্ষরে চিনু জানতে পারে, তাহলে আমার মাথা খেয়ে ফেলবে! ওদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, বাইরের জনপ্রাণী কেউ না জানতে পারে—বারে বারে আমায় শাসিয়ে গেছে।

মনটা খুব খারাপ হইয়া গেল। গোরার বিবাহের পরিণতি এক রকম, আবার চিন্ময়ের অন্য রকম।

দু'জনের বিবাহের দুই-রকম অভিজ্ঞতার বেদনা লইয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম।

॥ চব্বিশ ॥

মধুপুর স্টেশনের উপর দিয়া কতবার চলিয়া গিয়াছি কিন্তু আগে কখনো আসি নাই সেখানে। হাওয়া বদল করিতে অসুস্থ লোকেরা আসে এখানে জানিতাম। সত্যি চেঞ্জ-এ আসার মত জায়গা। কলকাতার এত কাছে যে এমন স্বাস্থ্যকর সুন্দর স্থান আছে, ওখানে না আসিলে বোঝা যায় না। ভারী সুন্দর। চারিদিকে গাছপালা, বনজঙ্গল। ওখান থেকে চোখে পড়ে দেওঘরের ত্রিকূট পাহাড়ের চূড়া। ভেতরে ভেতরে ছোট বড় সব বাংলো ছবির মত মনে হয়।

প্রত্যেকটি বাংলোর সঙ্গে ফুল-ফলের বাগান। ইউক্যালিপটাস গাছের ছড়াছড়ি। চতুর্দিকে তারা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, বিশেষ করিয়া বাহান্ন বিঘার দিকে শালবনের ভেতর দিয়া কিছুটা গিয়া তেওয়ারীজীর যে বিরাট বাগানবাড়ি তার তুলনা হয় না। এককালে কলকাতার কোন জমিদারের নাকি প্রমোদ-উদ্যান ছিল। তার চিহ্ন এখনো বর্তমান। বড় ফটকের ভিতর দিয়া ঢুকিলাম। অবাক লাগিয়া গেল। অনেক ছোট বড় ঘর, তেমনি ভিতরে পাঁচিল ঘেরা, মধ্যে প্রকাণ্ড বাগান, হরেক রকমের ফুলের ও ফলের গাছ। পাঁচিলের ধারে ধারে সারি সারি সাজানো বড় বড় ইউক্যালিপটাস গাছ, তাদের লম্বা লম্বা পাতাগুলো ঝিরঝিরে হাওয়ায় সব সময় যেন কাঁপিতে থাকে। বাতাসে ইউক্যালিপটাসের গন্ধ। ঘরের ভিতরে মনে হয় যেন সেই গন্ধ ছড়ানো।

গেস্ট হাউস—যেখানে আমি থাকি সেখানে শুইয়া ফুলের গন্ধের সঙ্গে ইউক্যালিপটাসের গন্ধ মিলিয়া ভারী সুন্দর লাগে। সামনে ও আশেপাশে ফুলের বাগান। অসংখ্য ফুল ফুটিয়া আছে। তিন-চারজন বাগানের পরিচর্যা করে। কুয়ো থেকে জল তুলিয়া ঢালিয়া দেয়। বাগানের ভিতরে ভিতরে যে নালা কাটা তাহা দিয়া সমস্ত বাগানটায় ছড়াইয়া পড়ে। গাছের গোড়ায় জল দেয়। ফলে সব সময় ফুল ফুটিয়া থাকে। কোন কাজকর্ম নাই, শুধু ভালমন্দ খাওয়া, দিবানিদ্রা, বই পড়া আর ইচ্ছামত সকাল বিকাল বেড়ানো। ওখানের ঐ নতুন প্রাকৃতিক পরিবেশে খুব ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এক-একদিন ভোরে উঠিয়া এক এক দিকে হাঁটা শুরু করিতাম। যে ক'দিন ওখানে আছি তার মধ্যে যাহাতে মোটামুটি মধুপুরটা সম্পূর্ণ দেখিয়া শেষ করিতে পারি—হাঁটিতে হাঁটিতে খুব ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত ফিরি না।

এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ভোরবেলা এক অভিনব দৃশ্যের সম্মুখীন হই। যাহা হয়ত বর্ণনা করা উচিত নয়, আমার পক্ষে অশোভনতা ও অনিষ্টতাই উহাতে প্রকাশ পায়। তবু এখানে উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। কারণ আমার জীবনের সঙ্গে ইহার প্রত্যক্ষ না হইলেও পরোক্ষ কিছু যোগ আছে বলিয়া মনে করি।

অবশ্য ইহার জন্য উভয়পক্ষ কেহই দায়ী নয়—ঘটনাচক্রে এরূপ পরিস্থিতি হওয়া স্বাভাবিক অথবা তৎবিপরীত, সেটা পাঠকের বিচার্য। বাস্তবিকপক্ষে এই ঘটনার যিনি নায়িকা অর্থাৎ সেই স্নানার্থিনীর কোন অপরাধ নাই। একে ঐ অঞ্চলটা বেশি নির্জন, তায় এত সকালে ওদিকে বড় একটা কেউ লোকজন হাঁটে না! বড় বড় সব বাংলো আছে বটে তবে অধিকাংশই বন্ধ। পূজা কিংবা বড়দিনের ছুটিতে শহর হইতে মালিকেরা ছেলেমেয়ে লইয়া বেড়াইতে আসে, তারপর কিছুদিন থাকিয়া চলিয়া যায়, ছেলেমেয়েদের স্কুল খুলিবার আগে পরীক্ষার অজুহাতে। আবার কোনদিন বাড়িতে লোকই আসে না। নিজের বাড়ি—বার বার আসিয়া পুরানো হইয়া যায়। ছেলেমেয়েরা আসিতে

চায় না। তাই হয়ত দু'তিন বছর ঘরদোর বন্ধ পড়িয়া থাকে। মালীরা মনিবদের চেনে। তাই তারাও যথাসম্ভব কাজে ফাঁকি দিতে ছাড়ে না। ফলে বাগান-গুলোও বেশির ভাগ অযত্নে পড়িয়া থাকে, মালীরা আসিয়া কোন সময় গাছে হয়ত একটু জল দিয়া যায়—পাছে মরিয়া গেলে বাবুদের কাছে ফাঁকিটা ধরা পড়িয়া যায় এই ভয়ে। অথচ মজা এই, কাউকে ভাড়া দিতে নারাজ এই-সব ধনী মালিকেরা। মালী বছরে এক-আধবার গাছের ফল-ফুল মনিববাড়ি পাঠাইয়া দেয়, তাহাতেই খুশি মালিকরা! মালীর মাহিনা মাসে মাসে কেহ পাঠান না। তিন মাস কি ছ' মাস পরে হয়ত মালীর নামে মনিঅর্ডার আসে। কিন্তু এর জন্য তাদের কোন অভিযোগ নাই। কারণ গাছের ফল-ফুলটা তারা বিক্রি করিয়া যা উপার্জন করে, তার মূল্য কম নয়। জমিতে যে তরিতরকারি, ফসল উৎপন্ন করে প্রতি রবিবারে হাটে গিয়া বেচিয়া আসে।

স্নানার্থিনীর বোধ হয় এসব জানা ছিল। তাই ঐ নির্জন পরিবেশে, বিশেষ করিয়া কুয়ার চারিপাশ ফুল-ফলের ঘন গাছপালায় ঘেরা বলিলে অত্যুক্তি হয় না, এমনই নিশ্চিন্ত মনে দ্বিধা-সঙ্কোচহীন ভঙ্গীতে সে স্নান করিতেছিল। সাবান মাখিয়া বালতিটির জলে ধুইয়া ফেলিয়া তখনি আবার দড়ি বাঁধা ছোট বালতিটা দিয়া কুয়া হইতে টানিয়া জলভর্তি বালতিটা দু'হাতে উঁচু করিয়া হুড় হুড় করিয়া মাথায় ঢালিতেছিল। কখনো বা সিক্ত বস্ত্রাঞ্চল বুক ও পিঠ হইতে খসাইয়া নিরাবরণ দেহে ভাল করিয়া সাবান মাখিতেছিল, সর্বস্থানে সাবান লাগাইয়া আবার ধুইতেছিল।

তাহার সেই সিক্ত স্নানমগ্ন সুগঠিত সুন্দর দেহের সুষমা কোন উৎসুক পুরুষ মুগ্ধ দৃষ্টিতে যে নির্লজ্জের মত গাছের ফাঁক দিয়া দেখিতেছে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য। গাছপালা বনজংগল আমার সবচেয়ে প্রিয়। তাই ভোরে উঠিয়া এক এক দিন এক এক দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। কোন্ স্থানের কি নাম তাহা জানিবার কোন কৌতূহলও বোধ করি নাই।

মনে আছে একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে ওইদিকটায় গিয়া পড়িয়াছিলাম! বড় বড় বাগান-বাগিচা সুন্দর সুন্দর বাংলো কিন্তু একসঙ্গে এক জায়গায় এত ইউক্যালিপটাস গাছের সমারোহ অন্য কোথাও দেখি নাই। প্রত্যেকটি বাংলোর সঙ্গে বাগানের সামনে পিছনে এপাশে ওপাশে একাধিক ছোট বড় ইউক্যালিপটাস গাছ—তেমনি রাস্তাটার দু'ধারে মনে হয় যেন সারি সারি গাছ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রভাতী হাওয়ায় পাতাগুলি ঝিরঝির করিয়া কাঁপিতেছে। বাতাসে ফুলের গন্ধকে ছাপাইয়া শুধু ইউক্যালিপটাসের সৌরভ! হাঁটিতে হাঁটিতে মনে হইতেছিল যেন আমার নাকে চোখে মুখে, আমার সর্বাঙ্গে কে যেন জামাকাপড়ে শিশিভর্তি ইউক্যালিপটাস ঢালিয়া দিয়াছে। বড় ভাল লাগিতেছিল। সবে সকাল হইয়াছে। গাছে গাছে বিচিত্র

পাখীর ডাক—এক একটি বাংলোর বাগানে অজস্র ফুল ফুটিয়া আছে। আমি একা, পথে আর কেহ নাই। মনে হইল যেন প্রকৃতি তার সে রূপ কেবল আমাকেই দেখাইবার জন্য সেদিন বিশেষ করিয়া আমাকে ওইখানে টানিয়া আনিয়াছে। সত্যি সেই পাতা-ঝিলিমিলি ইউক্যালিপটাসের গন্ধে ভরা পথে দু'পাশের গাছপালা ফুলের বাগান দেখিতে দেখিতে আমি যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম। নির্জনতা, নিঃসঙ্গ না হইলে বুঝি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায় না। হাঁটিতেছিলাম। ধনীর প্রমোদকাননে যেমন ইটালীয়ান ভাস্কর্যের নিদর্শন উলঙ্গ নারীমূর্তি সাজানো থাকে, হঠাৎ একসময় সেই স্নানার্থিনীকে দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। আমার যেন স্বপ্নভঙ্গ হইল। মনে হইল এ যেন আর এক শিল্পীর হাতে গড়া অত্যাশ্চর্য এক নারীমূর্তি! তবে রক্তমাংসের, জীবন্ত!

সত্যি বলিতে কি, আরো দু'তিনদিন ওই পথে ঠিক ও সময় বেড়াইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিনের সে দৃশ্য আর কোনদিন চোখে পড়ে নাই। তারপর ওদিকে আর যাই নাই।

॥ পঁচিশ ॥

সেদিন বিকেলে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িটা দেখিয়া ফিরিতেছিলাম! মধুপুর বাজার পার হইয়া বর্ধমান মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কাছাকাছি আসিতে হঠাৎ দেখি দেবুদা দাঁড়াইয়া আছে। হাতে একটা খাবারের ঠোঙা মুখে জ্বলন্ত সিগারেট—যেন কার প্রতীক্ষা করিতেছে। সত্যি বলিতে কি প্রথমটা ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। তাকে চিনিতে পারি নাই। সেই থসথসে মোটাসোটা বড়লোকের আদরে লালিত একমাত্র সন্তানের ভাবনা-চিন্তাহীন গোপাল গণেশ মার্কা চেহারার বদলে 'নেভি-ব্লু' রঙের প্যান্টের সঙ্গে সিল্কটুইল হাফশার্ট, পায়ে সাদা কেডস্-এর জুতা। মাথায় দশআনা ছ'আনা ছাঁট, এমন স্মার্ট ইয়ং ম্যানের মত যে দেবুদার চেহারা হইতে পারে কল্পনা করি নাই। সেই বিয়ের আগে দেখিয়াছিলাম, তারপর এই বছর চারেক পরে সাক্ষাৎকার!

তাই কাছে আসিতে চমকিয়া উঠিলাম, আরে দেবুদা, তুমি? মাইরি, তোমাকে একেবারে চিনতে পারি নি। হাতে ওই ঠোঙার বদলে একটা টেনিস খেলার র‍্যাকেট থাকলে একেবারে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ছাত্র!

দেবুদা মুখের আধপোড়া সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া বলিল, কেন মিছি-মিছি গুলপট্টি মারছিস?

আপ্ অন্ গড্! তোমাকে একটা স্মার্ট ইয়ং ম্যান মনে হচ্ছে।

তাহলে এ কথাটা আমার বৌকে একবার এখুনি বলবি—চল, তোকে সন্দেশ খাইয়ে দেবো।

সে কি, আমি বলতে যাবো কেন? তাঁর কি চোখ নেই? তার চেয়ে বড় সাক্ষী আর কে আছে? তিনি তো তোমার বিয়ের চেহারা দেখেছেন—সেই ভীম নাগের দোকানে সন্দেশ বেচা লোকের মত! তার সঙ্গে এখন কি তুলনা হয়!

তার চেয়ে বেশি কেউ জানে না ঠিকই কিন্তু সে বলে তুমি একটা আধ-বুড়ো, কেবল ভালমন্দ খাওয়া আর ঘুম ছাড়া কিছু বোঝো না। তোমার ভেতরে শখ, আনন্দ বলতে কিছু নেই। বলে নিভন্ত উনুনের মত অবস্থা তোমার।

ইয়ার্কি রাখো! তা তুমি এটা সহ্য করো কেন? এ তো তোমার পুরুষত্বের অবমাননা!

হ্যাঁ জানি, আমি কচি খোকা নই। তুই আমায় জ্ঞান দিতে আসিসনি। আর এ সব কিছুর জন্যে তুই দায়ী—আমার সবচেয়ে অনিষ্ট করেছিস তুই।

আমি? সে কি! কি বলছো তুমি?

হ্যাঁ। তুই ব্যাটা একটা আঠারো বছরের জংলী ছুঁড়ীকে বয়েস ভাঁড়িয়ে তাকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বলে নিজের ঘাড় থেকে নামিয়ে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে সরে পড়েছিলি। এতদিন পরে তোকে পেয়েছি—ছাড়ছি না আজ, চল—

দেখো দেবুদা, মাইরি আর যাই বলে ইয়ার্কি মারো কিছু বলবো না কিন্তু এই মিথ্যা অপবাদ দিলে কিছুতেই সহ্য করবো না। ছি ছি! আমি কোন দিন তাকে বিয়ে করবো বলিনি।

দেবুদা বলিল, তা জানি। তোর জেঠাইমা বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছিল, তুই ওকে দেখেই নাকচ করে দিয়েছিলি—তারপর সেই মালটিকে কৌশলে আমার ওপর চালান করে দিয়ে একেবারে ডুব মেরে দিলি।

এবার আমার সত্যি সত্যি রাগ হইল। বলিলাম, দেখো দেবুদা, আমার সম্বন্ধে তোমাকে এসব কে বলেছে জানি না, তবে যেই বলুক এটা সর্বৈব মিথ্যা তুমি জেনো!

নিমেষে দেবুদার মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তার সদা রঙ্গরসপ্রিয় প্রকৃতিতে ইহা সম্পূর্ণ বেমানান, যদিও আমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়, কিন্তু ছোট-বড় লঘু-গুরু কিছুই মানিতো না দেবুদা। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি-আড্ডা দিতে, এমন কি শ্লীল-অশ্লীল আলোচনা সব কিছুই সমবয়সী ইয়ার-বন্ধুর মত করিতে এতটুকু সমীহ বোধ করিত না। বরং লজ্জা পাইলে বলিত, "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ"—এটা শাস্ত্রের বচন, অমান্য করা কি উচিত? বলিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিত। তার মধ্যে এমন একটা স্নেহবাৎসল্য ও প্রীতি মেশানো অন্তঃকরণ আছে, যার জন্য তার প্রতি একটা আন্তরিক আকর্ষণ বোধ করিতাম। তাহাকে কাছে পাইলে ছাড়িতে ইচ্ছা করিত না।

তাই হঠাৎ দেবুদাকে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া তার মন হইতে আমার

সম্বন্ধে এই মিথ্যা ধারণা দূর করিবার জন্য বলিলাম, ভাই দেবুদা, তুমি বিশ্বাস করো, এর মধ্যে আমার কোন ষড়যন্ত্র বা কৌশল নেই। আমার জেঠাইমার সঙ্গে কি কথা কার হয়েছিল জানি না, হঠাৎ তাঁর অসুখের সংবাদ পেয়ে দেশে যেতে একদিন দেখি গাঁ থেকে গরুরগাড়ি করে কন্যাকে নিয়ে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে হাজির। এর আগে আমি এসবের বিন্দুবিসর্গও জানতুম না। ভদ্রলোককে যখন বললুম, আমার বিয়ে করার মত অবস্থা তো নেই, তাছাড়া কোন দিন বিয়ে করবো না স্থির করে রেখেছি—তখন আমার হাত দুটো ধরে ভদ্রলোক কেঁদে ফেললেন। বললেন, বাবা, তোমরা তো শহরে থাকো, কত লোকজনের সঙ্গে চেনাজানা—যেমন করে হোক আমাকে এই কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করো বাবা। দোজবরে, তেজবরে, যেমন হোক একটা পাত্র। শুধু দু'বেলা দুমুঠো খেতে পরতে পায় আর ভদ্র বংশ হয়, এর চেয়ে বেশি আর কিছু চাই না। একদিন, আমার বাপ-পিতামহের অনেক জমি-জমা বাগান-বাড়ি ছিল, আজ ভাগ্যদোষে আমি পথের ভিখিরী বাবা। এর বেশি কিছু বলতে চাই না। বিশ্বাস না হয় তোমার জেঠাইমাকে জিজ্ঞেস করো বাবা! বলে বার বার চোখ মুছিতে লাগিলেন।

দেবুদা চুপ করিয়া ছিল। সহসা বলিয়া উঠিল, আর সেই সঙ্গে তুই ক'বার চোখের জল মুছলি, বললি না তো?

না-না—ঠাট্টা নয় দেবুদা, সত্যি ভদ্রলোককে দেখে আমার খুবই কষ্ট হয়েছিল, তাই তাকে নিয়ে একদিন মেসোমশাইয়ের সঙ্গে শুধু পরিচয় করিয়ে দিলুম। তার পর যা কিছু তোমরাই তো করেছো ভাই।

দেবুদা বলিয়া উঠিল, জানি, বাবা নিজে দেখতে না গিয়ে আমার মেজ ভগ্নীপতির ওপর ভার দেন। তিনি আমার ছোট বোন ও ভগ্নীপতির সঙ্গে দল পাকিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করেন। ওঁদের ধারণা হয়েছিল, এখানে না হলে আমার আর কোথাও পাত্রী জুটবে না আমি এমনি অ-পাত্র।

বলিলাম, দেখো দেবুদা, তুমি ওদের মিছিমিছি দোষ দিচ্ছ। আগেই আমি ভদ্রলোককে সব বলেছিলুম, পাত্রের বয়স একটু বেশি, ইচ্ছে করেই এতদিন বিয়ে করবো না বলেছিল তাই—নইলে বাপের অবস্থা খুবই ভাল, কলকাতা শহরে বড় রাস্তার ওপরে দুখানা ভাড়াবাড়ি—তার যা আয় একটা উকিল ব্যারিস্টারের আয়ের চেয়ে বেশি। বাপের ওই একটাই ছেলে, তাই সাহেবেরও আপিসে দাসত্ব করে না। সব দিক থেকে যাকে বলে সোনার পাত্র।

দেবুদা মুচকি হাসিয়া বলিল, সোনার পাত্র তোমার চোখে হতে পারি কিন্তু যার সঙ্গে মালাবদল করেছি, তার চোখে কিন্তু সোনার পাত্র ছিলি তুই।

দেখো দেবুদা, ফের তুমি ওই সব যা-তা বলছো! বিশ্বাস করো আমি তাকে দেখি নি, তার মুখের দিকে তাকাই নি কখনো।

তুমি দেখো নি কিন্তু সে দেখেছে। তুমি তার মুখের দিকে না তাকালেও

সে তাকিয়ে ছিল!

কেন এইসব মিথ্যেগুলি আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছো—সব সময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না। আগেই তোমায় নিষেধ করেছি, আর দ্বিতীয়বার তুমি এসব কথা মুখে আনবে না!

দেবুদা বলিল, ইয়ার্কি নয়, যা সত্যি তাই বলছি।

ভয়ানক রাগ হইল। বলিলাম, কে এসব বলেছে?

দেবুদা একটু থামিয়া বলিল, যদি বলি আসল লোক বলেছে!

এবার আর আমার মুখে কথা সরিল না। তখন দেবুদা বলিল, বিশ্বাস কর বিয়ের আগে পাত্রীও জানতো তোর সঙ্গে বিয়ে হবে। ওর বাবা আগে কিছু বলে নি।—হঠাৎ পাকাদেখার দিন ও জানতে পারে তোর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না। কালো-কুচ্ছিত বলে তুই নাকচ করায় ওর নাকি আরো ভাল পাত্র ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন। খুব বড়লোক, খাস কলকাতা শহরে বাড়ি। বিয়ের দুদিন আগে পাকা দেখেছিলুম আমরা যে সোনার হার দিয়ে, সেটা দেখে তখন পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন সকলের বিশ্বাস হয়, সত্যি সত্যি ওর বড়-লোকের ঘরেই বিয়ে হচ্ছে। ও খুব ভাগ্যবতী! কিন্তু বিয়ের দিন বর দেখে আশেপাশে মেয়েদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে, ওমা এই যে শুনেছিলুম, ছোকরা বর হচ্ছে খেঁদীর, এ যে দেখছি দোজবরের মত, অনেক বয়েস! মেয়ের সঙ্গে হয়ত মানাবে না।

এই সব বলিতে বলিতে দেবুদা থামিয়া গেল। তারপর পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া আমার হাতে একটা দিয়া বলিল, যাক্ গে। গুলি মারো। এখন কি করছিস, কোথায় আছিস তাই বল?

সব শুনিয়া একটা দেশলাই-কাঠি জ্বালিয়া আমার সিগারেটটা ধরাইয়া, তারপর নিজেরটা ধরাইয়া একমুখ খোঁয়া ছাড়িলে বলিলাম, কেন, বেশ তো আছো মনে হচ্ছে দাদা, তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, তাহলে অষ্টাদশীর সঙ্গে অষ্টাত্রিংশ—যাকে বলে 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা'—এ তো পরম সৌভাগ্যের কথা।

ঘন ঘন বার দুই তিন একসঙ্গে সিগারেটে টান দিয়া দেবুদা বলিল, ব্যাটা এদিকে ঠেলা সামলাতে আমার প্রাণ বেরুচ্ছে, আর তুই দেখছিস সৌভাগ্য!

হাসিয়া ফেলিলাম। তোমার সেই ভীম নাগ-মার্কা চেহারাকে যে এই রকম স্মার্ট ইয়ং ম্যান করেছে এই তিন চার বছরের মধ্যে, সেটাকে তুমি সৌভাগ্য বলো না!

ও করেছে কি! তোদের মত ইয়ংম্যানদের সঙ্গে কম্পিটিশন্ করার জন্যে গোপনে সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে গিয়ে লেংটি পরে রোজ একশো দেড়শো ডন-বৈঠক দিয়েছি—সে খবর তো কেউ জানে না! জানিস, এই বয়সে যে প্যাণ্ট পরা ধরেছি সেও ওর কাছে প্রেস্টিজ রক্ষা করতে।

এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া আবার ঘন ঘন সিগারেটে টান দিয়া বলিল, আবার

বলে কিনা তুমি কোন চাকরি করো না, ঘরে বসে থাকো, আমার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে তার জন্যে মাথা কাটা যায়। বলে, তোর বর চাকরি করে না, বেকার! সেজন্য বাপের বাড়ি যায় না আর।

আমি বলি, তোমার বন্ধুদের বলো তোমার বর জমিদারের ছেলে! তার উত্তরে বলে, তাহলে জমিদারের বৌয়ের মত হীরে-মুক্তোর গয়না কৈ? বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে।

এবার সিগারেটটা হাতে লইয়া বলিল, তার অদ্ভুত সব শখের কথা শুনলে তুই হাসবি।

কি রকম—শুনি শুনি!

ঠোঁটের কোণে হাসি চাপিয়া দেবুদা শুরু করে, জানিস আমাদের বাড়ির পিছনে গলিতে ভাড়া থাকে একজন, রোজ সকাল আটটায় খেয়েদেয়ে আপিস যায় হাতে একটা টিফিন-কৌটো নিয়ে।

আমার বৌ বলে, তার খুব ইচ্ছা করে আমি ওই রকম সকালে আপিসে বেরিয়ে যাবো আর ও আমার জন্যে খাবার তৈরি করে দেবে। আবার বিকেল-বেলা ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে রাস্তার দিকে চেয়ে কখন আমি বাড়ি ফিরবো!

বলিলাম, বেশ ভালো বলেছে দেবুদা, তুমি রাগ করছো কেন?

কি বললি? তার মানে তুইও ওই দলে! তুই চাস আমি ওই রকম ভোরে উঠে কারখানায় কাজ করতে ছুটি? অর্থাৎ আমি যে বেকার সেই কথাই ওই ভাবে ঘুরিয়ে বোঝাতে চায়—ভেবেছে আমি বোকা, কিছু বুঝি না!

বলিলাম, তুমি ও কথা ভাবছো কেন দেবুদা, তার বদলে মনে করো না সে তোমায় ওইভাবে সেবা করতে চায়।

দ্যাখো আলো, আমায় ন্যাকা ভাবিস নি। দিনরাত যে বাড়িতেই রয়েছে, তাকে বুঝি ওইভাবে সেবা না করলে আশ মেটে না!

আরে না-না দেবুদা, এর ভেতরের কথাটা তুমি ধরতে পারো নি।

তুই থাম! আসল উদ্দেশ্য আমি বেকার, ঘরে বসে বাপের খাই—সেটা ওর পছন্দ নয়!

আঃ, তোমার মধ্যে দেখছি রসকষ বলে কিছু নেই।

তুই দেখছি আমার বৌয়ের দলে! সেও এই কথা বলে!

বলবে না? তুমি ভুলে যাচ্ছো রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা—"তোমায় নতুন করে পাবো বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ/ও আমার ভালবাসার ধন।" অর্থাৎ তুমি আপিস চলে যাবে। সারাদিন তোমার বিরহে ছটফট করবে, তারপর মনে হবে যেন কতকাল পরে তোমায় বুকে পেলে!

আহা-হা, মানিক আমার রে! কোথায় ছিলে এতদিন? বলিয়া খপ্ করিয়া আমার দাড়িতে হাত দিয়া নিজের সেই হাত মুখে ঠেকাইয়া চুমু খাইল। তারপর বলিল, তুই তো দেখছি তাকে চোখে না দেখেই তার প্রেমে হাবুডুবু

খাচ্ছিস!

দেখো দেবুদা, ফের তুমি আমার সামনে ওই সব বলছ!

দেবুদা বলিল, এত রসের কথা তো কইছিস—দিয়েছিস তো একটা জংলী গেঁইয়া মাল ঘাড়ে চাপিয়ে!

দেখো দেবুদা, তুমি যাকে বারে বারে জংলী বলছো, তার কথাবার্তা শুনে তো তেমন মনে হয় না।

এবার রাগিয়া ওঠে দেবুদা, জানিস এবার পুজোর সময় আমার মামাদের পালা ছিল পুজোর। আমাদের সকলকে যাবার জন্যে বিশেষভাবে দিদিমা বলে দিয়েছিলেন। পাড়াগাঁয়ের যেমন বিরাট বাড়ি তেমনি সব বাগান পুকুর। ওমা, বাগানে একটা গাছে বড় বড় পেয়ারা ঝুলছে দেখে একেবারে কোমরে শাড়ীর আঁচলটা জড়িয়ে তরতর করে গাছে উঠে গেল। আমরা সবাই হৈ-হৈ করে উঠি, শিগগির নেমে এসো, ডাল ভেঙে পড়ে গিয়ে এখুনি হাত-পা ভাঙবে! কিন্তু কে কার কথা শোনে, এ ডাল থেকে ও ডালে গিয়ে পেয়ারা পেড়ে নিয়ে আসে। সবাই ছি-ছি করতে থাকে—এ কি গেছো বৌ রে বাবা! জানো তো আমার মামারা শোভাবাজার রাজবাড়ির দৌহিত্র—কিরকম অভিজাত পরিবার! চৌরঙ্গীর কাছে পার্ক স্ট্রীটে মামাদের বিরাট বাড়ি, ফটকে দারোয়ান, বেয়ারা, চাকর দাস-দাসী, দু'তিনটে মোটরগাড়ি।

এই বলিয়া একটু থামিয়া কহিল, শুধু কি এই, অসভ্যতার সীমা নেই। সবাই বাড়িতে বাথরুমে স্নান করছে, সেখানে ভিড় দেখে একেবারে পুকুরঘাটে গিয়ে হাজির। ডুব দিয়ে স্নান করতে নেমে সাঁতার কাটতে কাটতে এপার ওপার হলো! সবাইয়ের মুখে এক কথা, একি গেছো মেয়ে রে বাবা, গাছে ভয় নেই, জলে ভয় নেই—কে বলবে শহরের বড়লোকের বৌ!

মুখ হইতে সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেবুদা বলিল, আমাদের সকলের মাথা হেঁট্—ওই একবাড়ি থৈ-থৈ করছে বড়লোক আত্মীয়-স্বজন চারিদিকে, তখন আমার কি অবস্থা বুঝতে পারছিস তো!

বলিলাম, দেখো দেবুদা, এর জন্যে এত লজ্জা বা অপমানের কি আছে! পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, এতদিন পরে যদি পুকুর দেখে সাঁতার কাটে কিংবা গাছে চড়ে, সে তো বরং আনন্দের কথা! ওই রকম একটা প্রাণচঞ্চল মেয়ে, স্বাস্থ্য-সম্পদে উজ্জ্বল......

থাক থাক, ওই স্বাস্থ্যসম্পদের আর বড়াই করিসনি, ওর ওই স্বাস্থ্যের জন্য কত সম্পদ যে আমার বাবার ডাক্তার আর ওষুধের পেছনে গিয়েছে, তা যদি জানতিস তাহলে ওকথা মুখে উচ্চারণ করতে পারতিস না! আর ভয়টা আমাদের আরো সেইজন্যে। পাড়াগাঁয়ের ওই পুকুরে স্নান করে আবার যদি ম্যালেরিয়া ধরে!

তোমার এ কথার কোন অর্থ হয় না দেবুদা। যদিও তা তোমার আমার সকলের ক্ষেত্রেই খাটে।

বিয়ের সময় মালখানা কি রকম ছিল দেখেছিস তো! কেল্টে, রোগা হাড্ডিসার। ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরে ভুগে ভুগে তো ওই মূর্তি হয়েছিল। আগে তো চেপে গিয়েছিল, তারপর মার কাছে একদিন কাঁদতে কাঁদতে সব বলে ফেলে, পয়সার অভাবে ওর বাবা চিকিৎসা করাতে পারেনি। আমার বাবা তখনি একবারে বিধান রায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করে দেন। তারপর দু'বছর ধরে ওষুধ-ডাক্তারের পেছনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করার পর ওই স্বাস্থ্য আবার ফিরে পায়।

তাই নাকি!

দেবুদা এবার বিকৃত কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ, তাই। আর ন্যাকা সাজতে হবে না। বিয়ের আগে তো দেখেছিলি, এখন দেখলে বুঝতে পারবি, আর কিছু বলতে হবে না।

ঠিক এই সময় একটা ছোকরা তিন প্যাকেট সিগারেট হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

দেবুদা একটা ধমক দিয়া বলিল, শুয়োর, বদ্মাইস, এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হয়ে গেল, সিগারেট কিনতে গিয়ে কোথায় আড্ডা দিচ্ছিলি সত্যি কথা বল!

ছেলেটা কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, সিগারেট কোথাও পাইনি, তাই সমস্ত বাজার খুঁজে খুঁজে এই তিনটে প্যাকেট যোগাড় করেছি।

এ্যাঁ, ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট্! বলিলাম, এই সব দামী সিগারেট তুমি আজকাল খাচ্ছো নাকি?

আর বলিসনি, এমন গেঁইয়ার পাল্লায় পড়েছি—সিগারেটের খুব ভাল গন্ধ না বেরুলে খেতে দেবে না, কোথায় যে ফেলে দেবে খুঁজে পাবো না। অথচ রাত্রে বিছানায় শুয়ে আমার সিগারেট খেতে হবে। একটা কি দুটো খেলে চলবে না, তিনটে-চারটে এক এক রাত্রে খেতে হয়, ওই গন্ধ নাকে না লাগলে নাকি ওর চোখে ঘুম আসে না। ফলে সিগারেটের খরচ যা বেড়ে গেছে, তোকে কি বলবো! এই যে তিন প্যাকেট দেখছিস—তিনটে দিনও যাবে না!

হাসি চাপিয়া কহিলাম, তার চেয়ে না খেলেই পারো।

ওরে সর্বনাশ! তাও করে দেখেছি। যাকে বলে হিতে বিপরীত। বিষ নেই কুলোপানা চক্র—বলিয়া চুপ করিল দেবুদা।

কৌতূহল বাড়িয়া যায়। বলিলাম, সেটা কি রকম ব্যাপার শুনি!

না, থাক গে......

বলিলাম, সবই যখন বললে, আর এইটুকু বাকী রাখছো কেন দাদা!

না, মানে কি জানিস, আবার সিগারেট না খেলে এমনি গোঁসা হবে যে সারা রাত আমার দিকে পিছন ফিরে থাকবে, একটা কথা পর্যন্ত কইবে না! অনেক সাধ্যি-সাধনা করলে একেবারে ফোঁস করে ছোবল মারবে, জানি আমি যা ভালবাসি, তোমার তা ভাল লাগে না!

যত বলি সিগারেট যে একেবারে নেই, ফুরিয়ে গিয়েছে—জানতুম না। কে কার কথা শোনে!

খবরদার গায়ে হাত দেবে না বলছি! বলে রাগের জ্বালায় বিছানা ছেড়ে ঘরের মেঝেয় রাতভোর পড়ে থাকবে। কার বাপের সাধ্যি তাকে বিছানায় শোয়ায়! আমি তখন ঘুমোতে পারি বল্? সারারাত আমারও জেগে কেটে যায়। সিগারেট একেবারে ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলুম, ওটা না নিয়ে বাড়ি যাওয়া চলবে না। ওঃ, কি একখানা বংশদণ্ড যে আমার যথাস্থানে তুই দিয়েছিস—জানিস না!

এতক্ষণ হাসি চাপিয়া ছিলাম, এবার আর পারিলাম না, যেন হাসিতে ফাটিয়া পড়িলাম।

ভ্রূ কুঁচকে দেবুদা বলিল, ব্যাটা হেসে যে গড়িয়ে পড়লি! পরের দেখে সবাই হাসতে পারে—তোর নিজের হলে তখন বুঝতিস কত মজা!

আমি এবার রুমাল বাহির করিয়া মুখে গুঁজিয়া দিলাম। তবু যেন হাসি থামে না।

ওঃ, খুব স্ফূর্তি যে দেখছি! ভাবছিস দেবুদার ওপর খুব এক হাত নিয়েছিস, না? এই জন্যে তোকে দেখামাত্র আমার গা-টা জ্বলে উঠেছে, তুই-ই যত অনিষ্টের গোড়া!

বলিলাম, থাক দাদা আর তোমায় জ্বলতে হবে না, আমি বিদায় হচ্ছি।

না-না, সে কি! আমার সঙ্গে চল!

বলিলাম, কোথায়?

কেন, আমাদের বাড়ি—আসবি না? মা, বাবা, বৌ সবাই এসেছে বললুম তো। তাদের সঙ্গে একবার দেখা করবি চল!

না ভাই দেবুদা, আজ থাক। দেরি হয়ে গেছে। পরের চাকরি করি তো? তবে কাল আসবো—তোমার ঠিকানাটা আমায় বলে দাও ভাই।

আরে চল না, কোথায় বাড়ি খুঁজবি, তুই তো সবে এসেছিস ক'দিন। তার চেয়ে আমার সঙ্গে এখন চল—একটু দেখা করেই চলে যাস।

না ভাই, সন্ধ্যে হয়ে এলো—আমায় এখুনি যেতে হবে। পরের চাকরি করি, খাওয়া-দাওয়ার সব রেডি।

দেবুদা বলিল, আসবি তো ঠিক কাল? সকালের দিকে আয়, আমাদের এখান থেকে চা খেয়ে যাবি।

আচ্ছা দেখা যাক্।

দেখা যাক কেন, কি এমন রাজকার্য তোমার ওই সকালবেলায়? না হয় সেগুলো সেরেই আসিস্। মা বাবা খুব খুশি হবেন। তাছাড়া—বলিয়া একটু থামিয়া কহিল, ওকে তো একেবারে দেখিস নি বিয়ের পর!

বলিলাম, আচ্ছা তাই হবে। ঠিকানাটা কি হোল তাহলে যেন? লাহিড়ী-বাবুর বাংলো, কালীপুর টাউন?

হ্যাঁ, স্টেশনের কাছে—একটা সাহেবদের কবরখানা দেখেছিস নিশ্চয় ?

হ্যাঁ হ্যাঁ—

ওরই এক পাশ দিয়ে চলে গেছে—পায়ে-হাঁটা পথ—খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখবি ডানদিকে একটা একতলা পুরনো ইঁট-বার-করা বাড়ি—ব্যস, সেটাকে ডাইনে রেখে এগুলেই দেখবি চওড়া রাস্তা, দুদিকে সারিবন্দী ইউক্যালিপটাসের গাছ আর দু'পাশে বাগান-বাগিচাওলা বারান্দা।

রাস্তাটার প্রায় শেষপ্রান্তে ডানদিকে সাদা কাঠের ফটক। ফটকের বাঁদিকে একটা মোটা ইউক্যালিপটাস গাছ, লম্বা ঢ্যাঙা নয়, মাথাটা ঝড়ে কবে ভেঙে যায়, ফলে একগোছা মাথায় যেন ঝাঁকড়া চুলের খোঁপা। ব্যস, ফটক খুলে ঢুকলেই ছোট একটা একতলা বাড়ি, চারিদিকে ফুলের গাছ, অসংখ্য গোলাপ—সাদা লাল ফুটে আছে দেখবি। ওই বাড়িতেই আমরা থাকি। লাহিড়ীবাবুর আসল বাংলোটা চৌকো বিরাট খিলানওলা—দুই বাড়ির মধ্যে কেবল ফুল ও ফলের গাছ অসংখ্য।

আচ্ছা ঠিক আছে, বলিয়া দেবুদার নিকট হইতে বিদায় লইয়া হন্‌হন্ করিয়া হাঁটিতে শুরু করিয়া দিলাম। রাত্রে বিছানায় শুইয়া মনে হইল, না, দেবুদার বাড়ি যাইব না। মিছিমিছি অকারণে হয়ত কত কথা শুনিতে হইবে, যার আমি কিছুই জানি না। শুধু কন্যাদায়গ্রস্ত এক বিপন্ন গরীবের যদি কিছু উপকার করিতে পারি, সেই জন্য দেবুদার বাবার কাছে তাঁকে লইয়া আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলাম। বাকী যা কিছু ওঁরা নিজেরাই করিয়াছেন।

তার চেয়ে গা-ঢাকা দেওয়াই ভাল। কি দরকার কতগুলো ভাল-মন্দ কথা শোনার! তাছাড়া দেবুদার বৌ দেখিয়া কি আমার চারটা হাত-পা গজাইবে!

অতএব মনে মনে না যাওয়াই স্থির করিয়া ফেলিলাম। এইভাবে পর পর পাঁচটা দিন কাটিয়া গেল। হঠাৎ জমিদার-গৃহিনীর পায়ের গাঁটে ব্যথা দেখা দিতে, মধুপুর বাজার হইতে ওষুধ কিনিতে গিয়া সেখানে সহসা দেবুদার সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

কেন গুলপাট্টি ঝাড়লি নিশ্চয় যাবি বলে! যেতে পারবি না, বলতেই পারতিস! তোর জন্যে আমরা সকালে চা না খেয়ে কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলুম!

এইসব রোগের ঝামেলায় পড়ে গেছি। দেখছো তো ওষুধ কিনতে এসেছি এদিকে—তা তুমি কি করতে ?

বিয়ে-থা করেছিস ?

বলিলাম, না।

তাহলে আর শুনে কি বুঝবি! এমন একটি মাল ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছো যে সুস্থ হয়েও রেহাই নেই! শালা প্রত্যেক মাসেই লেগে আছে—মেনস্ট্রুয়াল ট্রাবল। এমন যন্ত্রণা যে যতক্ষণ না দু'তিনটে বড়ি পেটে পড়ছে তার—। থাক

গে ওসব মেয়েলী রোগের কথা! বলিয়া ওষুধের দোকান হইতে রাস্তায় আসিয়া দেবুদা বলিল, চল্, মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে এক কাপ চা খেয়ে তারপর যাবি।

বলিলাম, প্লীজ দেবুদা, এখন নয়। মানুষটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে দেখে এসেছি—এক মিনিট দেরি করবো না।

ওসব বুড়োদের বাতের ব্যথা অমাবস্যা, পূর্ণিমায় জানান দেবেই দেবে। একটু দেরি করে গেলে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। চল—মিছি-মিছি বাজে ধাপ্পা না দিয়ে চল এখন।

আজ থাক, কাল আমি ঠিক যাবো, মাইরি বলছি দেবুদা!

আপঅন্ গড্?

হ্যাঁ। কাল বিকেল পাঁচটায়। তোমার ওখানে চা খেয়ে বেড়াতে চলে যাবো।

পরদিন দেবুদা যেমন বলিয়াছিল, সাহেবদের কবরখানার ভিতর দিয়া হাঁটা-পথে একটু আগাইয়া আসিতে সামনে চওড়া রাস্তা, দু'পাশে ইউক্যালিপটাস-এর সারি আর সুন্দর সুন্দর বাংলো দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। এই অঞ্চল তো আমার পরিচিত এবং অত্যন্ত প্রিয়। এইখানেই তো বাগানে কুয়াতলায় সেদিন ভোরে এক তরুণীর স্নানরতা অপরূপ দেহশ্রী আচম্বিতে গাছপালার ফাঁকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম—কিন্তু এই অঞ্চলটাকেই যে কালীপুর টাউন বলে তাহা জানিতাম না।

যাহোক ঠিকানা খুঁজিয়া যখন লাহিড়ীবাবুর বাংলোর কাছে হাজির হইলাম, তখন বিস্ময় যেন শতগুণ বাড়িয়া গেল। আশ্চর্য, ঠিক সেই বাংলোর বাগানেই সেই অপূর্ব নারীমূর্তির দেখা পাইয়াছিলাম!

কি রে, ওখানে অমন হাঁ করে কি দেখছিস? বলিয়া দেবুদা ফটকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

আসল কথাটা গোপন করিয়া বলিলাম, দেখছি কি সুন্দর!

বাইরে দেখেই এই, এখনো তো ভেতর দেখিস নি! বলিয়া মুচকি হাসিয়া চোখ মটকাইল।

দেবুদার এই এক বড় বদ অভ্যাস, লঘু-গুরু বোধ ছিল না। শ্লীল-অশ্লীল কথা কার সঙ্গে কতটা বলা যায় বা বয়সের ছোট-বড়—কিছুই মানিত না। তার মুখে এক কথা "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্সে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ" অর্থাৎ ষোল বছর বয়েস হইলে ছেলের সঙ্গে বাপ বন্ধুর মত আচরণ করিবে এ তো শাস্ত্রের নির্দেশ!

বাড়ির মধ্যে পা দিতে দেবুদা উঠানের ওপাশে একটা ঘরের সামনে গিয়া বলিল, মা, দেখ কাকে ধরে এনেছি!

মাসীমার ঘরে ঢুকিয়া তাঁকে প্রণাম করিতে তিনি বলিলেন, ধরে এনেছি

কি কথার ছিরি! কেন, ও কি আসামী নাকি? ও তো বলেই দিয়েছিল আজ আসবে!

দেখুন তো মাসীমা, দেবুদা সেই দেখা হওয়া পর্যন্ত যত রাজ্যের অভিযোগ, ওর ঘাড়ে বয়েস ভাঁড়িয়ে এক গেঁইয়া, রুগ্ন, কালাজ্বর ম্যালেরিয়ায় ভোগা মেয়েকে ওর গলাক ঝুলিয়ে দিয়ে আমি সরে পড়েছি!

তুমি ওর কথায় কিছু মনে করো না বাবা। সত্যি তোমার কি দোষ! তুমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই। আমরাই বলেছিলুম তোমায় ওর জন্যে একটা একটু বেশী বয়সের মেয়ে দেখতে, তোমাদের দেশের দিকে। তাই তুমি মেয়ের বাবাকে তোমার মেসোমশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে।

কথাটা দেবুদাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিন তো। এই দেবুদা শোনো— বলিয়া পিছনে ফিরিতে দেখি, আর সেখানেই নাই।

মাসীমা তখন বলিলেন, আমরা অবশ্য বিয়ের সময় এতটা বুঝতে পারিনি। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, বাপের অবস্থা খারাপ, ভাল করে খাওয়াতে পরাতে পারেনি—আমাদের ঘরে এলে কলের জল আর খাওয়াদাওয়ার একটু যত্ন করলেই চেহারা ফিরে যাবে জানতুম। কিন্তু বৌমার মুখে যখন শুনলাম, ম্যালেরিয়া কালাজ্বরে ভুগে ওর চেহারা ওই রকম হয়ে গেছে, ওর বাবা চিকিৎসা করাতে পারেনি, তখনই তোমার মেসোমশাই একেবারে বিধান রায়ের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখালেন। তাঁর চিকিৎসায় প্রায় এক বছর থাকার পর রোগ দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহে মাংস লাগল, রং ফুটলো—যেন আর এক মানুষ। তারপর তিন মাস একনাগাড়ে বৌকে নিয়ে শিমুলতলায় গিয়ে থাকতে একেবারে বদলে গেল সে চেহারা। যারা বিয়ের সময় দেখেছিল তারা চিনতে পারে না। এমন কি বৌমার বাপের বাড়ির মানুষরাও দেখে অবাক! তারা ভাবতেই পারেনি যে সেই মেয়ের এই রূপ হতে পারে!

এই বলিয়া একটু থামিয়া মাসীমা বলিলেন, অবশ্য এর পেছনে তোমার মেসোমশাইয়ের অনেক টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু সেজন্যে তাঁর এতটুকু দুঃখ নেই। বলেন মেয়েদের স্বাস্থ্যটাই আসল রূপ! এই বলিয়া তিনি ডাকিলেন, বৌমা, একবার এঘরে এসো তো? তুমি তো তাকে সেই বিয়ের আগে দেখেছিলে!

একখানা নীলাম্বরী শাড়ি পরিয়া দেবুদার স্ত্রী ঘরে আসিয়া ঢুকিলে মাসীমা বলিলেন, ওর সামনে আর মাথার কাপড় দিতে হবে না—দেবুর চেয়ে ও অনেক ছোট. তোমার ছোট দেওরের তুল্য।

আমি তো হতবাক্। রীতিমত রূপসী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রংটা হয়ত ধবধবে ফর্সা নয় কিন্তু ধারালো ইস্পাতের মত চকচকে। নিটোল দু হাত, লম্বা লম্বা চাঁপার কলির মত আঙুল, চোখ দুটি ঈষৎ ছোট কিন্তু তাতে যেন বিদ্যুৎ ভরা, দু'গালে ডিম্‌প্‌ল, নীচের ঠোঁটটা ঈষৎ পুরু, রসালো, ঝকঝকে দাঁতের পাটি—দুহাত কপালে দিয়া নমস্কার করিতে গেলে যখন

বলিলাম, আমি ছোট দেওর, এখুনি মাসীমা বললেন, আমারই বরং নমস্কার করা উচিত। বলিয়া যেই পায়ে হাত দিতে যাইব, অমনি 'ছি ছি' বলিয়া জিব কাটিয়া পা দুটি সরাইয়া লইয়া ঘরের এক কোণে সরিয়া গেল। সেই মুহূর্তে যে সলজ্জ হাসি ও দুচোখে বিদ্যুৎ-শিহরণ দেখিয়াছিলাম, তাহা আজও ভুলি নাই। আমার সঙ্গে তার সেই প্রথম সাক্ষাৎকার। চোখে চোখে দেখা। দেবুদার স্ত্রীকে তখন মাসীমা বলিলেন, বৌমা, চা কি হয়ে গেছে?

হ্যাঁ মা, আনছি। বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে তিনি বলিলেন, থাক, এখানে আনতে হবে না। তোমার ঘরেই ও যাচ্ছে। তোমরা একসঙ্গে চা খাওগে!

দেবুদার ঘরে ঢুকিতে দেখি টেবিলের ওপর বড় বড় সাদা ও লাল গোলাপের তোড়া। সুন্দর লেসের টেবিল-ঢাকা। দেবুদা একটা চেয়ারে বসিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল।

বলিলাম, তোমার ওপর আমার এত রাগ হচ্ছে যে কি বলবো! তুমি একটি আস্ত লায়ার! মিথ্যাবাদী! এই তোমার রুগ্ন কালো বৌ!

দেবুদা বলিল, জিজ্ঞেস কর্—যা বলেছি সত্যি না মিথ্যে! বিয়ের সময় কি ওর চেহারাটা আগে ছিল, তুইও তো দেখেছিলি!

ফের তুমি আমার নামে কতগুলো মিথ্যে বলছো? এই তো আসল লোক সামনে রয়েছে, জিজ্ঞেস করে দেখো!

দেবুদার বৌ আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, হ্যাঁ, ঠাকুরপো ঠিক বলেছে। দেখেনি—শুধু আমার মুখের ওপর চোখটা রেখেই ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

॥ ছাব্বিশ ॥

একেবারে প্রথম সাক্ষাৎ ও প্রথম পরিচয়ে দেবুদার স্ত্রী আমার মতন একজন অপরিচিত ও বিশেষ করিয়া তার ঘরে আমন্ত্রিত অতিথিকে যে ওইরূপ কথা বলিতে পারে, ইহা যেমন আমার কাছে কল্পনার অতীত ছিল, তেমনি আমার জীবনে এক অভিনব অভিজ্ঞতাও বটে!

যাকে বলে একেবারে ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলাম। তাই ওর কি উত্তর দিব ভাবিতে গিয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, ওটা যে ঠিক নয়, ভুল, দেবুদাকে তো সব বলেছি বৌঠান!

ঠাকুরপো, তোমার যুক্তিটি চমৎকার! একজনকে মারলে ঘা, আর এক-জনের গায়ে দিলে মলম! বলিয়া হাসিয়া মুখে এক অদ্ভুত ভঙ্গী করিল।

ঈষৎ থামিয়া বলিলাম, কিন্তু বৌঠান, আমায় বৃথা অপরাধী করছো। আমি তো তোমার কথার কোন অর্থ বুঝতে পারছি না।

ঠিকই বলেছো। তোমার বুঝতে পারার কথা নয়।

বিস্মিত কণ্ঠে কহিলাম, তার মানে?

মানে খুবই সোজা। যা যখন বাইরে লাগে লোকের চোখে পড়ে, কিন্তু যখন তা ভেতরে গিয়ে আঘাত দেয়, যাকে বলে আঁতে ঘা—ওটা যার লাগে সে ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না!

বলিয়াই দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল!

মুহূর্তে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে ঘরে আরো একজন দ্বিতীয় ব্যক্তি উপস্থিত। সে যে আমার চেয়েও বোবা, হতভম্ব বনিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারি নাই। তাই হঠাৎ তার মুখের দিকে চোখ পড়িতেই বলিয়া ফেলিলাম, দেবুদা, এইজন্যে কি তুমি বারে বারে অনুরোধ করেছিলে আসার জন্যে!

দেবুদা যেন কি ভাবিতেছিল। হঠাৎ বলিয়া উঠিল, দেখলি তো নিজের চোখে, সাধ করে কি গেঁইয়া জংলী বলি। কোন্ কথা কখন কোথায় বলতে হয়, আজ পর্যন্ত জ্ঞান হলো না। যখন যা মনে আসে ঝপ্ করে বলে ফেলবে, এই ওর স্বভাব।

বলিতে বলিতে সিগারেটের প্যাকেট হইতে একটা আমার হাতে দিয়া নিজে আর একটা ধরাইয়া বলিল, অথচ তুই বললে বিশ্বাস করবি না, আগ্রহটা ছিল ওরই বেশি!

সে আবার কি!

হ্যাঁ, সত্যি বলছি। তোকে বলিনি সেকথা। তুই তো প্রথম দিন এলি না, তারপর আবার দ্বিতীয় দিন নিশ্চয় যাবো বলেও এলি না, ওরে বাপ সেদিন কি রাগ-ঝাল আমার ওপর!

কি রকম শুনি শুনি! বলিয়া একমুখ সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া চেয়ারটা একটু টানিয়া, দেবুদার আরো কাছে বসিলাম।

দেবুদা সিগারেটটা মুখ হইতে টানিয়া লইয়া বলিল, প্রথম সেদিন তো আমার সঙ্গে বেড়াতেই বেরুল না। বিকেল থেকে ভাল শাড়ী পরে, চুল বেঁধে সাজগোজ করেছিল, সব খুলে ফেলে দিয়ে বললে, শরীরটা ভাল লাগছে না, তুমি যাও।

আসল কথাটা মুখে না বললেও, আমি জানতুম তুই এলে চা-টা খেয়ে একসঙ্গে বেড়াতে যাবে মনে মনে স্থির করে রেখেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন না আসতে একেবারে 'ফায়ার'—আগুন ছোটে মুখে। খবরদার, আর কোনদিন তাকে মুখে বলবে না আসার কথা। সে বড়লোক জমিদারের ম্যানেজার, তোমার মত লোককে গ্রাহ্য করে না, এখানে এলে তার মান যাবে—তাই এভাবে এড়িয়ে যায়, তুমি বোকা বুঝতে পারো না, তাই তাকে বন্ধু ভেবে বার বার আসার কথা বলো!

একটু থামিয়া সিগারেটে একটা টান দিয়া কহিল, সেইজন্যেই মানে ওর মন থেকে তোর সম্বন্ধে ভুল ধারণা দূরে করার উদ্দেশ্যে আরো তোকে আসার কথা বার বার বলেছিলুম। তাছাড়া আমারও একটা প্রেস্টিজ তো আছে

বৌয়ের কাছে, বুঝিস তো।

মাইরি দেবুদা। তুমি ওর কথায় বিশ্বাস করো না। তুমি আমার কাছে চিরদিন সেই দেবুদাই আছ এবং থাকবে!

আরে থাম্ 'বেচো'। তোমাকে ওই বলে বোঝাতে হবে না। বলিয়া একটু সিগারেট টানিয়া বলিতে শুরু করিল, আসলে কিন্তু ওর মনটা ভালো। মুখে রাগঝাল যাই করুন না কেন! তোকে অপমান করার জন্যে বলেনি। তুই কিছুক্ষণ আলাপ করলেই বুঝতে পারবি।

আমি কিন্তু তখন অন্য কথা চিন্তা করিতেছিলাম। এই নারীজাতটাকে বিধাতা এমন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন যে যত কুরূপা হউক, আর যতবার আয়নায় মুখ দেখুক, কখনই ভাবিতে পারে না যে তাহাকে দেখিতে খারাপ। কাজেই কেহ কোন মেয়েকে কুচ্ছিত বলিলে, কোনদিন সে অপমান সে ভুলিতে পারে না। যদিচ এক্ষেত্রে আমি নির্দোষ, আমার নামে কেহ মিথ্যা বলিয়া তার কান ভাঙাইয়াছে, আমি জানিলেও আসল মানুষটি হয়ত বিশ্বাস করিতে পারে নাই। একের লাঠি তাই অন্যের মাথায় গিয়া পড়িয়াছে। তাছাড়া এর মধ্যে বোধ হয় তার প্রতিহিংসা-স্পৃহা গোপন ছিল। আজ শ্বশুরবাড়ির দৌলতে কেবল ভাল খাওয়াপরা নয়, বিধান মত ডাক্তারের চিকিৎসা, ওষুধপথ্য ও স্বাস্থ্যকর স্থানে দীর্ঘদিন হাওয়া বদলের ফলে গাঁয়ের সেই ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরে ভোগা চেহারার যে কতখানি রূপান্তর হইতে পারে ইহা দেখাইয়া যেন প্রতিশোধ লইতে চায়।

দেবুদা সরল ভালমানুষ, এত সব ঘোরপ্যাঁচ তাহার মাথায় ঢুকিত না। সে তাই আমার প্রতি তার স্ত্রীর এইরূপ ব্যবহারে দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া আমার কাছে যেন নিজেকে অপরাধী মনে করিতেছিল। দেবুদা তাই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একটা কথাই বার বার বলিতেছিল, তুই একটু ওর সঙ্গে মেলামেশা করলেই বুঝতে পারবি, কথাবার্তা বেখাপ্পা যা-তা বলে ফেললেও ওর ভেতরটা অন্য রকম। যদিও এখনো পর্যন্ত সেই গেঁইয়া জংলী অভ্যাসগুলো ভুলতে পারে নি।

ঠিক এইসময় দুটি খাবারের থালা হাতে লইয়া ঘরে পা দিয়াই বৌঠান বলিয়া উঠিল, জংলী গেঁইয়া বলে বৌয়ের নামে বন্ধুর কাছে লাগাতে লজ্জা করে না? তোমাদের মত সভ্যতার মুখোশ এঁটে, মনে একরকম আর মুখে অন্য রকম কথা কইতে শিখিনি। যা সত্যি বলে মনে হয়, স্পষ্ট বলতে তাই ভয় পাই না। আমি গাঁয়ের মেয়ে জেনে-শুনেই তো পিঁড়িতে বসেছিলে, তবে গাঁইয়া বলে সব সময় খোঁটা দাও কেন? মনে রেখো এই গাঁইয়া ছিল বলেই এ জন্মে আইবুড়ো নাম খণ্ডাতে পেরেছো।

বলিয়া মিষ্টান্নের থালা দুটি আমাদের সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, আমায় আর বেশি ঘাঁটিয়ো না। আমি সব জানি। জুটছিল না তো কোন মেয়ে—বুড়ো বলে সবাই পালাচ্ছিল।

আঃ বৌঠান, কি হচ্ছে! দেবুদা তো তোমায় কিছু বলেনি।

আমায় বলেনি, তোমায় তো বলেছে? বলিতে বলিতে আমার দিকে সরিয়া আসিয়া কহিল, তোমার বন্ধুর সাত জন্মের ভাগ্যি যে এই গেঁইয়া ওর কপালে জুটেছে!

বলিলাম, তা তো কেউ অস্বীকার করেনি।

অস্বীকার করার উপায় আছে কি? ওদের সেই পুরোনো ঝিটা কাজ ছেড়ে চলে যাবার সময় আমায় সব বলেছে। কেউ পছন্দ করেনি বয়েস অনেক বলে। তারপর এক ছোকরা বন্ধুকে দেখিয়ে সম্বন্ধ পাকা করে শেষে তাকে হটিয়ে নিজে গলায় মালা দিয়ে বিয়ে করতে নাকি গিয়েছিল।

বলিলাম, ঝি চাকর কে কি বললে সে কথায় কান দিতে নেই বৌঠান।

দেবুদা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, বল তো ভাই আলোক ওকে একটু বুঝিয়ে—আমার কথা বিশ্বাস করতে চায় না।

ওঃ, শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল এলেন রে। আর লোক পেলেন না জামিন দেবার!

বলিলাম, দেখো বৌঠান, এইজন্য কি আমায় আসতে বলেছিলে?

আমার বয়ে বেছে, তোমায় আসতে বলার জন্যে! যে বলেছিল তার কাছে এসেছো। তুমি এখন জমিদারের ম্যানেজার বড় মানুষ, আমার মত গরীবের বৌয়ের সঙ্গে কথা কইলে যে মান যাবে! তোমায় কি ডাকতে পারি।

ফের আবার গাঁইয়ার মত কথা কইছো তুমি—

বেশ করেছি, তোমার তাতে কি?

আচ্ছা তোমরা তাহলে ঝগড়া করো, আমি চলি, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। বলিয়া হাতঘড়িটার উপর চোখ বুলাইয়া দরজার দিকে দু পা যাইতেই, খপ্ করিয়া একেবারে দরজার সামনে গিয়া দুহাত দিয়া পথ আগলাইয়া বৌঠান বলিল, যাও দেখি কেমন সাধ্যি তোমার?

দেখো বৌঠান, আমি পরের চাকর—আর দেরি হলে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তাছাড়া আমাকে তো তুমি আসতে বলোনি, তবে তোমার কথা শুনবো কেন?

মুচকি হাসিয়া এবার বৌঠান বলিল, বুঝেছি, নিজে অপরাধ করে এখন এইভাবে ঢাকা দেবার জন্যে উল্টো চাপ দেবার চেষ্টা আমার ওপর।

বৌঠান, সত্যি বলছি, কোন অপরাধ আমি করিনি।

আহা, একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা রে! আমি সব জানি, তুমি-ই যত নষ্টের গোড়া!

বৌঠান, তাহলে পথ না আগলে আমায় যেতে দাও।

ভয় নেই। যেতে দেবো। আটকে রাখবো না। কিন্তু তার আগে ওই মিষ্টিগুলো খেয়ে নাও, আমি চা আনছি।

না, মিষ্টি আমি আর খাবো না, পেট ভরে গেছে। ঘরে পা দেওয়া থেকে

এত মিষ্টি তুমি এখনো খাওয়াচ্ছো এবং খাইয়েছো যে আর তিল ঠাঁই নেই।

সত্যি বলছি, ওই মিষ্টিগুলো না খেলে আমি চা দেবো না।

বৌঠান, বিশ্বাস করো আমি মিষ্টি খাই না। মিষ্টি খেতে বলার চেয়ে বড় শাস্তি আমার কাছে আর কিছু নেই।

বেশ তাহলে এর বদলে যে শাস্তি দেবো, বলো মাথা পেতে নেবে?

যদি মাথায় রাখার মত জায়গা হয় তো নিশ্চিত রাখব।

দেবুদার এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। চেঁচাইয়া উঠিল, আঃ, এত বকবক না করে যা বলছে শোনো না, চা-টা এনে দাও।

বলি তোমার এত গাত্রদাহ কেন? দেওরের সঙ্গে বকবক করবো না তো কি পেঁচো গয়লার সঙ্গে করতে যাবো! তোমার বুঝি সহ্য হচ্ছে না?

ওর দেরি হয়ে যাচ্ছে—ও পরের চাকরি করে, জানো তো? তাই আর সময় নষ্ট না করে চা-টা দিতে বলছি। নইলে করো না গল্প সারাদিন সারারাত, একটা কথাও বলতে যাবো না।

আসলে তোমার বন্ধু চাইছে, আমি তার খোসামোদ করি—আরো একটু থাকো বলে। তুমি, হাঁদা গঙ্গারাম, কিছুই বোঝো না যখন চুপ করে থাকো। কথা কইতে এসো না।

সত্যি, বৌঠান কথাটা মিথ্যা বলে নাই। ঠাট্টার ছলে হইলেও আমার মনের কথাটা ধরিয়া ফেলিয়াছিল। তবু তা গোপন করিয়া দেবুদার পক্ষ লইয়া লইলাম, দেবুদা ঠিক বলেছে, মেয়েমানুষ মাত্রই অবুঝ, তারা কাজের গুরুত্ব বোঝে না। উল্টে পন্ড করতে তাদের জুড়ি আর দুটি নেই।

হয়েছে। খুব পৌরুষ দেখিয়েছো, এখন থামো। ভেবেছো শাস্তির কথাটা ভুলে গেছি, তা নয়। তোমার শাস্তি হলো, আজ ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু কাল থেকে যতদিন এখানে থাকবে, আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতে হবে রোজ বিকেলে।

না-না, বৌঠান—তোমাদের দুজনের মধ্যে গিয়ে আমি দেবুদার অভিসম্পাত কুড়োতে পারবো না।

আহা বাছা রে, কি কথাই না শোনালে! তাহলে তোমার দেবুদাকে খুব চিনেছো। সে বরং হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। রোজ ঢাক ঘাড়ে করে বেড়িয়ে সে ক্লান্ত। নেহাত আমি জোর করি বলেই যায়। সারা পথ ভ্রূ কুঁচকে থাকে। যেন তাকে ভীষণ শাস্তি দিয়েছি।

দেবুদা নিঃশব্দে সিগারেট টানিতেছিল।

বৌঠান বলিয়া উঠিল, ওগো, শুনতে পাচ্ছো না তোমার বন্ধুর কথা!

দেবুদা বলিল, হ্যাঁ শুনেছি। আমি তো কালা নই।

তাহলে চুপ করে রয়েছো কেন?

দেবুদা কহিল, যা বলবার তুমি-ই তো বলছো—

তাহাকে থামাইয়া বৌঠান বলিল, তোমার বন্ধুটি কম নয়, দেখে যেন মনে

হয়, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, আসলে তার বিপরীত। একেবারে আটঘাট বেঁধে কাজে নামতে চায়। স্বামী-স্ত্রীর একজনের যত আগ্রহ—অপরজনের ঠিক ততখানি আছে কিনা যাচাই করে দেখতে চায়। তাই তুমিও একটু খোসামোদ করো এইটাই ওর মনের ইচ্ছা, বুঝতে পারছো না!

তুমি বললেই আমার বলা হলো, ও জানে। আর আমার বলার দরকার নেই।

বেশ, তা হলে ওই কথা রইলো। চা খাইয়া বিদায় লইবার সময় আমার সঙ্গে দরজা পর্যন্ত আসিয়া বৌঠান বলিয়া উঠিল।

দেবুদা বলিল, চল্ আমি তোকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

বেশ একটু আগাইয়া গিয়া আমি দেবুদাকে বলিলাম, মাইরি দেবুদা, তুমি লাকি ডগ্। একটু ফুট্ ডাস্ট্—পায়ের ধুলো দাও। রিয়েলি ইউ আর লাকি! সব দিক থেকে। এমন অদ্ভুত ফিগার যে, যে-কোন আর্টিস্ট পেলে ধন্য হয়ে যায়।

তুই তো এই প্রথম দেখলি—এর মধ্যে ফিগার এত সুন্দর কি করে জানলি?

আমি তখন সেদিনের স্নান করার দৃশ্যটার কথা বলিলাম।

পরদিন বৈকালে দেবুদার বাসায় গিয়া দেখি, তার মা-বাবা যথারীতি সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তখনো আসলে যার আগ্রহ সব চেয়ে বেশি তার দেখা নাই, অথচ দেবুদা নেভী ব্লু রংয়ের প্যাণ্ট ও সিল্ক-টুইলের ধবধবে ইস্তিরী করা চওড়াকলার হাফ্‌সার্টের সঙ্গে বাটা কোম্পানীর সাদা কেড্‌স জুতো পায়ে দিয়া বাইরের রকে একটা হাতল-ভাঙা চেয়ারে বসিয়া সিগারেট টানিতেছিল।

বলিলাম, কি, এখানে বসে যে! এখনো মহারাণীর প্রসাধন বুঝি বাকি?

কোন কথা না বলিয়া দেবুদা শুধু পকেট হইতে সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাইটা আমার হাতে দিল।

সিগারেট ধরাইয়া ফুঁ দিয়া কাঠির আগুনটুকু নিভাইয়া বলিলাম, দেবুদা, কি হয়েছে—মুখটা এমন আইনস্টাইনের মত করে আছো কেন?

দ্যাখ, ইয়ারকি সব সময় ভাল লাগে না।

আরে, সেইজন্যেই তো আসল কারণটা জিজ্ঞেস করছি। নিশ্চয় বৌঠানের সঙ্গে একটা কিছু গণ্ডগোল বাধিয়েছ!

জানি না। বলিয়া মুখটা আরো গম্ভীর করিল দেবুদা।

আচ্ছা আমি যাচ্ছি ভেতরে, দেখি কি হলো তার।

বলিয়া ভিতরে ঢুকিতে দেখি, বৌঠান ভালোভাবে প্রসাধন করিয়া চুপ-চাপ ঘরে বসিয়া আছে। দরজার কাছে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপার কি বৌঠান বল তো, তুমি এখানে চুপচাপ বসে আছো, বাইরে দেবুদাও দেখলুম গম্ভীর। অথচ পাঁচটার সময় বেরুবার কথা, সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে—

বৌঠানকে কোন জবাব না দিয়া তেমনি নিরুত্তর দেখিয়া এবার বলিলাম, দেবুদার সঙ্গে নিশ্চয় ঝগড়া হয়েছে?

শুধু একবার 'না' বলিয়া আবার তেমনি নীরব হইয়া গেল। একটু থামিয়া কহিলাম, তাহলে বসে আছো কেন সেজেগুজে?

আমার ইচ্ছে! বলিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

বলিলাম, আরে বাবা ইচ্ছে তো জানি, কিন্তু সে ইচ্ছের পিছনে যে কারণ থাকে সেটা কি জানতে পারি না বৌঠান?

আরো কয়েকটা মুহূর্ত চুপ থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাবো না।

এই কথাটা বলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া সে জানলার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ভেবেছিলুম আর মুখদর্শন করবো না—জীবনে কথা কইবো না! বলিয়া বাগানের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কহিলাম, দেখো বৌঠান, চব্বিশ ঘণ্টাও এখনো হয়নি। যাকে আসার জন্যে এতো করে অনুরোধ করেছিলে, এরি মধ্যে এমন কি হলো যে তার মুখ দেখা যায় না!

ছি ছি, লজ্জা করছে না আবার সেকথা জিজ্ঞেস করতে? তোমার ভেতরটা যে এত নোংরা তোমায় দেখে ভাবতে পারিনি। কোন ভদ্রঘরের বৌ-ঝি যখন স্নান করে কোন ভদ্র-শিক্ষিত লোক যে লুকিয়ে গাছের আড়াল থেকে তাকে দেখে, একথা মনে হলে মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। আবার বলবি তো বল তার স্বামীর কাছেই! ছি ছি!

বলিলাম, বৌঠান, রাগ হবার কথা ঠিকই কিন্তু তার আগে তো জানতুম না যে তোমরা এ বাড়িতে থাকো এবং আমি কল্পনা করতে পারিনি যাকে দেখেছি সে দেবুদার স্ত্রী!

হ্যাঁ, দেবুদার ঘাড়ে তো একটা পেত্নীকে চাপিয়ে দিয়েছিলে তুমি তো আগে থেকেই জানতে! সেই জন্যে লুকিয়ে পরস্ত্রী ভেবে তার নগ্নরূপ দেখে নিলে! ছ্যাঃ, ভাবতে গেলেও ঘেন্নায় মাথা কাটা যায়।

দেখো বৌঠান, আমার সম্বন্ধে তোমার মনের এ ধারণা একেবারে ভুল। আমায় যে অপবাদ ইচ্ছা দাও ক্ষতি নেই, শুধু তোমাকে দেখে আমি যে কালোকুচ্ছিত বলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলুম, এত বড় মিথ্যা কিছুতেই সহ্য করবো না।

বৌঠান বলিল, তাই বুঝি দেবুদায় স্ত্রীর সম্বন্ধে কতকগুলো মিথ্যা বলে তার কাছে বাহাদুরি নিয়েছো! আমার চেহারায় কি আছে, ফিগার কেমন, তা আমার স্বামীকে বললেই কি তার ধারণা পাল্টে যাবে, না আমায় মাথায় করে নাচবে? তার কাছে আমি যে গাঁইয়া সে-ই রয়েছি।

তা ঠিক। কিন্তু আমার যা সত্যি, মনে হয়েছে তাই বলেছি। তোমার বিশ্বাস হয় করো, না হয় করো না। আমি তো আগে বুঝিনি যে সেই

অপূর্ব ফিগারের অধিকারিণী আমার এই বৌঠান, তাই দেবুদাকে বলেছি, তোমার মত ভাগ্যবান হয় না! তোমাকে দেখে ঈর্ষা হয়!

সঙ্গে সঙ্গে দু'কানে হাত চাপিয়া বৌঠান কহিল, সব মিথ্যে! তারপর মুখে হাসিটি চাপিয়া সহসা বলিল, তোষামোদ করতে তুমি শিখেছিলে সত্যি! ম্যানেজারী করে এই বিদ্যেটা খুব আয়ত্ত করেছো দেখছি।

বলিলাম, হয়ত বলতুম না দেবুদাকে, কিন্তু যেহেতু তার বিশ্বাস এ ঘটকালির মূলে আমি তাই তাকে বুঝিয়ে দিলুম যে ঘটকালিটা আমি আর যাই হোক খারাপ করি নি, তুমি যে কতখানি জিতেছো বুঝতেই পারছো তো?

ওঃ, তুমি বললে তো ভারী বয়ে গেল! মেয়েছেলের ফিগার ও বোঝে না, আর তার ভেতর মন বলে যে কিছু আছে সে খবরও রাখে না। ও যেন পাথরের দেবতা! বলিতে বলিতে যেন তার কণ্ঠে অন্তরঙ্গ সুর ধ্বনিত হইল। হাসিয়া কহিল, আমি তো বলি তুমি একটা নিভে যাওয়া উনুনের মত।

তাহলে একদিন আগুন ছিল যে সে উনুনে স্বীকার করলে তো?

বৌঠান বলিয়া ফেলিল, তবে সে কবে কোন্ কালে কে জানে! আমি তো দেখিনি কোন দিন!

বৌদি, এসব বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা করতেই চাই না। কারণ আমার ওখানে অনধিকার প্রবেশ। তবু দেবুদার পক্ষ নিয়ে এইটুকুই শুধু বলতে চাই যে নিভন্ত উনুনকে তো মেয়েরা হাওয়া দিয়ে জাগায় দেখেছি।

বৌঠান চট্ করিয়া জবাব দিল, তার জন্যে একটু আগুন থাকা দরকার। নইলে শুধু হাওয়ায় ছাই ওঠে, এ কথাটাও বোধ হয় তোমার জানা আছে!

থাক বৌঠান। বন্ধু-নিন্দা কানে শোনাও পাপ। বিদায় হচ্ছি। আর হয়ত দেখা হবে না। আর তোমাকে আমার মুখদর্শন করতে হবে না।

ঠিক সেই সময় দেবুদা আসিয়া পড়িল। কি রে, একবার বক্‌বক্ করতে শুরু করলে আর বুঝি কিছু মনে থাকে না।

বলিলাম, কি করবো, বৌঠান বলছে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে না।

তাই বুঝি বাইরে না গিয়ে ঘরের ভেতর জমে গিয়েছিস?

এবার বৌঠান বলিল, বিষ নেই কুলোপানা চক্কর। নিজে দোষ করে আবার চোখ রাঙাচ্ছে—

দেবুদা বলিল, তুমি যেমন, সঙ্গে সঙ্গে বললেই পারতে, যাও চলে— দেখতুম ও কি করে।

সেদিকে তোমার বন্ধু খুব চতুর। জানে আমি তা বলতে পারবো না কখনই।

দেখো বৌঠান, একথা বললে আমি কিন্তু সত্যি সত্যি চলে যাবো। আমি পুরুষমানুষ ভুলে যেয়ো না।

দেবুদা আমার পিঠে একটা থাবড়া মারিয়া বলিল, থাক আর এত পুরুষত্বের বড়াই করতে হবে না, চল এখন বেড়াতে। তুমি দেরি করো না যেন

—আমরা এগোলুম।

॥ সাতাশ ॥

রাস্তায় আসিয়া বৌঠান একেবারে অন্য মানুষ, যেন কতদিনের জানাশোনা আপনজন। দেবুদা বলিল, কোন দিকে যাবি বল্ ?

বলিলাম, যেদিকে তোমাদের খুশি চলো, বেড়ানোটাই আসল কথা!

হ্যাঁগো, কোন্ দিকে যাবে? স্ত্রীর দিকে চাইল দেবুদা।

আমায় জিজ্ঞেস করছো কেন?

বলিলাম, দেবুদা ঠিক করেছে। আমি তোমার অতিথি বৌঠান, ভুলে যেয়ো না। কাজেই তুমি যে পথে যাবে, আমরা যাবো তোমার পিছনে।

রক্ষে করো ভাই। তোমার দাদাই বলুন কোন্ দিকে যাবো। তারপর কোন খারাপ পথে গেলে তখন আমার শির থাকবে না!

হাসিয়া ফেলিলাম, তুমি খারাপ পথে যাবে আর দাদা তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে! এটা তুমি কি করে আশা করো!

না—ঠাট্টা নয় ঠাকুরপো! এখানের পথঘাট ভাল নেই। তাছাড়া বনজঙ্গল দেখলে আমার চোখ দু'টো আগে ছোটে সেদিকে, পা দু'টো কোথায় পড়ছে পথে কি বিপথে খেয়াল থাকে না।

ভেরী গুড্! এই তো চাই। তাই চলো।

তোমার তো খুব উৎসাহ, কিন্তু আর একজন তো মুখে তালা দিয়ে রয়েছে।

এটাই তো ভদ্রতা। আমি যখন তোমার অতিথি, দাদা জানে এখানে আর কথা বলা চলে না।

দেবুদা এবার বলিয়া উঠিল, তুই বড্ড বকবক করিস, এতে মানুষের ধৈর্য থাকে না!

কি করবো, আর একজন যদি কথা বলায়, তাহলে কি করে মুখ বুজিয়ে থাকি—সবই তো শুনছো!

হ্যাঁ, দুই-ই সমান! মিলেছে ভাল। একেই বলে 'রতনে রতন চেনে'—

বৌঠান এবার ফোঁস করিয়া উঠিল, তার পরের লাইনটা না বলে চুপ করে গেলে কেন? ছড়ার মিলটা করে দাও: বলো—আর শুয়োরে চেনে কচু।

বলিয়া হাসিতে লাগিল, 'নিজের বেলা আঁটিশুটি পরের বেলা দাঁত-কপাটি' না ঠাকুরপো, ঠিক বলিনি ভাই?

এইভাবে কথা বলিতে বলিতে আমরা একসঙ্গে হাঁটিতেছিলাম।

বেশ কিছু দূরে যাইতে হঠাৎ বৌঠান ছুট দিয়া একটা বাগানের ভাঙা পাঁচিলের উপর গিয়া যেই উঠিয়াছে, অমনি দেবুদা চাপা গলায় চেঁচাইয়া উঠিল, এই এই মিলি, খবরদার বলছি। চলে এসো—শিগ্গির—

কিন্তু কে কার কথা শোনে। মুহূর্তে বাগানের ভেতর লাফ দিয়া মটমট্ করিয়া দুটো ভুট্টা গাছ থেকে ছিঁড়িয়া লইয়া আসিল বৌঠান।

দেবুদা রাগ করিয়া বলিল, এ তোমার ভারী অন্যায় কিন্তু। পরের বাগান থেকে এইভাবে চুরি করতে গিয়ে যদি ধরা পড়তে, তখন তোমার মুখটি কোথায় থাকতো, আর আমাকেও অপমান করে ছাড়তো, জানো না?

ইস, তোমায় অপমান করবে কে শুনি? ওই ব্যাটা মালী? সে তো এখানে থাকেই না। দু'চার দিন অন্তর সকালে এসে জল দিয়ে চলে যায়। আমি তাকে চিনি। মালিক তো কলকাতায় থাকে, এদিক মাড়ায় না। ও ব্যাটারাই সব লুটেপুটে খায়। তাই আমি যদি দু'টো নিই, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। বরং ছোটলোকের চেয়ে দু'টো ভদ্দরলোকের পেটে গেল।

এই কথা বলিতে বলিতে ততক্ষণ দাঁত দিয়া ভুট্টার সবুজ খোলা ছাড়াইয়া, মাথার ওপরে চুলের ঝুলির মত গুচ্ছ ফেলিয়া দিয়া, শুভ্রা মুক্তার পাঁতির মত সাজানো সেই তাজা সরস ফলটি লইয়া স্বামীর মুখের কাছে ধরিয়া বলিল, তুমি এর আধখানা খেয়ে নাও—বাকিটা আমি খাবো।

না, আমি খাবো না। বলিয়া দেবুদা মুখ ঘুরাইয়া লইলে বৌঠান বলিল, খেয়ে দেখো, একেবারে দুধের মত রস টসটস করছে ভেতরে, এমন তাজা কখনো খাওনি।

দরকার নেই! তুমি খাও গে। আমি খেতে চাই না।

আচ্ছা ঠাকুরপো, তুমি এটা খাও তো ভাই।

না। বলিলাম, দাদা না খেলে আমি খাবো না।

দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ বৌঠান ছুঁড়িয়া ভুট্টা দুটি দূরে ফেলিয়া দিল।

দেখলি তো আলো রাগের বহরটা একবার। বলিতে বলিতে দেবুদা তাড়াতাড়ি গিয়া ভুট্টা দুটো সযত্নে কুড়াইয়া আনিল। তারপর বলিল, একেবারে মুখের জিনিসটা কেউ এমনিভাবে ফেলে দেয়?

বলিলাম, তুমিই তো রাগিয়ে দিলে দাদা, বৌঠান তো সর্বপ্রথম খোলা ছাড়িয়ে ওর দেবতাকে ভোগ দিতে চেয়েছিল, তুমিই রাগ দেখিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলে, ও বেচারী কি করে।

দেবুদা গলায় জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, তা বলে তুই একে প্রশ্রয় দিতে বলিস?

দেখো দেবুদা, প্রশ্রয়ের কথা এখানে ওঠে না। এ একটা আলাদা জিনিস। তুমি শহরের ছেলে, বুঝবে না এর রস। তোমার ঘরে হাজারটা ভুট্টা থাকলেও না বলে এই যে পরের বাগান থেকে এনে খাওয়া, এব আনন্দ, এর স্বাদ তুলনাহীন, স্বর্গের অমৃত ছার এর কাছে। এই হঠাৎ খুশির ছলকানি সব পাপ-পুণ্যের ঊর্ধ্বে। আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে, এ কম্ম কত করেছি, তাই তোমার এই রাগকে আমি দাদা সমর্থন করতে পারছি না।

তোমাদের আনন্দ তোমরা বোঝো, আমাকে বাদ দাও। বলিয়া দেবুদা সেই ভুট্টা বৌঠানের হাতে দিতে গেল। অমনি হাতটা ঠেলিয়া দিয়া সে কহিল, থাক ঢের হয়েছে, এত সোহাগে আর দরকার নেই। কে তোমায় হাত দিয়ে ছুঁতে বলেছিল, আমি তো ফেলে দিয়েছিলুম!

মুখের জিনিসটা এইভাবে ফেলে দিতে আছে!

ওঃ, এতই যদি টন্‌টনে জ্ঞান তো খেলেই পারতে আগে!

এই তো খাচ্ছি! বলিয়া আধখানা ভাঙ্গিয়া দেবুদা মুখে দিয়া বলিল, হয়েছে? এবার দয়া করে খেয়ে আমায় উদ্ধার করো!

ছোট মেয়ের মত বৌঠান খপ্ করিয়া জিব ভেঙাইয়া এবার দেবুদার হাত হইতে টানিয়া নিল। তারপর বৌঠান যখন আমারটা লইয়া ছাড়াইতে লাগিল, তখন বৌঠানের দিকে তির্যক চাহনি দিয়া কহিলাম, "সেই তো মল খসালি—তবে কেন লোক হাসালি!"

ফস্ করিয়া আমায় চোখ পাকাইয়া বৌঠান বলিল, খুব আনন্দ হচ্ছে না?

হবে না? বলিলাম, চোখের সামনে বিনা পয়সায় এমন মানভঞ্জন-পালা দেখতে পেলে কার না আনন্দ হয়!

দেবুদা ভুট্টার রসালো দানা চিবাইতে চিবাইতে বলিল, কি রকম মানুষকে নিয়ে আমায় ঘর করতে হয় দেখছিস তো চোখে! পান থেকে চুন খসেছে কি রাগ আর রাগ!

রাগ নয় দাদা—এ অনুরাগ। বেশ তো আছো—রসে রসে রসময় হয়ে রসের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছো।

দেবুদা বলল, তোকে দেখে যেন আরো বাড়িয়েছে আজ।

হাসিলাম, দাদা, পাছে আমি তোমাদের ভুল বুঝি তাই এইভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। তুমি বৌঠানকে মুখে যতই গাঁইয়া বলো, মনে মনে জানো ঠিকই যে শহরে মাথা খুঁড়ে মলেও এ জিনিস মেলে না।

বৌঠান এবার চোখ ঠারিয়ে বলে ওঠে, ওঃ, শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর! উনি আইবুড়ো কার্তিক কিনা, তাই আমাদের মনের ভেতর একেবারে ঢুকে বসে আছেন!

আরো কিছুটা অগ্রসর হইলে আমি দেবুদাকে হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, আমরা সবাই না-হয় প্রকারান্তরে বৃটিশের দাসত্ব করি, কিন্তু তুমি যখন ইংরেজের দাসত্ব করো না, তবে কেন তোমার বউয়ের আসল নামটা ছেড়ে ওই বিজাতীয় নামে এত আসক্তি বুঝতে পারি না।

যখন বুঝতে পারিস নি, চুপ করে থাক। মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিস নি!

না না, ইয়ার্কি নয়। তোমায় বলতে হবে আজ, কি রস তুমি ওই নামে পেয়েছো!

তুই ফের বকবক করছিস? তুই এর মর্ম কি বুঝিস? আইবুড়ো কার্ত্তিক! কটা স্ত্রী-পুরুষের বিবাহিত জীবন দেখেছিস?

বলিলাম, দেখেছি অনেক, তবে ঠিক এরকমটা আর কখনো দেখি নি। এই প্রথম। তাই তোমার মুখে বৌঠানের ওই নাম শুনলে কেমন যেন ছন্দপতন বলে মনে হয়। বিশেষ করে বৌঠানের চেহারা ও প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে বেমানান! তাই ও নামে না ডেকে যদি আসল নামটা ধরে ডাকো, দেখবে আরো কত মিষ্টি লাগবে!

দ্যাখ আলো, এইজন্যে বলে কুকুরকে লাই দিয়ে মাথায় তুলতে নেই। তোর সঙ্গে আড্ডা দিই বলে আমার বৌকে কি নামে ডাকতে হয় তুই শিখিয়ে দিবি! তোর কাছে সে জ্ঞান আমায় নিতে হবে?

রাগ করো না দেবুদা, তুমি যাই বলো, তোমার ওই মিলি নামটা যেন ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যায়। অথচ চামেলি নামটা উচ্চারণ করতে গেলে 'কণ্ঠস্বর' যেন ওষ্ঠ তালু দন্ত রসনার সব রস পেয়ে সরস হয়ে ওঠে রূপে রসে গন্ধে, ওই আসল ফুলের মত, তখন যে ডাকে তারও যেমন ভাল লাগে যে শোনে তারও তেমনি। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি, ওই নামটা ধরে একবার বৌঠানকে ডাকো।

দ্যাখ আলো, বেশি জ্যাঠামি করিসনি। ছোট ছোটর মত থাক।

সত্যি দেবুদা, তোমার ওপর খুব রাগ হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা পড়োনি? 'বহুদিন মনে ছিল আশা'। তাঁর সেই গানটা—"চামেলীর গন্ধটুকু জানালার ধারে। ভোরের প্রথম আলো নদীর ওপারে।" মনে পড়ে?

দেবুদা মুখের সিগারেটটা ফেলিয়া দিয়া বলিল, মনে পড়বে না কেন?

হাসিয়া বলিলাম, যাকে বাইরে জানালার পাশে শুধু পাবার জন্য কবির এত ব্যাকুলতা, তাকে ঘরের মধ্যে পেয়ে ঘর থেকে দিলে দূর করে তাড়িয়ে? না, এ অসহ্য! চারিদিকে এমন গাছপালা, সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, এখানে অন্তত তুমি ওই বিজাতীয় নামে বৌঠানকে ডেকো না। সত্যি দেবুদা, তুমি আসল নামটা ধরে বৌঠানকে ডাকো—দেখো কোন্ ডাকটা তোমার অন্ততঃ এই সময় বেড়াতে বেরিয়ে কানে মিষ্টি লাগে?

দেবুদা বলিল, রবি ঠাকুর তোর মাথাটা খেয়েছে দেখছি। বেশ তোর যদি এতই পছন্দ নামটা তুই ডাক না ওর নাম ধরে?

ছি, সম্পর্কে ছোট দেওর হয়ে বৌঠানের নাম ধরবো আমি? তার চেয়ে বরং তুমি ডাকো, তোমার মুখ থেকে শুনে কান জুড়োক!

দ্যাখ, দেওর ভাশুরের কথা আনছিস কেন এখানে. জানিস তো আমি ওসব মানি না। নইলে কি বন্ধুর মত তোর সঙ্গে ইয়ারকি মারতে পারি? বিশেষ করে স্ত্রীর সামনে! বন্ধুর স্ত্রীর নাম ধরে ডাকে অনেকেই, তাই তুই ওর নাম ধরে ডাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না! তাছাড়া আমি বা আমার মা বাবা কেউ ওই নামে ওকে যদি ডাকতো, তাহলে না হয় এই ছোট বড়র প্রশ্ন উঠতে পারতো। কিন্তু এক্ষেত্রে যাকে বলে বে-ওয়ারিশ অর্থাৎ যার কোন দাবীদারই নেই, যে ইচ্ছা ও নাম ব্যবহার করতে পারে।

প্রশ্ন করি, তুমি কি বল বৌঠান?

অভিমানে বৌঠান চাপা কণ্ঠে উত্তর দিল, আমায় কেন জিজ্ঞেস করছো, আমার মা-বাপের দেওয়া নামটা শ্বশুরবাড়ির পাল্লায় পড়ে কবে মরে গেছে। ও গেঁইয়া নাম বলে কেউ ডাকে না।

বলিলাম, বেশ, তোমাদের যখন আপত্তি নেই এখন থেকে আমি নাম ধরে ডাকবো। তবে সামান্য একটা কথা যোগ করে অর্থাৎ চামেলী বৌ বলবো।

দেবুদা মুখ থেকে সিগারেটটা সরাইয়া খপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, বাঃ বেশ লাগছে, আর একবার ডাক তো আলো! স্রেফ নামটার সঙ্গে বৌ জুড়ে দিতে যেন নতুন স্বাদ লাগছে রে।

হাসিয়া ফেলিলাম, দেবুদা, নিজের গাছের ফলের চেয়ে পরের বাগানের চুরি করা ফলের আস্বাদ সব সময় বেশি মিষ্টি লাগে, একথা আগেই তোমাকে বলেছি দেবুদা। এখন নিজে থেকে বেশ বুঝতে পারছো তো?

তারপর একটু থামিয়া বলিলাম, যত মিষ্টি লাগুক, এর 'কপিরাইট' বা সর্বস্বত্ব কিন্তু আমার মনে থাকে যেন দেবুদা। বৌঠান, থুড়ি, চামেলী বৌ তুমি সাক্ষী, দেবুদা যদি এ নামে ডাকে কিছুতেই সাড়া দেবে না।

চামেলী বৌ মুচকি হাসিয়া কহিল, 'শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর।' বয়ে গেছে ওর ও-নামে ডাকতে। তবেই চিনেছো তোমার দেবুদাকে, এ নাম তোমার মুখেই থাকবে, আর তুমি চলে গেলে তোমার সঙ্গে সেও চলে যাবে চিরকালের মত।

অর্থাৎ আমি যে আর আসি, তুমি চাও না। এই তো বলতে চাইছো!

ওমা, কখন তা বললুম। কি মিথ্যেবাদী তুমি।

বলিলাম, দেবুদা সাক্ষী, এই তো বললে চিরদিনের মত! তার মানে আর আসতে বলবে না, এই তো বোঝাচ্ছে কি বলো দেবুদা?

দেবুদা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, তোমাদের ও কথার মাথা-মুণ্ডু আমি বুঝি না, আমায় আর ওতে টেনো না।

এইভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে সন্ধ্যা আসিয়া পড়িলে বলিলাম, অনেক দেরি হয়ে গেল চামেলী বৌ—এখান থেকেই আমি কেটে পড়ি!

আমরাও যাবো, এখানে থাকতে আসিনি। বুঝেছি আমাদের সঙ্গ অসহ্য হয়ে উঠেছে, আর ভাল লাগছে না।

বরং উল্টো। এই চাঁদের আলোয় মধুর সন্ধ্যাটা তোমাদের মাটি করতে চাই না।

কথা ছিল পরদিন আমি কবরখানার কাছে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দাঁড়াইয়া থাকিব, ওরা আসিবে। কিন্তু পরদিন ঠিক সময়ে কবরখানার কাছে গিয়া তাদের দেখিতে না পাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম! আরো মিনিট পনেরো ওই কবরখানার সামনে ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিয়াও যখন তাহারা আসিল না তখন তাদের খোঁজে কালীপুর টাউনের দিকে যাইব বলিয়া একটা বড় বাগানের

ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম—পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য। যেমন বড় বড় গাছ তেমন তার চতুর্দিকে আরো অনেক ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল। ওরই ভিতর দিয়া আঁকা-বাঁকা মেঠো পথে কিছুটা অগ্রসর হইতে না-হইতেই কানে আসিল, টু-কি। থমকিয়া দাঁড়াইলাম, এদিক ওদিক চাহিয়া কাউকে দেখিতে না পাইয়া আবার যেমন দু'চারটি ঝোপঝাড় অতিক্রম করিয়াছি, আবার 'টু-কি' কথাটা কানে আসিয়া ধাক্কা দিল। ইহা যে বৌঠানের কণ্ঠস্বর এবার চিনিতে দেরি হইল না।

তখন পিছন ফিরিয়া সেই শব্দটা যেদিকে হইতে আসিয়াছিল সেই দিকের ঝোপঝাড়ের কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথাও কোন মানুষের দেখা না পাইয়া যেমন পিছন ফিরিয়াছি, দেখি সামনের একটা বড় ঝোপের ভিতর হইতে বৌঠান ছুটিয়া বাহির হইয়া আরো একটু দূরে ওই রকম একটা ঝোপের ভিতর ছুটিয়া চলিয়া গেল। একটু পরেই কানে আসিল দেবুদার কণ্ঠস্বর, এই মিলি—মিলি, কোথায় তুমি? সাড়া দাও, লক্ষ্মীটি, ওই সব জঙ্গলের ভেতর যেয়ো না। বেরিয়ে এসো—সাপখোপ কাঁকড়া বিছে কত কি ওখানে থাকতে পারে, তোমার কি প্রাণে ভয়-ডর বলে কিছু নেই!

এ-ঝোপ ও-ঝোপ খুঁজিতে গিয়া দেবুদার কপালে ঘাম দেখা দেয়। বলে, লক্ষ্মীটি বেরিয়ে এসো! কত দেরি হয়ে গেল। আলোক আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

মাথা নীচু করিয়া হামাগুড়ি দিয়া দেবুদার চোখের আড়ালে আর একটা ঝোপের ভেতর এবার বৌঠান গিয়া লুকাইল।

দূর থেকে আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহারা কেহই জানিত না। তাই পিছন হইতে চুপি চুপি গিয়া তার শাড়ীর আঁচলটা চাপিয়া ধরিয়া চেঁচাইয়া উঠিলাম, চোর ধরেছি! এই যে এখানে, শিগ্‌গির এসো। বলিয়া আমি চেঁচাইয়া উঠিলাম।

দেবুদা ছুটিয়া আসিতে বৌঠান একেবারে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল, কেমন ঠকিয়েছি, তুমি ধরতে পারোনি!

দেবুদা রাগ চাপিতে না পারিয়া বলিল, দেখছিস তো কি রকম বে-আক্কেলে! তুই ওখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিস, সব জেনেশুনে—

আ-হা, তোমার সঙ্গে একটু লুকোচুরি খেলতে সাধ হয়েছে, বুঝতে পারছো না! বলিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিলাম, বেশ তো রসে আছে দাদা!

তুই তো ওর সব কিছুতেই রস দেখছিস। তারপর বিছে কামড়ালে কি কাঁটা ফুটলে পায়ে, তখন—

তখন? "দেহি পদপল্লবমুদারম্।" বলে পা দুটি বুকে ধারণ করবে।

এবার বৌঠান মুখে রাগ দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি থামবে কি ঠাকুরপো? সবতাতে তোমার রঙ্গরস ভালো লাগে না।

মুখে ইহা বলিলেও মনে মনে যে বৌঠান আমার প্রতি খুশি হইয়াছিল

জানিতাম।

সেদিন বেশ কিছুটা পথ জঙ্গলের ভিতর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সহসা চামেলী বৌ একটা জায়গায় উঁচু একটা শিলাখণ্ড দেখিয়া আগে-ভাগে গিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল, আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না, এইখানে একটু বসে গান করা যাক।

হাসিয়া বলিলাম, এত লুকোচুরি খেলা কি এই বয়সে সহ্য হয়! ঠিক হয়েছে। ব্যথা করছে তো পা!

তা করুক, তোমার তাতে কি?

জানি, আমার কিছু নয়। রাত্রে দাদাকে দিয়ে পা টেপাতে চাও—এটা তার ভণিতা।

ওগো শুনতে পাচ্ছো, ঠাকুরপো যা-তা কথা বলছে। আমিও কিন্তু যা মুখে আসে বলবো, তখন তুমি আমার ওপর রাগ করতে পারবে না বলে দিলুম।

দেবুদা মুখটি টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ওকে আর বলতে কী বাকী রাখছ!

ঠিক বলেছো দেবুদা। দাও, একটা সিগারেট দাও। তবে এর জন্যে তুমিই সম্পূর্ণ দায়ী।

কেন? কি করলুম আমি?

বলিলাম, মানে একটু-আধটু শাসনে রাখা উচিত বৌকে, নইলে মাথায় চড়ে বসে!

ওঃ, আমাকে কখন দেখলে মাথায় চড়ে বসতে বলো শিগ্‌গির! ঐ বলে আমার বরের কান ভাঙানো হচ্ছে! আমার সামনে! ওরে দুষ্টু!

বলিয়া হঠাৎ আমার হাতে এমন জোরে একটা চিম্‌টি কাটিল যে 'উঃ' বলিয়া উঠিলাম। তারপর জামার হাতাটা সরাইয়া বলিলাম, দেবুদা দেখো, তোমার চামেলী বৌয়ের কাণ্ড, কি-রকম কালসিটে পড়ে গেছে!

আহা, দেখি দেখি! বাছা রে, ননীর দেহ এখুনি গলে যাবে! বলিয়া সেইখানে হাত বুলাইতে লাগিল।

দেবুদা রুষ্টস্বরে কহিল, ছি ছি, এইভাবে কি ঠাট্টা-ইয়ারকি করে!

বেশ করেছি। তোমাকে আর দরদ দেখাতে হবে না। যখন আমার নামে চুকলি খাচ্ছিল তোমার কাছে তখন তো বেশ চুপ করে ছিলে! তাই এমন শাস্তি দিয়েছি যাতে মনে থাকে, আর কখনো কোন মেয়ের পিছনে লাগতে না আসে!

বলিলাম, ঠাট্টা নয়, সত্যি সত্যি জ্বালা করছে!

ঠাট্টা নয়, তাই তো সত্যি সত্যি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি! এবার বৌঠান ঠোঁটে হাসি টিপিয়া বলিল, তবে যতটা জ্বালা বলছো, ততটা যে নয় তাও জানি।

তার মানে?

তার মানে খুব সোজা। ওই বলে যতটা পারা যায়, বৌঠানের সেবা খাওয়া। কি, ঠিক বলিনি?

এবার হাসিয়া উঠিলাম।

দেখছো তোমার বন্ধু কি জোচ্চোর! জ্বালাটালা সব বাজে, তোমার বৌয়ের সেবা খেয়ে নিলে। আমি বোকা, বুঝতে পারি নি, ভাবলুম সত্যি। আচ্ছা এর শোধ একদিন নেবো, মনে থাকে যেন!

উঠিয়া পড়িলাম, আচ্ছা নিয়ো। কিন্তু আজ এখানে ইতি। চললুম, বড্ড দেরি হয়ে গেল।

চামেলী বৌ এবার বলিল, তাহলে কাল ক'টায় আসছো?

বলিলাম, কাল আসবো না। শুধু তাই নয়, পরশুও না।

কেন, রাগ হলো বুঝি?

দেবুদা টিপ্পনী কাটিল, হবে না, তোমার সবতাতে বাড়াবাড়ি! ও নতুন মানুষ, কিছু বলতে পারে না মুখে, তাই সরে পড়তে চায়।

আমি কিছু না বলিয়া মজা দেখিতেছিলাম।

হঠাৎ চামেলী বৌ হাতটা ধরিয়া বলিল, তোমার দাদা যা বললে যদি সত্যি হয় তো তোমার গাঁইয়া বৌঠানের সব বে-আদবি মাপ করো ভাই।

হাসিয়া উঠিলাম। ছি চামেলী বৌ, তুমি দাদার সঙ্গে এতদিন ঘর করছো, অথচ ওর এই রসিকতাটা বুঝতে পারলে না?

কি করে বুঝবো বলো, উনি যে রসিকতার কাঠপিঁপড়ে! কখন কোথায় কামড় দেন কার বাপের সাধ্যি বোঝে!

এটাও যে সত্যি নয়, তোমার রসিকতা দাদাকে নিয়ে, তা আমি জানি। তবে তুমি বিশ্বাস করো, আমি সত্যি সত্যি দু'দিন আসতে পারবো না।

কেন ঠাকুরপো?

কাল আমরা যাচ্ছি দেওঘর। সেখানে থাকবো। পরশু সোমবার সকালে গিন্নীমা উপোস করে মহাদেবের পুজো করে, দ্বাদশটি ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে, তারপর আমরা খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে ফিরে আসবো। অবশ্য টানা মোটরেই যাওয়া আসা। তবে কটায় ফিরবো তার ঠিক নেই।

চামেলী বৌ বলিয়া উঠিল, না ঠাকুরপো, কোন কথা শুনবো না। পরশু যখনি ফেরো—আসতেই হবে। পরশু পূর্ণিমা, সেদিন নদীর ধারে এমন একটা সুন্দর জায়গায় তোমায় নিয়ে যাবো যে, তুমি দেখলে অবাক হয়ে যাবে। আমি মনে মনে স্থির করে রেখেছি, ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে গিয়ে সেখানে বসে খাবো একসঙ্গে।

আচ্ছা, সন্ধ্যের আগে যদি ফিরি, নিশ্চয়ই আসবো। তবে মনে হচ্ছে, এইসব পাহাড়ী পথে বিকেল বিকেল ফিরে আসবেন তেওয়ারীজী। উনি খুব ভীতু মানুষ। তাছাড়া তাঁর শালী, এত বড় জমিদার-গিন্নী, তাঁর শরীরও তত ভাল নয়। দেখা যাক্, বাবা বৈদ্যনাথের কি ইচ্ছা।

চামেলী বৌ হাসিতে হাসিতে বলিল, আমি বাবা বদ্যিনাথকে এখান থেকে ডাকবো যাতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসো!

॥ আটাশ ॥

শেষ পর্যন্ত বৌঠানের কলাই খাইল ঠাকুর। সেদিন বেশ বেলা থাকিতেই দেওঘর হইতে ফিরিয়াছিলাম।

আমাকে দেখা মাত্র চামেলী বৌয়ের চোখ দুটি যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। দেবুদাকে বলিল, দেখলে, তুমি বলেছিলে এত দূর থেকে সন্ধ্যের আগে এসে পৌঁছতে পারবে না, কিন্তু আমি বলেছিলুম ঠিকই আসবে।

বলিলাম, আমি পরের সঙ্গে গিয়েছি, তাদের মর্জির ওপর আমার ফেরাটা যেখানে নির্ভর করছে, তুমি কি করে এত নিশ্চিত হলে, শুনি?

বলবো কেন? বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, আজ পূর্ণিমা, তায় নদী বনজঙ্গল, সব মিলিয়ে ওই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার লোভ তুমি যে সামলাতে পারবে না, আমি জানতুম। কি, ঠিক বলিনি!

হাঁ, ঠিকই। বলিয়া মুখে সমর্থন করিলেও আসলে যাহার লোভে ছুটিয়া আসিয়াছি, মুখ ফুটিয়া তা বলিতে পারিলাম না। এমন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, চাঁদনী রাত, বনজঙ্গল, নদী, পাহাড় এ জীবনে ঢের ঢের দেখিয়াছি কিন্তু এমন পরিবেশে দুটি জীবন্ত নরনারীর প্রকৃত রূপ ইতিপূর্বে কখনো দেখি নাই।

চামেলী বৌ চায়ের ফ্লাস্কটা কাঁধে ঝুলাইয়া ছোট একটি সুদৃশ্য কাপড়ের ব্যাগ হাতে লইয়া রাস্তায় আসিলে, ব্যাগটা তাহার হাত হইতে আমি কাড়িয়া লইলাম। তুমি একলা দুটো বইবে কেন, আমায় একটা দাও। তোমার কষ্ট হবে এতটা পথ যেতে!

দেবুদা একটু আগে ছিল। বৌঠান মৃদুস্বরে বলিল, তবু ভাল, আমার কষ্ট যে তোমার সহ্য হয় না, জেনেও সুখী।

ঠিক এইসময় দেবুদা বলিয়া উঠিল, নদীটা যে এককালে খুব বড় ছিল দেখলেই বুঝতে পারবি। এখন একেবারে মজে গেছে, তবু ওখানে গেলে ফিরতে ইচ্ছে হয় না। তেমনি সুন্দর নদীর নামটা, সুবর্ণরেখা।

চামেলী বৌ বলিয়া উঠিল, আমরা যেদিন গিয়েছিলুম সেদিন পূর্ণিমা ছিল না। আজকে সন্ধ্যার আগেই চাঁদ উঠবে, খুব ভাল লাগবে দেখো ঠাকুরপো!

সত্যি বৌঠানের কথা মিথ্যা নয়। চারিদিকে শাল, সেগুন, মহুয়ার জঙ্গল, তারি ভিতরে সেই ক্ষীণ সলিলা সুবর্ণরেখা। দুপাশে বালি আর পাথরের ছোট বড় অসংখ্য টুকরা। তারি মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে জলধারা। কোথাও বা মৃদু-কল্লোলিনী, কোথাও বা নিঃশব্দ-প্রবাহিণী।

সন্ধ্যা তখনো হয় নাই কিন্তু থালার মত বিরাট গোলাকৃতি চাঁদের মুখ তখনি বনস্পতির আড়াল থেকে যেন উঁকি দিতেছিল। গাছের ছায়া জলের ধারায় কোথাও স্পষ্ট কোথাও অস্পষ্ট, জ্যোৎস্নায় সোনালী আলো নদীর ওপারে বিস্তীর্ণ বালুময় বেলাভূমিতে কেমন যেন এক স্বপ্নময় পরিবেশ। চতুর্দিক নীরব, নিস্তব্ধ। শুধু মাঝে মাঝে দু'একটা নীড়ে ফেরা পাখীর ডানার ঝট্পটানি যেন সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

পায়ে পায়ে আমরা উপর হইতে নামিয়া একেবারে নদীর তীরে এক প্রস্তরখণ্ডের উপর আসিয়া বসিয়াছিলাম। আমরা তিনজন যে পাশাপাশি বসিয়া আছি, যেন হুঁশ ছিল না। বেশ কিছুক্ষণ পরে প্রথম দেবুদা কথা কহিল, চা-টা এইবারে খাওয়া যাক্, কি বলো মিলি?

বৌঠান একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া তখন ব্যাগ হইতে কাপ ডিস বাহির করিয়া চায়ের সঙ্গে লুচি ও হালুয়া খাইতে দিল। তিনজনে এক-সঙ্গে খাইতে খাইতে সহসা চামেলী বৌ বলিয়া উঠিল, সত্যি ঠাকুরপো, এই রকম জায়গায় বসে তোমার সঙ্গে চা খাওয়ার এই আনন্দ কখনো ভুলতে পারবো না!

আমি চুপ করিয়া ছিলাম। বুঝি ওই কথারই প্রতিধ্বনি আমার মনের মধ্যে হইতেছিল। কিন্তু বৌঠান আমাকে নীরব দেখিয়া বলিল, জানি তোমার কাছে এটা কিছুই নয়।

যদি বলি আমার কাছে এটা অনেকখানি, তোমার চেয়েও অনেক বেশি, তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না!

করবো। জানি তোমার জীবনটা কত শূন্য। এই বলিয়া একটু নীরব থাকিয়া কহিল একটা গান গাও না ঠাকুরপো।

দেবুদা বৌয়ের সঙ্গে পোঁ ধরিল, হাঁ, ঠিক বলেছে মিলি। এমন চমৎকার পরিবেশ, এমন চাঁদনী সন্ধ্যায় গান তো আপনি এসে যায়।

তাহলে তুমিই আগে পথ দেখাও দাদা।

দেবুদা হাসিয়া উঠিল। আমি একটা গান জানি, সে গর্দভরাগিণী। একবার ধরলে বন থেকে সব গাধারা ছুটে আসবে এখানে।

কিন্তু আমি যে তানসেনের ভায়রাভাই, সেকথা তোমায় কে বললে দাদা?

আরে বাবা, কথায় কথায় যার কাব্য ঝরে সে গান গাইতে পারে না, আমি বিশ্বাস করি না।

হাঁ, ঠিকই বলেছে তোমার দাদা। এই বলিয়া চামেলী বৌ আবার দরদী কণ্ঠে অনুরোধ করিল, আজকে বৌঠানের একটা কথা রাখো। যেমন গান হোক গাও, যাতে আজকের আনন্দ সুর হয়ে চিরদিন মনে বাজে!...ওই দেখো...কত বড় চাঁদ উঠেছে শালগাছের মাথায়। তোমার গান শুনবে বলে যেন চেয়ে আছে তোমার দিকে।

নীরব আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখি, দু' একটি করিয়া সন্ধ্যাতারা

মিট্‌মিট চোখে যেন তাকাইয়া আছে। ওপারে বিস্তীর্ণ ধূসর বালির উপর চাঁদের আলো আরো উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। নদীর জলে যেন গলিত সোনা।

আমি গায়ক নহি। গান শুনিতে ভালবাসিতাম খুব। আর সেই সব ভাললাগা গানের সুর লইয়া মাঝে মাঝে আপনমনে গুন, গুন করিয়া আনন্দ পাইতাম। কিন্তু বৌঠানের মত এইভাবে ইতিপূর্বে আর কেহ কখনো আমার গান শুনিবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। তাই চামেলী বৌয়ের মনের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য সত্যি একটি গান গাহিয়া ফেলিলাম। সে গানের বাণী এখন সম্পূর্ণ মনে নাই। তবে কিছু কিছু আজো ভুলি নাই।

যেমন শুরুটা এইরূপ—

উতলা মাধবী রাতে
মৃদুল চরণপাতে
সুরের আড়ালে কে আসি দাঁড়ালে
হৃদয়ের আঙিনাতে!

এবং শেষ—

এ নিশি পোহাবে যবে,
কিছু কি স্মরণে রবে
যে গোপন বাণী
দিলে মোরে আনি
কুসুমের সৌরভে।

বৌঠান আমাদের দুজনের মধ্যে বসিয়া ছিল।

মনে পড়ে আমার কণ্ঠ যখন অস্থায়ী হইতে অন্তরায় চড়িয়াছে, দেবুদা শুধু মুখে 'বাঃ' বলিয়া চুপ করিল কিন্তু আর একজন তা না করিয়া শুধু নিঃশব্দে তার ঈষদুষ্ণ কোমল করতলখানি আমার হাতের উপর রাখিয়া মৃদু চাপ দিল।

হাতের স্পর্শের যে একটা বিশেষ ভাষা আছে ইতিপূর্বে এমন করিয়া তাহা কখনো অনুভব করি নাই। নৃত্যের মুদ্রা যেমন অর্থব্যঞ্জক, বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাব প্রকাশ করে, নারীর স্পর্শও যে তেমনি বিশেষ ইঙ্গিত বহন করে ইহা সেই প্রথম বোধ করিলাম।

মুখের অনেক কথা দিয়াও যে অনুভূতি প্রকাশ করা যায় না, শুধুমাত্র নিঃশব্দে স্পর্শের দ্বারা তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু যে ব্যক্ত করা যায়—বৌঠান যেন প্রথম তাহা বুঝাইয়া দিল।

এসরাজ বা সেতারের বাদ্যযন্ত্রে কোমলগান্ধার খাদ-নিখাদের সুর শিল্পীর করস্পর্শে মূর্ত হইয়া উঠে, তেমনি বৌঠানের করস্পর্শে মনে হইল সহসা যেন আমার মনের সব তন্ত্রীগুলো সুরে, ছন্দে লয়ে একসঙ্গে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।

গান থামিলে আমার ডান হাতের আঙ্গুলগুলো নিঃশব্দে নিজের মুঠির মধ্যে একবার শুধু সজোরে চাপিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে ছাড়িয়া দিল। তারপর কয়েকটি নীরব বিহ্বলিত মুহূর্ত অতীত হইলে চামেলী বৌ কহিল, চমৎকার।

সত্যি বলছো?

হাঁ, কোনদিন ভুলবো না, আজ যে আনন্দ দিলে তুমি। নিমেষে বৌঠান রোমাণ্টিক হইয়া উঠে।

তৎক্ষণাৎ দেবুদা বলিয়া উঠিল। রাস্কেল, তুই যে এত ভাল গান জানিস, এ কথা তো জানতুম না আগে।

তুমি কেন, বিশ্বাস করো, আমি নিজেই জানতুম না।

দ্যাখ বেশি ন্যাকামি করিসনি। আমি কচি খোকা নই।

মাইরি বলছি। এই প্রথম শুনলুম। আমি ভাল গাইতে পারি!

একটু থামিয়া বলিলাম, এর আসল কারণ আমি নই, এই সুন্দর পরিবেশে তোমাদের মধুর সঙ্গ আর সেই সঙ্গে বৌঠানের মিষ্টি গলার অনুরোধ —এর আগে কখনো পাইনি এ সুযোগ।

সত্যি। তাহলে আমাদের কথা কখনো ভুলবিনি? দেবুদা বলিল, মনে থাকে যেন, তোকে কত বড় গায়ক বানিয়ে দিলুম।

নিশ্চয়! বলিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিলাম।

না-না, ঠাট্টা নয়। সত্যি সত্যি বলছি—তুই যদি একটু চর্চা করিস, তাহলে একদিন তোকে রেডিয়ো আর গ্রামোফোন কোম্পানী ঘরে এসে ডেকে নিয়ে যাবে।

চামেলী বৌ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। এবার বলিয়া উঠিল, তখন কিন্তু বকশিশ দিতে হবে, মনে থাকে যেন আমি-ই তোমাকে প্রথম গান গাইয়েছি।

নিশ্চয় বৌঠান। এ আমি কোনদিন ভুলবো না।

সেদিন রাত্রে তেওয়ারীজী বলিলেন, বুধবার সকালের গাড়িতেই আমরা কলকাতায় ফিরবো। অর্থাৎ পরশু।

পরদিন সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া দেবুদাকে চলিয়া যাইবার খবরটা দিবার জন্য ফেরার পথে তাহাদের বাসায় গিয়া দেখি দেবুদার হঠাৎ রাত্রি হইতে প্রবল জ্বর ও সেই সঙ্গে হাতে পায়ে সারা অঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা।

বৌঠান বিছানায় বসিয়া স্বামীর সেবা করিতেছে। কখনো পা টিপিতেছে, কখনো গায়ে হাত বুলাইতেছে, কখনো বা পায়ের আঙ্গুলগুলো একে একে টানিয়া দিতেছে। যেন নিমেষে স্বামীর সব ব্যথা, সকল যন্ত্রণা সেই মুহূর্তে নিজে হাতে দূর করিয়া দিতে চায়। এমন ঐকান্তিক সেবা করিতে কোন স্ত্রীকে কখনো দেখি নাই।

দেবুদা বলিল, কাল সারারাত ঘুমোয়নি, আমার কপালে জলপটি দিয়ে

বাতাস করে করে জ্বর কমিয়েছে। গা হাত পা টিপে দিয়েছে। যত বলি থাক এবার একটু ঘুমোও—আমার জ্বর তো কমে গেছে, বলে, না, যদি ঘুমিয়ে পড়লে ফের জ্বর আসে! এমন বেয়াড়া তোকে কি বলবো। যা একবার মাথায় ঢুকবে—

ঢের হয়েছে, চুপ করে এখন! বৌয়ের নিন্দে ভাল হয়ে যত পারো করো।

এতক্ষণ আমি চুপ করিয়া বৌঠানের সেবাময়ী মূর্তিকে দেখিতেছিলাম।

হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বোঠান বলিয়া উঠিল, তুমি বন্ধুর অসুখের খবর পেয়ে তাকে দেখতে এসেছ সকাল হতে না-হতেই?

ওর খবর কে দেবে, কোথায় পাবো বৌঠান! আমার নিজের খবরটা দিতেই এসেছি, কাল সকালের গাড়িতে চলে যাচ্ছি কলকাতায়।

সে কি! তুমি যে বলেছিলে সেদিন, এখনো সাত আট দিন—

বলিলাম, কি করবো বলো, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আমি পরের চাকর, ভুলে যেয়ো না।

মা বলেছিলেন, তোমাকে একদিন খাওয়াবার কথা। ভেবে রেখেছিলুম, যাবার আগের দিন, বেড়িয়ে ফেরার পথে একেবারে খেয়েদেয়ে যাবে।

বলিলাম, মাসীমাকে বলো, কলকাতায় এসে একদিন খেয়ে যাবো। এখন খাওয়াটা পাওনা রইল।

তারপর মাসীমার ঘরের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম দোর বন্ধ এখনো কি মাসীমা ওঠেননি?

না। কাল রাত্রে বারে বারে এসে জ্বর কমলো কি না জিজ্ঞেস করে গেছেন, তাই ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

থাক, ডাকতে হবে না। আমার প্রণাম দিয়ো মাসীমা মেসোমশাইকে। আর দেবুদা সুস্থ হলেই একটা চিঠি দিয়ে খবরটা জানিয়ো।

বলিয়া পকেট হইতে একটুকরো কাগজ বাহির করিয়া আমার ঠিকানাটা বৌঠানের হাতে দিলাম।

দেবুদা বলিল, একটু চা করে দিক, খেয়ে যা।

না-না, সারারাত জেগেছে—চা করতে হবে না আমার জন্যে। আমার চা জলখাবার সব তৈরি আছে, গিয়েই খেয়ে নেবো।

বৌঠান ক্লান্তস্বরে বলিল, তাহলে আর দেখা হচ্ছে না ঠাকুরপো?

বলিলাম, হাঁ নিশ্চয়-ই হবে। অবশ্য তোমরা যদি ইচ্ছা করো। আমার নেমন্তন্ন তো করাই আছে, পুজোর সময় যদি বেড়াতে যাও তো খুব আনন্দ পাবে। বিশেষ করে তোমার খুব ভাল লাগবে। চারিদিকে বন জঙ্গল পাহাড়। হাতীর পিঠে চড়ে যেদিকে খুশি ঘুরে বেড়াবে।

হাতী চড়াবে! তাহলে নিশ্চয় যাবো। কি মজা হবে তাহলে। বলিয়া ছোট মেয়ের মত হাততালি দিয়া উঠিল।

তারপর দেবুদাকে বলিল, ওগো, তুমি ঠাকুরপোকে বলে দাও না, আমরা

যাবো এবার পুজোর সময়।

তুমি যখন বলছো, তাতেই হবে। আবার আমার বলার কি দরকার! আলো তা জানে!

কথাটা ঠিকই! সেদিন ফিরিবার পথে সারাক্ষণ ওই কথাটাই মনে পাক খাইতেছিল। বাস্তবিক দেবুদাই ভাগ্যবান। চামেলী বৌয়ের মত এমন স্ত্রীর পায়ে নিজেকে বিলাইয়া দিতে পারার চেয়ে অধিক সুখ আর কি আছে এই সংসারে!

॥ উনত্রিশ ॥

এর কিছুদিন পরে হঠাৎ চিন্ময়ের একটি চিঠি পাইয়া অবাক লাগিল। সাধু ভাষায় উহাকে পত্র না বলিয়া যথার্থ অর্থে পত্রাঘাত বলাই উচিত।

সে লিখিয়াছে, আলোক, সত্যি তোর কথা মনে হলে দুঃখ হয়। তুই এত লেখাপড়া জানা শিক্ষিত হয়ে কি করে ওই জঙ্গলে কতগুলো অসভ্য মূর্খ চাষা-ভূষোদের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাচ্ছিস, ভাবতে পারি না। এ তো এক রকম নির্বাসন দণ্ড! টাকাপয়সা কে না চায়? সবচেয়ে বড় কথা আমার চেয়ে বেশি বোধ হয় আর কেউ টাকাকে ভালবাসে না। তবু আমায় কেউ যদি তোর ওই চাকরিটা দেয়, তুই যতই মনে করিস নিজেকে একটি ক্ষুদ্র নবাব বিশেষ, আমার কাছে কিন্তু মনে হয়, ও তোর একরকম নরকভোগ!

দীর্ঘদিনের তপস্যার ফলে আমরা শিক্ষাদীক্ষা ও সভ্যতার যে আলো দেখতে পেয়েছি এবং ইংরেজ রাজত্বের কৃপায় আমরা আজ সভ্য, ভদ্র, শিক্ষিত মানুষ হয়েছি, বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী কলকাতা শহরে বাস করার সৌভাগ্যলাভ করেছি, তাকে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ যদি না করতে পারি তাহলে শিক্ষার মূল্য কি? উপার্জনের মূল্য কি? একদিন এই জঙ্গলের অন্ধকার থেকে সভ্যতার আলো লাভ করার জন্য যুগ যুগ ধরে জ্ঞানী-গুণীরা যে সাধ্যিসাধনা করেছে, তাকে কি তবে অর্থহীন, শূন্য বলতে চাস?

মানুষ অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে চায়—তাকেই জীবনের সার্থকতা, পূর্ণতা বলে মনে করে, তা ভাল করেই তুই জানিস। তাই তোকে সেই আলো থেকে অন্ধকারে ফিরে যেতে দেখে, সত্যি মাঝে মাঝে খুব দুঃখ হয় তোর জন্যে।

এই কথা লিখে তোকে জ্ঞান দিতে চাই না। তুই ছেলেবেলা থেকেই যে খুব অভিমানী তা জানি। তাই মুখ ফুটে কারুর কাছে কোন চাকরি চাওয়া পছন্দ করিস না। সবই বুঝি। আজ একটা ভাল চাকরি হঠাৎ আমার আপিসে খালি হয়েছে এবং এর নির্বাচন সম্পূর্ণ আমারই হাতে। তাই তোকে এখুনি ওই জঙ্গল থেকে চলে আসতে বলছি। কবে নাগাদ আসছিস পত্রপাঠ আমার এই বোম্বের অফিসের ঠিকানায় জানাস। এখানে এখন আমায় আরো

তিন মাস থাকতে হবে। ইতি, তোর চিন্ময়।

চিন্ময়ের এই চিঠির জবাব যে কি দিব অনেক চিন্তা করিয়া শেষে লিখিলামঃ

ভাই চিন্ময়, তুই যে সত্যি আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে এত ভাবিস, তা বুঝতে পারিনি।

যা হোক তোকে এর জন্যে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাবো জানি না। তবে আমার পক্ষে এ চাকরি ছেড়ে উপস্থিত অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।

অন্ততঃ যতদিন না মনিব তাড়িয়ে দিচ্ছেন, ততদিন এ প্রশ্নই ওঠে না। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাঁর কাছে।

জানি, তুই হয়ত এ চিঠি পড়ে আমায় পাগল ভাববি! শহর ও সভ্যতার সব সুখ হাতে পেয়ে এইভাবে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিচ্ছি বলে!

শুধু একটা কথাই তোকে বলি। জানিস তো, সব নদীর সকল ধারা উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী, এটা স্বাভাবিক। তবু কোথাও দেখা যায় কোন কোন নদী উত্তরবাহিনী।

আমার জীবনের ধারা ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ্য করেছি, সামনের দিকে সহজ স্বাভাবিক পথে না গিয়ে উল্টো দিকে ধায় এবং সেটাকেই স্বাভাবিক বলে মনে করে! কি করবো? এর জন্যে সৃষ্টিকর্তাই দায়ী, যিনি আমার মনের গতি এমনি বিপরীতগামী করে দিয়েছেন। আশা করি বেশ আনন্দে আছিস। যদি সম্ভব হয় ত আবার কোনদিন দেখা হবে। প্রীতি নিস্।

ইতি তোর আলোক।

পুনশ্চঃ—

ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে। It is better to reign in Hell than to serve in Heaven! তুই নিশ্চয় এর অর্থ জানিস! তাই তোর চোখে আমার এ জীবনটা যদি 'হেল্' বা নরকের তুল্য হয়, তাহলে আমি ওই ইংরেজ কবির সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবো, হাঁ, এ জীবন আমার কাছে অনেক ভাল। তোর কাছে আমার এ জীবন যতই নিন্দনীয় হোক, একে 'হেল্' বা নরকের সমতুল্য জ্ঞান করলেও ভুলে যাসনি—এদের কাছে আমি রাজার মত জমিদারের প্রতিনিধি, ম্যানেজার, আমার মুখের দিকে ওই শত শত নিরীহ, মূঢ়, হতভাগ্য মানুষগুলো তাকিয়ে আছে। তাদের যত সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনা অভাব অভিযোগ সব তারা জানায় এই একজনের কাছে। আমাকে যেন ঘিরে রেখেছে তারা, তাদের সকল মন দিয়ে। সেই সুবিরাট সুমহান হৃদয়সাম্রাজ্যের আমি একমাত্র অধীশ্বর! তুই জানিস না, যে শিক্ষা-সভ্যতার জন্য তুই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছিস, তার বদলে যে কি হারিয়েছিস, কত বড় মহৈশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিস তা জানিস না! যে সভ্যতার জয়গানে তুই মুখর, একদিন আমিও ছিলাম ও-দলে। বিশ্বাস কর ভাই, তখন বুঝতে পারিনি ওই সভ্যতার

স্বরূপ। এখানে এসে এদের দেখে, এদের সঙ্গে বাস করে এদের সামিল হয়ে আজ বুঝেছি তথাকথিত ওই সভ্যতা কত অন্তঃসারশূন্য। শহরে মানুষ আছে কিন্তু মনুষ্যত্ব নেই, প্রেম আছে কিন্তু ভালবাসা নেই, সুখ আছে কিন্তু শান্তি নেই। যেখানে যত আলো তার নীচে তত অন্ধকার।

কিন্তু এখানে এই জঙ্গলে নিরীহ, হতভাগ্য মানুষগুলোর হৃদয় যে কত বড় তা তোকে লিখে বোঝাতে পারবো না। ওদের দারিদ্র্য, দুঃখ, অভাব সবই আছে কিন্তু নেই শুধু তার অভাববোধ। ওরা মাটিতে বাস করে, মাটিতে ঘোরে, মাটি ওদের শয্যা—তাই বুঝি ওদের অন্তরটা ওই মাটির মত। ওরা ধরিত্রীর মত সর্বংসহা। যাই হোক, তোর এই জরুরী চিঠির জন্য আবার ধন্যবাদ—আমার জন্য যে একটা চাকরির কথা তোর মনে পড়েছে তাতে আমি যেমন খুশি হয়েছি, তেমনি তোর কথা রাখতে পারলুম না বলেও দুঃখিত। কিছু মনে করিসনি।

ইতি—আলোক

॥ ত্রিশ ॥

সেদিন কাছারীতে যাইবামাত্র নায়েববাবু বলিলেন, হুজুর, হঠাৎ ভুঁইষাটাঁড়ে প্লেগ্ দেখা দিয়েছে, অনেক লোক মারা গেছে, ঘরদোর ফেলে প্রাণভয়ে গ্রাম ছেড়ে যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। মৃতের সৎকার করে এমন লোকও নাকি মিলছে না।

সে কি! চমকিয়া উঠিলাম। এদিকে প্লেগ্ হয় নাকি?

হুজুর, কখনো তো হয়েছে বলে শুনিনি। তবে বিহারের কোন কোন জেলায় একেবারে দেহাতের দিকে কখন-সখন হয় ও অনেক লোক মরে শুনেছি।

ভুঁইষাটাঁড় খুব কম হলেও ওখান থেকে তিরিশ, পঁয়তিরিশ, ক্রোশ দূরে। তাই প্রশ্ন করিলাম, আপনি এ খবর পেলেন কোথা থেকে?

হুজুর, আমাদের তহসিলদার রাম অবতার ভোরবেলা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে আসে আমার কাছে। বলে তার সর্বনাশ হয়েছে। ওর শ্বশুরবাড়ি ওই গাঁয়ে, ওর বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছিল ক'দিনের জন্য বেড়াতে। একই বাড়িতে তিনদিনের মধ্যে ওর শ্বশুর, শাশুড়ী, ছোট শালা ও তার বৌ, বড় ছেলে প্লেগে মারা গেছে। মেয়েটা বেঁচে আছে। গাঁয়ের এক আদ্মী তাকে নিয়ে চলে গেছে মতিহারীতে, তার চাচেরা ভাইয়ার কাছে।

প্লেগ্ কখনো দেখি নাই। বইয়ের পাতায় পড়িয়াছিলাম সাংঘাতিক মারাত্মক ব্যাধি! এক একটা পরিবার এমন কি গাঁকে-গাঁ মরিয়া উজাড় হইয়া যায়। সময়মত চিকিৎসা, ওষুধপত্রের ব্যবস্থা হইলে হয়ত অনেকের প্রাণ বাঁচে কিন্তু আতঙ্কে লোকজন পালাইয়া যায় বলিয়াই মৃতের সংখ্যা বাড়িয়া যায়।

দিনে দিনে।

এছাড়া ছেলেবেলায় ঠাকুমার মুখে শুনিয়াছিলাম, কলিকাতা শহরে নাকি একবার প্লেগে বহু লোক মারা যায়। নিমতলা ও কাশীমিত্রের ঘাটে শ্মশানে জায়গা ছিল না, গাদা হইয়া মড়া জমিয়া থাকিত। ওদিকে গঙ্গার জলে এত পচা মড়া ভাসিত যে সরকার হইতে ঘোষণা করা হয়, গঙ্গায় কাহাকেও স্নান করিতে দেখিলে আইন ভঙ্গের অপরাধে শাস্তি হইবে। ঘাটে ঘাটে পুলিসের কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

হায়, তখন কে জানিত যে একদিন আমাকে এইরূপ সংকটের সম্মুখীন হইতে হইবে! আমি ম্যানেজার, জমিদারের প্রতিভূ, প্রজারা জমিদারকে কোন-দিন চোখে দেখে নাই, আমাকেই জানিত তাদের একমাত্র রক্ষক, মা-বাপ বলিয়া। তাই তাদের এই বিপদের দিনে আরামে ঘরে বসিয়া না থাকিয়া নিজেই সেখানে লোক-খাদ্য ওষুধপত্র সঙ্গে লইয়া যাইব বলিয়া স্থির করিয়া ফেলিলাম।

কিন্তু নায়েববাবু হঠাৎ বাঁকিয়া বসিলেন, আমাকে যাইতে দিবেন না কিছুতেই। তিনি বলিলেন, হুজুর, আপনার এত সব কর্মচারী রয়েছে আপনার এত বড় স্টেটের কাজকর্ম যারা দিনের পর দিন করছে, আপনি যাদের কাজে খুশি, সেইসব বিশ্বাসী কর্মচারীদের নিয়ে আমি নিজে যাবো। আপনি শুধু হুকুম করুন কি করতে হবে, দেখবেন তার এতটুকু ত্রুটি-হবে না কোথাও!

নায়েববাবু আমার মানসম্ভ্রমটাকে প্রাধান্য দিয়ে এমনভাবে সকল দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন যে তারপর আর কিছু আমার তরফে বলিতে গেলে হয়ত সন্দেহের প্রশ্ন জাগিতে পারে তার মনে। কারণ এক্ষেত্রে টাকা-কড়ি, খাদ্যখাবার ওষুধপত্র ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সব কিছু বিলিব্যবস্থার স্বাধীনতা তাঁর।

তাই সেদিন দুপুরেই সদলবলে টাঙা করিয়া নায়েববাবু আমার কাছ হইতে টাকাকড়ি বুঝিয়া লইয়া যাত্রা করিলেন। এবং ওখানকার সকল সংবাদ পরদিন রাত্রেই যাহাতে পাই, 'ঘোড়সোয়ার' মারফৎ তাহার ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া গেলেন।

কিন্তু পরদিন রাত গেল, তার পরের দিন রাত গেল, চতুর্থ দিন সকাল দশটা পর্যন্ত ওখানকার কোন সংবাদ না পাইয়া মনটা অস্থির হইয়া উঠিল। ব্যাপার কি! নায়েববাবু যে আমার সঙ্গে কথার খেলাপ করিবেন, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তাই নিজেই চুপি চুপি কেবল দারোয়ানকে বলিয়া খাওয়াদাওয়া করিয়া হাতী করিয়া ভঁইষাটাঁড়ের পথে যাত্রা করিলাম। মাহুতটা এ অঞ্চলের লোক। পথঘাট চেনে জানে। বিশেষ করিয়া কোন বনজঙ্গলের পথে দ্রুত যাওয়া যায় জানিত। তাই সারাদিন পরে বৈকাল নাগাদ যখন ভঁইষাটাঁড় গাঁয়ের ঠিক আগের গ্রামের ভিতর আমার হাতীটা গিয়া ঢুকিল, একদল মেয়েপুরুষ ছুটিয়া আসিয়া দু'হাত জোড়

কহিল, "হুজুর আব মাত্ যাইয়ে উধার"। হাতীটা দেখিয়াই তাহারা চিনিতে পারিয়াছিল, উহা স্বয়ং ম্যানেজার সাহেবের হাতী।

ম্যানেজারকে না চিনিলেও হাতীটা চিনিত সবাই। আরো কিছুটা অগ্রসর হইতে দেখি আরো একদল গ্রামবাসী ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মিনতিভরা কণ্ঠে সবাই বলিয়া উঠিল, "হুজুর, মেরা মা-বাপ দেওতা, উধার মাত যাইয়ে!"

সেই লোকগুলির মুখের দিকে তাকাইয়া নিমেষে আমার মনটা যেন দুর্বল হইয়া পড়িল। মনে হইল এমন আন্তরিক ভালবাসার মূর্তি আর কখনো দেখি নাই।

হাতী হইতে নামিয়া পড়িলাম। আমার আগমন-বার্তা ইতিমধ্যে গ্রামের ভেতর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। জানিতাম না যে ঐ গ্রামেই আমাদের ওই ত্রাণ-শিবির খোলা হইয়াছে, বিজু মাহাতোর খামারবাড়িতে। ওই অঞ্চলে জমি-জমা চাষ-আবাদ সব চেয়ে বেশি ছিল তার।

একটু পরেই আমাদের একজন সেরেস্তাদার আসিয়া আমায় সেখানে লইয়া গেল। আমি যে নিজে আসিতে পারি, ইহা বিশেষ করিয়া আমার কর্মচারীরা কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই। তারা আমায় দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল।

বিজু মাহাতোর খামারে পাঁচিল-ঘেরা বিরাট প্রাঙ্গণ, সেখানে ছোট বড় মাটির ঘর অনেকগুলি। সেখান হইতেই ওষুধপথ্য, খাদ্যখাবার, প্রয়োজনীয় পয়সাকড়ি বিতরণ করা হইতেছিল শরণার্থীদের।

অনেকেই এইসব লইয়া গ্রামান্তরে আত্মীয়-স্বজনের কাছে যেমন চলিয়া যাইতেছিল, তেমনি যাহারা অসহায়, সেইখানেই আশ্রয় লইয়াছিল।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতেছিলাম। হঠাৎ একটি তরুণী যুবতী আসিয়া আমার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেরেস্তাদার বলিল, মেয়েটির স্বামী ছেলে মারা গিয়াছে, আপনজন বলিতে দুনিয়ায় আর কেহ নাই।

মেয়েটির মুখের দিকে তাকাইয়া চিনিতে পারিলাম। এ সেই দেহাতী মেয়েটি, অনাঘ্রাত-কুসুম বলিয়া একদিন রাত্রে আমার ঘরে গিয়াছিল। সেরেস্তাদারকে বলিলাম, মাসখানেক পরে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলে দাও। একটা যা হোক ব্যবস্থা তখন করবো।

এমনিধারা আরো অনেক সর্বহারা নর-নারী নানা প্রার্থনা লইয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইলে আমি তাহাদের নায়েববাবুর কাছে যাইতে বলিয়া দিলাম।

সেরেস্তাদার বলিল, হুজুর, নায়েববাবু কাল চলে গেছেন, তাঁর শরীর খারাপ বলে!

বলিলাম, আচ্ছা, এদিকটা একটু শান্ত হলে তারপর ওরা যেন দেখা করে নায়েববাবুর সঙ্গে, বলে দাও ওদের। তিনি ওদের ব্যবস্থা করে দেবেন।

যা হোক, ত্রাণকার্য ভালই হইতেছে দেখিয়া সে রাত্তিরটা সেখানে থাকিয়া পরদিন ভোরে হাতীর পৃষ্ঠে নিজের বাংলোতে ফিরিয়া আসিলাম।

আমার আরো কয়েকটা দিন থাকিবার ইচ্ছা ছিল, বিশেষত নায়েববাবু নাই বলিয়া। কিন্তু কাহারো ইচ্ছা নয় যে আমি আর একটা দিন কেন, একটা ঘণ্টাও থাকি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাই ফিরিয়া আসিয়াছিলাম।

কিন্তু বাসায় আসিতে দারোয়ানের কাছে শুনিলাম, নায়েববাবু আসিয়াছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করিতে। কিন্তু ওখানে গিয়াছি শুনিয়া কাছারীবাড়ির চাবিটা তাকে দিয়া গিয়াছেন হুজুরকে দিবার জন্য।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, কাছারীবাড়ির চাবিটা হঠাৎ আমায় কেন দিয়া গেলেন! পরে যাহোক কাছারীতে গিয়া খোঁজ লইব ভাবিয়া তখন স্নানাহার করিয়া ক্লান্ত দেহ লইয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম।

গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা জমিদারবাড়ির সরকার মশাইয়ের কণ্ঠস্বরে ঘুম ভাঙিয়া গেল, হুজুর মাপ করবেন, আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করলুম বলে। কি করবো গিন্নীমায়ের হুকুম! বলিয়া পকেট হইতে একটি চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন।

চিঠি পাইয়া আমি হতবাক্। গিন্নীমার জবানীকে তাঁর পুত্রবধূ ভুল বাংলায় লিখিয়াছেন, আমি যেন পত্রপাঠ আপিস বন্ধ করিয়া, খাতাপত্র ক্যাশ ইত্যাদি সব লইয়া সরকারবাবুর সঙ্গে এখনি টাঙায় করিয়া এখানে চলিয়া আসেন!

মালেকানের হুকুম শিরোধার্য করিয়া তৎক্ষণাৎ সব গুছাইয়া লইয়া টাঙায় আসিয়া বসিলাম।

জমিদার বাড়িতে যখন পেঁছাইলাম, সবে সন্ধ্যা লাগিয়াছে, ঠাকুরবাড়িতে আরতির শাঁক-ঘণ্টা বাজিতেছে।

আমি ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুর-প্রণাম করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আরতি শেষ হইলে মাতাজীকে প্রণাম করিয়া কহিলাম, আমায় সব বন্ধসন্ধ করে এখনি ডেকে পাঠিয়েছেন কেন?

জপের মালাটা মাথায় ঠেকাইয়া তিনি কহিলেন, ছি বাবা, তুমি খুব অন্যায় করেছো সেখানে গিয়ে। নায়েববাবু তো তোমাকে যেতে বার বার নিষেধ করেছিলেন। তিনি নিজে লোকজন নিয়ে সেখানে সব ব্যবস্থা ভালভাবেই করেছেন। হঠাৎ তাঁর শরীরটা খারাপ হয়ে পড়ায় চলে আসেন এবং তোমাকে না দেখতে পেয়ে, আমার কাছে ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছেন।

বলিলাম, হাঁ, নায়েববাবু কাছারীর চাবিটা দিয়ে গেছেন দারোয়ানের কাছে!

গিন্নীমা ভয়ার্তকণ্ঠে বলিলেন, ভাগ্যিস নায়েববাবু চাবি দিয়ে গিয়েছিলেন দারোয়ানের কাছে, তবেই তো একথা জানতে পারি। শোনার পর থেকে ভয়ে

মরি। কাল রাত্রে ভাল করে ঘুমোতে পারিনি। তুমি ছেলেমানুষ, প্লেগ্ যে কি সাংঘাতিক রোগ, সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। তুমি ভারী অন্যায় করেছো কারুর কথা না শুনে সেখানে গিয়ে।

বলিলাম, মাতাজী, প্রজারা আপনার সন্তানতুল্য। তাদের সুখদুঃখ বিপদ-আপদ সব কিছুর দায়দায়িত্ব যার ওপর দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত আছেন, তারা—আপনার সেই সন্তানরা বিপন্ন শুনে সে কি করে আরামে ঘরে শুয়ে থাকে। আর তারা গরীব অসহায় হতে পারে, কিন্তু তাদের প্রাণের মূল্য তো কারুর চেয়ে কম নয় মাতাজী?

মাতাজী কহিলেন, কথাটা হয়ত সত্যি। কিন্তু বাবা, সেইসব হাজার হাজার মানুষের জীবনের সব কিছু দায়দায়িত্ব যার ওপর, তার জীবনের মূল্য কি সবচেয়ে বেশি নয়, ভেবে দেখো মনে?

বলিতে বলিতে হাতের মালাটা আবার একবার কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, আমার রাজেন্দ্র যা তুমিও তা, তোমাকে আমি তারই মত নিজের সন্তান মনে করি, সে কেবল জমিদারীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার ও সব দায়দায়িত্ব তোমার ওপর দিয়ে যায়নি সেই সংগে আমাদেরও, ভুলে যেয়ো না। তাই আজ থেকে তুমি এখানেই থাকবে, আর কোথাও যেতে দেব না তোমায়।

সত্যি বলিতেছি, ঠাকুরঘরের ওই পবিত্র পরিবেশে মাতাজীর মুখের কথা শুনিয়া সেদিন অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম। সত্যি তিনি আমায় নিজের ছেলে মনে করেন, এতবড় কথাটা জপের মালা হাতে দেববিগ্রহের সামনে যখন বলিলেন তখন এর চেয়ে বড় সত্য আর কি হইতে পারে!

আনন্দে আমার দু চোখে জল আসিয়া পড়িল। কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া, পুনরায় তাঁকে মাতাজী বলিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইতে গেলে তিনি কহিলেন, বেটা যতদিন না ওদিকের খবর ভাল হয়, তুমি এখানে থেকেই তোমার হিসাবপত্রের কাজ করো।

মাতাজী আপনার ইচ্ছাই আমার শিরোধার্য! বলিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

জমিদার-বাড়ির হাতায় ম্যানেজারের থাকিবার নিজস্ব সুসজ্জিত বাংলো। বোধ করি সরকারমশাই আমাকে গাড়ি লইয়া আনিবার জন্য গিয়াছেন, সে খবর ভৃত্যমহলে আগেই পেঁাছিয়াছিল। তাই আমি উপস্থিত হইবার পূর্বেই ঘর তাহারা ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কেবল করিয়া রাখে নাই, জানালায় দরজায় রেশমী পর্দা টাঙাইয়া ধোপদস্ত বিছানার চাদর, বালিশ, মশারী প্রভৃতি গোছ করিয়া, মায় টেবিলের উপর সুদৃশ্য ফুলদানীতে বাগানের ফোটা টাটকা বাছাই করা নানা ফুল সাজাইয়া রাখিয়া দিয়াছিল। ঘরে পা দিয়াই তাই মনটা প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। দুটি ভৃত্য আমার সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিযুক্ত ছিল—বুধন আর শুকদেও। তারা সব সময় আমার নিকটেই থাকিত, যাহাতে আমার এতটুকু কোন অসুবিধা না হয়।

সেদিন রাত্রে শরীরটা খুব ক্লান্ত থাকায় বিছানায় শুইবামাত্র গভীরভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ভৃত্যরা কখন মশারী ফেলিয়া ঘরের আলো নিভাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল হুঁশ পর্যন্ত ছিল না।

মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুমটা ভাঙিয়া দেখি গা খুব গরম, বেশ জ্বর ও কপালের দু'পাশের রগ দুইটায় অসহ্য যন্ত্রণা। খুব পিপাসা পাইয়াছিল। জল খাইবার জন্য টর্চটা জ্বালিতেই জানলার ওপাশ হইতে বুধনের গলা পাইলাম, হুজুর পানি পিয়েঙ্গে?

হাঁ। বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া মাটির সুরাই হইতে এক গ্লাস ঠান্ডা জল গড়াইয়া আমার হাতে আনিয়া দিল। খালি গ্লাসটা তার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন রাত কত বুধন।

হাঁ হোগা—কৈ দেড়, পৌনে দো, হুজুর।

তা তুমি এখনো ঘুমোও নি যে?

এবার মোলায়েম সুরে সে কহিল, হুজুর, হাম্ যব্ নিদ্ যায়েগা, আউর কৌন্ পানি দেগা জী?

বুঝিলাম ইহাই রীতি। ম্যানেজারের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন। তাই আর কোন কথা না বলিয়া শুইয়া পড়িলাম।

শেষরাতে আবার দারুণ তেষ্টায় ঘুম ভাঙিয়া যাইতে ভাবিলাম, বেচারী বুধন জানিতে না পারে, নিঃশব্দে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া মশারীটি যেমন তুলিয়াছি, তখনি শুকদেও ঘরের মধ্যে হাজির হইয়াছে।

হুজুর কেয়া জরুরত আব্ কো বাতাইয়ে।

আরে তুমিও ঘুমোওনি, জেগে আছো!

তখন সে বলিল, ওরা দু'জনে ভাগাভাগি করিয়া ডিউটি দেয়।

এইভাবে রাতটা কাটিয়া সকাল হইলে সরকারমশাই যখন আমার খোঁজ-খবর লইতে আসিলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম, যদি বুধনকে পাঠিয়ে একবার ডাক্তার বাবুকে আসতে বলেন তো ভাল হয়।

হুজুর, আপনার অসুখ—বুধনকে পাঠাবো কেন, আমি নিজেই যাচ্ছি এখুনি।

॥ একত্রিশ ॥

কিছুক্ষণ পরে সরকারমশাই ডাক্তারবাবুকে লইয়া ঘরে ঢুকিলেন। সাদা প্যাণ্টের উপর গলাবন্ধ কালো রঙের কোট, লম্বা শুকনো রোদে পোড়া চেহারা, পাকা শালের খুঁটির মত মজবুত প্রৌঢ়, মাথার চুল প্রায় সবই কাঁচা, অথচ ঠোঁটের উপরে একবোঝা পাকা গোঁফ, ভদ্রলোক ঘরের ভিতর পা দিয়া সর্বপ্রথম তাঁহার হাতের কালোরঙের ডাক্তারী ব্যাগটা উঁচু করিয়া বুকের কাছে তুলিয়া ও একই সঙ্গে ঘাড়টি নীচুতে নামাইয়া "নমস্তে ম্যানেজার সাব্" বলিয়া একেবারে

আমার শয্যাপার্শ্বে চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। তারপর হাতের ব্যাগটা নীচে রাখিয়া "হাঁ" বলিয়া একটা ছোট্ট রকমের হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিলেন, 'বাতাইয়ে সাব্, আপ্‌কো কেয়া হুয়া শরীরমে, কাঁহা কাঁহা কষ্‌ট্ মালুম হোতা ?'

একে একে সব বলিলাম। তিনিও মনোযোগ দিয়া সব শুনিলেন। তারপর আবার সেইরকম একটি হুঙ্কার ছাড়িয়া কহিলেন, হাঁ। দীজীয়ে ত আব্‌কো হাতটো। বলিয়াই আমার ডান হাতটি টানিয়া লইয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে শুরু করিলেন। কিন্তু মিনিট কয়েক পরে, বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, খপ্ করিয়া বাঁ হাতে কোটের বুক্‌পকেট হইতে একটি বড় পকেট ঘড়ি বাহির করিয়া, নাড়ী ধরিয়া বসিয়া রহিলেন।

হাঁ। বলিয়া নাড়ী ছাড়িয়া, ঘড়ি পকেটে ভরিতে ভরিতে বলিলেন: দেখাইয়ে জিবটো।

তারপর নিজেই চোখের কোণ দুটি আঙ্গুল দিয়া টানিয়া দেখিয়া, ব্যাগ হইতে স্টেথোস্‌কোপ বাহির করিয়া আমার বুক পিঠ ভাল করিয়া পরীক্ষার পর, হঠাৎ আমার কুঁচকি টিপিয়া বলিলেন, হিঁয়া কৈ দরদ মালুম হোতা ?

বলিলাম, হাঁ খোড়াসে—সামান্য। দুদিন ধরিয়া হাতী চড়িয়া অনেক উঁচু নীচু পথে চলার দরুণ গায়ে যেমন ব্যথা, ওখানেও তেমনি বোধ করিতেছি।

এবার আরো জোরে 'হুঁ' বলিয়া কুঁচকি ছাড়িয়া আমার গলায় দু পাশে টিপিতে লাগিলেন।

ইধার কৈ দরদ মালুম হোতা জী ?

নেহি জী।

আচ্ছা ঠিক হ্যায়। মায় আভি দাওয়াই ভেজ্‌তা হ্যায়। বলিয়া আবার নমস্কার করিয়া বাহিরে গেলে সরকার মশাই নিজেই আমার ওষুধ আনিতে গেলেন তাঁর সঙ্গে।

সারাদিন ওষুধ খাইবার পর সেই দিন মাঝরাতে হঠাৎ জ্বর বাড়িতে বাড়িতে একশো সাড়ে চার ডিগ্রী পর্যন্ত নাকি উঠিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে আমি নানারকম উল্টা-পাল্টা ভুল বকিতে শুরু করিয়াছিলাম।

ভৃত্যেরা ভয় পাইয়া তখনি সরকার মশাইকে ডাকিয়া আনে। তিনি মাথায় জল ঢালিয়া কপালে জলপটি দিয়া বাতাস করিতে করিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলে তার পর নাকি নিজে ঘুমাইতে যান।

সকালে আমার ঘুম ভাঙিলে সরকার মশাই প্রথমেই আসিলেন হন্তদন্ত হইয়া আমার কাছে এবং একটু ভাল দেখিয়া তখন রাত্রের ঘটনা একে একে সবই আমায় বলিলেন, অর্থাৎ তিনি যে আমায় কিরূপ সেবা করিয়াছিলেন, সেটাই জানানো ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য, যাহাতে ম্যানেজার সাহেবের সুনজরে থাকেন।

তাই নাকি! এত সব ব্যাপার, আমার কিন্তু কিছু মনে নেই!

সরকার মশাই হাত কচলাইয়া কহিলেন, হুজুর বিকারের ঘোরে রুগী যে প্রলাপ বকে, কিছুই মনে থাকে না। আমি বুড়ো মানুষ অনেক দেখেছি এমন।

তারপর একটু থামিয়া নিম্নস্বরে কহিলেন, হুজুর, আপনার বাড়িতে বহুজীকে কি খবর দেবো আসার জন্য।

চমকিয়া উঠিলাম, কেন?

হুজুর, কসুর মাপ কীজীয়ে, বহুজীর নাম আপনি ওই বিকারের ঘোরে অনেকবার করেছেন, তাই মনে হয় নিশ্চয় আপনার মন চায় তাঁকে, নইলে অনেক আজে-বাজে কথার মধ্যে ওই নামটা বারবার কেন মুখে আনবেন।

আমি যে বিবাহ করি নাই এবং সংসারে আমার আপন বলিতে এমন কেহ নাই যে আমার অসুখের খবর শুনিয়া ছুটিয়া আসিবে, আত্মসম্মান রক্ষার্থে সেকথা গোপন করিয়া কৌতূহলবশত সরকার মশাইকে বলিলাম, আপনি হয়ত ভুল করে কি শুনতে কি শুনেছেন!

হুজুর, আমি বুড়ো হলেও ভুল শুনিনি। চামেলী বৌ, চামেলী বৌ, তুমি এসেছো? বেশ কবার আপনি মুখে উচ্চারণ করেছিলেন।

'চামেলী বৌ' আমার কানে যাওয়া মাত্র আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল, হর্ষ-বেদনা মিশ্রিত স্মৃতির আঘাতে। মনে পড়িল, মধুপুর হইতে বিদায় লইবার দিন দেবুদার রোগশয্যায় চামেলী বৌয়ের সেবাময়ী সেই মূর্তি দেখিয়া কেবল মুগ্ধ হই নাই, হাঁটিতে হাঁটিতে সারা পথ শুধু একটা কথাই বারংবার তরঙ্গের মত মনের মধ্যে ধ্বনিত হইতেছিল—দেবুদাই যথার্থ সুখী। একই সঙ্গে এমন প্রেমময়ী, লীলাময়ী, সেবাময়ী স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা। কিন্তু ওরই সঙ্গে আমার অন্তরের অন্তস্তলে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত একটি বাসনা উঁকি দিতেছিল। এ সৌভাগ্যের যথার্থ অধিকারী আমারই হইবার কথা ছিল। ঈর্ষা বলিব না, বরং একপ্রকার বিরহের বেদনা সেদিন শুধু ক্ষণিকের জন্য যেন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অবচেতনার অন্ধকার গহ্বরে একদিন যে বাসনা সমাধি লাভ করিয়াছিল, তাহা যে এইভাবে বিকারের ঘোরে প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে কখনো কল্পনা করি নাই।

আমি এ বিষয়ে আর কোন কথা তাহাকে না বলিয়া শুধু কহিলাম, তার চেয়ে আপনি এখনি একবার ডাক্তারবাবুকে ডাকতে লোক পাঠান।

হুজুর লোক নয়, আমি নিজেই যাবো এখনি তাঁর কাছে, তার আগে এখন আপনি কেমন আছেন, খবরটা নিতে এসেছি।

বলিলাম, ভাল নয়, সারা দেহে ব্যথা যন্ত্রণা।

একটু পরে ডাক্তারবাবু আসিলেন। সরকার মশাইয়ের মুখে তিনি সব শুনিয়াছিলেন, তাই ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই আমার গলার দুই দিকের গ্ল্যাণ্ড টিপিয়া বলিলেন, ইয়ে তো বহুত বড়া মালুম হোতা।

বলিলাম, হাঁ খুব ব্যথাও করছে, কিন্তু ভেতরে খুব শ্লেষ্মা আছে, গলায়

ব্যথা, বুকে পিঠে ব্যথা!

ব্যস, জাদা বাত্ মাত্ বলিয়ে ম্যান্‌জার সাব্। হাম সব্ কুছ সমঝ লিয়া। বলিতে বলিতে তাঁর ব্যাগটি খুলিয়া, ডান হাত ও বাঁ হাতে পর পর তিনটি ইন্‌জেক্‌শন্ দিয়া ও আরো কিছু ওষুধ খাইবার ব্যবস্থা সব কাগজে লিখিয়া দিয়া এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বোধ হয় ঘুমের জন্য একটা ইন্‌জেকশন দিয়াছিলেন, তাই দশটার সময় ডাক্তারবাবু চলিয়া যাইবার পর সেই যে চাদর মুড়ি দিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম, একেবারে সন্ধ্যানাগাদ ঘুম ভাঙিল। জলতেষ্টায় জিভ শুকাইয়া গিয়াছিল।

আরে বুধন, এ শুকদেও, বহুত্ পিয়াস লাগা, পানি দেও জল্‌দি।

কাহারো কোন সাড়াশব্দ নাই। আরে এরা সব গেল কোথায়? মুখের কথা বার করিবার আগেই যারা ছুটিয়া আসে হুজুরের সেবার জন্য, তারা সব চুপচাপ কেন? অন্য দিন আগেই ঘরের আলোটা জ্বালিয়া দিয়া যায়, আজ সন্ধ্যা লাগিতেও আলো জ্বলে নাই। ব্যাপার কি? আবার তাদের নাম ধরিয়া ডাকিয়া কাহাকেও না পাইয়া নিজেই টেবিলের ওপর জলের সুরাই হইতে অতি কষ্টে এক গ্লাস জল গড়াইয়া খাইয়া যখন বিছানায় আসিয়া বসিলাম, একটা চাকাওলা চেয়ার লইয়া একটা বৃদ্ধ ঘরে ঢুকিল। তাহাকে আগে দেখি নাই। বলিলাম, আরে, আঁধিয়ার মে পহেলা বাতি জ্বালাও তো। আর ওসব নকর কাঁহা—বুধন, শুকদেও, ও লোককো বোলাও তো!

ও লোককো পাত্তা মালুম নেহি। আব্ আইয়ে হামারা সাথ। বইঠিয়ে ইয়ে চেয়ারমে।

বলিলাম, তোমার সঙ্গে কোথায় যাবো?

আপ্‌কো বাস্‌তে দুসরা কামরা ঠিক হুয়া জী। হুয়াপর আভি সে আব্ ঠেরিয়ে গা।

তখন শরীরটা খুব দুর্বল। ওর সঙ্গে বেশী কথা না বলিয়া চেয়ারটায় বসিতে লোকটা চেয়ারটি ঠেলিয়া আমায় যখন বাইরের দিকে অতিথিশালায় একটা ছোট্ট ঘরে লইয়া আসিল এবং একটি নেয়ারের খাটিয়ার উপর শোয়াইয়া দিল, তখন ব্যাপারটা বুঝিতে দেরি হইল না।

ভিতরমহলের সঙ্গে ইহার কোন যোগ নাই। ইহার সংলগ্ন একটি যে ফুল-বাগান শুধু উহাই খিড়কী দরজা পর্যন্ত গিয়াছে। বহুরাণী ফুল ভাল-বাসেন। ওই দরজা দিয়া বাগানে ফুল তুলিতে আসেন। গৃহদেবতার পূজার ফুলও ওই পথেই ভৃত্যরা লইয়া যায়।

অতিথিশালার পাশেই মালীর ঘর। মালীর নাম বনোয়ারী, বৃদ্ধ হইলেও বেটেসেটে বলিষ্ঠ চেহারা। এই বনোয়ারীই আমায় এখানে আনিয়া, ওঘরের ওষুধপত্র সব টেবিলের ওপর গুছাইয়া রাখিতে গিয়া বলিল, হুজুর, এখন থেকে আপনার সেবার ভার সব কিছু আমার উপর।

কেন, আর সবাই গেল কোথায়?

সে তখন সব খুলিয়া বলিল। অর্থাৎ সকালে ডাক্তারবাবু আমার প্রবল জ্বরের সঙ্গে গ্ল্যান্ড ফুলিতেছে দেখিয়া ভয় পাইয়া গিয়াছেন। নিশ্চিত প্লেগের বীজাণু আমার দেহে ঢুকিয়াছে। তাই আমার এই বাহিরমহলে থাকিবার ব্যবস্থা। আর চাকর-বাকরেরা প্লেগের নাম যেই কানে শোনা, সবাই পালাইয়া গিয়াছে—কাজকর্ম ছাড়িয়া যে যার দেশেঘাটে। লোকজনের অভাবে জমিদারবাড়ি খাঁ খাঁ করিতেছে। এমন কি সরকার মশাই পর্যন্ত ছুটি লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

সব শুনিয়া তাকে প্রশ্ন করিলাম, সবাই প্রাণভয়ে পালালো, তুমিও গেলে না কেন?

হুজুর, আমি মরতে ভয় পাই না, বরং আমি মরতেই চাই, বলিয়া কাঁদো কাঁদো সুরে সুরে কহিল, কোথায় যাবো, আমার কে আছে? দশ সাল পহলে এই পিলেগমে আমার দু'টো জোয়ান ব্যাটা আর বৌ মুল্লুকমে মরে গেছে—আমি তাই মরতে চাই, যদি পেলেগ হয় তো বেঁচে যাই।

বনোয়ারীর কথা শুনিয়া দুঃখ হইল, আবার একই সঙ্গে হাসিও পাইল। অর্থাৎ আমাকে সবাই খরচের খাতায় লিখিয়া দিয়াছে, প্লেগ যখন হইয়াছে মৃত্যু সুনিশ্চিত! ওই অশিক্ষিত চাকর-বাকরদের কোন দোষ নাই, তাহারা জানে না যে শুরুতে ঠিকমত চিকিৎসা হইলে এ রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করা যায়।

একটু পরে শাঁখঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। বনোয়ারীকে প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, অন্দরমহল ছাড়িয়া সবাই পালাইয়া গিয়াছে, কিন্তু মালেকান অর্থাৎ গিন্নীমা গৃহদেবতাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে রাজী হন নাই, যদি মরিতে হয় তো এইখানে ঠাকুরের সামনে মরিবেন—

তেমনি বৌরাণী, যিনি বংশের কুললক্ষ্মী, তিনিও গৃহত্যাগ করিয়া শাশুড়ীকে একা ফেলিয়া এক পাও কোথাও নড়িবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ডাক্তারবাবু তাঁদের ইনজেক্‌শন ও ওষুধপত্র কি সব খাওয়াইয়া দিয়াছেন।

সত্যি বলিতে কি, ইহা শুনিয়া মনে যেন বেশ বল পাইলাম। বাহিরমহলে একা বনোয়ারী আর একটা ঘরে একলা আমি রোগশয্যায় মৃত্যুপথযাত্রী ভাবিতে কেমন যেন নার্ভাস বোধ করিতেছিলাম।

সেদিন রাত্রে একবাটি গরম দুধসাবু লইয়া আমার মুখে যখন বনোয়ারী ধরিল, আমি তখন বলিলাম, খুব গরম, তুমি কি এখনি তৈরি করলে নাকি?

না হুজুর, রাধা তৈরি করে এইমাত্র বাগানের ভেতরদিকের খিড়কীর দরজার কাছে রেখে চলে গিয়েছে, আমি সেখান থেকে নিয়ে এলুম। পাছে ছোঁয়া লাগে বা আমার হাওয়া তার গায়ে লাগে, এই ভয়ে সে এদিক আসে না, আমি আপনার যেমন সেবা করি, রাধা তেমনি অন্দরমহলের রান্না থেকে সব কাজ করে। বিধবা, ছোটবেলা থেকে মালেকানের কাছে মানুষ, তাই সে তাঁকে ছেড়ে যায়নি।

রাধা এদিকে না আসুক, সবচেয়ে আশ্চর্য হইয়া যেতাম তাহার সময়-জ্ঞান দেখিয়া। ঠিক খাবার সময়ে যখন যে পথ্যটি প্রয়োজন বনোয়ারী আনিয়া হাজির করিত। এমনিভাবে দুদিন কাটিবার পর তৃতীয়দিন রাত্রে হঠাৎ প্রবল জ্বর ও মাথার যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙিয়া গেল। বিছানায় ছটফট করিয়া কাতরাইতেছি—এমন সময় বনোয়ারী হঠাৎ একটা ওষুধের বড়ি আনিয়া বলিল, হুজুর, এটা জলদি খেয়ে নিন, এমনি মাথার ব্যথা কমে যাবে।

হাতঘড়িটায় দেখিলাম রাত তখন পৌনে দুইটা। বনোয়ারীকে বলিলাম, কোথায় ছিল এ ওষুধ?

হুজুর, বহুরাণী ভেজ্ দিয়া। ইস্‌মে শিরকা দরদ তুরন্ত ছুট্ যায়েগা।

ওষুধ গালে ফেলিয়া বনোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু বহুরাণী তো থাকেন ভেতরে, কি করে তিনি জানলেন এখানে আমার এই যন্ত্রণার কথা!

বনোয়ারী বলিল, বহুরাণীর মহলটা বাগানের পিছনদিকে, তাঁর দোতলার ঘর থেকে নাকি এ ঘরের সব কিছু দেখা যায়। আর নিস্তব্ধ রাত বলে কথা-বার্তাও শোনা যায়।

আশ্চর্য। রাত পৌনে দুটার সময় বৌরাণী ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া আমার জন্য ওষুধ পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্ধেক মাথার যন্ত্রণা তখনি যেন মনে হইল কমিয়া গিয়াছে।

পরের দিন আবার মাঝরাত্রে জ্বর ও মাথার যন্ত্রণায় আচ্ছন্নের মত পড়িয়াছিলাম। ঠিক স্বপ্ন নহে, আবার ঘুমও নহে, জাগিয়াই যেন স্বপ্নের মতই দেবুদার রোগশয্যায় সেবাপরায়ণা সেই চামেলী বৌকে দেখিতেছিলাম।

ওই অবস্থায় জলতেষ্টায় মুখ শুকাইয়া গেলে 'জল জল' বলিয়া কখন যে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম জানি না।

এই নিন্ জল!

সহসা কানের কাছে মৃদু নারীকণ্ঠ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। চামেলীবৌ তুমি! বলিয়া আগ্রহে হাত বাড়াইলে কোমল হাতের সঙ্গে চুড়ির স্পর্শ লাগিতেই ঘুমটা নিমেষে ছুটিয়া গেল। ফুলের গন্ধের মত যুবতীনারীদেহের এক বিশেষ সৌরভ যেন নাকে মুখে মাখামাখি হইয়া গেল।

তখন সে কণ্ঠস্বর আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিল, চামেলীবৌ নেহি, ম্যয় বহুরাণী হুঁ!

এ কি! আপনি এখানে? না—না, এ কি সত্যি? স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া গেল।

হ্যাঁ সত্যি। আপনি জল জল বলে তেষ্টায় চীৎকার করছিলেন। বনোয়ারীর কোন পাত্তা নেই দেখে তখন আমি চলে এসেছি চুপি চুপি। স্থির থাকতে পারিনি। শিগ্‌গির জলটা খেয়ে নিন।

এই বলিয়া আমার মুখে যেমন গ্লাসটা ধরিলেন, চোয়ালে ব্যথা, ভাল করিয়া মুখ ফাঁক করিতে না পারায় একঝলক জল গালের উপর গড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বহুরাণী তাঁর শাড়ীর আঁচল দিয়া মুখটা মুছাইয়া দী

হাতে আমার চোয়ালটা তুলিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে জল খাওয়াইয়া, যেমন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়াছিলেন হাতের ছোট্ট টর্চ লইয়া তেমনিভাবে বাহির হইয়া গেলেন।

মিনিট কয়েক পরেই আমার কানে আসিল, 'বহুরাণী, কাঁহা গিয়া থা? এতনা রাতমে?'

নারীকণ্ঠ। নিশ্চয় এ সেই বিধবা রাধার গলা! সে ছাড়া আর কোন মেয়ে ত বাড়ীতে নেই!

॥ বত্রিশ ॥

পরদিন অনেক বেলায় ঘুম ভাঙিতে মনে হইল যেন বাহিরের দিকে কয়েকজন লোকের কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। এ কদিন এদিকটায় কোন মানুষজনের সাড়াশব্দ ছিল না, প্লেগের আতঙ্কে সবাই সরিয়া পড়িয়াছিল। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য বনোয়ারীর নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র সে বাগানের দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া দু'হাত কচ্‌লাইয়া কহিল, হুজুর, কসুর মাপ কীজীয়ে।

অর্থাৎ অন্যদিন ডাকিতে হইত না। চোখ খুলিতেই দেখিতাম বনোয়ারী হাজির এবং তখনি আমায় ধরিয়া লইয়া গোসলখানায় পোঁছাইয়া দিত। আজ তাহাকে ঘরে না দেখিয়া যে ডাকিতে হইয়াছে, হুজুরের কাছে তার জন্য যেন সে মহা অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে! অন্য চাকরবাকরের চেয়ে এই লোকটা যেন বড্ড বেশি বিনয়ী! বোধ হয় বুড়ো হইয়াছে বলিয়া ইহা দীর্ঘদিনের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। তাই তাড়াতাড়ি আমার বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাইরে কারা এত কথা কইছিল বনোয়ারী?

হুজুর, ওরা পালকীবেয়ারা।

পালকীবেয়ারা কেন এখন?

হুজুর, বহুরাণী চাচীকা ঘর যা রহা।

কেন? হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বনোয়ারী তেমনি বিনীত ভঙ্গিতে বলিল, হাম নোকর হ্যায়, কেইসে মালুম হোগা হুজুর! উনকী চাচা ব্রজলালজী তো বহুত রহিস্ আদমী, বহুত বড়া গোলদার, হিঁয়াসে কমসে কম্ আট ন' ক্রোশ হোগা!

ভাবিলাম, ও বাইরের চাকর, অন্দরমহলের খবর কি করে জানবে! ঠিকই বলেছে। তবে বড়লোক কাকার বাড়িতে হয়ত কোন ক্রিয়াকর্ম আছে, তাই পালকীবেয়ারা পাঠিয়েছেন, ভাইঝিকে নিয়ে যাবার জন্যে। আবার দু'চারদিন পরেই ফিরে আসবেন।

কিন্তু পরদিন আমার বিছানায় মশারী ফেলিয়া, ওষুধটা খাওয়াইতে গিয়া সহসা বনোয়ারী কাঁদিয়া ফেলিল।

কি হয়েছে? তুমি কাঁদছো কেন বনোয়ারী?

নীরবে চোখের জল মুছিতে মুছিতে সে বলিল, হুজুর হামারা কেয়া কসুর হুয়া, বাতাইয়ে! রাধামাই হাম্‌কো ঝুট, বেইমান, বদমাস শয়তান কাঁহাকা বলকে বহুত্ গালি দিয়া।

কেন, তুমি কি করেছো তার?

এবার আস্তে আস্তে ধরাগলায় সে বলিল, হুজুর হাম্‌কো রাধামাই বোলা, যব্ দুস্‌রা কিসিকো কহেগা, ত তোমারা জান লে লেগাঁ, খেয়াল রাখো। বিশেষ করে শাসিয়ে দিয়েছে। আপনার কানে যেন কিছুতেই একথা না যায়।

তাহলে আমায় বলো না! আমি শুনতে চাই না।

এবার মুখে কাপড় চাপা দিয়া সে ডুকরাইয়া উঠিল।

হুজুর, আপ্‌কো বদ্‌নামী কিয়া—আব্‌কো নেহি কহেনেসে মেরা পাপ হোগা!

এবার কৌতূহল জাগিল। আমার নামে?

হাঁ হুজুর, মেরা কসুর মাপ কীজীয়ে। রাধামাই আজ ভোরে যখন আমি বাগানে জল ঢালছিলুম, আমার দরজার কাছে হাতছানি দিয়ে ডেকে বললে, তুমি এ বাড়ির পুরনো নকর, বাবুর নিমক খেয়ে বুড়ো হয়েছো, রামজী কো নাম লেকে কহো, হাম্ যো পুছেগা সাচ্ কহেগা!

রাধামাই, হাম তো বুড়া আদমী, কাহে ঝুট্ কহেগা!

ঠিক হ্যায়। তব কহো, কাল রাতমে বহুরাণী ম্যানেজার সাব্‌কা ঘরমে গিয়া থা তুম্ দেখা, সাচ্ কহো!

এই কথা মুখে বলিয়াই বনোয়ারী খপ্ করিয়া আমার সামনে দু'কানে হাত চাপিয়া, জীব কাটিয়া কহিল, হুজুর, আমি রাধামাইকে বললুম, রাম্ রাম্! ঝুট! সব ঝুট! বিলকুল ঝুট! বললুম, রাধামাই, ওকথা শুনলে পাপ হবে! তুমি মুখে আনলে কি করে? এর চেয়ে বড় মিথ্যা দুনিয়ায় হতে পারে না। বহুরাণী দেবী।

তখন আমায় ধমক দিয়ে রাধামাই বললে, তুমি সব জানো শয়তান, বহুরাণীর ভয়ে বলছো না। সাচ্ কহো, নেহি তো বহুত্ খারাপ হোগা! খেয়াল রাখো!

দুহাত জুড়ে রাধামাইয়ের কাছে বললুম, রামজীর নামে আমি শপথ করছি, এ হতে পারে না কখনো, যার কাছে তুমি শুনেছো সে ঝুট্ বলেছে।

তখন রাগে কাঁপতে কাঁপতে ফিস্ ফিস্ করে ঘা-লাগা কেউটে সাপের মত বললে, হাম্ খুদ্ আপনা আঁখোমে দেখা, আমি নিজের চোখে দেখেছি! বদমাস, বেইমান, নিমকহারাম কাঁহাকা—বলে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

এই পর্যন্ত বলিয়া, আবার চোখ মুছিয়া কহিল, সারাদিন হুজুর, কোন

কাজে মন দিতে পারিনি—রাধামাই ভয়ানক শয়তানী। কত লোককে ও যে ফাঁসিয়েছে, তার হিসেব নেই।

তারপর নীচু সুরে বলিল, হুজুর, ও এ বাড়ির গুপ্তচর। ওকে খাস্ মাতাজী খুব পেয়ার করেন। ও যা বলে, উনি তাই বিশ্বাস করেন। এত বড় মিথ্যাটাকে বলে, 'আমি নিজের চোখে দেখেছি, তুমি বহুরাণী আর ম্যানেজার সাহেবের ভয়ে বলছো না, জানি সব!'

এর উত্তরে বনোয়ারীকে কি করিয়া বলিব যে রাধা যা বলিয়াছে সত্য, তুমিই তখন ভাঙ্ খাইয়া ঘুমাইয়াছিলে! পাছে বহুরাণীর গায়ে কলঙ্ক লাগে, তাই সত্য গোপন করিয়া বলিলাম, তুমি চুপ করো বনোয়ারী।

না হুজুর, এর একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। এতবড় অপবাদ আপনার নামে দেবে, আর আপনি চুপ করে থাকবেন? আমার চাকরি খেয়ে দেয় তো দিক্, বহুরাণী দেবীর তুল্য, তাঁর নামে এ বদনাম কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। আপনি ম্যানেজার, আপনার কথা রাধামাই নিশ্চয় শুনবেন। আপনি বলুন, এ ঝুট্ হ্যায়! কেন বনোয়ারীকে অপরাধী করছো মিথ্যা!

আচ্ছা তুমি চুপ্ করো। আমি ভালো হয়ে উঠে এর একটা ব্যবস্থা করবো, যখন তুমি বলছো। এই বলিয়া তাহার কথা এড়াইয়া গেলাম।

হুজুর, এতদিন ধরে চাকরি করছি, আমায় বেইমান কেউ বলতে পারেনি কখনো। বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ব্যবস্থা অবশ্য আমাকে করিতে হইল না, তাঁর আগেই আমার ব্যবস্থা স্বয়ং মাতাজীই করিলেন।

অর্থাৎ মাস দেড়েক পরে আমি সুস্থ হইয়া উঠিলে তিনি আমায় জবাব দিলেন, কোনো কারণ, কোন কৈফিয়ৎ না দিয়া। শুধু বিদায়ী বকশিশ হিসাবে তিন মাসের বেতন দিয়াছিলেন।

তার আগেই বনোয়ারী বে-পাত্তা। কেহ জানে না সে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। জমিদারবাড়ির অন্তঃপুরের কোন কেচ্ছা যাহাতে অন্য কারো কানে না যায়, তাই অন্য চাকরবাকর, দাসদাসীরা ফিরিয়া আসিবার আগেই পৃথিবী হইতে বোধহয় তাকে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাই নাকি জমিদারবাড়ির রীতি!

গিন্নীমার দুর্দান্ত প্রতাপের কথা আগেই শুনিয়াছিলাম। কর্তার জীবিতকালে তিনিও নাকি তাঁকে ভয় করে চলিতেন। তাঁর ইচ্ছার উপর কথা কহিবার সাহস পর্যন্ত কারো ছিল না।

তাই কোন আপীল না করিয়া ফাঁসির আসামীর মত শুধু সে দণ্ডাদেশ মাথায় লইয়া সোজা চলিয়া আসিলাম কলিকাতায়।

আবার বেকার জীবন শুরু হইল।

॥ তেত্রিশ ॥

এত বড় চাকরিটা হইতে যে ওইভাবে বিনা বিচারে কুকুর-বিড়ালের মত বিতাড়িত হইব ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। দীর্ঘদিন ধরিয়া সততা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করিয়া যে জমিদারীর আয় প্রায় তিনগুণ বাড়াইয়া দিয়াছিলাম, তাহার জন্যে শেষে এই পুরস্কার!

কিছুদিন আগে যিনি আমার প্রাণের আশঙ্কায়, আমাকে ডাকিয়া নিজের বাড়িতে আশ্রয় কেবল দেন নাই, গৃহদেবতার মন্দিরে বসিয়া জপের মালা হাতে বলিয়াছিলেন, তুমি আমার সন্তানের অধিক, এই কি সেই মাতৃত্বের পরিচয়।

একেবারে মুখদর্শন পর্যন্ত করিলেন না! যেন কি অমার্জনীয় আমার অপরাধ, এমন ঘৃণ্য জঘন্য, কুকাজ আমি করিয়াছি!

এর চেয়ে যদি আমায় ডাকিয়া অপমান করিতেন, ছি-ছি করিতেন, গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিতেন—তাতেও ছিল সান্ত্বনা! অন্ততঃ কিছু সত্য যদি মুখ দিয়া বলিতে পারিতাম তাঁহাকে, তাহা হইলেও আত্মগ্লানি হইতে বাঁচিতাম। আমার বিবেকের কাছে আমি পরিষ্কার থাকিতাম। জানি আমার কথাটা হয়ত তিনি বিশ্বাস করিতেন না, কারণ আমি পুরুষ ও যুবক, আর একদিকে জমিদারবাড়ির কুলবধূ, নারী ও সুন্দরী যুবতী!

আমি যতই রুগ্ন মুমূর্ষু হই না কেন, আমার মত পরপুরুষের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য, আমার বুকফাটা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে নিজের প্রাণের ভয় তুচ্ছ করিয়া, লজ্জা মান ইজ্জত সব কিছু ভুলিয়া গভীর রাত্রে একা চুপি চুপি ওইভাবে কেবলমাত্র তৃষ্ণার্তকে বাঁচাইবার জন্য বহুরাণী আসিতে পারেন, ইহা তাঁর ধারণার বাহিরে। তাঁর মত প্রবীণা বিচক্ষণা বুদ্ধিমতী মহিলা, যিনি অলক্ষ্যে থাকিয়া জমিদারীর সবকিছু দীর্ঘদিন ধরিয়া পরিচালনা করিয়াছেন, রাধার মত এক দাসী, কড়ে রাড়ী, বাল্যবিধবা ব্রাহ্মণকন্যার কথায় বিশ্বাস করিয়া, কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োগ ছাড়াই আমায় যেভাবে সেদিন দূর করিয়া দিয়াছিলেন, সে অপমানের মর্মান্তিক জ্বালা বহুদিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই।

একবার মনে হইল, রাজেন্দ্রকুমার, যে একদিন আমায় ওই মর্যাদাপূর্ণ পদে অভিষিক্ত করিয়া আমার মত নগণ্য ব্যক্তিকে সম্মানিত করিয়াছিল, তাহাকে সব কথা খুলিয়া লিখি। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলাম, আমার এ চিঠি তাঁর কাছে পৌঁছাইবার আগেই নিশ্চয় মাতাজী তাহাকে সব কিছু জানাইয়াছেন, নহিলে একেবারে এক কথায় ওইভাবে আমায় তাড়াইতে সাহস করিতেন না।

নিশ্চয় ছেলের সম্মতি আছে। মিছিমিছি তাই যাচিয়া অপমানিত হওয়ার

কি প্রয়োজন! মায়ের চেয়ে আম তো বড় নই! তাছাড়া তাঁর উপর কথা বলিবার সাহসও রাজেন্দ্রকুমারের নাই।

কিন্তু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া মনে হইল, না. যা সত্য তাহাকে জানাইয়া আমি লিখিব। নচেৎ সেই করুণাময়ী লক্ষ্মীস্বরূপিনী বহূরাণীর প্রতি আমার অবিচার করা হইবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যাহাতে আমায় উপলক্ষ করিয়া মিথ্যা অবিশ্বাস ও মনোমালিন্য ঘটিয়া না যায়, ইহা আমার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তাই দীর্ঘ পত্র লিখিয়া, আমার ঠিকানা না দিয়া একটি চিঠি দিয়াছিলাম যাহাতে পরে আমায় কিছু লিখিতে না পারে। ভালই হোক, মন্দই হোক।

সে আমায় অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করিত, ভালবাসিয়া মাস্টার সাহেব বলিত। চুপ করিয়া থাকিলে হয়ত মনে হইতে পারে, আমি সত্যই অপরাধী।

তাই যা সত্য, কখনো তা চাপা থাকে না, একদিন তা প্রকাশ পাইবেই পাইবে—এ বিশ্বাস আমার ছিল বলিয়া ওই চিঠি দিয়াছিলাম!

সত্য বলিতে কি, রাজেন্দ্রকুমারকে ওই পত্র দিবার পর আমার মনটা যেন অনেকখানি হাল্‌কা হইয়া গিয়াছিল। মনে হইল মাথার উপর হইতে যেন কলঙ্কের বোঝা নামিয়া গেল।

এইভাবে বিনা অপরাধে একটি নারীকে উপলক্ষ করিয়া আমার জীবনের এক বিশেষ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হইয়া যায়।

॥ চৌত্রিশ ॥

কলিকাতায় ফিরিয়া আমি মির্জাপুর স্ট্রীটে ফ্রেন্ডস্ বোর্ডিংয়ে উঠিয়াছিলাম। ওই অঞ্চলে আরো আরো অনেক মেস, বোর্ডিং, হোটেল ছিল কিন্তু ওই বোর্ডিংটি আমার সবচেয়ে ভাল লাগিল। প্রথমত ঘরগুলি বেশ বড়, আলো হাওয়া বাতাস প্রচুর। তাছাড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক বোর্ডার। এইজন্য অন্যান্য বোর্ডিংয়ের চেয়ে প্রায় ডবল চার্জ হওয়া সত্ত্বেও কখনো সীট খালি থাকে না। রুচিসম্পন্ন, শিক্ষিত ও ভাল চাকুরেরাই সাধারণত থাকেন। পয়সা দিলেও যাকে-তাকে রাখা হয় না।

মালিক উত্তর কলিকাতার এক বনেদী পরিবারের সন্তান। টাকার লোভের চেয়ে যাঁরা তাঁর আশ্রয়ে থাকেন, তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্যের যাতে কোন ত্রুটি না হয়, সেদিকে তাঁর কড়া নজর। কোন ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করেন না। তাই বোর্ডার ভর্তি করিবার আগে কোথায় দেশ, কি চাকরি করেন ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া লন। পূর্ববঙ্গ শুনিলে, বিনয়ের সঙ্গে সীট্ খালি নাই বলিয়া তখনি বিদায় করেন।

একদিন আমার সামনে এইরূপ ঘটনা ঘটিল। ভদ্রলোক চলিয়া গেলে পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিন নম্বর ঘরে তো একটা সীট কাল খালি হইয়াছে।

তিনি গম্ভীর মুখে বলিলেন, জানি। কিন্তু কে মশাই খাওয়াদাওয়া নিয়ে নিত্য অভিযোগ, ঠাকুরের সঙ্গে চেঁচামেচি ঝগড়া সহ্য করে! তরকারিতে একটুকু মিষ্টির স্বাদ পেলেই চটে লাল! এমন কি মাংস কালিয়া পোলাও দূরে থাক, ডাল্‌না মুগের ডাল চাট্‌নীও ওঁদের মুখের স্বাদমত কাঁচালঙ্কা, তেলঝালমসলায় গরগরে না হলেই মুখ ঠেকিয়ে—ক্যাবল মিঠা, এ কি খাওন্‌ যায়।—বলে তরকারীর বাটিতে হাত না দিয়েই উঠে যান! এদিকে আবার তেমনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রান্না, সবকিছুতে একটু মিষ্টি দেওয়া নিয়ম, নাহলে ঠিক স্বাদ আসে না, মুখে রোচে না! এখন শ্যাম রাখি না কুল রাখি বলুন? অথচ সকলেই পয়সা দেন। তাই আমি নিয়ম করেছি, এদেশীয় মনুষ ছাড়া আর কাউকে রাখবো না। আমার এখানে পশ্চিমবঙ্গের বোর্ডার বেশী। তারা এক একজন পাঁচ বছর ছ' বছর রয়েছেন। কোন রকম তেল-ঝাল-লঙ্কাবাটা দিয়ে গরগরে রান্না হলে কেউই পছন্দ করেন না। তাছাড়া আপনি তো খাচ্ছেন!

বলিলাম, হ্যাঁ, ভালই। ডাক্তারবাবু আমায় কম তেল-ঝাল দেওয়া রান্নাই খেতে বলেছেন। কোন উগ্র মসলাদার খাদ্য নিষেধ।

তিনি বলিলেন, কোন্‌ ডাক্তারকে দেখাচ্ছেন!

বলিলাম, অমল রায়চৌধুরীকে।

খুব ভাল করেছেন, একেবারে 'এ-ক্লাস' ডাক্তার। এখন খুব নামডাক ওঁর।

বলিলাম, তা জানি। তাই তো মশাই একটা দিনও নষ্ট করিনি। আপনার এখানে এসেই সেইদিন বিকেলে, তাঁর কাছে গিয়েছিলুম।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি অসুখটা সারিলেও তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাই। ভিতরে ভিতরে খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। ডাক্তারবাবু অসুখের সব বিবরণ শুনিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বুক পিঠ ও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া একসঙ্গে চারটি ওষুধের নাম লিখিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, খুব সাবধানে থাকবেন, ঠান্ডা না লাগে; মাথার কাছে জানলা খুলে ঘুমোবেন না। এক হপ্তা পরে এসে আবার দেখিয়ে যাবেন। বেশ কিছুদিন লাগবে পুরোপুরি সারতে। সব লিখে দিয়েছি, ঠিকমত সব খাবেন।

ডাক্তারের পরামর্শে এইভাবে একরকম বেকারজীবন শুরু হইল। খবরের কাগজ, ইংরেজী বাংলা বই পড়িয়া সারাদিন কাটাই ও সকাল-সন্ধ্যেয় পার্কে পার্কে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াই! ইহারই মধ্যে রবিবারের সংবাদপত্রের কর্ম-খালি বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত পাঠাই। অধিকাংশরই জবাব পাই না। যা দু'তিনটি অফিসে সাক্ষাতের জন্য ডাকিয়াছিল, সেসব খুব নীচুমানের কাজ এবং বেতনও সেইরূপ বলিয়া করি নাই।

এইভাবে হতাশ হইয়া আর কোন মার্চেন্ট অফিসে দরখাস্ত করিব না স্থির করিয়াছিলাম।

কিন্তু বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ চোখে পড়িল একটা বিজ্ঞাপনঃ বার্মা

সেল' অফিসে একজন কেরানী চায়। রবিবার স্টেটসম্যান পত্রিকায় দেখিয়াই সোমবার একটা দরখাস্ত জমা দিয়া যখন নীচে নামিতেছি, হঠাৎ চিন্ময়ের সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা। সে চমকিয়া উঠিল, আরে আলোক তুই, এখানে যে! কি ব্যাপার? কোন বিশেষ কাজ থাকলে বল, হেড ক্লার্ক গুপ্তবাবুর সঙ্গে আমার খুব খাতির আছে। আমাদের অফিসের কাজে প্রায়ই তাঁর কাছে আসতে হয়!

আজকাল ভিতরে কোন লোক জানাশুনো না থাকিলে চাকরি জোটা খুবই দুষ্কর ব্যাপার। কিন্তু আমার সুপারিশ করার মত কোন লোক না থাকা সত্ত্বেও আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দেখিয়া এইভাবে চাকরির জন্য দরখাস্ত করিতাম, যদিও সব জায়গা থেকে রিগ্রেট লেটার আসিত।

তাই বড়বাবু গুপ্তসাহেবের চিন্ময়ের সঙ্গে পরিচয় আছে শুনিয়া তাকে ধরিয়া বসিলাম, কি কাজে আসিয়াছি গোপন না করিয়া তাহাকে অসঙ্কোচে সব বলিলাম।

চিন্ময় বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কেন, তোর জমিদারীর বড় চাকরির কি হলো? চাকরি গেছে নাকি?

একটু ইতস্তত করিয়া কহিলাম, হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে সে বলিয়া উঠিল, আমি জানতুম আগেই, ও চাকরি তুই বেশীদিন করতে পারবি না। 'ও বড়র পিরীত বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ!' বলিয়া একটি ঢোক গিলিয়া বলিল, তা হঠাৎ চাকরি গেল কেন, জমিদারীর বেহিসেবী কাঁচা পয়সার লোভ সামলানো কঠিন!...তেমন কিছু ক্যাশ তছরূপের ব্যাপার নাকি? ধরা পড়েছিলি?

না, না—ওসব কিছু নয়।

তাহলে?

তখন আসল কথাটা চাপিয়া গেলাম। বলিতে পারিলাম না, যে খোদ বহুরাণীর সঙ্গে মিথ্যা অপবাদে চাকরি হইতে একরকম বিতাড়িত হইয়াছি!

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, বুঝেছি। তোর দোষ কি, ওই রকম কাঁচা পয়সা পেলে সত্যি বলতে কি আমি তো এতদিনে বেশ গুছিয়ে নিতুম। জানি না, তুই কত কি করেছিস। তোর মনে তো ভাল ছেলে বলে অহঙ্কার আছে। মনে মনে যেন সে বেশ খুশি হইয়াছে বলিয়া মনে হইল, অর্থাৎ এখন আমার কেবল জমিদারীর সেই দম্ভ চূর্ণ হয় নাই, বেকার!

আচ্ছা তুই এখন কোথায় আছিস, আমি তোর সঙ্গে কাল সন্ধ্যায় গিয়ে দেখা করবো। তোর জন্যে গুপ্তবাবুকে ধরবো—দেখি কি করতে পারি!

পরদিন যথাসময়ে সে আসিয়া যা বলিল, তাহাতে আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম।

ক্যাশিয়ারবাবুর এক মামাতো ভাইয়ের জন্যে আগেই তিনি কথা দিয়ে

দিয়েছেন তাকে।

তারপরে আমার ঘরটার চতুর্দিকে একবার চোখ বুলাইয়া কহিল, বাঃ বড় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন বোর্ডিংটা তো! খাওয়া-দাওয়া কেমন?

বলিলাম, খুবই ভাল। তাই রেটটাও সেই অনুপাতে খুবই বেশী, এ অঞ্চলের সব মেস বোর্ডিংয়ের চেয়ে।

যাক্, তাহলে আছিস ভাল, বল? তা তুই এখানে কতদিন এসেছিস?

প্রায় ছ'মাস হয়ে গেল।

এ্যাঁ, ছ'মাস হলো এসেছিস, তা আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে পারোনি। ছি ছি, খুব অন্যায় করেছিস্। একটা লোক আমাদের অফিসে নেওয়া হলো এই মাস তিন আগে।

তখন তাহাকে আগাগোড়া আমার অসুখের কথা ও ডাক্তার যে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকিতে বলিয়াছেন তাহা বলিলাম। এবার একটু চিন্তা করিয়া সে বলিল, আচ্ছা, তুই কিছুদিন অপেক্ষা কর, আমাদের বিলিং সেকশনের মজুমদার বদলি হয়ে যাচ্ছেন হেড অফিসে। দেখি এখন থেকে সাহেবকে বলে রাখি। সাহেব আমার উপরে কথা বলেন না! অবশ্য এ সপ্তাহের শেষেই বোম্বে যাচ্ছি আমি, ফিরতে দু'তিন হপ্তা দেরি হবে—বলিয়া বিদায় লইল।

কলিকাতায় কাহারো সহিত দেখা করিব না, সংকল্প করিয়াছিলাম। কোন্ মুখ লইয়া তাহাদের কাছে যাইব! বেকার! চামেলী বৌয়ের সঙ্গে এখানে আসিলে সাক্ষাৎ করিব নিশ্চয়, কথা দিয়াছিলাম। কিন্তু পাছে দেবুদা ম্যানেজারীর কথা তুলিয়া বসে, সেই লজ্জায় ও-পথ মাড়াই নাই। সবচেয়ে বড় কথা, চাকরির জন্য চিন্ময়ের কাছে কিছুতেই যাইব না মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। একদিন যাচিয়া সে চাকরি দিতে চাহিয়াছিল, তাহা স্বেচ্ছায় কেবল প্রত্যাখ্যান করি নাই, ওখানের চাকরি আমার কাছে স্বর্গতুল্য বলিয়া যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলাম তাহা নিশ্চয় চিন্ময় ভোলে নাই। ওর মত স্পষ্ট-ভাষী যে কিছুতেই তাহা নিঃশব্দে হজম করিবে না, জানিতাম। কোন চাকরি যদি না জোটে, অন্ততঃ ওর দ্বারস্থ হইব না মনে মনে তাহাই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর যে এইভাবে সে অহঙ্কার চূর্ণ করিবেন, স্বপ্নেও ভাবি নাই। বরাবর ওর নিজেকে বড় করিয়া জাহির করাই স্বভাব, ছেলে-বেলা হইতেই, তাই ওর নিকট হইতে দূরে থাকিতাম। তবু ওর মধ্যে যে একটা মহৎ হৃদয়, পরোপকারী, দরদী ও সহানুভূতিশীল মন ছিল, ইহা সত্য হইলেও অনেকেই তাহাকে ভুল বুঝিত। কারুর এতটুকু উপকার করিলে, সেটা দশজনের কাছে প্রচার না করিয়া থাকিতে পারিত না। বিশেষত তার চেয়ে বেশী শিক্ষিত কোন লোকের কিছু করিতে পারিলে যতটা আত্মতৃপ্তি লাভ করিত, তার চেয়ে বেশী যেন প্রতিহিংসার আনন্দ বোধ করিত মনের গভীরে এবং তা উপভোগ করিতে লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

তাই চিন্ময় যখন বলিয়াছে নিজের মুখে, মনে মনে ভরসা ছিল একটা কিছু সে করিবেই। বিশেষ করিয়া আমার জন্য! হয়ত বেশী দিন এইভাবে বেকার থাকিতে হইবে না।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

কিন্তু চাকরির ভরসা দিয়া সেই যে চিন্ময় গেল আর তাহার দেখা নাই। ক্রমশ এক মাস হইতে দু' মাস যখন চুপচাপ, তখন একদিন সকালে তাহার বাড়ি গিয়া হাজির হইলাম। কি জানি, যদি কোন অসুখ-বিসুখ করিয়া থাকে!

চাকর দরজা খুলিতেই তার কাছে শুনিলাম, সাহেব বাড়ি নাই, আপিসের কাজে বাইরে গিয়েছেন। তখন মাসীমার সঙ্গে দেখা করিয়া জানিলাম, বোম্বে গিয়াছিল, সেখান হইতে ফিরিয়া পরের হপ্তায় ফের চলিয়া গিয়াছে। কবে আসিবে তা জানা নাই।

এবার ওর স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে মাসীমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, সেই যে বাপের বাড়ি চলে গেছে আর আসে নি। ছেলেরও সেই এক গোঁ, সেধে তাকে নিয়ে আসতে যাবে না। সে যেমন নিজে স্বেচ্ছায় গেছে তেমনি নিজে আসবে! আগে কেন বৌয়ের কাছে মাথা নীচু করতে যাবে। এমন কি বৌয়ের নাম শুনলে যেন জ্বলে ওঠে।

এই বলিয়া মাসীমা নীরব হইয়া গেলেন। তারপর আমার সব সংবাদ লইয়া, শেষে বিদায় লইবার সময় প্রণাম করিতে গেলে বার বার নিষেধ করিয়া দিলেন, দেখো বাবা, তোমাকে যে আমি বৌমার কথা বলেছি, ঘুণাক্ষরেও ও যেন জানতে না পারে। বাইরের কেউ জানে না এ খবর।

এমনি যখন বেকার দিন কাটাইতেছি, সহসা একদিন সকালে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া চিন্ময় বলিল, তুই নিশ্চয় ভেবেছিল আমি তোকে গুল্ মেরে ডুব দিয়েছি!

না—না, তা কেন ভাববো! তুই এত বড় চাকরি করিস, তোর ওপর কত দায়িত্ব!

ঠিক বলেছিস। উইলসন্ সাহেব আমায় ভারী ভালবাসেন। বলেন, ঘোষ, তোমাকে কাজ দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকি।

এই বলিয়া সগর্বে একবার গলায় হাত দিয়া 'টাই'টা নাড়িয়া কহিল, শিগগির একটা দরখাস্ত আমায় লিখে দে। আমি এখনি সাহেবের হাতে গিয়ে দেবো। তাঁকে আমার বলা আছে। আরে ভাই, মজুমদারের তো চলে যাবার কথা ছিল দু'মাস আগে—কিন্তু সব কাজ শেষ হয় নি বলে বেশ কিছুটা সময় নিলে!

বলিতে বলিতে পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া আমায় একটা দিয়া, নিজে একটা ধরাইল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, আসলে কি

জানিস, ওখানে তো রস বেশী। যা মাইনে—প্রায় তার কাছাকাছি 'উপরি' আয় আছে। বিল পাস করলেই পার্টির কাছ থেকে একটা দস্তুরী পায়।...ওঃ, অনেক বলে-কয়ে তোর জন্যে ওই পোস্টটার ব্যবস্থা করেছি। নইলে একেবারে নতুন লোককে সাধারণত সাহেব ওই কাজ দেন না। বলেছি খুব বড় স্টেটের একজন ম্যানেজার ছিল। নেহাত আমাকে সাহেব খুবই ভালবাসে এবং তুই আমার বন্ধু বলাতে আর আপত্তি করে নি। বলেছে, এখুনি তাকে দরখাস্ত করতে বলো!

কথাটা মিথ্যা বলে নাই চিন্ময়। সত্যি সত্যি ওই বিলিং সেক্‌শনেই আমার চাকরি হইয়া গেল এবং আরো যা বলিয়াছিল, অর্থাৎ উপরি পাওনার কথা, সেখানেও কোন ভুল ছিল না।

বড় বড় পার্টি যাহারা কোম্পানীকে মাল সরবরাহ করে, তাহাদের পাওনা বিল যত তাড়াতাড়ি আমি পাস করিয়া দিই, টাকাটা সেইমত দ্রুত পাইবে বলিয়া বিল পিছু একটা দস্তুরী তাহারা দিত। কোন কোন মাসে বেতনের সমান হইয়া যাইত সেই উপরি পাওনাগুলিতে।

কিন্তু আমার শরীরটা তখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই, তাই ডাক্তার বেশী পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিলেও এই সব হিসাবনিকাশের কাজে রীতিমত মাথা ঘামাইতে হইত। কোন ভুলভ্রান্তি হইলে চাকরি যাইবার সম্ভাবনা। কাজেই বেশী সতর্ক হইতে গিয়া মাঝে মাঝে অসুস্থ হইয়া আপিস কামাই করিতে বাধ্য হইতাম।

একদিন অসুখের খবর পাইয়া চিন্ময় আমায় দেখিতে আসিয়া বলিল, এই ভাবে যদি যখন তখন তুই কামাই করিস, তাহলে তো চাকরি রাখতে পারবি না। জানিস তো মার্চেণ্ট আপিসের চাকরি যেমন সাহেবের মর্জির ওপর নির্ভর করে, চাকরী যাওয়াটাও ঠিক তেমনি তাদের খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করে। যাও বললেই হলো! তাই আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছি। মনে রাখিস তোর ওই পোস্টটার দিকেই হাঁ করে চেয়ে আছে তোর ডিপার্টমেণ্টের অনেকে! কে কখন সাহেবের কাছে চুকলি খাবে, বড্ড কামাই করিস বলে, তার ঠিক নেই।

বলিতে বলিতে সিগারেটের মূল্যবান কৌটোটা পকেট হইতে বাহির করিল। দেখ, এইরকম মেস্‌-বোর্ডিংয়ে থাকলে কোনদিনই তোর স্বাস্থ্য ভাল হবে না। তার চেয়ে এবার একটা বিয়ে করে ফেল। সংসার হলে দেখবি ঘরের খাওয়াদাওয়া ও বৌয়ের সেবাযত্নে শরীর আপনি ভাল হয়ে যাবে!

সত্যি বলিতে কি, কেবল চাকরি করিয়া দিয়া চিন্ময় ক্ষান্ত হয় নাই। প্রকৃত হিতৈষী বন্ধুর মত সদুপদেশ প্রায়ই দিত। একদিন সে বলিল, আমি কিন্তু ঘটক লাগিয়ে দিয়েছি, তোর কোন আপত্তি শুনবো না। আগে যদি মেয়ে দেখে আমার পছন্দ হয়, তখন তুই নিজে দেখিস। হ্যাঁ, আমি বলে

দিয়েছি, আগে 'দর্শনধারী পিছু গুণবিচারী'—অর্থাৎ সর্বাগ্রে রং ফর্সা চাই। 'শি মাস্ট বি গুড-লুকিং এন্ড ফেয়ার-কম্‌প্লেক্‌শন্‌ড'। তোকে তো আমি চিনি ছেলেবেলা থেকে!

আমাকে নীরব দেখিয়া সে বলিল, কি এত ভাবছিস বল তো? তোর যা উপার্জন আমি তো জানি। মাইনে আর উপরি মিলিয়ে যা পাস তাতে এই কলকাতা শহরে বেশ ভাল ভাবে থাকা যায়, একটা কেন দুটো বৌ নিয়ে।

এবার না হাসিয়া পারিলাম না।

হাসছিস যে, কথাটা সত্যি কিনা বল তো?

না-না, সেজন্যে নয়।

তবে কি? দুঃখকষ্ট তো ছেলেবেলা থেকে অনেক পেয়েছিস, আর কেন? তাছাড়া বয়েসটার কথা তো চিন্তা করবি। তোর চেহারাটা সুন্দর, রোগা রোগা বলে আমার চেয়ে অনেকটা ছোট মনে হয়, নইলে তোর চেয়ে বোধ হয় বছর দুই তিনের বড় হবো আমি!

আমি তখনো চুপ করিয়া থাকিলে, চিন্ময় অপেক্ষাকৃত মৃদু গলায় বলিল, ভাবনার কি আছে, যদি কারো প্রেমে পড়ে থাকিস তো বল্‌, কিংবা কারুর সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—আমার কাছে লুকোসনি। আমি যেমন করে হোক তার বাপ-মাকে হাতে পায়ে ধরেও রাজী করাবো। তুই যেরকম রোমাণ্টিক ও লাজুকপ্রকৃতির জানি তো!

না-না, সত্যি বলছি—ওরকম কিছুই নয়।

তাহলে কি চাস? কিরকম মেয়ে—সত্যি বল ভাই!

ইহার কি উত্তর দিব তাহাকে, কি বলিব ভাবিতে লাগিলাম। জগতে যে টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না, এমন কি টাকা দিয়া সব কিছু কেনা যায়, প্রেম, ভালবাসা তো দূরের কথা, মাতৃস্নেহ পর্যন্ত—ধারণা করে, তাহাকে কি বলিব! আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া চিন্ময়ের ধারণা হইল, বুঝি 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্‌'—সে আর কিছু না বলিয়া তখনি উঠিয়া দাঁড়াইল।

তাহলে ওই কথা রইল। এরপর তোর কিন্তু আর কোন ওজর আপত্তি শুনবো না—বলিতে বলিতে দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ঠিক ওই মুহূর্তে চিন্ময়ের সেই আন্তরিক ব্যবহার ও বন্ধুপ্রীতির ঐকান্তিকতায় এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে তাহাকে মুখে কিছু বলিবার পরিবর্তে কেবলই মনে হইতে লাগিল, সত্যি সত্যি এইভাবে আমাকে সংসারী ও সুখী দেখিবার জন্য আর কেহ তো কখনো বলে নাই! তাহার সেই মহত্ত্ব ও দরদভরা কণ্ঠের উত্তাপ নিমেষে যেন আমাকে সবকিছু ভুলাইয়া দিয়াছিল।

চিন্ময়কে সেদিন যেন নতুনরূপে আবিষ্কার করিলাম।

চিন্ময় চলিয়া গেলে বেশ কিছুক্ষণ মনটা তাহারই চিন্তায় আবিষ্ট হইয়া ছিল। বাস্তবিক মানুষের মনটা যেমন জটিল তেমনি দুর্বোধ্য। কত না বিচিত্ররূপ দেখিলাম এই চিন্ময়ের। বাল্যকাল হইতে পুরনো দিনের সে সব কাহিনী সহসা যেন একই সঙ্গে মনের মধ্যে ভীড় করিয়া উঠিল। ইহার কোনটা সত্য, কোনটা নয়, তার ভাল মন্দ বিচার করিতে গেলে মনের গভীর হইতে কে যেন মাথা তুলিয়া কহে, মানুষ ত দেবতা নয়। কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, প্রেম, ভালবাসা একই সঙ্গে সবার মনে সহাবস্থান করে। ইহাদের সবই সত্য, আবার নয়ও বটে! তাই এই মানুষকেই একদিন দেবতার আসনে বসাইয়া মানুষই তাদের অন্তরের সব ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়া পূজা করে!

থাক এসব দার্শনিক চিন্তা!

মোট কথা বাল্যকাল হইতে বন্ধু সম্বন্ধে আমি মনের মধ্যে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতাম। ভাবিতাম, মা বাবার পর বন্ধুর মত এমন আপন জন ও পরমাত্মীয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই। এই সংসার সমুদ্রে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে কেবল আশ্রয়স্থল নয়, এর চেয়ে বড় অবলম্বন ও নির্ভরযোগ্য স্থান বুঝি আর কোথাও নাই, হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। তাই কোথাও এতটুকু বন্ধুত্বের স্বাদ পাইলে সমস্ত প্রাণ দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিতাম। ইহার জন্য অনেক আঘাত অনেক ব্যথাও নিঃশব্দে বুকে বহন করিয়াছি—তার প্রতিহিংসা লইতে কখনও মন চাহে নাই। যেটুকু পাই, তাহাকেই মনের ভাণ্ডারে কৃপণের মত সঞ্চয় করিয়া তৃপ্ত থাকি। বোধ হয় শৈশবে মাতৃ-পিতৃহীন বলিয়া আমার মনে ইহার জন্য এত ক্ষুধা এত আকুলতা।

এখনকার মত সেই সময় পূজার ছুটিতে বিদেশ যাত্রার এমন হিড়িক ছিল না। তার বদলে দেশে পূজায় গিয়া পারিবারিক পরিবেশে, আত্মীয় বন্ধু পরিজন ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে বৎসরান্তে একবার মিলিত হইবার জন্য চাকুরীজীবীদের মন যেন উন্মুখ হইয়া থাকিত। বৎসর শুরু হইতেই তাই ক্যালেণ্ডারের পাতা উল্টাইয়া লাল তারিখগুলির হিসাব করিয়া এই পূজাবকাশের প্রতীক্ষায় আকুল আগ্রহে দিন গুনিত। ইংরেজ আমলে পূজার ছুটিটাই ছিল সবচেয়ে বেশী। এক নাগাড়ে ষষ্ঠী হইতে লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত আপিস বন্ধ। তাই পঞ্চমীর দিন হইতেই ভীড় লাগিয়া যাইত বিশেষ করিয়া শিয়ালদার স্টেশনে। বরিশাল এক্সপ্রেস, ঢাকা মেল, আসাম মেল প্রভৃতি ট্রেনগুলিতে যে কল্পনাতীত ভীড় হইত তা বর্তমানে হাওড়া স্টেশনের পূজার ভীড়ের সঙ্গেই একমাত্র তুলনীয়। তখন ট্রেনের কামরায় এমন রিজার্ভেশনের প্রথা চালু হয় নাই। ফলে যে পৈশাচিক ভীড় হইত, তা কল্পনার অতীত।

যেন সহসা নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে কালবৈশাখীর আবির্ভাব।

কামরায় কামরায় পেশাপেশি ভীড়, খোলা দরজার মুখে একাধিক মানুষের ভীড় ঝোঝুল্যমান অবস্থায়। তবু ঝগড়া, মারামারি হাতাহাতি নাই। প্রসন্ন মুখ দেশে যাইবার আনন্দে উজ্জ্বল! শিয়ালদা স্টেশনের এই পূজার ভীড় তখন একটা প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল।

বাস্তবিক পক্ষে দেশ ও জন্মভূমির প্রতি সেইদিন যে গভীর ভালবাসা ও দুর্ধর্ষ আকর্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা যে চিরদিনের মত হারাইয়া যাইবে আর দেখিতে পাইব না কোনদিন ভাবি নাই। তবু এখনো পূজা আসিলে সহসা সেই স্মৃতি মনে পড়িয়া বুকের মধ্যে কি এক অব্যক্ত বেদনা যেন অনুভব করি। থাক সে পুরনো ইতিহাস।

আজকের মত তখন এই কলিকাতার পথেঘাটে হাটে-বাজারে পার্কে দুর্গা পূজার ছড়াছড়িও ছিল না। এত রোশনাই, এত ধুমধাম, এমন প্রতিমা প্রতিযোগিতার কথা দূরে থাক। শুধু একমাত্র ছিল সিমলা ব্যায়াম সমিতির আয়োজিত পূজা। সেই প্রথম বিরাট প্রতিমা, বিখ্যাত শিল্পী নিতাই পালের হাতে গড়া মূর্তি দেখিয়া শহরবাসী মুগ্ধ চমৎকৃত। সর্বজনীন দুর্গোৎসবের সেই সূচনা। যেমন বিরাট মূর্তি তেমনি বিরাট সুসজ্জিত মণ্ডপ, মহাষ্টমীর দিন পাহাড়-প্রমাণ ভাতের অন্নকূট ও তার সঙ্গে স্বদেশী দ্রব্যের প্রদর্শনী, বীরাষ্টমী, লাঠি-ছোরা খেলা মল্লযুদ্ধ বিখ্যাত ব্যায়ামবীরের সহযোগিতায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

গান্ধীজীর আদর্শে জাতিভেদ ভুলিয়া সেই প্রথম সর্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রতিষ্ঠা কলিকাতা মহানগরীতে! ইহাই সূত্রপাত। বড় বড় সব জ্ঞানীগুণী শিল্পী প্রভৃতির সহযোগিতায় এ পূজা মহাপূজায় পরিণত হইয়াছিল সেদিন।

ইহাই শহরের তখন একমাত্র উল্লেখযোগ্য পূজা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য ইহা ছাড়াও ছোটখাটো কিছু বারোয়ারী পূজা ও ধনী অভিজাত গৃহস্থের পৈতৃকপূজা ত ছিলই।

আমি তাই মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম পূজার ছুটিতে রাঁচী যাইব। খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা শুনিয়াছিলাম। সেখানে এই ক'টা দিন কাটাইয়া আসিব। চিন্ময়কেও সেকথা বলিয়াছিলাম। সে খুব উৎসাহ দিয়া বলিল, শরীরটা আগে, নিশ্চয় তোর যাওয়া উচিত! যখন তখন প্রায়ই তো শুনি তোর জ্বর হয়, শরীর খারাপ। এবারে রবিবার নিয়ে দশদিন পূজোর ছুটি পাচ্ছিস, তার সঙ্গে যদি আরো আট-দশটা দিন থাকতে পারিস চেপে, রাঁচির আবহাওয়া অত্যন্ত ভাল, দেখবি চোখ বুজিয়ে একটা বছর খাটতে পারবি।

বলিলাম, আমারও ইচ্ছা তাই। কিন্তু ছুটি কি আর দেবে আপিস?

না। আপিস দেবে না। নিয়ম নেই। তবে আমি যতক্ষণ আছি তোর ভাবনা নেই। একটা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে আমি সাহেবকে ধরে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দেব। অবশ্য তার জন্যে তোর ডাক্তারকে আটটা টাকা ঘুষ

দিতে হবে।

তাই কর ভাই। তাহলে খুব ভাল হয়।

হ্যাঁ করে দেবো, তুই নিশ্চিন্ত থাক।

সত্যিই, চিন্ময় মিথ্যা বলে নাই। ছুটির আগেই সে চিঠি আনিয়া আমার হাতে দিয়াছিল। তাই এই বন্ধুপ্রীতি আমার মনকে কেবল আরো গভীর ভাবে স্পর্শ করে নাই, তার প্রতি আমার অনুরাগ যেন চতুর্গুণ বাড়াইয়া দিয়াছিল।

তখন পুজোর ছুটির আর দুই তিন দিন বাকী। হঠাৎ চিন্ময় আসিয়া বলিল, জানিস, একটা খুব গুড্ নিউজ আছে, তোকে আগে বলিনি, পাকা খবর না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলুম। আজই চিঠি পেয়েছি তাই ছুটে এলুম সুখবরটা দিতে।

হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। গুড্ নিউজ পাকা খবর বলে কি? শেষকালে সত্যি সত্যি বিয়ের সম্বন্ধ কোথাও করিয়া বসিল নাকি! কি বলিয়া প্রত্যাখান করিব, ভাবিয়া না পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, দেখ ভাই শরীরে কদিন ধরে ভেতরে ভেতরে খুবই দুর্বলতা বোধ করছি। এখন আর ওসব কিছু—

আমার কথা শেষ করিতে না দিয়া সে আরো উৎসাহ দেখাইয়া বলিল, আরে সেই জন্যেই তো আমার এত আগ্রহ। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে দিয়েছি।

সর্বনাশ এ যে হিতে বিপরীত হইল। চিন্ময়ের ধারণা বৌ আসিলে, তাহার সেবা যত্নে শরীর আপনি ভাল হইয়া যাইবে। তার মুখের সেই কথাটা তখন সহসা মনে পড়িয়া গেলে গলার ভিতরটা যেন শুকাইয়া উঠিল।

সে বলিল, তোকে আর রাঁচীতে যেতে হবে না।

না-না ভাই, তা হয় না। তুই বিশ্বাস কর, আমি সত্যই খুব দুর্বল বোধ করছি। আপিসে খাটুনী খুব গেছে! কাজের চাপে সিগারেট খাবার সময় পর্যন্ত পাই না। সবাই চায় পুজোর আগে পেমেন্ট্।

সব জানি, আরে তাই তো আমার এত আগ্রহ, তোর শরীরের কথাটা ভেবেই তো। সত্যি বলছি ভাই, তুই দেখে অবাক হয়ে যাবি। যেমন দেখতে, তেমনি মিষ্টি স্বভাব, এত যে বড় লোকের মেয়ে, কোথাও এতটুকু দম্ভ অহঙ্কার নেই। বরং অতিরিক্ত সাদাসিদে, দেখলে বিশ্বাস হয় না যে এত বড় ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা, তাছাড়া দিদিমার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র অধি-কারিণী।

আমার যেখানে আসল ভয়, চিন্ময়ের কথাবার্তা হইতে মনে হইল যেন সে ইচ্ছা করিয়া এই সব শোনাইয়া আমার মনকে সেই দিকে প্রলুব্ধ করিতেছে। কি বলিব তাহাকে তখন ভাবিতেছি। যা ভয় পাইয়াছিলাম, তাই হইল। পয়সা ছাড়া চিন্ময় কিছু বোঝে না, তাই বাছিয়া বাছিয়া এই ধনীর একমাত্র কন্যা নির্বাচন করিয়াছে আমার জন্য।

নিজের কথার জের টানিয়া চিন্ময় বলিয়া উঠিল, তাছাড়া হাতের রান্না এত ভাল, খেলে ভুলতে পারবি না।

চিন্ময় বরাবরই একটু পেটুক। ভালমন্দ খাইতে পছন্দ করে জানিতাম, তাই এবার হাসি সামলাইতে পারিলাম না। বলিয়া ফেলিলাম, মনে হচ্ছে তোমার জিবে যেন জল এসে পড়লো। বোধ হয়, রান্নার পরীক্ষা আগেই করেছো!

বোধ হয় কেন, নিশ্চয়।

তার মানে ওদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আগে থেকে ছিল কিছু?

হ্যাঁ।

কিন্তু ভাই ভয় হচ্ছে এত বড়লোক, আমার অবস্থার কথা সব বলেছো তো তাদের?

আরে হ্যাঁ-হ্যাঁ, নইলে কি আমার কথায় তোকে নিয়ে যাবো বলেছি। তোর বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দ্যাখ নিরাপদর চিঠি। সে লিখেছে, এত বড় বাংলো এবং এমন সুন্দর সাজানো গোছানো যে একজন কেন, আরো যে ক'জন আসতে চায় নিয়ে এসো। আমাদের কোন অসুবিধা নেই।

চিন্ময় চিঠিটা পকেটে রাখিতে রাখিতে বলিল, টাকা-পয়সার তো অভাব নেই। তার ওপর ওর বৌটি যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, রূপে-গুণে তুলনা হয় না। খাওয়াতে-দাওয়াতে এত ভালবাসে! তুই গেলে বুঝতে পারবি।

এবার একটু ইতস্তত করিয়া কহিলাম, ভাল না লাগলে কিন্তু চলে আসবো, তুমি থেকো।

আরে তোর ভাল লাগবে বলেই তো যাওয়া! নিরাপদ লিখেছে, যেমন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, দূরে দূরে পাহাড়, উঁচু নীচু ঢেউ খেলানো দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ চারিদিকে, শাল, সেগুন, মহুয়া, পলাশের বন, তাছাড়া ইঁদারার জল এত হজমী যে শরীর এক সপ্তাহে তাজা হয়ে যাবে! তাই তো আমার এত আগ্রহ তোর জন্যে। যখনই কোন ভাল জায়গায় ওরা চেঞ্জে যায়, আমাকে যাবার জন্যে অনেক করে চিঠি লেখে। সব সময় আমার যাওয়া হয়ে ওঠে না। একবার কাশীতে ও একবার শিমুলতলায় ওদের গেস্ট হয়েছিলুম, সে আদর-যত্ন কল্পনা করা যায় না। বলিলাম, বুঝেছি, তোমার সঙ্গে ওদের অনেক দিনের আলাপ।

এবার সগর্বে চিন্ময় বলিল, আরে, আমি তো একদিন এই নিরাপদর চাকরী করে দিয়েছিলুম, আমার সাহেবকে ধরে তার এক বন্ধুর জুট মিল-এ হুগলীতে। তারপর সাহেবের নজরে পড়ে যায়। ওর কাজে নিষ্ঠা দেখে। ফলে চারটে বছর গেল না। একেবারে প্রোডাকশন ম্যানেজার। বুঝতেই পারছিস দু' হাজার শ্রমিকের মাইনে, হিসেব নিকেশ সব যার হাতে, তার উপরি আয়ের হিসেব নেই।

বলিলাম, তাহলে তোমায় আদর-যত্ন করবে না ত কি?

কাজেই তুই যখন আমার বন্ধু, তোর আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হবে না দেখবি।

এবার বলিলাম, আচ্ছা, তাহলে এই নিরাপদবাবুর সঙ্গে তোমার আগে জানাশোনা ছিল?

মোটেই নয়। সে এক ইতিহাস। শুনলে অবাক হয়ে যাবি! থাক আজ, পরে বলবোখন।

আরে শুনি শুনি, পরে কেন। আজই বলো।

এবার একটা নতুন সিগারেট ধরাইয়া ও আমার মুখে একটা ধরাইয়া দিয়া বলিল, নিরাপদর চেহারা ছিল খুব সুন্দর। যেমন গায়ের রং ফর্সা, তেমনি ছিপছিপে সুগঠিত দেহ। ভোরে উঠে নিয়মিত বারবেল ভাঁজতো। একদিন ওর এক বন্ধুর বোনের বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে, এক ভদ্রমহিলার নজরে পড়ে যায়। তিনি থাকতেন ওই পাড়াতেই। বিরাট এক ধনী ব্যবসায়ীর স্ত্রী। তিনি যেমন রূপসী তার স্বামী ছিলেন তেমনি কুৎসিত। কালো, বেঁটে, মোটা। স্ত্রৈণ, স্ত্রীর কথায় উঠতেন বসতেন।

ভদ্রমহিলার ছোট মেয়েটির বয়স তখন তেরো। জেদ ধরলেন ওই নিরাপদকে জামাই করবেন বলে। নিরাপদদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ওর বাবা রাজী হলেন না। ছেলে বেকার, চাকরী-বাকরি করে না। কিন্তু সেই জেদী মহিলা এত টাকা ও অলঙ্কারের প্রলোভন দেখালেন যে নিরাপদর মা তা প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তিনি স্বামীকে বোঝালেন, এত বড় ধনীর জামাই হলে, শ্বশুর-ই একটা ভাল চাকরী করে দেবেন, নিজের মান রক্ষা করার জন্য।

অগত্যা বিয়েটা হয়ে যায়, এবং কিছুদিন পরে একটা চাকরীও ওর শ্বশুরমশাই নিজের ফার্মে করে দেন। কিন্তু নিরাপদর যে অত আত্মসম্মান বোধ, ওর মা তা জানতেন না। ফলে সে চাকরী করতে রাজী হলো না। আপিসের দোরে দোরে ঘুরে জুতো ক্ষইয়ে ফেলে। কিন্তু যে তিমিরে সেই তিমিরে। টুম-টাম দু'একটা ছেলে পড়িয়ে যা কিছু পেতো মায়ের হাতে তুলে দিতো। এমনি করে দুটো বছর যেতে না যেতেই তাদের একটা বাচ্চা হয়, এতে ওদের দারিদ্র্য খুবই বেড়ে যায়। এমনি করে যখন দিন কাটে তখন আমি বোম্বের আপিসে এখান থেকে বদলী হয়ে যাই। সেই সময় ওর দাদা শ্যামাপদবাবু আমায় রাগ করে সব বলেন। তিনি ভাইয়ের বিয়েতে আপত্তি করেছিলেন কিন্তু মা বাবা তাঁর কথায় কান দেননি। তিনি তাঁদের যে টাকা পাঠান তার বেশী আর কিছু দেবার সাধ্য নেই। এদিকে তাঁর নিজের সংসারও তো বেড়েছে।

চিন্ময়কে আমি বাধা দিয়া বলিলাম, তাহলে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ ছিল আগে বলো।

হ্যাঁ ভাই, আমি বলতে ভুলে গেছি। যখন চাকরীর খোঁজে বাড়ি থেকে

বোম্বে পালিয়ে বেকার হয়ে ঘুরছি, সেই সময় উনি অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত জেনে ও বাঙ্গালী সন্তান বলে আমাকে বাড়িতে ছ'মাস রেখেছিলেন। একটি পয়সাও নেননি। সেদিনের কথা আমি ভুলিনি। তাই অনেক খোসামোদ করে সাহেবের হাতে পায়ে ধরে নিরাপদর ওই চাকরীটার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলুম!

চিন্ময় এই বলিয়া একবার হাতের ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল, ইস্, আটটা বেজে গেল। চলি ভাই, তাহলে ওই কথাই রইলো? কটায় ট্রেন, কত নম্বর প্ল্যাটফর্ম, কোথায় অপেক্ষা করবি—সব লিখে বেয়ারাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

বাস্তবিক সুরিয়ার সেই বাংলোটা ও তার চতুর্দিকের যেরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা চিঠিতে লিখিয়াছিলেন নিরাপদবাবু, সেখানে পেঁছাইতে দেখিলাম তার চেয়ে আরো অনেক বেশী সুন্দর। অন্ততঃ আমার তাই মনে হইল। বিশেষ করিয়া যেন সেই বাংলোটার তুলনা হয় না।

রেলস্টেশন হইতে এক মাইলেরও বেশী হাঁটা পথ। একেবারে গ্রাম্য পরিবেশ। কোন রকমের যান-বাহনের বালাই নাই।

আমরা যখন স্টেশনের বাইরে আসিয়া হাঁটিতে শুরু করিলাম, তখন সবে ভোর হইয়াছে। রাস্তার দু'পাশে গাছে গাছে বনে জঙ্গলে অসংখ্য পাখীর ডাক। ঈষৎ ঠাণ্ডা ভোরের হাওয়ায় অজানা ফুলের গন্ধ। কাঁচা রাস্তা দিয়া হাঁটিতে বেশ ভাল লাগিতেছিল। পথের নির্দেশ যেমন চিঠিতে দেওয়া ছিল, সেই মত বেশ কিছুটা যাইবার পর অদূরে একটি রানীগঞ্জ টালির বাংলো দেখাইয়া চিন্ময় বলিল, ওইটা নিশ্চয়! নিরাপদ লিখেছে সাদা কাঠের ফটক ও বেড়া ঘেরা অনেকখানি ফুলের বাগান বাংলোটার সামনে। সব মিলে যাচ্ছে, আরো একটু কাছে যাইতে দেখিতে পাইলাম সামনের সেই বাগানে অনেক ফুল ফুটিয়া আছে।

একটি রঙীন শাড়ী পরা তরুণী, পিঠে তার লম্বা বেণী, ফুল তুলিতেছিল, আমাদের কথাবার্তা হঠাৎ কানে যাইতে যেন চমকিত হইয়া একবার পিছনে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

আমরা ফটকের ভিতর ঢুকিয়া লাল মোরামের পথ দিয়া বাংলোর সিঁড়ির কাছে পেঁছাইবার আগেই নিরাপদবাবু ও তাঁর স্ত্রী দরজার সামনে আসিয়া দু'হাত কপালে ঠেকাইয়া আমাদের সাদরে আহবান জানাইলেন। তারপর আমার দিকে চাহিয়া নিরাপদবাবুর স্ত্রী বলিলেন, আপনি আমাদের নতুন অতিথি, চিন্ময়দা আমাদের ঘরের লোক তাই আগে আপনাকে ডাকছি। আসুন ভাই ভেতরে।

চিন্ময় ততক্ষণ ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছিল আমি তখনো ঢুকি নাই। সামনে পরেশনাথ পাহাড়ের উঁচু চূড়াটার দিকে তাকাইয়াছিলাম। প্রথম সূর্যোদয়ের রক্তিম আলোকচ্ছটায় মনে হইতেছিল যেন সোনার ঝলমলে মুকুট পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাঃ ওয়ান্ডারফুল! সত্যি, আপনাদের এ বাংলোর তুলনা হয় না।

তিনি তখন মধুঝরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আমাদের নয়, একজন দয়া করে আমাদের থাকতে দিয়েছেন।

যারই হোক, ভদ্রলোকের সৌন্দর্য-বোধ তারিফ করবার মত। বলিতে বলিতে সিঁড়ির বাঁদিকে একটা বিরাট পলাশগাছের গোড়ায় চক্রাকারে লালমাটি ও পাথর দিয়া গাঁথা বেদীটার ওপর বসিয়া পড়িলাম।

নিরাপদবাবুর স্ত্রী এবার বলিলেন, 'আপনি' 'আপনি' নয়, যখন চিন্ময়দার বন্ধু তখন আপনাকে কিন্তু আমি আলোকদা বলে ডাকবো? আপনি আমার নাম ধরেই ডাকবেন সুলতা বলে, কেমন?

আচ্ছা। তাই হবে!

বলিতে বলিতে সেই বেদীটার ওপর বসিয়া পড়িলাম।

ওখানে এখন না, ভেতরে আসুন আগে, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

যাচ্ছি এখনি। সত্যি ভদ্রলোকের 'টেস্ট' আছে। এখানে বসে নিশ্চয় পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে চা খেতেন।

এবার সুলতা হাসিয়া উঠিলেন। বুঝেছি, আচ্ছা আপনি এখানেই বসুন। আমি চা নিয়ে আসছি।

আঃ তোর কাব্যির জ্বালায় মলুম। ভিতরে চা খাইতে খাইতে চিন্ময় বলিয়া উঠিল।

নিরাপদবাবু স্ত্রীকে সমর্থন করিয়া বলিলেন, ওঁর যদি জায়গাটা এত ভাল লেগে থাকে, তো ওখানেই বসে খান, ক্ষতি কি?

চিন্ময় বলিল, মিছি মিছি লোককে হয়রান করা। আমি পছন্দ করি না।

হয়রান আবার কি? সত্যি আলোকবাবুর চোখ আছে, উনি যা বলেছেন ঠিকই। এ জায়গাটার তুলনা হয় না!

চিন্ময় চায়ের কাপটা মুখ হইতে নামাইয়া প্রশ্ন করিল, তার মানে তুমি কি বলতে চাও, আমার চোখ নেই?

আছে! নিরাপদবাবু হাসিয়া বলিলেন। আলোকবাবুর চেয়েও বড় বড় চোখ। কিন্তু রাগ করবেন না দাদা, আপনিও তো ওখান দিয়ে চলে এসে ঘরে ঢুকলেন, কৈ, উনি তো তা পারলেন না। কেন?

এই নিন চা। আমি সামনে পরেশনাথ পাহাড়ের দিকে চাহিয়াছিলাম। পিছনে চাহিয়া দেখি সেই রঙীনশাড়ী পরা। পিঠে সাপের মত লম্বা বিনুনী ঝোলানো মেয়েটি, গরম ধূমায়িত চায়ের কাপ তার হাতে। মেয়েটিকে এই প্রথম কাছ থেকে দেখিলাম। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। একটা স্লিভলেস ব্লাউজ, বগল

হইতে নগ্ন তাহার সেই সুপুষ্ট সুডৌল হাতে একগাছা কাঁচের চুড়ি। চায়ের পেয়ালাটা হাত হইতে লইবার সময় সেই চুড়িগুলি ঠুন্‌ঠুন্‌ শব্দে বাজিয়া উঠিল যেন বিচিত্র এক সুরে।

চায়ের কাপে যেমন চুমুক দিলাম, সে দ্বিধাহীন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, মিষ্টি ঠিক হয়েছে তো?

বলিলাম, হ্যাঁ হয়েছে। তবে আমি মিষ্টি একটু বেশী খাই চায়ে।

তবে দাঁড়ান। খাবেন না। এক্ষুনি চিনি আনছি। বলিয়া দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল এবং নিমেষে চিনি আনিয়া আমার কাপে দিয়া চামচ নাড়িতে লাগিল। যতক্ষণ নাড়িতে ছিল তার ওই চুড়িগুলি ঠুন্‌ ঠুন্‌ করিয়া একসঙ্গে যেন বাজিতে লাগিল।

এই মেয়েটি কে সুলতা, একে তো আগে দেখিনি তোমার বাড়ীতে! চিন্ময় ভিতরে কথা বলিলে আমার কানে সবই আসিতেছিল। মেয়েটি চা বেশ ভাল করে কিন্তু।

আর একটু খাবেন? দাঁড়ান। বলিয়া সুলতা ডাকিল, এই অনি আর একটু চা চিন্ময়দাকে দিয়ে যা তো ভাই?

বৌদি যাচ্ছি! তখনি ছুটিয়া সে চলিয়া গেল।

সুলতা বলিতেছিল, ও আমার মাসতুতো ননদ। আমায় বড় ভালবাসে—আর মিঠুনও ওর খুব ভক্ত। এই পিসীকে সবচেয়ে ভালবাসে। ওর ওপরে আরো দুটি দিদি আছে, তাদের কাছে ও কিন্তু ঘেঁষে না। ওর যখন টাইফয়েড হয়েছিল আমাদের বাড়িতে এসে দুমাস অনি ছিল। ও সম্পূর্ণ ভাল হতে, তবে ফিরে যায়। আমি ওরই জন্যে হাওয়া বদল করতে যাচ্ছি শুনে, মাসীমা নিজেই বললেন, বৌমা, ছেলেটা যখন অনির এত ন্যাওটা হয়েছে, তখন তুমি ওকে নিয়ে যাও, বিদেশ বিভুঁই জায়গা, তায় তোমরা দু'জনে যাচ্ছো! ওখানে ওই রোগা ছেলেটাকে নিয়ে, লোকজন যতই থাকুক, ছেলেটাকে ত সামলাতে পারবে।

এবার একটু থামিয়া বলিল, তা দাদা, বৌদিকে আনলেন না কেন? সেবারেও নিয়ে এলেন না! আমি অনিকে বলে রেখেছিলুম, দেখবি চিন্ময়দার বৌকে, যেমন সুন্দরী, তেমনি যাকে বলে বিদুষী—এম. এ. পাশ। সবাই মিলে জঙ্গলে পিক্‌নিক করবো। কি কি রান্না হবে, আমরা কে কোনটা রাঁধবো সব প্ল্যান করে রেখেছিলুম—দু'জনে। জিজ্ঞেস করুন অনিকে।

অনুরাধা ওরফে অনির গলাও আমার কানে আসিল, হ্যাঁ। আনলেন না কেন দাদা?

সে কি তোমার মত মেয়ে? তার নিজস্ব মতামতের ওপর স্বামীরও কথা বলার অধিকার নেই! সে জংলী জায়গা পছন্দ করে না। এখানে না আছে সিনেমা না রেস্তোরাঁ।

হাজার হোক স্ত্রী, তার সম্বন্ধে এরকম মিথ্যা ভাষণ। আমার কানে যেন

ধাক্কা মারিতেছিল।

আমি যে চিন্ময়ের মায়ের কাছে সব শুনিয়াছিলাম, তা সে জানিত না। তা হইলে এত জোরালো গলায় বলিতে সাহস করিত না।

মেয়েলী কৌতূহল তখন চিন্ময়কে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িল। আমি এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও এখনো কেন বিবাহ করি নাই ইত্যাদি ইত্যাদি!

চিন্ময় প্রথমটা জানি না বলিলেও তখন তার উপর আরো চাপ দিয়া নিরাপদ-বাবুর স্ত্রী কহিলেন, আপনার যখন দীর্ঘদিনের বন্ধু নিশ্চয় জানেন, আমাদের কাছে চেপে যাচ্ছেন। বলুন না—কেন করেন নি?

চিন্ময় বলিল, ঠিক ওর মনের মত পছন্দসই মেয়ে পাচ্ছে না খুঁজে তাই। ওঃ ভয়ানক খুঁতখুঁতে। কেবল সুন্দর দেখতে হলে চলবে না। ভাল লেখা-পড়া জানা চাই। ভাল গান গাইতে পারা চাই। তার ওপর আবার স্মার্ট ও রোমাণ্টিক হওয়া চাই। ভাল কথা কইতে ও হাসতে জানা চাই।

সুলতা হাসিয়া উঠিল, এর সংগে 'নাচতে জানা চাই' হলেই ত একেবারে ষোল কলা পূর্ণ হোত। আপনার বন্ধুকে বলবেন, ওটাই বা বাদ থাকে কেন? সুলতার এই কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা মিলিত কণ্ঠের হাস্যধ্বনি উঠিল। তার মধ্যে সবচেয়ে জোরালো কণ্ঠ সেই মেয়েটির বলিয়া আমার বোধ হইল। যদিও ওরা ভিতরে নীচু গলায় আলোচনা করিতেছিল, আমার কানে যে সব আসিতেছে তাহা বোধ হয় তাঁহাদের কারো খেয়াল ছিল না। যাহোক, আমার ইহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। বরং চিন্ময় একদিক দিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছে, আমাকে আর সরাসরি ইহা লইয়া কেহ প্রশ্ন করিবে না।

বেশী বয়স পর্যন্ত বিয়ে না করার এই একটা অভিশাপ! কেন এতদিন আইবুড়ো আছি, এ প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। বিশেষ করিয়া মেয়েদের কাছে। এমন একজনও ব্যতিক্রম দেখিলাম না, আজো! আশ্চর্য।

সত্যি চিন্ময় যা বলিয়াছিল অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল। প্রথমে আমার মনে একটা সত্যি সত্যি সংকোচ ছিল, যাহাদের চিনি না, এমন কি, কোনদিন চোখে দেখি নাই, বিদেশে তাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া থাকা খাওয়া, দু' এক দিন নয়, একাদিক্রমে বিশ পঁচিশ দিন, হয়ত মুখে কিছু না বলিয়া আদর-আপ্যায়ন করিবেন ঠিকই, মনে মনে যতই আমাকে অবাঞ্ছিত অতিথি, আপদ বলিয়াই ভাবুক যেহেতু চিন্ময় আমাকে লইয়া গিয়াছে, আমি তার বন্ধু এবং তার দৌলতেই সব পাইয়াছেন তারা। কিন্তু ওখানে গিয়া বুঝিলাম চিন্ময় ঠিকই বলিয়াছিল, যেমন নির্মল ও উদার চরিত্র নিরাপদবাবু তেমনি তাঁর স্ত্রী যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আদর যত্ন ও সেবায় চার-পাঁচদিনের মধ্যেই এমন আপন করিয়া লইলেন যে চিন্ময় বেশী আপন না আমি, এক এক সময় নিজেরই মনে সন্দেহ জাগিত। এক-টেবিলে বসিয়া সকলে এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজবে যেমন জমাট আড্ডা বসিত, তেমনি সকালে ও বিকালে বাহিরে সেই বাঁধানো

চত্বর আমি ভালবাসি বলিয়া সেখানে দু'বেলা চা চক্র বসিয়া যাইত। চিন্ময়ের সাহেবী মেজাজ তাই অনি চট করিয়া একটা বেতের চেয়ার আনিয়া দিত তার জন্য। ইহাতে চিন্ময়ের মুখে বেশ একটা গর্বিত ভাব লক্ষ্য করিতাম। অর্থাৎ তাহাকে যে সকলে মনে মনে কত বেশী শ্রদ্ধা করে—তা অন্তত আমাকে দেখাইতে পারিয়া সে যেন আরো আত্মপ্রসাদ লাভ করিত।

স্নান করিবার সময় তার সাহেবী ধরণধারণ। প্রতিদিন এক বালতি গরম জল অনি আগে বাথরুমে দিয়া আসিত। তার সঙ্গে টার্কিস তোয়ালে, বাথ-গেটের ক্যাস্টর অয়েল ও পিয়ার্স গ্লিসারিন সাবান ঠিকমত অনি দিয়া আসিত। চিন্ময়ের একটি সুদৃশ্য চামড়ার ব্যাগ ছিল। তার মধ্যে দাড়ি কামাইবার নানা সরঞ্জাম, সুগন্ধি সেভিং স্টীক, দু'রকম লোশন এ সব লইয়া তখন সে স্নান করিতে ঢুকিত এবং এর জন্য সময় যাইত বেশ কিছুক্ষণ।

আমি ঠান্ডা জলেই স্নান করিতাম, চিন্ময়ের মত বারোমাস শীত গ্রীষ্ম বর্ষা গরম জল না হইলে চলিবে না, এই বদ অভ্যাস ছিল না। চিন্ময়ের ধারণা এর মধ্যেই আভিজাত্য, বড়লোকীয়ানা। তাছাড়া বাড়িতে সব সময় পায়জামার সঙ্গে সিল্কের পাঞ্জাবী ও বাঘের চামড়ার চটি পরিয়া থাকিত। সে যে সকলের চেয়ে বড় চাকরি করে, তাহার চালচলন, ওঠা-বসা খাওয়া-দাওয়া সব কিছুর ভিতর সকলকে বুঝাইয়া দিতে ভুলিত না! সুরিয়ার হাট বাজার বলিতে কিছু ছিল না। একেবারে গ্রাম্য পরিবেশ। সেই স্টেশনের কাছে ছোট্ট একটু বাজারের মত। চা, জল-খাবার খাইয়া আমরা দুজনে একটু বেড়াইতে বাহির হইতাম। আসলে চিন্ময় বনজঙ্গলে কাঁচা পথে হাঁটিতে ভালবাসিত না জানিতাম। তবু যে তার উৎসাহ তা শুধু চায়ের সঙ্গে যা ভুরিভোজন হইয়াছে, তাহা দ্রুত হজম করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য পুনরায় ক্ষুধা করার জন্য। রাস্তায় আসিয়া সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে সে বলিত, সত্যি, জলটা এখানের খুব হজমী। খানিকটা ঘুরলেই বেশ ক্ষিদে পেয়ে যায়, দেখছিস?

এমনি হাঁটিতে হাঁটিতে কোথাও ছোটখাটো কোন মিষ্টির দোকান চোখে পড়িলে কোনদিন গরম জিলিপী, কখনো বা টাট্‌কা কালাকাঁদ কাঁচা শালপাতার দোনায় করিয়া আনিয়া সুলতার হাতে দিতে গেলে, সে বলিত, দাদা, এসব আবার কেন আনতে গেলেন?

আরে, এরকম খাঁটি জিনিস তুমি কলকাতায় মাথা খুঁড়লেও পাবে না বৌমা! দেখছো গরম জিলিপী থেকে ঘিয়ের গন্ধ বেরুচ্ছে। এরা সব দেহাতী, এখনো ভেজাল দিতে শেখেনি! এমনিভাবে কালাকাঁদ আনিয়া বলিত, একবারে টাটকা ক্ষীর, দুধ জ্বাল দিয়ে তৈরী, খেয়ে দেখো কি অপূর্ব এর স্বাদ।

সত্যি দাদা, আপনি এ জিনিস কোথায় পেলেন, আমরাও এতদিন এসেছি, আপনার ভাই খাবার কিনে আনেন বাজার থেকে, কিন্তু তার স্বাদ গন্ধও

এরকম নয়।

গর্বিত কণ্ঠে চিন্ময় বলে, হুঁ হুঁ, এ আমার নিজের আবিষ্কার। গাঁয়ের ভেতর গিয়ে খুঁজে বের করতে হয়। আর ভাল জিনিস দেখলে যাদের ভালবাসি তাদের না খাওয়াতে পারলে যেন তৃপ্তি হয় না।

প্রথমে আমিই ওদের জন্য লইতে বলিয়াছিলাম। সুলতা বলিল, অনুও তাই বলছিল! চিন্ময়দা নিজে যেমন খেতে-দেতে ভালবাসেন, তেমনি অন্যকে খাওয়াতে ভালবাসেন। মনটা খুব উঁচু।

তাই নাকি, ওর দেখছি চোখ আছে, ঠিক ধরেছে তো? বলিতে বলিতে চিন্ময় গদগদ হইয়া উঠিল।

এর পরের দিন গরম হিঙের কচুরী এক ঠোঙ্গা আনিয়া অনুকে ডাকিয়া তার হাতে দিলে, অনুরাধা তখন বৌদিকে ডাকিলে, চিন্ময় বলিয়া উঠিল, বৌদিকে এখনি না ডেকে একেবারে প্লেট এনে সকলকে ভাগ করে দাও। তারপর কিন্তু আর এক কাপ চা করে খাওয়াতে হবে।

সুলতা ততক্ষণে আসিয়া গিয়াছিল। অনুরাধা খাবারের ঠোঙাটা তার হাতে দিলে সে হাসিয়া বলিল, এক কাপ কেন, পাঁচ কাপ চা অনু আপনাকে একসঙ্গে খাওয়াতে পারে। আপনি ওর সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি এনেছেন। কি করে বুঝলেন দাদা ওর মনের কথা!

না বৌদি, ভাল হচ্ছে না ভাই! এঁরা কি মনে করছেন বলো ত?

অকারণে হাসিয়া গড়াইয়া পড়া সুলতার যেন স্বভাবগত অভ্যাস, লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাই এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হইল না। সুলতা সে কথায় জবাব না দিয়া আরো জোরে হাসিতে লাগিল।

চিন্ময় অনুরাধার দিকে চাহিয়া বলিল, আমাকে দেখে তুমি যেমন বুঝতে পারো আমার মনের কথা, তেমনি আমিও পারি তোমাকে। ভুলে যেয়ো না!

ওমা! আমি কবে আপনার মনের কথা বুঝতে গেছি!

বৌমার কাছে তুমি বলোনি আমায় পেটুক!

ছি ছি—কবে বলেছি বৌদি, একি ভাই—না—না।

চিন্ময় বলিল, হ্যাঁ—হ্যাঁ, 'খেতে ভালবাসে' বলার অর্থ একটু ঘুরিয়ে শুদ্ধ ভাষায় বললে কি ওই বোঝায় না?

অনুরাধা এবার একটু অনুযোগ ভরা স্বরে বলিল, আমি বুঝি শুধু ওই বলেছি—আর আপনি যে পাঁচজনকে খাওয়াতে ভালবাসেন, সেটা বুঝি শোনেননি?

সুলতা এবার বলিল, দাদা ওর সঙ্গে কথায় পেরে উঠবেন না। বলেছি ত আপনাকে, স্কুলে কলেজে পড়েনি কিন্তু লাইব্রেরীর বই এত পড়েছে যে ওকে সহজে তর্কে হারাতে পারবে না কেউ।

আবার বৌদি, ভাল হচ্ছে না—না—ওর কথায় বিশ্বাস করবেন না, চিন্ময়দা। সব বাজে। বৌদি আমাকে ঠিক ননদের চোখে দেখে না। তাই

ওইসব বলেন আমার সম্বন্ধে।

আমি চুপ করিয়া ছিলাম। একবার আমার দিকে দ্রুত চাহিয়া বৌদিকে বলিল, আলোকদা কি ভাবছেন আমার সম্বন্ধে বলুন ত?

তোকে ত রোজ দেখছেন। দিনরাত! নতুন করে কি ভাববেন! তুই কি চাস বল্? বলিতে গিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেন।

যাও, ভারী দুষ্টু তুমি। বলিয়া সলজ্জ ভঙ্গিতে অনুরাধা ভিতরে প্রস্থান করিল।

॥ আটত্রিশ ॥

মনে আছে চিন্ময়ের স্নান শেষ হইলে, প্রতিদিন আমি বাথরুমে ঢুকিতাম। সেদিন পোলাও রান্না করিয়াছিল সুলতা, চিন্ময়ের দেরী দেখিয়া আমাকে আসিয়া অনুরাধা বলিল, কুয়োতলায় স্নান করবেন? পোলাও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, আমাকে বৌদি জিজ্ঞেস করতে বললে।

হাঁ হাঁ নিশ্চয়। আমি খুব ভালবাসি বাইরে স্নান করতে। এখানে কি তার ব্যবস্থা আছে, কৈ একদিনও বলোনি তো?

অনুরাধা হাসি টিপিয়া বলিল, কি জানি, আপনারা শহরের মানুষ, বড়-লোক। এই গাঁইয়া ব্যাপার পছন্দ করবেন কি না।

ঠাট্টা করছো! চিন্ময়দার সঙ্গে আমাকে একদলে টেনো না। ওর কথা আলাদা! আমাকে এতদিন ধরে দেখে কি বোঝোনি, আমি প্রকৃতিকে কত ভালবাসি!

তা জানি। কিন্তু তাই বলে ওই বাইরে কুয়োতলায় বসে স্নান করতে যে পছন্দ করেন ভেবে দেখি নি! আসুন, আমার সঙ্গে।

সত্যি, পাতকুয়ার কাছে গিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। ভিতরের দিকে রান্নাঘরের কাছে। কুয়োর চারিপাশ পাথরের টুকরো দিয়া বাঁধানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেখানে শ্বেত পাথরের ছোট্ট একটা স্নানের চৌকি ও তার পাশে বড় বড় দু' বালতি জল প্রস্তুত। কুয়োর পাড়ে একটা তোয়ালে, সাবান ও জবাকুসুমের শিশি।

বলিলাম, কে স্নান করবে বলে সব প্রস্তুত দেখছি!

একটু থামিয়া সলজ্জকণ্ঠে অনুরাধা কহিল, আমি ওই ঘরের মধ্যে স্নান করতে ভালবাসি না। চিরদিন কলকাতার অন্ধকার বাড়ির মধ্যে কলের জলে নেয়েছি। এমন সুন্দর কুয়ো কখনো চোখে দেখিনি আগে। তাই মালীটা রোজই স্নানের জল তুলে রাখে আমার জন্যে, আমি ভালবাসি বলে।

হাসিয়া ফেলিলাম। তাহলে দেখছি তোমার বৌদি যে বলেন, ওর ভেতরে একটা জংলীমেয়ে আছে, তা সত্যি! তুমি নাকি দুপুরবেলা সবাই যখন দিবা-নিদ্রা দেয়, তুমি একা, বুড়ো মালীটাকে নিয়ে টো-টো করে বনে জঙ্গলে ঘুরে

বেড়াও।

কি করবো, দুপুরে ঘুমনো আমার ধাতে সয় না, তাছাড়া, কেবল বইয়ে পড়েছি, এর আগে কোন দিন বনজঙ্গল পাহাড় চোখেও দেখিনি। এত বড় নীল আকাশ, ঢেউ খেলানো রাঙামাটির এমন দিগন্ত বিস্তৃত প্রকৃতি, নিস্তব্ধ দুপুরে বনজঙ্গল থেকে গরু-মোষের গলার ঠন্‌ঠন্‌ ঘণ্টার শব্দ সব যেন হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকে। ঘরে থাকতে দেয় না! দুপুরটা যে কি অদ্ভুত ভাবে টানে আমায় সেকথা কাউকে বোঝাতে পারবো না। আপনি শুনেছি বন-জঙ্গল খুব ভালবাসেন, তাই আপনাকে বলছি। জানি না আপনি কি ভাবছেন!

ভাবছি তোমার ভেতরে একটা সত্যিকারের কবি ভাব আছে। একটু থামিয়া বলিলাম, শুনেছি, তুমি কবিতা খুব ভালবাস। বই কিনতে পারো না বলে রবীন্দ্রনাথের গোটা চয়নিকাটা খাতায় লিখে রেখেছো? আচ্ছা ওই কবিতাটা পড়েছ নিশ্চয়—ওগো সুদূর বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী—

এই পর্যন্ত বলিতেই অনুরাধা বলিয়া উঠিল, মোর ডানা নাই / তাই আছি এক ঠাঁই / সে কথা যে যাই পাশরি।

বাঃ চমৎকার। তোমার ঠিক মনের ভেতরটা এমনি করে তো?

অনুরাধা এবার ঘাড়টা নীচু করিয়া নীরবে সায় দিল।

অনুরাধার সঙ্গে কথা কহিয়া স্নান করিতে করিতে কখন যে বালতির জল নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, বুঝিতে পারি নাই। মুখে চোখে সাবান লাগাইয়া চোখ বুজাইয়া যখন বালতির জল খুঁজিতেছি, হঠাৎ অনুরাধা মাথার উপরে এক বালতি জল ঢালিয়া দিয়া বলিল, দাঁড়ান, আর এক বালতি তুলে দিচ্ছি।

সে যে চুপি চুপি কখন কুয়া হইতে এক বালতি জল তুলিয়া নিল, বুঝিতে পারি নাই। হঠাৎ কানে চিন্ময়ের কথা যাইতে দেখি সে দূরে দাঁড়াইয়া আছে। দেখছি তোর কাণ্ডজ্ঞান নেই, ওই মেয়েটাকে দিয়ে তুই নাইবার জল তোলাচ্ছিস?

অনুরাধা এর জবাব দিল, না-না, মালী জল তুলে রেখে গিয়েছিল। ওঁর একটু কম পড়তে তাই আমি তুলে দিলুম।

তা মালীটাকে ডাকলেই পারতে। তুমি নিজে না জল টেনে?

মালীটা কোথায় দেখতে পাচ্ছি না, তাই আমিই দিলুম। তাতে কি হয়েছে?

হবে আর কি, তোমার কষ্ট হলো এই যা।

দাদার জন্যে না হয় একটু কষ্ট করলুম।

এমনি আর একদিন। হাটে গিয়াছিলাম। হাটটা বেশ কিছু দূরে ছিল। বেশ কয়েকটা জিনিস কিনিয়া আমরা দুজনে যখন ঘরে ফিরিলাম, তখন গরমে

আমি খুব ঘামিতেছি দেখিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘর হইতে পাখা আনিয়া অনুরাধা আগে আমাকে ও পরে চিন্ময়কে বাতাস করিতে গেলে সে বলিয়া উঠিল, থাক থাক, তোমাকে আর হাওয়া করতে হবে না, এত কষ্ট করে। তার চেয়ে বরং তাড়াতাড়ি একটু চা খাওয়াও।

সুলতা বলিল, কষ্ট কি, আপনারা ওর বড় ভাইয়ের তুল্য। গুরুজন। করুক না একটু। এটা ওর অভ্যাস। ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখেছি, ওর বাবা দাদা যখনই বাইরে থেকে ঘেমে ফেরে, ও আগে গিয়ে পাখা নিয়ে ছুটে যায়।

এবার চিন্ময় বলিল, আমার দরকার নেই। তার চেয়ে বরং ও একটু চা করে খাওয়াক।

সুলতা বলিল, ও আলোকদা কি ভীষণ ঘেমেছেন! মিছিমিছি এত দূরে হাটে গিয়ে এত জিনিষ কিনে কেন আনলেন ভাই।

চিন্ময় টপ্ করিয়া বলিল, দাদাদের কি ইচ্ছে হয় না বোনেদের জন্য কিছু আনতে। তাহলে বোনেরা দাদাকে ভালবাসে না! কি বল আলোক।

আমি জবাব দিলাম, সেকথা কোন্ মুখে বলি—যেভাবে বোনেদের সেবা যত্ন এখনো পাচ্ছি! হাসি চাপিয়া এবার অনুরাধা তাহার বাতাস বন্ধ করিয়া দিল। সত্যি আমার যেন লজ্জা করিতেছিল। অনুরাধা তখনো একা আমায় হাওয়া করিতেছিল, আমি বেশী ঘামিয়াছি বলিয়া।

থাক থাক, আর হাওয়ার দরকার নেই। আমার ঘাম জুড়িয়ে গেছে।

এবার অনুরাধা পাখা ফেলিয়া বলিল, ক'কাপ চা করবো বৌদি?

ক'কাপ কেন, আমাদের সকলের জন্যেই করবি।

না—না—আমি খাবো না। আমার জন্যে করো না। সকাল থেকে তিন কাপ হয়ে গেছে, আমি বলিলাম।

আমাকে বাদ দিয়া একটু পরে সকলের জন্যে চা আনিল।

অনুরাধা তারপর একটা গ্লাসে চিনির সরবৎ লেবু দিয়া করিয়া আনিয়া আমার হাতে দিল।

ওটা আবার কি? চায়ের কাপ হইতে মুখটা সরাইয়া চিন্ময় ভ্রূ কুঁচকাইয়া প্রশ্ন করিল।

অনুরাধা বলিল, চিনির সরবৎ।

ও! আমি বুঝি খেতে জানি না। তোমার এই একচোখোমি কিন্তু ভাল নয়। সুলতা, তোমার এ ননদটির কিন্তু বেশী পক্ষপাতিত্ব একজনের দিকে, লক্ষ করেছ?

সুলতা হাসিয়া উঠিল, আপনি ত দাদা আগেই চা চেয়ে বসলেন। ওর কি দোষ?

চা না খেলে সরবৎ করে দেবে জানলে, কখনই চা চাইতুম না!

এই রোদে তেতে পুড়ে এসেছে যে মানুষটা, আমরা ওঁর সামনে চা খাবো আর উনি শুকনো মুখে বসে থাকবেন!

কেন ঠাণ্ডা জল কি ছিল না কলসীতে?

কিন্তু উনি ত তা চাননি?

তাই না চাওয়ার পুরস্কার। একেই বলে সবুরে মেওয়া ফলে? বলিতে বলিতে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

সেদিন আলোককে ও নিয়ে গেল স্নান করাতে কুয়োতলায়। ওখানে যে এত সুন্দর স্নানের ব্যবস্থা আছে—সেকথা আমাকে ত বলতে পারতো।

ওখানেও সেই এক কথা। আগ বাড়িয়ে সব কিছু নিতে নেই, সবুরে মেওয়া ফলে। এখন বলছেন কেন! আপনার দেরী দেখে অপেক্ষা করে করে শেষে আলোকদাকে নিয়ে যাই ওখানে।

বেশ, এবার থেকে তাই করবো।

॥ উনচল্লিশ ॥

সেদিন কালীপুজো। ওখান থেকে বেশ একটু দূরে রামকৃষ্ণ মিশনের পুজো।

কথা ছিল রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর্ব মিটিলে, আমরা সবাই একসঙ্গে ঠাকুর দেখিতে যাইব। কিন্তু হঠাৎ মিঠুনের গা গরম দেখিয়া সুলতা ও নিরাপদবাবু যাইতে রাজী হইলেন না। চিন্ময় ততক্ষণ বিছানায় গা ঢালিয়া দিয়াছিল। সে সাহেব মানুষ, ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বাস করে না, পুরুষকার ছাড়া কিছু মানে না। অনুরাধা আসিয়া আমায় বলিল, আলোকদা, আপনি যাবেন আমার সঙ্গে, পুজো দেখতে? বৌদিকে জিজ্ঞেস করেছি। বৌদি বললেন, আপনাকে বলতে, নইলে আমার যাওয়া হবে না। একদম দেরী হবে না। দর্শন করে আমার মানতের পয়সাটা দিয়ে আসবো।

বলিলাম, কিসের মানত তোমার জিজ্ঞেস করলে, তুমি রাগ করবে না?

হ্যাঁ করবো। কারণ আগে বললে কোন ফল হয় না!

যাইহোক টর্চটা নিয়ে তখনি আমরা দুজনে সেই অন্ধকারে রওনা হইলাম। অনুরাধাই পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিতে ছিল। কিছুদূর যাইয়া বোধ হয় আমাকে একদম চুপচাপ দেখিয়া সে বলিল, আচ্ছা, আপনি কেন আমায় অনুরাধা বলে ডাকেন—চিন্ময়দা বা অন্য সকলের মত আমায় অনু না বলে? একটু নীরব থাকিয়া বলিলাম, এই সুন্দর নাম একমাত্র তোমাকেই মানায়।

যান বাজে কথা বলবেন না। তা যদি হতো তাহলে অন্য কেউ এ নামে ডাকে না কেন? সবাই জানে, আমি কালো কুচ্ছিত। কানা ছেলের নাম পদ্ম-লোচন যাকে বলে, তাই। আপনি আর অনুরাধা বলে ডাকবেন না। আমার মনে হয় যেন বিদ্রূপ করছেন।

অনুরাধা আমার সম্বন্ধে তুমি যা খুশি ভাবতে পার, কিন্তু তুমি আমার চোখে সুন্দর, জেনো। আমি ওই সুন্দর নাম ছেড়ে অন্য নামে ডাকতে পারবো না কিছুতে।

অনুরাধা চুপ করিয়া যেন কি ভাবিতে ছিল। কিছু বলিবার আগেই আমরা একেবারে রামকৃষ্ণ মিশনে পৌঁছিয়া গেলাম।

অনুরাধা প্রতিমার সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া আগে প্রণাম করিল। তারপর একজন মহারাজের হাতে পুজোর জন্য পয়সা দিয়া চলিয়া আসিল।

পথে বাহির হইয়া কয়েক পা যাইতেই আমি প্রশ্ন করিলাম, এবার তো বলতে বাধা নেই, কিসের জন্যে মানত করেছিলে?

না-না, জিজ্ঞেস করবেন না। সেকথা শুনে আপনি হয়ত হাসবেন। সে খুবই সামান্য ব্যাপার!

হোক সামান্য। তবু এই অন্ধকারে এতদূরে এসে যে পুজো দিলে, ঠাকুরের নামে মিথ্যে বলতে নেই!

ঠাকুরের নাম করিতে আর না বলিতে পারিল না। অনুরাধা বলিল, এর আগে কখনো হাওড়া স্টেশন চোখে দেখিনি এবং কোনদিন যে দেখতে পাবো সে আশাও ছিল না। তাই মা-কালীর নামে মানত করেছিলুম যেন বৌদির সঙ্গে যাওয়া হয়! আপনাকে বললে বিশ্বাস করবেন না, বৌদি যেদিন বললে, মাসীমা বলেছেন, তুই আমার সঙ্গে যাবি—সারারাত আনন্দে ঘুমোতে পারিনি!

বলিলাম, তাহলে আশা পূর্ণ হয়েছে?

সত্যি, এত আনন্দ যে বাইরে তা ভাবতে পারিনি!

অন্ধকারে যাইবার সময় চোখে পড়ে নাই। এখন হঠাৎ চামেলীর সুমিষ্ট গন্ধ নাকে আসিতেই অনুরাধা বলিয়া উঠিল, দাঁড়ান, আলোটা একটু ওদিকে ফেলুন না।

সত্যি দেখি অদূরে একটি চামেলী গাছের ঝোপ, তাতে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া আছে।

অনুরাধা আনন্দে বলিয়া ফেলিল, আমায় দুটো ফুল পেড়ে দিন না।

গাছটা তার নাগালের বাইরে ছিল। পুরনো খুব বড় গাছ। আমি আলো ফেলিয়া পিছন দিক হইতে একটা ফুল শুদ্ধ ডাল ভাঙিয়া আনিলে সে হাত বাড়াইয়া বলিল, দিন।

আমি হাতে না দিয়া সেটা অনুরাধার লম্বা বেণীর মূলে জড়াইয়া দিয়া বলিলাম, বাঃ কি সুন্দর মানিয়েছে!

হ্যাঁ, বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা যেমন! খুলে ফেলুন শিগগীর বলছি। কণ্ঠে রাগ ও অভিমান।

আমার কথা বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না। আচ্ছা তুমি নিজে আয়নায় দেখো। তারপর আমায় বলো।

হ্যাঁ, নিজের দেখা হয়েছে—আরো সকলকে না দেখালে বুঝি আশ মিটছে না, বলিয়া মাথায় হাত দিয়া যেই খুলিতে গেল, আমি তার হাতটা টানিয়া

লইয়া অনুরোধ করিলাম, ফেলো না প্লিজ, অন্ততঃ বাড়ি পর্যন্ত মাথায় দিয়ে থাকো। ঘরে ঢোকবার আগে ফেলে দিয়ো।

হঠাৎ অনুরাধা নীরব হইয়া গেল। আমিও আর কিছু না বলিয়া তার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলাম। টর্চের আলোয় তার সেই বেণীটি পিঠে—নীলাম্বরী শাড়ীর উপর হইতে যেন দুলিয়া দুলিয়া আরো মধুর গন্ধ অন্ধকার ভেদ করিয়া আমার নাকে আসিতে লাগিল।

বাড়ির কাছে আসিয়া সে তেমনি ভাবেই আবার বলিয়া উঠিল, আমি কিন্তু সত্যি সত্যি ফেলে দিচ্ছি, আপনি রাগই করুন আর যাই করুন। বলিয়া বেণী হইতে সেটা টান দিয়া খুলিয়া দরজার বাইরে ফেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল।

পরদিন ভোরে উঠিয়া চা দিতে আসিয়া সে চায়ের পেয়ালাটা টেবিলের উপর রাখিয়া চাপা স্বরে বলিল, ছি ছি, আপনি এটাকে ধুলো থেকে কুড়িয়ে এনে বিছানায় রেখেছেন?

হ্যাঁ, সারারাত এর গন্ধে আরামে ঘুমিয়েছি।

এবার রাগ চাপিতে চাপিতে সেই ফুলের ডালটি বিছানা হইতে টানিয়া লইয়া, আমার সামনে ছিঁড়িয়া দুহাতে চটকাইয়া জানলা দিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া দিতে দিতে অস্ফুট স্বরে বলিল, সারাটা পথ মাথার ফুলের গন্ধ শুঁকে বুঝি মন ভরেনি, তাই আমার আড়ালে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে বিছানায় নিয়ে সারারাত ঘুমুচ্ছিলেন, আমায় বুঝি সকলের কাছে হেনস্থা করার জন্যে! ভাগ্যিস চিন্ময়দার এখনো ঘুম ভাঙেনি! নইলে আর একটু দেরী হলে এ ঘরে ঢুকে এই ফুলটা চোখে পড়লে, বাঃ কি মিষ্টি গন্ধ বলে যখন নাকের কাছে তুলতেন, তখন কি সর্বনাশটা হতো!

কি হতো, তোমার কাঁচা মাথাটা কেটে নিতেন। তোমার এত ভয় কিসের চিন্ময়কে, বুঝতে পারি না। বাস্তবিক পক্ষে তুমি তো ওটা আমায় দাওনি। ফেলে দিয়েছিলে রাস্তায়। তাছাড়া চিন্ময় জানে, আমি কি রকম ফুল ভালবাসি!

আমার মুখের কথা কাড়িয়া কণ্ঠে বিদ্রূপ চাপিয়া আরো নীচু গলায় কহিল, বাস্তবিক পক্ষে সেটা যা বলেছেন ঠিক-ই। কিন্তু ফুলের সঙ্গে মেয়েদের মাথায় লম্বা চুল দেখলেও কি আপনাকে ভাল বলতেন?

চমকিয়া উঠিলাম, তাম মানে?

মানে আপনি এত ফুল ভালবাসেন যে তার সঙ্গে আমার মাথার যে লম্বা চুল জড়িয়ে গিয়েছিল, তা দেখতে পাননি। তাই আপনার বন্ধুর যে রকম তীক্ষ্ম দৃষ্টি, যদি গন্ধ শুঁকতে গিয়ে তা দেখতে পেতেন, তা হলে কি হতো ভাবতে গেলে বুকের ভেতরটা যেন হিম হয়ে যায়।

আমাকে কোন উত্তর দিতে না দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, জানি আপনার

তাতে কিছু এসে যায় না কিন্তু ভুলে যাবেন না, আমি যত কুচ্ছিত হই না কেন একটা মেয়ে, কুমারী মেয়ে। বলিয়া দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

॥ চল্লিশ ॥

একদিন সন্ধ্যের বেশ খানিকটা পরে, হঠাৎ ফেউ ডাকিয়া উঠিল। সর্বাগ্রে কুকুরগুলো ভয়ে লেজ খাড়া করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তাদের ঘেউ ঘেউ ডাকের সঙ্গে লোকের বাড়ির দরজা জানলাগুলো বন্ধ করিবার খটাখট শব্দে চারি দিকের বনজঙ্গল ও অন্ধকার যেন কেমন একটা আতঙ্কে থমথম করিতে লাগিল। অনুরাধা, সুলতা ও নিরাপদবাবু সবাই এঘরে ওঘরে ছুটিয়া গিয়া ধপাধপ জানলার কপাটগুলো বন্ধ করিয়া দিতেই সুলতার ছেলেটা মিঠুন, সজোরে কাঁদিয়া উঠিল। মা বড্ড ভয় করছে। বাঘ আসছে!

ভয় কি! এই তো আমরা সবাই রয়েছি। বুড়ো মালী সূর্যপাল তখনি একটা ধারালো বর্শা লইয়া ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। অনুরাধাও তার পিছনে পিছনে দোর খুলিয়া বাহির হইতেই সুলতা চেঁচাইয়া উঠিল, এই পোড়ারমুখী যাসনি। ঢের দস্যিপনা হয়েছে। শেষকালে বাঘের মুখে মরবি নাকি?

মরলে ত বাঁচি। একটা কন্যা-দায় থেকে মা বাবা রেহাই পান।

ইহা শুনিয়া আমিও বাহির হইয়া আসিলাম—অনুরাধা, অনুরাধা, ছিছি ফিরে এসো, সকলে এত করে নিষেধ করছেন! আশ্চর্য, বাঘকেও তুমি ভয় করো না। দেখছো ফেউ ডাকছে, লোকেরা সব ঘরের মধ্যে আতঙ্কে কাঁটা হয়ে আছে।

থাক দাদা, আপনি অন্ধকারে আর বেরুবেন না। মালীটা, সূর্যপাল আমাদের পাহারা দিচ্ছে। মালীটা জানেন, ও একদিন সত্যি সত্যি ডাকাত দলের সর্দার ছিল। ভয় ডর কাকে বলে জানে না। বালিয়া জেলায় ওর দেশ। অনু ত ওর চেলা! বুড়ো বলে, বাঙ্গালীর মেয়ের এত সাহস কখনো দেখেনি।

ফিরিয়া আসার কিছু দিন আগে। আমি ঘুমাইতেছিলাম। দুপুর বেলা। অনুরাধা ঘরে ছিল না। হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙিয়া যাইতে দেখি, চিন্ময় ঘরে নাই। একটু পরে পাশের ঘর হইতে আমার কানে আসিল, চাপা গলায় সুলতার সঙ্গে কি যেন বলিতেছে চিন্ময়।

দাদা, আপনি একটু চেষ্টা করলেই, গরীবকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। আপনার এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেবল না, তার চাকরি করে দিয়েছেন। আপনার জন্যেই আজ সে দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া তার শরীর ভাল হবে বলে বন্ধুকে সঙ্গে করে বিদেশে নিয়ে এসেছেন, এত উপকার যে করেছে, তার কথা কখনো ফেলতে পারবে না। আপনি যদি একটু জোর করেন তাহলে একটা

গরীবের সত্যিকারের উপকার হয়। ওর ওপরে আরো দুটি বোন আইবুড়ো। মেসোমশাইর রোজগার সামান্যই। ছেলেটা বিয়ে করে বেকার বসে আছে। দু' বেলা পাঁচ ছ'টা ছেলে পড়িয়ে যা পায়, তাই দিয়ে কোন রকমে সংসার চলে। তাছাড়া সত্যিকারের ভাল মেয়ে অনু—দেখলেন ত এত দিন, একই ঘরে এক-সঙ্গে থেকে আপনার বন্ধুও ত নিজে চোখে দেখলেন। গায়ের রংটা ময়লা, সেটা ভগবানের হাত, নইলে এমন সর্বগুণের মেয়ে আজকাল দেখা যায় না। লেখাপড়া স্কুল কলেজে করেনি বটে, কিন্তু লাইব্রেরিতে ভাল ভাল বই দিন-রাত পড়ে। লাইব্রেরির আট আনা পয়সা চাঁদা দেবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু ওদের ওপরতলায় ভাড়া থাকেন যে ভদ্রলোক তিনি আপিস লাইব্রেরি থেকে দু'খানা করে বই আনেন। প্রতিদিন একখানা শেষ করে তবে ঘুমোতে যায়।

চিন্ময় বলিল, বোনটি, আমায় জেনে শুনে একটা মেয়ের এতবড় সর্বনাশ করতে বলো না। সুন্দর ছাড়া যে কিছু বোঝে না, চায় না, তাকে বলতে গিয়ে মিছিমিছি নিজে অপমানিত হওয়া। তার চেয়ে বরং আমায় নিজে বল তো বিয়ে করতে রাজী আছি।

সুলতা হাসিয়া উঠিল, সত্যি ঠাট্টা নয়।

আমাদের ছুটি শেষ হইতে আর দু'দিন তখন বাকী, হঠাৎ সুলতাদের আদরের পুত্র মিঠুন অসুস্থ হইয়া পড়িল। প্রবল জ্বর তেমনি বমির ভাব, কিছু খাইতে পারে না। কিছু মুখে দিলেই তৎক্ষণাৎ বমি করিয়া ফেলে। সকলেরই দুশ্চিন্তার শেষ নাই। কেবল মিঠুনের মা বাবার নয় ; সেই সঙ্গে আমাদেরও। বিদেশ-বিভুঁই জায়গা। একেবারে গ্রাম্য পরিবেশ। স্টেশনের কাছে একজন ডাক্তার থাকেন। সেখান হইতে ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়া আনিতে ছুটিলাম আমি ও চিন্ময়। ডাক্তার আসিয়া রুগীকে পরীক্ষা করিয়া ওষুধ দিয়া গেলেন বটে কিন্তু তাহাতে তেমন ফল হইল না। রাত্রের দিকে জ্বর বাড়িয়া একশো চার ডিগ্রী হইতে সকলেই ভয় পাইয়া গেলাম। মাঝে মাঝে ভুল বকুনি। সারারাত কারো চোখে ঘুম নাই। অনুরাধা মিঠুনের মাথার কাছে বসিয়া জল-পটি দিয়া পাখার হাওয়া দিতে দিতে প্রায় শেষ রাতে জ্বরটা কমিয়া একশো হইতে সকলেই যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।

কিন্তু সুলতা আর থাকিতে চাহিল না। তখনো দু'মাসের আরো নয় দিন বাকী। বলিল, আমাদের সঙ্গেই কলিকাতায় চলিয়া আসিবে।

ট্রেন রাত্তির ন'টায় কিন্তু আমরা সন্ধ্যার পূর্বেই স্টেশনে পৌঁছাইব স্থির করিয়াছিলাম, যাহাতে মিঠুনের না ঠাণ্ডা লাগে। যদিও সকালেই তার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল, বমির ভাবও আর ছিল না—সকলের মনেই আবার আগের মত হাসি-খুশি ফিরিয়া আসিয়াছিল।

সন্ধ্যার আগেই তিনটি গরুর গাড়িতে মালপত্র লইয়া আমরা যাত্রা করিলাম। আমার মনে হইতেছিল যেন স্বর্গ হইতে বিদায় লইলাম। প্রথম গাড়িটায় আমি

চিন্ময় ও নিরাপদবাবু, দ্বিতীয়টিতে সুলতা, অনুরাধা ও মিঠুন, পিছনেরটায় মালপত্তর লইয়া সুর্যপাল।একটু যাইতেই, আমি ছইয়ের ভিতর হইতে বলিলাম, এই গাড়োয়ান, থামাও, থামাও। আমাদের গাড়িটা থামিতেই সঙ্গে সঙ্গে পিছনের দু'টিও থামিয়া গেল।

কি হয়েছে আলোক, কিছু ফেলে এসেছিস নাকি?

হাঁ ভাই! চটিটা আনতে ভুলে গেছি—বলিয়াই যেমন গাড়ির পিছন থেকে রাস্তায় লাফ দিয়া নামিলাম, অমনি সুলতা ছই হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, কি হয়েছে—

ভাই, আমার চটিটা হোল্ডলে জায়গা ছিল না বলে পরে আলাদা কাগজে জড়িয়ে নেবো ভেবেছিলুম। তারপর তাড়াতাড়িতে ভুলে গেছি।

সুলতা বেশ জোরে হাসিয়া উঠিল, অনুরাধা লজ্জায় সে কথাটা আমায় না বলিয়া, আস্তে আস্তে সুলতাকে বলিল, আমার সুটকেসে অনেক জায়গা ছিল, তাই ওর মধ্যে নিয়েছি! আলোকদার বেডিং, সুটকেশ গাড়িতে উঠে যাবার পর ওটা হঠাৎ আমার চোখে পড়ে, খাটের নিচে রয়েছে—

আচ্ছা মানুষ তুই। সব সময় কি রঙে থাকিস!

চিন্ময় মুখে একথা বলিল বটে কিন্তু মনে যেন রাগিয়া উঠিল। তার কণ্ঠের ঝাঁজ আমার কাছে লুকাইতে পারিল না। আমায় ধিক্কার দিয়া বলিল, ছিঃ, ওই মেয়েটা মুখে কিছু বলে না তাই তোর পায়ের জুতোটা তাকে দিয়ে বওয়ালি! তোর লজ্জা করে না। না—না—দ্যাট্স্ ভেরী ব্যাড। তোকে আমি সঙ্গে এনেছি ভুলে যাসনি। এতে তোর নয় আমার অপমান।

নিরাপদবাবু বোধ করি তাহাকে এতখানি গরম হইতে কোনদিন দেখেন নাই। তিনি শান্তকণ্ঠে কহিলেন, দাদা, এতে রাগের কি আছে। ছেলেমানুষ, ও তো আনন্দ করেই দাদার চটি জোড়াটা নিজের সুটকেশে নিয়েছে। ভালই করেছে।

যত তুমি মুখে বলো আমি কিন্তু এতে রীতিমত অপমান বোধ করছি। অনি কি ভাবছে বলো তো? তাকে দিয়ে শেষে পায়ের জুতো বওয়ালে! ওর উচিত ছিল ওটা ফেলে দিয়ে আসা। তাহলে উপযুক্ত শিক্ষা হতো। ভাব-রাজ্যে ডুবে থাকার শাস্তি হতো। নেহাত ভাল মানুষ মেয়েটা, মুখে কিছু না বলে মনে মনে সব হজম করেছে। আমি সব বুঝতে পারি।

স্টেশনে ওয়েটিং রুম-এ যাইতেই চিন্ময় অনুরাধাকে বলিল, ফেলে দাও তো ওর চটিটা! তার কণ্ঠে যেন চাপা প্রতিহিংসার সুর। যেন কেহ বুঝিল না!

সকলে যখন নীরবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছিল, তখন মিঠুন চিন্ময়ের দিকে আঙ্গুল তুলিয়া বলিল, এই দুষ্টু! ওকে বকছো কেন?

এবার সকলে হাসিয়া উঠিল একসঙ্গে, আমিও হাসি চাপিতে পারিলাম না।

চিন্ময় এবার বলিয়া উঠিল, তুই আর হাসিস নি!

আচ্ছা, এখন একটা ভাল সিগারেট খাওয়াও!

এবার হাসি ফুটিল চিন্ময়ের মুখে! প্যাকেট খুলিয়া একটা আমায় দিয়া, নিজের মুখে আগুন নিয়া সেই কাঠি আমার মুখে ধরিল।

॥ একচল্লিশ ॥

সুরিয়া হইতে ফিরিয়া আসিবার পূর্বে বুঝিতে পারি নাই কেমন করিয়া অনুরাধা তার প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়া আমার সম্পূর্ণ মনটাকে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। বড় শিল্পীর আঁকা ছবি যেমন কাছের চেয়ে দূর হইতে দেখিলে আরো ভাল বোঝা যায়, ছোট খাটো রেখার আড়ালে, তুলির টানে কোথায় কোন্ ভাবের কত গভীরতা চোখের সামনে সব জীবন্ত হইয়া উঠে, তেমনি যত দিন যাইতে থাকে, অনুরাধার ছোটবড় প্রতিটি কাজের ভিতর হইতে বিশেষ করিয়া আমার প্রতি তাহার মনে যে অনুরাগ প্রচ্ছন্ন ছিল, সব যেন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া আমায় কেমন বিভ্রান্ত করিয়া তোলে। কোন কাজে মন বসাইতে পারিতাম না। কিছু করিতে ভাল লাগিত না। সব সময় অনুরাধার চিন্তাতে মন বিভোর হইয়া থাকিত!

মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। নিজের মন দিয়া বোধহয় অপর মেয়ের মনের গভীরে সহজেই ঢুকিতে পারে। সুলতা তাই আসিবার কয়েক-দিন আগে, আমার সঙ্গে অনুরাধার বিবাহের জন্য চিন্ময়কে এত অনুরোধ করিয়াছিল কেন বুঝি নাই। পাশের ঘরে আমি ঘুমাই নাই, শুনিয়াছিলাম। চিন্ময় আমি রূপের পিয়াসী বলিয়া সেদিন এক কথায় তাহা নাকচ করিয়া দিলেও সুলতার মন কিন্তু তাহাতে সায় দেয় নাই।

বাস্তবিক যতদিন অনুরাধা চোখের সামনে ছিল, বুঝিতে পারি নাই যে কলিকাতায় ফিরিলে তাহার অদর্শনে চারিদিক এত শূন্য মনে হইবে।

কতক্ষণে আবার তাহাকে চোখে দেখিব, তাহার কাছে যাইতে পারিব, সেই এক চিন্তা সদাসর্বদা মনকে অস্থির করিয়া তুলিত! সে এক অদ্ভুত মানসিক অবস্থা! আপিসে যাইতে হয়, তাই যন্ত্রচালিতের মত কোন রকমে কাজ করিয়া ফিরিয়া আসি। কিন্তু বোর্ডিংয়ের ঘরে ঢুকিবামাত্র সেই শূন্য ঘরটা যেন আরো শূন্য মনে হইত। কি যেন ছিল, সব হারাইয়া ফেলিয়াছি। তখনি সমস্ত মন আকুল হইয়া উঠিত তাহাকে দেখিবার জন্য। সে যাইতে বলে নাই। চিন্ময়ের সূত্রে পরিচয়। তাই চিন্ময়ের সঙ্গে ছাড়া একা যাওয়া হয়ত শোভন হইবে না, বিশেষত সে কুমারী মেয়ে আর আমি অবিবাহিত, তাহার বাড়ীর লোকেরা কি ভাবিবে! চিন্ময় হয়ত রাগ করিতে পারে। তার চেয়ে আমার হিতৈষী আর কে আছে! তাই চিন্ময় যেদিন যাইবে নিশ্চয় আমায় ডাকিতে আসিবে। এই ভাবিয়া তাহার অপেক্ষায় দিন গুনিতাম।

ওঃ সে কি ভীষণ যন্ত্রণা! এক একটা দিন যেন আমার কাছে এক-একটা

যুগ বলিয়া মনে হইত।

সেই সময় হঠাৎ রাণীদির কথাটা মনে পড়িয়া যায়, একদিন তিনি বলিয়া-ছিলেন যথাযথ প্রেমের যাচাই করিবার একমাত্র কষ্টিপাথর পুরুষের পক্ষে যেমন অন্য মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, ঠিক তার উল্টোটা হইল মেয়েদের।

সেদিন একথাটা শুনিয়া রাগ হইয়াছিল, রাণীদিকে যা-তা বলিয়াছিলাম। কিন্তু সে যে কতবড় সত্য নিজে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া তাঁর উদ্দেশে তখন বারংবার প্রণাম করিয়াছিলাম।

বাস্তবিক, ইতিপূর্বে আর কখনো একটি তরুণীর সঙ্গে একই ছাদের নীচে একত্র এতদিন বাস করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। ইহাই জীবনে প্রথম। একেবারে উদয়-অস্ত, ওই ভাবে তাহার হাতের স্পর্শ প্রতিটি কাজেও আর কখনো পাই নাই এমন করিয়া। ভোরে ঘুম ভাঙাইয়া বেড্-টি দেওয়া হইতে রাত্রে মশারীর দড়ি টাঙ্গানো কেবল নয়, খাওয়া-দাওয়া স্নান-বেড়ানো প্রভৃতি সর্বব্যাপারে এমন ঘনিষ্ঠভাবে একটি মেয়ের অন্তর বাহির দেখিবার সুযোগও আমার জীবনে এই প্রথম। একদিন অনুরাধার কেশের সৌরভ, কাঁচের চুড়ির রিনিঝিনি, মৃদু হাসির তরঙ্গ ও তাহার গায়ের গন্ধ নিঃশ্বাসের সহিত দিবানিশি লইবার যে সৌভাগ্য হইয়াছিল, তাহাও আমার কাছে ছিল এক অপরূপ অভিজ্ঞতা! তাই রাণীদির কথাটা মনে পড়িয়া যাইত বারে বারে।

বাস্তবিক কি করিয়া এমন হয়, বুঝিতে পারি নাই। অনুরাধার সেই গায়ের গন্ধ চুলের সৌরভের সঙ্গে চুড়ির রিনিঝিনি হাসি মেশানো বাতাস যেন এখানে আমার বোর্ডিং ঘরে আসিয়া যখন তখন আমায় এরূপ উন্মনা করিয়া তুলিত যে ঘরে টিকিতে পারিতাম না।

এতদিন মনে মনে অহঙ্কার ছিল, আমার সেই বাল্য কৈশোরের সঙ্গিনী শান্তির আসন আমার মন হইতে কেহ কখনো কাড়িয়া লইতে পারিবে না। সে অহঙ্কার এতদিন পরে যেন চূর্ণ করিয়া দিয়া অনুরাধা আমার ভুল ভাঙাইয়া দিল।

রাণীদির উদ্দেশে তাই বারবার প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারি নাই।

যাহোক কোনরকমে আঠারোটা দিন কাটাইবার পর, মন আর ধৈর্য মানিল না। সকল শোভনতার মাথা খাইয়া, একাই একদিন ঠিকানা খুঁজিয়া অনু-রাধাদের বাড়ীর সামনে হাজির হইলাম।

যেমন পুরনো সঙ্কীর্ণ গলি, তেমনি জীর্ণ একটা দোতালা বাড়ীর নিচের তলায় তাহারা ভাড়া থাকিত। তাই বোধ হয় লজ্জায় আসিতে বলে নাই।

একটু থামিয়া বাড়ীর অস্পষ্ট নম্বরটা আর একবার মিলাইয়া লইয়া দরজায় কড়া নাড়িতেই একজন মহিলা দরজা খুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, কাকে চাই?

বলিলাম, অনুরাধা আছে?

হ্যাঁ, তোমার নাম কি জানতে পারি!

বলনু, আলোকদা এসেছে।

ও মা, তুমি আলোক, তোমার নাম ত সব সময় আমার মেয়ে করে। বলে এতদিন এসেছি, একবার এলো না! এসো বাবা, ভেতরে বসো। তাকে ডাকছি।

মিনিটখানেকের মধ্যেই সে ঘরে ঢুকিয়া আমার দিকে তাকাইয়া শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিল, হঠাৎ যে, কি মনে করে?

এমনি। তোমাকে দেখতে! তুমি ত আমায় আসতে বলো নি!

চিন্ময়দাকেও ত বলিনি। তিনি আমি আসার এক দিন পরেই খোঁজ নিতে এসেছিলেন। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে আমার দাদার একটা চাকরি করে দিয়েছেন। ভাল চাকরি। সাহেব এখানে ছিল না। ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিল লক্ষ্ণৌ। সেখানে দাদাকে নিয়ে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়ে চাকরি একেবারে পাকা করে চলে আসেন। সত্যি ওঁর মনের তুলনা হয় না! দাদা আজ পাঁচ দিন হলো আপিস যাচ্ছে।

বলিলাম, তুমি ত জানো, আমার চাকরিও ওর দৌলতে। এমন কি, নিরাপদ-বাবুর চাকরিও উনি করে দিয়েছেন।

জানি। তাই ওঁকে আমি অনুরোধ করেছিলুম দাদার জন্যে। বসুন। আমি মাকে চা করতে বলে আসছি।

ঘরের ভিতরটা দেখিলেই বোঝা যায় কত দারিদ্র্য। একটা পুরনো হাতল ভাঙা চেয়ার, আর তার সামনে একটা ছোট আরো পুরনো টেবিল, তার ওপর কতগুলো বইখাতা ছড়ানো। এছাড়া একটা তক্তাপোষ। আসবাব বলিতে শুধু এই।

আমি তক্তাপোষের উপর বসিয়াছিলাম। অনুরাধা আসিয়া বলিল, ওখানে বসবেন না। চেয়ারটায় বসুন।

চেয়ারে বসিয়াছি এমন সময় ওর মা ঘরে আসিলে তাঁকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, বাবা, মেয়ে একে-বারে তোমার জন্যে হেদিয়ে যাচ্ছে। বলে, একবারও এলেন না। বোধহয় ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছেন।

চুপ করো মা। না—না আমার বয়ে গেছে, মার কথা বিশ্বাস করবেন না। চিন্ময়দা ঠিকই বলেন, যতক্ষণ তুমি ওর সামনে আছো তোমার হাতে আকাশের চাঁদ তুলে দেবে। তারপর বাইরে গেলে আর মনে থাকবে না।

বাস্তবিক, বাবা, চিন্ময়ের মত এমন ভাল ছেলে দেখা যায় না! আজ আমার ছেলের চাকরি করে দিয়ে আমাদের যে কত বড়-উপকার করেছে তা মুখে বলে বোঝাতে পারবো না। ভগবান ওর ভাল করুন। আমরা গরীব, আমাদের সারা পরিবারকে আজ বাঁচিয়ে দিয়েছে, আমার ছেলের চাকরি করে দিয়ে।

চুপ করো মা। উনি সব জানেন, তোমাকে আর বেশী বলতে হবে না।

তিনি তখনি ভিতরে চলিয়া গিয়া দু কাপ চা আনিয়া দিলেন আমাদের। আমার চায়ের সঙ্গে দুখানা থিন্ এরারুট বিস্কুট ছিল। বলিলাম, মাসিমা,

এটা নিয়ে যান, আমি কেবল চা-ই খাবো।

অনুরাধা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, আজ প্রথম এলেন, একেবারে শুধু চা খাবেন, তা হয় না। গরীবের ঘরের খুদ কুঁড়ো।

দেখো, ওকথা বলো ত নিশ্চয় খাবো। কিন্তু আর কোন দিন আমার সামনে ওকথা উচ্চারণ করো না। তাহলে আর আসবো না বলে দিলুম।

আচ্ছা আর বলবো না। আগে বিস্কুটটা খান ত?

কথা বলিতে বলিতে দুজনের চায়ের কাপ যখন প্রায় শেষ এমন সময় হঠাৎ চিন্ময় প্রবেশ করিল। হাতে একটা গ্রেট্ ইস্টার্ন হোটেলের বাক্স কেক্ লইয়া। আমায় দেখিয়া সে যেন চমকিয়া উঠিল, আরে আলোক যে, আচ্ছা ছেলে ত তুই, এতদিন পরে তোর সময় হোলো! আশ্চর্য, যার হাতে এত সেবা যত্ন খেয়ে এলি এতদিন ধরে, তাকে একেবারে ভুলে গেলি! দেখলে অনু, যা বলেছি ওর সম্বন্ধে মিলিয়ে পাচ্ছো তো?

অনুরাধা বলিয়া উঠিল, তাছাড়া আপনি বলেছিলেন আলোকদা রূপের পূজারী। এখানে তাই আসবেন কিসের টানে!

এই সময় অনুরাধার মা সেখানে আসিলে চিন্ময় কেক-এর বাক্সটা তাঁর হাতে দিয়া বলিল, এতে ভাল কেক আছে, অনুরাধার জন্যে এনেছি।

হাতে বাক্সটা লইয়া তিনি বলিলেন, কেন তুমি রোজ রোজ এত খরচ করে খাবার-দাবার আনো ওর জন্যে!

কি বলছেন মা, ওর হাতে এত খেয়ে এলুম কিন্তু এমনই খোট্টাদের দেশ যে কোন কিছু ভাল খাবার পাওয়া যায় না সেখানে। কিছুই খাওয়াতে পারিনি!

আচ্ছা বসুন আপনি, আমি এখুনি চা করে এনে দিচ্ছি। বলিয়া অনুরাধা ভিতরে চলিয়া গেলে, আমার যেন নিজেকে অবাঞ্ছিত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাছাড়া চিন্ময়ের জন্য নিজে চা করিতে গেল। অথচ আমার বেলায় সেকথা একবারও মনে হইল না। ইহাকেও যেন কেমন ইচ্ছাকৃত অবহেলা মনে হইল, যাহোক একটু পরে চায়ের সঙ্গে একটা ডিসে কয়েকটা কেক্ লইয়া আসিলে, আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম, আচ্ছা তাহলে আমি এখন উঠি।

চিন্ময় বলিল, সেকি, এর মধ্যে উঠবি কি! আর একটু বোস।

একটা বিশেষ কাজ আছে, আমায় এখুনি যেতে হবে। দরজা দিয়া সিঁড়ি হইতে রাস্তায় নামিতেই অনুরাধা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, আবার কবে আসছেন?

দেখি, কবে সময় হয়। বলিয়া দ্রুত গলি ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

সেদিন যে অনুরাধার আচরণটা ইচ্ছাকৃত, বিশেষ করিয়া চিন্ময়ের মত উপকারী মানুষকে খুশি করিবার জন্য, ইহার পরের সাক্ষাৎকার হইতেই ক্রমশঃ তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। যখনই গিয়াছি দেখি ঘরে ঢুকিবার পূর্বেই সে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

কি ব্যাপার, এখানে দাঁড়িয়ে যে?

সে উত্তর দিত, আপনার জুতোর শব্দটা, আপনি গলির মুখে পা দিলেই, আমি জানতে পারি! আপনার পায়ের শব্দ আমার এত পরিচিত।

বলিলাম, ফেরবার দিন বুঝি সেই জন্যে আমার জুতোটা নিজের বাক্সে ভরে নিয়েছিলে?

অনুরাধা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, বৌদির কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলুম। চিন্ময়দা মিছিমিছি আপনাকে কতগুলো কথা শোনালেন। আমার প্ল্যান মাটি করে দিলে, বলিয়া একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, জুতোটা আমার কাছে থাকলে, ওটা নিতে নিশ্চয় পরের দিন আসতেন আমার কাছে! বৌদি কত ঠাট্টা করল। চিন্ময়দা বড় বে-রসিক কিছুই বোঝেন না।

তারপর একটু ঢোক গিলিয়া আস্তে আস্তে কহিল, বৌদি কিন্তু ধরতে পেরেছেন সব!

কি করে জানলে?

হাঁ, সেইজন্যে নাকি আরো আপনার সঙ্গে আমায় দুপুরে ইচ্ছা করে বেড়াতে পাঠাতেন। একদিন বলেই ফেললেন, আলোকদা যেমন রোমাণ্টিক, তুইও তেমনি। ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন তোর উপযুক্ত দোসর!

কৈ, এ কথা ত তুমি ওখানে কোনদিন বলোনি।

বাবা, পাছে দাদার কানে যায়, চিন্ময়দা শুনতে পান। তাই আমি ভয়ে আপনাকে পর্যন্ত বলিনি। চিন্ময়দা জানতে পারলে, কি ভাবতেন আমাকে!

পরে একদিন অনুরাধার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে, মাসীমা দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলেন, ওরা কেউ বাড়ী নেই, তিন বোনেই গিয়েছে, পাড়ায় ওদের এক বন্ধুর ছেলে হয়েছে। সবে শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে, তাই গিয়েছে ছেলে দেখতে। এখুনি ফিরবে। তুমি ভেতরে এসে বসো ততক্ষণ।

আমি ভিতরে যাইতে তিনি ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া কহিলেন, ভালই হয়েছে ওরা নেই। তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা আছে বাবা!

কি কথা মাসীমা?

এসো ভেতরের ঘরে, বলছি।

ঘরে যাইতে তিনি এইভাবে শুরু করিলেন, সত্যি বাবা, তোমার বন্ধু

চিন্ময়ের মতো ভাল ছেলে হয় না। তুমি ত শুনেছ সব অনুর কাছে প্রণবের চাকরির কথা!

হ্যাঁ মাসীমা শুনেছি।

সত্যি ওর মনের তুলনা হয় না। বড় দাদার মত নিজে টিকিট কেটে খোকাকে এখান থেকে লক্ষ্ণৌ নিয়ে গিয়ে চার-পাঁচদিন হোটেলে থাকতে যত খরচা হয়েছে, সব নিজে পকেট থেকে দিয়েছে। খোকাকে একটা পয়সা খরচ করতে দেয়নি। খোকা ত বলে এরকম মানুষ দেখিনি কখনো। তবে একটা কথা সে খোকাকে বলেছে, তার জীবনটা নাকি বড় দুঃখের, সুন্দরী এম. এ পাশকরা বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে ভীষণ ভুল করেছে। সে ওর ঘর করে না। স্বামীকে মনে মনে ঘেন্না করে, তার চেয়েও নাকি তার শাশুড়ী। একমাত্র মেয়ে তাই নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। স্বামীর ঘর করতে দেয় না। ওর নিজের মা নাকি বলেন, আর একটা গরীবের মেয়ের সঙ্গে আবার ওর বিয়ে দিতে চান।

এইবার একটু থামিয়া বলিলেন, তুমি ত ওর ছেলেবেলার বন্ধু, সবই জানো। তাই তোমাকে আমি চুপি চুপি জিজ্ঞেস করছি বাবা, এটা কি সত্যি!

হাঁ, তবে ওর স্ত্রীর সঙ্গে খুব বনিবনা নেই তা শুনেছি আমি ওঁর মার মুখে। বুঝতেই পারছেন মায়ের মন, ছেলেকে সুখী দেখতে কে না চায়, তাই আবার বিয়ে করতে তিনি বলেন ছেলেকে। কিন্তু তাতে ও নাকি রাজি নয়। তাও শুনেছি তাঁর কাছে। আমাকে এ ব্যাপারে কোন কথা সে বলেনি।

হ্যাঁ, অনির কাছেও নাকি একদিন খুব দুঃখ করেছে, স্ত্রীর কথা বলে। আমাকেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অনেক কথাই বলেছে বাবা। তাহলে যা বলেছে সত্যি, কিছু গোপন করেনি। খোকা, তার বাবা, সকলেরই খুব দুঃখ তোমার বন্ধুর জন্যে। বাস্তবিক কষ্ট আমারও খুব হয়। বলে, আপনাকে আমি মায়ের মত ভালবাসি।

বলিলাম, সত্যি, চিন্ময়ের মনের তুলনা হয় না। যাকে একবার ওর ভাল-লাগে তার জন্যে সব কিছু করতেও প্রস্তুত।

এবার গলাটা থামিয়ে প্রায় চুপি চুপি বলিলেন, খোকার কাছে নাকি লক্ষ্ণৌতে বলেছে, তোমার ছোট বোনটি ভারী চমৎকার। এমন সর্ব গুণের মেয়ে আর কখনো দেখিনি। অনুকে নাকি ওর বিয়ে করার খুব ইচ্ছা, অথচ লজ্জায় আমার কাছে বা ওর বাবার কাছে তা বলতে পারে না।

কর্তার তো ছেলের মুখে শুনে আনন্দ ধরে না। আমায় বলেছেন তাহলে ত অনু রাজরাণী হবে, এই বয়সে চিন্ময় গাড়ী বাড়ী নিজে করেছে, কত বড় চাকরী করে। ওঁর ওকে জামাই করবার এত ইচ্ছে যে এর মধ্যে একদিন গোপনে পাইকপাড়ায় গিয়ে ওর বাড়ীটা কেবল বাইরে থেকে দেখে আসেননি, চাকরটাকে একটা টাকা বকশিশ দিয়ে ভেতরের সব খবরও জেনেছেন। চাকরটা বলেছে, দিনরাত ওদের স্বামীস্ত্রীতে ঝগড়া তর্কাতর্কি, ঘরে অশান্তি, আমারই থাকতে ইচ্ছা করে না, ত সাহেবের দোষ কি। তাই সব সময় বাইরে বাইরে থাকেন

আপিসের কাজ নিয়ে। আবার একটু থামিয়া কহিলেন, উনি মেয়ের মত নিতে বলেছিলেন, হাজার হোক মেয়ের বয়েস হয়েছে ত।

বলিলাম, হাঁ ঠিকই বলেছেন।

কিন্তু বাবা ওর কাছে সেকথা একদিন আড়ালে পাড়তে একেবারে মারমুখী হয়ে উঠলো। বলে, তোমার লজ্জা করে না, তুমি নিজে মেয়ে হয়ে আর একজন মেয়ের জীবন নষ্ট করতে চাইছো! কত বোঝালুম, কতলোক ত এমনি একটা বৌয়ের সঙ্গে বনিবনা না হলে আবার বিয়ে করে সংসারে সুখী হয়। তাছাড়া দোজবরে তোদেরি ত বন্ধুবান্ধবের বিয়ে হয়েছে। তখন মেয়ে ফোঁস করে উঠলো। তাহলে কিছু বলার ছিল না। কিন্তু নিজে মেয়ে হয়ে জন্মে জেনে শুনে আর একটার জীবন এভাবে নষ্ট কিছুতেই করতে পারবো না! তুমি আর কোনদিন ওকথা মুখে উচ্চারণ করবে না, বলে দিলুম! তাই ওর বাবার ও আমার ইচ্ছে, তোমাকে ও মনে মনে খুবই শ্রদ্ধা করে, তুমি যদি একটু ওকে বুঝিয়ে বলো। আমাদের ঘাড়ে তিন তিনটে মেয়ে, ওর ওপরে দুজন রয়েছে আইবুড়ো। যদি একটা ভাল পাত্রে পড়ে, তাহলে আর দুটোর জন্যেও ভাবতে হবে না। তখন ওই চিন্ময়ই নিজে চেষ্টা করে ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করবে!

কথাটা হয়ত ঠিক। কিন্তু মাসীমা আপনার মেয়ে যার বিপক্ষে, সেটার জন্যে অনুকে অনুরোধ করতে আমাকে বলবেন না। আমায় ক্ষমা করুন। বরং চিন্ময়ের উচিত অনুর সঙ্গে কথা বলা যখন সে তাকে নিয়ে ঘর করবে।

তিনিও চুপ করিয়া রহিলেন। বোধহয় এরপর কি বলিবেন ভাবিতে-ছিলেন। তখন আমি বলিলাম, অনু তো আপনার ছোট মেয়ে। সে যখন রাজী নয়, বড় কিংবা মেজ মেয়েদের সঙ্গে কথা বসে দেখুন না। তারা ত ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। আইনত তাদেরই আগে বিয়ে হওয়া উচিত! তাছাড়া ওর সঙ্গে মানাবে-ও!

তোমাকে কি তা বলতে হবে বাবা! বড়র মনে চিন্ময়ের প্রতি একটা সহানুভূতির ভাব লক্ষ্য করে, খোকাকে দিয়ে বলিয়েছিলুম তাকে, কিন্তু তোমার বন্ধু তাতে রাজী নয়। বলেছে, জানা শোনা মেয়ে না হলে আর বিয়ে করবো না। তোমার ছোট বোনকে নিয়ে একসঙ্গে একই বাড়ীতে বাস করে তার সেবা যত্ন ও গুণে মুগ্ধ হয়েছি, ওকে না পেলে ও-কাজে যাবে না।

ঠিক এই সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঘরে আসিয়া ঢুকিল অনুরাধা। কতক্ষণ এসেছেন?

বলিলাম, তা অনেকক্ষণ হয়ে গেল।

মা, তুমি আগে আমায় খবর দাওনি কেন? বুড়ি এই মাত্র আমায় গিয়ে বললে, আলোকদা এসেছে, আমায় ডাকছে। শুনেই আমি চলে এলুম, দিদিরা আসেনি! এই বলিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল, চা খেয়েছেন?

না। তোমার হাতের চা খাবো বলে অপেক্ষা করছি।

যান্। ওই বলে আর আমার মন রাখতে হবে না। চিন্ময়দা ঠিকই

বলেন, যখন যার সামনে থাকেন, আকাশের চাঁদ তুলে দেন যেন তার হাতে, তারপর আড়ালে গেলেই ও আর মনে থাকে না!

সত্যি সত্যি, তুমি কি এটা বিশ্বাস করো অনুরাধা?

হ্যাঁ করি। নইলে সেই যে গিয়েছিলেন, কতদিন বাদে এলেন বলুন ত? ইতিমধ্যে আপনার বন্ধু চারদিন এসেছেন। চিন্ময়দাকে এই জন্যে আমার ভাল লাগে, সাদাসিদে মানুষ, মনের মধ্যে কোন ঘোর-প্যাঁচ নেই। বলেন, তুমি বোধ হয় জাদু জানো, নইলে দু তিনদিন পরেই কোন কাজে আর মন দিতে পারি না, কে যেন পায়ে দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসে তোমার কাছে।

হুঁ। বলিয়া চুপ করিতে অনুরাধা বলিল, কি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন যে, কি ভাবছেন?

ভাবছি তুমি নিশ্চয় চিন্ময়কে বেশী পছন্দ করো, তাই কেবল একা ওকেই জাদু করেছ। আমি তাহলে তোমার কাছে অবাঞ্ছিত।

হাসিয়া বলিল, তাহলে আপনি বিশ্বাস করছেন যে আমি জাদু জানি?

হয়ত করতুম না, কিন্তু চিন্ময়ের টান দেখে, আর বিশ্বাস না করে পারছি না।

মুচকি হাসিয়া অনুরাধা কহিল, যদি অবাঞ্ছিত টবাঞ্ছিত ফের বলেন, তাহলে কিন্তু এমন জাদু চালাবো আপনার ওপর যে টান আপনি সামলাতে পারবেন না। চিন্ময়দার টানের চেয়ে দশগুণ বেশী, একেবারে বন্যার টান যাকে বলে।

তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলাম, দোহাই, শেষকালে প্রাণটা যাবে নাকি ভেসে বন্যার টানে।

যখন একবার বলেছেন, তখন ছাড়বো না আপনাকে, বলিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। আমিও না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। দু'জনে যখন এইভাবে হাসিতেছি, সহসা চিন্ময় ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এত হাসির হল্লা কিসের?

অনুরাধা উত্তর দিল, বলবো কেন? আপনার নামে নিন্দে করছিলুম।

তা বেশ, আরো ভালো করে করো, আমি মার কাছে যাচ্ছি।

এর কয়েকদিন পরে হঠাৎ চিন্ময়ের একটা চিঠি পাইলাম, বোম্বে থেকে লেখা। চিঠিটা এইরূপ। ভাই আলোক, নিশ্চিত জানি আমার এ চিঠি পড়ে খুব অবাক হবি, আমার উপর হয়ত অশ্রদ্ধায় ঘৃণা জন্মাবে। তবু তোকে সব না বলা পর্যন্ত আমি যেন সুস্থির হতে পারছি না। চার পাঁচ রাত্তির ঘুমতে পারিনি, বিশ্বাস কর। একটা কথা কেউ জানে না। বিশেষ করে তোকেও জানতে দিইনি, পারিবারিক জীবনটা আমার কত বিষাক্ত। বড়লোকের সুন্দরী বিদুষী মেয়েকে বিয়ে করে একদিন গর্বের সীমা ছিল না। কিন্তু

বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে যাওয়া যে আমার কতবড় ভুল হয়েছে, কিছু দিন পরেই তার ফল হাতে হাতে পাই। অশিক্ষিত বলে কেবল স্ত্রী মনে মনে ঘৃণা করে না, তার চার ডবল বেশী হেনস্থা করেন তার মা। ধনীর একমাত্র কন্যাকে বিয়ে করা একটা মস্ত অভিশাপ, আমি যেচে তাই মাথায় নিয়েছি। আজ আমার ভিতরটা মরুভূমির মত সর্বদা জ্বলেপুড়ে গেলেও তোকে তা জানতে দিইনি। থাক সে সব কথা। এখন আসল কথাটা তোকে বলি। অনুরাধাকে দেখে এবং বহুদিন তার সঙ্গে এক বাড়ীতে থেকে আমার মনে হয় যদি তার মত একটা স্ত্রী পাই তাহলে হয়ত আমি জীবনে প্রকৃত সুখ শান্তি পেতে পারি আবার। তুইও তো ভাই অনুরাধাকে ওখানে ভাল করেই দেখেছিস। আমার পারিবারিক জীবনের অশান্তির কথা শুনে অনুরাধার বাবা, মা, ভাই, বোন সকলের ইচ্ছা আমি তাকে বিয়ে করে তাঁদের কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করি। আমার মনে হয়, তুইও এবিষয়ে একমত। সকলে জানে প্রণবের আমি ভাল চাকরি করে দিয়েছি। কিন্তু ওর বাবার অনেক ঋণ ছিল তাও সব শোধ করেছি গোপনে তাঁকে টাকা দিয়ে। এটা হয়ত অনেকেই জানে না। ওঁর বিশেষ আগ্রহে আমি সম্মতি দিয়েছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, যাকে পেলে আমি জীবনে সুখ শান্তি ফিরে পাবো বলে এত আশা করছি, তার মনেও কি এমন হয়, আমায় পেলে সত্যি সত্যি সে সুখী হবে! এই কথাটাই তোকে জেনে নিতে হবে, অনুরাধার কাছ থেকে কৌশলে। তোকে ও খুবই মনে মনে শ্রদ্ধা করে আমি জানি!

সর্বনাশ এ চিঠির জবাব আমি তাকে কি দিব। আমিও মনে মনে অনুরাধাকে কত ভালবাসি যদি সে জানিত তা হইলে হয়ত সে কিছুতেই আমায় লিখিতে পারিত না। তার বিশ্বাস টাকা দিয়া সব কিছু পাওয়া যায়। অনুরাধার মা-বাপের তাই এত আগ্রহ বড়লোক জামাই পাইবার আশায়। অনুরাধাও হয়ত মনে মনে কামনা করে চিন্ময়কে, কে জানে!

সারারাত চোখে ঘুম আসিল না। অনেক চিন্তা করিয়া অবশেষে চিন্ময়কে লিখিলাম—তুমি যে দায়িত্ব আমায় দিয়েছো আমি অনেক ভেবে দেখলুম, ওই কাজ তোমার নিজের করা উচিত। কারণ সুখ-শান্তির কোন মাপকাঠি নেই। ওটা সম্পূর্ণ নিজস্ব, ব্যক্তিগত ব্যাপার। কাজেই যার ওপর তোমার সব সুখশান্তি নির্ভর করছে, তার সঙ্গে তোমার নিজের কথা বলা উচিত। আমার থেকে তোমাকে সে অনেক বড় চোখে দেখে, তাছাড়া তোমার যেখানে আমার চেয়ে বেশী আলাপ-পরিচয়, তুমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলো এই আমার বক্তব্য। আশা করি আমায় ভুল বুঝবে না। আমার কথাটা একটু ভাল করে চিন্তা করলে, নিজেই বুঝতে পারবে। ইতি আলোক।

মনে আছে এর পর বেশ কিছুদিন আর অনুরাধাদের বাড়ী যাই নাই।

অনুরাধা মুখে মায়ের কাছে যাহা বলিয়াছে তাহা হয়ত মনের কথা নয়। শেষকালে বাপ-মায়ের চাপে ও চিন্ময়ের আগ্রহে হয়ত আর না বলিতে পারিবে না। গরীবের মেয়ের পক্ষে ধনীর বউ হইবার এই এত বড় প্রলোভন ত্যাগ করা কি সম্ভব! এই ভাবে একটা গভীর সংশয় ও আতঙ্কের মধ্যে আমার দিন কাটিতে থাকে।

॥ তেতাল্লিশ ॥

বেশ কিছুদিন পরে রুক্ষশুষ্ক চুল ও উদ্‌ভ্রান্তের মত সহসা আমার ঘরে ঢুকিয়া চিন্ময় আমার হাত দুটি জড়াইয়া ধরিল, একটু পায়ের ধুলো দে ভাই।

ছিঃ, কি যা-তা বলো যে।

বিশ্বাস কর, সত্যি বলছি, তোর মত ভাগ্যবান পুরুষ সংসারে কে আছে!

কেন এমন সব আবোল তাবোল বকছিস ভাই। আমি জানি আমি তোর পায়ের যোগ্যও নই।

বাস্তবিক বলছি, বিশ্বাস কর। এতদিন ভাবতুম টাকা পয়সা থাকলে জগতে সব কিছু পাওয়া যায়। একটু থামিয়া আবার নিজের কথায় সে ফিরিয়া আসিল, জানিস সব অহংকার আমার চূর্ণ করে দিয়েছে অনুরাধা।

চমকিয়া উঠিলাম, সে কি!

হ্যাঁ, চিন্ময় কণ্ঠে আবেগ চাপিতে চাপিতে কহিল, তোর চিঠি পেয়ে ভাবলুম তুই ঠিকই পরামর্শ দিয়েছিস। তাই ওর কাছে গোপনে কথাটা পেড়েছিলুম, কিন্তু শোনামাত্র সে শিউরে উঠে বললে, আমি নিজে মেয়ে হয়ে আর একটা মেয়ের এত বড় সর্বনাশ করতে পারবো না কিছুতেই, বাবা মা যে যতই বলুন। কেবল এতেই ক্ষান্ত হয়নি, তারপর আরো যা বলেছে, তুই শুনলে আশ্চর্য হবি!

কি, কি বলেছে। চুপ করে রইলে কেন?

বলেছে, বাড়ির বাইরে কখনো যাইনি, সুরিয়ায় গিয়ে প্রথম দেখি আলোকদাকে। তারপর যত দিন গেছে, তিলে তিলে কি করে যে উনি আমার সমস্ত মনটা জুড়ে বসেছেন বুঝতে পারি নি। তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতে পারবো না কোনদিন।

বললাম, আলোককে তুমি চিনতে পারোনি, সে সুন্দরের পূজারী। সে যদি তোমায় না চায়।

তখন মাথা নীচু করে জবাব দিলে, তবু অন্য কাউকে সে আসনে বসাতে পারবো না। তাঁর স্মৃতি বুকে নিয়ে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবো।

এই বলিয়া চিন্ময় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আজ বুঝতে পারছি, সব পেয়েও আমি কিছু পাইনি। আমার মত হতভাগ্য আর কে আছে!

ভেবেছিলুম, আমার শেষ সম্বল, একটুখানি ভালবাসা পাবো যার কাছে, তাও তুই কেড়ে নিলি! তুই রূপের পূজারী জানতুম, তাই ওই কুচ্ছিত মেয়েটার মনে স্থান হবে ভেবে ওর দিকে হাত বাড়িয়েছিলুম। এক ফোঁটা প্রেমের মূল্য যে কত তা বুঝেছি। তুই ভাগ্যবান। ছেলেবেলা থেকে অনেক পেয়েছিস, আরো যেটুকু বাকি ছিল, ভগবান তাও তোকে ঢেলে দিলেন।

ছি ছি, তুমি ওকথা বলো না ভাই। আমি কালই অনুরাধার কাছে গিয়ে তাকে বিশেষ করে অনুরোধ করবো তোমার জন্যে।

আমার হাত দুটো আরো জোরে চাপিয়া ধরিয়া সে কহিল, না না। একবার যখন তার মনের কথা জানতে পেরেছি, তখন আর নয়। জীবনে প্রেম ভালবাসা কোন মেয়ের কাছ থেকে কখনো পাই নি। আজ আমার মত হতভাগ্য কে সংসারে!

কিন্তু আমি ত ভাই এতসব কিছু জানতুম না। তোমার মুখেই প্রথম শুনলুম।

চিন্ময় বলিল, হাঁ, কাউকে বলিনি। কেউ জানে না, তুই-ই প্রথম। তবে তোমরা যাতে সুখী হও। মনে প্রাণে আমি তার চেষ্টা করবো বলিয়া। দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ওই মাসের শেষ তারিখে হঠাৎ চিন্ময় আসিয়া বলিল, নে, তোর বিছানা সুটকেস যা আছে, সব গুছিয়ে নিয়ে চল আমার সঙ্গে—কোথায় তোর মালপত্র সব, বল না, বলিয়া তখনি আমায় গাড়িতে তুলিয়া লইয়া শ্যামবাজারের কাছে একটি দোতলা বাড়ীর উপরের ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, এটা আমি তোর নামে ভাড়া করেছি। এখানে তুই এখন থেকে থাকবি। আর অনুরাধার বাবার সঙ্গে কথাবার্তা সব পাকা হয়ে গেছে। শিগ্‌গির বিয়ের তারিখটা জানাবেন।

কি সর্বনাশ, এ কি করেছিস। এত তাড়াতাড়ি? না না, আমায় একটু ভাবতে সময় দে।

না, শুভস্য শীঘ্রম্। এতে ভাববার কিছু নেই তোর। তোদের আমি সুখী দাম্পত্য-জীবন দেখতে চাই। আমি নিজে বরকর্তা হয়ে তোদের বিয়ের সব কিছু করে দেবো। কিছু ভাবিস নি।

ঘরটা একেবারে সাজানো গোছানো, খাট. বিছানা. আলমারী, ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি সব কিছু আগে থেকে চিন্ময় কিনিয়া রাখিয়াছে। মায় একটি কাজের লোক পর্যন্ত। সে বলিল, ওরা গরীব, কিছু দেবার ক্ষমতা নেই। তাই বলে আমি তোকে গরীবের মত বিয়ে করতে দেবো না। ওপক্ষেরও যা যা প্রয়োজন সব কিছু কেনার জন্যে অনুরাধার বাবাকে টাকা দিয়েছি।

এর কয়েকদিন পরেই অনুরাধাদের সেই জীর্ণ গলির মধ্যে সত্যি সত্যি

সানাই বাজিয়া উঠিল। অনুরাধা বধূর বেশে মাথায় ঘোমটা দিয়া আমার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধিয়া ফুল দিয়া সাজানো চিন্ময়ের মোটরে আসিয়া যখন উঠিল তখন ওই গলিটা পাড়া-প্রতিবেশিনীদের সমবেত উলুধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল।

জটিলতা

অভিমান

ছাত্রাবস্থায় হরিবিলাসবাবু তাঁহার একমাত্র পুত্র অমলের বিবাহ দিলেন। সবাই নিষেধ করিল কিন্তু তিনি কাহারো কথা শুনিলেন না।

আত্মীয়-স্বজনরা তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। অমলের বর্তমান, অমলের ভবিষ্যৎ, নারী সংসর্গে লেখাপড়ার অবনতি, মূর্খ অপোগণ্ড পুত্রের শোচনীয় পরিণাম, স্বাস্থ্যহীনতাবশতঃ ক্ষয়রোগ ও অনতিবিলম্বে মৃত্যুর আশংকা প্রভৃতি যত রকমের কুৎসিত ও ভয়াবহ কুফল অপরিণত বয়সে বিবাহ দিলে ঘটিতে পারে তাহার সবগুলি তাঁহারা ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষির মত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। বস্তুতঃ হরিবিলাসবাবুও জানিতেন যে অমলের এখনো বিবাহের বয়স হয় নাই। হাইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে সে পড়ে, ষোল পূর্ণ হইয়া সবে সতেরো বছরে পড়িয়াছে, তাহার উপর রোগা একহারা চেহারা, স্বাস্থ্যও বিশেষ ভাল নয়—তবুও যে তিনি কেন সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়া বসিলেন সে কথা জানিতে হইলে সকল সামাজিক বিধি-নিষেধেরও উপরে, মানুষের যে চিররহস্যাবৃত মন তাহার কিছু খবর রাখিতে হয়।

অবশ্য রহস্য চিরকাল রহস্যই রহিয়া যায় এবং গোপনতা গোপনই থাকিয়া যায়, যদি উহা কাহারো কাছে প্রকাশ করা না যায়। কারণ অন্তরঙ্গ বলিতে যাহা বুঝায় হরিবিলাসবাবুর সেরকম একজনও ছিল না। সকলের সঙ্গে যেমন তিনি মিশিতেন আবার সকলের নিকট হইতে তেমনি দূরেও থাকিতেন। সমাজের মধ্যে থাকিয়াও যেন তিনি ছিলেন অসামাজিক, বহুর মধ্যে যেন একাকী। এবং এক্ষেত্রে হয়ত তাহাই হইত যদি না সেদিন বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ দেখিতে গিয়া একটি ছোট মেয়ের গান শুনিয়া তাঁহার চোখে জল দেখা দিত এবং তাহাকে একটি স্বর্ণপদক তিনি উপহার দিয়া বসিতেন।

সেই মেয়েটির চাহনি, সেই মেয়েটির কণ্ঠস্বর, সেই মেয়েটির চালচলন সারাক্ষণ তাঁহার সমস্ত চৈতন্যকে এরূপ অভিভূত করিয়া রাখিল যে তিনি সভাভঙ্গ হইবার পর কাহারো সহিত কোন বাক্যালাপ না করিয়া একেবারে সোজা নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন এবং বহুদিনের বিবর্ণ একখানি খাম নিজের 'ক্যাশবাক্স'র তলা হইতে বাহির করিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

হরিবিলাসবাবুর হাত কাঁপিতে লাগিল, চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। সতেরো বৎসর পরে এই প্রথম তিনি স্ত্রীর ফটো বাহির করিলেন। এখানি তাঁহাদের বিবাহের ফটো—তাঁহারি কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহার স্ত্রী, নববধূবেশে।

ছয় মাসের শিশুপুত্র অমলকে রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী যেদিন স্বর্গে যান সেইদিন হইতে আজ পর্যন্ত কখনো তিনি সাহস করিয়া এই ছবিখানির দিতে তাকাইতে

পারেন নাই। এবং বহুলোকের অনুরোধসত্ত্বেও আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই।

হরিবিলাসবাবু খামের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে সেই ছবিখানি বাহির করিলেন এবং আজকের এই বালিকাটির সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীর মুখের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। তেইশ বৎসর পূর্বে যেদিন এই ছবিখানি তুলিয়াছিলেন সেদিনের কথা মনে পড়িয়া তাঁহার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

এই ছবিখানি তাঁহারি স্ত্রী সযত্নে সিন্দুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। লজ্জায় কাহারো সামনে কোনদিন বাহির করিতে দেন নাই। হরিবিলাসবাবু যেন ইহার ভিতর দিয়া আবার বহুদিন পরে তাঁহার স্ত্রীর স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ পিতাকে কি বলিবার জন্য অমল সেই ঘরে ঢুকিল কিন্তু 'বাবা' বলিয়া ডাকিয়াই তাহার মুখের কথা মুখে মিলাইয়া গেল। হরিবিলাসবাবু এমনভাবে অপলক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন যে, অমল কেমন ভড়কাইয়া গেল।

হরিবিলাসবাবু যেন পুত্রকে আজ নূতনরূপে দেখিলেন! তেইশ বৎসর পূর্বে তাঁহার যে চেহারা ছিল তাহার সঙ্গে অমলের চেহারার এমন অদ্ভুত মিল দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

ভীত ও অস্ফুটকণ্ঠে অমল বলিল, বাবা তোমার কি অসুখ করেছে?

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, অসুখ—হ্যাঁ—না, না। বলিয়া ছবিখানি তৎক্ষণাৎ সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

সেদিন হইতে কেন জানি না তাঁহার জেদ চাপিল যেমন করিয়া হউক সেই বালিকাটির সহিত অমলের বিবাহ দিবেন।

মেয়েটির নাম মেনকা। পিতৃমাতৃহীন হইয়া কাকার সংসারে মানুষ হইতেছিল অপ্রয়োজনীয় জিনিসের মত। তাই হরিবিলাসবাবু যখন বিনাপণে পুত্রের জন্য তাহার পাণিপ্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন মেনকার কাকা তখন ভ্রাতুষ্পুত্রীর অল্প বয়সের কথা একবারও চিন্তা করিলেন না, বরং আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বর্তমান বিবাহ-প্রথার কুফল ও তৎকালীন গৌরীদানের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে মেনকার অযথা ভার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

দশ বৎসরের বালিকা, বধূবেশে কাঁদিতে কাঁদিতে হরিবিলাসবাবুর ঘরে আসিয়া উঠিল।

অমল পিতাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। কোনদিন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কোন কথা বলে নাই। পিতার ইচ্ছাই ছিল তাহার ইচ্ছা। সেইজন্য তাহার বিবাহের দিন হইতে পিতাকে পূর্বাপেক্ষা হর্ষোৎফুল্ল দেখিয়া তাহার মন খুশিতে ভরিয়া উঠিল। কি যেন একটা বিষাদের ছায়া সে বাল্যকাল হইতে তাহার পিতার মনে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। সর্বদা যেন একটা দুঃসহ ভার তিনি

অন্তরে লুকাইয়া রাখিতেন। তাই বহুকাল পরে পিতার মনের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া অমল যতখানি খুশী হইল তাহার চেয়েও বেশী খুশী হইল তাহার খুড়ী, মাসি, পিসি, বিধবা ভগ্নি প্রভৃতিরা।

যেদিন হইতে হরিবিলাসবাবুর স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল সেই দিন হইতে কে যেন তাঁহার অন্তরের সমস্ত সুখশান্তি হরণ করিয়া লইয়াছিল। বাড়িতে কেহ তাঁহাকে হাসিতে দেখে নাই, কেহ তাঁহাকে কোন আনন্দ উৎসবে যোগদান করিতে দেখে নাই। চাকরী না করিলে নয়, সংসারের এতগুলি প্রাণী অনাহারে মরিবে তাই যেন যন্ত্রচালিতের মত তিনি নিয়মিত অফিসে যাইতেন এবং অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া চুপচাপ ঘরে বসিয়া বই লইয়া পড়িতেন। অসাধারণ গাম্ভীর্য দিনরাত তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত।

সংসারের কোন কিছুর দিকে তিনি ফিরিয়া চাহিতেন না! ঝি চাকর রাঁধুনী-বামুন, বিধবা বোন, ভাগ্নে-ভাগ্নী, উপার্জন-অক্ষম ভাই ও তাহার স্ত্রী, ভাইপো, ভাইঝি, পিস্তুতো ভাই, মাস্তুতো বোনের জামাই—ইহাদের লইয়া সংসার দিনরাত মুখরিত হইয়া থাকিত! তাহাদের স্বার্থসংঘাতজনিত কোলাহল হইতে তিনি সর্বদা নিজেকে দূরে রাখিতেন। শুধু মাসের প্রথমে মাহিনা পাইয়া খরচের জন্য মোটা রকমের একটা টাকা বিধবা বোনের হাতে তুলিয়া দিতেন, ইহা ছাড়া প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সংসারের ফাঁকে ফাঁকে অতিরিক্ত অর্থ গুঁজিয়া দিয়া এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারের ভিত্তিকে কোনরকমে রক্ষা করিয়া যাইতেন।

এমনি করিয়া সতেরো বৎসর চলিয়া আসিতেছিল।

কিন্তু যেদিন একমাত্র পুত্র অমলের বিবাহ দিয়া হরিবিলাসবাবু পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন সেইদিন হইতে যেন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। তিনি ধীরে ধীরে নিজের হাতে আবার সংসারের ভার তুলিয়া লইলেন। নূতন আশা, নূতন উদ্যম, নূতন প্রেরণায় তাঁহার সারা দেহ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল।

আত্মীয়স্বজন যাঁহারা এতদিন বিনাবাধায় সংসারের কর্তৃত্ব করিতেন তাঁহারা চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, আহা, বৌ নিয়ে বাছা যেন আবার সংসারী হয়, ভগবান যেন তাই করেন। বাছার কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায়।

হরিবিলাসবাবু ছয়শত টাকা বেতনে পাটনার সরকারী দপ্তরে চাকরী করিতেন। সরকার-দত্ত স্বল্পপরিসর কোয়ার্টারে এতদিন কোন রকমে ছাগলের খোঁয়াড়ের মত বহুজন পরিবৃত হইয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন। আজ হঠাৎ তাঁহার মনে হইল এই জঘন্য আলো-বাতাসহীন ঘরগুলি যেন তাঁহার শ্বাসরোধ করিয়া ধরিতেছে। কেরাণী বলিয়া কি তিনি মানুষ নহেন! এই দাসমনোবৃত্তির প্রতি ঘৃণায় তাঁহার মন রি-রি করিয়া উঠিল। এতদিন কেমন করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বাস করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এতদিন কি তাঁহার মধ্যে মনুষ্যত্ব ছিল না?

পরদিন অফিসে যাইয়াই তিনি এক দরখাস্ত করিয়া বসিলেন টাকা ধার লইবার

জন্য এবং অল্পদিনের মধ্যে গঙ্গার ধারে এক বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করাইলেন !

এদিকে শ্বশুরকে পাইয়া মেনকা যেন পিতা ও মাতার শোক একসঙ্গে ভুলিল। ছোটখাট আদরে আবদারে সে সর্বদা হরিবিলাসবাবুকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত। তিনিও সব কাজ ফেলিয়া বৌমার তুচ্ছতম আদেশটি আগে প্রতিপালন করিতে ছুটিতেন—যেন ইহা তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য !

মেনকাকে পাইয়া হরিবিলাসবাবুর আবার নূতন জীবন-যাত্রা সুরু হইল। বৌমা ফুল ভালবাসে বলিয়া তিনি বাড়ীর চারিপাশে বিরাট ফুলের বাগান করাইলেন। বৌমা রাজহাঁস দেখিতে ভালবাসে বলিয়া বাগানের মাঝে একটি পুষ্করিণী কাটাইয়া তাহাতে রাজহাঁস ছাড়িয়া দিলেন। বৌমা হরিণ ভালবাসে বলিয়া ছোট ছোট কতকগুলি হরিণ কিনিয়া আনিয়া বাগানে ছাড়িয়া রাখিলেন। মেনকা কখনো হরিণের পিছু পিছু সেই বাগানের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইত, কখনো বা হাঁসগুলিকে ঢিল মারিয়া ব্যস্ত করিয়া তুলিত। হরিবিলাসবাবুও তাহার পিছু পিছু বাগানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন – তিনি যেন ছিলেন তার খেলার সাথী ! যদি তিনি কোনদিন অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন মেনকা জোর করিয়া তাঁহাকে টানিতে টানিতে বাগানে লইয়া যাইত এবং কখনো বা সে নিজে রাগিয়া মুখ ভার করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিত, আবার হরিবিলাসবাবু তাহার মান ভাঙ্গাইয়া তাহার ইচ্ছাতেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া দিতেন। এইভাবে শ্বশুর তাঁহার বয়সের কথা ভুলিয়া গিয়া পাঁচ বছরের শিশুর মতই মেনকার সহিত খেলা করিতেন।

ইহা ছাড়াও প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ মেনকা নিজে হাতে করিয়া দিত। অফিসে যাইবার সময় তাঁহার জামা কাপড় লইয়া সে দাঁড়াইয়া থাকিত। পান, জলের গেলাস, তামাক পর্যন্ত সাজিয়া প্রস্তত করিয়া রাখিত এবং তিনি খাইতে বসিলে পাখা হাতে করিয়া সারাক্ষণ মেনকা তাঁহাকে বাতাস করিত।

ছেলেমানুষের হয়ত কত কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া হরিবিলাসবাবু তাহাকে নিষেধ করিতেন, কখনো বা ধমকাইতেন কিন্তু 'কে যেন কাহাকে বলে' ! দুষ্টুমিভরা হাসিতে চোখ-মুখ উদ্ভাসিত করিয়া মেনকা সেই কাজগুলি তৎক্ষণাৎ করিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে আরও রাগাইত। হরিবিলাসবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিতেন।

এইভাবে ছোট ছোট স্নেহের অভিনয় নিত্যই তাঁহাদের মধ্যে চলিত এবং এমনি করিয়া কোথা দিয়া কেমন করিয়া সেই ছোট মেয়েটি যে একদিন তাঁহার সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়া বসিল তাহা হরিবিলাসবাবুও বুঝি জানিতে পারিলেন না।

অফিসের ছুটি হইলে আর একমুহূর্তও অপেক্ষা না করিয়া তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন। এবং আসিবার সময় দোকান হইতে ভাল ভাল ফল ও উৎকৃষ্ট খাবার লইয়া আসিয়া বৌমাকে চোখের সামনে বসাইয়া খাওয়াইতেন ও নিজে খাইতেন। ভাল কাপড়, ভাল জামা—নূতন ফ্যাসানের যাহা কিছু তাঁহার চোখে

পড়িত তাহা তৎক্ষণাৎ তিনি মেনকার জন্য কিনিয়া আনিতেন। ছোট মেয়েরা পুতুলকে যেমন করিয়া সাজায় তেমনি করিয়া তিনি তাহাকে সাজাইতেন, অন্তরের সমস্ত স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া। কিছুতেই আর তাঁহার আশা মিটিত না—যাহা আনিতেন তাহাই মনে হইত যেন মেনকার কাছে অকিঞ্চিৎকর!

শ্বশুরের এই আদর, যত্ন ও ভালবাসায় মেনকা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িত এবং এই অনাস্বাদিতপূর্ব স্নেহের আতিশয্যে বারবার তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিত।

শ্বশুরের কাছে মেনকার যত আবদার! কোনদিন তাহার কোন ইচ্ছা তিনি অপূর্ণ রাখেন নাই! একদিন রাস্তায় একখানি চকচকে সাদা মোটর গাড়ী দেখিয়া মেনকা বলিল, বাবা, আমি ওই রকম গাড়ী চড়বো।

তাহার পরের দিন হরিবিলাসবাবু সেই রকমের একখানি গাড়ী কিনিয়া বসিলেন।

খুড়ী, জ্যাঠাই, ভগ্নি প্রভৃতি রমণীরা হরিবিলাসবাবুর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া বলাবলি করিতেন, আহা বাছার আমার প্রাণে কত সখ অপূর্ণ ছিল! ভাগ্যিস্ অমলার বিয়ে হয়েছিল!...ভগবান্ ওদের বাঁচিয়ে রাখুন।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া মেনকা অমলকে বলে, তোমার চেয়ে বাবা আমাকে ঢের বেশী ভালবাসেন।

অমল বলে, তোমার চেয়ে আমায় বেশী ভালবাসেন।

মেনকা বলে, ইস্!

অমল বলে, কখ্‌খনো নয়।

—আমাকে বাবা মোটরগাড়ী কিনে দিয়েছেন, তোমাকে ত আর দেননি।

—আমাকে বাবা ঘোড়া কিনে দিয়েছেন তোমাকে ত দেননি।

মেনকা বলে, ঘোড়ার চেয়ে অনেক বেশী দাম মোটর গাড়ীর—তাহ'লে বাবা নিশ্চয়ই আমাকে বেশী ভালবাসেন।

অমল বলে, ইস্।

মেনকা বলে, আমায় নিয়ে বাবা রোজ গাড়ী করে বেড়াতে যান, তোমায় ত আর নিয়ে যান না।

তাড়াতাড়ি তাহার কথার উত্তর দিতে গিয়া অমল চুপ করিয়া যায়। হঠাৎ তাহার মনে হয়, সত্যই ত রোজ বাবা মেনকাকে লইয়া বেড়াইতে যান। তাহা হইলে কি তিনি আমাকে ভালবাসেন না? সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার মনে হয়, ধ্যেৎ, তা কি কখনো হয়! বাবা আমাকে কত ভালবাসেন! মেনকা ছেলেমানুষ তাই আদর করেন।

এইভাবে তাহারা দুইজনে পিতৃস্নেহের ভাগ বাঁটোয়ারা লইয়া ঝগড়া করিতে করিতে একসময় ঘুমাইয়া পড়ে। তাহাছাড়া সমস্তদিন তাহারা পিঠোপিঠি ভাইবোনের মত হাসিয়া, খেলিয়া, তুচ্ছ কারণে ঝগড়া করিয়া বাড়ী মাথায় করিয়া

রাখে—বাহিরের কেউ দেখিলে বুঝিতেই পারে না যে তাহারা স্বামী-স্ত্রী।

হরিবিলাসবাবু দুই চোখ ভরিয়া তাহাদের এই প্রেমলীলা দেখিতেন। দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার যেন আর আশা মিটিত না।

কিন্তু একদিন হঠাৎ যেন তাঁহার মনে হইল এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ইহাতে ছেলের স্বাস্থ্য ও লেখাপড়া উভয়ই নষ্ট হইতে পারে। তাই কতকটা জোর করিয়াই তিনি তাহাদের দূরে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যহ বিকালে আরো বেশীক্ষণ ধরিয়া বৌমাকে লইয়া তিনি বেড়াইয়া বেড়াইতেন।

মেনকা মোটর চড়িতে ভারি ভালবাসে। নিত্য নূতন শাড়ী পরিয়া নিখুঁত করিয়া সাজিয়া শ্বশুরের পাশে আসিয়া বসিত। কত মাঠ, কত নদী ও অরণ্য পশ্চাতে ফেলিয়া তাহাদের গাড়ী ছুটিত দূর দূরান্তরে। বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে মেনকা সেই সব দেখিতে দেখিতে ঘুরিয়া বেড়াইত।

হরিবিলাসবাবু নিজে মোটর চালাইতেন। কখনো অজস্র প্রশ্ন একসঙ্গে করিয়া মেনকা তাঁহাকে বিপদে ফেলিত! কখনো বা বলিত, বাবা আমি গাড়ী চালাবো।

রোজ রাত্রে বিছানায় শুইয়া মেনকা তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত একে একে অমলকে শুনাইত। অমল তাহা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত। এক একদিন রাগ করিয়া অমল বলিত, যাও শুনতে চাই না। কিংবা কোনদিন বলিত, চুপ করো, আমার ভয়ানক ঘুম পেয়েছে।

মেনকা তখন দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, রাগ ক'রো না গো—বাবা বলেছেন তুমি যখন বড় হবে তোমার লেখাপড়া সব শেষ হয়ে যাবে তখন তোমাকে একখানা আলাদা খুব বড় গাড়ী কিনে দেবেন, তুমি যত ইচ্ছে ঘুরে বেড়াবে। এখন দিলে তোমার এক্‌জামিনের ক্ষতি হবে কিনা!

অমল বলিত, চাই না আমি গাড়ী।

এইভাবে দেখিতে দেখিতে পাঁচ বছর কাটিয়া গেল এবং কেমন করিয়া যে সকলের অজ্ঞাতসারে মেনকা কৈশোর পার হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিল তাহা হরিবিলাসবাবু কিংবা অমল কেহই বুঝিতে পারিল না। শুধু একদিন অপরাহ্ণে শ্বশুরের সঙ্গে বেড়াইতে যাইবার জন্য মেনকা যখন আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধনুকের মত বাঁকা ভ্রূ দুটির মধ্যে সিঁদুরের টিপ পরিতেছিল তখন অমলের মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। সে আস্তে আস্তে তাহার হাত দুইটি ধরিয়া বলিল, মিনু আজ আর তুমি বেড়াতে যেয়ো না, চলো আমরা দু'জনে বাগানে ফুল তুলিগে।

মেনকা বলিল, বাবা গাড়ী বার ক'রে এনে দাঁড়িয়ে আছেন, আমি না গেলে তিনি কি মনে করবেন? এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেল। অমলও আর তাহাকে বাধা দিল না। সে তাহার পিতাকে দেবতার মতই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত।

শুধু অন্যদিনের মত সেদিন অমল আর খেলিতে যাইতে পারিল না। তাহাদের গাড়ী যে পথে চলিয়া গেল সেই দিকে চাহিয়া জানালার গরাদ ধরিয়া

চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাঘের শীত কাটিয়া গিয়া হঠাৎ সেদিন গরমের হাওয়া বহিতেছিল। পশ্চিমের আকাশ হইতে অস্তগামী সূর্যের শেষ রক্তিম আভাটুকু আসিয়া অমলের মুখে চোখে পড়িয়া তাহাকে যেন কেমন বিষণ্ণ ও মলিন দেখাইতেছিল।

পিসিমা বাড়ীর গিন্নী। তিনি ভাবিয়াছিলেন, অমল যেমন প্রত্যহ বৈকালে খেলিতে যায় আজও বোধহয় তেমনি গিয়াছে। তাই পাশের বাড়ীর মিত্তির গিন্নীর সঙ্গে ছাদে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে আলাপ করিতেছিলেন, বলি বউ নয় ত মা, যেন ধিঙ্গী। এখনও কি শ্বশুরের সঙ্গে সেজেগুজে একলা বেড়াতে যাওয়া ভাল দেখায়? আর এতই বা কেন? হোক্ না শ্বশুর, বলি পুরুষমানুষ বলেও ত একটু 'সমীহ' ক'রে চলা উচিত—কি বলো বৌমা? শ্বশুর বলে' একেবারেই মানে না মা এমন বৌ!

মিত্তির গিন্নী কণ্ঠে একপ্রকার সুর টানিয়া বলিলেন, তা নয় আবার! বলি আমাদেরও একদিন ছিল—আমাদেরও ত বিয়ে হয়েছিল অল্প বয়সে। কিন্তু তোমায় বললে বিশ্বাস করবে না মা শ্বশুর আমার বৌমা বলতে অজ্ঞান! একপাতে বসে কতদিন তাঁর সঙ্গে খেয়েছি—তাই বলে কি আর পনেরো ষোল বছরের মাগী হয়ে?

—আর অমলটাও তেমনি! এখন বড় হয়েছিস্, সব দেখছিস্, শুনছিস্ বৌটাকে একটু বারণ ক'রে দিতে পারিস ত? এদিকে যে আমার মুখ দেখানো ভার হ'লো! লোকে যে আমার গায়ে থুথু দিচ্ছে মা!

অমল পাথরের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিল, তারপর সবার অলক্ষ্যে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সেদিন আবার হরিবিলাসবাবুর ফিরিতে সবচেয়ে বেশী রাত হইল। তিনি বৌমাকে লইয়া নূতন পাহাড় দেখাইবার জন্য গয়ার কাছে গিয়া পড়িয়াছিলেন। আসিবার সময় মেনকা রাশীকৃত গোলাপ ফুল পাহাড় হইতে তুলিয়া আনিয়াছিল অমলকে উপহার দিবার জন্য। অমল গোলাপ ফুল বড় ভালবাসে।

কিন্তু ফুল লইয়া তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া মেনকা মুষড়াইয়া পড়িল। দেখিল, অমল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যহ সে তাহার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে, তাই আজ তাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়া মেনকার মনে কেমন ভয় হইল। সে তাহার গায়ে হাত দিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল, তুমি কি ঘুমুচ্ছ। —দেখো, তোমার জন্যে কত ফুল এনেছি।

অমল মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—যেন সেখানে সে কি খুঁজিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই চাহনীর অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মেনকার বুক কাঁপিয়া উঠিল! সে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, কেন গো এমন ক'রে আমার দিকে চেয়ে আছো? কি হয়েছে বলো না?

অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমল বলিল, অসুখ করেছে।

—তুমি কিছু খাবে না ?

—না।

মেনকা ফুলগুলি তাহার মাথার কাছে রাখিয়া দিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িল এবং কোন রকমে চারটি ভাত খাইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল !

গোলাপের গন্ধে তখন ঘরের বাতাস সুরভিত হইয়া উঠিয়াছিল। মেনকা যখন আলো নিভাইয়া শুইতে আসিল, অমল বলিল, ফুলগুলো বাইরে ফেলে দাও—বড্ড গন্ধ, আমি সহ্য করতে পারছি না।

গোলাপের গন্ধ যাহার এত প্রিয় ছিল তাহার মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া মেনকা ভাবিল নিশ্চয়ই অমলের অসুখ করিয়াছে। তাই আর কোন কথা না বলিয়া সে ফুলগুলি বাহিরেই ফেলিয়া দিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া অমল নিজের পড়াশুনা করিল এবং যথারীতি কলেজে চলিয়া গেল। মেনকাও তেমনি নানাকাজের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইল না।

কলেজ হইতে অমল সে দিন দেরীতে ফিরিল। অনেক ক্লাস ছিল।

মেনকা তখন যথারীতি বেড়াইতে যাইবার জন্য বেশভূষা করিতেছিল। ঘরে ঢুকিতেই হঠাৎ অমলের চোখ পড়িল তাহার জামা-কাপড়ের দিকে। তাহার মনে হইল যেন সে অন্যদিনের চেয়ে আজ বিশেষভাবে সাজিয়াছে। মেনকার এ মূর্তি ত অন্য কোনদিন সে দেখে নাই ! এক প্রকার হিংস্র আনন্দে অমলের চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল। ধীর অথচ কঠিন পদক্ষেপে সে মেনকার কাছে অগ্রসর হইয়া বলিল, কার জন্যে আজ এমন অপরূপ সাজে সেজেছো ?

মেনকা তাহার স্বভাবসুন্দর হাসিতে চোখমুখ উদ্ভাসিত করিয়া বলিল, তোমার জন্যে।

—আমার জন্যে না আর কারুর জন্যে ?

—কি বলছো তুমি ?

—বলছি এই যে এ জামা কাপড় এখুনি খুলে ফেলো। আমি তোমায় যেতে দেবো না। এই বলিয়া সে পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল। মেনকা প্রথমে মনে করিয়াছিল অমল বুঝি রসিকতা করিতেছে তাই আবার হাসিমুখে বলিল, পথ ছাড়ো লক্ষ্মীটি, বাবা দাঁড়িয়ে আছেন।

অকস্মাৎ উত্তেজিতকণ্ঠে অমল বলিল, না পথ ছাড়বো না।

—দ্যাখো, ছেলেমানুষি ক'রো না, বাবা কখন থেকে গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নিচে।

—থাকুন তিনি দাঁড়িয়ে, আমি কিছুতেই তোমায় যেতে দেবো না।

অনুনয় করিয়া তখন মেনকা বলিল, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, পথ ছাড়ো, বাবা কি ভাবছেন বলো ত ?

রুক্ষস্বরে অমল উত্তর করিল, বাবা কি ভাবছেন জানি না, তবে পাড়ার লোকেরা

যা ভাবছে, তা শুনলে তুমিও কানে আঙুল দেবে।

ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া মেনকা বলিল, পাড়ার লোকেরা কী ভাবছে, তার মানে?

—তার মানে, তুমি এখন আর ছেলেমানুষটি নও, আর বাবাও এমন কিছু বৃদ্ধ নন্ যে—

চুপ! বলিয়া মেনকা দুইহাতে তাহার কান চাপিয়া ধরিল। উত্তেজনায় ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তারপর সহসা বেশভূষা সমস্ত টানিয়া ছিঁড়িয়া খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া বিছানায় আছড়াইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দুঃখে অভিমানে ঘৃণায় তাহার মুখে আর কোন কথা জোগাইল না।

অমল নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাহিরে হঠাৎ পরিচিত জুতার শব্দ পাইতে তাহারা দুইজনেই সচকিত হইয়া উঠিল। মেনকা তখন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, তুমি কি সর্ব্বনাশ করলে, বাবা নিজে কানে যে সব শুনে গেলেন!

অমলের যেন চমক ভাঙ্গিল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই সে দেখিল, চৌকাঠের পাশে একজোড়া জুতার স্পষ্ট দাগ! যেটুকু সন্দেহ ছিল অমলের মনে, ইহা দেখিয়া তাহা দূর হইয়া গেল।

তখন ঘরে ঢুকিয়া কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, কি হবে মেনকা? মেনকা কোন উত্তর না দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হরিবিলাসবাবু বৌমার আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া উপরে গিয়াছিলেন তাহাকে ডাকিবার জন্য। কিন্তু দরজার কাছে যাইতেই তাঁহার কানে যে সমস্ত কথা আসিয়া পৌঁছাইল তাহাতে তাঁহার দেহ হিম হইয়া গেল। নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত তিনি কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া একাকী গাড়ী লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মোটরের শব্দ কানে যাইতেই মেনকা ধড়মড় করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া একেবারে জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী তখন ছুটিয়াছে উন্মত্তবেগে। ধূলা উড়াইয়া চক্ষের নিমেষে তাহা দূরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, কাহাকে কি বলিবে মেনকা যেন কিছুই ভাবিয়া পাইল না। শুধু অগ্নিময়ী দৃষ্টিতে সে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মেনকার মুখের দিকে চাহিতেই অমলের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। অপরাধীর মত সে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারও মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। যেন এইমাত্র তাহাদের সম্মুখে বজ্রপাত হইয়া গেল।

মেনকা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল! তাহাকে কিছু বলিবার সাহসও আর অমলের রহিল না।

পিসিমা তখন ভাঁড়ারঘরে বসিয়া ঠাকুরঘরের জন্য প্রদীপ সাজাইতেছিলেন। মেনকা একেবারে সোজা তাঁহার সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, পিসিমা আমি এখুনি একবার বাপের বাড়ী যাবো, অনেকদিন কাকাকে দেখিনি, বড় মন কেমন করছে।

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া পিসিমা একবার ভাল করিয়া মেনকার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। স্ত্রীলোকের মনের খবর, স্ত্রীলোকরা যেমন বুঝিতে পারে এমন বুঝি আর কেউ পারে না। পিসিমা প্রথমটা মনে ভাবিলেন, আজ মেনকা নিশ্চয়ই অমলের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে তাই বেড়াইতে যায় নাই এবং রাগ করিয়া বাপের বাড়ী যাইতে চাহিতেছে। তিনি বলিলেন, বৌমা, ছেলেমানুষি কি তোমার এখনো গেল না? এই ভরসন্ধ্যেবেলা বাড়ী থেকে কি বেরুবার নাম করতে আছে?

মেনকা দৃঢ় স্বরে শুধু বলিল, হ্যাঁ আমি যাবই।

পিসিমা জানিতেন শ্বশুরের আদরিণী বধূমাতাকে এ বাড়ীতে কাহারো কোন কথা বলিবার হুকুম নাই। সে একবার যাহা বলিবে তাহা না করিয়া ছাড়িবে না। তাই মিছামিছি হরিবিলাসবাবুর বিরাগ ভাজন না হইয়া তিনি শুধু বলিলেন, তা যাবে ত যাও বাছা—তবে শ্বশুর এলে তাঁকে বলে গেলেই কি ভাল হতো না?

মেনকা বলিল, না তাহ'লে বড্ড দেরী হয়ে যাবে—আমাকে এখুনি যেতে হবে।

—তবে যাও বাছা। বলিয়া পিসিমা উপরে চলিয়া গেলেন।

মেনকা আর উপরে উঠিল না কিংবা তাহার ঘরে গেল না। শুধু ঝি ও দারোয়ানকে লইয়া তৎক্ষণাৎ একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। পাটনা হইতে মাত্র পাঁচ ক্রোশ দূরে মেনকার বাপের বাড়ী।

অমল উপর হইতেই মেনকার সব কথা শুনিতে পাইল। কিন্তু তাহাকে বাধা দিবার সাহস তখন যেন আর তাহার দেহে ছিল না। শুধু সে জানালা দিয়া চাহিয়া রহিল। দূরে মেনকার গাড়ীর আলো মিলাইয়া গেল।

সেদিন রাত্রি প্রায় বারোটার সময় হরিবিলাসবাবু বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার ঘরে তখনো আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া তিনি মনে করিলেন হয়ত মেনকা তাঁহার খাবার লইয়া এতরাত পর্য্যন্ত বসিয়া আছে। কিন্তু কোন্ মুখে তিনি তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইবেন! তাঁহার বুকের ভিতরটা বার-কয়েক ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। তবু ধীরে ধীরে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন ঘরের দিকে।

নিস্তব্ধ বাড়ী। চারিদিক অন্ধকার। ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া তিনি আগে ভিতরে উঁকি মারিলেন, তারপর যখন দেখিলেন কেহ নাই, শুধু তাঁহার খাবার ঢাকা পড়িয়া আছে এককোণে, তখন হরিবিলাসবাবু যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে অমলের পিসিমা ঘরে ঢুকিয়া

দেখিলেন, আলো তেমনি জ্বলিতেছে, খাবার তেমনি ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে আর জামা কাপড় না ছাড়িয়া চুপ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া আছেন হরিবিলাসবাবু। যেন কিসের গভীর চিন্তায় তিনি মগ্ন।

—দাদা, তুমি খাবে না কিছু?

হরিবিলাসবাবু যেন চমকাইয়া উঠিলেন। তারপর ভগ্নির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, না আজ আর ক্ষিদে নেই আমার।

—তুমি আদর দিয়ে বৌয়ের মাথাটা খেলে। ওমা, বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ ভরসন্ধ্যেবেলা ঝি-দারোয়ান সঙ্গে ক'রে বাপের বাড়ী চলে গেল। আবার সেখান থেকে বলে পাঠিয়েছেন একমাস থাকবেন। এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন এবং ভাই ইহার কি উত্তর দেন তাহা শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হরিবিলাসবাবু তখন এমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন যে অপর কেহ তাঁহার সহিত কথা বলিতেছেন সেকথা তাহার হুঁশই ছিল না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া পিসিমা মনে করিলেন, কথাটা হয়ত ভায়ের ভাল লাগিল না। তাই পূর্বাপেক্ষা সুর ঈষৎ নরম করিয়া বলিলেন, তা' যখন ছেলেমানুষ ছিল তখন না হয় একরকম শোভা পেতো—এখন যদি তুমি একটু আধটু ব'কে না দাও ত একদিন তোমাকেই ভুগতে হবে দেখে নিয়ো, মেয়েছেলের এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এই বলিয়া তিনি যেন এক বিরাট কর্তব্য সম্পাদন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ভগ্নির এই কথা শুনিয়া তিনিও যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন তাই তাড়াতাড়ি বলিলেন, তা ছেলেমানুষ অনেক দিন বাপের বাড়ী যায়নি—থাক না মাসখানেক সেখানে।

—তুমি আদর দিয়ে বৌয়ের মাথাটা খাবে দাদা। এই বলিতে বলিতে পিসিমা তাঁহার ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িলেন।

সেদিন বিছানায় শুইয়া অনেকরাত পর্যন্ত হরিবিলাসবাবুর চোখে ঘুম আসিল না।

মানুষের মন দুর্জ্ঞেয়! সেখানে নিত্য কত চিন্তা গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে, উঠিতেছে, পড়িতেছে তাহা একমাত্র যিনি মানুষের সৃষ্টিকর্তা তিনি ছাড়া বোধকরি আর কেহই বুঝিতে পারেন না। তাই মানুষ যখন মানুষের কার্যকলাপের সূত্র ধরিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য মাথা খুঁড়িতে থাকে অন্তর্যামী তখন সবার অন্তরালে বসিয়া মুচকি হাসেন।

কাজেই পরদিন যখন হরিবিলাসবাবু চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য অফিসে গিয়া এক দরখাস্ত করিয়া দিলেন তখন তাঁহার সহকর্মীরা যেমন বিস্মিত হইলেন, তাহার চেয়েও বেশী হইলেন বাড়ীর লোকেরা। কত লোকে তাঁহাকে কত বুঝাইলেন কিন্তু তিনি কাহারো কথা শুনিলেন না। নিজের প্রতিজ্ঞায় অচল অটল হইয়া রহিলেন।

অমল সব শুনিয়াছিল কিন্তু পিতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে তাহার সাহস হয় নাই। যেদিন মেনকা বাপের বাড়ী চলিয়া গেল সেইদিন হইতে আর একদিনও সে পিতার সম্মুখে বাহির হয় নাই—সর্বদা লুকাইয়া বেড়াইত।

তাই ইহার দিন কুড়ি পরে অমল যখন পিসিমার মুখে শুনিল যে তাহার পিতা চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং আজই রাত্রে হরিদ্বার যাইতেছেন তখন তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, সে স্থির হইয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে পিতার ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু দরজার কাছে যাইয়া আর তাহার পা উঠিল না; সে কিছুতেই ঘরের ভিতরে ঢুকিতে পারিল না।

হরিবিলাসবাবুও সেই অবধি কোনদিন তাহাকে কাছে ডাকেন নাই। আজ হঠাৎ অমলকে দরজার নিকট আসিয়া ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া ঘরের ভিতর ডাকিলেন।

অমল ঘাড় হেঁট করিয়া পিতার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

হরিবিলাসবাবু বলিলেন, আজ রাত্রে আমি হরিদ্বার যাচ্ছি—বাকী জীবনটা সেইখানেই কাটাবো মনে করেছি। তুমি এখন উপযুক্ত হয়েছো—এইবার আমায় ছুটি দাও। এই নাও সিন্দুকের চাবি—আর সরকার মশাই রইলেন, তিনি সব দেখাশুনা করবেন, সাবধানে হিসেব-পত্তর ক'রে যদি চলো তাহ'লে তোমাদের কোনদিন কোন অভাব হবে না।

অমল কি বলিতে গেল কিন্তু পারিল না। তাহার ঠোঁট দুইটি শুধু বারকয়েক কাঁপিয়া উঠিয়া থামিয়া গেল। চাবিটা হাতে নিয়া চোখের জল চাপিতে চাপিতে সে নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে বাগানের গাছপালা সব যেন প্রকৃতির সঙ্গে মসীলিপ্ত হইয়া একাকার হইয়া রহিয়াছে। উপরের বারান্দায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অমল ভাবিতে লাগিল বোধহয় তাহারই অপরাধের জন্য আজ তাহার পিতা সংসার ছাড়িয়া বনবাসী হইতেছেন। কি জানি সেই মুহূর্তে কেন তাহার মনে হইতে লাগিল এই সমস্ত অনর্থের মূল সে নিজে। পুত্র হইয়া সে-ই যেন দাগা দিয়াছে পিতার মনে। ঘৃণায় তাহার সমস্ত মন কলুষিত হইয়া উঠিল। যেদিন হইতে তাহার জ্ঞান হইয়াছে, সেইদিন হইতে তখন পর্যন্ত পিতার স্নেহের অজস্র স্মৃতি একসঙ্গে মনে পড়িয়া অমলের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। একটা দুঃসহ গ্লানি তাহার বুক হইতে ঠেলিয়া উঠিয়া যেন কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিতে লাগিল

হঠাৎ অমলের মনে হইল এই সময় যদি মেনকা থাকিত তাহা হইলে হয়ত বাবার এই সংকল্প টলাইতে পারিত। তাই সেই কথা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া ছুটিল শ্বশুরবাড়ী।

রাত্রি নয়টায় হরিদ্বার যাইবার গাড়ী, তখন সাতটা বাজিয়াছে, আর মাত্র দুই

ঘণ্টা বাকী।

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে, পথহারা নাবিকের মত উদভ্রান্ত ও অসহায় দৃষ্টি লইয়া অমল একেবারে হাজির হইল মেনকার সামনে।

মেনকা তখন একলা তাহার ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়াছিল। অকস্মাৎ অমলকে ঐ অবস্থায় সেখানে ঢুকিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিল।

অমল বলিল, সর্বনাশ হয়েছে মেনকা, বাবা সংসার ছেড়ে আজই হরিদ্বার চলে যাচ্ছেন—তুমি শীগগির চলো, তা নাহ'লে বুঝি আর কেউ তাঁকে ফেরাতে পারবে না। এই বলিয়া ঝড়ের মত এক নিঃশ্বাসে যাহা যাহা হইয়াছে সব একসঙ্গে বলিয়া ফেলিল।

পাষাণপ্রতিমার মত নীরব ও নিশ্চল হইয়া মেনকা সব কথা শুনিল। বোধ-করি এই রকম একটা ভয়ানক কিছু শুনিবার আশঙ্কাই এতদিন সে করিয়াছিল। নিজের শ্বশুরকে সকলের চেয়ে ভাল করিয়া চিনিত একমাত্র মেনকা। তাই স্বামীর কথার কোন উত্তর না দিয়া সে যখন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল অমল তখন রীতিমত বিস্মিত হইল। তবুও কিছুক্ষণ পরে আবার সে বলিল, মিনু শীগ্গির কাপড় পরে নাও—আর দেরী করলে হয়ত বাবার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত হবে না। রাত ন'টায় গাড়ী।

মেনকা বলিল, আমি যাবো না—তুমি যাও।

তাহার কণ্ঠস্বরের এই দৃঢ়তা দেখিয়া অমল অবাক হইয়া গেল। যে পিতা তাহাকে এত ভালবাসিতেন এবং যাঁহাকে মেনকাও সদাসর্বদা ছায়ার মত ঘিরিয়া থাকিত তাঁহার প্রতি এই ঔদাসীন্য কেন বুঝিতে না পারিয়া অমলের মাথা যেন কেমন গোলমাল হইয়া গেল। তথাপি সে আর একবার ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, মিনু তোমার পায়ে পড়ি একবার চলো—আমি জানি তুমি বললে বাবা কখনই যেতে পারবেন না!

শান্তকণ্ঠে শুধু মেনকা জবাব দিল, না তা হয় না।

অমল তাহাকে অনেক সাধিল, অনেক অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু কিছুতেই রাজী করাইতে পারিল না। মেনকা আপনার সংকল্পে তেমনি অচল অটল হইয়া বসিয়া রহিল।

অমল আরো কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মেনকা তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না, এমন কি একবার বসিতে পর্যন্ত বলিল না। সে যেমনভাবে আসিয়াছিল ঠিক তেমনি-ভাবেই আবার চলিয়া গেল।

সরকার মহাশয়ের মুখে হরিবিলাসবাবু শুনিয়াছিলেন যে এইমাত্র একখানা ট্যাক্সি করিয়া অমল কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোথায় যে গেল তাহা বোধ করি তিনি অনুমানে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই গাড়ীতে মালপত্তর বোঝাই করিয়া

সরকার মহাশয় যতই তাঁহাকে ট্রেনের সময় হইয়াছে বলিয়া তাগাদা দিতে লাগিলেন ততই তিনি যাই যাই করিয়াও যাইতে পারিতেছিলেন না। মানবচক্ষুর অন্তরালে তাঁহার হৃদয়ের কোন্ গোপনস্থানে কে যেন আর একজনের স্নেহ ব্যাকুল কণ্ঠের শেষ দু'টি কথা শুনিবার জন্য তখনো সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া ছিল।

এক সময় সরকার মহাশয় আসিয়া বলিয়া গেলেন, আর মাত্র কুড়ি মিনিট আছে ট্রেনের, এখন না বাহির হইলে এ গাড়ী ধরিবার আর কোন আশা নাই।

একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়া হরিবিলাসবাবু বলিলেন, এই—চলো—যাচ্ছি। বলিয়া শেষবারের মত তিনি দরজার উপরে যে দুর্গার ছবি ছিল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যেমন পা বাড়াইয়াছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বাহিরে একখানা মোটরের শব্দ হইল। তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন—কাহার চরণের ধ্বনি যেন তাঁহার ঘরের দিকে আসিতে লাগিল।

কিন্তু মিনিটখানেক পরে একলা নতমুখে ঘরে আসিয়া ঢুকিল অমল এবং পিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় রাখিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

শুধু মুহূর্তের জন্য যেন হরিবিলাসবাবুর চক্ষু অমলের পিছনদিকে একবার কাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল কিন্তু তাহার পর কোন কথা না বলিয়া এক হাতে তিনি অমলের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া মোটরে উঠিলেন।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

সেদিন সেই মসীমলিন আকাশের নীচে তিনটি নরনারীর জীবনে নিঃশব্দে যে বিয়োগান্ত অভিনয় হইয়া গেল একমাত্র অন্তর্যামী ছাড়া তাহার বোধ করি আর কেহ সাক্ষী রহিল না।

মৃগতৃষা

মলিনার বর দেখিয়া সবাই ছি ছি করিল। আপনার লোকেরা মুখে কিছু না বলিয়া মনে মনে হজম করিল বটে কিন্তু পাড়াপ্রতিবেশীরা চুপ করিয়া রহিল না, বিশেষ করিয়া গ্রাম সম্পর্কীয় পিসি মাসীর দল। তাঁহারা মলিনার মাকে একটু আড়ালে পাইয়া বলিলেন, হ্যাঁরে খেঁদী, তুই মা হয়ে শেষকালে এই কাজ করলি! মেয়েটাকে এর চেয়ে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিলি না কেন! এমন সোনার চাঁদ মেয়ে অবশেষে কিনা একটা বুড়োর গলায় বেঁধে দিলি—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

মলিনার মা চোখের জল চাপিতে চাপিতে বলিলেন, সবই আমার বরাত মা, তা না হ'লে ছেলেবেলায় এমন করে কপাল পুড়বে কেন, আর ভায়ের গলগ্রহ হয়েই বা থাকতে হবে কেন? আজ যদি ওর বাপ বেঁচে থাকতো তা হ'লে কি এমন করে মেয়ের বিয়ে দিতে পারতো! এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একেবারে কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

বিধবাদের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বয়সে ছোট অথচ বাকপটুতায় সকলের চেয়ে সেরা তিনি খপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, ওমা এমন করবি জানলে আমি আমার ভাইপোর সঙ্গে সম্বন্ধ করতুম! আমি বলি এমন টুকটুকে মেয়ে হয়ত কোন রাজপুত্রের হাতে পড়বে—তা এমন আপদ-বালাই করে বিদেয় করবি, কেমন করে জানবো বল?

ইহার উত্তরে তিনি কি বলিবেন খুঁজিয়া পাইলেন না। শুধু চোখের জল মুছিতে মুছিতে উপরের অন্ধকার ঘরে যাইয়া—যেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল অঘোরে ঘুমাইতেছিল তাহাদের মধ্যে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলেন।

আঠারো বছর বয়সে বিধবা হইয়া তিনি বড় ভায়ের সংসারে ঢুকিয়াছিলেন। তারপর বিনা বেতনের ঝি ও রাঁধুনীর কার্য একসঙ্গে করিয়া ভাই, ভাজ, ভাইপো ও ভাইঝিদের মনোরঞ্জন করিতে করিতে আরো আঠারো বছর কাটাইয়া দিয়াছেন, শুধু এই একমাত্র মেয়েটিকে মানুষ করিয়া দাদা একদিন ভাল ঘরে বিবাহ দিবেন এই আশায়। তাই আজ যখন তাঁহার সেই একমাত্র আশা অতি নিষ্ঠুরভাবে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল তখন তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজের মন্দ ভাগ্যকেই বারবার দোষারোপ করিতে লাগিলেন।

ওদিকে বিবাহ শেষ হইয়া গেল। কর্মবাড়ীও প্রায় নিস্তব্ধ হয় হয় এমন সময় মলিনার মায়ের খোঁজ পড়িল। এদিক ওদিক ওপর নীচে সব অনুসন্ধান করিয়া শেষে মেয়েরা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। এবং সবাই তাঁহাকে খাইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিল কিন্তু তিনি নিজের প্রতিজ্ঞায়

অটল অচল হইয়া রহিলেন। শুধু সকলকে এককথা বলিলেন, আমার শরীর খারাপ কিছু খাবো না।

বাড়ীর গিন্নী অর্থাৎ তাঁহার বড় ভাজও যখন তাঁহাকে খাইবার জন্য রাজী করাইতে পারিলেন না তখন তিনি ঘরে যাইয়া স্বামীকে বলিলেন, তুমি একবার যাও, ঠাকুরঝির বোধহয় রাগ হয়েছে।

অগত্যা মহেশবাবুকে ভগ্নির মানভঞ্জন করিবার উদ্দেশ্যে যাইতে হইল। কিন্তু যেমন তিনি বিছানার কাছে গিয়া ভগ্নির নাম ধরিয়া ডাকিলেন অমনি তিনি ছেলেমানুষের মত ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং ভায়ের একখানি হাত ধরিয়া বলিলেন, দাদা তুমি আমার কি করলে?

মহেশবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি। এক পয়সা মূলধন না লইয়া ব্যবসায়ের পিচ্ছিল পথে চলিতে চলিতে বহু টাল সামলাইয়াও শেষে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন। কাজেই তিনি দার্শনিকের মত ভাবাবেগ বর্জিত কণ্ঠে বলিলেন, কি জানিস বোন, বয়সই বল, আর রূপই বল—এ জগতে সবই দুদিনের কিন্তু টাকার প্রয়োজন চিরদিনের। তাই বহু অনুসন্ধান করে আমি এই পাত্রটি জোগাড় করতে পেরেছি। মলিনার বরাত ভালো—তুই দেখিস্ ও রাজরাণী হবে।

বলাবাহুল্য মহেশবাবুর মুখ হইতে এইসব ভালো ভালো কথা শুনিয়াও তাঁহার ভগ্নি আদৌ সান্ত্বনা পাইলেন না, বরং আরও কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি কলের চাকার মত আপনি ঘুরিয়া চলিতে লাগিল। তাই বাসর ঘর যখন চিরাচরিত প্রথায় আত্মীয়া ও অনাত্মীয়া রমণীদের আমোদ উচ্ছ্বাসে মুখরিত হইয়া উঠিল তখন যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এই আনন্দ আয়োজন তাহার মনের মধ্যে যে নিদারুণ ব্যথা কালো মেঘের মত জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল তাহার খবর বোধ করি একমাত্র অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহই জানিতে পারিল না!

মলিনা ঘাড় গুঁজিয়া সারারাত্রি বাসর ঘরে বসিয়া রহিল। কোন আনন্দ উল্লাসে যোগ দিল না। সঙ্গিনীরা কেহ কেহ তাহাকে লইয়া যে টানাটানি করে নাই তাহা নহে কিন্তু মলিনার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সবাই ক্ষান্ত হইয়াছে। তাহার এইরূপ চেহারা ইতিপূর্বে আর কেহ কখন দেখে নাই।

ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে মলিনা বাসর ঘর হইতে বাহির হইয়া দোতলায় ছাদের এককোণে গিয়া বসিয়া বসিয়া খুব খানিকক্ষণ কাঁদিল! একবার ইহাও তাহার মনে হইল ছাদ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলে কেমন হয়, কিন্তু নীচের দিকে তাকাইতে তাহার আর সাহসে কুলাইল না। হাত পা ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাই চুপ করিয়া বাঁশবনের দিকে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল!

বিবাহ-বাড়ী তখন নিদ্রামগ্ন। কেহ কোথাও জাগে নাই। যাহারা বাসর জাগিতে আসিয়াছিল। তাহারাও সবাই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

মহেশবাবুর 'ডায়বিটিস্' রোগ ছিল, তাহার উপর অধিক খাটাখাটুনির ফলে

এমন গায়ের জ্বালা ধরিয়াছিল যে ভোর হইবার বহু পূর্বেই সেদিন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তাই বহুক্ষণ বিছানায় ছটফট করিয়া তিনি যখন ছাদে শুইবার জন্য একটা মাদুর বগলে করিয়া উপরে উঠিলেন তখন মলিনাকে সেখানে একাকী দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মনে একটা খটকা লাগিল। তবে কি তিনি সত্যই অন্যায় করিলেন তাহার বিবাহ দিয়া!

মলিনা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। তিনি নিঃশব্দে তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং ধীরে ধীরে তাহার মাথার উপরে একটি হাত রাখিয়া বলিলেন, মা তুই একলা এখানে কি করছিস্?

মলিনা প্রথমটা চমকাইয়া উঠিল। তারপর ছিন্নলতার মত কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে তাঁহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। এমনভাবে কাঁদিতে তিনি আর কখনও তাহাকে দেখেন নাই। মহেশবাবু তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিলেন, মা তুই রাজরাণী হয়েছিস—আমি কি তোকে যার তার হাতে দিয়েছি!

মলিনা বলিল, মামা আমি ত রাজরাণী হতে চাইনি, আমি যে গরীব কাঙ্গালের মেয়ে।

মহেশবাবু বলিলেন, তুমি যে মা লক্ষ্মী—গরীবের ঘরে তোমার স্থান হবে কেন মা? তাই ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন এমন সুপাত্র। তা না হ'লে আমার কি সাধ্য আছে যে এত বড়লোকের ঘরে বিয়ে দেবো। পূর্বজন্মের বহু পুণ্য থাকলে তবে সতীশের মত পাত্র মেলে মা একথা যেন ভুলে যাস্নি।

বাস্তবিক পাত্র হিসাবে সতীশ যে অত্যন্ত লোভনীয় সে বিষয়ে কাহারো কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কলিকাতায় তাহার চারিখানা বাড়ী। তাহা ছাড়া গাড়ী ঘোড়া লোকজন দাসদাসী যে কত তাহার ইয়ত্তা নাই। বড় ব্যবসায়ী সে। গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে জঙ্গল জমা লইয়া কাঠ বিক্রী করিয়া প্রতি বছরে মোটা টাকা লাভ করে। তবে বয়স যে একটু বেশী হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী সে নিজেই। কেননা ছেলেবেলা হইতে সে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যতদিন না রীতিমত বড়লোক হইতে পারে ততদিন বিবাহ করিবে না। তাই যখন তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল তখন নিজে মেয়ে দেখিতে শুরু করিয়া দিল। [illegible]বর সুন্দরী মেয়ে বিবাহ করিবে ইহাও ছিল তাহার কল্পনা। তাই বহু [illegible] অপছন্দ করিয়া শেষে মলিনাকে সে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিল। বিবাহের ব্যাপারে যে বেশী বয়সটা একটা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে ইহা সে মানিত না। পয়সা থাকিলে জীবনের পথে যে কোন বাধাই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না ইহা সে বিশ্বাস করিত। উপযুক্ত ঘুষ দিতে পারিলে জগতে যে অসম্ভব সম্ভব হয় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বহুবার সে তাহার প্রমাণ হাতে হাতে পাইয়াছে!

যদিচ ব্যবসা ও বিবাহ এক জিনিষ নয় এবং টাকা দিয়া কাঠ কেনা যেমন সহজ মানুষের মন কেনা তত সহজ নয় তবুও সতীশের অনুমানই ঠিক হইল। প্রথম দুই চার দিন শ্বশুরবাড়ী যাইয়া মলিনা খুব কান্নাকাটি করিলেও ফুলশয্যার

পরদিন হইতে সে একেবারে যেন বদলাইয়া গেল। কান্না দূরে থাক, হাসিতে সর্বদা তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া থাকিত। ইহার কারণ আর কিছুই নয়। বিবাহের দিন হইতে মলিনাকে কান্নাকাটি করিতে দেখিয়া ফুলশয্যার দিন রাত্রে কোন কথা বলিবার আগে সতীশ হীরামুক্তাখচিত একসেট অলংকার তাহাকে উপহার দিয়া বসিল। গরীবের মেয়ে মলিনা সেই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ করিয়া সতীশের প্রতি এমন কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল যে স্বামী যখন রাত্রে তাহাকে প্রশ্ন করিল তাহাকে তাহার পছন্দ হইয়াছে কিনা, মলিনা তখন সে কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া শুধু স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সতীশ তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে আবার জিজ্ঞাসা করিল, মলিনা তুমি কি আমায় ভালবাসতে পারবে না?

অশ্রু-জড়িতকণ্ঠে মলিনা বলিল, ওকথা বলো না, আমি যে তোমার পায়ের ধূলোর যোগ্য নই।

সতীশ তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, ছিঃ মলিনা, ওকথা বলতে নেই, ওকথা শুনলে আমার বড় কষ্ট হয়। তুমি যে আমার নয়নের মণি, হৃদয়ের সর্বস্ব—আমার দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষার ধন! তারপর আরো একটু আদর করিয়া বলিল, পারবে মলিনা আমাকে সম্পূর্ণরূপে তোমার ক'রে নিতে?

মলিনা একথার কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না শুধু স্বামীর বাহু বন্ধনের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিল।

কিন্তু তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সতীশের বক্ষের মাঝে যেন কালবৈশাখীর ঝড় উঠিল। তাহার মনে হইল বুঝি এখনি তাহার বহু প্রতীক্ষিত আশাতরণী ডুবিয়া যাইবে। তাই ব্যাকুলকণ্ঠে আবার বলিয়া উঠিল, বলো মলিনা, তুমি একবার মুখ ফুটে বলো—হবে আমার হৃদয়ের রাণী?

অতি অস্ফুটস্বরে মলিনা স্বামীর কানে কানে বলিল, বড় ভয় হয়—আমি যে বড় হতভাগিনী!

ক্ষিপ্তের মত সতীশ তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল, না-না-না ওকথা বলো না—তুমি যে এখন রাজরাণী!

মলিনা কাঁদিয়া ফেলিল। এত সোহাগ এত আদরের কথা শুনিয়া কিনা কে জানে!

পরদিন সকালে উঠিয়া সতীশ তাহার লোহার সিন্দুকের চাবি মলিনার আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, আজ থেকে আমার সকল দায়িত্ব তোমার হাতে তুলে দিলুম।

মলিনা কি যেন বলিতে গেল কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইবার আগেই সতীশ সেখান হইতে চলিয়া গেল। মলিনা সেই আঁচলে বাঁধা চাবির গোছাটি হাতে করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভিখারিণী সত্যই রাজরাণী হইল! মলিনা ভাবিয়া অবাক হইয়া গেল! সেইদিন হইতে কেন জানি না মলিনার কেবলই মনে হইতে লাগিল সে-বাড়ীর

ছোট হইতে বড় সবাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে যেন আদেশের প্রত্যাশায়।

চাকর-বাকরেরা সর্বদাই মা মা বলিয়া তাহাকে ডাকিয়া অস্থির করিয়া তুলিত; তাহার উপর বাড়ীর ছেলে বুড়া সবাই যাহার যাহা সম্পর্ক—কেহ মামিমা, কেহ কাকিমা, কেহ জ্যাঠাইমা, কেহ বৌদিদি প্রভৃতি বলিয়া তাহাকে চারিদিক হইতে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিত।

প্রথম প্রথম মলিনার ভারী লজ্জা লাগিত এবং সত্যকথা বলিতে কি বিরক্তও সে হইত। তাই তিন-চারবার ডাকিবার পর কোন রকমে একবার ঘাড় নাড়িয়া কিংবা ইসারা করিয়া কাহারো কথার উত্তর দিত। কিন্তু তখন হইতে তাহার চোখের দৃষ্টি যেন বদলাইয়া গেল। সেই ঘর বাড়ী, দাসদাসী, গাড়ী ঘোড়া, লোকজন সবাইকে তাহার একান্ত আপনার বলিয়া মনে হইতে লাগিল এবং তাহাদের ডাক তাহার কানে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে যেন মধুবর্ষণ করিত। তখন আরো—আরো শুনিবার জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তাহার উপর সতীশ আদরে, যত্নে, সেবায় তাহাকে এমন অভিভূত করিয়া ফেলিল যে বিবাহের আটদিন পরে যখন মলিনাকে বাপের বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিল সে যাইতে রাজী হইল না।

আরো কিছুদিন থাকিয়া প্রায় দেড়মাস পরে মলিনা বাপের বাড়ী ফিরিল। রাজেন্দ্রাণীর মত তাহার বেশভূষা। অলংকারে ঐশ্বর্যে ঝলমল করিতে করিতে সে তাহার মাকে গিয়া নমস্কার করিল।

মা তাহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া কাঁদিবেন কিনা ভাবিতেছেন এমন সময় মলিনার অত্যুজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়া গেলেন। তখন তিনি মেয়ের পা হইতে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন।

মলিনা ইচ্ছা করিয়া সমস্ত অলংকার পরিয়া আসিয়াছিল। সোনারূপা, হীরা-মুক্তা ও জড়োয়ার গহনা কোনটাই রাখিয়া যায় নাই। যেখানে যাহা পরিলে ভাল দেখায় তাহা ত লইয়া ছিলই উপরন্তু যে সব প্রতিবেশী বৃদ্ধ বর বলিয়া বিবাহের দিনে নাক তুলিয়াছিল তাহাদের দেখাইবার জন্য বিশেষ করিয়া বাকী গহনাগুলিও বাক্স ভরিয়া লইতে সে ভোলে নাই।

তাই মলিনার মা মেয়েকে আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁরে মলি, এ সমস্ত গয়না কি তোর?

মলিনা সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ—আরো আছে মা বাক্সয়।

এমন সময় হৈ-হৈ করিতে করিতে পাড়া প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে বাড়ী ভরিয়া গেল। বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবতী, প্রৌঢ়া যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল সবাই সেই বধূরূপিণী মলিনাকে দেখিতে আসিল।

পল্লীগ্রামে মেয়েরা প্রথম শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ী ফিরিলে এই রকম

ভীড় হইয়াই থাকে, তবে এক্ষেত্রে একটু বেশী জনতা হইবার কারণ এই যে বুড়োর হাতে পড়িয়া মলিনার ঠিক কতখানি সুখ বা দুঃখ হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিতে সবাই আসিয়াছিল। সেইজন্য বাড়ীতে পা দিয়াই গ্রাম সম্পর্কের পিসীমাসীর দল বলিয়া উঠিলেন, তবু ভালো এতদিনে আমাদের মনে পড়লো—আমরা ত ভাবলুম বুঝি শ্বশুরবাড়ী পেয়ে মা মাসীদের ভুলে গেলি লো।

সঙ্গে সঙ্গে মুখে গুল ঠুসিতে ঠুসিতে পাশের বাড়ীর ক্ষান্তপিসী আসিয়া বলিলেন, খুব যাহোক দেখালি মা—ধন্যি কলিকালের মেয়ে—তোদের খুরে খুরে নমস্কার, বলি শ্বশুরবাড়ী আমাদেরও একদিন হয়েছিল, সোমত্ত বয়েসও ছিল—তবু যদি বুড়ো বর না হতো ত কি করতিস ? ওমা কি ঘেন্নার কথা, এখান থেকে লোক নিতে গেল তাকে কিনা ফিরিয়ে দিলি ! হ্যাঁ মলিনা, লজ্জা সরমের মাথাও কি একেবারে খেয়েছিস ?

মলিনা ইহার কোন উত্তর না দিয়া শুধু খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তখন উপস্থিত সকলে নানা রকমের ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল।

নববধূকে উদ্দেশ্য করিয়া এই রকম রসিকতা রোজই চলে। কিন্তু মলিনা এসবে কান দেয় না। সে যে সুখী হইয়াছে—আশাতীত, কল্পনাতীত, ইহা তাহাদের কাছে দেখাইবার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে। যেমন কোনদিন যদি মামাতো ভাই-বোনেরা একটা পয়সা চায়, সে একটা টাকা দিয়া বসে। কখনো বা একটা পুতুল কিনিয়া কাহাকে হঠাৎ উপহার দেয়। কখনো বা তুচ্ছতম কাজ করাইয়া লইবার ছলে পাড়া প্রতিবেশী বালক বালিকাদের সিকি, আধুলি এমন কি টাকা পর্যন্ত বকশিস করে।

মলিনার ইচ্ছা সে যে বড়লোকের স্ত্রী একথাটা অন্ততঃ বাড়ী হইতে শুরু করিয়া দেশের সকলে জানুক।

তাই হয়ত ছেলেদের বারোয়ারী সরস্বতী পুজায় সে হঠাৎ পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়া বসে ; নয়তো মামাতো ভাইবোনদের বনভোজনের সমস্ত খরচা নিজে বহন করিতে রাজী হয়। আবার কোন কোন দিন পাড়া প্রতিবেশী পিসীমাদের সঙ্গে তাস খেলিতে বসিয়া অকস্মাৎ মলিনা বাজী রাখে। তারপর ইচ্ছা করিয়া হারিয়া গিয়া বাক্স হইতে টাকা বাহির করিয়া আনিয়া সকলের সামনে ফেলিয়া দেয়।

তাহার ভুল খেলা দেখিয়া অপরপক্ষ চটিয়া ওঠেন। কিন্তু মলিনা তাহা গ্রাহ্য করে না। তাহার অংশীদারও যত রাগ করে মলিনাও যেন তত হাসিতে খুশিতে ফাটিয়া পড়ে। অবশেষে তিনি বিরক্ত হইয়া বলেন, হ্যাঁলা মলি, বলি পয়সার দেমাকে যে একেবারে ফেটে পড়ছিস, তবু যদি বুড়ো ভাতার না হতো ত কি করতিস ?

এই কথা শুনিয়া আরো জোরে সে হাসিয়া ওঠে। হাসিতে হাসিতে মলিনার দম বন্ধ হইয়া যায়। কোন রকমে তাসটা মুখে চাপিয়া ধরিয়া তখন হাসির বেগ

দমন করিতে করিতে সে বলে, হ্যাঁগা মাসী, তোমাদের ত জোয়ান বরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল—তোমরা তখন কি করতে বলো না ?

তিনি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, কেন লা, মিলিয়ে দেখবি নাকি বুড়ো বরে আর জোয়ান বরে কত তফাৎ ?

মলিনা এই কথা শুনিয়া আরো হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তারপর ছোট মেয়ের মত সোহাগভরা কণ্ঠে বলিল, আমার ত মনে হয় তোমাদের বুড়ো জামাইয়ের মত এমন ক'রে আর কেউ ভালবাসতে জানে না।

ওলো এই বলে এখন নিজের মনকে প্রবোধ দে—দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে ? এই বলিতে বলিতে আঁচলের খুঁট হইতে দোক্তা বাহির করিয়া ক্ষান্ত পিসী মুখে একটু ফেলিয়া আবার তাস ভাঁজাইতে থাকেন।

ক্ষান্ত পিসী পাড়ার সরকারী পিসী। মলিনার মা তাঁহাকে পিসী বলে, মলিনা তাঁহাকে পিসী বলে, তাহার দিদিমাও নাঁকি ওই বলিয়া ডাকিতেন। আবার পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরাও পিসী বলিয়া ডাকে। তাঁহার প্রায় ষাট বছর বয়স হইয়াছে কিন্তু দশ বছর বয়সে বিধবা হইয়া সেই যে বাপের বাড়ী আসিয়া উঠিয়াছিলেন সেই হইতে দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া ওই একই নামে সর্বত্র সুপরিচিত। গ্রামের সব বাড়ীতেই তাঁর যেমন অবাধ গতিবিধি তেমনি অসীম প্রতিপত্তি। তবে দুপুরের আড্ডাটা বেশীর ভাগ দিন মলিনাদের বাড়ীতেই বসে। গ্রামের আরও পাঁচজন সেখানে আসিয়া জোটে এবং সবাই ক্ষান্ত পিসীর কথায় সায় দিয়া তাঁহাকে খুশী রাখিতে চায়। তাই মলিনা সেই কথার উত্তরে একরকম সবাইকে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, আমিও বলি পিসীমা দুধ ও ঘোলে তফাৎ আছে কিন্তু মেয়েদের কাছে বরেরা সবাই সমান—কোন তফাৎ নেই। বরং বুড়োদের কাছ থেকে যত্ন ভালবাসা বেশী পাওয়া যায়।

ক্ষান্ত পিসী বলিলেন, ওমা, অবাক করলি, মলিনা—বুড়ো ও ছোঁড়াকে তুই যে একদলে ফেললি !

মলিনা হাসিতে হাসিতে বলিল, মেয়েদের কাছে ত তারা এক পিসীমা—শুধু পুরুষ। তাছাড়া ছোঁড়াদের মন পাবার জন্যে মেয়েদের সর্বদা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয় কিন্তু বুড়োদের বেলা ঠিক উল্টো—মেয়েদের মন পাবার জন্যে তারা সর্বদাই 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' বলে।

মাথার উপর চুলটা ঢিপি করিয়া জড়াইতে জড়াইতে একজন খপ্ করিয়া বলিয়া উঠিল, ওলো মলি শোন তবে বলি—ইচ্ছে ক'রে আমি রাগ করতুম এবং না খেয়ে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন তোর মেসোমশায় পায়ে ধরে কত খোসামোদ করতো তবে আমি ভাত মুখে দিতুম—তোর মেসোমশায়কে দেখতে ছিল ঠিক রাজপুত্তুরের মত আর আমার চেয়ে দুবছরের বড় ছিল মাত্র। ভালবাসতে ছোঁড়ারাও জানে লো জানে।

মলিনা বলিল, তোমাকে ত তবু রাগ করতে হতো আর আমাকে যে তাও করতে

হয় না—তোমাদের জামাই পায়ে ধরা দূরে থাক একেবারে পায়ের তলায় পড়েই আছে। এই বলিতে বলিতে খিল খিল করিয়া সে হাসিয়া উঠিল।

ক্ষান্ত পিসী বলিলেন, তাহোক্ তবু বুড়ো বরের সঙ্গে ছোকরা বরের আকাশ পাতাল তফাৎ।

মলিনা ইহার কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল কিন্তু পারিল না। সবাই তাস খেলা ভঙ্গ করিয়া ঠিক সেই সময় উঠিয়া পড়িল।

তখনো পল্লীগ্রামের মেয়েদের পুকুরের ঘাটে গিয়া গা ধুইবার সময় হয় নাই তবুও কিন্তু মলিনা সাবানদানি হাতে করিয়া তোয়ালে কাঁধে ফেলিয়া তাহাদের বাড়ীর সংলগ্ন দিঘীটার সানবাঁধানো ঘাটে গিয়া নামিল। জলের মধ্যে প্রথম যে সিঁড়িটা ডুবিয়াছিল তাহার উপর বসিয়া মলিনা ভাবিতে লাগিল ক্ষান্তপিসীর সেই কথাটি।

কিন্তু যতই সে ভাবে ততই তাহার মনে হয় মেয়েদের জীবনে যুবক বৃদ্ধে কোন প্রভেদ নাই, সব এক—তাহারা শুধুই পুরুষ! তাই যদি হয় তবে এত বিচার করিবার কি আছে? বরং বৃদ্ধ স্বামীর হাতে পড়া নারীর সৌভাগ্য। যশ, অর্থ, খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্তই প্রথম দিন হইতে স্বামীর নিকট পাওয়া যায়। তখন তাহার সমবয়সী অন্যান্য মেয়ে যাহাদের বিবাহ হইয়াছে তরুণ যুবকের সঙ্গে তাহাদের কথা চিন্তা করিয়া মলিনার মনে রীতিমত কষ্ট হইতে লাগিল। একমুঠো ভাতের সংস্থান করিতে যেসব যুবকের দিনরাত কঠিন সংগ্রাম করিতে হয় তাহাদের জীবনে সুখ কোথায়? অনাহারের মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের স্থান নাই। সেখানে বিবাহ একেবারেই অসম্ভব। মলিনার বহু সঙ্গিনী ত তাহারই কাছে স্বামীর দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করিয়া কত কাঁদিয়াছে, কত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে! তবে বিবাহের অর্থ কি—যদি সুখ, শান্তি না রহিল মানুষের মনে? অথচ নারী সে তো দেবতার পায়ে নিবেদিত ফুলের মত। বিরাট পাথরের দেবতাও তাহার কাছে যা, হাতে গড়া মাটির মহাদেবও তাই। ফুল, সর্বদা ফুলই!

এই সব চিন্তা করিতে করিতে মলিনার কেবলই মনে হইতে লাগিল, বিবাহে তাহারই জিত হইয়াছে সবচেয়ে বেশী—ক্ষান্ত পিসীর ধারণা একেবারে ভুল! সাঁতার দিয়া তখন সে পুকুর তোলপাড় করিতে লাগিল।

বাস্তবিক মলিনা জিতিয়াছে, তাহার মনে সুখ আর ধরে না! জুড়ি গাড়ী, লোকলস্কর, খ্যাতি প্রতিপত্তি, স্বামীর ভালবাসা, সবই সে পাইয়াছে পূর্ণমাত্রায়। তাহাকে খুশী করিবার জন্যই সর্বদা তাহার স্বামী ব্যস্ত থাকে। আরো বহু মেয়ের বিবাহ হইয়াছে সত্য কিন্তু এমনধারা স্বামী কয়জন পাইয়াছে?

প্রকৃতই সতীশের মনে অহরহ শুধু জাগিয়া থাকিত মলিনাকে খুশী করিবার চিন্তা। মলিনা রূপসী, যুবতী এবং অল্পবয়সী! তাই প্রাণপণ যত্নে সে মলিনার মন রাখিতে চেষ্টা করিত। এবং একটা জিনিষ চাহিলে দশটা আনিয়া দিয়া তাহাকে সুখী করিত।

এইভাবে খুশী করিতে করিতে মাত্র দুই বৎসর পরে সতীশ দেখিল নিজস্ব সত্তা বলিয়া তাহার আর কিছু নাই। মলিনার খুশিতে তাহার খুশি, মলিনার সুখে দুঃখে তাহার সুখ দুঃখ! তাহার স্ত্রী যে তাহাকে এত অল্পদিনের মধ্যে জয় করিয়া লইয়াছে ইহা ভাবিয়াও সতীশ মনে মনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিত। মলিনার মত সুন্দরী ও যুবতী স্ত্রীর হাতে নিজেকে নিঃশেষে দান করিতে পারিয়া সে যেন ধন্য হইয়াছে! ইহার জন্য তাহার মনে গর্ব ও আনন্দের সীমা ছিল না! স্ত্রীর ভালবাসার কথা বলিতে যাইয়া সতীশ বন্ধুবান্ধবদের কাছে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিত।

মলিনাও স্বামীর প্রেমে গদগদ। সঙ্গিনীদের বুঝাইতে ছাড়িত না যে এমন স্বামী পৃথিবীতে আর কখনো কাহারো হয় নাই।

সত্যই মলিনা স্বামীর নিকট হইতে প্রতিনিয়ত এই রকম অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত স্নেহ ভালবাসার শত সহস্র নিদর্শন পাইয়া সতীশকে দেবতার মত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। একদিনের জন্যও তাহাদের মধ্যে কোন অশান্তি কোন মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় নাই। অতি আনন্দে তাহাদের দিন কাটিতেছিল।

ইহার উপর আবার সতীশ আর এক চমক লাগাইয়া দিল। তাহাদের বিবাহের দিনটির স্মৃতি উজ্জ্বলতর করিবার জন্য চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর উপর বিরাট এক সৌধ গোপনে নির্মাণ করাইয়া তাহাদের বিবাহের পঞ্চম বাৎসরিক দিনে উহা মলিনাকে উপহার দিয়া বসিল। বাড়ীটির নাম সুখস্মৃতি! মলিনা তাহার স্বামীর নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য লাভ করিয়া দিশাহারা হইয়া গেল। কি করিয়া স্বামীকে খুশী করিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে তখন স্বামীর একটি বিরাট তৈলচিত্র আনিয়া তাহার শয্যার পাশে রাখিয়া দিয়া বলিল, তুমি দিনরাত আমার চোখের সামনে এমনি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে।

সতীশ তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, তা' হবে না—তোমাকেও সকল সময় আমার চোখের সামনে থাকতে হবে। অর্থাৎ আমার ছবির বাঁ পাশে তোমারও একখানি ছবি থাকবে। এই বলিয়া মলিনার একটি বিরাট তৈলচিত্র আনিয়া সতীশ তৎক্ষণাৎ তাহার ছবির পাশে টাঙাইয়া দিল। তারপর দুজনে মিলিয়া সেই ছবির দিকে চাহিয়া খুব একচোট হাসিল।

তখন সতীশ বলিল, না এও ভালো দেখাচ্ছে না—তোমার এবং আমার ছবির মাঝে যেন ফাঁক রয়েছে। তার চেয়ে এসো দু'জনের একখানা যুগল ছবি এনে এখানে রাখা যাক্।

তাহাই হইল। মলিনা চেয়ারে বসিয়া আছে আর তাহার কাঁধে হাত দিয়া সতীশ দাঁড়াইয়া আছে—এইরূপ একখানি বিরাট তৈলচিত্র আনিয়া তাহাদের শোবার ঘরে রাখা হইল। সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো প্রকাণ্ড ছবি দক্ষিণের দেওয়ালটা জুড়িয়া জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

সতীশ তখন ধীরে ধীরে মলিনার একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া

লইয়া বলিল, মলিনা আজ আমার চেয়ে সুখী জগতে কে ?

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া মলিনা বলিল, আমি।

সতীশ তাহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, সত্যি বলছো ?

মলিনা বলিল, এর চেয়ে সত্যি কথা আমি জীবনে বোধহয় আর কোনদিন বলিনি। তুমি নিজেই ভেবে দেখো বাঙালীর ঘরে আমার মত ভাগ্যবতী মেয়ে ক'টা আছে ? কোন্ মেয়ে আমার মত এমন স্বামী পেয়েছে ?

সতীশ এই প্রথম স্ত্রীর মুখে নিজের প্রশংসা শুনিল। আনন্দে তখন তাহার সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

মলিনার মনও তখন আনন্দে উৎসাহে উচ্ছ্বসিত ! সে ঘরের চারিদিকে গুন গুন করিয়া গান গাহিয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। শ্বেতপাথরের মেঝে, মসৃণ ও চিক্কণ, ঘরের দেওয়ালগুলি অপূর্ব কারুকার্যখচিত, ছাদ হইতে বড় বড় কাঁচের বৈদ্যুতিক ঝাড়-আলো ঝুলিতেছে, জানালায় দরজায় নানাবর্ণের রঙীন কাঁচ দেওয়া। এরকম ঘর ইতিপূর্বে আর মলিনা দেখে নাই। তাই এই বিরাট অট্টালিকাটি যে তাহারই জন্য নির্মিত একথা চিন্তা করিতে গিয়া তাহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল ! বারবার তাহার মনে হইতে লাগিল ইহা ত ইঁট, কাঠ, চুণ, সুরকী, পাথরের বাড়ী নহে, ইহা যেন তাহার স্বামীর অন্তরের সমস্ত প্রেম দিয়া গড়া তাজমহল !

স্বামীর প্রেমে বিভোর হইয়া মলিনা তখন পশ্চিমের জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। হাওয়ায় তাহার উপরের খড়খড়ি দুইটি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি সে তাহা খুলিয়া ছিটকিনী লাগাইয়া দিল।

শীতের মধ্যাহ্ন। কলিকাতার বাড়ীগুলির উপর তখন সূর্যের নিস্তেজ আলো পড়িয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। মলিনা চারতলার ঘরের জানলায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ দুই-তিনখানা বাড়ী পার হইয়া একটি দোতলার ঘরে তাহার দৃষ্টি যাইতেই সে চমকাইয়া উঠিল ! একটি যুবক ঘরের মেঝের উপর মাদুরে ঘুমাইতেছে আর একটি যুবতী তাহার ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য নানারকম কৌশল করিতেছে। কখনো সে তাহার চুল ধরিয়া টানিতেছে, কখনো বা পিঠে কিল চড় মারিতেছে, কিন্তু যুবকটি মড়ার মত পড়িয়া আছে। শেষে সেই যুবতীটি গ্লাসে করিয়া একটু জল আনিয়া তাহার গালের উপর দুই চার ফোঁটা ফেলিয়া দিল। যেমন দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে যুবকটি লাফাইয়া উঠিল। মেয়েটি তখন হাসিতে হাসিতে পলাইয়া যাইতেছিল কিন্তু খপ করিয়া তাহার কাপড়ের আঁচলটি ধরিয়া ফেলিয়া যুবকটি একেবারে তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল। তারপর যাহা করিতে লাগিল তাহা আর মলিনা দাঁড়াইয়া দেখিতে পারিল না। তাহার মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল, সে পলাইয়া আসিল সেখান হইতে। তবে তাহারা যে স্বামী স্ত্রী এ

কথা বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না।

মলিনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল তারপর আবার ছুটিয়া জানালায় গেল তাহাদের দেখিতে। এবার আর এক নতুন দৃশ্য তাহার চোখে পড়িল। মেয়েটি ঘরের মধ্যে এখানে ওখানে ছুটাছুটি করিতেছে আর তাহার স্বামী তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাতে ছোট ছেলের মত দৌড়াইয়া মরিতেছে।

মলিনা আর দেখিতে পারিল না—তাড়াতাড়ি চোখে হাত চাপা দিয়া বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার সারা দেহ তখন থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

শুইয়া শুইয়া সে প্রতিজ্ঞা করিল আর সেই বাড়ীর দিকে চাহিবে না। কিন্তু ঘণ্টাখানেক যাইতে না যাইতে আবার মলিনার মন কেমন অস্থির হইয়া উঠিল; চুপি চুপি আবার সে গিয়া দাঁড়াইল সেই জানালার ধারে। এবার দেখিল তাহারা দুজনে কাড়াকাড়ি করিয়া মুড়ি খাইতেছে! কখনো স্বামী স্ত্রীর মুখে দিতেছে, কখনো বা স্ত্রী স্বামীর মুখে খাওয়াইয়া দিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহার শরীর কেমন করিতে লাগিল, সে দুই হাতে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল।

এইভাবে কয়েক মিনিট কাটিয়া যাইবার পর যেমন সে উঠিয়া দাঁড়াইল অমনি তাহার চোখ পুনরায় গিয়া পড়িল সেই মেয়েটির দিকে। মেয়েটি তখন বারান্দায় দাঁড়াইয়া হাত নাড়িতেছিল আর যুবকটি রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে বারবার পিছন ফিরিয়া তাহাকে দেখিতেছিল।

মলিনার মুখ চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। তাহার অন্তরে একটা কিসের ঝড় উঠিল। সে আর সে দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না! মাতালের মত টলিতে টলিতে একেবারে বিছানায় গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। শুধু তাহার দুই চক্ষু দিয়া নিঃশব্দে কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, কেন তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারিল না।

চারটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে সতীশ কতকগুলি ফুলের মালা হাতে করিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মলিনা ঘুমাইতেছে মনে করিয়া একটি মালা সে চুপি চুপি তাহার গলায় পরাইয়া দিল। গলা হইতে মালাটি খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া মলিনা বলিল, যাও ভাল লাগে না, আমায় বিরক্ত করো না।

মলিনার মুখের দিকে চাহিয়া সতীশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি তাহার কপালে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মলিনা তোমার কি অসুখ করেছে?

মলিনা প্রথমটা তাহার কথার কোন উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল। তখন সতীশ তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আবার প্রশ্ন করিল, মলিনা তোমার কি হয়েছে বলো, লক্ষ্মীটি?

মলিনা তাহার মাথার উপর হইতে স্বামীর হাতটি সরাইয়া দিয়া বলিল, কিছু হয়নি—

ব্যগ্রকণ্ঠে সতীশ আবার বলিল, তবে তুমি এমন করছো কেন ?

মলিনা বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বলিল, জানি না। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি আমায় একটু একলা থাকতে দাও।

মলিনার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সতীশের মনটা ভারী খারাপ হইয়া গেল। কোন দিন ত সে মলিনাকে এইভাবে তাহার মুখের উপর কথা বলিতে শুনে নাই, তবে আজ তাহার কি হইল ? এই কথা চিন্তা করিতে করিতে সতীশ তখন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন রাত্রে মলিনা স্বামীর সহিত কোন কথা কহিল না। সতীশও আর তাহাকে বিরক্ত করিল না ! সে মনে করিল গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে খাটাখাটি করিয়া শরীরটা হয়ত তাহার খারাপ হইয়াছে, ভাল করিয়া একটু ঘুমাইলে কাল আবার ঠিক হইয়া যাইবে।

কিন্তু পরের দিন হইতে সতীশ লক্ষ্য করিল মলিনা যেন কেমন গম্ভীর হইয়া থাকে। আগের মত আর হাসিখুশী তাহার মুখে দেখা যায় না—সংক্ষেপে স্বামীর কথার উত্তর দিয়া চলিয়া যায়। সর্বদাই যেন সে একলা থাকিতে চায়।

এইভাবে আরো কয়েক দিন কাটিয়া গেল কিন্তু তখনো সতীশ তাহাকে মুখ ফুটিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। শুধু একদিন ঝিকে চুপি চুপি সে প্রশ্ন করিল, তোর মার কি হয়েছে বলতে পারিস ?

ঝি বলিল, কি করে জানবো বাবু, আমাদের সঙ্গে ত মা আর ভাল ক'রে কথা বলেন না, সংসারের কোন খবর জিগ্যেস করতে গেলেও যেন খিঁচিয়ে ওঠেন সকলের ওপর। শুধু যখন তখন দেখি হয় পশ্চিমের জানালাটার কাছে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন, নয় বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে আছেন।

বাস্তবিক কথাটা ঝি মিথ্যা বলে নাই। মলিনার কেমন নেশা হইয়া গিয়াছিল সেই স্বামী-স্ত্রীর প্রণয় লীলা দেখা। রোজই সে মনে করিত আর দেখিবে না অথচ রোজই সে কিছুতেই নিজেকে উহা হইতে বিরত করিতে পারিত না—কে যেন অমোঘ বলে তাহাকে সেইদিকে টানিয়া লইয়া যাইত।

এইভাবে যখন আরো কিছুদিন কাটিয়া গেল তখন সতীশ একদিন রাত্রে তাহাকে বলিল, মলিনা আমাকে বলতেই হবে তোমার কি হয়েছে ? স্বামী স্ত্রীলোকের দেবতা তার কাছে কোন কথা লুকোনো পাপ ! বল সত্যি করে, তুমি কেন সর্বদা এমন মনমরা হয়ে থাক ?

মলিনা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে এ বাড়ী থেকে তুমি নিয়ে চলো—এখানে আমার মন টিকছে না।

সতীশ বলিল, এতদিন একথা আমায় ত বললেই পারতে, এর জন্যে এত মন খারাপ করার কি আছে ?

মলিনা বলিল, আমি অনেক চেষ্টা করলুম এখানে মন টেঁকাতে কিন্তু আর পারছি না।

তাহাই হইল। পরের দিন সকালে উঠিয়া সতীশ তাহাদের পুরনো বাড়ীতে মলিনাকে লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু মুস্কিল হইল আবার দুই তিন দিন যাইতে না যাইতে মলিনা সতীশকে বলিল, আমাকে নতুন বাড়ীতে নিয়ে চলো—এখানে একেবারে ভাল লাগছে না।

এবারও সতীশ তাহার অনুরোধ না রক্ষা করিয়া পারিল না। এবং মলিনার ইচ্ছানুরূপে ব্যবস্থাই করিল। কিন্তু পুনরায় দুই দিন যাইতে না যাইতে মলিনা সতীশকে ধরিয়া বসিল, আমাকে নতুন বাড়ী থেকে নিয়ে চলো—এখানে ভালো লাগছে না।

সতীশ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, সেকি! এই বললে নতুন বাড়ীতে মন-টেকে না?

মলিনা বলিল, তা আমি জানি না—আমাকে এখনি সেখানে নিয়ে চলো—আমার আর একমুহূর্তও ভাল লাগছে না।

সতীশ কোন দিন মলিনার কথার উপর কথা বলে নাই—তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করাই ছিল তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত সুতরাং এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না।

কিন্তু এখানে আসিয়াও আবার দুই তিন দিন ধরিয়া মলিনাকে সেই রকম গম্ভীর হইয়া থাকিতে দেখিয়া সতীশ প্রশ্ন করিল, মলিনা তোমার কি হয়েছে বল তো—এই নতুন বাড়ীতে আসার দিন থেকে তোমার মুখে হাসি নেই যেন দিনরাত কি চিন্তা করো—না, না, আমি কোন কথা শুনতে চাই না—আজ আমায় বলতেই হবে তোমার কি হয়েছে?

ইহার উত্তরে প্রথমে মলিনা বলিল, জানি না। তারপর বারবার অনুরোধ করিতে যেন একটু বিরক্ত হইয়া সে স্বামীর মুখের উপর উত্তর করিল, মানুষ কি দিনরাত শুধু হি হি ক'রে হাসবে নাকি?

না তা নয়। তা ব'লে তুমি কি দিনরাত গম্ভীর হয়ে থাকবে? আমি ত তোমার কোন অভাব অপূর্ণ রাখিনি। যখন যা চেয়েছো সমস্তই এনে দিয়েছি, কাপড়, গয়না, বাড়ী, ঘর দোর, চাকর দাসী, লোকজন—আর কি স্ত্রীলোক স্বামীর কাছ থেকে প্রত্যাশা করতে পারে?

মলিনা অভিমানভরাকণ্ঠে বলিল, আমি ত তোমার কাছ থেকে আর কিছু চাইনি, তবে মিছিমিছি কেন তুমি আমার ওপর রাগ করছো!

সতীশ বলিল, না রাগের কথা নয়—তবে এ বাড়ীতে আসার পরদিন থেকেই তুমি যেন মনে মনে আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছো বলে মনে হয়। তাই আমাকে দেখলেই তোমার মুখের হাসি কোথায় চলে যায়।

মলিনা অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবে উত্তর দিল, তোমার বোধহয় জানা নেই যে হাসিখুশীরও একটা বয়েস আছে।

সতীশ বলিল, তা তোমার কি সে বয়েস কেটে গেছে?

মলিনা বলিল, আমার হয়ত কাটেনি কিন্তু তোমার ত কেটে গেছে।

সতীশ মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, হঠাৎ এ বাড়ীতে আসার পর থেকে তুমি আমার বয়েস সম্বন্ধে যেন বেশী সচেতন হয়ে উঠেছো—এর আগে কি আমার বয়েস অল্প ছিল, না সেদিকে তোমার দৃষ্টি ছিল না, কোনটা সত্যি ?

দেখ, তোমার এসব বাজে কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। এই বলিয়া যেমন মলিনা চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইল অমনি সতীশ খপ্‌ করিয়া তাহার একটি হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, মলিনা আজ সত্যি ক'রে বলতেই হবে, তোমার কি হয়েছে ?

কি আবার হবে !

নিশ্চয় কিছু হয়েছে, তোমায় বলতেই হবে, আমার দিব্যি !

মলিনা সে কথার উত্তর না দিয়া শুধু ছেলেমানুষের মত স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কিছু হয়নি ! তারপর আবার একটু থামিয়া কহিল, তুমি ওই পশ্চিমের জানালাটা বন্ধ করে দিতে পারো যাতে আর না খোলা যায় ?

তাহার প্রশ্নের এই রকম অবান্তর উত্তর শুনিয়া প্রথমটা সতীশ যেন একটু বিস্মিত হইল ! তারপর ভাবিল হয়ত বাহিরের দিক হইতে কেহ তাহার প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেইজন্য মলিনা তাহাকে এইরূপ অনুরোধ করিতেছে। তাই আর এক মুহূর্ত দেরী না করিয়া তখনি সতীশ আগে মিস্ত্রী ডাকাইয়া সেই জানালাটি বাহির হইতে একেবারে আঁটিয়া দিল।

ইহার পরদিন হইতে মলিনার যেন গৃহের কিছু কাজকর্মে কিছু উৎসাহ দেখা গেল। ইহা লক্ষ্য করিয়া সতীশেরও মনটা একটু প্রফুল্ল হইল।

কিন্তু দুই দিন কাটিয়া গিয়া তৃতীয় দিনে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। দুপুরবেলা যখন সবাই দিবা-নিদ্রায় মগ্ন তখন হঠাৎ মলিনা শয্যা ত্যাগ করিয়া সেই বন্ধ জানালার কাছে গিয়া দুম্‌ দুম্‌ করিয়া পদাঘাত করিতে লাগিল। তাহাতেও যখন খুলিল না তখন সে হাত দিয়া টানাটানি শুরু করিল। এবং ইহাতেও যখন ব্যর্থ হইল, তখন সে সজোরে জানলায় মাথা ঠুকিতে লাগিল। যেমন করিয়া হউক সেই বন্ধ কপাট যেন তাহাকে খুলিতেই হইবে—খুন চাপিয়াছে তাহার মাথায় !

সেই শব্দ শুনিয়া ঝিয়েদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা ছুটিয়া আসিয়া দেখিল মলিনার মাথা ফুলিয়া উঠিয়াছে তবুও সে বারবার আঘাত করিতেছে সেই জানালাটা খুলিবার জন্য। ঝিয়েরা তখন তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, মা জানালাটা যে বন্ধ তুমি কি তা জানো না ?

মলিনা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, আমি কিছু জানতে চাই না, শীগগির খুলে দে।

একদিন যে মানুষ নিজে হুকুম দিয়া সেই জানালাটি বন্ধ করিয়া দিয়াছে আজ সে-ই আবার তাহা খুলিবার জন্য কেন যে মাথা কুটিয়া মরিতেছে তাহা

বুঝিতে না পারিয়া ঝিয়েরা তৎক্ষণাৎ ছুটাছুটি করিয়া ছুতার মিস্ত্রী ডাকিয়া আনিয়া তাহা খুলিয়া দিল।

কিন্তু এবার সেই বাড়ীটির দিকে চাহিয়া মলিনা অত্যন্ত মর্মাহত হইল। দেখিল সেই নবদম্পতিটি নাই, তাহার স্থলে কয়েকটি পুলিশ ও বহু লোকজন সেখানে রহিয়াছে। কি হইল কোথায় গেল তাহারা? ভয়ে তাহার বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। সে তখন চুপি চুপি একজন ঝিকে সেখানে পাঠাইয়া দিল ব্যাপারটা কি জানিয়া আসিবার জন্য।

ঝি ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিল তাহার সারাংশ হইতেছে এইরূপ—সেই দম্পতিটি পনেরো টাকা ভাড়ায় উপরের একখানি ঘর লইয়া থাকিত কিন্তু চারি মাসের ভাড়া দিতে না পারায় বাড়ীওয়ালা তাহার নামে নালিশ করিয়াছিল। তাই আদালত হইতে লোক আসিয়া তাহাদের মালপত্র সব নিলাম করিবার জন্য টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

মলিনা এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল তারপর ঝিকে প্রশ্ন করিল, হ্যাঁরে তাহ'লে ওরা এখান থেকে চলে যাবে?

ঝি বলিল, চলে যাবে না ত কি মা—বাড়ীওলা আর কতদিন বিনা ভাড়ায় রাখবে বল? তার ওপর ছোঁড়া নাকি চাকরীবাকরী কিছুই করে না—শুধু বাড়ীতে বসে থাকে।

মলিনা আরো কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, ওদের কি এখানে কোন আপনার লোক নেই যে এই বিপদের সময় রক্ষা করবে?

ঝি বলিল, আ আমার পোড়াকপাল, তবেই তুমি আপনার লোকদের চিনেছ! পয়সা না থাকলে দুনিয়ায় কেউই আপনার হয় না মা! এই বলিয়া সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

মলিনা তখন তাড়াতাড়ি আলমারী খুলিয়া একশো টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া বলিল, আহা বড় গরীব মানুষ ওরা, তুই এই টাকাটা ওদের দিয়ে আয় ঝি

ঝি টাকাটা হাতে লইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল এবং যাইবার সময় বলিতে বলিতে গেল, আহা কি দয়ার শরীর তোমার মা। তুমি যেমন গরীবকে দিচ্ছো ভগবান তোমায় তেমনি দশগুণ দেবেন!

পরদিন দুপুরবেলা হঠাৎ সেই বউটি মলিনার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। ঈর্ষিত দৃষ্টিতে মলিনা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। কিন্তু মলিনা কিছু বলিবার পূর্বেই বউটি তাহার হাত দু'টি ধরিয়া পূর্বদিনের উপকারের জন্য ছলছলনেত্রে কৃতজ্ঞতা জানাইল। তারপর বিনয় ও সঙ্কোচের সঙ্গে তাহার কাছে স্বামীর একটি চাকরীর

জন্য প্রার্থনা করিল। বউটির নাম নলিনী।

চাকরীর কথা শুনিয়া কণ্ঠে ঈষৎ শ্লেষ আনিয়া মলিনা বলিল, চাকরী যদি তোমার স্বামী করে তা'হলে তুমি কি করবে?

কথাটার অর্থ ভাল রকম বুঝিতে না পারিয়া নলিনী তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল।

মলিনা তখন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ তোমার সোমত্ত বয়েস তার ওপর অমন জোয়ান স্বামী—তাকে ছেড়ে কি থাকতে পারবে?

গরীবদের আবার সোমত্ত বয়েসই বা কি, আর জোয়ান স্বামীই বা কি,—একমুঠো ভাতের মূল্য তাদের কাছে সবচেয়ে বড়—এই বলিয়া নলিনী করুণ দৃষ্টিতে মলিনার মুখের দিকে তাকাইল।

মলিনা ভাবিল, যাক বাঁচা গেছে, তা'হলে এরও মনে দুঃখ আছে! সে তখন মনে মনে একটু উল্লসিত হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার মনে হইল যদি এতই দুঃখ তবে তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে কেমন করিয়া এমন আমোদে দিন কাটায়? এই কথা চিন্তা করিয়া পুনরায় তাহার মন খারাপ হইয়া গেল। তাহার স্বামীর চাকরী করিয়া দিলে পাছে নলিনী আরো সুখী হয় তাই মলিনা মনে মনে স্থির করিল ইহাতে সে কিছুতেই রাজী হইবে না। কিন্তু আবার কি ভাবিয়া পরক্ষণেই সে নলিনীকে কহিল, তাছাড়া আমাদের কাছে চাকরী করতে হ'লে বনে জঙ্গলে তোমার স্বামীকে ঘুরে বেড়াতে হবে, কলকাতার শহরে বসে তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকলে ত চলবে না!

নলিনী তাড়াতাড়ি তাহার হাত দুইটি ধরিয়া বলিল, দিদি তাই যদি একটা করে দাও ত চিরজীবন আমি তোমার কেনা দাসী হয়ে থাকবো। আমার কিছু নেই! গায়ের যা গয়না ছিল আজ দু'বছর হলো একখানা একখানা ক'রে বিক্রী করে কলকাতায় খরচ চালিয়েছি, যদি একটা চাকরী হয় এই ভরসায় কিন্তু ভগবান তবু মুখ তুলে চাননি—পাঁচ ছ'মাস হলো লোকের কাছে ধারদেনা ক'রে কোনদিন একবেলা খেয়ে কোনদিন বা না খেয়ে দিন কাটছে!

যাহা হউক সতীশকে বলিয়া পরদিন হইতেই মলিনা নলিনীর স্বামীর একটা চাকরী করিয়া দিল।

তখন নলিনীর মুখে আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভাষা জোগাইল না। সে মলিনার হাত দুইটি ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তারপর নলিনীকে মলিনার কাছে রাখিয়া তাহার স্বামী চাকরী করিতে গেল বিহারের কোন জঙ্গলে।

বিদায়কালে নলিনীর মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইলেও সে কিন্তু মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া স্বামীকে বিদায় দিল। উপরন্তু তাহার পর হইতে কোনদিন সে মলিনার সামনে কাঁদিত না এমন কি স্বামীর জন্য যে তাহার মন কেমন করিতেছে একথাও প্রকাশ করিত না। কারণ তাহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া ছিল যে তাহা

হইলে মলিনা ভীষণ রাগ করিবে। চাকরী দিবার পূর্বে তাই বারবার সেকথা মলিনা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছিল।

মলিনা নীচের একখানি ঘরে নলিনীকে থাকিতে দিল বিনাভাড়ায়! আপন বলিতে তাহার আর কেহ কোথায় ছিল না বলিয়া তাহার কাছে সেই স্থানটুকু নলিনী ভিক্ষা করিয়া লইয়াছিল। মলিনা শুধু স্থানই দেয় নাই দিনের মধ্যে তিন চার বার আসিয়া তাহার খোঁজ লইয়া যাইত। ইহা ছাড়া সপ্তাহে একখানি করিয়া চিঠি স্বামীর নিকট হইতে নলিনী পাইত।

এমনি করিয়া ছয়মাস কাটিয়া গেল। তারপর মাত্র দুইদিনের জন্য বাড়ী আসিবার ছুটি পাইল নলিনীর স্বামী। স্বামীর সঙ্গে বিবাহের পর হইতে নলিনীর আর কখনো ছাড়াছাড়ি হয় নাই। তাই এই সুদীর্ঘ বিরহের পর সেই মিলনের দিনটির জন্য তাহার সমস্ত মন উন্মুখ হইয়া উঠিল।

এদিকে যতই তাহাদের মিলনের দিন আসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল ততই যেন নলিনীর উদ্বেগ বাড়িয়া চলিল। মলিনার কাছে নলিনী তাহার সেই মনোভাব চাপিতে শত চেষ্টা করিলেও সে কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে ঈর্ষিত হইয়া উঠিল।

ইহার অল্প কয়েক দিন পরে হঠাৎ নলিনী তাহার স্বামীর নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইল। তাহাতে সে লিখিয়াছিল তাহার আসা হইবে না, কোন জরুরী কার্যোপলক্ষে তিন মাসের জন্য আরো কোন সুদূর জঙ্গলে নাকি তাহাকে যাইতে হইবে।

ইহা শুনিয়া নলিনী আর স্থির থাকিতে পারিল না। মলিনা তাহার ঘরে আসিলে কান্না চাপা দূরে থাক সে যেন আরো উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং সেই চিঠিখানি তাহার হাতে দিল।

চিঠিখানিতে একবার মাত্র চোখ বুলাইয়া মলিনা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল তারপর হো হো করিয়া হাসিতে লাগল। অদ্ভুত সে হাসি। নলিনী যত কাঁদে মলিনাও তত হাসিয়া লুটোপুটি খায়।

ইহা দেখিয়া নলিনীর মনে বড় ব্যথা লাগিল।

মলিনা-ই যে সতীশকে দিয়া চিঠি লিখাইয়া নলিনীর স্বামীর ছুটি বন্ধ করাইয়াছে তাহা সে জানিত না। তাই সে প্রশ্ন করিল, দিদি তুমি এত হাসছো কেন?

মলিনা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, তুই তাহলে সত্যিসত্যি কাঁদছিস?

নলিনী বলিল, কি করবো বল দিদি মনটা বড্ড কেমন করছে।

মলিনা হাসিতে হাসিতে তখন তাহার ঘরে চলিয়া গেল এবং সেখানে তাহার স্বামীকে দেখিতে পাইয়া আরো জোরে হাসিয়া তাহার কোলে ছেলেমানুষের মত শুইয়া পড়িল।

মলিনার এই ভাবান্তর দেখিয়া সতীশ প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি, তুমি এত হাসছো কেন ?

মলিনা হাসিয়া স্বামীর কোলে মুখ ঘষিতে ঘষিতে শুধু বলিল, নলিনী কাঁদছে !

একজনের দুঃখে আর একজনের এত উল্লাসের কি কারণ থাকিতে পারে তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে সতীশ মলিনার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু তাতে তোমার কি ?

মলিনা কিছু না বলিয়া শুধু হাসিয়া গড়াগড়ি খাইতে লাগিল !

অপ্রত্যাশিত

অপ্রত্যাশিত বৈ কি, দশ বছর পরে হঠাৎ এইভাবে দেখা হওয়া! কেবল যে দীর্ঘ দিনের ব্যবধান তা নয়, পত্র বিনিময় পর্যন্ত ছিল না—এমনকি কে যে কোথায় আছে সে খবরও কেউ রাখতো না। তবুও প্রথম সাক্ষাতেই তারা দু'জন দু'জনকে চিনতে পারলে।

অবশ্য প্রথমটা অশোকের একটু ধাঁধাঁ লেগেছিল! হাফপ্যাণ্ট পরা, মাথায় টুপি আঁটা, একটা লোক যখন সাইকেলে চেপে ছুটতে ছুটতে তার কাছে এসে হঠাৎ গাড়ীর গতিরোধ ক'রে বললে, হ্যাল্লো অশোক, তখন সে রীতিমত ঘাবড়ে গেল। কিন্তু তার মুখে চোখে বিস্ময়ের ভাব দেখেই শঙ্কর বুঝতে পেরেছিল, তাই একটু পরে মাথার টুপিটা খুলে ফেলে জিজ্ঞাসা করলে, রাস্কেল, আমায় চিনতে পারছিস না?

সহসা এইরকম মধুর সম্ভাষণ শুনে অশোকের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সে একটু থেমে বললে, আরে, শঙ্কর নাকি?

আজ্ঞে হাঁ। তবে এতক্ষণ ধরে না চেনার ভান করা হচ্ছিল কেন? আমার কি আর দুটো হাত বেরিয়েছে যে এত সময় লাগল ঠাওর করতে?

অশোক বললে, হাত বেরুলে বরং সুবিধে ছিল, মানুষটাকে চেনা যেতো। এ যে দুইয়ের বার—না বাঙ্গালী না সাহেব; আমার ত ফিরিঙ্গী বলেই মনে হচ্ছিল তোকে।

শঙ্কর বললে, দ্যাখ ও সব 'ভাঁওতা' আমার কাছে মারিস নি—স্রেফ ভুলে গিয়েছিলি তাই বল না? আমি ত দূর থেকে তোকে দেখেই চিনেছি?

অশোক কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু পারলে না। শঙ্কর ওর মুখের কথাকে চেপে দিয়ে বললে, তারপর এখানে কি মনে করে?

অশোক বললে, চেঞ্জে এসেছি।...আর তুই এখানে?

আমি ত এখানে চাকরী করছি, আজ ন' বছর হ'লো। এই বলে একটু থেমে আবার সে বললে, ওই যে পাহাড়ের নীচে লাল বাংলো দেখা যাচ্ছে, ওইটেই আমার বাসা। চল আমার ওখানে।

অশোক ভোর বেলা বেড়াতে বেরিয়েছিল। নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করার জন্যে তার ক্ষিদের প্রয়োজন, তাই সে প্রত্যহ সাত আট মাইল করে হাঁটতো। সেদিন কিছু বেশী দূরে এসে পড়েছিল এবং ক্লান্ত যে হয়নি তা নয়, তবুও মুখে বললে, আজ থাক ভাই। তোর বাসাটা তো দেখে গেলুম, আর একদিন আসবো!

শঙ্কর বললে, যা দেখি এখান থেকে এক পা, কেমন তোর ক্ষমতা আছে। জানিস্, আমি এখানকার ফরেষ্ট অফিসার—এটা আমার রাজত্ব! শুধু একটা মুখের কথা বললেই হ'লো—ব্যাস্, তোকে এখনি বেঁধে আমার বাসায় নিয়ে

গিয়ে হাজির করবে এখানকার লোকেরা। এই বলে সে হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

অশোক বললে, মাইরি বলছি কাল আমি ঠিক আসবো।

কেন প্রেয়সী বুঝি আজ ভাব্‌বে? তা ভাবুক, দিনরাত যে তার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকতে হবে তার মানে কি? চল্‌-চল্‌ ওঠ্‌ আমার সাইকেলের পেছনে। এই বলে অশোকের গায়ে সে একটা ঠেলা মারলে।

অশোক অবিবাহিত। তাই একথার কি জবাব দেবে ভাবছিল। শঙ্কর তাকে ইতস্তত করতে দেখে আবার বলে উঠলো, হয়েছে বাবা হয়েছে, ভাবনায় যেন একেবারে আকাশ মাথায় ভেঙ্গে পড়লো—আমি এখনি লোক দিয়ে তোর বাসায় খবর পাঠিয়ে দেবোখুন, আমার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই ভাবিস্‌? চল্‌ চল্‌—

আশোক একটু হেসে বললে, আমার স্ত্রী কোথায় যে তার সম্বন্ধে—

আরো কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু শঙ্কর সে কথায় কান না দিয়েই বলে উঠলো, তার কোন কথা আমি এখন শুনতে চাই না, তার সম্বন্ধে যা বলবার আমার বাসায় গিয়ে বলবি! তারপর কণ্ঠস্বর নরম করে বললে, এই মেড়োর দেশে ন' বছর পড়ে আছি, একটা আপনার লোকের মুখ পর্যন্ত দেখিনি, তুই কি বুঝবি আমার মনের অবস্থা!

অশোক বললে, তোর ছেলেমানুষী দেখছি এখনো যায়নি। কলেজে যেমন ছিলি এখনো ঠিক তেমনি আছিস!

বরং তখনকার চেয়ে এখন গুণ্ডামি কিছু বেড়েছে। এই বলে শঙ্কর একরকম জোর করেই তাকে সাইকেলে তুলে নিলে।

অগত্যা অশোককে আত্মসমর্পণ করতে হ'লো।

পাহাড়ের উঁচু নীচু পথে সাইকেল ছুটলো।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর অশোক বললে, ভারী সুন্দর দৃশ্য ত এই জায়গার!

কবিত্ব ক'রে বললে বেশ শোনায় না! চারিদিকে ঢেউ খেলানো পাহাড়, এখানে ওখানে শাল সেগুনের গুচ্ছ, বনের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে গেরুয়া রঙের পথ, নিরালা, লোকজন একেবারে নেই বললেই হয়—প্রকৃতি যেন দিবারাত্র ধ্যানমগ্ন ইত্যাদি ইত্যাদি। বল না, ছোটবেলায় তুই ত কবিতা লিখতিস্‌, আমার আবার মাথায় ওসব আসে না! জানিস্‌ ত আমি চিরকাল একটু কাঠখোট্টা?

তারপর একটু থেমে আবার বললে, দেশ ছেড়ে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব ছেড়ে কতকগুলো অশিক্ষিত জঙ্গলীদের মধ্যে পড়ে থাকা যে কি সুখ তার কি জানবি তোরা? এই বলে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সে চেপে নিলে।

অশোক এতক্ষণ চুপ করে ভাবছিল শঙ্করের কথা। কলেজে তিনটে বছর তারা কি আনন্দে কাটিয়েছে। তার সঙ্গে শঙ্করের ছিল অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। তারপর

হঠাৎ বিধাতার অভিশাপের মত এলো তার বাপের মৃত্যু সংবাদ। থার্ড ইয়ারেই পড়লো তার পড়াশুনায় পূর্ণচ্ছেদ। সে চলে গেল দেশে। শঙ্করের বি, এ পাশের খবরটা সে শুনেছিল সেখান থেকেই কিন্তু তার পরের ইতিহাস অজ্ঞাত। কালের নিষ্ঠুর নিয়মে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়লো কে জানে! তারপর হঠাৎ আজ এই সাক্ষাৎ! অশোক আজ চল্লিশ টাকা মাইনের কেরাণী—অম্ল, অজীর্ণ, জ্বর ও স্বাস্থ্যহীনতা তার একমাত্র পরিচয়। আর শঙ্কর? হাসিতে-খুশীতে-স্বাস্থ্যে-সম্পদে একেবারে ঝলমল করছে! তাই পুরানো বন্ধুকে দেখে আনন্দ হলেও তার সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করতে গিয়ে সে একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। অথচ লেখা-পড়ায় বরাবর অশোক ছিল শঙ্করের চেয়ে অনেক ভালো!

শঙ্কর যখন তার নির্জন বাসের ভয়াবহতার কথা চিন্তা করছিল, অশোক তখন ভাবছিল এমনি কত কি!

এখন সেই বাংলোর সামনে এসে সাইকেলটা থামলো। শঙ্কর ছোট ছেলের মত বাইরে থেকেই চীৎকার করে উঠলো, নীলিমা নীলিমা, দেখবে এসো, অশোক এসেছে।

অশোকের বুঝতে বাকী রইল না যে নীলিমা তার স্ত্রীর নাম এবং তার কাছে শঙ্কর ইতিপূর্বেই তার সম্বন্ধে গল্প করেছিল।

নীলিমা শঙ্করের গলা পেয়েই ছুটে আসছিল কিন্তু অশোকের নাম যেই কানে যাওয়া অমনি সে থমকে দাঁড়ালো। কি ভাবলে। তারপর স্থির করলে পর-পুরুষের সামনে এই রকম বেশভূষায় বেরনো উচিত নয়। তাই চট্ ক'রে আয়নার সামনে গিয়ে একবার পাউডারের তুলিটা মুখে বুলিয়ে নিলে, এবং তাড়াতাড়ি আলমারীটা খুলে তা থেকে একখানা রঙীন সাড়ী বার ক'রে পরতে লাগল।

শঙ্কর অশোককে নিয়ে গিয়ে তার বৈঠকখানায় বসালে। ঘরখানি যেমন সুসজ্জিত তেমনি রুচি সম্পন্ন। মেঝেয় কার্পেট পাতা, গদি মোড়া সোফা-কাউচ চারিপাশে, জানালায় দরজায় রঙীন পর্দা, দেওয়ালে বড় বড় বিলিতি ছবি, ঘরের মধ্যে কাঁচের টবে বিলিতি ফুল ফুটে রয়েছে।

বন্ধুর এই বিলাসিতা দেখে অশোক আরো ঘাবড়ে গেল। ঠিক এই রকম স্টাইলে যে শঙ্কর বাস করে সেটা সে আগে বুঝতে পারে নি—তা হ'লে হয়ত আসতো না। অশোকের মনের অবস্থা যখন এই রকম তখন বড় বড় লোমে ঢাকা একটা ছোট্ট কুকুর ঘরের ভেতর থেকে ছুটে এসে তার পা-টা শুঁকতে লাগল।

শঙ্কর বললে, ভয় নেই, কামড়াবে না। এই বলে দু'বার শিস্ দিয়ে কুকুরটাকে ডাকলে, জিমি-জিমি—

কুকুরটা এক লাফে একেবারে মনিবের কোলের ওপর গিয়ে চড়ল, তারপর তার লম্বা জিবটা বার করে বারকয়েক মনিবের হাতটা চেটে দিলে।

শঙ্কর কুকুরটাকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে দিতে বললে, ওগো তুমি কোথায়? দেখে যাও কে এসেছে!

নীলিমা তখন সাড়ীটা খুলে ফেলে আবার পরছিল। তাড়াতাড়িতে সেটা পায়ের এত ওপরে উঠে পড়েছিল যে চলবার সময় আয়নার ভেতর দিয়ে তার দিকে লক্ষ্য পড়তেই সে নিজের মনেই বলে উঠলো, ম্যাগো কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে!

এদিকে শঙ্করের এই ব্যস্ততা দেখে অশোক মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়ছিল। সে বললে, তুই এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? আসছে রে বাবা, না হয় একটু দেরীই হয়েছে—আমি ত আর পালাচ্ছি না!

না না, দেরীই বা হবে কেন? এই বলতে বলতে আরো ব্যস্ত হয়ে শঙ্কর একেবারে ঘরের ভিতরে ছুটে গেল এবং নীলিমার কাছে গিয়ে তার একখানা হাত ধরে টানতে টানতে বৈঠকখানার দিকে আসতে লাগল।

আঃ কি যে তুমি জ্বালাতন করো—ছাড়ো লক্ষ্মীটি—আমি একাই যাচ্ছি—মাইরি, তোমার বন্ধু কি মনে করবে—এই বলে নীলিমা তার স্বামীকে মিনতি জানাতে লাগল।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! শঙ্করের কৌতুক যেন তাতে আরো বেড়ে যায়। সে নীলিমাকে একেবারে অশোকের সামনে নিয়ে গিয়ে হাসতে হাসতে বল্‌লে, দিস্ ইজ মাই ফ্রেণ্ড অশোক রায়। তারপর বন্ধুকে বললে, দিস্ ইজ মাই সুইট-হার্ট, নীলিমা দেবী।

সামনে যেন একটা বজ্রপাত হ'লো! নীলিমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিমেষে সাদা হয়ে গেল। আর অশোকও তার মুখের দিকে বিস্ময়াভিভূতের মত চেয়ে রইল! তারপরে তারা দু'জনেই শেক্‌হ্যাণ্ড করবার জন্যে দু'জনের দিকে হাত বাড়ালে কিন্তু কেউ কাউকে যেন স্পর্শ করতে পারলে না।

এই দেখে শঙ্কর হো হো ক'রে হেসে উঠে নীলিমাকে বললে, আরে লজ্জা কি, ও আমার বাল্য-বন্ধু। আর অশোক তুই দেখছি লজ্জায় মেয়েদেরও ওপরে যাস্।

এই কথা শুনে যেন তাদের দুজনেরই চমক ভাঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে নীলিমা জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বললে, কৈ লজ্জা করছি? তোমার সব তাতেই ইয়ে—।

শঙ্কর বললে, ও তোমার গেস্ট—অতিথি,—ওর সঙ্গে কোথায় তুমি যেচে আলাপ করবে না যেন কত দিনের অচেনা—

নীলিমা খিল খিল করে হেসে উঠলো। তারপর অশোকের মুখের দিকে চেয়ে বললে, দেখুন ত আপনার বন্ধু কি রকম অবুঝ! অচেনা মানুষের সঙ্গে প্রথম দর্শনেই কেমন ক'রে চেনা মানুষের মত ব্যবহার করি!

অশোকের বুকে যেন এতক্ষণে বল ফিরে এলো। সে একটু হেসে বললে, ঠিক বলেছেন, শঙ্করটার আর দেরী সয় না। সব তাতে তাড়াতাড়ি।

শঙ্কর খপ্ ক'রে অশোকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, যা-যা তুই আর কথা বলিস নি—মেয়েমানুষ দেখেছিস কি অমনি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলি—যেন

এই প্রথম প্রেয়সীর সঙ্গে চার চক্ষুর মিলন হলো ! তোর ছেলেবেলার রোগ এখনো যায় নি দেখছি !

অশোক ও নীলিমার মধ্যে মুহূর্তে একটা দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। তাদের উভয়েরই ঠোঁটের কোণে যেন একটু হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল বিদ্যুতের মত।

অশোক বললে, তা মনে ভাবতে পারলেও ত বাঁচতুম। কল্পনায় অর্ধেক সুখ, কি বলেন নীলিমা দেবী !

নিশ্চয়ই। বলে নীলিমাও একটু মুচকি হাসলো।

আমারও তাই মত। এই বলে সেই প্রসঙ্গটাকে শঙ্কর তৎক্ষণাৎ থামিয়ে দিয়ে বললে, আচ্ছা এইবার তোর স্ত্রীকে চিঠিটা লিখে দে দেখি, আমি লোক দিয়ে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি তোর বাসায়। লেখ, তুই বিকেলে একেবারে এখান থেকে খেয়ে-দেয়ে যাবি—যেন সে কোন চিন্তা না করে। এই বলে শঙ্কর কাগজ ও কলম এনে অশোকের সামনে ধরলে।

অশোক বিস্মিতকণ্ঠে বললে, কাকে চিঠি লিখবো রে ! কে ভাববে !

আহা ন্যাকা ! যে তোমার পথ চেয়ে বসে আছে—হয়ত বা এতক্ষণ না দেখতে পেয়ে মূর্ছাই গেল ! জানো নীলিমা, তাঁর নাকি আবার এতটুকু বিরহ সহ্য হয় না ! সেইজন্যে প্রথমে কিছুতেই আসতে চাইছিল না ! বলে, আর একদিন যাবো। আমি জোর করে ধরে এনেছি।

নীলিমা হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললে, তাই নাকি অশোকবাবু ? তা হলে আমি যা বলি লিখে দিন ! লিখুন বন্ধুর বউ আমাকে বন্দী ক'রে রেখেছে এখানে, তুমি নিজে না এলে কিছুতেই ছাড়বে না বলছে।

শঙ্কর স্ত্রীর এই রসিকতা শুনে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো।

অশোক এইবারে গম্ভীর হয়ে গেল এবং বললে, চিঠি লিখবো কাকে, আমি ত বিয়ে করিনি। একা একা একটা ঘর নিয়ে আছি। নিজেই রেঁধে-বেড়ে খাই।

এই কথা শুনে মুহূর্তে তিনজনেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

এর পর প্রথম কথা বললে নীলিমা। অশোকের মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি এখনো বিয়ে করেন নি, কেন ?

শঙ্কর কণ্ঠে বিদ্রূপ এনে বললে, এখনো কি 'লভ' চলছে নাকি রে ? কলেজে পড়ার সময় কোন্ একটা মেয়েকে না তুই কবিতায় চিঠি লিখতিস্ —তার মাকে মা বলে খুব যাতায়াত করতিস্ তাদের বাড়ী, কি হলো তার !

তুমি চুপ করো। ব'লে শঙ্করকে থামিয়ে দিয়ে নীলিমা আবার বললে, কোন মেয়েকে বুঝি আপনি ভালবাসেন ! বলুন না, অশোকবাবু লক্ষ্মীটি—আমার কাছে গোপন করবেন না !

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে নিয়ে অশোক বললে, সে কথা শুনে আপনার লাভ কি !

খিল খিল করে হেসে উঠে নীলিমা বললে, আমার লাভ নেই তবে আপনার হয়ত হতে পারে।

তার মানে ?

তার মানে ঘটকালিতে আমার হাতযশ আছে। চেষ্টা করলে, চাই কি তার সঙ্গে যাতে আপনার বিয়ে হয় তার ব্যবস্থাও করে দিতে পারি।

অশোক বললে, ধন্যবাদ ! অত কষ্ট আর আপনার করবার প্রয়োজন হবে না।

কেন, তার বুঝি বিয়ে হয়ে গেছে ? আহা বেচারা ! এই বলে কণ্ঠে একপ্রকার সহানুভূতির সুর টেনে এনে নীলিমা বললে, তার বাপ-মার বুঝি আপনাকে পছন্দ হলো না ? আপনার চেয়ে ভালো পাত্র বুঝি পেয়ে গেল ? তা মেয়েটির ওপর আপনি রাগ করছেন কেন, তার কি দোষ !

অশোক বললে, না আমি কাউকে দোষও দিই না, কারুর ওপর রাগও করি না।

তার মানে রাগটা দেখছি আপনার তারই ওপর ! সে কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, না স্বেচ্ছায় অন্য কাউকে ভালবেসেছে বলুন না, লক্ষ্মীটি ?

অশোকের মুখে-চোখে দারুণ বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠলো।

শঙ্কর এতক্ষণ নীলিমার রসিকতাটা খুব উপভোগ করছিল। এইবার একেবারে লাফিয়ে উঠে বললে, Grapes are sour ! আঙুর টক্ ! সেই দ্রাক্ষাফল আর শৃগালের গল্পটা জানো না নীলিমা ? আমাদের দেশের ছেলেদের অবস্থা সেই রকম—যাকে পায় না তার সঙ্গে হয় তাদের পবিত্র প্রেম, অর্থাৎ যে মেয়ে তাকে কাঁচকলা দেখালে তার নাম জপ করতে করতে সে ব্রহ্মচারী হয়ে বসে রইল সারাজীবন।

নীলিমা আবার অশোককে বললে, সে দিব্যি স্বামীর ঘর করছে, হয়ত ছেলে-মেয়েও হয়েছে একগাদা আর আপনি তার কথা চিন্তা করে সংসারধর্ম না ক'রে সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করেছেন, এটা কি ভালো ? এদিকে বয়েসও তিরিশ পেরুল, কবে আর বিয়ে করবেন ?

শঙ্কর একটুতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তাই বক্তৃতা দেবার ভঙ্গীতে বললে, আরে মুখ্যু এইটুকু বুঝিস না যে মেয়েরা চায় পুরুষকে, তাই যুগযুগ ধরে তারা কেবল পৌরুষের গলায় মালা দিয়ে এসেছে।

হিয়ার ! হিয়ার ! ব'লে হাততালি দিয়ে উঠলো অশোক। তারপর গলাটা একটু খাটো করে বললে, বন্ধু, বক্তৃতা দেবার সময় কথাগুলো বেশ শোনায় কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তার কি পরিণাম হয়, একবার ভেবে দেখেছ কি ?

হ্যাঁ-হ্যাঁ দেখেছি, হবে আবার কি ? সবাই ত আর তোর মত কাপুরুষ নয় ! এই বলে শঙ্কর বুকটাকে একটু চিতিয়ে দিলে।

হাসতে হাসতে অশোক বললে, ধরো, আমি যদি এই মুহূর্তে বলি নীলিমা-দেবীকে আমার চাই। আর তার জন্যে পৃথিবী দূরে থাক, কেবল তোর বিরুদ্ধে দাঁড়াই, তাহ'লে সংসারটা কেমন হয়ে ওঠে বল্ দেখি ?

নীলিমা সকলের অজ্ঞাতে যেন একটু চমকে উঠলো। তারপর মুখ টিপে ঈষৎ হেসে বললে, কেমন জব্দ হয়েছো অশোকবাবুর কাছে—দাও এবার জবাব ?

শংকর তেমনিভাবে বললে, আমি তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হবো না। যেখানে সত্যিকারের চাওয়া, সেখানে যে পৃথিবীর কোন শক্তি বাধা দিতে পারে না, একথা আমি জানি ভাল করেই।

নীলিমার মুখ নিমিষে ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। আর তাই লক্ষ্য করে অশোক তাকে জিজ্ঞেস করলে, তা হ'লে প্রেম বলে কি কিছু নেই পৃথিবীতে ? আপনি কি বলেন নীলিমা দেবী ?

রহস্যময় হাসি হেসে নীলিমা বললে, বাবা, নেই বলবার উপায় আছে যখন তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আপনি নিজে !

অশোক আর একবার গম্ভীর হয়ে উঠলো। তারপর একটু থেমে বললে, হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি প্রেম অমর, সত্যিকারের ভালোবাসা কখনো মরে না—হোক না তার বিয়ে, হোক না সে অন্যের স্ত্রী, তবুও আমার কাছে সে প্রথম দিন যেমন ছিল, আজো তেমনি আছে !

শংকর বললে, দেখলে, নীলিমা আমি ঠিক বলেছি। কলেজে পড়বার সময় ও একটা মেয়েকে খুব ভালবাসতো তাকে আজও ভুলতে পারেনি !

নীলিমা আবার হাসি চাপতে চাপতে বললে, হ্যাঁ অশোকবাবু, ওঁর কথাটি কি তা হলে সত্যি—বলি পাত্রীটি সে-ই আছে, না ইতিমধ্যে বদলেছে ?

অশোক বললে, সেই প্রথম ও সেই শেষ। মানুষ জীবনে একজনকেই ভালোবাসতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। এই বলে গলাটা আর একটু নামিয়ে সে আবার প্রশ্ন করলে, আচ্ছা নীলিমা দেবী, মেয়েরা কি বিয়ের পর সব ভুলে যায় ?

সঙ্গে সঙ্গে যেন নীলিমার চোখমুখের ভাব কেমন বদ্‌লে গেল। সে তাড়াতাড়ি একটা কৃত্রিম হাসি হেসে উঠে বললে, কেন, এখনো সে আপনাকে ভালবাসে কিনা তাই মিলিয়ে দেখবেন ? বলতে বলতে খপ্‌ ক'রে সে উঠে পড়্‌লো।

অশোক বললে, পালালে হবে না আমার কথাটার উত্তর দিয়ে যান।

নীলিমা বললে, মহারাজ এখনো আপনার খাবার দিয়ে গেল না কেন আগে দেখে আসি—কোন্‌ সকালে আপনি বেরিয়েছেন! আপনার নিশ্চয়ই এখন খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

শংকর এতক্ষণ অশোকের এই কথা শুনে হো হো করে হাসছিল। এইবার বললে, আচ্ছা ওর হয়ে আমি উত্তর দিচ্ছি, শোন। হ্যাঁ, মেয়েরা সব ভুলে যায়, তারা তোমার মত আহাম্মুখ নয়—হয়েছে ?

নীলিমা এইবার একটা উচ্চ হাসির তরঙ্গ তুলে বাড়ীর ভিতরে চলে গেল।

খাওয়া দাওয়ার পর শংকর ও নীলিমা অশোককে তাদের ওখানেই থাকবার জন্য অনেক অনুরোধ জানালে কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হলো না। নীলিমা বললে, একা মানুষ হাত পুড়িয়ে এমনি ক'রে নিজে রেঁধে খাবার কি দরকার,

যখন আমি রয়েছি এখানে !

অশোক বললে, একটা ঘর যখন ভাড়া করে ফেলেছি তখন এবারকার মত থাক—এর পরে যখন আসবো তখন একেবারে আপনার এখানেই এসে ওঠা যাবে ! তা ছাড়া, আর ক'টা দিনই বা এখানে থাকবো, ছুটি তো ফুরিয়ে এলো।

আরো কিছুদিন ছুটির জন্যে যে সে অফিসে দরখাস্ত পাঠিয়েছিল সে কথাটা তখন অশোক একেবারে চেপে গেল। কেন, তা সে-ই জানে !

শঙ্কর অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে, থাক থাক, ওকে আর সেধো না। আমরা বড়লোক, এখানে থাকলে যে ওর মান যাবে !

তখন নীলিমা বললে, আচ্ছা থাক্, তবে রবিবার দিনটার কথা যেন ভুলবেন না। শুধু খাওয়া-দাওয়া নয়, রাত্তিরটাও এখানে থাকতে হবে। কেননা এ অঞ্চলে বড় বাঘের ভয়—সন্ধ্যের পর কেউ রাস্তায় বেরোয় না—অথচ রাত্তিরের খাওয়াটা বিকেলেও খাওয়া যায় না ! কাজেই সব বন্দোবস্ত করে রেখে একেবারে ভোরে উঠেই এখানে চলে আসবেন কিন্তু !

অশোক সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলে।

রবিবার দিন নীলিমা ভোর থেকে উঠেই নানারকম খাদ্যের আয়োজন করতে লাগল। জঙ্গলে সব জিনিষ পাওয়া যায় না। তাই আগের দিন থেকে দুধ আনিয়ে ছানা কাটিয়ে, ক্ষীর ক'রে—পানতুয়া, সন্দেশ, পেঁড়া, রাবড়ী আরো কত কি তৈরী করে রেখেছিল। মিষ্টি খেতে অশোক নাকি খুব ভালবাসে ! তা ছাড়া তিন চার রকমের মাংসই রাঁধলে। আবার অশোক 'ফাউল' খায় না বলে নীলিমা শঙ্করকে পাঠালে পাখী শিকার করতে। শঙ্কর বললে, তুমিও যেমন, এমন ক'রে ফাউল রেঁধে দেবো যে অশোকের সাধ্য নেই ধরতে পারে !

নীলিমা বললে, মানুষ যা খায় না, তাকে গোপন ক'রে সেটা খাওয়াতে আমি পারবো না। আর দরকার কি এত জোর করে খাওয়াবার বাপু, যখন তার প্রবৃত্তি হয় না ?

শঙ্কর বললে, তুমি কি আগে খেতে—কত কাণ্ড করে তোমায় ধরিয়েছি ভেবে দেখো দেখি ?

খুব কীর্তি করেছ—সকলে ত আর আমি নয় ! এই বলে নীলিমা মুচকি হেসে নিজের কাজে চলে গেল।

সকালেই অশোকের আসবার কথা, কিন্তু দশটা বেজে যাবার পরও সে এলো না দেখে নীলিমা আর চুপ ক'রে থাকতে পারলে না। শঙ্করকে পাঠালে তার খোঁজে।

সাইকেল নিয়ে শঙ্কর তখনই ছুটলো।

নীলিমা মধ্যে মধ্যে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার দিকটা দেখে যাচ্ছিল।

ঘণ্টা দুই পরে শঙ্কর একা ফিরে এলো ! নীলিমা তখন ব্যাকুলকণ্ঠে তাকে

জিজ্ঞেস করলে, তোমার বন্ধু কৈ ?

শঙ্কর বললে, কাল থেকে তার জ্বর হয়েছে—এখনো রীতিমত জ্বর রয়েছে—কি ক'রে আসবে !

এই খবরে নীলিমার মুখ শুকিয়ে গেল। সে বললে, কিন্তু তাকে তুমি সেখানে একলাই বা রেখে এলে কার ভরসায় ?

শঙ্কর বললে, কিছুতেই যে আসতে চাইলে না। ভারী একগুঁয়ে। আমি কি এখানে আনবার জন্যে কম চেষ্টা করেছি !

নীলিমা কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু পারলে না, প্রাণপণে ওষ্ঠকে সংযত করে দূরে পাহাড়ের মাথার দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। শঙ্করও স্ত্রীর পাশে তেমনিভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর বললে, আচ্ছা এখানে সে কিছুতেই থাকতে চায় না কেন বলতে পারো ? সেদিন অত সাধাসাধি করলুম, আজো কত করলুম। একা নিজে রেঁধে খায় 'কুকারে' তবু আমাদের এখানে থাকতে কিসের যে আপত্তি ভেবেই পাই না। কি যেন একটা মনের মধ্যে সে চেপে রেখেছে—আমি অনেক জেরা করেও ধরতে পারলুম না, তুমি একটু ভুলিয়ে ভালিয়ে তার কাছ থেকে আসল কথাটা বার করে নিতে পারো ?

নীলিমা বললে, তোমার বাল্যবন্ধু, তুমিই যখন পারলে না, আমাকেই বা সে বলতে যাবে কেন ?

না না, বলতে যাবে কেন, তবে কি জানো, কোন কৌশল করে যদি তুমি কথাটা বার ক'রে নিতে পারো, তাই বলছিলুম।

নীলিমা তখন বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বললে, তোমার বন্ধুটি বাপু মানুষ ভালো নয় ! তা না হলে একা এই অসুখ নিয়ে বিদেশে মানুষ আপনার লোকের কাছে না এসে সেখানে থাকে কোন সুখে ? একটু দুধ সাগু করে দিতে হলেও ত একটা লোকের দরকার ? বোধহয় কাল রাত থেকেই উপবাস চলছে—যা ইচ্ছে করগে, আমার বয়ে গেছে ! শেষের কথাগুলো কতকটা যেন আপন মনেই বলতে বলতে নীলিমা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

মুহূর্তে যেন সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। এত কষ্টের তৈরী খাবার দাবার নীলিমার আর মুখে তুলতে ইচ্ছা করলো না। না খেলে নয়, তাই কোন রকমে দু' একটা গালে দিয়ে সে উঠে পড়লো। বাকী খাবারগুলো চাকরবাকরদের ডেকে বিলিয়ে দিলে।

দুপুর বেলা ভুরিভোজনের পর শঙ্কর নাক ডাকাচ্ছিল।

নীলিমা একটা পান গালে দিয়ে তার পাশে এসে শুলো। তারপর আঙ্গুলের ডগা দিয়ে শঙ্করের পিঠের মাঝে দু'একটা ঘামাচি খুঁটে দিতে দিতে বললে, তুমি ঘুমলে নাকি !

শঙ্কর তৎক্ষণাৎ নাক ডাকানো থামিয়ে বললে, হাঁ।

নীলিমা তখন একটু ইতস্তত করে বললে, দেখো এক কাজ করলে কি হয়, একটা

টাঙ্গা করে যদি আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে আর একবার অশোকবাবুকে এখানে আনবার জন্যে চেষ্টা করি ?

শংকর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, খুব ভালো হয়, আমিও ঠিক সেই কথাই তোমাকে বলবো ভাবছিলুম। কিন্তু পাছে তুমি যেতে আপত্তি করো তাই—

নীলিমা হেসে উঠে বললে, ওঃ তাই বুঝি এতক্ষণ নাক ডাকাচ্ছিলে ?

এবারও অশোক আপত্তি তুললে কিন্তু নীলিমার জবরদস্ত অনুরোধের কাছে তা ভেসে গেল। অগত্যা সুটকেশ, কুকার ও বিছানা সমেত অশোককে ভাল ছেলের মত একেবারে সুড় সুড় ক'রে গাড়ীতে এসে উঠতে হলো।

নীলিমার এই কৃতিত্ব দেখে সবচেয়ে খুশী হলো শংকর।

যাবার আগে নীলিমা ভালো ক'রে একটা বিছানা পাশের ঘরে পেতে রেখে গিয়েছিল। বাড়ীতে পা দিয়েই সে প্রথমে অশোককে সেখানে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলে, তারপর তাড়াতাড়ি খানিকটা দুধ গরম করে এনে খাইয়ে দিয়ে ঘর থেকে একখানা মূল্যবান শাল এনে তার গায়ে বেশ করে ঢাকা দিয়ে দিলে।

অশোক এতক্ষণ কিছু বলে নি, এইবার প্রথম কথা বললে—আমার আলোয়ান ত রয়েছে, আবার একটা চাপাচ্ছেন কেন ?

নীলিমা একটু মুচকি হেসে বললে, কেন আমার আলোয়ানটা বুঝি আপনার গায়ে ফুটছে ?

অশোকের ঠোঁটের কোণে ঈষৎ ম্লান হাসি দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে গেল।

নীলিমা বললে, কি ফেলে দিলেন না ওটা গা থেকে ?

অশোক বললে, আপনি যখন দিয়েছেন তখন কি আর ফেলে দিতে পারি ?

খিল খিল করে হেসে উঠে নীলিমা বললে, তবু ভালো, এ কথাটা কি অসুখ সেরে গেলেও আপনার মনে থাকবে ?

শংকর সেইখানেই দাঁড়িয়ে ছিল এবং তাদের আলাপ-আলোচনায় মধ্যে মধ্যে যোগ দিচ্ছিল। সে বললে, জানিস অশোক, নীলিমা বলে তোমার বন্ধুটি কিন্তু লোক একেবারেই ভাল নয়। এই বলে হো হো ক'রে সে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলো।

এই কথা শুনে নীলিমা একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বললে, হ্যাঁ বলেছি ত, ভয় নাকি ?···বলি এত সাধ্যসাধনা করলে এতদিন ভগবান বোধহয় নিজে এসে বাড়ীতে দেখা দিয়ে যেতো।

এমনি করে নীলিমার সেবায় ও শংকরের যত্নে অশোক অল্প দিনের মধ্যেই ভালো হয়ে উঠলো। নীলিমা তখন বললে, এখান থেকে কিন্তু আপনাকে আর কোথাও যেতে দেবো না।

অশোক হেসে উঠে বললে, কথাটা যদি লিখে পড়ে দেন ত বেঁচে যাই। এমন সেবা যত্ন ছেড়ে কার আর যেতে ইচ্ছা করে, বলুন ?

শঙ্কর বললে, বাস্তবিক অশোক, ঠাট্টা নয়—বেশ সুস্থ না হলে আমি এখান থেকে তোকে এক পা কোথাও নড়তে দেবো না।

অশোক বললে, তার চেয়ে বল না কেন, চাকরিবাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানেই বসে থাকি।

নীলিমা বললে, তাহলে ত বেশ ভাল হয়—আমার কেরাম খেলার একটা সঙ্গী পাই।

তখনো অশোকের এক মাস ছুটি ছিল। তার দরখাস্ত সাহেব মঞ্জুর করে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

পশ্চিমের এই জায়গাটা একে জল হাওয়ার জন্য বিখ্যাত ছিল, তার ওপর আবার বন্ধুর বাড়ীর আদর যত্ন পেয়ে অশোকের স্বাস্থ্য অসম্ভব রকম দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে লাগল।

এই সময় একদিন স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে কথা উঠতে শঙ্কর নীলিমাকে বললে, জানো কলেজে পড়ার সময় অশোকের ঠিক এখনকার মত চেহারা ছিল।

নীলিমা অমনি খপ করে বলে উঠলো, আহা, তখন বুঝি ইনি এত মোটা ছিলেন!

ঈষৎ হেসে শঙ্কর বললে, ছিল কিনা তা তুমি কি করে জানলে?

একটুও ইতস্তত না করে সে জবাব দিলে, বা-রে! বারো তেরো বছর আগে অশোকবাবু ত ছিলেন ছেলেমানুষ তখন তার পক্ষে কি করে এত মোটা হওয়া সম্ভব!

শঙ্কর বললে, কি রকম 'বারবেল' ভাঁজতো জিজ্ঞেস করো না? রীতিমত পালোয়ান ছিল ও তখন।

নীলিমা ছোট্ট মেয়ের মত হেসে উঠে বললে, বাবা, তাহলে পালোয়ানী বিদ্যেটাও শেখা হয়েছিল···তবুও জোর করে কেড়ে আনতে পারলেন না আপনার প্রিয়তমাকে? হায়, ধিক আপনার পালোয়ানীতে!

অশোক বললে, এ বিষয়ে আমি একেবারে মহাত্মা গান্ধী—অহিংস আমার সংগ্রাম!

এইবার নীলিমা সশব্দে হেসে উঠে বললে, তাহলেই হয়েছে। গান্ধীর মত শুধু সংগ্রামই করে যাবেন, স্বাধীনতা আর কোনদিন চোখে দেখতে হবে না!

শঙ্কর বললে, ভেরী গুড্! দেখ অশোক, নীলিমা রাজনীতি যা বোঝে আমাদের দেশের পাকা মাথাওয়ালা কংগ্রেস নেতাদের মগজেও তা ঢোকে না, কেন বলতে পারিস?

অশোক হেসে বললে, তাদের মাথা ঠিক নীলিমাদেবীর মত নয় বলে!

তারপর রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়!

বেড়াতে গিয়েও এক একদিন এই রকম এক একটা বিষয় নিয়ে তারা মেতে

উঠতো। নীলিমাও যে একেবারে চুপ করে থাকতো তা নয়, মধ্যে মধ্যে সেও যোগ দিত তাদের সঙ্গে। তবে এই কচকচি যেদিন একেবারে তার অসহ্য হয়ে উঠতো, সে বলতো তোমরা থামবে, না আমি বাড়ী চলে যাবো? বাবা, একটু বেড়াতে এসেও যদি শান্তি আছে!

তারা তিনজনে প্রায়ই বিকেলে একত্রে বেড়াতে বেরুত। পাহাড়ে একটা জায়গা ছিল নীলিমার খুব প্রিয়—বেড়াতে বেড়াতে পরিশ্রান্ত হলে সেইখানে গিয়ে তারা একটু বিশ্রাম করতো। ছোট্ট একটা পাহাড়ে নদীর একেবারে কোল ঘেঁষে একটা মোটা গাছের ডাল ভেঙ্গে পড়েছিল বেঞ্চির মতন। তার ওপরে গিয়ে তারা তিনজনে বসে থাকতো। নদীর মৃদু কলধ্বনি অবিরাম সেই গাছপালা ও পাহাড়ের বুকে গুঞ্জরিত হতে হতে দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে যেত—তারা চুপ করে তাই শুনতো।

সহসা একদিন নীলিমা অশোককে অনুরোধ ক'রে বসলো একটা গান গাইবার জন্যে।

শঙ্কর একেবারে লাফিয়ে উঠলো—হ্যাঁরে, তুই আবার গান গাইতে জানিস নাকি? তারপর নীলিমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, হ্যাঁগো তুমি কি করে জানলে ও গান জানে?

তোমার মত ত সবাই কাঠখোট্টা গোঁয়ারগোবিন্দ নয়—যারা গান জানে তাদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়। এই বলে জোর করে নীলিমা আবার একটু হাসি টেনে আনলে তার মুখে।

প্রকৃতির প্রভাবে তখন সকলের মন এমন ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছিল যে কথায় নয়, সুরের ভিতরেই যেন তারা সবাই ভাষা খুঁজছিল। তাই অশোককে আর বেশী অনুরোধ করতে হলো না, সে সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি জ্ঞাপন করলে।

অশোক গায়ক নয়। তবে তার গলাটা মিষ্টি বলে কলেজের ছেলেদের মধ্যে একদিন তার গানের খুব খ্যাতি ছিল। অকস্মাৎ সেই কথাটা শঙ্করের মনে পড়ে যেতে সে নিজের কাছেই যেন লজ্জিত হয়ে পড়লো—অশোক তার বন্ধু, এ প্রস্তাবটা অন্তত তারই কাছ থেকে আসা উচিত ছিল! শঙ্কর তাই অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়ে বললে, তুই যে গান গাইতে জানিস আমি সেকথাটা ভুলেই গিয়েছিলুম। আচ্ছা, এখন একটা খুব ভাল দেখে গান ধর দেখি।

অশোক গান ধরলো—

একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে
সেজেছো ফুল-সাজে সে কথা যে গেছ ভুলে।
সেথা যে বহে নদী নিরবধি সে ভোলেনি
তারি যে স্রোতে আঁকা বাঁকা-বাঁকা তব বেণী
তোমারি পদরেখা আছে লেখা তারি কূলে
আজি কি সবই ফাঁকি? সে কথা কি গেছ ভুলে?·····

গান শেষ হলো যখন, কারো মুখে কোন কথা নেই ! সুরের সঙ্গে বাণীর এবং তার সঙ্গে প্রকৃতির এমন অদ্ভুত সমন্বয় হয়েছিল যে তিনজনেই বুঝি তখন তার প্রভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল।

তবু প্রথম কথা বললে শঙ্কর—কি যে মেয়েলি সুরে গান গাস্ ভাল লাগে না। পুরুষের কণ্ঠ হবে উদাত্ত, সাতটি সুর সেখানে খেলবে সিংহনাদের মত—তা নয়, এই প্যান্‌পেনে সুরের গান শুনলে আমার গা জ্বলে যায় !

অশোক বললে, জানিস্ এটা রবিঠাকুরের গান ?

আরে রেখে দে তোর রবিঠাকুর ! এই রবিঠাকুরই ত উচ্ছন্ন দিলে দেশটাকে। সমস্ত জাতটা 'এফিমিনেট্' হয়ে গেল। তাই বাঙ্গালীর দ্বারা আর কিছুই হয় না—তারা শুধু কাঁদতে জানে !

হ্যাঁ, তোমার মত হো হো করে হাসতে পারে না ! তুমি থামো দেখি একটু—দু'দণ্ড যে শান্তিতে গান শুনবো তারও উপায় নেই—গায়ের জোর চাই ওর সর্বত্র ! এই ব'লে শঙ্করকে নীলিমা তৎক্ষণাৎ চুপ করিয়ে দিলে !

অশোকের ছুটির তখনো সাত দিন বাকী ছিল। নীলিমা শঙ্করকে বললে, হ্যাঁগো তোমার অফিসে একটা লোক নেবে বলেছিলে তা অশোকবাবু কি সে-চাকরিটা করতে পারবে না ? এখানে ত মাইনে আশি টাকা দেবে বলছে, আর উনি পান কলকাতায় মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা ! তাও নাকি আট বছরে বেড়ে ওই হয়েছে।

শঙ্কর বললে, আমিও ঠিক ওই কথাটাই তোমায় বলবো ভাবছিলুম।

অশোক প্রথমটা এ প্রস্তাবে রাজী হয় নি। শেষে নীলিমা জোর ক'রে তাকে রাজী করালো। সে বললে, সংসারে আপনার আপন বলতে কেউ নেই তবে এখানেই থাকুন না কেন—তবু ত আমরা রয়েছি। বন্ধু কি আপনার পর ! আপনি আমাদের আপন না ভাবতে পারেন কিন্তু আমরা ত তা পারি না। শঙ্করও আর চুপ করে রইল না, নীলিমার সঙ্গে তাকে বেশ দু' কথা শুনিয়ে দিল।

অগত্যা অশোক সেইখানেই চাকরি নিলে।

অশোকের এবার নতুন জীবনযাত্রা শুরু হলো।

শঙ্কর আর সে প্রত্যহই এক সঙ্গে চাকরি করতে যায়। নীলিমা তাদের উভয়ের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সমান নজর রাখে, কোথাও কোন ত্রুটী হতে দেয় না।

এমনি করে কিছুদিন কাটবার পর শঙ্কর বন্ধুর বিয়ের জন্য হঠাৎ উঠে পড়ে লাগল। শহরে যে বাঙ্গালী ডাক্তার ছিল একদিন চা খেতে গিয়ে তাঁর সুন্দরী শ্যালিকাকে দেখে সে একেবারে পাকা কথা দিয়ে এলো।

কিন্তু অশোক বেঁকে বস্‌লো বিয়ে করবো না বলে। শঙ্কর তাকে অনেক অনুরোধ উপরোধ করলে তবু সে কিছুতেই সম্মত হলো না। তখন শঙ্কর নীলিমার ওপর ভার দিলে।

নীলিমাও তাকে অনেক বোঝালে কিন্তু অশোক সেই এক গোঁ ধরে বসে

রইল। অবশেষে অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হলো যে নীলিমা যদি নিজে মেয়ে দেখে পছন্দ করে তা হ'লে হবে।

শঙ্কর মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। সে জানতো আগের মত এবারেও নীলিমার হাতেই তার পরাজয় ঘটবে।

কিন্তু মেয়ে দেখে এসে নীলিমা যখন বললে তার পছন্দ হয়নি তখন শঙ্কর রীতিমত বিস্মিত হলো বৈকি! সে বললে, এমন মেয়ে তোমার পছন্দ হলো না? যেমন ধবধবে রঙ্ তেমনি নাক, মুখ, চোখ; ভালো গান গাইতে পারে, লেখাপড়াও দস্তুর মত জানে। আর শুধু তাই নয় রান্নায় বান্নায় গৃহস্থালির কাজেও নাকি পাকা গিন্নিকে হার মানিয়ে দেয়—তার ওপর আবার টাকা দেবে তিন হাজার, তবুও তোমার পছন্দ হলো না কেন বুঝতে পারছি না!

নীলিমা বললে, টাকা কড়ি আর রূপ গুণ-ই ত মেয়েছেলের সব নয়!

তবে এছাড়া আরো কি তোমার চাই? এই বলে সাগ্রহে শঙ্কর নীলিমার মুখের দিকে তাকাল।

বড় বেহায়া বাপু—ওকে নিয়ে তোমার বন্ধু সুখে ঘর করতে পারবে ব'লে মনে হয় না। এই বলে এক কথায় রায় দিয়ে নীলিমা তখন নিজের কাজে চলে গেল।

শঙ্কর হতভম্বের মত শুধু তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সেদিন অশোক একা বেড়াতে গিয়েছিল। সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ী ফিরে এসেই সে নীলিমার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। নীলিমা তখন পান সাজছিল, আর শঙ্কর একটা বই মুখে করে বিছানায় শুয়েছিল। একটা পানের খিলিতে লবঙ্গ গুঁজতে গুঁজতে নীলিমা বললে, আপনার বরাতে নেই তা আমি কি করবো বলুন? আপনাকে ত আমি ভাল করেই চিনি, শেষে কিছু একটা হ'লে আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপাবেন! এই বলে খিল খিল করে হেসে উঠলো।

এই কথা শুনে অশোকের মন থেকে যেন একটা দুশ্চিন্তার পাষাণ ভার নেমে গেল। তার মনে ভয় ছিল যদি নীলিমার পছন্দ হয়ে যায়! তাই এই মুক্তির আনন্দ চাপতে চাপতে সে বললে, এই জন্যেই ত আপনার ওপর ভার দিয়েছিলুম—শঙ্করের ওপর আমার একটুও বিশ্বাস নেই, কুমারী মেয়ে দেখলেই ওর পছন্দ হয়ে যায়।

এই বলে তারা দুজনেই এক সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। শঙ্কর কিন্তু এই হাসিতে যোগ দিতে পারলে না, শুধু মুখ তুলে একবার 'হুঁ' বলেই আবার পাঠে মনোনিবেশ করলে।

এর কয়েক দিন পরে হঠাৎ অশোক আবার জ্বরে পড়লো। নীলিমা চুপি চুপি শঙ্করকে বললে, ওঃ গা পুড়ে যাচ্ছে, বোধহয় চার কি পাঁচ জ্বর হবে।

শঙ্কর বললে, আমি ওর থার্মোমিটারটা ঘর থেকে নিয়ে এসে জ্বরটা দেখছি,

তুমি কেবল মাথায় জলপট্টি দিয়ে হাওয়া করো।

অশোক থার্মোমিটার ও কয়েকটা হোমিওপ্যাথী ওষুধ সদাসর্বদা নিজের কাছে রাখতো। শঙ্কর তার সুটকেসটা খুলে থার্মোমিটার খুঁজতে লাগল। ইতিপূর্বে কোন দিন সে তার জিনিষপত্রে হাত দেয় নি, কোথায় কি আছে তাও সে জানতো না। তা ছাড়া সুটকেস নয় ত যেন একটা মনিহারির দোকান, তাতে কি নেই? তালা চাবি, ছুঁচ সুতো, টর্চলাইট, বাতি, দেশলাই, ছুরি, দাড়ি কামানোর সেট, খান কতক বই, পুরনো চিঠি, একটা কাঁচের গেলাস, আর তার সঙ্গে কতকগুলো জামাকাপড় তালগোল পাকিয়ে আছে। শঙ্কর হাতড়াতে লাগল তার মধ্যে। কোথায় থার্মোমিটার? এটা দেখে ওটা দেখে। হঠাৎ একটা জামার নীচে খুঁজতে গিয়ে সে দেখলে সুটকেসের একেবারে তলায় যে খবরের কাগজ পাতা ছিল তার একটা কোণ ছেঁড়া এবং তার ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে একটা ফটোর মত কি বস্তু।

শঙ্কর সেটাকে খুব সাবধানে বার করলে।

একি! এ যে নীলিমার ফটো। তার বুকের মধ্যেটা ধড়াস্ ধড়াস্ করে উঠলো। তখন তাড়াতাড়ি ফটোটা ওলটাতেই সে দেখলে আবার পিছনে এক জায়গায় লেখা রয়েছে, অশোকদাকে দিলুম। তারিখ এগারো বছর আগের। লেখাটাও প্রায় বিবর্ণ হয়ে এসেছে!

তবে কি নীলিমাকেই সে ভালবেসেছিল! তারই জন্যে বিয়ে করেনি! এই চিন্তা মাথায় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দিনের সাক্ষাৎ থেকে সেদিন পর্যন্ত তাদের উভয়ের কার্যকলাপ ও আলাপ-আলোচনা সমস্ত তার চোখের সামনে যেন সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো।

শঙ্কর আর ভাবতে পারলে না, তার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যেতে লাগল। নিঃশব্দে সেই ফটোখানাকে হাতে ক'রে সে তখন নিজের ঘরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে নীলিমা ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে বললে, তুমি ত খুব বন্ধু দেখছি—আমি বলি বুঝি থার্মোমিটার আনতে গেছ—তা নয় চুপচাপ এখানে বসে রয়েছো?

তার উত্তরে শঙ্কর গম্ভীর কণ্ঠে বললে, থার্মোমিটার পেলুম না তা কি করবো—

পেলে না যে, সে কথাটা আমায় গিয়ে বলে আসতে কি হয়েছিল? মানুষটা রোগের জ্বালায় কি রকম ছট্‌ফট্ করছে—কোথায় তার কাছে একটু বসবে, না—। আচ্ছা থাক। ব'লে সে চলে গেল।

নীলিমার এই অতি ব্যস্ততা দেখে রাগে শঙ্করের সমস্ত দেহ জ্বালা করতে লাগল। একবার তার ইচ্ছা হলো যে বলে, বিনা রোগে অশোকের চেয়েও তার মনটা যে সহস্র গুণ বেশী জ্বলছে তার খবর কে রাখে? কিন্তু সে কথা সে

কিছুতেই মুখে উচ্চারণ করতে পারলে না ! নীলিমাকে শুধু সে যে ভালবাসতো তা নয়—তার ইচ্ছাতেই নিজেকে একান্ত ভাবে সমর্পণ ক'রে সর্বদা সে সুখ পেতো। তাই নীলিমার কথা ভাবতে গিয়ে শঙ্করের মাথা গরম হয়ে উঠলো।

ম্যালেরিয়ার জ্বর ! দু' তিন দিনের মধ্যেই অশোক বেশ সুস্থ হয়ে উঠলো !

কিন্তু অশোকের এই অতি দ্রুত আরোগ্য লাভে নীলিমা যেমন খুসী হলো, শঙ্কর তেমনি চিন্তান্বিত হয়ে পড়লো। কোন কাজে যেন তার মন যায় না, কেবল ভাবে কি করা উচিত। অথচ নীলিমা ও অশোক কাউকেই সে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না ! তারা চোখের সামনে হাসি ঠাট্টা করে অথচ শঙ্কর ভাল ক'রে তাদের আলোচনায় যোগ দিতেও পারে না।

তাই লক্ষ্য ক'রে একদিন নীলিমা বললে, আচ্ছা আজকাল তুমি দিন রাত কি ভাবো বল ত ?

শঙ্কর বললে, তোমাকে !

নীলিমা খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, তা অমন পেঁচার মত গম্ভীর মুখে কেন ?

আমিও তাই ভেবে পাই না।

দিন দিন তোমার হেঁয়ালী যেন বাড়ছে। এই বলে নীলিমা নিজের কাজে চলে গেল।

তখন শঙ্করের একবার মনে হলো, জোর করে নীলিমাকে ঘরে টেনে এনে সেই ফটোটা দেখায়, তাহ'লে সে বুঝতে পারবে এই হেঁয়ালীর কি অর্থ ! কিন্তু সাহসে কুলোল না।

অশোকও যে বন্ধুর এই ভাববৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করেনি তা নয়, তবে আসল কারণটা অনুমান করতে না পেরে ভাবতো হয়ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন গোলমাল হয়েছে, তাই সেও চুপ করে থাকত।

বাড়ীর মধ্যে যেন কেমন একটা থমথমে ভাব।

ইদানীং অশোক বেশীর ভাগ সময়ই বাইরে বাইরে কাটায়। যদি কোনদিন নীলিমা তার সঙ্গে বেড়াতে যেতে চায় ত বাজে একটা কাজের ওজর দেখিয়ে সে বেরিয়ে যায়।

এমনি ভাবে যখন তাদের দিন কাটছিল তখন একদিন শঙ্করের কাছে সংবাদ এলো একটা দুর্দান্ত বাঘ এসেছে তাদের সেই জঙ্গলে। সে নাকি রোজ দু'টো তিনটে ক'রে মানুষ মেরে ফেলছে !

শঙ্করের দেহের রক্ত নেচে উঠলো। সে সেইদিনই রাত্রে বন্দুক ও গুলি নিয়ে প্রস্তুত হলো। কিন্তু যাবার আগে কি ভেবে সে অশোককে ডাকলে। অশোক আসতেই সে বললে, যাবি আমার সঙ্গে বাঘ শিকার করতে ?

নিশ্চয়ই যাবো, বহুদিন থেকে আমার শিকার দেখবার ইচ্ছে, এ সুযোগ কথনো ছাড়তে আছে ! এই বলে অশোক একেবারে লাফিয়ে উঠলো।

কিন্তু শিকার দেখতে গেলে শিকারী হওয়া দরকার এ কথাটা বোধহয় আপনার জানা নেই অশোকবাবু? এই বলতে বলতে নীলিমা এসে তাদের মাঝখানে দাঁড়ালো।

অশোক বললে, কিন্তু কত লোক ত এমনি শিকারীদের সঙ্গে যায়।

যে যায় যাক্, আমি আপনাকে কিছুতেই যেতে দেবো না। রোজ নাকি একটা দু'টো ক'রে লোক মেরে ফেলছে শুনছি!

বরাতে থাকলে কেউ খণ্ডাতে পারবে না—ঘরের ভেতর থেকে যে বাঘে লোক ধরে নিয়ে যায়! কি বলিস্ শঙ্কর?

শঙ্কর এতক্ষণ কোন কথা বলেনি, চুপ করে শুনছিল। এইবার বললে, নিশ্চয়ই।

নীলিমা তাড়াতাড়ি শঙ্করের কাছে এগিয়ে বললে, দেখ তোমার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই—তুমি কি বলে ওঁকে নিয়ে যাচ্ছো—ওঁর যদি কোন বিপদ ঘটে, তখন—

নিমেষে শঙ্করের রসনা তীক্ষ্ম হয়ে উঠলো। সে বললে, হ্যাঁ, সে বিপদ আমারও ত ঘটতে পারে, কৈ একবারও ত তুমি আমাকে নিষেধ করলে না তার জন্যে। অশোকের জীবনের মূল্য বুঝি আমার চেয়েও বেশী তোমার কাছে?

শেষের কথাটা বলে ফেলেই শঙ্করের মনে হলো কি করলুম, না বললেই হয়ত ভাল হতো! এরপর আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে তার সাহস হলো না, তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলে গেল।

শুধু নীলিমা ও অশোক বজ্রাহতের মত সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে অশোক ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো এবং চুপ ক'রে খাটের ওপর বসে রইল। তারপর হঠাৎ কি যেন তার মনে পড়ে গেল। সে তখন তাড়াতাড়ি গিয়ে তার সুটকেসটা খুলে সমস্ত জিনিষগুলোকে ঘরের মেঝেয় ঢেলে ফেললে এবং তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল সেই ফটোটাকে। অনেক খুঁজেও যখন পেলে না তখন নীলিমার কাছে গিয়ে সে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, আমার সুটকেসটা কে খুলেছিল বলতে পারেন?

নীলিমা তখনো সেইখানে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিল। একটু চমকে উঠে সে বললে, কেউ ত হাত দেয় নি—শুধু সেদিন আপনার বন্ধু থার্মোমিটারটা দেখবার জন্যে খুলেছিল, কিন্তু খুঁজে পায় নি।

আর কিছু বলতে হলো না! অশোকের সন্দেহ-ই এবারে ঠিক হলো। শঙ্করের এই ভাববৈলক্ষণ্যের কারণ বুঝতে আর তার বাকী রইল না। আর কেন যে এই মাত্র শঙ্করের মুখ দিয়ে ওকথা উচ্চারিত হয়েছে তার অর্থও তখন দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হয়ে গেল তার কাছে।

অশোক আর একমুহূর্তও অপেক্ষা না ক'রে তখন শঙ্করের ঘরের দিকে ছুটলো। সে মনে মনে স্থির করলে আজ আর কোন কথা শঙ্করের কাছে গোপন

করবে না, সমস্তই তাকে খুলে বলবে।

কিন্তু ঘরের ভিতর ঢুকেই অশোক চমকে উঠলো, দেখলে শঙ্কর নেই। সে গুলি বন্দুক নিয়ে একাই বেরিয়ে গেছে।

তৎক্ষণাৎ সে ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো এবং শঙ্কর কোন্‌দিকে গেছে খুঁজতে লাগল। কিন্তু কোথায় শঙ্কর? অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার তখন যেন পাহাড়ের বুকে আরও জমাট হয়ে উঠেছে। অশোক চারিদিকে একবার বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালে কিন্তু কোথাও শঙ্করকে দেখতে পেলে না। কি হবে? অশোকের মন উদ্বেল হয়ে উঠলো! যেমন ক'রে হোক বন্ধুর কাছে আজই রাত্রে সব স্বীকার করতে না পারলে সে যে পাগল হয়ে যাবে। তার বাল্যবন্ধু, তার উপকারী বন্ধু শঙ্কর! কি করবে, কোনদিকে যাবে, অশোক ভাবছে এমন সময় নীচে একটা টর্চের আলো জ্বলে উঠলো। পাহাড়ের রাস্তা ঘুরে ঘুরে বনের দিকে নেমে গেছে! অশোক স্পষ্ট দেখতে পেলে একজন কুলীকে সঙ্গে করে শঙ্কর এগিয়ে চলেছে বন্দুক হাতে।

তাকে দেখে অশোক চীৎকার করে উঠলো, শঙ্কর, দাঁড়া, আমি যাচ্ছি।

নিস্তব্ধ রাত। পাহাড়ের বুকে সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে হতে দূর থেকে দূরান্তে মিলিয়ে গেল। অশোক যাকে ডাকলে সে শুনতে পেলে কিনা জানি না তবে নীলিমার কানে সেই কণ্ঠস্বর পৌঁছতেই সে একেবারে ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো।

অশোক তখন অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে ছুটে চলেছে। নীলিমা তাকে দেখতে না পেয়ে ভয়ার্তকণ্ঠে ডাকতে লাগল, 'অশোকবাবু ফিরে আসুন', 'অশোকবাবু ফিরে আসুন' ব'লে।

কিন্তু কোথায় অশোক? কে কার ডাক শোনে!

তাই নীলিমাও তার কোন সাড়া না পেয়ে তখনি সেই অন্ধকারের মধ্যে ছুটলো অশোককে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। তার কণ্ঠে উদ্বেগ, মুখে সেই এক কথা 'অশোকবাবু ফিরে আসুন'!

পাহাড়ী চাকরটা ছিল বাইরের ঘরে। সে নীলিমাকে এইভাবে অন্ধকারের মধ্যে ছুটে যেতে দেখে চীৎকার করে উঠলো, মাইজি, মাত যাইয়ে আঁধিয়ারমে—শেরকা ডর হ্যায়!

কিন্তু নীলিমাকে ফিরতে না দেখে তখন পাহাড়ীটা আর চুপ করে বসে থাকতে পারলে না। ছুটে বাবুর ঘরে ঢুকে একটা বন্দুক ও কিছু গুলি নিয়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এলো। তারপর ওর পিছনে পিছনে ছুটলো এই বলে ডাকতে ডাকতে 'মাইজি মাত্ যাইয়ে আঁধিয়ারমে'।

অন্ধকারে পথই দেখা যায় না ত মানুষ! কে কোন্ দিকে গেছে তার ঠিক কি! তবুও পাহাড়ীটা অভ্যস্ত পথে নামতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে একটা মানুষের আর্তনাদ শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে দুম্ দুম্ দুম্ ক'রে তিনটে গুলির আওয়াজ হলো। ব্যস্, তারপর সব চুপচাপ।

তখনি পাহাড়ী চাকরটা বন্দুক হাতে বাগিয়ে ধরে সেই শব্দটাকে লক্ষ্য করে ছুটলো। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই সে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালো। যেমন একটা পাহাড়ের বাঁক ছেড়েছে, দেখলে, সামনে তীব্র টর্চের আলোয় একটা বিরাট বাঘ মরে পড়ে আছে, আর তার পায়ের কাছে ছিন্নভিন্ন ও রক্তাক্ত নীলিমার মৃতদেহ! —আর শঙ্কর ও অশোক পাথরের মূর্তির মত সেইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

বনিয়াদী

এক-ই গলির অর্ধেকটায় বেশ্যারা থাকে আর অর্ধেকটায় ভদ্রলোকের বাস! দিনের বেলা বোঝা শক্ত যে কোন্ বাড়ীতে নারী ঘৃণিত জীবন যাপন ক'রে, আর কোন্ বাড়ীতে করে না। তাদের মুখ দেখলে হয়ত এই পার্থক্য চোখে পড়ে কিন্তু ইঁট ও কাঠের বাড়ী দেখে তার অধিবাসীদের স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব!

উত্তর কলকাতার কোন সুপ্রাচীন কায়স্থ বংশের কোন এক দানশীল ও ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষের নাম বক্ষে করে আজো সেই গলিটি দাঁড়িয়ে আছে, সগর্বে—আজো তার দুধারে রয়েছে সাবেকী আমলের বহু বাড়ী পরস্পর সংযুক্ত হয়ে। সেকাল গিয়েছে; সেকালের অধিবাসীরাও এখন আর কেউ জীবিত নেই সত্যি! কিন্তু এখনো সেই সাবেকী আমলের মানমর্যাদা কোন কোন বাড়ীতে অক্ষুণ্ণ আছে।

এমনি এক বাড়ীতে থাকে হরিশ আর তার স্ত্রী ঊর্মিলা। হরিশের পৈতৃক বাড়ী এটা। তার ঠাকুর্দার বাবা তৈরী করেছিলেন। খুব বিরাট বাড়ী না হ'লেও ওপর নীচে ঘরের সংখ্যা যা আছে তাতে স্বচ্ছন্দে অর্ধেকটা ভাড়া দিয়েও তারা কিছু আয় করতে পারে। কিন্তু হরিশ কিছুতেই রাজী হয় না। বলে যে বাড়ীতে আমার স্বর্গত পিতা-পিতামহের পুণ্য স্মৃতি রয়েছে, সেখানে কোন্ উন্‌ছো জাতকে ভাড়া দিয়ে তাঁদের সম্ভ্রম নষ্ট করবো! খেতে না পাই তাও ভালো কিন্তু একাজ আমার দ্বারা কিছুতেই হবে না।

ঊর্মিলা একটু মুচ্‌কি হেসে বলে, তুমি না পারো, না হয় ও-কাজটা আমি করি।

হরিশ চটে ওঠে স্ত্রীর ওপর! বলে, জানো তুমি কোন্ বাড়ীর বৌ! আজ যদি তাঁরা বেঁচে থাকতেন তাহলে সূর্য-চন্দ্রও তোমার মুখ দেখতে পেতো না! এখন তোমার মানমর্যাদার ওপর আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশের সুনাম নির্ভর করছে। তুমি বেরুবে পর-পুরুষের সামনে, একথা মুখে উচ্চারণ করতেও তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। এই বলে সে রীতিমত ভৎসনা করে ঊর্মিলাকে।

ঊর্মিলা কিছু না বলে শুধু কাঁদে।

ওই একটা জায়গায় ছিল হরিশের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা! বংশগৌরবের প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা! কাউকে কোন কথা বলতে গেলেই সে আগে অন্ততঃ একবার তার বংশপরিচয়টা শুনিয়ে দিতো। বোধহয় নিজের পরিচয় দেবার মত কিছু ছিল না বলেই সে অতীত গৌরবটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকতো!

হরিশ কেরাণী! বেসরকারী আপিসে চাকরি করলেও যা মাইনে পেতো তাতে স্বামী স্ত্রী খেয়ে প'রেও রীতিমত ধনীর মত বাস করতে পারে! কিন্তু

বনেদীবংশের ছেলেদের মত তারও কতকগুলো বনেদী অভ্যাস ছিল। ফলে কোনদিন একবেলা আহার জুটতো, কোনদিন বা তাও জুটতো না। এছাড়া আবার ঊর্মিলাকে পর পর কয়েকদিন হয়ত উপোস ক'রে কাটাতে হতো! কখনো কখনো হরিশ আট দশ দিন একেবারে বাড়ীতেই আসতো না। তারপর হয়ত কোনদিন রাত্তির বারোটায়, কোনদিন বা ভোরের সময় এসে দরজা ঠেলতো।

প্রথম প্রথম ঊর্মিলা শুধু কাঁদতো এবং মুখ বুজিয়ে সব সহ্য করতো। বুড়ী ঝি তাকে দোকান থেকে ধার ক'রে এনে খাওয়াত, আর এক্ষেত্রে সতীনারীর কর্তব্য কি, সে সময়ে অনেক উপদেশ দিত। কিন্তু মুস্কিল হ'লো যখন সেই ঝি-টাও পালালো। দেড় বছরের মাইনে বাকী পড়াতে একদিন তার ছেলে এসে জোর করে তাকে নিয়ে দেশে চলে গেল।

ঊর্মিলার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা তখন অন্ধকার হয়ে গেল। একটা বাড়ীর মধ্যে সে একা! এই চিন্তাই তাকে যেন উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। জানলা দিয়ে সে দিনের বেলা সামনের বাড়ীর বৌয়ের সঙ্গে কথা কইতো—তার ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলোও সন্ধ্যা পর্যন্ত ঊর্মিলার কাছে থাকতো। কিন্তু রাত্তির হ'লেই হতো বিপদ। ঊর্মিলা দোরে খিল দিয়ে ওপরের ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে বই পড়তো। শ্বশুরের পুরনো একটা আলমারী বোঝাই অনেক বই ছিল।

সেই বাড়ীর দেওয়ালের অপর পাশে যে বাড়ীটা তাতে বেশ্যারা থাকে। রাত্তির বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন নৃত্য গীত ও হাসি ঠাট্টা ভেসে আসে তখন ঊর্মিলা সেইদিকের জানালাগুলোর সারসি খড়খড়ি বেশ ক'রে এঁটে বন্ধ করে দেয়।

এমনি করে তার দিন কাটে।

একদিন শেষে এক সপ্তাহ পরে রাত দেড়টার সময় হরিশকে বাড়ী ফিরতে দেখে ঊর্মিলা গম্ভীর হ'য়ে বললে, তুমি কি আমায় বিয়ে করেছিলে এইভাবে একা ফেলে রাখবার জন্যে ?

হরিশ মুখে একটা বিশ্রী আওয়াজ করে বললে, না, তোমার মুখে মুখ দিয়ে পড়ে থাকবার জন্যে, লজ্জাও করলো না ওকথা বলতে ?

ঊর্মিলা দৃপ্তকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, লজ্জা করতো যদি তুমি স্বামীর কর্তব্য পালন করতে। যদি একবারও ভেবে দেখতে যে একলা একটা মেয়েমানুষ কি ক'রে এত বড় বাড়ীতে বাস করতে পারে।

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হরিশ চেঁচিয়ে উঠলো, চুপ। বড় লম্বা লম্বা কথা শিখেছো দেখছি জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেবো এখনি।

ক্ষুধিতা সিংহীর মত তার মুখের দিকে চেয়ে ঊর্মিলা বললে, তা না করলে বনেদীবংশের মুখ উজ্জ্বল হবে কি করে। ওইটে আর বাকী থাকে কেন, শেষ কোরে দাও ? এই বলে সে স্বামীর দিকে দু'পা এগিয়ে গেল।

কি? আমার মুখের ওপর আবার জবাব দেওয়া হচ্ছে? বনেদী বংশের মুখ কিসে উজ্জ্বল হয় বা না হয় তা আজ তোমার মত ছোটলোকের মেয়ের কাছ থেকে আমায় শিখতে হবে? জানো, কত রাজা মহারাজার ছেলে আমার বন্ধু, তাদের পায়ের নখের যোগ্যও তুমি নও! কৈ তাদের পরিবারদের জন্যে ত তারা রাত্তিরে বাড়ী ফিরে যায় না—আর তাদের স্ত্রীরাও ত কেউ তোমার মত স্বামীকে যা তা বলে না?

ঊর্মিলা বললে, তারা যে দুবেলা পেট ভরে খেতে পায়—আমার মত উপবাস করে স্বামীর পথ চেয়ে ত তাদের বসে থাকতে হয় না! আজ সাত দিন ধরে একটা মানুষ না খেয়ে শুকিয়ে মরছে বাড়ীতে, তোমার একবারও মনে পড়ল না তার কথা! ছি ছি ছি—তুমি আবার বনেদী বংশের ছেলে ব'লে গৌরব বোধ করো? ঊর্মিলার চোখে জল এসে পড়লো, কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

বটে? তোমার কথা আমার মনে থাকে না? আচ্ছা দেখা যাক্ তবে কার মনে থাকে!

না কখ্খনো থাকে না; তা হ'লে আজ আমার এই দুর্দশা হ'তো না। তাহ'লে পরের বাড়ী থেকে ভাত চেয়ে আমায় খেতে হ'তো না। ঊর্মিলা এইবার কান্নায় ফেটে পড়লো।

শেষের কথাটা শুনে হরিশ খেঁকী কুকুরের মত লাফিয়ে পড়লো ঊর্মিলার ঘাড়ের ওপর, তারপর তার চুলের মুঠি ধরে বললে, দূর হও আমার ঘর থেকে তুমি আমার বংশগৌরব নষ্ট করেছ, কুলে কালি দিয়েছ। ছোট লোক, পরের বাড়ী থেকে ভাত চেয়ে খেতে একবার লজ্জাও করল না? তারা কি মনে ভাবলে! এই বলে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে হরিশ তাকে নিজের ঘর থেকে বাইরে বার ক'রে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলে।

বাকী রাতটা বারান্দায় পড়ে কাঁদতে কাঁদতে ঊর্মিলা কাটিয়ে দিলে।

পরদিন খেয়ে দেয়ে সেই যে হরিশ অফিস চলে গেল, দশদিন কেটে যাবার পরও কিন্তু তার আর কোন পাত্তা পাওয়া গেল না।

ঊর্মিলা রোজ রাত্তিরে মনে করে হয়ত আজ ফিরবে, কিন্তু বৃথা। একাকী সেই বাড়ীর মধ্যে প্রেতিনীর মত সে ঘুরে বেড়ায়। শূন্য ঘরগুলো অন্ধকারে হাঁ-হাঁ করে, হাওয়ায় পুরনো দরজা জানালাগুলো অদ্ভুত আওয়াজ ক'রে নড়ে ওঠে। ক্ষুধার জ্বালায় তার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসে, দু'হাতে সে চুলের মুঠি ধরে ছিঁড়তে যায়।

এমন সময় একদিন হঠাৎ পাশের বাড়ী থেকে নৃত্য গীত তার কানে ভেসে আসতেই ঊর্মিলা চমকে উঠলো এবং ধীরে ধীরে একটা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর কি মনে করে চুলগুলো ভালো ক'রে আঁচড়ে পা টিপে টিপে নীচে নেমে গিয়ে সদর দরজাটা খুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

তখন রাত্তির বোধহয় বারোটা হবে।

গলির পথ জনশূন্য। শুধু মাঝে মাঝে সুসজ্জিত বেশধারী দু'একটি পুরুষ সেখান দিয়ে যাতায়াত করছিল। হঠাৎ একজন চলতে চলতে ঊর্মিলাকে দেখে দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালো ; তারপর একটু ইতস্তত ক'রে যেমন তার দিকে এক পা এগিয়েছে অমনি ঊর্মিলা সভয়ে দু'পা পিছিয়ে গেল।

ও—আপনি ? মাপ করবেন, আমি অন্ধকারে বুঝতে পারিনি যে এটা ভদ্দর-লোকের বাড়ী। এই বলে তাড়াতাড়ি সেই লোকটি তখন সেখান থেকে চলে গেল।

ঊর্মিলা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত চুপচাপ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সেই লোকটির শেষ কথাটি মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার যেন চমক ভাঙল, এবং কে যেন তার অন্তরে বিদ্রুপের কশাঘাত করতে লাগল। ভদ্দরলোকের বাড়ী! আমি তা হ'লে ভদ্দরলোক! এত কষ্টের মধ্যেও সে তখন খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। প্রেতিনীর মত সেই হাসি শুধু শূন্য ঘরগুলির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে মিলিয়ে গেল।

তারপর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ঊর্মিলা ওপরে চলে গেল। এবং ঘড়া থেকে একঘটী জল গড়িয়ে খেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

ক্ষুধা সর্বনাশী! জঠরের জ্বালা মানুষকে অমানুষ করে দেয়। তাই পরদিন রাত্রে আবার পাশের বাড়ীর গান বাজনা শুনে ঊর্মিলা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবং নিজের মুখের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগল, এখনো কি আমায় সত্যি ভদ্রলোকের বৌয়ের মত দেখাচ্ছে? সঙ্গে সঙ্গে কে যেন তার মনের মধ্যে বলে উঠলো, না। কালকের সেই লোকটা আমাকে মিথ্যে বলে পালিয়েছে। নিশ্চয়ই আমাকে তার পছন্দ হয় নি। নিমেষে তার চোখে জল এসে পড়লো। সে আবার মনে মনে চিন্তা করতে লাগল, ভদ্দরলোক কি চেষ্টা করলে ছোট লোক হ'তে পারে না? অনেকক্ষণ ধরে এই রকম সব চিন্তা করার পর তার সমস্ত অন্তর যেন তাতে সায় দিয়ে উঠলো। তখন খড়খড়ি ফাঁক ক'রে সে দেখতে লাগল পাশের বাড়ীর মেয়েরা কি রকম ভাবে সাজ গোজ করেছে।

ঊর্মিলা এইবার পুরনো ট্রাঙ্কটা খুলে তার মধ্যে থেকে বিয়ের বেনারসী সাড়ীটা বার ক'রে পরলে এবং দশ বৎসর আগের কেনা একটা পাউডারের কৌটোর গায়ে তখনো যেটুকু লেগেছিল তাই নিয়ে মুখে ঘষলে। তারপর একটা সিন্দুরের টিপ জোড়া ভ্রূর মধ্যে বড় করে দিয়ে, আস্তে আস্তে নীচে নেমে গিয়ে বৈঠকখানা ঘরের জানালার পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

রাত তখন সবে দশটা। লোকজনের বেশ ভীড় রয়েছে গলির মধ্যে।

একটি যুবক বই বগলে ক'রে যেতে যেতে তার দিকে তাকাতেই ঊর্মিলা হঠাৎ হাতছানি দিয়ে তাকে ডেকে ফেললে। দরজা খোলা ছিল। যুবকটি তৎক্ষণাৎ ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো।

তাকে দেখেই ঊর্মিলার সর্বাঙ্গ ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপতে লাগল, এবং গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না। সে শুধু ঘাড় হেঁট করে রইল।

যুবকটি একটু ইতস্তত করে বললে, আমায় ডাকছিলেন? আপনার কি দরকার বলুন! আমার কাছে লজ্জা করবেন না, আমি আপনার ছোট ভায়ের মত!

ঊর্মিলা তাকে কি বলবে ভেবে পেলে না। শুধু তার দু'চোখ জলে ভরে এলো—লজ্জায়, কি অপমানে, কি হতাশায় তা সেই জানে! তবু কোনরকমে ঘাড় নেড়ে তাকে জানালে যে কিছু বলবার নেই।

যুবকটি তখন তাকে নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বজ্রাহতের মত নিশ্চল নিস্তব্ধ হয়ে ঊর্মিলা অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দরজায় খিল দিয়ে ওপরে চলে গিয়ে ঘরের মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর আবার কি মনে হ'তে সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ মুখ ভাল ক'রে মুছে, কাপড় চোপড় ঠিক ক'রে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলো। নীচে এসেও আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবলে। শেষে মরিয়া হয়ে সদর দরজাটা খুলে একেবারে পাশের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'লো।

পাশের বাড়ীতে তখন নাচ গান হল্লা চলছিল পুরোদমে। ঊর্মিলা সহসা সেই ঘরের মধ্যে উপস্থিত হয়ে একটি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বললে, ভাই আমায় শিখিয়ে দে না, কি করলে তোদের মত হ'তে পারি। আমাকে দেখে সবাই পালিয়ে যায়!

আরে এসে এসো সুন্দরী, আমরা তোমায় নিয়ে স্ফূর্তি করবো—পালাবো কেন? যা চাও তাই দেবো। এই বলে সেখানে যারা মদ খেয়ে নাচগান করছিল একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো।

লাথি মেরে মুখপোড়াদের মুখ ভেঙ্গে দেবো, দেখছিস্‌ না ভদ্দরলোকের বৌ, স্বামীর জন্যে এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ওকথা মুখে আনতে তোদের লজ্জা করলো না! এই ব'লে ঊর্মিলাকে টেনে নিয়ে সে একেবারে পাশের ঘরে চলে গেল। তারপর বুকের মধ্যে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে বললে, ছি ভাই, এপথে কি আসতে আছে? তুমি কত বড় বংশের বৌ—তোমার মান ইজ্জত কত, তোমার পায়ের ধুলোর যোগ্য যে আমরা নই! কি করবে বলো সবই তোমার বরাত ভাই, তা না হ'লে অমন স্বামীর এমন দশা হবে কেন? আমি ত তোমার পাশেই থাকি, সব ত জানি ভাই!

এই বলে সে মিনিটকয়েক চুপ ক'রে থেকে আবার বললে, তা বলে মরে গেলেও আমি তোমায় এপথে আসতে দেবো না। তোমার পায়ে পড়ি দিদি—বাড়ী ফিরে চলো। এসো, আমি তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি। এই বলে একরকম জোর ক'রে ঊর্মিলাকে নিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এলো।

উর্মিলা কোন কথা বলতে পারলে না। তার গলার কাছে সমস্ত ভাষা এসে যেন তখন রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই শুধু তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

সেই মেয়েটি তখন তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, ভয় কি দিদি, আমি ত রয়েছি তোমার পাশে। আমি তোমার ছোট বোন। আজ থেকে যখন যা তোমার দরকার আমায় বলো। কিন্তু পায়ে পড়ি ভাই এপথে কখনো এসো না।

বলে সে উর্মিলাকে নিয়ে যেমন তার বাড়ীর দরজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো, দেখলে হরিশ সেখানে অগ্নিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা দুজনেই তখন একসঙ্গে চম্‌কে উঠলো।

হরিশ বললে, ও এইজন্যে আমি বাড়িতে না থাকলে তোমার খুব সুবিধে হয়! তারপর সহসা চীৎকার করে উঠলো—দূর হ কালামুখী আমার বাড়ী থেকে। যেখানে গিয়েছিলি সেইখানে থাকগে যা। তোর গায়ের হাওয়া লাগলে আমার এ বাড়ী কলুষিত হয়ে উঠবে।

এই কথা শুনে উর্মিলাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। বললে, তোমার গায়ের হাওয়া লেগে যদি এখনো এবাড়ী কলুষিত না হয়ে থাকে ত আমার স্পর্শে কিছু হবে না ঠিক জেনো। আমি আজো সতীসাধ্বী, আজো এ বাড়ীর কুললক্ষ্মী!

পাশের বাড়ীর মেয়েটি উর্মিলাকে সমর্থন ক'রে কি বলতে গেল কিন্তু হরিশ একেবারে কুৎসিত ভাষায় তাকে গালাগাল দিয়ে বললে, মাগি, তুই হলি যত নষ্টের গোড়া। তুই আমার পরিবারকে দিয়ে রোজগার করাস্—আমি কি জানি না?

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি তার পায়ে ধরে বললে, আমি ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি আপনার স্ত্রী ফুলের মত পবিত্র!

বিকৃতকণ্ঠে তার অনুকরণ ক'রে হরিশ বললে, হ্যাঁ তোর মত পবিত্র! চুপ করে থাক্, মাগি।

উর্মিলা বললে, খবরদার তুমি ওকে কিছু বলো না—ওর কোন দোষ নেই! যা বলবার আমায় বলো।

ওর দোষ নেই, তবে রে হারামজাদি—ওর হয়ে আবার ওকালতি করা হচ্ছে—এই বলে সে উর্মিলার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা দরজায় ঠুকে দিলে।

উর্মিলার মাথাটা কেটে গিয়ে ঝর ঝর ক'রে রক্ত পড়তে লাগল। পাশের বাড়ীর মেয়েটি তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে যেই তার রক্ত মুছিয়ে দিতে গেল অমনি হরিশ তার মা বাপ তুলে কুৎসিত ভাষায় গালাগাল দিয়ে বললে, খবরদার তুই ওর গায়ে হাত দিবিনি। হাত দিয়েছিস কি খুন করবো।

উর্মিলা বললে, তুই চলে যা ভাই, আমার জন্যে তোর কোন ভাবনা নেই।

সে চলে গেল। তখন উর্মিলার চুলের মুঠি ধরে টেনে একপাশে সরিয়ে দিয়ে হরিশ সদর দরজাটায় তালা চাবি লাগিয়ে দিলে। তারপর উর্মিলার দিকে চেয়ে

বললে, এইবার যা খুসী করো আমি কিছু বলবো না—তবে এ বাড়ীতে আর তোমার স্থান নেই !

এই বলে চাবিটাকে পকেটে ফেলে সে হাঁটতে শুরু করলে। ঊর্মিলাও তখন তার পেছন পেছন চললো। হরিশ তাকে নিষেধ করলে কিন্তু সে কিছুতেই তা শুনলে না।

পাশের বাড়ীর মেয়েটি তখন ছুটতে ছুটতে এসে তাকে ধরে বললে, কোথায় যাচ্ছিস দিদি একটা মাতালের সঙ্গে—ওর কি কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে ?

ঊর্মিলা তার ওপর বিরক্ত হ'য়ে বললে, ছেড়ে দে, আমার স্বামীর সঙ্গে আমি যাবো। ও যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাবো। একথার ওপর মেয়েটি আর কিছু বলতে পারলে না। তাকে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। ঊর্মিলা সেই গলি ছেড়ে, কোন্ পথে চলে গেল তা কে জানে ?

একমাস, দু'মাস ক'রে ছ'মাস কেটে গেল তখনো কিন্তু সেই বাড়ীটা তেমনি তালাবন্ধ পড়ে রইল। হরিশ বা ঊর্মিলা কেউ সে বাড়ীতে আর আসেওনি এবং তাদের খবরও কেউ জানতো না। শুধু আরো মাসখানেক পরে একদিন পাশের বাড়ীর সেই মেয়েটি গঙ্গাস্নান করে ফিরে আসবার সময় দেখলে, সরু একটা গলির মধ্যে বসে, নর্দমা থেকে ভাত খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে ঊর্মিলা। তাকে দেখে ভদ্রঘরের বউ বলে চেনাই শক্ত। ভিখিরীরও অধম তার বেশভূষা। তাকে দেখতে পেয়ে সেই মেয়েটি যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো। তারপর তার কাছে এগিয়ে গিয়ে, চোখের দিকে ভাল ক'রে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করলে, তুমি না ঊর্মিলা ?

হি হি করে হাসতে হাসতে সে তখন একমুঠো ভাত নর্দমা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে তার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে বললে, না।

পাড়ার কতকগুলো ছেলে ছুটে এসে সেই মেয়েটিকে বললে, শিগগির পালিয়ে যাও এখান থেকে, ও পাগলী, কেবল নর্দমা থেকে ভাত কুড়িয়ে কুড়িয়ে খায় আর লোকের গায়ে ছুঁড়ে মারে। এই বলে তারা ঢিল ছুঁড়তে লাগল পাগলীর গায়ে। মেয়েটি তাদের ঢিল মারতে নিষেধ ক'রে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে কি ভাবতে লাগল।

রসিকতা

বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রমেশ মুখ দেখিতেছিল—গোঁফ চুমরাইয়া, দাড়িতে হাত বুলাইয়া, ঘাড় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বারবার সে নিজেকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। চেহারা তাহার বদলাইয়া গিয়াছে, নতুন লোক বলিয়া নিজেকে নিজের ভ্রম হইতেছে। দাড়ি গোঁফ তাহার কখনো ছিল না, অর্থাৎ ভালো করিয়া উঠিবার আগে থেকেই সে কমাইতে শুরু করিয়াছিল তাই দীর্ঘ পনেরো বৎসর পরে আবার নিজের মুখে নিজের দাড়ি গোঁফ দেখিয়া রমেশের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। দেড় মাস অসুখে ভুগিবার পর এই অনাবশ্যক কেশগুলিকে সে যখন পরামাণিক ডাকিয়া উচ্ছেদ করিতে যায়, তখন তাহার স্ত্রী মনোরমা উহা করিতে দেয় নাই। বলিয়াছিল, দাড়ি গোঁফে নাকি তাহাকে ভারী সুন্দর দেখায়!

তখনো অফিসের ছুটি পনেরো দিন বাকি ছিল বলিয়া কিম্বা স্ত্রীর মুখে নিজের চেহারার প্রশংসা শুনিয়া বলিতে পারি না রমেশ সেদিন পরামাণিককে ফিরাইয়া দিয়াছিল, দাড়ি গোঁফে হাত দিতে দেয় নাই। কিন্তু আজ তাহার অফিসে 'জয়েন' করিবার দিন। তাই সকাল হইতে বারবার রমেশ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছিল, দাড়িগোঁফ কামাইয়া ফেলিবে কিংবা উহা লইয়াই অফিসে যাইবে। কোন্ অবস্থায় তাহাকে বেশী ভালো দেখায়, ইহা সে কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছিল না।

এমন সময় পিছন দিক হইতে হঠাৎ মনোরমা ঘরে ঢুকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, এতবার ক'রে কি দেখ্‌ছো—মেয়েমানুষের মত দাড়ি-গোঁফ কামালে পুরুষকে ভাল দেখায়, কি রাখলে ভাল দেখায়—এই ত?

রমেশ ইহার কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া না পাইয়া, ইতস্তত করিতে করিতে বলিয়া ফেলিল,—না, মানে অভ্যেস নেই কিনা। তাছাড়া অফিসে সাহেবদের সঙ্গে কাজ করতে হয়—দাড়িগোঁফ দেখলে আবার রেগে গিয়ে তারা জঙ্গলী না বলে তাই ভাবছি।

মনোরমা বলিল, তা একদিন না হয় এইভাবে অফিসে গিয়েই দেখ না, সাহেবরা কি বলে। বলা যায় না, যদি হঠাৎ কারো চোখে ভাল লেগে যায় ত চাইকি তাড়াতাড়ি কিছু মাইনেও ত বাড়তে পারে! এই বলিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে মনোরমা আবার রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

অগত্যা রমেশ ওইভাবেই সেদিন অফিসে বাহির হইল। কিন্তু জগুবাবুর বাজারের কাছে যাইলেই হঠাৎ আনন্দ পিছন দিক হইতে তাহাকে ডাকিয়া বলিল, কিরে, একেবারে পাঞ্জাবী বনে গেলি যে—এবার হাতে একটা লোহার বালা আর মাথায় একটা পাগড়ী বাঁধলেই ব্যস্, একেবারে শিখ ড্রাইভার!

আনন্দ তাহার সঙ্গে এক ক্লাবে থিয়েটার করে। রমেশ সাজে উত্তরা আর সে

সাজে অভিমন্যু। আনন্দর কথা শুনিয়া তাহার কি মনে হইল জানি না, তবে রমেশ তৎক্ষণাৎ একটা 'সেলুনে' গিয়া ঢুকিল এবং দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া নিশ্চিন্ত মনে অফিসে চলিয়া গেল।

এই ঘটনার শেষ এইখানেই। মনোরমা ইহা লইয়া স্বামীকে আর কোন প্রশ্ন করে নাই এবং রমেশকেও ইহার জন্য কোন কৈফিয়ৎ তাহাকে দিতে হয় নাই। তাহাদের মধ্যে যেন পূর্ব হইতেই একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এই ঘটনাটির শেষ এইখানে হইলেও ইহার উপসংহার কেমন করিয়া একটি সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া বহুদিন পরে আবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল সেই কথাই এখন বলিতেছি—

রমেশ ভবানীপুরের এক এ্যামেচার ক্লাবে থিয়েটার করিত। স্ত্রীলোক সাজিয়া সে এমন অভিনয় করিত যে স্ত্রীলোকেরাও সময় সময় ভুলিয়া যাইত যে সে পুরুষ; তাহা ছাড়া তাহার করুণ শোকসঙ্গীত শুনিয়া অশ্রুবর্ষণ করে নাই, এমন দর্শক ছিল না বলিলেই হয়। মোটকথা স্ত্রীচরিত্র অভিনয় করিতে সে ছিল অদ্বিতীয় এবং সারা দক্ষিণ-কলিকাতায় একরকম অপরাজেয়।

প্রতি বৎসরের মত এ বৎসরও পূজার সময় তাহাদের পাড়ায় রমেশদের দল থিয়েটার করিল। বলা বাহুল্য রমেশ স্ত্রীলোকই সাজিল। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া রমেশ এবার একটি অতি ক্ষুদ্র ভূমিকায় অবতীর্ণ হইল! প্রথম অঙ্কের দুইটি দৃশ্যের পর আর তাহার পার্ট নাই। রমেশ তাই 'গ্রীনরুমে' বসিয়া চা খাইতে খাইতে অন্য স্ত্রী-ভূমিকায় যাহারা অভিনয় করিবে, তাহাদের 'মেক আপ' কোথায় কমবেশী হইয়াছে তাহা লইয়া পেন্টার ও ড্রেসারের সঙ্গে বকাবকি করিতেছিল।

—দেখছেন বিধবা সেজেছে, আর আপনারা দিয়েছেন কার্লিং চুল, তারওপর আবার সিঁদুর দেওয়া রয়েছে—ছি ছি, আপনাদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই—খুলুন এ চুল শিগ্‌গির।

পেন্টার বলিল, এ সবের জন্যে আপনি ভাবছেন কেন মশাই? আমি মাথার কাপড়টা টেনে সেফ্‌টিপিন দিয়ে এমন এঁটে দেবো যে, সিঁদুর আর দেখা যাবে না—ব্যস্‌ তাহলেই ত বিধবা হয়ে গেল!

রমেশ রাগিয়া বলিল, এইজন্যে আমি প্রথমেই নারাণদাকে বলেছিলুম কুঞ্জ পালকে ড্রেস ও পেন্টের অর্ডার দিতে। আমাদের অফিসের প্লে সেদিন স্টার বোর্ডে হয়ে গেল—সে কি 'মেক আপ' দিয়েছিল মশায়—নীহারবালা ভেতরে এসে আমায় 'কন্‌গ্রেচুলেট' করে গেল।

পেন্টার একটু বেশী মাত্রায় 'স-স' করে! সে খপ্‌ করিয়া রমেশের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, আপনি সে সুধাংশুর কথা বলছেন ত? সে এ সব শিখলে কোথায়? জানেন, আমাদের রায়চৌধুরী কোম্পানীর শশীশেখরবাবুর সাক্‌রেদ সে? সে বললে, বিশ্বাস করবেন না, তাকে হাতে ধরে শিখিয়েছেন আমাদের মনিব।

এমন সময় অকস্মাৎ নারাণদা আসিয়া বলিলেন, রমেশ মুশকিল হয়েছে, ইন্দু এখনো আসেনি, এখন শিখ ড্রাইভারের পার্টটা করে কে? অনেকখানি 'একটিং' তায় আবার চণ্ডীবাবুর সঙ্গে।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। চণ্ডীবাবু ভবানীপুরের সবচেয়ে বড় 'এক্টর' আর নারাণদা হলেন ক্লাবের মাস্টার। রমেশের একটা মহৎ গুণ ছিল, নিজের পার্ট ছাড়া অন্য যে কোন পার্ট একবার শুনিলেই তাহার মুখস্থ হইয়া যাইত। তাই নারাণদা চট করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, তোর ত আর কোন পার্ট নেই, সাজ দেখি শিখ ড্রাইভারটা।

রমেশ প্রথমটা মুখে আপত্তি জানাইল বটে কিন্তু মনে মনে তাহার বহুদিন হইতেই সখ ছিল একটা কোন পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবার। তাই এ সুযোগ সে হারাইল না, নারাণদা আরও বারকয়েক খোসামোদ করিতেই সে একেবারে সাজিয়া প্রস্তুত হইল। জীবনে ইহাই তাহার প্রথম পুরুষ চরিত্রে অভিনয়।

রমেশ 'মেক আপ' দিতে জানে। তাহার উপর সে ভবানীপুরের শিখপটিতে বাস করিত, কাজেই ড্রাইভারের সাজসজ্জা সে অতি নিখুঁতভাবে ফুটাইয়া তুলিল এবং সেই সঙ্গে অভিনয়ও করিল এরূপ উচ্চাঙ্গের যে, দর্শকগণ বারবার করতালি ধ্বনিতে সামিয়ানা কাঁপাইয়া তুলিল। সত্যি কথা বলিতে কি, পুনঃপুনঃ তাহার এই সশব্দ প্রশংসায় চণ্ডীবাবুরও পার্ট খারাপ হইয়া গেল।

রমেশ ভিতরে আসিতেই নারাণদা তাহাকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, বহুৎ আচ্ছা, গুরুর নাম রাখলি তুই আজ! তুই এরকম গলা পেলি কোথায় রে? চণ্ডীবাবুও রমেশের এই অতিপুরুষোচিত অভিনয়ের খুব প্রশংসা করিলেন।

প্রশংসায় গদগদ হইয়া রমেশ তখন গ্রীনরুমে চলিয়া গেল। কিন্তু ড্রেস খুলিতে যাইয়া হঠাৎ আয়নার মধ্যে নিজের মুখ দেখিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল মনোরমাকে এই চেহারাটা দেখাইলে কেমন হয়! সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

রমেশ ভাবিল, ঠিক হইয়াছে। প্রথমে মনোরমার ঘরে ঢুকিয়া সে তাহাকে ভয় দেখাইবে তাহার পর দাড়িগোঁফ খুলিয়া ফেলিয়া তাহাকে বেকুব বানাইবে! মনে মনে সেই অতি কৌতুককর দৃশ্যটির কথা চিন্তা করিতে করিতে সে তখন বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

নিকটেই রমেশের বাড়ি। মনোরমার সর্দি হইয়াছিল বলিয়া রমেশই তাহাকে থিয়েটার দেখিতে আসিতে দেয় নাই। কি জানি কার্তিক মাসের নতুন হিম লাগিয়া যদি অসুখ হয়! তাই যে অভিনয় মনোরমা আসিয়া দেখিতে পায় নাই, সেই অভিনয় তাহারই সম্মুখে করিবার কথা চিন্তা করিয়া রমেশ আর হাসি সামলাইতে পারিল না।

কিন্তু বাড়ির কাছে আসিয়াই রমেশ বিপদে পড়িল। এখন কেমন করিয়া সে ভিতরে ঢুকিবে? মনোরমাকে ত ডাকিলেই সব রসিকতা গোড়ায় মাটি হইয়া যাইবে। কে ডাকিতেছে, কেন ডাকিতেছে—ভিতর হইতে সব না জানিয়া ত সে আর দরজা খুলিবে না। কাজেই চুপিচুপি রমেশ তখন পাঁচিল টপকাইল বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার জন্য। তারপর তাহার ঘরের যে দরজাটার ছিটকিনী খারাপ ছিল তাহা বাহির হইতে নিঃশব্দে খুলিয়া রমেশ ভিতরে প্রবেশ করিল। এই দরজাটি খুলিবার কৌশল একমাত্র সে ও মনোরমা ছাড়া আর কেহ জানিত না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। মনোরমা তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। নিঃশব্দে সুইচটা টিপিয়া দিয়া রমেশ ঘরের আলো জ্বালাইল। তারপর আস্তে আস্তে বিছানার কাছে যাইয়া যেমন সে মনোরমার গায়ে হাত ঠেকাইল অমনি সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া ভয়ার্তকণ্ঠে বলিল, কে?

রমেশ ঈষৎ হাসিয়া দাড়িতে একবার হাত বুলাইল, তারপর আরো একটু কাছে যাইয়া হিন্দী ও পাঞ্জাবীতে মিশ্রিত একপ্রকার অদ্ভুত ভাষায় বলিল, চিনতে পারছো না সুন্দরী?

মনোরমার মুখে চোখে যেন মুহূর্তে একটা প্রচ্ছন্ন হাসি খেলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে চাপা গলায় বলিল, ও তুমি? কিন্তু তুমি আবার আজ রাত্রে এলে কেন?

আবার আজ! রমেশের বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সে ভাবিল তবে কি সত্যসত্যই কোন শিখ যুবকের সঙ্গে মনোরমার প্রণয় আছে? সর্বনাশ, কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া শেষে সাপ বাহির হইয়া পড়িল নাকি? ব্যাপারটা তখন ভাল করিয়া জানিবার জন্য রমেশের সমস্ত মন কৌতূহলী হইয়া উঠিল। তাই সে কণ্ঠে আরো বেশী করিয়া আবেগ ঢালিয়া দিয়া বলিল, আজই ত সুবিধে, তোমার স্বামী নেই বাড়ীতে—

মনোরমা বলিল, না আমার বড় ভয় করছে—তিনি যদি এখনি এসে পড়েন! তুমি শীগ্‌গির চলে যাও—

রমেশ ইহার উত্তরে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার জিহ্বা তখন শুষ্ক হইয়া বুকের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছিল। তবু সে অতিকষ্টে বারদুই ঢোক গিলিয়া বলিল, কিন্তু আজ যে তোমার কাছ থেকে যেতে ইচ্ছা করছে না।

মনোরমা একমুহূর্তও চিন্তা না করিয়া বলিয়া ফেলিল, তুমি আজ এলে কেন, তোমার ত কাল আসবার কথা ছিল, রাত্তির বারোটার পর? চলে যাও শিগগির —আর দেরী করো না লক্ষ্মীটি—আমার বড় ভয় করছে—যদি তিনি এসে পড়েন এখনি!

রমেশের একবার ইচ্ছা হইল, তখনি দাড়ি গোঁফ খুলিয়া ফেলিয়া মনোরমাকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়; কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল, না ব্যাপারটা আরো কতদূর গড়ায় দেখিতে হইবে। তাই মনের রাগ মনে চাপিয়া রাখিয়া সে মুখে

হাসি টানিয়া আনিয়া শুধু বলিল, আচ্ছা কাল তবে আসবো ঠিক রাত বারোটার সময়। এই বলিয়া তখন রমেশ দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া যেন বাঁচিল।

মনোরমাকে সে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত এবং বিশ্বাস করিত। অথচ মনোরমা তাহাকে লুকাইয়া অন্য পুরুষ—ছি ছি একটা শিখের সঙ্গে শেষে—কথাটা রমেশ আর ভাবিতে পারিল না। নারীকে বিশ্বাস না করিবার জন্য মুনিঋষিরা সেই সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সেদিন পর্যন্ত যত রকমের সদুপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন সমস্তগুলি যেন তখন এক সঙ্গে ভীড় করিয়া তাহার মাথায় জমিতে লাগিল।

ধীর ও মন্থর পদক্ষেপে রমেশ আবার গ্রীনরুমে ফিরিয়া গেল। তারপর একে একে দাড়ি, গোঁফ, চুল, জামা কাপড় প্রভৃতি খুলিয়া সাবান দিয়া মুখ হাত ধুইয়া নিজের স্বাভাবিক বেশভুষা পরিয়া আবার কিছুক্ষণ পরে নিজের বাড়ির দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং কড়া নাড়িল।

মনোরমা প্রথমে ঘরের ভিতর হইতে সাড়া লইল। তারপর চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, রাতদুপুরে থিয়েটার ভাঙ্গা আমি দু'চক্ষে দেখিতে পারি না। ভোরে শেষ হ'লে বাবা কোন জ্বালা থাকে না। এই বলিয়া একবার আড়চোখে রমেশের মুখের দিকে তাকাইল।

রমেশও খপ করিয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অতিকষ্টে ওষ্ঠকে সংযত করিয়া লইয়া দরজায় খিলটা আঁটিয়া দিল।

মনোরমা বরাবরই খুব ঘুমকাতর—সে আর এক মিনিটও সেখানে অপেক্ষা না করিয়া একেবারে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। মনোরমা যে শয্যায় শুইয়া আছে তাহা স্পর্শ করিতে তখন রমেশের মনে ঘৃণা হইতে লাগিল কিন্তু পাছে তাহার স্ত্রীকে আবার ইহার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয় তাই খাটের এক পাশে সে আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া রহিল। বাকী রাতটুকু রমেশ জাগিয়া কাটাইল, তাহার চোখে আর ঘুম আসিল না। সে ভাবিতে লাগিল কাল রাত্তির বারোটার সময় সে এমনি করিয়া ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকিবে, তারপর হাতে হাতে মনোরমাকে সেই শয়তানের সঙ্গে ধরাইয়া দিয়া একেবারে তাহাকে বাড়ি হইতে বিদায় করিয়া দিবে। প্রতিহিংসা লইবার জন্য তাহার দুই চক্ষু তখন হিংস্র জন্তুর মত জ্বলিয়া উঠিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া মনোরমা যথারীতি কাজকর্ম করিতে লাগিল, কিন্তু রমেশ একটা বই মুখে করিয়া সারাদিন বিছানায় পড়িয়া রহিল—ভালো করিয়া মনোরমার সহিত কথাবার্তা পর্যন্ত কহিল না। এদিকে মনোরমা যে বিনা প্রয়োজনে স্বামীর সঙ্গে দু'একবার কথা কহিবার চেষ্টা করে নাই তাহা নহে, কিন্তু রমেশ তাহার উত্তর কখনো বা শুধু ঘাড় নাড়িয়া, কখনো বা সংক্ষিপ্ত হাঁ, হুঁ, দিয়া চুপ করিয়াছে।

এমনি করিয়া সেদিন সারাবেলা কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা হইলে মনোরমা ঘরে

ঢুকিয়া আলো জ্বালাইয়া, ধুনা গঙ্গাজল দিয়া শাঁখ বাজাইয়া আবার রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

রমেশ সন্ধ্যাবেলা আবার একটা বই লইয়া বসিয়াছিল। মনোরমা রাঁধিতে রাঁধিতে কিছুক্ষণ পরে একবার ঘরে আসিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিয়া গেল, এরকম পড়ার চাড় যদি ছেলেবেলায় থাকতো তাহ'লে ত একটা জজ, ব্যারিস্টার হতে পারতে!

রমেশ ইহার কোন উত্তর দিল না। শুধু কিছুক্ষণ পরে জামাকাপড় পরিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেল।

মনোরমা তখন রান্নাঘর হইতে চেঁচাইয়া বলিল, আমার রান্না হয়ে গেছে, কাল রাত জেগেছ তাড়াতাড়ি দু'টি খেয়ে শুয়ে পড়লে ত পারতে!

বাহির হইতে রমেশ ছোট্ট একটি 'হুঁ' বলিয়া চলিয়া গেল। সমস্ত দিন ধরিয়া নানা রকম চিন্তা করিয়া তাহার মাথা গরম হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর এইকথা শুনিয়া তাহার মনে হইল বুঝি তাহাকে তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়াইবার জন্য মনোরমা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাই ইচ্ছা করিয়া ঘণ্টাদুই বাহিরে কাটাইয়া রমেশ বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তারপর অল্প দু'টি ভাত মুখে গুঁজিয়া উঠিয়া পড়িল।

মনোরমা বলিল, ভাত সব ফেলে রাখলে যে?

রমেশ বলিল, ক্ষিদে নেই।

খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মনোরমা বলিল, বই পড়ে বুঝি পেট ভরে গেছে? সেদিন সেই হাসি ও সেই রসিকতা যেন রমেশের দুই গালে দুই চড় মারিল। তবু অতি সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল এবং হাতমুখ ধুইয়া ঘরে গিয়া শুইল।

স্বামী-স্ত্রীর সংসার। কাজেই মনোরমাও সেই সঙ্গে খাইয়া লইল এবং রান্নাঘরের কাজকর্ম সমস্ত চুকাইয়া যখন ঘরে শুইতে আসিল, তখন রমেশ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তবু একবার, দুবার সে বলিল, ঘুমুলে নাকি? কিন্তু অপর পক্ষ হইতে কোন জবাব না পাইয়া মনোরমা মশারি ফেলিয়া, দরজায় খিল দিয়া, আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

সমস্ত দিন মনোরমাকে কাজ করিতে হয়, ঝি চাকর তাহার নাই কাজেই বিছানায় গা ঠেকাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

রমেশের চোখে কিন্তু ঘুম ছিল না। শিকারী বিড়ালের মত নিঃশব্দে সে পড়িয়াছিল। পাশের বাড়ির ঘড়িতে দশটা বাজিল, এগারোটা বাজিল, সাড়ে এগারোটা বাজিল—সে সব শুনিল। বারোটার জন্য সে তখন উৎকর্ণ হইয়া জাগিয়া রহিল। সাড়ে এগারোটা হইতে বারোটা যেন আর বাজিতে চায় না।

কিছুক্ষণ পরে ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিল। রমেশের বুকের ভিতরটা ঘড়ির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যেটা যেমন নিস্তব্ধ তাহাদের সেই গলিটাও তেমনি। শুধু দূর হইতে মাঝে মাঝে দুই একটি

মোটরের অস্পষ্ট হর্ন ধ্বনি তাহার কানে আসিতেছিল।

এমন সময় খট্ করিয়া বাহিরে কিসের একটা আওয়াজ হইল! রমেশের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সেই শিখ যুবকটি কি তবে আসিল? মনোরমাকে না ডাকিয়া সে কি তবে এইভাবে মৃদু শব্দ করে? এই কি তাদের সংকেতধ্বনি! রমেশ আর ভাবিতে পারিল না। মনোরমা এইবার হয়ত বাহিরে যাইবে, এই মনে করিয়া সে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া শুইয়া রহিল। কিন্তু কই, সব চুপচাপ। ওই ত মনোরমা অগাধে তাহারি পাশে ঘুমাইতেছে!

রমেশ ভাবিল হয়ত মনোরমা সেই শব্দটা শুনিতে পায় নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার কিসের একটা আওয়াজ হইল। এবারের আওয়াজটা যেন পূর্বের অপেক্ষা আরো জোরে বলিয়া রমেশের মনে হইল। কিন্তু কৈ, এবারেও ত সব চুপচাপ। শুধু মনোরমার নাক ডাকিতেছিল মৃদু ও বিরামহীন এক অপরূপ ছন্দে। মানুষের শরীর, হয়ত মনোরমা হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, এই মনে করিয়া তখন চুপিচুপি রমেশ বিছানা হইতে নামিয়া আসিল এবং পা টিপিয়া টিপিয়া জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইল, বাহিরে দণ্ডায়মান সেই শিখ যুবকটিকে যদি দেখিতে পায় এই আশায়।

প্রথম জানালাটা দিয়া উঁকি মারিয়া সে গলির মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। তখন দ্বিতীয় জানালাটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সেখান হইতেও কাহাকেও তাহার নজর পড়িল না। চুপি চুপি আবার সে তৃতীয় জানালাটির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু যেমন সেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে অমনি কোথা হইতে হাওয়া আসিয়া একটা খড়খড়িকে বাহিরের দেওয়ালে আছাড় মারিল।

ঝনাৎ করিয়া শব্দ হইল। রমেশ ভয়ে কাঠ হইয়া অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। যদি মনোরমা জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে দেখিতে পায়। কিন্তু তাহা হইল না। তাহাকে তখনো তেমনিভাবে ঘুমাইতে দেখিয়া রমেশের যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল। সে আবার চুপি চুপি আসিয়া বিছানার ভিতর শুইয়া পড়িল।

এইভাবে আরো আধ ঘণ্টা কাটিয়া যাইবার পর হঠাৎ রমেশের মনে হইল যেন নীচে কিসের একটা শব্দ হইতেছে। তবে কি মনোরমা সেইখানে তাহার সহিত দেখাশুনা করে?

রান্নাঘরের পাশে নীচে এমনি একটা ঘর পড়িয়াছিল, তাহার একদিকে কাঠকুটা ঘুঁটে প্রভৃতি থাকিত এবং আর একদিকে একখানি পুরাতন তক্তাপোষ পাতা ছিল, তাহাতে ঝি চাকর যখন থাকিত, শয়ন করিত।

রমেশ কান খাড়া করিয়া ভাবিতে লাগিল। এইবার হয়ত মনোরমা উঠিয়া নীচে যাইবে। কিন্তু এবারও মনোরমার কোন সাড়াশব্দ নাই। পূর্বে যেমন-ভাবে ঘুমাইতেছিল এখনো ঠিক তেমনিভাবে সে ঘুমাইতে লাগিল। আবার একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল! রমেশ আর চুপ করিয়া শুইয়া থাকিতে পারিল

না। এবার নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলিয়া নীচে নামিয়া আসিল। তারপর ধীরে ধীরে যেমন সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল অমনি একটা বিড়াল সেখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। রমেশ থমকিয়া দাঁড়াইল। তবে কি সেই বিড়ালটা শব্দ করিতেছিল? তখন সে বাহির হইতে ঘরটিতে শিকল দেওয়া দেখিয়া আবার চুপি চুপি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

কিন্তু ঘরের ভিতর পা দিতেই হঠাৎ কাহার গায়ে তাহার হাত ঠেকিয়া গেল। রমেশের সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে একেবারে তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল।

ছাড়ো—ছাড়ো—আরে আমি যে। বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ মনোরমা আলোর সুইচটা টিপিয়া দিল। রমেশ তাড়াতাড়ি তাহাকে ছাড়িয়া দিল বটে; কিন্তু তখনো উত্তেজনায় তাহার সর্বশরীর কাঁপিতেছিল। সে বলিল, কোথায় যাচ্ছো?

কলঘরে—দেখতে পাচ্ছো না! বলিতে বলিতে মনোরমা বারান্দার শেষে টিনের 'পার্টিশন' দেওয়া ছোট ঘরটির দিকে চলিয়া গেল।

রমেশ সেই দিকে চাহিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া লইল এবং একেবারে বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। হতাশায় তাহার দেহ মন তখন ক্লান্ত, ও অবসন্ন।

মনোরমা কলঘর হইতে আসিয়া, গামছায় হাত পা মুছিয়া, আবার দরজায় খিল লাগাইয়া দিয়া আলো নিভাইয়া মশারির মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি শুইয়া জাগিয়া আছে, অথচ কেহ কাহারো সহিত বাক্যালাপ করিতেছে না, দাম্পত্যজীবনে ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ ব্যাপার!

তাই মিনিট কয়েক পরে মনোরমাই প্রথম কথা বলিল—হ্যাঁগো, কাল তোমাদের থিয়েটার ক'টার সময় শেষ হলো?

কি জানি। সংক্ষেপে শুধু ইহা বলিয়া রমেশ চুপ করিল।

মনোরমা আবার বলিল, সেকি কথা, তুমি থিয়েটার করলে আর তুমি জানো না কটার সময় ভাঙ্গলো?

রমেশ ইহার কোন উত্তর না দিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। মনোরমা তখন স্বামীর বুকের উপর একখানি হাত তুলিয়া দিয়া বলিল, ওমা, কথা কইতে কইতে এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

রমেশ মনোরমার হাতটা তাহার বুকের উপর হইতে নামাইয়া দিয়া বিরক্তি পূর্ণ কণ্ঠে বলিল, আমি শেষ পর্যন্ত ছিলুম কি যে জানবো ক'টার সময় ভেঙ্গেছে? এই বলিয়া দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া শুইল।

মনোরমা অন্ধকারের মধ্যে ইহা বেশ বুঝিতে পারিল; কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিল না। শুধু আর একবার বলিল, হ্যাঁগো, এবার তুমি কেমন অভিনয় করলে বললে না ত?

রমেশের একবার ইচ্ছা হইল চীৎকার করিয়া বলে, তাহা শুনিয়া তোমার লাভ

কি ? কিন্তু পারিল না, মনে মনে ভাবিল হয়ত মনোরমা এইভাবে চালাকি করিয়া পরীক্ষা করিতেছে যে সে ঘুমাইল কিনা। তাই কোন কথা না বলিয়া সে চুপ করিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল এবং কৃত্রিম উপায়ে নাক ডাকাইতে লাগিল।

নাসিকা গর্জন শুনিয়াও কিন্তু মনোরমা থামিল না। আপন মনেই বলিয়া চলিল, আমার কিন্তু তোমার পার্টটা সবচেয়ে ভালো লেগেছে।

ইহা শুনিয়া রমেশ চমকাইয়া উঠিল। তবে কি মনোরমা কাল অভিনয় দেখিতে গিয়াছিল! সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। হঠাৎ নাসিকা গর্জন থামাইয়া বলিয়া উঠিল, থিয়েটার দেখলে না অথচ আমার পার্টটা তোমার ভাল লাগলো কি করে, বুঝতে পারলুম না ত ?

ওঃ, তোমাকে ওকথাটা বলতেই ভুলে গিয়েছিলুম। দুলুর মা কাল কিছুতেই আমায় ছাড়লে না, বললে চল একটুখানি দেখে চলে আসবো। সে চলে গেলে আমি একা কি ক'রে বাড়িতে থাকি, অগত্যা আমায়ও যেতে হলো তার সঙ্গে। তবে শাল বেশ করে মুড়ি দিয়ে গিয়েছিলুম, ঠাণ্ডা একটুও লাগেনি। এই পর্যন্ত বলিয়া মলিনা চুপ করিল।

দুলুর মা তাহাদের বাড়ীওয়ালার স্ত্রী, তিন তলায় থাকে।

মনোরমা থিয়েটার দেখিয়াছে শুনিয়া রমেশ রীতিমত ঘাবড়াইয়া গেল। তাই মিনিট কয়েক চুপ করিয়া থাকিবার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, কতদূর পর্যন্ত তোমরা দেখেছিলে ?

মনোরমা বলিল, তোমার ওই শিখ ড্রাইভারের পার্টটা যেই হয়ে গেল, আমরাও অমনি চলে এলুম। বাস্তবিক কি সুন্দর তোমাকে মানিয়েছিল, একেবারেই চেনা যায় না।

রমেশ সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, একেবারেই চেনা যাচ্ছিল না ?

মনোরমা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, জানো, দুলুর মা তোমায় একেবারেই চিনতে পারে নি—আমি কিন্তু তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম।

রমেশ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, নিমেষে তাহার সমস্ত আগ্রহ যেন নিভিয়া গেল। সে চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

মনোরমা তখন দক্ষিণ বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠবেষ্টন করিতে করিতে বলিল, হ্যাঁগো, তোমার কথা না শুনে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলুম ব'লে আমার ওপর রাগ করলে ?

রমেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শুধু ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, না।

সুমথনাথ ঘোষ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে পরপূর্বা ও উত্তরবাহিনী এই দুটি উপন্যাস এবং প্রথম গল্পসংকলন জটিলতার পাঁচটি গল্প সংকলিত হয়েছে।

পরপূর্বা উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। স্বাধীনতা পূর্ব-বর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় এই উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে। প্রথম প্রকাশক মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩। গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয় লেখকের বন্ধু ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক ও তদীয় পত্নী কল্যাণী প্রামাণিককে। গ্রন্থের দ্বিতীয় মুদ্রণ থেকে রচনাবলীর পাঠ গৃহীত হয়েছে।

যশস্বী সাহিত্যিক সুমথনাথের একটি সুখপাঠ্য উপন্যাস 'পরপূর্বা'। এ ধরনের সমস্যাসংকুল উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিরল। একদিকে মাতৃত্বের দৃঢ় বন্ধন ও অন্যদিকে বলপূর্বক অপহৃতা ও ধর্মান্তরিতা মায়ের হৃদয়বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে এই নাতিক্ষুদ্র আখ্যায়িকায়।

'পরপূর্বা'র মধ্যে অনেক নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ লেখক করেছেন। দেশ-ভাগের প্রাক্‌কালে দেশব্যাপী হাংগামা, নারী নিগ্রহ ও অত্যাচারকে অবলম্বন করে এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন।

'পরপূর্বা' ঘাত-প্রতিঘাতময় অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস। নর ও নারীর ব্যথা ও বেদনার চিরন্তন কাহিনী শুনিয়েছেন সুমথনাথ। 'পরপূর্বা' বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রচনা হিসেবে চিহ্নিত হবে বলে বিশ্বাস।

প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পরপূর্বা' প্রসঙ্গে মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্যঃ "পরপূর্বা সুমথনাথের একটি শক্তি-শালী ও আবেগের ঘাতপ্রতিঘাতময় উপন্যাস।" 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ. ৮১৯॥

দ্বিতীয় উপন্যাস উত্তরবাহিনী প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৯০ সালের ফাল্গুন মাসে। এটি লেখকের প্রথম উপন্যাস 'বাঁকাস্রোতে'র পরিপূরক গ্রন্থ বলা যায়। 'বাঁকাস্রোতে'র নায়ক আলোকের উত্তরজীবনের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের কাহিনী। উপন্যাসের উৎসর্গপত্র এইরকমঃ— "শ্রীমৃদুলা ঘোষ জীবনসঙ্গিনীকে"। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩। উপন্যাসটির প্রথম পেপার-ব্যাক সংস্করণ থেকে রচনাবলীর পাঠ গৃহীত হয়েছে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন বিখ্যাত ও বিশিষ্ট লেখক সুমথনাথ

ঘোষ। বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের সুখ ও দুঃখ এবং ব্যথা ও বিষাদের কথাকার তিনি। তাঁর সাবলীল ও সহজসরল এবং কাব্যগুণে সমৃদ্ধ সুমিষ্ট গদ্যেলেখা উপন্যাসগুলি সহজেই পাঠক-মনকে আকৃষ্ট করে তোলে। আধুনিক কথা-সাহিত্যে বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্কর-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী কালে যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় সাহিত্যিক পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করেছেন—সুমথনাথকে তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান লেখক বলতেই হবে।

সুমথনাথের কালজয়ী বিখ্যাত উপন্যাস 'বাঁকা স্রোত'। 'বাঁকা স্রোত' উপন্যাসের অনুসৃতি হোলো 'উত্তরবাহিনী'। নদী উৎস-মুখ থেকে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয় নানা উপলখণ্ড ও বালুকারাশির মধ্য দিয়ে। আবার সব নদীর গতিই সুমসৃণ ও দক্ষিণ-গামিনী নয়। সে রকম সব মানুষের জীবনও উপল-বাহিত গতিতে প্রবাহিত হয় না। ব্যতিক্রমও থাকে। জীবনের বাঁকে বাঁকে অজস্র বাধা ও বিঘ্নের মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র আলোকও অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু কোথাও স্থির হয়ে ঘর বাঁধতে পারেনি।

'উত্তরবাহিনী' উপন্যাসের আরম্ভ কাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনতিকাল পূর্বে হয়তো দুই-এক বৎসর আগে। সে সময়ের যুবক-জীবনের অনেক জীবন-যন্ত্রণা উপন্যাসে ব্যক্ত করেছেন লেখক। উপন্যাসের যবনিকা উঠেছে হরিদ্বারে। সেখানে পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে ধর্মশালায় আলোক আশ্রয় নিয়েছিল। এই ধর্মশালায় থাকতে থাকতেই তার সঙ্গে বিচিত্র চরিত্র সব মানুষের পরিচয় ঘটে। ধর্মশালার পাণ্ডাজী, ছড়িদার ঈশ্বরলাল এবং হরিদ্বারের কাছে কন্‌খলের সেই 'লেংটিসার' দুধের দোকানের 'পাঁড়েজী'র মতো বিচিত্র মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়। তারপর অসুস্থ হয়ে কন্‌খলে পাণ্ডাজীর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ এবং সেখানেও পাণ্ডাজীর মাতাজী ও বিধবা ভগ্নী ললিতার সেবা-শুশ্রূষায় দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে। মাতাজীর কাছে শোনে এক সময়ের কলকাতার বিখ্যাত বাইজী মতি বাঈয়ের কথা। মতি বাঈয়ের কাছেই তাঁর বিগত জীবনের কাহিনী শুনতে শুনতে অভিভূত হয়। ভৃত্যরূপী কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণকেও হঠাৎ আবিষ্কার করে তাঁর কাছে। তাঁর বৈচিত্র্যময় ও অত্যাশ্চর্য তন্ত্র-সাধনার কাহিনী শোনে। হরিদ্বারের ভ্রাম্যমাণ জীবনে আরো বহু সাধু সন্ন্যাসী ও তাঁদের আখড়া ও আশ্রমের সংস্পর্শে আসে। রক্তাম্বর-পরিহিতা-বাঙালী-তরুণী-সন্ন্যাসিনী কমলিনী দেবী ও সদানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্যাম মহারাজের সংস্পর্শে এসেও বৈচিত্র্য-ভরা মনুষ্য জীবন ও চরিত্রের সংবাদ পায়।

কাশীতেও ভ্রাম্যমান অবস্থায় রাণীদির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। রাণীদির আশ্চর্য ঘটনা-বহুল জীবনেতিহাসও পাঠকচিত্তকে বিমুগ্ধ ও বেদনায় মথিত করে দেয়।

আবার 'উত্তরবাহিনী'র দ্বিতীয় অধ্যায়েও অনেক বিচিত্র ঘটনা ও বিচিত্র-

রূপিণী নারীর সঙ্গে আলোকের পরিচয় হয়। মামাদেব গ্রামের বৌদি ও তাঁর কন্যা ভদ্রা এবং চিন্ময় ও তার উচ্চশিক্ষিত স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়। আরো অনেক চরিত্র ও ঘটনা মিছিল করে এসেছে সুদীর্ঘ উপন্যাস 'উত্তরবাহিনী'তে।

বিহারী জমিদার পুত্র রাজেন্দ্রকুমার এবং দেবুদা ও তার স্ত্রী এবং রাজেন্দ্র কুমারের মাতা ও স্ত্রী—মাতাজী ও বহুরাণী এবং মাতাজীর সর্বক্ষণের সহচরী কুটিলা রাধা—কত কুটিল ও জটীল চরিত্রের সঙ্গে ক্রমে পরিচয় হয়। শেষ পর্যন্ত সুরিয়ায় বেড়াতে গিয়ে অনুরাধার সঙ্গে পরিচয় হয় ও আলোকের মনে অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। পরিশেষে অনুরাধার সঙ্গে বিবাহের মধ্য দিয়ে আলোকের ভ্রাম্যমাণ ও অশান্ত জীবনের অবসান ঘটে।

সুমথনাথের সক্ষম হস্তের পরিচয় পরিস্ফুট তাঁর 'উত্তরবাহিনী' নামক ক্লাসিক-রসে সঞ্জীবিত উপন্যাসের মধ্যে। বাংলা সাহিত্যের একটি মহৎ ও বিখ্যাত উপন্যাস 'বাঁকা স্রোত'। তারই সমগোত্রীয় উপন্যাস বলা যায় এই উপন্যাসটিকে। যদিও যতদূর জানি 'বাঁকা স্রোত' রচনার দীর্ঘকাল পরে এই উপন্যাসটি রচনায় লেখক হাত দিয়েছিলেন। সুমথনাথের লেখক হিসেবে মুন্সীয়ানা ও মহৎ ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচয় এই উপন্যাসের মধ্যেও পাওয়া যায়।

'উত্তরবাহিনী' পুস্তক-আকারে প্রকাশের পূর্বে 'কথাসাহিত্য' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক রচনা হিসেবে প্রকাশিত হয়।

'উত্তরবাহিনী'র 'পেপার-ব্যাক' সংস্করণের প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন ১৩৯৬। প্রকাশ ঃ এস. এন. রায়, মিত্র ও ঘোষ প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। মুদ্রাকর ঃ জয়ন্ত বাকচি, পি. এম. বাকচি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৬। ডবল ক্রাউন সাইজ, কাগজের মলাট। প্রচ্ছদপট-শিল্পী ঃ শ্রীপূর্ণেন্দু রায়। পৃ. ৪+৪৯৬ (টাইটেল পেজ, উৎসর্গপত্র—সচিত্র মলাট। বইয়ের মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় গ্রন্থের পরিচয় দেওয়া আছে।)

'জটিলতা' গল্পগ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪২ সালে, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে। গ্রন্থটি প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল ও তাঁর স্ত্রী জয়ন্তী দেবীকে উৎসর্গিত। এর দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে পাঁচটি গল্প আগে রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাকী পাঁচটি গল্প—অভিমান, মৃগতৃষা, অপ্রত্যাশিত, বনিয়াদি এবং রসিকতা এই খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

—চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥